পূজাবার্ষিকী ১৪২৪

আনন্দমেলা

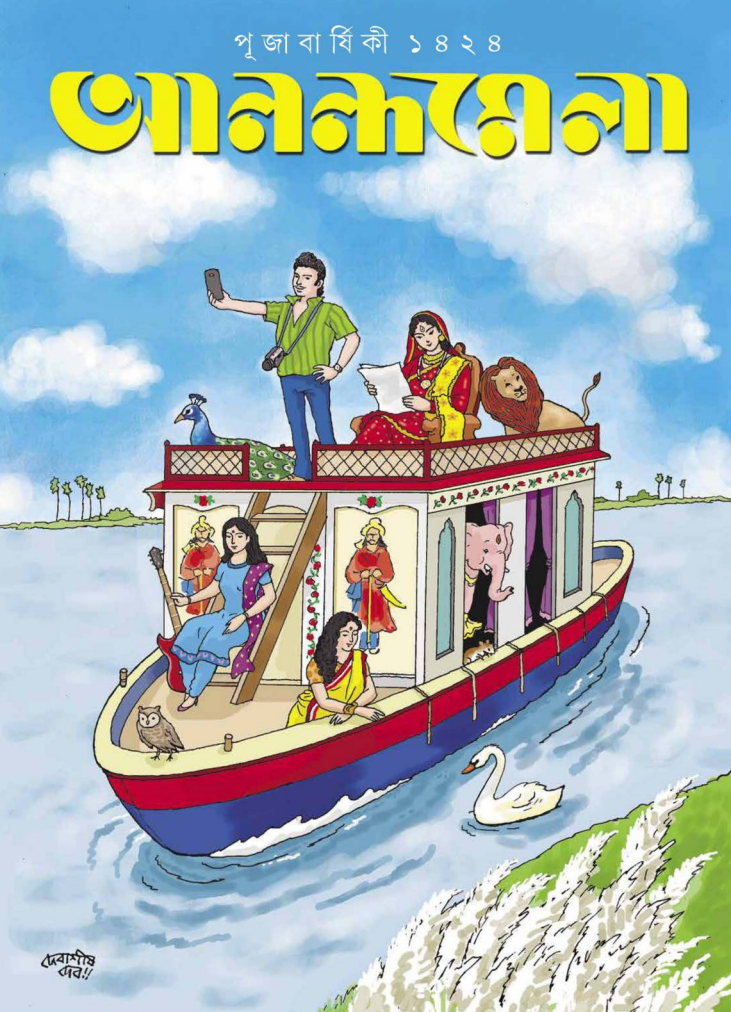

আনন্দমেলা

পূ জা বা র্ষি কী ১৪২৪

ডিজিটাল সংস্করণ

সূচিপত্র

স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স

জং বাহাদুর সিংহর নাতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৩

গোটা বিদ্যেধরপুরের লোকই চায় বীর বাহাদুর সিংহ একজন বীরপুরুষ হয়ে উঠুক। অনেকেই তার কাছে এসে লাঠিখেলা বা তরোয়াল চালানো শিখতে চায়। কেউ বা সাত ফুট উঁচু দেওয়াল ডিঙোনোর কায়দা শেখার জন্য ঝুলোঝুলি করে। কিন্তু বীর বাহাদুর সকলকেই হতাশ করে। সে তো জানেই না কিছু। কিন্তু এভাবেই একদিন একজন বেঁটে সাদাসিধে লোক এসে তার কাছে আশ্রয় নিল। শত চেষ্টাতেও তাড়ানো গেল না। বীর বাহাদুর পড়ল ফাঁপরে। তাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে লোকটা। এদিকে বীর বাহাদুরকেই তো বারপাঁচেক ডাকাতের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। কিন্তু বীরুর এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। এ তল্লাটের ডাকসাইটে ডাকাত জং বাহাদুর সিংহের নাতি বলে কথা। সে কি এভাবেই ভিতুর মতো দিন কাটাবে?

নিঃশব্দ মৃত্যু

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ৪২

শ্বাসকষ্টে মারা পড়ছেন শহরের একের পর-এক উচ্চবিত্ত পরিবারের বিভিন্ন মানুষজন। এ এক আশ্চর্য কাণ্ড। কারও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে পরিবারের কাছে আসছে এক উড়ো ফোন। নির্দিষ্ট জায়গায় লক্ষ-লক্ষ টাকা পৌঁছে দিলে ফোনেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোথায় রয়েছে নিরাময়ের ওষুধ। এমন রুদ্ধশ্বাস রহস্যের তদন্তে নেমেছেন দীপকাকু। সঙ্গে আছে ঝিনুক। কীভাবে সফল হলেন তাঁরা?

কঙ্কালতটের ভয়ঙ্কর

রাজেশ বসু ৮২

নামিবিয়ার পূর্ব সীমানা জুড়ে অতলান্তিক সমুদ্র বরাবর দেড় হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নামিব মরুভূমি। এখানেই রয়েছে স্কেলিটন কোস্ট। বছরে দশ মিলিমিটারও বৃষ্টি হয় না নামিবে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মরুভূমিও এই নামিব। সেখানেই কাজে এসেছে দ্যুতি ও কাবুলদা। ধু ধু মরুভূমির ভিতরে গাড়িতে করে যেতে-যেতে হঠাৎ কানে এল আচমকা কাছেই কোথাও টায়ার ফাটার আওয়াজ। যদিও ঠিক টায়ার নয় যেন। সবেমাত্র একটা ফুয়েল পাম্প পেরিয়েছে ওরা, শব্দটা মনে হল ওখান থেকেই এসেছে। ওটা আসলে ছিল গুলির আওয়াজ। নেমে দেখা গেল একটা লোক মাটিতে আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। চারদিকে হিংস্র জন্তু, ধু ধু মরুভূমি। এই ছমছমে জায়গায় কী ভয়ানক রহস্যে জড়িয়ে পড়ল দ্যুতিরা?

টুয়াটারা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৫

গারো পাহাড়ের স্বপ্নমাখা মেঘের মধ্যে এবার অভিযান দিঠি, কল্প্য আর সুনৃতদের। সঙ্গে আছে ভুবনদাদু। সেখানেই কোথাও নাকি আছে মাংশাসী পিচারপ্ল্যান্ট। গারো উপজাতির হারানো লিপি নিয়ে গবেষণা করতে একসময় ঘুরেছিলেন ভুবনদাদু। এবার তাঁর পুরনো সহকারী স্যামুয়েল জানিয়েছে, সে পেয়েছে তেমনই এক চিত্রলিপির খোঁজ। তিনজনকে নিয়ে ওই দুর্গম জায়গায় রওনা দিলেন ভুবনদাদু। রহস্যের অঙ্কগুলো কীভাবে মেলাল খুদে গোয়েন্দার দল?

ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুরহস্য

জয়দীপ চক্রবর্তী ২৩৯

ঝুলনের বন্ধু মন্দিরার বাবা ব্রতীনআঙ্কল মথুরাপুরের একটি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। ঝুলনের শ্রদ্ধার মানুষ। হঠাৎ তিনি মারা গিয়েছেন এক মাস আগে। ডাক্তার বলেছিল কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। কিন্তু মাসখানেক পরে তাঁর ডায়েরি পড়তে গিয়ে সন্দেহ হল মেয়ে মন্দিরার। তখনই সে ফোনে তলব করেছে ঝুলনকে। কিশোর নোটনকে নিয়ে রহস্যভেদে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝুলন। শেষ পর্যন্ত কী দেখা গেল? এটা কি খুনই নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু?

কুমায়ুন রহস্য

অনীশ মুখোপাধ্যায় ২৬৩

বন্ধুদের সঙ্গে কুমায়ুন হিমালয়ে ট্রেক করতে গিয়েছিল ললিত। চারদিন পর ফেরার কথা ছিল শনিবার। কিন্তু মঙ্গলবার হয়ে যাওয়ায় তার জন্য বাড়ির সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। তাকে ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে তার বাবা চন্দ্রমোহনবাবু শরণাপন্ন হন বাপ্পার। ললিতকে খুঁজতে বাপ্পা-নীল প্রথম গেল লখনউ। তারপর কুমায়ুনে। কিন্তু কোথায় গেল ললিত? কী রহস্য লুকিয়ে আছে ললিতের অন্তর্ধানের আড়ালে? বাপ্পাদেরই বা কারা অনুসরণ করছে?

আপ্পু ও পরিদিদি

রঞ্জন দাশগুপ্ত ৩৬১

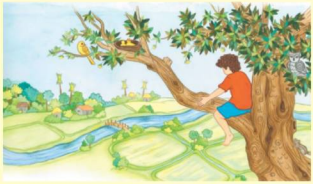

পুরুলিয়ার যে গ্রামে বাড়ি আপ্পুর, সেটা যেন ঠিক গল্পের বই থেকে উঠে এসেছে। সেখানে আছে ঝরনাপুকুর, যার জল কখনও শুকোয় না। হঠাৎ একদিন আপ্পুর বাড়িতে হাজির হল পরির মতো এক সুন্দর মেয়ে। তার সঙ্গে আপ্পুর দিব্যি ভাবও হয়ে যায়। তবে মা-বাবার কথায় কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পায় আপ্পু। যা সামনে আছে, তার আড়ালেও যেন কিছু কথা বইছে। কী সেই কথা? সেগুলো কীভাবে জানতে পারে আপ্পু?

সম্পূর্ণ রঙিন ফেলুদা কমিক্স

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা ১০৯

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ঘুরঘুটিয়ার জমিদার কালীকিঙ্করবাবু ফেলুদাকে বলেছিলেন, রহস্যের সমাধান হলে তাকে এমিল গ্যাবোরিওর বইগুলো দিয়ে দেবেন। কিন্তু সাতমহলা ঘুরঘুটিয়ার জমিদারবাড়িতে অন্ধকারে লুকিয়ে আছে অনেক চাপা অজানা কথা। সেসব কথা টেনে বের করে গ্যাবোরিওর বইগুলো জিতে নিতে পারবে যে ফেলুদা, সে তো সকলেরই জানা। তবু রঙের আঁচড়ে আর ঘটনার চিত্রায়ণে প্রাণ পেয়েছে বহুবার পড়া ফেলুদার চিরনতুন কাহিনি।

সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

চোরা হাতি শিকারি ১৯০

কাহিনি: সমরেশ বসু

চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

গোগোলের পুলুমামা শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে এসেছেন। গরমের ছুটি কাটাতে তার বাড়ি বাবা-মায়ের সঙ্গে পাড়ি দিল গোগোল। সেখানে পুলুমামার ফরেস্ট বাংলো দেখে মুগ্ধ গোগোল। পুলুমামার বন্ধু রজতবাবুর কথায় বৈকুণ্ঠপুরের রণবীর সিংহর বাড়ি একদিন বেড়াতে গেল গোগোলরা। সেখানে লিমবুর সঙ্গে আলাপ হল গোগোলের। লিমবু তারই বয়সি। ওর সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে কী রহস্যে জড়িয়ে পড়ল গোগোল?

সম্পূর্ণ হাসির কমিক্স

রাপ্পা রায় ও সোনার হরিণ ২৯০

কাহিনি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজত দাস ও পৃথা ঘোষ

রাপ্পা তার বন্ধুকে নিয়ে কাজিরাঙার জঙ্গলে বেড়াতে যাচ্ছিল। স্টেশনে তার সঙ্গে এক দৃষ্টিহীন লোকের ধাক্কা লাগল। কেন জানি রাপ্পার মনে হল, উনি আসলে দৃষ্টিহীন নন। ট্রেনে সেই দৃষ্টিহীন মানুষটির সঙ্গেই আবার দেখা। তাকে অনুসরণ করতে গেল সে। হঠাৎই বেমক্কা মাথায় বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হল সে। হুঁশ ফিরলে দেখল সে বন্দি দৃষ্টিহীন মানুষটির সঙ্গেই। কাজিরাঙার গহন জঙ্গলে কী রহস্য বিছানো রয়েছে?

গল্প

জাদুকর

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ২৫৯

হারুপাগলকে ভয়ই পেত তোজো। তবে একদিন পুরনো বাড়িতে আটকে যাওয়ার পর হারুই তাকে বাঁচিয়ে দিল। হারুপাগলের দেওয়া পাথরটা তোজোর কোন কাজে লাগল?

নতুন হেডমাস্টারমশাই

প্রচেত গুপ্ত ৭১

স্কুলে শিক্ষকদের নানাবিধ নাম দেয় ছাত্ররা। শিক্ষকরা সেসব জেনেও ফেলেন, তবে রাগেন না। বরং পছন্দই করেন। নতুন হেডমাস্টারমশাই এলেন একদিন স্কুলে। খুব রাগী তাঁরও তো নতুন নামকরণ করল ছাত্ররা। সেটাও কি জেনে ফেললেন তিনি?

কাচের মুকুট

ঋতিকা নাথ ২৩৪

ঠাম্মা মারা যাওয়ার পর থেকেই নৈঋতের কিছু ভাল লাগে না। লেখাপড়াতেও মন নেই। স্কুলে বন্ধুরা তাকে অপদস্থ করে নানাভাবে। সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে খালি নিরাশায় ডুবে যায় নৈঋত। কীভাবে নিজেকে শেষে ফিরে পেল নৈঋত?

হ্যাংলাথেরিয়াম

নবনীতা দত্ত ৩৭৮

খাওয়া পেলে বুঁচকি আর কিছু চায় না। বেশি খেয়ে-খেয়ে তার শরীর খারাপ। এদিকে সেদিন বাপটুর জন্মদিন। মাকে রাজি করিয়ে কি বাপটুর জন্মদিনে যেতে পারল বুঁচকি?

বি জ্ঞা ন

মিলিয়ন ডলার ধাঁধা

পথিক গুহ ৩৮

অঙ্কের যেসব ধাঁধা শুনতে খুবই সহজ, কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও আজও আসা যায়নি যাদের সমাধানে।

পু রা ণ

দেবী যখন দুর্গা

সিজার বাগচী ১১

দুর্গ নামের অসুরকে পরাজিত করে কীভাবে দেবী দুর্গার পুজোর প্রচলন হল মর্ত্যে?

সা হি ত্য

ডি-লা-গ্র্যান্ডি...

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯

আগামী বছর শতবর্ষে পড়ছেন টেনিদার স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিদগ্ধ মানুষটির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

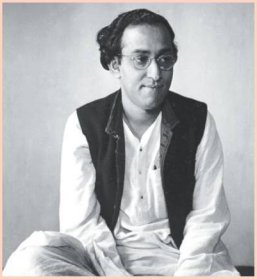

বি চি ত্রা

পাতাল শহর কুবের পেডি

সুদেষ্ণা বসু ৭৫

অস্ট্রেলিয়ায় মাটির নীচে রয়েছে এক আশ্চর্য শহর। রয়েছে বিলাসবহুল মোটেল, গির্জা, বাড়ি আরও অনেক কিছুই।

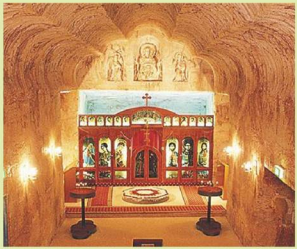

অদৃশ্য জাহাজ

জয় সেনগুপ্ত ৭৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউ এস এস এলড্রিজ হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল কয়েকশো মাইল দূরের নরফোক-এ। এ কি ম্যাজিক? যে-কোনও উন্নত ম্যাজিকের মতোই এর নেপথ্যেও লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের কৌশল।

চলমান পাথরের রহস্য

পারমিতা মুখোপাধ্যায় ৮১

প্রকৃতির বিস্ময় নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। তবে মাঝে-মাঝে নতুন করে চমকে যেতে ভাল লাগে বইকী। এই ক্যালিফোর্নিয়ার 'ডেথ ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক'-এর আশ্চর্য পাথরগুলো যেমন, এরা নাকি চলতে পারে! আপাতভাবে রহস্যময় মনে হলেও এর পিছনে রয়েছে ভূগোলের গূঢ় তত্ত্ব।

মৌমাছি না থাকলে

অচ্যুত দাস ৩৫৯

মৌমাছি ক্রমশ কমে আসছে পৃথিবী থেকে। আরও অনেক অসহায় প্রাণীর মতোই। কিন্তু আর সকলের চেয়ে মৌমাছির প্রয়োজন যে অনেকটাই আলাদা। এর কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে মানুষের খাদ্যের সম্ভার। কী হতে পারে মৌমাছি না থাকলে?

খে লা ধু লো

জয়রথে রোনাল্ডো

জয়দীপ চক্রবর্তী ৩৮১

গত একবছরে দুরন্ত ফর্মে পর্তুগালের সি আর সেভেন।

হৃদয়ে হার্দিক

স্বর্ণাভ দেব ৩৮৩

চমকে দেওয়া পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের উঠতি তারকা হার্দিক পান্ড্য।

স্টিক হাতে সর্দারি

ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮৫

ভারতীয় হকিতে নতুন প্রাণ এনেছেন অধিনায়ক সর্দারজি।

শাবাশ সিন্ধু

সায়ম বন্দোপাধ্যায় ৩৮৭

অলিম্পিক্‌সে রুপোর সঙ্গে ব্যাডমিন্টনে এনেছেন নতুন উন্মাদনা।

ঝড়ের নাম ঝুলন

চন্দন রুদ্র ৩৮৯

একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ঝুলন গোস্বামী।

অন্যান্য আকর্ষণ

শব্দসন্ধান

সুদেষ্ণা ঘোষ ১৬৩

আমার কুইজ়

দীপসুন্দর দিন্দা ৩৭৫

প্রচ্ছদ: দেবাশিস দেব

এগজ়িকিউটিভ এডিটর,
বাংলা ম্যাগাজ়িন: পৌলোমী সেনগুপ্ত

সম্পাদক: সিজার বাগচী

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড জি এন ৩৯, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ এবং ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০৬০ থেকে মুদ্রিত।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা

দুর্গাসুরকে বধ করে দেবীর নাম হল দুর্গা।

সিজার বাগচী

সবাই বলে দুর্গাঠাকুর। ছোটরা অনেকে ভালভাবে উচ্চারণ করতে না পেরে দুর্গাকে দুগ্‌গাঠাকুরও বলে থাকে। কিন্তু দেবীর নাম দুর্গা হল কেন? কীভাবেই বা হল? তার পিছনে রয়েছে এক কাহিনি।

সে অনেক-অনেকদিন আগের কথা। দুর্গ নামের এক অসুররাজ ছিল। সব অসুররাজই চায় ত্রিলোক দখল করতে। সেই অসুররাজ দুর্গও চেয়েছিল স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের অধীশ্বর হতে। তবে হতে চাইলেই তো হওয়া যায় না। দুর্গের আগেও বহু অসুররাজ দেবতাদের যুদ্ধে হারিয়েছে। স্বর্গের সিংহাসনেও বসেছে। কিন্তু স্বর্গসুখ বেশিদিন তাদের কপালে জোটেনি। অচিরেই দেবতাদের হাতে ধরাশায়ী হয়েছে সেই সব অসুররাজ।

দুর্গ ছিল ভারী বুদ্ধিমান। সে বারবার বিশ্লেষণ করে বুঝতে চাইত, এতজন শক্তিশালী অসুররাজ কেন দেবতাদের হারিয়েও স্বর্গ দখল করতে পারেনি! বিশ্লেষণ করতে-করতে শেষ পর্যন্ত দুর্গ আসল কারণ খুঁজে পেল। সে দেখতে পেল, দেবতাদের মূল শক্তি হল বেদ এবং ব্রাহ্মণেরা। ওই দুই শক্তির জোরেই দেবতারা প্রতিবার টেক্কা দিচ্ছে অসুরদের। তাই দেবতাদের কাছ থেকে বেদ এবং ব্রাহ্মণের শক্তি সরাতে না পারলে কিছুতেই পাকাপাকি স্বর্গের অধীশ্বর হওয়া যাবে না।

সেই অভিসন্ধি নিয়েই দুর্গ হিমালয়ে গিয়ে কঠিন তপস্যায় বসল। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা এসে দুর্গের সামনে আবির্ভূত হলেন। বললেন, "তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট। বলো কী তোমার প্রার্থনা?"

দুর্গ তো এমন সুযোগই খুঁজছিল।

ভারী ভালমানুষের মতো মুখ করে সে বলল, "আপনি যদি সত্যিই আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে থাকেন তা হলে আমায় সব বেদ দান করুন। আমি যেন সব দেবতাদের যুদ্ধে হারাতে পারি। আর কোনও পুরুষের হাতে আমার মৃত্যু না হয়।"

ব্রহ্মা বললেন, "তথাস্তু।"

দুর্গ যা চেয়েছিল তা পেয়ে গেল। ব্রহ্মা আশীর্বাদ করতেই ব্রাহ্মণেরা গেল বেদমন্ত্র ভুলে। কীভাবে হোম, যাগযজ্ঞ, পুজো করতে হয় কিছুই আর তারা মনে করতে পারল না। ব্রাহ্মণদের পুজো বন্ধ হতেই দেবতারা দুর্বল হয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে দুর্গ এসে দেবতাদের হটিয়ে স্বর্গের সিংহাসনে গিয়ে বসল। দেবতারা পালিয়ে গেলেন সুমেরুতে। সেখানে গিয়ে তাঁরা শক্তির আরাধনা করতে লাগলেন।

পুজো বন্ধ হওয়ায় শুধু দেবতারা দুর্বল হলেন না, বন্ধ হল মেঘ জমাও। মেঘ নেই মানে বৃষ্টি নেই। পৃথিবীর সব নদীনালা, খাল, বিল শুকিয়ে গেল। জল নেই, খাবার নেই। মানুষ, পশু, পাখিরা সব মরে-মরে পড়ে থাকতে লাগল। এমন ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণেরা হিমালয়ে গিয়ে দেবী ভাগবতীকে ডাকতে থাকল এক মনে। ব্রাহ্মণদের কাতর আহ্বানে দেবী সাড়া দিলেন। দেখা দিয়ে তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করলেন। দেবতা এবং মানুষের দুর্দশা উপলব্ধি করে তাঁর শত-শত চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। সেই জলের ধারায় পৃথিবীর জলাশয়গুলো ফের ভরে উঠল। আবার বইতে থাকল নদী। দেবী এবার শাক, ফলমূল খাইয়ে দেবতা এবং মানুষের খিদে মেটালেন। তাই তাঁর এক নাম হল শাকম্ভরী।

এর পর দেবী নজর দিলেন দুর্গের দিকে। কালরাত্রি বলে এক রুদ্রাণীকে তিনি নির্দেশ দিলেন দুর্গকে নিয়ে আসার জন্য। কালরাত্রি গেল দুর্গের কাছে। গিয়ে প্রথমে দুর্গকে ভালভাবে বোঝাল যাতে সে স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে দেয়। না হলে তার প্রাণ বিপন্ন হবে। দুর্গ সেই কথায় আমল তো দিলই না উলটে অনুচরদের হুকুম করল কালরাত্রিকে বন্দি করার জন্য। কালরাত্রি তবু দুর্গকে বলল, "তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর। আমি সাধারণ দূতী। আমার সঙ্গে এমন করাটা কি ঠিক?"

কিন্তু ক্ষমতার মোহে ভগমগ অসুররাজের কি ঠিক-ভুল জ্ঞান থাকে? দুর্গেরও ছিল না। তাই তার ইশারায় অনুচরেরা ধেয়ে গেল কালরাত্রির দিকে। এবার কালরাত্রি স্বমূর্তি ধারণ করল। সে এমন এক হুঙ্কার দিল যে তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুর্গের অনুচরেরা। দুর্গ তখন সেনাপতিদের নির্দেশ দিল কালরাত্রিকে ধরতে। কালরাত্রি জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সেই নিশ্বাসের হাওয়ায় দুর্গের এগারোজন সেনাপতি আর তিরিশ হাজার সৈন্য ছিটকে পড়ল। দুর্গের বাহিনীকে ছত্রখান করে কালরাত্রি ফিরে এল দেবীর কাছে। আর আহত পশুর মতো দুর্গও বিরাট অসুর বাহিনী নিয়ে হাজির হল সেখানে। দেবী তখন ছিলেন বিন্ধ্যাচলে।

দেবীকে দেখে দুর্গ উত্তেজিত হয়ে উঠল। নিজের বাহিনীর সামনে দুর্গ ঘোষণা করল, যে দেবীকে ধরে আনতে পারবে তাকেই সে স্বর্গের সিংহাসন দেবে। দুর্গের এই ঘোষণা শুনে অসুর সেনাপতিরা প্রবল উৎসাহের দেবীকে বন্দি করতে ছুটল। অসুরদের আসতে দেখে দেবী নিজের শরীর থেকে এমন শক্তি উৎপন্ন করতে লাগলেন যে, তাতেই অসুরেরা ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। অসুরদের দুরবস্থা দেখে দুর্গ নিজে এগিয়ে এল। কিন্তু দুর্গের মতো বীরও কোনও অস্ত্র প্রয়োগ করে দেবীকে হারাতে পারল না। এমনকী এক বিশাল গদা দিয়ে দেবীর হাতে আঘাত করে সে দেখল দেবীর কিছুই হল না, তবে গদাটা গুঁড়িয়ে গেল। সেই সময় দেবী বাঁ পা দিয়ে দুর্গের বুকে এমন আঘাত করলেন যে অসুররাজ মাটিতে ছিটকে পড়ল। এভাবে দেবীর হাতে পরাজিত হয়ে দুর্গ উপলব্ধি করল সামনাসামনি যুদ্ধে এই নারীকে হারানো অসম্ভব। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে সে চলে গেল আকাশে।

সেখান থেকে দুর্গ শুরু করল শিলাবৃষ্টি। বড়-বড় পাহাড় তুলেও সে ছুড়তে লাগল। দেবী তির ছুড়ে সব পাহাড় গুঁড়িয়ে দিলেন। দুর্গ যখন দেখল এভাবেও দেবীকে হারানো যাচ্ছে না, তখন সে হাতির রূপ ধরে আক্রমণ করল দেবীকে। দেবী সেই হাতির শুঁড় কেটে দিলেন। দুর্গ এর পর মোষের রূপ নিল। দেবী ত্রিশূল দিয়ে সেই মোষ মারলেন। দুর্গ এবার হাজার হাতের পুরুষ হয়ে এল। দেবীকে আকাশ থেকে ছুড়ে ফেলল। কিন্তু তাতেও দেবীকে হারানো গেল না। বরং তিনি এমন দিব্যাস্ত্র ছুড়লেন যাতে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ল দুর্গ।

দুর্গ মারা যেতেই বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ। আর দুর্গকে নাশ করেই দেবী হলেন দুর্গা। দুর্গতিনাশিনী।

পুনশ্চ: দু'-তিনটে ছোট্ট তথ্য জেনে রাখা ভাল। 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এ দুর্গা গায়ত্রীতে প্রথম দুর্গার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'দেবী ভাগবত'-এ দুর্গাসুর বধের কাহিনি সবিস্তারে লেখা। সেখানে দেবী স্বয়ং বলেছেন, "দুর্গাসুর বধের জন্যই আমার নাম হয়েছে দুর্গা।"

'দুর্গমাসুরহন্তৃত্বাদ্দুর্গেতি মম নাম যঃ।' মার্কেণ্ডেয় পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণেও একই কথা আছে।

***ছবি:** রৌদ্র মিত্র*

একটি বিশেষ ঘোষণা

প্রতি বছর আনন্দমেলার পূজাবার্ষিকীর বিভিন্ন অংশ নানাজন সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে থাকেন। কেউ ফোটো তুলে পোস্ট করেন, কেউ বা পাতা স্ক্যান করে পোস্ট করেন। কিন্তু এবার থেকে আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর কোনও লেখা কিংবা ছবির অংশ প্রকাশ না করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে পত্রিকার পক্ষ থেকে।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

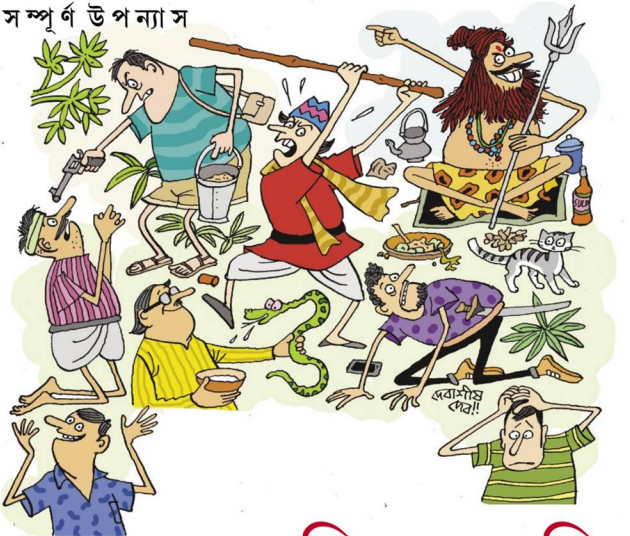

জং বাহাদুর সিংহর নাতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছবি: *দেবাশিস দেব*

"হ্যাঁ রে, তুই যে জং বাহাদুরের নাতি সেটা কি টের পাস? তুই রোগাভোগা, দুবলা পাতলা, মিনমিনে, ভিতু সবই ঠিক। তবে ভাল করে খেয়াল করিস তো, তোর জিনের ভিতরে জং বাহাদুর সিংহ ঘাপটি মেরে আছে কিনা। আমার তো মনে হয় নিশুতি রাতে কান পাতলে তুই তোর ভিতরে জং বাহাদুরের গর্জন শুনতে পাবি।"

বীরু মাথা নেড়ে বলে, "না গোবিন্দখুড়ো, আমি কোনও তর্জন-গর্জন শুনতে পাই না তো!'

"পাবি রে, পাবি। ওই গর্জন, ওই হুঙ্কার, ওই নাদ যে তোর জিনের মধ্যেই ঘাপটি মেরে আছে। টাইমবোমার কথা শুনিসনি? এ হল সেই জিনিস। সময় হলেই তোর ভিতরে জং বাহাদুর জেগে উঠবে। বীরের অভাবে দেশটা কেমন ছারেখারে যাচ্ছে, দেখছিস না? উঠতে হয় বলেই এখনও চাঁদ-সূর্যি ওঠে, বইতে হয় বলেই বাতাস এখনও বয়, কাটতে হয় বলেই দিন এখনও কাটে বটে, কিন্তু চারদিকটা যেন বাসি বিস্কুটের মতো নেতিয়ে পড়েছে। এখন ফের জং বাহাদুরের মতো একজন বীর ঝাঁকি মেরে উঠে না দাঁড়ালে যে চারপাশটা একেবারে লাতন হয়ে পড়বে।"

"আপনি যাকে বীর বলে এত ভক্তিশ্রদ্ধা করছেন, তিনি কিন্তু আসলে ডাকাত ছিলেন।"

"কোন বীরটা ডাকাত না ছিল রে আহাম্মক? ভীষ্ম, দ্রোণ, পঞ্চপাণ্ডব, আলেকজান্ডার, তৈমুর লং, নেপোলিয়ান কে ডাকাত নয় বল তো? পরের রাজ্য দখল, পরের ধনসম্পদ কেড়েকুড়ে নেওয়া সেটাও তো বকলমে ডাকাতিই! নাকি রে! আর তুই শুধু তোর দাদুর ডাকাতিটাই দেখলি? বুকের পাটাটা দেখলি না? পরাক্রমটা দেখলি না? দাপটটা দেখলি না? জং বাহাদুর সিংহ যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত গোটা তল্লাট সিঁটিয়ে থাকত ভয়ে। হোক ডাকাত, তা বলে তো গর্তে লুকিয়ে থাকত না। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করত। ছিল গরিবের মা-বাপ। অমন ডাকসাইটে দারোগা বজ্রধর কানুনগো পর্যন্ত স্বীকার

করত, "হ্যাঁ, জং বাহাদুর পুরুষসিংহই বটে। জং বাহাদুর চোখ বুজবার পর তো গোটা এই বিদ্যাধরপুরটা একেবারে আলুনি হয়ে গেল। বিদ্যেরপুরে এই আমরা পুরনো যারা আছি তারা যে তোর দিকেই চেয়ে আছি বাপ। সবাই মনে করে রোগাভোগা, নড়বড়ে, অপদার্থ যাই হোক তবু বীর বাহাদুর সিংহতো শত হলেও জং বাহাদুরেরই নাতি! একদিন দুম করে কি তার ভিতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে না? ভিতরের বাঘটা কি চিরকাল ঘুমিয়েই থাকবে?"

"সে আপনি যাই বলুন গোবিন্দখুড়ো, খুনখারাপি, চুরিডাকাতি কিন্তু ভাল কাজের মধ্যে পড়ে না। দেশের আইনে সেই ব্যবস্থা নেই।"

"কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার! মাঝে-মাঝে ভাবি তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়। কিন্তু জং বাহাদুরের নাতি হয়েই তুই গণ্ডগোলটা পাকিয়েছিস। তোকে না পারি গিলতে, না পারি ফেলতে।"

বিরক্ত ও হতাশ হয়ে গোবিন্দখুড়ো বিদেয় হলেন বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় কী যেন বিড়বিড় করে বকতে-বকতে যাচ্ছিলেন। বোধ হয় বীর বাহাদুরকে শাপশাপান্তই করছিলেন। বীর বাহাদুরও বারান্দার সিঁড়িতে বসে দুঃখের সঙ্গে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। আজ শরতের এই সুন্দর সকালবেলাটাই তার কাছে মাটি। সামনের উঠোনে অনেকটা জায়গা জুড়ে সকালের রোদে তেঁতুল, সজনে, নিম গাছের কেমন ঝিরিঝিরি ছায়া পড়েছে। কোকিলও আছে। পায়রারা উঠোন জুড়ে ঘুরে-ঘুরে দানা খাচ্ছে। একটা চমৎকার কাঠবেড়ালি তেঁতুল গাছ থেকে নেমে আম গাছটায় উঠে পড়ল। এসব দেখেও দেখছে না বীরু। মনটা খারাপ। গোবিন্দখুড়োই তো শুধু নয়, গোটা বিদ্যেধরপুরের লোকেই যে কেন চায়, সে একজন বেশ বীরপুরুষ হয়ে উঠুক!

মাঝেমধ্যে নানা জায়গা থেকে ছেলেছোকরারা এসে হাজির হয়। কেউ লাঠিখেলা বা তরোয়াল চালানো শিখতে চায়। কেউ এসে কুস্তির প্যাঁচপয়জার শিখতে বসে পড়ে। আবার কেউ বা এসে সাত ফুট উঁচু দেওয়াল ডিঙোনোর কায়দা শেখার জন্য ঝুলোঝুলি করে। রপণায়ে চড়ে কী করে দৌড়ে মাঠ, জঙ্গল পেরিয়ে যাওয়া যায় তা শিখতেও অনেকে এসে হতো দেয়। সে যে ওসব মোটেই জানে না একথা কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। ঠারেঠোরে অনেকেই বলে যায়, "আপনি গুরু, সবই জানেন। তবে গুপ্তবিদ্যে শেখাতে চাইছেন না!"

দিনকয়েক আগে এরকমই একজন এসে হাজির। বেঁটেখাট চেহারা, হাবভাব হাড়হাভাতের মতোই। বলল, "ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিবাকরি কোনও দিকেই সুবিধে হচ্ছে না মশাই। তাই ইয়ার বন্ধুরা পরামর্শ দিল, ডাকাতি করলে দোহাত্তা রোজগার। তবে তার জন্য তালিম নেওয়া চাই। নোয়াপাড়ার ফটিক বলল, 'ডাকাতির তালিম নিতে চাও, তার আর ভাবনা কী? স্বয়ং জং বাহাদুরের নাতি বীর বাহাদুরই তোর কাছের রয়েছে! ছুপা রুক্তম রে ভাই, কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। তবে দোর ধরে যদি পড়ে থাকতে পার, তা হলে হিল্লে হয়ে যাবে।' তাই আজ প্রাতঃকালে অমৃতযোগে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে রওনা হয়ে এসে পড়েছি। বেশি কিছু নয়, আপনাকে তেমন গা ঘামাতেও হবে না। এই একটু বন্দুক-পিস্তল চালানো, তরোয়াল খেলা, খানিকটা লাঠিবাজি, একটু ক্যারাটে কুংফু, মুগুরভাঞ্জা, প্রাণায়াম।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বীরু বলেছিল, "আর কী বাকি রইল হে!"

"আজ্ঞে, বাকি তো মেলা। বিদ্যের কি শেষ আছে? আমি ছোটখাট মনিষ্যি, আধারও ছোট। আপনি দিতে চাইলেও আমি অত নিতে পারব কি?"

"তা পারবে না কেন? আমি বিদ্যে যে টুঁ টা। দেওয়ার মতো বিদ্যেই আমার নেই। বন্দুক, পিস্তল চোখেই ভাল করে দেখিনি। লাঠি, সড়কি, তরোয়াল ছুঁয়েও দেখেনি কখনও। কুংফু-ক্যারাটের নাম শুনেছি বটে, তবে বস্তুটা কী তা জানি না। এক জোড়া মুগুর আছে বটে বাড়িতে, কিন্তু সে দুটো কখনও তোলার চেষ্টাও করিনি। তুমি খুব ভুল লোকের কাছে এসেছ।"

লোকটা হাঁ করে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "বলেন কী মশাই! আপনি কি তার শ্রদ্ধাস্পদ জং বাহাদুর সিংহর নাতি বীর বাহাদুর নন? তবে কি বাড়ি ভুল করলুম! কিন্তু লোকে যে নাম বলতেই এই বাড়িই দেখিয়ে দিল!"

"বাড়ি ভুল হবে কেন? এটা জং বাহাদুরেরই বাড়ি আর আমি তাঁরই নাতি বীর বাহাদুর সিংহই বটে। তবে আমার সম্পর্কে যা শুনে এসেছ সব ভুল। আমি দুবলা-পাতলা মানুষ। দৌড়বাঁপ করলেই হাঁফ ধরে। জীবনে ডন-বৈঠক করিনি।"

লোকটা ভারী হতাশ হয়ে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপরে ছলোছলো চোখে বলল, "এহ, আমি যে অনেক আশা করে এসেছিলুম মশাই। পিতৃদত্ত নামটাও রঘুনাথ। ভেবেছিলুম আপনার কাছে তালিম নিয়ে রঘুডাকাত হয়ে দুনিয়া কাঁপিয়ে দেব। তা হলে কি কোনও আশা নেই মশাই? অনেক দূর থেকে খিদে, তেষ্টা চেপে এই এতটা পথ হেঁটে এসে শেষে কি কপালে এই ছিল?"

লোকটার হাহাকার শুনে বীরুর একটু দুঃখও হল বটে। কিন্তু সে নাচার।

লোকটা হাপুস নয়নে কিছুক্ষণ বসে থেকে কাঁধের গামছা পেতে বারান্দাতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে সে বীর বাহাদুরকে বলল, "কর্তা, আপনাকে কবে থেকে মনে-মনে গুরু বলে মেনেছি! যা থাকে কপালে আপনার শাগরেদিই করব বলে ঠিক করলাম। একটু আগে স্বপ্ন দেখছিলাম, একজন লম্বা-চওড়া লোক এসে বলছে, 'তুই ঠিক জায়গাতেই এসেছিস।' তাই আমি সাব্যস্ত করে নিয়েছি, মারুন, কাটুন আমি আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি না।"

বীর বাহাদুর ফাঁপরে পড়ে বলে, "বাপু হে, তোমার মতলবখানা কী তা বুঝতে পারছি না। যদি জং বাহাদুরের ডাকাতি করা সোনাদানার সন্ধানে এসে থাকো, তা হলে সে গুড়ে বালি। আমার ঠাকুরদার ধনরত্নের খোঁজে এ বাড়িতে অন্তত সাতবার ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদের হাতেই আমার বাবা অস্ত্রবয়সে মারা যান। আর আমাকে অন্তত বারপাঁচেক ডাকাতদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। দু' বার তো মরো-মরো হয়েও বেঁচে ফিরেছি। আর চোরদের আগমনের তো হিসেব নেই। নিত্যি চার হাজিরা দিত। তেমন সুবিধে না হওয়ায় আজকাল চোর-ডাকাতের আনাগোনা বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু পুলিশের আনাগোনা বন্ধ হয়নি। জং বাহাদুরের নাতি বলে আমার নাম নাকি তাদের সন্দেহের তালিকায় আছে। কাজেই তারা প্রায়ই তত্ত্বতালাশ করতে আসে। আমি বড় সুখে নেই হে বাপু। জং বাহাদুরের নাতি হওয়ার এত হ্যাপা জানলে কে জন্মাত!"

রঘুনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "লোক আমি তেমন ভাল নই বটে, তবে আপনার সঙ্গে বেইমানি করব না ওস্তাদ। শত হলেও গুরু বলে মেনেছি কিনা।"

"হেহে বাপু, গুরু হতে গেলে কিন্তু এলেম লাগে। আমার কোনও যোগ্যতাই নেই। পৈতৃক কিছু জমিজিরেত ভাগে চাষ করিয়ে আমার গ্রাসাচ্ছাদন চলে। আমি বড়ই সামান্য মানুষ বাপু। আমাকে গুরু ধরলে ভুল করবে।"

"স্বপ্নটা তো উড়িয়ে দিতে পারি না মশাই।"

"ও তো দিবাস্বপ্ন, ওর কোনও দাম নেই।"

রঘুনাথ করুণ মুখ করে বলে, "আমাকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্য ওসব তো আপনি বলবেনই কর্তা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্বপ্নে আপনার ঠাকুরদা জং বাহাদুরই এসে আমাকে দেখা দিয়ে গেছেন। ওহ! সে যে কী একখানা চেহারা কর্তা, দেখলেই ভক্তিছেদ্দা হয়। আর যে কী হাড়কাঁপানো বাঘা চাউনি! রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। না কর্তা, আমি এ বাড়ি ছেড়ে নড়ছি না। আপনি যদি একান্তই রাজি না হন, তা হলে ওই সামনের আম গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে আজই ঝুলে পড়ব।"

বীরু ভারী সমস্যায় পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। তারপর বলল, "না হে বাপু, অতটা করার দরকার নেই। তা নিতান্তই যদি উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাও তা হলে আগেভাগেই বলে রাখি, তোমাকে বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াতে পারব না কিন্তু। কাজকর্ম করতে হবে।"

"সে আর বলতে! কাজকর্মে আমি খুব পাকা। তা ছাড়া আমি

থাকলে আপনার একটা বলভরসাও হয়। ঠিক কিনা বলুন?''

রঘুনাথ সেই থেকে রয়ে গিয়েছে।

তা দেখা গেল রঘুনাথ কাজের লোকই বটে। বড়সড় বাড়িখানায় বেশ অনেক ঘর এতকাল ধুলোবালি আর ঝুল জমে অন্ধকার হয়ে ছিল। ইঁদুর, আরশোলা, চামচিকে আর মাকড়সার আস্তানা। রঘুনাথ কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়িটা বেশ পরিষ্কার করে ফেলল। বিরাট বাগানটা আগাছায় বনজঙ্গল হয়ে পড়েছিল। আগাছা কেটে বাগান সাফ করল। বীর বাহাদুর এতকাল সেদ্ধভাত খেয়ে কোনও রকমে উদরপূর্তি করত। রঘুনাথ এসে দিব্যি রান্নাবান্না শুরু করে দিল এবং দেখা গেল তার রান্নার হাতটি চমৎকার।

রঘুনাথকে রাখতে প্রথমটায় গাইগুঁই করেছিল বটে, কিন্তু অবশেষে কয়েকদিন পর বীরু মুখ ফসকে বলেই ফেলল, ''তুমি তো একজন গুণী মানুষ হে!''

রঘুনাথ বিগলিত হয়ে বলে, ''কী যে বলেন কর্তা, আপনার কাছে আমি তো নস্যি।''

বীরু সন্দিহান হয়ে বলে, ''কেন হে বাপু, আমার কাছে তুমি নস্যি হতে যাবে কেন? এ ক'দিনে তুমি যে এলেম দেখালে তাতে নিজেকে আমার ভারী অপদার্থ মনে হচ্ছে।''

''আপনার সঙ্গে হাতির খুব মিল আছে কর্তা।''

বীরু হাঁ হয়ে থেকে, কিছুক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বলে, ''আমার সঙ্গে হাতির মিল! বলো কী হে!''

''ঠিকই বলছি। হাতির দোষ কি জানেন? ঘাড় ঘোরাতে পারে না বলে হাতি বুঝতে পারে না যে, সে কত বড় প্রাণী। আপনার বেলাও ওই কথা। আপনি যে মস্ত মানুষ তা আপনি বুঝতে পারছেন না।''

''বটে! তা বাপু এই ক'দিনে তুমি আমার কোনও গুণ দেখতে পেলে নাকি? আমি তো বিস্তর চেষ্টা করেও পাইনি।''

''মেলা গুণ, কর্তা! মেলা গুণ! খানিক ঢাকাঢাপা পড়ে আছে, এই যা।''

''বাপু হে রঘুনাথ, আমাকে তোষামোদ করার দরকার নেই। তোমার উপর আমি সন্তুষ্টই আছি। বরং তোমাকে বেতনটেতন তেমন দিতে পারি না বলে আমার একটু লজ্জাও করছে।''

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে রঘুনাথ বলে, ''ও কথা মুখেও আনবেন না। শুনলে পাপ হয়। বেতনটা আবার কিসের? আমারই গুরুদক্ষিণা দেওয়ার কথা কিনা!''

''গুরুদক্ষিণা দেবে! ভাল জ্বালা তো। কারও কাছে কিছু শিখলে তবে না গুরুদক্ষিণার কথা ওঠে। আমার কাছে তুমি শিখেছটা কী?''

মাথা চুলকে, লাজুক হেসে রঘুনাথ বলে, ''সে অত ফেঁদে বলা যাবে না মশাই, তবে শিক্ষা কিন্তু হচ্ছে। ঘনারামও বলেছে, 'চেপে বসে থাক, আস্তে-আস্তে মেলা শিখে যাবি। তারপর আর তোকে পায় কে?'''

''ঘনারাম! সে আবার কে বলো তো?''

ফের ভারী লজ্জিত হয়ে রঘুনাথ বলে, ''সে আছে একজন।''

''কিন্তু ঘনারাম বলে তো কাউকে আমি চিনতে পারছি না। তার কি এবাড়িতে যাতায়াত আছে?''

''তা আর নেই কর্তা, খুব আছে। হাওয়া-বাতাসের মতোই আসে যায়।''

বীরু আর কথা বাড়াল না। রঘুনাথের যে মাথায় একটু দোষ আছে সেটা সে বুঝতে পেরে গেল। তবে অল্পস্বল্প পাগল হলে তেমন দোষ নেই। বেশি পাগল না হলেই হল।

কিছুদিন পরে হঠাৎ কোণের দিকের একটা বন্ধ ঘর খুলে পরিষ্কার করতে গিয়ে রঘুনাথ খুব চেঁচামেচি জুড়ে দেওয়ায় বীর বাহাদুর তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখল, রঘুনাথ এক কাঁড়ি পুরনো জংধরা লোহালক্কড় বের করে উত্তেজনায় কাঁপছে।

বীরু ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলে, ''ওহে রঘুনাথ, পুরনো লোহালক্কড়ের মধ্যে কি গুপ্তধন পেয়েছ নাকি হে! চেঁচামেচি কিসের?''

রঘুনাথ বড়-বড় চোখে চেয়ে বলে, ''এই ভুলটাই তো আমিও করতে যাচ্ছিলাম কর্তা। ভেবেছিলুম বাজারের 'শ্যামলাল হার্ডওয়্যার'-এ জিনিসগুলো সের দরে বেচে দেব। তখনই ঘনারাম এসে বলল, 'ওরে আহাম্মক, সবকিছুই ঘষেমেজে দেখতে হয়। নইলে বুঝবি কী করে যে বস্তুটা আসলে কিনা? কথায় আছে, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই। মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন।'''

''না হে রঘুনাথ, তোমাকে দেখছি ঘনারামের ভূতে পেয়েছে।''

''যে আজ্ঞে, আপনার চারদিকে চোখ, ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। ঘনারামও বলছিল কর্তা, 'বীরুবাবুকে দেখলে আলাভোলা মনে হয় বটে, কিন্তু হুঁশিয়ার লোক।'''

বীরু বিরক্ত হয়ে বলে, ''কী মুশকিল! ঘনারামটা কে সেটাই তো বুঝতে পারছি না? সে হঠাৎ আমার সুখ্যাতিই বা করে কোন সুবাদে? তাকে আগে আমার সামনে হাজির করো তো বাপু!''

রঘুনাথ একটু চিন্তিত মুখ করে বলে, ''আজ্ঞে, হাজির করতে চাইলেই কি আর সে এসে হাজির হবে কর্তা? কাজটা শক্ত হবে।''

''তা হলে বাবু, সোজা বলে দিচ্ছি তাকে এ বাড়িতে যাতায়াত করতে বারণ করে দিয়ো।''

রঘুনাথ অবাক হয়ে বলে, ''বারণ করব? তাই বা কী করে হয়? ঘনারাম তো এ বাড়িতেই থাকে মশাই?''

শুনে বীরু তাজ্জব। উত্তেজিত হয়ে বলে, ''এ বাড়িতে থাকে, বলো কী? এটা কি মামার বাড়ির আবদার নাকি? না বলেকয়ে একজন উটকো লোক ঢুকে পড়লেই হল? দেশে কি আইন নেই? আদালত নেই? পুলিশ নেই? বাড়ির মালিককে না জানিয়ে তার পারমিশন না নিয়ে ঢুকে পড়লেই হল?''

রঘুনাথ মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলে, ''তা কথাটা অবিশ্যি ঠিক। তবে সে পুরনো লোক কিনা। তা প্রায় ধরুন ষাট-সত্তর বছর ধরেই এখানে ধানা গেড়ে আছে। একটু মায়াও পড়ে গেছে তো।''

এবার বিস্ময়ে অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না বীরু। তারপর গলা নামিয়ে সন্দিহান চোখে রঘুনাথের দিকে চেয়ে বলে, ''ষাট-সত্তর বছর ধরে আছে? বাপু রঘুনাথ, তোমার সত্যি কথা বলার অভ্যেস এত কম কেন? তুমি অবিশ্যি একটু পাগলও আছ। ঘনারামের গল্প ফেঁদে তুমি আমার পিলে চমকে দিয়েছিলে কিন্তু। যাকগে, গুলগপ্প আর বেশি মেরো না বাপু। আমি সোজা সরল মানুষ, টপ করে সব বিশ্বাস করে ফেলি।''

''যে আজ্ঞে, তাই হবে। আপনার যদি ঘনারামের কথা শোনার গরজ না থাকে, তা হলে আমারই বা গায়ে পড়ে তা শোনানোর দরকারটা কী?''

একদিন সকালে বীরু তার রোজকার বরাদ্দের এক গ্লাস দুধ খাচ্ছিল। রঘুনাথ বলল, ''কর্তা, দুধ খাওয়ার সময় আপনার মুখে কোনও ভাব ফোটে না কেন বলুন তো?''

বীরু অবাক হয়ে বলে, ''দুধ খাওয়ার সময় কি মুখে কোনও ভাব ফোটার কথা নাকি?''

''আজ্ঞে, তাই তো জানি। দুধ হল অমৃত। তা খাওয়ার সময় মানুষের মুখে একটা স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠলে তবেই বুঝতে হবে, দুধটা খাঁটি।''

''বটে!''

''যে আজ্ঞে, কিন্তু ভাবটা যখন ফুটছে না তখন বুঝতে হবে রামরিখ গয়লার দুধে গন্ডগোল আছে।''

''তা বাপু সত্যি কথা বলতে কী, দুধের আমি তেমন স্বাদগন্ধ পাই না। খেতে হয় বলে খাই।''

''আজ্ঞে, আমিও তো সে কথাই বলছি। রামরিখ দুধ বলে যা দিচ্ছে তা স্রেফ পিট্টিলোগোলা। আমি ঘন করে জ্বাল দিয়ে দেখেছি। রামরিখের দুধে সরই পড়ে না। আর তাই দুধ খাওয়ার সময় আপনার মুখে সেই ভাবখানাও ফুটছে না। কথায় আছে দুধে হচ্ছে বল। আপনার বলও তাই বৃদ্ধি হচ্ছে না।''

"বলছ! তা হলে কী করা যায় বলো তো?"

"তাই বলছি, আপনি অনুমতি করলে আমি এই কাছের রামনগরের গোহাটা থেকে একটা দুসেল গাই কিনে নিয়ে আসি।"

"ও বাবা, গোরুর দেখাশোনা করবে কে? সে তো অনেক ঝামেলা!"

"আমি আছি কী করতে কর্তা? ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। টাকাটা ফেলে দিন, আমি গোরু নিয়ে আসি।"

বীরু দোনোমনো করে বলে, "দেখ বাপু রঘুনাথ, তুমি যে কাজের লোক তা আমি জানি। তোমাকে আমার বিশ্বাসও হয়। কিন্তু দু' দিনের জীবন দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। ভজঘট পাকিয়ে লাভ কী?"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বীরু গোরু কেনায় মত দিল এবং দু'দিন পর রঘুনাথ দিব্যি একটা নধর কালো গোরু সঙ্গে একটা বকনা বাছুরসহ কিনে নিয়ে এসে বলল, "আট হাজার টাকা পড়ে গেল কর্তা। আরও কমেই হত, কিন্তু আরও কয়েকজন গোরুটাকে তাক করেছিল বলে এর নীচে নামানো গেল না।"

দামটা মোটেই বেশি বলে মনে হল না বীরুর। এবং মনে-মনে তাকে স্বীকার করতে হল, পাগল হোক বা গুলবাজ হোক, রঘুনাথের এলেম আছে।

পরদিন সকালে দুধের গেলাসে চুমুক দিয়েই বীরু বুঝতে পারল, এতকাল দুধ বলে যা খেয়ে এসেছে তার সঙ্গে গোরুর কোনও সম্পর্ক নেই। জিভ থেকে পেট পর্যন্ত দুধ যেন প্রভাতফেরি গাইতে-গাইতে নেমে গেল। দুধ জিনিসটা যে কত ভাল, সেটাই নির্মীলিত চোখে বসে ভাবছিল সে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে নিরীক্ষণ করছিল রঘুনাথ। এক গাল হেসে বলল, "হ্যাঁ, এইবার আপনার মুখে সেই স্বর্গীয় ভাবখানা ফুটেছে কর্তা!"

লজ্জা পেয়ে বীর বাহাদুর বলে, "হ্যাঁ, জিনিসটা মন্দ নয়। দুধ বোধ হয় এরকমই হওয়া উচিত।"

"হ্যাপাও পোহাতে হয়েছে কর্তা। আপনি ভালমানুষ বলে রামরিখ এতকাল খড়িগোলা জল খাইয়ে বিস্তর মুনাফা লুটেছে। এখন তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ায় খেপে গিয়ে জোট বেঁধে চড়াও হয়েছিল। রামরিখের হুকুম, গোরু বেচে দিয়ে তার কাছ থেকেই দুধ নিতে হবে।"

বীরু আঁতকে উঠে বলে, "ও বাবা, রামরিখ যে ভীষণ গুন্ডা লোক, কখন চড়াও হয়েছিল?"

"আজ্ঞে আজ প্রাতঃকালেই। ভাল করে তখনও ইষ্টনাম স্মরণ করিনি। রামরিখ আর তার পাঁচ-সাতজন স্যাঙাত লাঠিসোঁটা নিয়ে হাজির।"

"সর্বনাশ! এ তো বিপদের কথা হল রে। তুমি বরং গোরুটা বেচেই দাও।"

"চিন্তা নেই কর্তা, আমি তো আছি। তার মারমুখো ভাব দেখে শেষে আমিও লাঠিগাছি নিয়ে তাদের রুখলাম।"

বীরু শিহরিত হয়ে বলে, "বলো কী হে! রামরিখ যে বিশাল পালোয়ান আর দারুণ লাঠিবাজ।"

"তা হবে, কে অত খবর রাখে? তবে তারা পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লড়াই দিতে পারেনি। ওই আম গাছের তলায় রামরিখকে শুইয়ে দিলাম, আর তার স্যাঙাতদের পিটিয়ে জানতিনককে ফেললাম ওই নিম গাছের তলায়। জনাদুই চাতালে শয্যা নিল, একজন ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে পালিয়েছে।"

স্তম্ভিত বীরু কিছুক্ষণ হাঁ করে রঘুনাথের দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি এলা তাদের এতজনকে লাঠিপেটা করেছ? কথাটা কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?"

ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে রঘুনাথ বলে, "বিশ্বাস করা বা না-করা আপনার বিবেচনা। প্রয়োজনে আমি মিছে কথা কই বটে। তবে আপনাকে গুরু বলে মেনেছি তো। আপনার কাছে প্রাণ গেলেও মিছে কথা কইতে পারব না কর্তা।"

"বাপু হে, তুমি লাঠিখেলা শিখতে আমার কাছেই এসেছিলে। কিন্তু আমার ও বিদ্যে জানা নেই বলে শেখাতেও পারিনি। তা তুমি এমন লাঠিবাজ হয়ে উঠলে কী করে?"

"আজ্ঞে, আপনি হলেন ওস্তাদেরও ওস্তাদ। আপনার কথা আলাদা। তবে আমাকে একটু-আধটু তালিম দেয় বংশীবদন।"

"বংশীবদন! বংশীবদনটা আবার কে হে?"

একটু লাজুক হেসে হাত কচলে রঘুনাথ বলে, "আজ্ঞে বংশীবদনের কথা কী করে ভেঙে বলি! তবে সে আপনার খুব কাছের লোক। আশপাশেই ঘুরঘুর করে বেড়ায়।"

বীরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তা সে তোমার ঘনারামের মাসতুতো ভাই নয় তো?"

"আজ্ঞে ঠিক তা নয়, তবে দু'জনের একটা সম্পর্ক আছে বটে। ভারী গলাগলি ভাব।"

বীরু হতাশ হয়ে বলে, "বুঝেছি হে রঘুনাথ, তোমার গুল আর গল্পের স্বভাবটা আমি সারাতে পারিনি। তা সে যাকগে, আসল কথাটা হল দুধটা আজ বড্ড ভাল খেলুম।"

"যে আজ্ঞে। এ হল মূলতানি গাই। দুধের খুব স্বাদ। আরও অনেকেই কিনতে চাইছিল গোরুটাকে। আমি কিনে নেওয়ায় কয়েকজন জানতে চাইছিল গোরুটা কার জন্য কিনছি।"

"বটে! তা তারা জানতে চায় কেন?"

"আজ্ঞে, গাঁয়ের লোকের ওই একটা স্বভাব। দরকার থাক না না-থাক তারা এটা-ওটা জানতে চায়। তা আপনার নাম বলাতে দু'-একজন কেমন যেন ঠোঁট বেঁকাল। একজন তো বলেই ফেলল, 'বীরু কি লটারি মেরেছে নাকি যে, গোরু কিনছে? তার এত পয়সা হল কবে?' তা আমি তখন বুক চিতিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে দিলাম, 'কেন মশাই, কর্তাবাবুর কি টাকার অভাব? তিনি হ্যাতা ন্যাতা লোক তো নন, স্বয়ং জং বাহাদুরের নাতি। তাঁর কি টাকাপয়সা বা সোনাদানার অভাব আছে? তিনি টাকার পাহাড়ের উপর বসে আছেন মশাই।'"

কথাটা শুনে বীরু চোখ কপালে তুলে বলে, "সর্বনাশ! তুমি করেছ কী, হাটে বাজারে দাঁড়িয়ে ও কথা বলে দিলে? এ তো খাল কেটে কুমির আনা। এ খবর রটতে দেরি হবে ভেবেছ? এক লহমায় গাঁয়ে-গাঁয়ে রটে যাবে যে, আমার হঠাৎ আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে। চোর-ডাকাতরা ধরে নেবে আমি জং বাহাদুরের লুকনো টাকা আর সোনাদানার সন্ধান পেয়ে গেছি। এ বাড়িতে যে চোর-ডাকাতের মোচ্ছব লেগে যাবে হে রঘুনাথ।"

রঘুনাথ লজ্জিত মুখে ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "আজ্ঞে, কাজটা বড্ড ভুল করে ফেলেছি বলেই এখন মনে হচ্ছে কর্তা। তবে পাঁচজনের সামনে আপনার অপমান হচ্ছে দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি। শত হলেও আপনি তো ওস্তাদ।"

"এখন যে আমার হৃদকম্প হতে লেগেছে রঘুনাথ! বুকটা দুরদুর করছে। ডাকাতদের হাতে বিস্তর ঠ্যাঙানি খেতে হয়েছে। এই বত্রিশ বছর বয়সে আবার ঠ্যাঙানি খেলে কি বাঁচব? এখনকার ডাকাতরা তো আবার বন্দুক-পিস্তল আর বোমা নিয়ে আসে। না হে, তুমি আমাকে বড্ড বিপদে ফেলে দিলে।"

"অত ভাবছেন কেন কর্তা? নীলরতন পাঠকমশাই তো হাতের কাছেই আছেন। অতি বিবেচক ধুরন্ধর মানুষ। সবাই তাঁকে বিপত্তারণ বলে মানে। তাঁর কাছ থেকে মোক্ষম বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে রাখব'খন।"

"নীলরতন পাঠক? জন্মেও যে নাম শুনিনি।"

রঘুনাথ একগাল হেসে বলে, "নাম শোনেননি বলেই কি তিনি নেই? একটু আবডালে থাকেন বটে, কিন্তু মাথাখানা হল গিয়ে নানা ফন্দিফিকির আর কূটবুদ্ধির বাসা। বিপদের সময় লোককে বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়াই তাঁর কাজ।"

"তা তিনি থাকেন কোথায়? কাছেপিঠে হলে তুমি বরং এক্ষুনি গিয়ে তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে এসো।"

"অস্থির হবেন না কর্তা, ধৈর্য ধরুন। খবর তিনি এক রকম পেয়েই

গেছেন।"

"খবর পেয়ে গেছেন? হওয়ার মুখে নাকি?"

"যে আজ্ঞে।"

জং বাহাদুর সিংহ বাড়িখানা করেছিল বটে জম্পেশ। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আট বিঘে জমি। দু' বিঘে জুড়ে মস্ত পুকুর। দালবলে নিয়ে এই বাড়িতে বাস করত। চড়িশালে মেলা ঘোড়া ছিল, একটা মোটরগাড়ি ছিল, অস্ত্রাগার ছিল বলেও শোনা যায়। আর ছিল মেলা সোনাদানা, পয়সা। সেসব এখন আর কিছুই নেই। শুধু বিশাল বাড়িটা পড়ে আছে। শখ করে নানা রকম দামি আর শৌখিন গাছের বাগান করেছিল জং বাহাদুর সিংহ। পরিচর্যার অভাবে গোটা বাগানটাই এখন আগাছার জঙ্গল। সাপ, শেয়ালের বাসা। বাড়িটার দিকে চাইলে মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বীরুর। এত বড় বাড়ি তার তো কোনও কাজেই লাগে না। একখান ঘর হলেই তার চলে যায়। অনেকেই পরামর্শ দেয় বাড়িটা বিক্রি করে দিতে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। বাড়িটার বড় মায়া।

কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ একজন লোক তাকে জ্বালাতন করে যাচ্ছে। লোকটার নাম নবকুমার বিশ্বাস। তার বিরাট ব্যবসা। দু'বছর আগে লোকটা ভারী অমায়িক মুখ করে এক সকালে এসে বলল, "আপনার তো এত বড় বাড়ির কোনও প্রয়োজনই দেখছি না বীরুবাবু। রক্ষণাবেক্ষণও হচ্ছে না। যদি পুকুর সমেত পিছনের চার বিঘে জমি আমাকে ন্যায্য দামে দেন, তা হলে আমি ওখানে গাঁয়ের বাচ্চাদের জন্য একটা শিশু উদ্যান করব।"

বীর বাহাদুর অবাক হয়ে বলে, "শিশু উদ্যান করবেন? তার কি কোনও দরকার আছে মশাই? এটা তো বরাবর শিশু উদ্যানই হয়ে আছে। গাঁয়ের বাচ্চারা এসে গাছে উঠে আম, জাম, কাঁঠাল, কুল, জামরুল পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাপাদাপি করছে, আমি তো বারণ করি না।"

"আহা, তা বলে জংলা জায়গা ফেলে রাখা কি ভাল? আমি তো শুনেছি আগাছা হওয়াতে আপনার বাগান এখন সাপখোপের রাজত্ব।"

"গাঁ-গঞ্জে সাপখোপ থাকেই। তাতে কী?"

"আপনি বুঝতে চাইছেন না বীরুবাবু, এঁদো পুকুরের বদলে আমি বানাব সুইমিং পুল। আগাছা কেটে হবে দারুণ একখানা বাগান, একখানা ভাল গেস্ট হাউজ, জিম, খেলাধুলোর ব্যবস্থা। এ জায়গা আর চেনাই যাবে না।"

"চেনা জায়গাটা অচেনা হয়ে গেলে কি ভাল হবে মশাই?"

"ভাল হবে না, বলেন কী? দুনিয়ার সব জায়গাই যে বদলে যাচ্ছে। আর ওটাই তো নিয়ম। আমি তো ঠিক করেছি গোটা বিদেশধরপুরকেই বদলে দেব। জেলেপাড়ার পুরনো রাজবাড়িটা আমরা অলরেডি কিনে নিয়েছি। কপালেশ্বরী কালীমন্দির ভেঙে নতুন করে গড়া হবে। আরও অনেক প্ল্যান আছে আমাদের।"

বিবরণ শুনে মোটেই খুশি হল না বীরু। খুশি হওয়ার খুব একটা কারণও নেই। বিরস মুখে বলে, "ঠিক আছে, ভেবে দেখব'খন। গাঁয়ের মাতব্বররা কী বলে দেখি।"

"ওঁদের নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। ওঁদের আমরা পকেটে পুরে নিয়েছি। আপনি বরং একটু পঞ্চিচিচ্ভাবে ভাবুন। আমি সাতদিন পরে ফের আসব।"

গোবিন্দখুড়ো সব শুনে শুধু বললেন, "হুম।" তারপর অনেকক্ষণ গুম মেরে রইলেন। তারপর একখানা বড় সাইজের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেইজন্যই তো গাঁয়ে একজন পুরুষসিংহর বড় দরকার ছিল রে। এমন একজন সত্যলে মানুষ, যার এক হাঁকাড়ে যত ক'টা মানুষ এসে এক জায়গায় জড়ো হত, এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়াত। সেইজন্যই তোর মুখের দিকে আশায়-আশায় আমরা সবাই চেয়েছিলুম। কিন্তু তোর ভিতর থেকে তো সিংহ গর্জনটা কিছুতেই বেরছে না।"

"আজ্ঞে, হঠাৎ তর্জন-গর্জন করার দরকারটা কী হল তা একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

"নবকুমারকে বড় সোজা লোক ভাবিসনি বাপু। তার পিছনে বড় কারও মাথা আছে। তাদের যেমন টাকার জোর, তেমনি লোকবল। বুঝলি কিছু? জমিদারি প্রথা এখন লোপ পেয়েছে বটে, কিন্তু সেই প্রথাই আবার নাম ভাঁড়িয়ে ফিরে আসছে। রিয়েল এস্টেট না কী যেন একটা বলে। রাজবাড়ি গিয়েছে, শিবমন্দির গিয়েছে, কালীবাড়ির দখল নিয়েছে, গোটা তল্লাটই গিলে খেয়ে নেবে একদিন। তোর সাত-আট বিঘের বসত বাড়িই কি রক্ষে করতে পারবি? যদি ভাল চাস তো এখনও জেগে ওঠ। তোর ভিতরে যে জং বাহাদুর ঘুমিয়ে আছে, তাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দে। একটা বাঘা হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁকি মেরে দাঁড়া তো দেখি?"

মুখ গোমড়া করে খুব অভিমানের সঙ্গে বীর বাহাদুর বলে, "সবসময়ে আমাকেই আপনারা বাঘ-সিংহ হতে বলেন কেন গোবিন্দখুড়ো? গাঁয়ে তো আর পাঁচজন ছেলে-ছোকরা, জোয়ান-মদ্দ আছে না কী?"

"তা থাকবে না কেন? মেলাই আছে। কিন্তু হাজারটা ভেড়ার তো দরকার নেই আমাদের। আমরা চাই একটা বাঘ।"

"এটা আপনাদের বড় অন্যায় খুড়ো, সবসময় আমাকেই আপনারা বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চান। আমি তো বলেই দিয়েছি, দাদুর কোনও গুণই আমার মধ্যে নেই। আমি ভিতু, দুর্বল, আর এরকমই আমি বেশ ভাল আছি। ডাকাতদের হাতে কতবার মার খেয়েছি তা জানেন? মুখ বুজে সয়ে গেছি।"

গোবিন্দখুড়ো গদগদ হয়ে বললেন, "ওরে তাই তো বলছি। ওরকম মার খেয়েও যে তুই এখনও বহাল আছিস তার কারণ তোর শরীরে জং বাহাদুরের রক্ত বইছে।"

"কী যে বলেন খুড়ো, মার খাওয়াটা আবার কোন বীরত্বের কাজ?"

"যতবার তোর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ততবার আমরা ঘরে বসে ইস্টনাম জপ করতে-করতে ভেবেছি, এইবার বীরটা গেল। যে মার তুই খেয়েছিস তাতে আর কোনও মদ্দ বেঁচে থাকত না। তোর দম ছিল বলে মরিসনি। যে ওই আসুরিক মার সহ্য করতে পারে, তার হিম্মত নেই তো কার হিম্মত আছে? তুই যে একাই বাহাদুর লোক সেটা একমাত্র তুই-ই বুঝতে চাইছিস না। যদি এই রকম মিনমিনে হয়েই থাকতে চাস, তবে বলে দিচ্ছি তোর কপালে কিন্তু বিপদ নাচছে।"

তা বিপদ যে নাচছিল সেটা বুঝতে বেশি দেরি হল না বীরুর। ঠিক সাতদিনের মাথায় নবকুমার এসে হাজির। এবার একা নয়, সঙ্গে দু'জন সন্দেহজনক হাবভাবের লম্বা, চওড়া লোক। তাদের কপালে জুকুটি, মুখে হাসি নেই।

নবকুমার বিনীতভাবেই বলল, "কী ঠিক করলেন বীরুবাবু?"

বীরু মাথা নেড়ে বলল, "বাপপিতেমোর জায়গা মশাই, বিক্রি করব না।"

"আহা স্পষ্ট করেই বলুন না, আমাদের দেওয়া দরটা কি কম মনে হচ্ছে? তা হলে আরও কিছু বাড়িয়ে দিতে পারি।"

বীরু এবার বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই বলল, "না দামের কথাই আমি ভাবিনি। ভিটে বেচব না বলেই স্থির করেছি।"

"তা বললে হবে কেন বীরুবাবু? আপনি একা একজন মানুষ। এতখানি জমি দখল করে বসে থাকবেন, এটা কি ভাল? জমিটা তো গাঁয়ের লোকেরই উপকারে লাগবে। আপনি আর-একটু পঞ্চিচিচ্ভাবে ভাবুন। আমরা দর বাড়াতে রাজি আছি যদি দরটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয়।"

"দরের কথা উঠছে কেন? বিক্রিই যখন করব না, তখন দরাদরির প্রশ্নও নেই।"

"দেখুন, আমরা খবর রাখি যে আপনার দাদু জং বাহাদুর সিংহ নিতান্ত গায়ের জোরে ওই জমিটা দখল করেছিলেন। হয়তো আপনাদের পাকা দালানও নেই। বললে হয়তো খারাপ শোনাবে যে, খতিয়ে দেখলে জমিটা কিন্তু আপনি এক রকম জবরদখল করে বসে আছেন।"

বীরু কঠিন গলায় বলে, "আমার পাকা দলিল নেই কে বলল?"

"ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি যে আপনার দলিল আছে। তবু গাঁয়ের ভালর জন্য জমিটা যদি আপনি ন্যায্য দামে দেন, তা হলে এই গাঁয়ের মানুষের কত উপকার হবে তা ভেবে দেখেছেন? জমিটা তো পতিত জমি হিসেবে পড়েই রয়েছে। এভাবে উৎপাদনশীল জমি ফেলে রাখা তো অন্যায়।"

"জঙ্গল হাপিশ করে বাড়ি, ঘর বানানো কি ভাল কাজ মশাই? আর জমি পতিত হয়ে পড়ে আছে কে বলল? কত ফলন্ত গাছ আছে জানেন? আর এটা তো এমনিতেই শিশু উদ্যান। সারা বছর তাদের এখানে আনাগোনা। সাফ কথা শুনে রাখুন, জমি আমি বেচব না। আপনি এখন আসুন।"

নবকুমারের স্যাঙাড় দুটো লম্বা, চওড়া গুন্ডা লোক ক্রুর চোখে বীর বাহাদুরকে মেপে নিচ্ছিল। ভাবসাব যেন ইশারা পেলেই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। তবে বীরুর মার খেয়ে অভ্যেস আছে বলে তেমন ভয় হল না। সেও বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ বটে, তবে তার ভিতরে তেজ নেই। পানু সর্দার একবার বলেছিল, "তুই হলি তুবড়ির খোল, ভিতরে মশলাটাই ভরা হয়নি।"

নবকুমার গম্ভীর হয়ে বলে, "আপনি যে এতটা জমি দখল করে আছেন সেটা কিন্তু গাঁয়ের লোকেরাও ভাল চোখে দেখছে না। মোড়ল আর মুরুব্বিরা তো আমাকে বলেছে, বীর বাহাদুরের এটা ভারী অন্যায় হচ্ছে। তারা তো হাসিমুখে তাদের বাড়তি জমি আমাদের দিয়ে দিচ্ছে। আর আমরা তো ভাল কাজই করতে চাইছি। বিদ্যাধরপুর যদি একটা টুরিস্ট স্পট হয়ে ওঠে তা হলে কি আপনারও ভাল লাগবে না?"

"না, মশাই। আমি চাই না বিদ্যেধরপুরে গুন্ডেরা লোক এসে জুটুক।"

"আপনি কি এই গ্রামের উন্নতি চান না?"

"আপনি যে ধরনের উন্নতির কথা বলছেন, সেরকম উন্নতি চাই না।"

"আপনি না চাইলেও উন্নতি আটকে থাকবে না। আপনাকে ফের অনুরোধ করছি, জমিটার বিষয়ে আর-একটু ভাবুন। আপনার বাড়তি, পতিত জমিই তো চাইছি। বসতবাড়িটা তো নয়। আপনি রাজি না হলে কর্নেলসাহেব কিন্তু খুব দুঃখ পাবেন।"

"কর্নেলসাহেবটা আবার কে মশাই?"

"আমার মনিব। গোটা পরিকল্পনাটা তো তাঁরই।"

"আমি কর্নেলটর্নেল কাউকে চিনি না।"

"চিনবেন, এখানকার লোক তো নন, তবে এবার থেকে তিনি এখানকারই বাসিন্দা হবেন বলে ঠিক করেছেন। বিদ্যেধরপুরের ভাগ্য খুবই ভাল। এ পর্যন্ত বোধ হয় হাজারখানেক গ্রাম দেখে কোনওটাই তাঁর পছন্দ হয়নি। কিন্তু বিদ্যেধরপুর? এখনই তিনি জায়গাটা ভালবেসে ফেলেছেন। আর একবার যখন তাঁর নেকনজর পড়েছে, তখন এ গাঁয়ের উন্নতি ঠেকায় কে? তবে সেই উন্নতির পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে সেটা তিনি পছন্দ নাও করতে পারেন। কর্নেলসাহেব বড্ড মেজাজি লোক, বুঝতেই পারছেন। তাই বলছি, একটু ভাবুন। আমি না হয় দিনতিনেক পরে আসব।"

"না, নববাবু। আর আপনার আসবার দরকার নেই। আমি বিদ্যেধরপুরের উন্নতি চাই না। আমি চাই, এ গাঁ যেমন আছে তেমনি থাকুক।"

নব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "আর-একটু বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখতে পারতেন।"

নব চলে যাওয়ার পর বীরু দুপুরবেলায় বাইরের বারান্দায় বসে মনখারাপ করে আকাশপাতাল ভাবছিল। রঘুনাথ এক ঝোলা কাঠকুটো নিয়ে এসে উঠোনের একপাশে জড়ো করে রেখে বলল, "ওস্তাদ, ভরসা দেন তো একটা কথা বলি।"

"কী কথা?"

"বাড়ির পিছন দিকের দেওয়ালটা কিন্তু বড্ড নোনা ধরে গিয়েছে।"

"তা কী আর করা যাবে!"

"একটু সারিয়েটারিয়ে নিলে হয় না ওস্তাদ?"

"না হে রঘুনাথ, এ বাড়ির উপর শকুনের নজর পড়েছে। আমি ভাবগতিক ভাল বুঝছি না। দেওয়ালের পিছনে আর পয়সা খরচ করে লাভ নেই।"

"তা আপনি কি নবকুমারের প্রস্তাব শুনে ঘেবড়ে গেলেন নাকি? নাকি কর্নেলসাহেবের কথা শুনে?"

"তুমি কি আড়ালে আড়ি পেতে সব শুনেছ?"

"আজ্ঞে না, গাঁয়ে এখন ওদের নিয়েই কথা হচ্ছে কিনা। ছেলে-ছোকরাদের এক হাজার, দু'-হাজার করে দিয়ে হাতে রাখছে। যাতে তারা কোনও হাঙ্গামা না করে। বিপিনদারোগাকেও পকেটে পুরে ফেলেছে। মাতব্বররাও কাত হয়ে পড়েছে প্রায়। আপনার পাশে দাঁড়ানোর প্রায় কেউই নেই।"

"বলো কী হে রঘুনাথ! তা হলে কি আমি একা?"

"যে আজ্ঞে, তবে ঠিক একাও বলা যায় না।"

"একা বলা যায় না কেন? আমার পাশে কে আছে? ওই তো গোবিন্দখুড়োর মতো দু'-চারজন বুড়োহাবড়া। তাদের মতিগতিই বা কী? তা হলে কি জমিটা বেচে দেওয়াই ভাল?"

"বললেই তো আপনি আবার আমার উপর রাগ করবেন। তবু বলি, আপনি একাই একশো। আপনার দলবলের দরকার কী?"

বীরু হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বলে, "নাহ, তোমার মতো পাগলের পাল্লায় পড়ে আমার মাথাটাও আজকাল গুলিয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দখুড়োর মুখে শুনলুম ওদের অনেক লোকবল, অর্থবল। নবকুমার সঙ্গে করে যে লোকদুটোকে এনেছিল, তাদের ভাবসাবও গুন্ডার মতোই।"

"আজ্ঞে, তারা গুন্ডাই।"

"তবে? আমি একা কি ওদের সঙ্গে পারব? এখন মনে হচ্ছে নবকুমারের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেই ভাল করতুম।"

"আজ্ঞে না। ছোট মুখে বড় কথা বলে ধরবেন না যেন। আমার তো মনে হচ্ছে রাজি না হয়ে ভালই করেছেন।"

"ভালটা যে কী করলাম সেটাই বুঝতে পারছি না।"

সারা দিনটা আজ বীরুর নানা দুশ্চিন্তায় কাটল। ভাল করে খেল না, রাতে ঘুমটাও তেমন হচ্ছিল না। এপাশ ওপাশ করতে-করতে হঠাৎ মাঝরাত্তিরে গুড়ুম শব্দে আঁতকে উঠল সে। বন্দুকের আওয়াজ না? এবং খুব কাছ থেকেই। মনে হল, পিছনের বাগানের দিক থেকেই আওয়াজটা এল। দুরুদুরু বুকে বিছানায় উঠে বসল বীরু। বন্দুক চালাচ্ছে কে? আবার কি ডাকাত পড়ল? নাকি নবকুমার তার দল নিয়ে হামলা করল?

ডান হাতে টর্চ আর একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল বীরু। সাবধানে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাড়ির পিছনে এগিয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে যা দেখা গেল তা আহ্লাদের ব্যাপার নয়। বাগানের দেওয়াল প্রায় ছয়-সাত ফুট অংশ ভেঙে পড়ে গিয়েছে। দেওয়ালটা পুরনো হয়েছে বটে, কিন্তু ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় ছিল না। কিন্তু দেওয়াল ভাঙার সঙ্গে বন্দুকের শব্দের সম্পর্কটা কী? কেনই বা দেওয়াল ভাঙল, আর কে-ই বা বন্দুক চালাল কিছুই বুঝতে না পেরে সে ভাগবতের মতো দুশ্যটা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল। হঠাৎ মানুষজনের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। টর্চ আর হ্যারিকেন নিয়ে কয়েকজন প্রতিবেশী এসে হাজির।

"এই যে বীরুভায়া, তোমার বাড়িতে কি আবার ডাকাত পড়ল নাকি?"

"আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না। দেওয়ালটা ভাঙা দেখছি, আর একটা বন্দুকের শব্দও পেয়েছি বটে। কিন্তু কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।"

"তোমার তো বিরাট বাড়ি, বাগানের ঝোপঝাড়ে কেউ লুকিয়ে নেই তো আবার?"

"লুকনোর তো দরকারও দেখি না। আমার বাড়িতে তো তেমন আগলবাগলও নেই। যে খুশি আসে যায়। দেওয়ালটা কেন ভাঙা হল

তা বুঝতে পারছি না।''

লোকজন ঘটনার সন্ধানে এসেছিল। হতাশ হয়ে ফিরে গেল। চিন্তিত বীরুর আর ভাল ঘুম হল না। পরদিন সে রঘুনাথকে জিজ্ঞেস করল, ''কাল রাতে কোনও শব্দ পাওনি?''

''কিসের শব্দ ওস্তাদ?''

''বন্দুকের?''

''বন্দুক! না তো। তবে আমি ঘুমোলে একদম কাদা। কামান দাগলেও ঘুম ভাঙে না।''

''পিছনের দেওয়ালটাও খানিকটা কেউ ভেঙেছে।''

''যে আজ্ঞে, ভাঙারই কথা কিনা।''

''তার মানে কী রঘুনাথ?''

''মানে খুব সোজা ওস্তাদ। রাতারাতি দেওয়াল ভেঙে খানিকটা জমির দখল নিতে পারলে আপনাকে প্যাঁচে ফেলে দেওয়া যাবে। আপনি যে লড়াই দেবেন না তা ওরা জানে। গাঁয়ের লোক বা পুলিশ যদি আপনার পক্ষে না থাকে, তা হলে জমি এরকমভাবেই বেদখল হতে থাকবে।''

''কিন্তু বেদখল তো হয়নি?''

''আজ হয়নি, কাল যে হবে না তা কে বলতে পারে? এটা তো গৌরচন্দ্রিকা হয়ে রইল।''

''কিন্তু বন্দুকটা কে দাগল রঘুনাথ?''

''আজ্ঞে, সেটাও ভাবনার কথা। বন্দুক সর্বনেশে জিনিস। তবে ভারী কাজের জিনিসও বটে।''

॥ ২ ॥

''হ্যাঁরে গুটে, শেষ পর্যন্ত কি তুইও বুড়ো হলি নাকি? গত চার মাসে এবার নিয়ে তিন-তিন বার ধরা পড়লি। কত বড় লজ্জার কথা বল তো? আর এই তোকে ধরতেই অতবড় ডাকসাইটে দারোগা দীনু বিশ্বাস তিন বছর ধরে ঘোল খেয়েছিল। প্রমোশন পর্যন্ত আটকে গেল। শেষ পর্যন্ত আড়কাঠি মারফত তোকে খবর পাঠিয়েছিল, 'ভাই গুটে, তুমি ধরা না দিলে যে আমার মান ইজ্জত থাকছে না। অনিদ্রায় ভুগছি, খিদে হচ্ছে না, লোকে দুয়ো দিচ্ছে। একবারটি ধরা দিয়ে আমার মুখরক্ষা করো। তোমার মেয়ের বিয়েতে আমি তিন ভরির সোনার হার দেব।' মনে আছে সে কথা?''

''যে আজ্ঞে! দারোগাবাবুর বরাবর আমাকে স্নেহ করতেন।''

'' হ্যাঁরে, তোর চোখে ছানিটানি আসেনি তো? ব্লাডপ্রেশারটা কি মাসে-মাসে পরীক্ষা করাস? কানে কম শুনছিস না তো আজকাল? বাতে ধরেনি তো? খিদে, ঘুম সব ঠিকমতো হয় তো? শরীর নড়বড়ে হয়ে গেলে কি আর ও লাইনে সুবিধে করতে পারবি? যোগাসন, প্রাণায়াম সব করিস তো? বারবার আনাড়ির মতো ধরা পড়ে যাচ্ছিস বলে তোর জন্য বড্ড চিন্তা হচ্ছে।''

''আজ্ঞে বড়বাবু, শরীরের জোয়ার-ভাটা তো আছেই। বয়সও তো হচ্ছে। তবে কিনা সেইজন্য নয়। আমার মনটাই বড় উচাটন হয়ে আছে কিনা। আমার নিজের হাতে তৈরি চেলাচামুণ্ডারা কেমন করে-কম্মে খাচ্ছে। কিন্তু আমার নিজের ছেলেপুলেরাই তো কিছু শিখতে চাইল না বড়বাবু! অপোগণ্ড রয়ে গেল।''

''কেন, তারা কোন নবাবপুত্তুরটা যে তোর মতো ওস্তাদকে হাতে পেয়েও পায়ে ঠেলল?''

''দুঃখের কথা কী বলব বড়বাবু, আমার বউ-ই তাদের কাছে আমায় ঘেঁষতে দিল না। দুই ছেলেই লেখাপড়া শিখে একজন কলেজের মাস্টার, আর-একজন উকিল। ওই আলুনি কাজ করে কী মজা পায় তা ওরাই জানে। আরও দুঃখের কথা শুনবেন? আমার একটা বছরতিনেকের ফুটফুটে নাতনি রয়েছে। সে আমার বড্ড ন্যাওটা। মাঝে-মাঝে কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'ও দাদু, তুমি কি চোর?' সেই থেকেই কেমন যেন কাজে গুবলেট করে ফেলি। এই তো সেদিন চাঁদু কর্মকারের বাড়িতে শোয়ার ঘরে ঢুকে তার বউয়ের গলা থেকে বিছে হারটা সরিয়ে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ নজরে পড়ল বউটার

পাশে শোওয়া ছোট খোকাটির গা থেকে লেপটা সরে গেছে। বড্ড শীত ছিল সেই রাতে। মতিমহই হবে, মায়ার বশে গায়ে লেপটা টেনে দিতে গেলুম, আর অমনি বউটা এমন চেঁচাল যে...''

''বুঝেছি রে গুটে। সেইজন্যই তো গীতায় বলেছে, 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ'। মন দুর্বল হলেই সর্বনাশ, কাজ ভণ্ডুল।''

''আজ্ঞে, তাই ভাবছি। এবার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটিয়ে দেব। জেলখানা তো আমার এক রকম বাড়ির মতোই, কী বলেন। সারাদিন শুয়ে, বসে খেকে হরিনাম করলেও পরকালের খানিকটা কাজ হবে। কী বলেন বড়বাবু?''

''সর্বনাশ!''

''কেন বড়বাবু, খারাপ কিছু বললুম নাকি?''

''তুই তো ডাকাত, অমন কথা বলতে আছে? আমাদের সরকারবাহাদুর যে বড্ড গরিব রে গুটে। কত লোককে বসিয়ে-বসিয়ে তিনবেলা ভরপেট খাওয়াবে বল তো? আর শুধু কী খাওয়া, তেল-সাবান আছে, চুল ছাঁটার মজুরি আছে, অসুখ হলে ডাক্তার, বদ্যি, ওষুধের খরচ আছে। তোদের কি সরকারবাহাদুরের কথা ভেবে একটুও মায়াদয়া হয় না? আজকাল তো দেখছি কাজকর্ম জোটাতে না পারিল দিব্যি ছোটখাট চুরিচামারি কী গুন্ডামি করে গটগট করে এসে দাঁত বের করে জেলখানায় ঢুকে পড়ছে সব। তারপর দিব্যি ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে তিন বেলা খাচ্ছিল, বারো ঘণ্টা ঘুম আর কুটকচালি। ছিঃ, ছিঃ! দেশপ্রেম নেই, আনুগত্য নেই, লজ্জাশরম, আত্মমর্যাদা নেই। তুই কোন দুঃখে ওই অপোগণ্ডগুলোর দলে নাম লেখাবি? আমি তো আজকাল পারতপক্ষে কাউকে আরেস্টই করি না। সব্বাইকে বলি, যা করছ করো, শুধু দয়া করে ধরা পড়ে সরকারবাহাদুরের গলগ্রহ হয়ে থেকো না। আমরা তো আর অন্নসত্র খুলে বসিনি।''

''তা কথাটা তো ন্যায্য বলেই মনে হচ্ছে বড়বাবু। এদিকটা আমি ভেবে দেখিনি।''

''আহা, তুই ভাবতে যাবি কেন? ভাবাভাবি কি তোর কাজ? তার জন্য তো আমরাই আছি।''

''তা আমার দিকটাও তা হলে কি একটু ভাববেন নাকি বড়বাবু?''

''দ্যাখ, এখন চুরিচামারি করতে গেলে বয়সের দোষে তোর ভুলচুক হবেই হবে। অগত্যা ধরা পড়ে তোর জেল হবে। তার চেয়ে বরং তুই ইনফর্মার হয়ে যা। তাতে হাতখরচটা হয়ে যাবে।''

''শেষে কি আড়কাঠিই হতে হবে বড়বাবু? তাতে কি আমাদের সমাজে আমার মানমর্যাদা থাকবে?''

''ওরে, ইনফর্মার মানে এক রকম গোয়েন্দাই। গোয়েন্দাদের কি মানমর্যাদা কিছু কম? তাদের নিয়ে কত বই লেখা হয়, সিনেমা হয়। নিজেকে আড়কাঠি না ভেবে গোয়েন্দা বলে ভাবিস।''

''নাহ, একথাটা বড় জব্বর কথা। নিজেকে গোয়েন্দা ভাবতে বেশ একটু গা গরম হচ্ছে বড়বাবু।''

''ওই জন্যই তো বলি, বেশি ভাবতে যাসনে। ভাবনার ভার আমার।''

''তা হলে বউনিটা করেই যাই আজ বড়বাবু।''

''কিসের বউনি?''

''একটা খবর আছে।''

''কী খবর রে?''

''আজ্ঞে, আজ শেষ রাতে বীর বাহাদুরের বাড়ি থেকে একটা বন্দুকের আওয়াজ হয়েছে।''

''সর্বনাশ! বীর বাহাদুরের বাড়ি থেকে? কিন্তু সে তো ভেড়ুয়া লোক। সে বন্দুক পেল কোথা থেকে?''

''কানাঘুষো শুনেছি, তার বাড়িতে একটা উটকো লোক ঢুকেছে। মস্ত লেঠেল।''

বিপিনদারোগা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ''লেঠেল! বীর বাহাদুরের আবার লেঠেলের দরকারটা কী? আর লাঠি দিয়ে যে গুলিও চালানো যায় তা তো কখনও শুনিনি।''

''আজ্ঞে ভেঙে না বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না কর্তা। আসল কথাটা হল, রঘুনাথ অতি গুন্ডা লোক। গয়লা রামরিখ দলবল নিয়ে চড়াও হয়েছিল তার উপর। রামরিখ শুধু পালোয়ানই নয়, একজন পাকা লাঠিয়ালও বটে। কিন্তু একা রঘুনাথ তাদের উত্তমকুত্তম লাঠিপেটা করেছে। শুনতে পাচ্ছি, বীরুবাবুর ভাঁড়ার ঘরে কিছু পুরনো লোহালক্কর পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে নাকি কিছু মরচে ধরা পুরনো বন্দুক, পিস্তলও ছিল। মনে হয় রঘুনাথ সেগুলো ঘষেমেজে কাজের যুগ্যি করে নিয়েছে।''

বিপিনবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, ''বলিস কী? এ তো ভয়ঙ্কর খবর। তা হলে তো এক্ষুনি রঘুনাথকে ধরে আনতে হয়।''

''তাড়াহুড়ো করবেন না বড়বাবু। খামোকা আবার সরকারবাহাদুরের আর-একটা খরচ বাড়বে। বন্দুকের খবরটা পাকা নয়। পাকা খবর পেলে আমি সময়মতো দিয়ে যাব।''

''বন্দুকের শব্দটা কি তুই আর ভুল শুনেছিস?''

''ভুলও শুনে থাকতে পারি। বয়স হয়েছে তো, কান কি আর আগের মতো কাজ করে বড়বাবু? পটকার আওয়াজও হতে পারে। আর-একটা কথা, পুরনো জং ধরা বন্দুকে গুলি ভরে চালানো কিন্তু খুব বিপজ্জনক। বন্দুকের নল কেটে বন্দুকবাজেরই মারা পড়ার সম্ভাবনা।''

''তা হলে কি তুই বলতে চাস যে, রঘুনাথ একজন বিপজ্জনক লোক?''

''সেরকমই মনে হয়। তবে মুখ দেখলে মনে হবে ভারী গোবেচারা মানুষ। বীরুবাবুর কাছে লাঠি আর তরোয়াল খেলা শিখতে এসেছিল। সেই খেকে রয়ে গেছে।''

''সর্বনাশ! বীর বাহাদুর কি ওসব জানে নাকি?''

''আজ্ঞে না। তবে তার দাদু জং বাহাদুর ছিল ওস্তাদ লেঠেল। তরোয়াল চালানোতেও জুড়ি ছিল না, আবার বন্দুক, পিস্তলেও অব্যর্থ টিপ।''

বিপিনদারোগা মুখে একটা তাচ্ছিল্যসূচক 'ফুঃ' শব্দ করে বললেন, ''কিছু-কিছু মানুষ আছে যারা মরার পর মানুষের মুখে-মুখে মহান হতে থাকে। গ্যাস বেলুন দেখেছিস তো? এ হল সেই বৃত্তান্ত। যত গ্যাস ভরবি, তত ফুলবে আর ততই উপরে উঠবে। এই যেমন আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খান, তৈমুর লং তেমনি তোদের ওই জং বাহাদুর। ভাল করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে লোকটার হয়তো আমাশা বা বাতব্যাধি ছিল। হয়তো ম্যালেরিয়ায় ভুগত কিংবা ভূত বা আরশোলায় ভয় পেত। সেসব কথা তো ইতিহাস বইতে লেখা থাকে না, বুঝলি। ইতিহাস পড়েছিস তো?''

''আজ্ঞে না বড়বাবু। বর্ণপরিচয়ের পর আর ওদিকটায় যাতায়াত নেই কিনা। তবে না পড়লেও আপনার কথা বেশ বুঝতে পারছি।''

''আরে এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হল গিয়ে দারোগা। তার কাজই হল দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। তা জং বাহাদুরের আমলে এলাকার দারোগাটা ছিল কে? না, রাখাল গোঁসাই। পরম বৈষ্ণব মানুষ। মশাটা, মাছিটা পর্যন্ত মারত না। নিয়মিত একাদশী করত, সকাল-বিকেল কীর্তন গাইত খোল, করতালসহ। কপালে রসকলি, কেটে কি আর চোর, ডাকাতের সঙ্গে পাঞ্জা দেওয়া যায়? তাই তখন ছিল চোর, ডাকাতদের মোচ্ছব। এই আমার মতো একজন জাঁদরেল অফিসার থাকলে কি আর জং বাহাদুরের জারিজুরি খাটত? কী বলিস?''

''যে আজ্ঞে, কথাটা তো ন্যায্য বলেই মনে হচ্ছে।''

''ন্যায্য কথাকে তো ন্যায্য বলেই মনে হবে। এখন চারদিকে তাকিয়ে দেখ, এক শান্তির রাজ্য। কোথাও কোনও গন্ডগোল নেই। কে যেন চারদিকে শান্তির জল ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে। গাছে-গাছে ফল ধরে আছে, ফুলে-ফুলে মৌমাছি আর প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাঁয়ের বধূ কলসি কাঁখে টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে, বুড়োরা নির্ভয়ে প্রাতঃভ্রমণ, সান্ধ্যভ্রমণ করছে, ছেলেরা মাঠে-ঘাটে খেলে বেড়াচ্ছে, চাষিরা চাষ করছে, তাঁতিরা তাঁত বুনছে, কুমোরেরা হাঁড়িকুঁড়ি

বা প্রতিমা গড়ছে, কামাররা দা, কুড়ুল তৈরি করছে, কোথাও কোনও অরাজকতা দেখতে পাচ্ছিস?"

"আজ্ঞে না। বিদ্যেধরপুরের লোকেরা তো অরাজকতা কথাটাই ভুলে গেছে বড়বাবু।"

বিপিনবাবু আশ্বপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, "তবেই বুঝে দেখ। খুনোখুনি নেই, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই নেই। শুধু পাখির ডাক, শুধু রাখালিয়া বাঁশির সুর, শুধু আলো-হাওয়া। গুটে কি ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রে?"

"আজ্ঞে না বড়বাবু, চোখ বুজে শুনছিলাম। শুনতে এত খাসা লাগছিল যে, একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল। তা বড়বাবু কি নির্যস এই বিদ্যেধরপুরের কথাই বলছিলেন আজ্ঞে?"

"তা নয়তো কী?"

"তাই জায়গাটা কেমন চেনা-চেনা লাগছিল বটে!"

"ওরে, বিদ্যেধরপুরকে ক'দিন পরে যে আর মোটেই চিনতে পারবি না। বারবার চোখ কচলে দেখতে হবে আর মনে হবে, না হে বাপু, এ তো আর আমাদের সেই পুরনো বিদ্যেধরপুর নয়। এটা কি দুবাই না সিঙ্গাপুর?"

"বটে বড়বাবু! তা হলে কি মস্তেশ্বর মহারাজের কথাটাই ফলে যাবে?"

"কে তোর মস্তেশ্বর মহারাজ?"

"আজ্ঞে বউডুবির খালের ধারে তাঁর ঠেক। লোকে বলে, তিনি স্বয়ং শিবের অবতার। যা বলেন তা অব্যর্থ ফলে যায়।"

"তা কী বলেন তিনি?"

"গত অমাবস্যায় সন্ধের মুখে বাদামের শরবত খেতে-খেতে হঠাৎ বললেন, 'না রে এবার ডেরাডান্ডা তুলতে হবে। এই জায়গা শ্মশান হয়ে যেতে আর দেরি নেই।'"

"তোর মাথা আর তোর গাঁজাখোর মস্তেশ্বর মহারাজের মুন্ডু, বাতাসে ভাল করে কান পেতে শোন। দু'চোখ ভাল করে মেলে চেখ। শুনতে পাবি চারদিকে একটা চাপা সাজো-সাজো রব। দেখতে পাবি বড়-বড় মানুষ টাকার থলি হাতে আনাগোনা করছে। বিদ্যেধরপুরের জমির দর কত জানা আছে? বাজার ঘুরে দেখে আয়, জমির দাম দ্বিগুণ, তিনগুণ হয়ে গেছে। শেষে দশগুণ, বিশ গুণে গিয়ে দাঁড়ালেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।"

শুনে বড়-বড় চোখ করে নড়েচড়ে বসে গুটে বলে, "বটে বড়বাবু! তা হলে কি বিদ্যেধরপুরে তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে? ক'দিন আগে গয়েশ্বরের লোকেরা রথতলার মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছিল দেখলাম।"

"নারে, না। ক'দিন সবুর কর, দেখতে পাবি বিদ্যেধরপুরের গা দিয়ে তেল গড়াচ্ছে। পার্ক হবে, রেস্টুরেন্ট হবে, ঝাঁ চকচকে দোকানপাট হবে, গেস্ট হাউজ, মল, স্টেডিয়াম হল বলে।"

একটু মিইয়ে গিয়ে গুটে বলে, "তাতে কি আমাদের কিছু সুবিধে হবে বড়বাবু?"

"তা না হবে কেন? সকলেরই দু'পয়সা হবে। এই আমার যেমন হচ্ছে।"

সকাল থেকে তরলাকে দেখতে না পেয়ে মহিমবাবু ভারী উচাটন। রোজ প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠেই পাপোশের পাশে সুন্দর গুটি পাকিয়ে শুয়ে থাকা তরলাকে দেখে ভারী একটা সুখ হয় তাঁর। আর তরলা মেয়েও বড় ভাল। কারও সাতে-পাঁচে নেই। ঠান্ডা সুস্থির মেজাজ। আপনমনে থাকে আর নিজের মনে ঘুরে বেড়ায়। ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক, খাটের তলা, আলনার আড়াল সব খুঁজে দেখতে গিয়ে হঠাৎ মহিমবাবুর চোখে পড়ল ঘরের দরজাটাও আবজালো, খিলটা দেওয়া নেই। খুবই অবাক হলেন তিনি। তবে কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন নাকি? খিল দিয়ে শুতে কি রাতে ভুলে গিয়েছিলেন?

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দাওয়া থেকে হাঁক মারলেন, "ওরে গিরিধারী, কোথায় গেলি রে! দেখ তো বাবা কী কাণ্ড!"

গিরিধারী তাঁর পুরনো কাজের লোক। তার বয়স হয়েছে। কানে কম শোনে, চোখেও কম দেখে। ডাকাডাকি শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "হল কী কর্তা? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি?"

"আমার তরলা কোথায় গেল বলতে পারিস? ঘুম থেকে উঠেই দেখছি, পাপোশের পাশটা ফাঁকা। আর ঘরের দরজাও খোলা।"

"আপনার কিন্তু কর্তা একটু ভীমরতি হয়েছে আজকাল। তা হওয়ারই কথা। এ বয়সে হয়। এই তো সেদিন হরিসভায় কীর্তন শুনতে গিয়ে অন্য কার যেন চটিজোড়া পায়ে দিয়ে ফিরে এলেন। গত বিষ্যুৎবার পউলবাবুর সঙ্গে বউডুবির খালে মাছ ধরতে যাবেন বলে বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলেন।"

"তোরও কি বয়স বসে আছে নাকি? বুড়ো বয়সের দোষ কি জানিস? বেশি কথা কওয়া। যে কথাটা না কইলেও হয়, সেটাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, পাড়া জানান দিয়ে বলতে লেগেছিস। বলি আসল কথাটা কি কানে গেছে? তরলা গেল কোথায়?"

"ওই তো বললুম, আপনাকে ভীমরতিতে ধরেছে। ঘরের দরজাটায় খিল দিতে নিশ্চয়ই রাতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমি ঘরের দরজা খোলা দেখে ঘরে গিয়েছিলুম উঁকি মারতে। তরলা কোথাও যায়নি, আপনার বিছানায় উঠে বালিশের পাশে দিব্যি বিড়ে পাকিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একটু আগেই দেখে এলুম।"

"বলিস কী? গত বিশ বছরে কখনও তো তরলা আমার বিছানায় ওঠেনি!"

"আহা, তরলারও তো বয়স হচ্ছে। তারও হয়তো একটু নরম বিছানায় শুতে ইচ্ছে যায়।"

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বিছানার দিকে তাকিয়ে মহিমবাবুর চোখ স্থির। ঠিক বটে, তাঁর বালিশের পাশে বিড়ে পাকিয়ে একটা গোখরো সাপ শুয়ে আছে। তবে সাপটা কখনওই তাঁর আদরের তরলা নয়। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, "ওরে ও গিরিধারী, শিগগির আয়। এ যে মোটেই আমার তরলা নয়। এটা যে একটা বিচ্ছিরি, জংলি, নোংরা একটা সাপ।"

গিরিধারী দৌড়ে এসে বলে, "বলেন কী কর্তা! তরলা নয়?"

মহিমবাবু খপ করে হাত বাড়িয়ে সাপটার মুন্ডুটা ধরে বিছানা থেকে টেনে আনলেন। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "চোখের মাথা খেয়েছিল নাকি? ভাল করে চেয়ে দেখ তো, এটা আমার তরলা?"

গিরিধারীও অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "তাই তো কর্তা। চোখে ছানি এসেছে বলে সব কিছু তেমন পরিষ্কার ঠাহর হয় না কিনা। এ তো তরলা বলে মনে হচ্ছে না। তরলার ফেসিফোসিনিটাও অন্য রকম। তা হলে কি এর তাড়া খেয়ে আমাদের তরলা পালিয়েছে?"

"বাজে কথা বলিস না তো। আমার তরলা কাউকে ভয় পায় নাকি? সে কি তাড়া খেয়ে লেজ গোটানোর মেয়ে? আর এই জংলি সাপটাই বা কোথা থেকে এসে হাজির হল? তুই এক্ষুনি থানায় যা তো। একটা মিসিং ডায়েরি করে আয়। লিখবি, প্রায় তিন ফুট লম্বা, ধূসর রঙের সুন্দর একটা গোখরো সাপ নিরুদ্দেশ। তাকে কেউ খুঁজে এনে দিতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার।"

"আহা, পুলিসের কি আর কাজকর্ম নেই কর্তা? তারা কি সব ফেলে সাপ খুঁজতে বেরবে?"

"কেন, গনা মিস্ত্রিরে যে কুকুর হারিয়েছিল সেটাকে তো থানার সেপাইরাই খুঁজে এনেছিল?"

"আহা, সে তো পোষা কুকুর।"

"আর আমার তরলা বুঝি পোষা সাপ নয়?"

"পোষা কুকুর নাম ধরে ডাকলে কাছে আসে, তরলা কি আসে?"

"কানে শোনে না বলে আসে না। শুনতে পেলে আমার তরলাও আসত।"

"ঠিক আছে কর্তা, তাই হবে। তবে থানায় যাওয়ার আগে একটু আশপাশটাও খুঁজে নেওয়া দরকার। তরলার পাড়া বেড়ানোর অভ্যেস আছে। মাঝে-মাঝে মধুবাবুর শাশুড়ি যখন সকালে উঠোনে মোড়া

পেতে বসে থান পাহারা দেন, তখন তাঁর কাছটিতে গিয়ে বসে থাকে। বিশুদের মাচানের তলায় গিয়ে মাঝে-মাঝে ইঁদুরের তল্লাশ নেয়। বিজয়বাবুদের তুলসী মঞ্চের নীচেও মাঝে-মাঝে থিম হয়ে বিড়ে পাকিয়ে পড়ে থাকে।"

"যা বাবা, যা। একটু খুঁজে আয়। তরলাকে না পাওয়া গেলে যে আমার অম্লজল তাগ হয়ে যাবে।"

"অত উতলা হবেন না কর্তা। আর যে সাপটার মুন্ডু ধরে আছেন, সেটার তো নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। আর কিছুক্ষণ ওরকম টুঁটি টিপে ধরে থাকলে ওটা যে অন্ধা পাবে। পিছনের বাগানের দিকটায় গিয়ে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুন।"

মহিমবাবু সবিতও ফিরে পেয়ে ডান হাতে ধরা সাপটার দিকে চেয়ে দেখলেন, সেটা সত্যিই নেতিয়ে পড়েছে, তেমন খলবল করছে না। তিনি মুঠোটা একটু আলগা করে সাপটাকে নিয়ে গিয়ে বাগানের বেড়ার নীচে ছেড়ে দিলেন। সাপটা প্রাণভয়ে পড়ি কী মরি করে পালিয়ে গেল।

তরলা হারিয়ে গিয়েছে শুনে পাড়ার অনেকেই ভিড় করে খবর নিতে এল। মধু ঘোষ তো হায়-হায় করে উঠলেন, "আহা! অমন ভদ্র, সভ্য সাপ আমি জন্মেও দেখিনি। আর কী সুন্দর দেখতে! সাপ তো নয়, যেন আলপনা।"

বিজয়বাবু আফসোস করে বললেন, "তরলাকে কি আর কখনও গোখরো সাপ বলে ভেবেছি? পাড়ার মেয়ে বলেই তো মনে হত। ভক্তিশ্রদ্ধাও ছিল খুব। আমার বাড়িতে গেলে তো তুলসী মঞ্চের কাছটাতেই হতো দিয়ে পড়ে থাকত।"

বিশুর বুড়ি ঠাকুরমা বলল, "আমার তো ইচ্ছে করত তরলার নাকে একখানা সোনার নোলক পরিয়ে দিই। ভারী লক্ষ্মীমন্ত সাপ বাপু। ও ঠিক ফিরে আসবে। মহিমকে তো নিজের বাপের মতোই ভালবাসত।"

গাঁয়ের একমাত্র গোয়েন্দা করালী বারিক অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, "বুঝলে মহিমদা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এই সর্পহরণের মধ্যে একটা ধূর্ত প্যাঁচ আছে।"

"ধূর্ত প্যাঁচ, সেটা কীরকম হে?"

"তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দিকি?"

"দ্যাখ করালী, আমার মনটা বড় খারাপ। এ সময়ে উলটোপালটা প্রশ্ন করে আমার মাথাটা আর গরম করিসনি।"

"দ্যাখ মহিমদাদা, মাথা গরম করলে বুদ্ধি উবে যায়। আর তখনই লোকে আহাম্মকের মতো সব কাজ করে বসে। লোকের দা, কুড়ুল হারায়, সোনাদানা বা টাকাপয়সা চুরি যায়, সে এক রকম। কিন্তু তোমার হারিয়েছে একটা জলজ্যান্ত গোখরো সাপ। এটা তো আর এলেবেলে জিনিস বলে ধরা যায় না।"

"সাপ হলে কী হয়, সে আমার মেয়ের মতো।"

"আহা, তা তোমার কাছে মেয়ে হলেও আর পাঁচজনের কাছে তো নয়। জ্যান্ত গোখরো তোমার ঘরে পাহারা দেয় বলে তোমার বাড়িতে কস্মিনকালেও চোর ঢোকে না। এবার যখন ঢুকেছে আর সাপটাও গায়েব হয়েছে, তখন তো ভাবনার কথা। তাই না?"

"ওরে, ভাবনার কথা বলেই তো ভাবছি।"

"আরও তলিয়ে ভাবতে হবে মহিমদাদা। আগে বলো, তোমার ঘর থেকে আর কিছু চুরি গিয়েছে কি?"

"না তো, আলমারি তো বন্ধই রয়েছে। দেওয়ালে বন্দুকটাও ঝুলছে। মানিব্যাগ বালিশের নীচে। নাহ, কিছু চুরি যায়নি।"

"কিন্তু চোর তো বিনা কারণে দরজার খিল খসিয়ে ঘরে ঢোকেনি। চুরি করতেই ঢুকেছে। সর্বনেশে কথা হল, সে আর সব কিছু ছেড়ে তোমার আদরের তরলাকেই খলিতে পুরে নিয়ে গেছে। বিবেচক চোরই বলতে হবে। তরলার বদলে আর-একটা জংলি গোখরো রেখে দিয়ে গেছে। এবার মাথা ঠান্ডা রেখে ঘটনাগুলো মেলাও তো দেখি।"

"সেই চেষ্টাই তো করছি। মিলছে না তো!"

"তা হলে আমি বলি?"

"দেখ করালী, তোর দোষ কী জানিস। তুই বড্ড বাচাল।"

"বাচাল হলেও বেচাল নই। আর গোয়েন্দাদের একটু বেশি কথা বলতে হয়। প্রোফেশনাল হ্যাক্কাড়ু। ওটা ধরতে নেই।"

"তা হলে বলে ফ্যাল বাপু।"

"তোমার ঘরে যে চোরটা ঢুকেছিল যে কোনও সাধারণ চোর নয়। বোঝাই যাচ্ছে সে সাপ ধরার একজন ওস্তাদ লোক। সে তোমার তরলাকে চুরি করতেই এসেছিল। উদ্দেশ্য হয়তো তোমাকে ব্ল্যাকমেল করা। তরলাকে তুমি মেয়ের মতোই ভালবাস, সটা সে ভালই জানে। তরলার মুক্তিপণ হিসেবে সে এখন দাবিদাওয়া তুলতে পারে। আর তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হল যে, একটা জংলি গোখরো সাপ তোমার বিছানায় ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি নিজে যদিও একজন সর্পবিশারদ, তবু সাপে কাটলে তোমারও মরার কথা। ঘুমের মধ্যে অজান্তে সাপটার গায়ে হাতটাত দিলে এতক্ষণে তোমার হরিবোল হয়ে যেত। এখন ভাল করে ভেবে দেখো দেখি, তোমাকে পথ থেকে সরালে কার সুবিধে হয়?"

"দূর আহাম্মক! আমার আবার শত্রু কে? আমি তো অজাতশত্রু।"

"অত নিশ্চিন্ত থেকো না, তলিয়ে ভাবো। তোমার বারো বিঘের আম বাগান, শতখানেক নারকেল গাছ, পেয়ারা পাকা বাড়ি। একটু ভাল করে ভেবে দেখো তো, কেউ তোমাকে সরানোর জন্য বা তোমার কাছ থেকে কিছু আদায় করার জন্য কলকাঠি নাড়ছে কিনা।"

"দাঁড়া বাপু, দাঁড়া। ভাবতে সময় দিচ্ছিস কোথায়? নাগাড়ে তো নিজেই কথা কয়ে যাচ্ছিস।"

"কথা না কইলে যে লোকের আক্কেল খোলে না।"

"এই ঘটনার সঙ্গে আমার বিষয়সম্পত্তির সম্পর্ক কী সেটাই তো বুঝতে পারছি না। আমি মারা গেলে বিষয়সম্পত্তি পাবে আমার দুই ভাইপো, কৃষ্ণ আর বলরাম। তা তারা শহুরে মানুষ, গাঁয়ের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। সাফ বলে দিয়েছে, ওসব বেচে দিতে।"

"কৃষ্ণ আর বলরাম ভাল ছেলে। তারা তোমাকে মারার জন্য ঘরে সাপ ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে না। আর তরলাকেও চুরি করবে না। তাদের তো স্বার্থ নেই। অন্য লাইনে ভাবো।"

"হ্যাঁ, বটে। কিছুদিন যাবৎ একটা লোক আমার আম বাগানটা কিনবে বলে ঘুরঘুর করছে। কী জানি রিসর্ট না কী যেন বানাবে। আমি তাকে কয়েকবারই দূরদূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। একবার তো রেগে গিয়ে বন্দুক নিয়েই ধাওয়া করেছিলাম। লোকটার নাম যত দূর মনে আছে নবকুমার না কী যেন!"

করালী একটা শ্বাস ফেলে বলে, "আজ থেকে একটু হুঁশিয়ার থেকো। এটা ছিল সাঁড়াশি আক্রমণ। সাপ কাটলে কাজ ফরসা, আর সাপে না কাটলে তরলার জন্য মুক্তিপণ। এক নম্বরটা ফসকে গেছে বটে, কিন্তু দু'নম্বরটা এখনও তাদের হাতে আছে।"

"তুই কি বলতে চাস, এটা নবকুমারেরই কাজ?"

"আমার মুখ থেকে কিন্তু কথাটা বেরয়নি। প্রমাণ না পেলে কিছুই বলা যায় না।"

"তবে তুই আর কিসের গোয়েন্দা? আমি পুলিশের কাছে যাব।"

"যাও না, কে আটকাচ্ছে?"

"হুঃ, তুই আবার গোয়েন্দা! তুই গোয়েন্দা হলে আমি তো রঘু ডাকাত। এই তো সেদিন কেষ্টনের আসরে গিয়ে রাখাল ঘোষের নতুন জুতোজোড়ার একপাটি চুরি হয়ে গেল। তুই আকাশ-পাতাল ভেবে অনেক মাথা খাটিয়ে শেষে বললি, 'ঘরে একপাটি চুরি গিয়েছে তখন এ নিশ্চয়ই কোনও খোঁড়া লোকের কাজ। বাঁ পায়ের জুতো যখন চুরি হয়েছে তখন ধরতে হবে চোরের ডান পা খোঁড়া,' বলেছিলি কিনা?"

"দেখো মহিমদাদা, গোয়েন্দাদের অনেক সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখতে হয়। হুট করে কোনও সমাধানে পৌঁছনো তো কাজের কথা নয়।"

"তার ফলটা কী হল বল! সবাই গিয়ে বেচারা সনাতন দাসের উপর হামলে পড়ল। কী হেনস্থাটাই হতে হল লোকটাকে। পরে দেখা

গেল সনাতনের বাঁ পা-টাই খোঁড়া। শেষে জুতোর পাটিটা পাওয়া গেল চণ্ডীমণ্ডপের পাশে কচু বনে। বিষ্ণুপদর ছেলে ফুটু দেখেছে একটা নেড়ি কুকুর জুতোর পাটিটা নিয়ে কামড়াকামড়ি করছিল।"

"সাধে কী তোমাকে সবাই বিশ্বনিন্দুক বলে মহিমদাদা। কখনও কারও কোনও গুণ কি তোমার চোখে পড়েছে? তুমি যেন সবসময়ে একটা দোষ দেখার চশমা পরে আছ। কেন, আমি কি রামবিলাস দোসাদের পিতলের লোটাটা খুঁজে দিইনি? হারাধনবাবুর সাধের পকেটঘড়িটা কে উদ্ধার করে দিল বলো? রথের মেলায় গিয়ে পাঁচকড়িবাবুর সাত বছরের ছেলে মন্টু যে হারিয়ে গেল, তাকে নন্দপুর গাঁয়ের বীরু সামন্তর বাড়ি থেকে যে উদ্ধার করে এনেছিলুম, সেই গন্ধ তো এখনও লোকের মুখে-মুখে ফেরে।"

"নিজের ঢাক আর নিজে কর পেটাবি বাপু? রামবিলাস তো জনে-জনে বলে বেড়িয়েছে যে, লোটাটা তাকে খুঁজে দিয়েছে জটাবাবা। লোটা হারিয়ে যখন সে শোকে অন্নজল ত্যাগ করতে বসেছে, তখনই নাকি জটাবাবা চৌম্বক প্রক্রিয়ায় লোটার সন্ধান বলে দেয়। তুই নাকি সেটা শুনতে পেয়ে গিয়ে গয়ারামের পুকুরের উত্তর ধারে জলের মধ্যে থেকে সেটা তুলে এনেছিলি। আর হারাধনখুড়ো তো তোর নামে মামলা করতে চেয়েছিল। হারাধনখুড়ো দুপুরে যখন চান করতে গিয়েছিলেন, সেই ফাঁকে তাঁর তিন বছরের নাতি গুলবু তাঁর পকেটঘড়িটা নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসে খেলছিল। তুই নাকি তাকে একটা কাঠি লজেন্স ঘুষ দিয়ে ঘড়িটা হাতিয়ে নিয়েছিলি! তারপর যখন ঘড়ি নিয়ে হইচই ওঠে, তখন তুই ঘড়িটা বের করে দিয়ে বুক ফুলিয়ে নিজের কেরদানি জাহির করতে লাগলি। আর মন্টু যে রথের মেলা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল সেটা মোটেই সত্যি নয়। বীরু সামন্ত তার সম্পর্কে মামা হয়। সেই সুবাদেই সে বীরুর বাড়িতে গিয়েছিল ল্যাংড়া আম খাবে বলে।"

"এইজন্যই লোকের ভাল করতে নেই, বুঝলে মহিমদাদা। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। আজ যদি শহরে, গঞ্জে গিয়ে চেম্বার খুলে বসতাম, তবে আমার সত্যিকারের কদর দেখতে। যাকগে, তোমার ভালর জন্যই বলছিলুম, কাল রাতে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত রহস্যজনক।"

"সে না হয় ধরলুম। কিন্তু তুই তো বাপু বহুরূপী। সকাল আটটা থেকে দশটা অব্দি তোর হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করিস, বেলা দশটা থেকে বারোটা হোমিওপ্যাথি, বিকেল চারটে থেকে ছ'টা তুই কুংফু আর ক্যারাটে শেখাস, বিকেল ছ'টা থেকে রাত আটটা তুই জ্যোতিষী, রাত আটটা থেকে দশটা তুই গোয়েন্দা।"

করালী অতি উচ্চাঙ্গের একখানা হাসি হেসে বলে, "আমার গুণ একটু বেশি সেটা আমি মানছি মহিমদাদা। আমার নিজেরও মনে হয়, ভগবান আমাকে দু'-একটা গুণ কম দিলেই বোধ হয় ভাল হত। বেশি গুণ থাকলে তার ঙনগারও দিতে হয় কিনা।"

মধু ঘোষ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ওরে বাপু, তোর যদি একটাও গুণ না থাকত তা হলে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচতুম। আমাকে এমন আমাশার ওষুধ দিলি যে, ওষুধ খেয়ে আমি কোমরের ব্যথায় একমাস শয্যা নিলুম।"

বিজয় সাধুখাঁও গরম হয়ে বলে, "দেখ করালী, ভণ্ড জ্যোতিষীরাও পাঁচটা ভবিষ্যৎবাণী করলে দুটো-একটা ফলে। তুই-ই একমাত্র জ্যোতিষী যার পাঁচটা ভবিষ্যৎবাণীই ফেল! তুই বলেছিলিস আমার মেজছেলে ফটিক এবার ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ হবে। সে ফেল মেরেছে। বেলেছি, রাঙা গাইটা বোশেখের মধ্যে বিয়োবে। বিয়োয়নি। বলেছিলি আমার নিরানব্বই বছরের পিসি গিরিজাবালা দেব্যার আশ্বিন মাস পেরোবে না, তারপরই আমি তার বিষয়সম্পত্তি পাব। পিসি এখনও দিব্যি বেঁচে। আর সম্পত্তিও নাকি দেবোত্তর করে দিয়েছে। এগঙ্গিমা সারানোর জন্য কবচ দিয়েছিলি, সেই এগঙ্গিমা এখনও বাঁ পায়ে গ্যাঁট হয়ে বসে তোর কবচকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। গঙ্গারামের সঙ্গে মোতিগঞ্জের জমির মামলায় নির্ঘাত জিতব বলে দু'হাজার টাকা দিয়ে যজ্ঞ করালি, সেই মামলায় আমি হেরে ভূত।"

বিশুর বুড়ি ঠাকুরমা বিন্দুবাসিনীদেবী বললেন, "না গো বাপুরা, তোমরা অমন করে করালীকে খুঁড়ো না। ও যে গুণের ছেলে তা আমি হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি। এই তো গেলবার মাঘ মাসে আমার হাঁপানির টান উঠেছিল বলে করালী হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়েছিল। তাতে আমার তো বাপু খুব কাজ হয়েছে। হাঁপানি সারল না বটে, কিন্তু হাঁটুর ব্যথা উধাও। তারপর গত জষ্টি মাসে পিত্তশূল আমি যখন শয্যা নিলুম, তখন তো ওই করালীর ওষুধ খেয়েই উপকার হল। পিত্তশূল সারেনি ঠিকই, কিন্তু চোখের ছানি কেটে গিয়ে দিব্যি সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমার নাতবউয়ের তো মাথার চুল উঠে ঠাক পড়তে বসেছিল। তখন ওই করালীর হোমিও ওষুধ খেয়ে কী কাণ্ডটাই হল! টাকে চুল গজায়নি বটে, তবে নাতবউয়ের গ্যাস, অম্বল একেবারে সেরে গিয়েছে। এখন নাতবউ ঠিক করেছে করালীর কাছে গিয়ে গ্যাস, অম্বলের ওষুধ নিয়ে এসে খাবে, আর তাতেই নাকি তার টাকে চুল গজাবে। তাই বলছিলুম, করালীর ওষুধে কিন্তু খুব কাজ হয়। একটু উলটোপালটা হয় বটে, তবে কাজ ঠিকই হয়।"

বিগলিত মুখে করালী বলে, "আহা থাক না ঠাকুরমা, নিজের প্রশংসা নিজের কানে শোনাও যে পাপ। তা সেই পাপ আমাকে নিতি সইতে হচ্ছে। চারদিকে লোক এত ধনি-ধনি করে যে, আজকাল রাস্তায় আমাকে মুখ লুকিয়ে হেঁটে যেতে হয়।"

মধু ঘোষ মিচকে হেসে বলে, "কিন্তু তোর কান তো খাড়া থাকে!"

ঠিক এই সময়ে গিরিধারী একজন রোগা, বুড়ো মতো মানুষকে নড়া ধরে টেনে এনে মহিমবাবুর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে, "এই যে কর্তা, এ হল এ তল্লাটের চোরেদের সর্দার। এর নাম গুটে। ফটকের বাইরে ঘুরঘুর করছিল, ধরে এনেছি।"

গুটে কাঁধের গামছাখানা টেনে এনে মুখের ঘাম মুছে চারদিকে জ্বলজ্বল করে চেয়ে দেখল। তারপর বলল, "আজ্ঞে আমি গত পরশু থেকে চুরি করা ছেড়ে দিয়েছি। পরশু থেকেই থানার বড়বাবু আমাকে আড়কাঠির চাকরিতে বহাল করেছেন।"

মাধববাবু গুটের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "তোমাকে দেখে তো পাকা চোর বলেই মনে হচ্ছে।"

গুটে দু'ধারে মাথা নাড়া দিয়ে বলে, "সে এককালে ছিলুম মশাই। এখন বয়স হচ্ছে তো। তা ছাড়া নাতনির কাছেও মান থাকছে না।"

মাধববাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওহ, বড্ড মানী লোক দেখছি! তা এখানে কী মতলবে ঘুরঘুর করছিল বলো তো?"

"আজ্ঞে, মতলব কিছু খারাপ ছিল না মশাই। দু'-চারটে কথা বলতেই আসা।"

"কী কথা?"

"কথাটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই বিষয়আশয় নিয়েই।"

"বলো কী হে, তুমি কি আমার সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কথা কইতে এসেছ নাকি?"

গুটে ঘাড় চুলকাতে-চুলকাতে বলে, "আজ্ঞে, ছেটি মুখে বড় কথাই হয়ে গেল নাকি কর্তা?"

মহিমবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কিছু মনে কোরো না বাপু। আজকাল কালের নিয়মেই মানুষের আস্পর্দা বেড়েছে। তবে কিনা আমার সময়টা বড় ভাল যাচ্ছে না হে। মনটাও বড্ড খারাপ। আমার বড় আদরের একটা পোষা সাপ ছিল। আজ সকাল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আজ আর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কথা নয়।"

গুটে একগাল হেসে বলে, "আজ্ঞে কর্তা, কথায় বলে কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।"

"তার মানেটা কী দাঁড়াল হে?"

"আজ্ঞে, আপনি যখন আপনার তরলার শোকে চোখের জল ফেলছেন, তখন গাঁয়ের চোরেরা বিশালাক্ষী কালীবাড়িতে পুজো দিতে গিয়েছে। সন্ধেবেলা হরির লুঠও দেবে।"

"বটে! তা তাদের এত ফুর্তির কারণ কী?"

"আজ্ঞে কারণ তো জলের মতো সোজা। লোকে কুকুর পোষে, কী

দরোয়ান রাখে সে এক কথা। কিন্তু এ বাড়ি পাহারা দেয় জ্যান্ত গোখরো সাপ। চোরেরা তাই এ বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াত না। আজ থেকে তারা একেবারে নিষ্কণ্টক। তাই বলছিলুম, আপনার তরলার সঙ্গে কিন্তু বিষয়সম্পত্তির একটু যোগ আছে।''

মাধববাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ''তুমি কি বলতে চাও গাঁয়ের চোরেরাই তরলাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের পথ পরিষ্কার করেছে?''

মাথা নাড়া দিয়ে গুটে বলে, ''আজ্ঞে না কর্তা। চোরেদের কারও তর বুকের পাটা নেই। তবে আপনার যে বুকের পাটা আছে তা তারা একবাক্যে স্বীকার করে। শুধু তারা কেন, আমাদের দারোগা বড়বাবুও তো বলছিলেন সেদিন, 'হ্যাঁ বটে, এ তল্লাটে আসার পর থেকে দেখছি, বুকের পাটা যদি কারও থেকে থাকে তবে তা মহিমবাবুর। পাশবালিশের বদলে তিনি অজগর সাপের গায়ে পা তুলে ঘুমোন, কেউটে সাপের লেজের ডগা দিয়ে কান চুলকান, পাপোশের বদলে গোখরো সাপের মাথায় পা ঘষেন।'''

মহিমবাবু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, ''বেঁধে, বেঁধে! অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলবে।''

''যে আজ্ঞে! আসল কথা হল, আপনার কথা উঠলে তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারেন না কিনা।''

''বটে! তা হঠাৎ বিপিনদারোগার এত গদগদ ভাব কেন বলো তো? লক্ষণটা তো আমার তেমন ভাল ঠেকছে না হে!''

গোবিন্দ খাসনবিশ বলে উঠল, ''তা তো বটেই। এই তো গেল হপ্তায় বিপিনদারোগা এসে অক্ষয় গোঁসাইয়ের বুদ্ধি আর দূরদর্শিতার কথা কেমন শত মুখে বলে গেল, আর রাত কাটার আগেই কত বড় ডাকাতিটা হয়ে গেল অক্ষয়ের বাড়িতে। সেদিন বিষ্ণুপদ খাজাঞ্চির হাতের লেখা দেখে বলে উঠল, 'এ তো মুক্তাক্ষর!' তার সাতদিনের মাথায় খাজাঞ্চির পো দলিল জালিয়াতির মামলায় ফেঁসে গিয়েছে। আর নবীন ময়রার রসগোল্লা খেয়ে তাকে যে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে গেল বিপিনদারোগা, তার ফল কী হল বল! পরদিন সকালে নবীনের দোকানে রসগোল্লার গামলায় মরা ইঁদুর ভেসে থাকতে দেখে কী হইচই! সেই বদনামে এখন দোকানটাই উঠে যাওয়ার মুখে।''

গুটে জুলজুল করে চারদিকে চেয়ে নিয়ে বলে, ''তিনি সর্বদাই বলেন, 'ওরে, তোরা মানীকে মান দিতে ভুলিস না যেন। যদিও আমি এক হিসেবে এখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কিন্তু তা বলে মানুষের মান মর্যাদার কথা মনে রাখি।'''

মহিমবাবু গম্ভীর গলায় বলেন, ''দেখো বাপু গুটে, এই সাতসকালে যে তুমি আমার গুণকীর্তন করতে আসোনি তা আমি জানি। ভণিতা ছেড়ে এখন আসল কথাটা খোলসা করো তো বাপু।''

''আজ্ঞে, তার কিছু অসুবিধে আছে। আমার বাঁ হাঁটুতে বড় ব্যথা।''

মহিমবাবু অবাক হয়ে বলেন, ''তা তোমার যা বয়স তাতে হাঁটুর ব্যথা হতেই পারে। কথা তো কেউ আর হাঁটু দিয়ে কয় না, কী বলো?''

''যে আজ্ঞে! কিন্তু আগে যেমন হরিণের মতো দৌড়তে পারতুম তেমনটা তো আর এখন পেরে উঠব না কর্তা।''

মহিম বিরক্ত হয়ে বলেন, ''তা এই বুড়ো বয়সে তোমাকে দৌড়াদৌড়িই বা করতে হবে কেন বলো তো?''

''আপনি বায়ুচঙ্গ মানুষ, কখন কী করে বসেন তার তো ঠিক নেই কিনা! এই সেদিন বন্দুক বাগিয়ে নববাবুকে যে ধাওয়াটা করলেন, তা তো গাঁসুদ্ধ লোক দেখেছে। তা নববাবুর আর কোনও গুণ না থাকুক পায়ে বেড়িটা আছে বটে। পৈতৃক প্রাণটা রক্ষে করতে একেবারে মৃগবেড়ের হাটে গিয়ে উঠলেন। বটতলার চাতালে শুয়ে ঘণ্টাখানেক হ্যা হ্যা করে হাপিয়েছেন বটে, কিন্তু প্রাণটা তো রক্ষে হয়েছে। কিন্তু আমি তো অতটা পেরে উঠব না।''

মাধববাবু বললেন, ''আহা, নবকুমারের কথা আলাদা। সে অতি ঘোড়েল লোক। আমার বিশ বিঘের আম বাগানটা কিনে স্টেডিয়াম না কী যেন বানাতে চায়। রোজ এসে টাকার গরম দেখাত, তাই মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল।''

''যে আজ্ঞে, আপনি ন্যায্য কাজই করেছিলেন। ওই আম বাগান তো আজকের নয়, আপনার প্রপিতামহের আমলের। কাশী থেকে কলমের গাছ আনিয়ে তিনিই বাগানখানা করেছিলেন। কী বলব কর্তা, আপনাদের ওই আম বাগানের সঙ্গে আমাদেরও বহুকালের সম্পর্ক। ঈশেন কোণে ঝোপবাড়ের আড়ালেই হল গিয়ে আমাদের ঠেক। লাইনে নামবার আগে ওখানেই যদু ওস্তাদ আমাদের তালিম দিত কিনা। হস্তলাঘব, কুম্ভক, বায়ুবন্ধন, প্রাণায়াম, মন্ত্রধারণ, অঙ্গুলিমুদ্রা কত কী শিখতে হত! লোকে চোর বলে জানে। তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করে, কিন্তু পিছনে যে মেহনত আছে, সাধনা আছে সেটা জানে ক'জন বলুন!''

''বটে! তা হলে আমার আম বাগানেই তোমাদের আখড়া ছিল?''

''যে আজ্ঞে, আপনার কাছে আম বাগান বটে, কিন্তু আমাদের কাছে তীর্থ। এই ঠেক থেকে কত বড়-বড় গুণী কারিগর বেরিয়েছে। কালোরতন, নাটা, নবীন, ঢোল, কার্তিক, গুলেমস্তান। জায়গাখানাও বড় সরেস। এক ধারে উঁচু পাঁচিল, অন্য ধারে ঝোপবাড়ের আড়াল। ওই বাগানের উপর আপনার যেমন মায়া, আমাদেরও তেমনই মায়া। তবে কিনা কর্তা চিরকাল কি কারও সমান যায়?''

''তার মানে?''

''এই বলছিলুম আজ্ঞে, ও বাগান কি রক্ষে করতে পারবেন? পুবধারের দেওয়াল ঘেঁষে যে গাছগুলো আছে তার মধ্যে তিনটে গাছ নেতিয়ে পড়েছে, গিয়ে দেখে আসুন। ভাববেন না যেন গাছ বুড়ো হয়ে মরতে বসেছে। ওই তিনটে গাছের গোড়ায় গজক, সোড়া আরও সব নানা জিনিস পুঁতে ইচ্ছে করেই মারা হয়েছে। আর আপনার পেয়ারের গোখরো সাপটাকে তো আর এমনি-এমনি তুলে নিয়ে যায়নি। পিছনে একটা মতলব আছে বলেই না! তবে আপনার বিছানায় যে গোখরো সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে, সেটার বিষ দাঁত ওপড়ানো ছিল। শুধু আপনাকে একটু হুঁশিয়ার করে দেওয়ার জন্যই। তবে এর পরের বার যেটা ছেড়ে দিয়ে যাবে, সেটার কথা আগাম বলা মুশকিল।''

মহিমবাবু এত অবাক হয়ে গিয়েছেন যে, কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, ''তুমি যখন এত কথা জান, তখন তুমিও নিশ্চয়ই আমার শত্রুপক্ষের লোক?''

গোবিন্দ খাসনবিশ বললেন, ''ওরে তোরা হাঁ করে দেখছিস কী? চোরটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেল। তারপর কিচুটি নিয়ে আয়। এ তো ভয়ঙ্কর লোক।''

বিজয়বাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, ''এ তো মগের মুলুক হয়ে উঠল দেখছি।''

করালী বলে, ''আহা, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। মানুষকে যত কথা কইতে দেবেন, ততই ইনফরামেশন বেরিয়ে আসবে।''

গুটে মাথা নেড়ে বলে, ''আজ্ঞে না, পুরোপুরি শত্রুপক্ষের লোক নই মহিমকর্তা। এবার যা বুঝবার বুঝে নিন। শুধু মনে রাখবেন, আপনার আদরের তরলা কিন্তু এখন শত্রুপক্ষের হাতে।''

॥ ৩ ॥

আজ সকালেই শিরীষ গাছটা থেকে মস্ত একটা মৌচাক নামিয়েছে রঘুনাথ। সেই টাটকা মধু মেশানো দুধের গেলাসে চুমুক দিয়ে হঠাৎ যেন মান্দামারা সকালটা একেবারে ঝলমল করে উঠল বীরুর চোখের সমুখে। খাঁটি দুধ আর টাটকা মধু মিলেমিশে তার ভিতরে যেন ওস্তাদ গাইয়ের তানকারির সঙ্গে বাঘা তবলিয়ার সঙ্গত। যেন মেঘ ভেঙে শতরংশশীর উদয়।

রঘুনাথ ভারী বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, ''কিছু কি টের পাচ্ছেন কর্তা?''

সস্মোহিত চোখে চেয়ে বীরু বলে, ''পাচ্ছি হে রঘুনাথ, খুব টের পাচ্ছি।''

"পাওয়ারই কথা, আপনার ঠাকুরদাও দুধ আর খাঁটি মধু খেতেন কিনা।"

"খেতেন নাকি?"

"যে আজ্ঞে।"

"তা সেকথা তুমি জানলে কী করে?"

"আজ্ঞে, আমি আর জানব কী করে? ওই ঈশানদাদা-ই বলে গেলেন সেদিন। তিনি আবার আপনার ঠাকুরদার রসুইকর ছিলেন কিনা।"

ভ্রূ কুঁচকে বীরু বলে, "আমার ঠাকুরদার রসুইকর! বলো কী হে, সে আবার কে?"

"তাকে অবশ্যি আপনার চেনার কথাই নয়। তখন বড্ড ছোট ছিলেন তো আপনি।"

বীরু গব্বীর হওয়ার একটা চেষ্টা করল। কিন্তু দুধ আর মধু মিলে তাকে এমন মেখে ফেলেছে যে, গব্বীর হওয়া খুবই কঠিন। তাই আগে সে দুধটা শেষ করে অনেক কষ্টে মুখে, চোখে একটা ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তুলে বলল, "আচ্ছা রঘুনাথ, এই ঘনারাম, বংশীবদন, নীলরতন পাঠক আর ওই ঈশানদাদা এরা তোমারই দলের লোক নয় তো?"

রঘুনাথ আকাশ থেকে পড়ে বলে, "আমার দল? বলেন কী কর্তা!"

বীরু চিন্তিতভাবে বলে "এরকম সন্দেহ হওয়াটা কি অমূলক রঘুনাথ? আমার তো মনে হচ্ছে তোমার দলবল এ বাড়িতেই গা ঢাকা দিয়ে আছে।"

রঘুনাথ সবেগে মাথা নাড়া দিয়ে বলে, "আজ্ঞে না ওস্তাদ। তারা এ বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে আছে বটে, তবে তারা আমার দলবল নয়। তারা সব আপনারই দলবল।"

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে বীরু বলে, "আমার দলবল?"

হঠাৎ পিছন থেকে বজ্রগম্ভীর স্বরে কে যেন বলে উঠল, "হ্যাঁ বীরুবাবু, তারা আপনারই দলবল। খবর্দার, একটুও নড়বেন না। হাতের অস্ত্র ফেলে দিন এবং দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়ান। আমার হাতে লোডেড পিস্তল।"

বীরুর হাত থেকে দুধের খালি গেলাসটা ঠকাত করে মাটিতে পড়ে গেল। সে কাঁপতে-কাঁপতে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "এসব কী হচ্ছে দারোগাবাবু?"

"আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে বীরুবাবু। আপনি নিজের বাড়িতে একদল হুলিগান, অ্যানার্কিস্ট আর টেররিস্টকে পুষে রেখেছেন। কিছুদিন আগে তারা রামরিখ গয়লাকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। সেই হামলায় রামরিকের কয়েকজন বন্ধুও উন্ডেড হয়েছে। ঠিক দু'দিন আগে আপনার বাড়ির পিছনের বাগানে একদল নিরীহ লোকের উপর আপনার দলবল বন্দুক নিয়ে চড়াও হয়। তাতে একজন গুরুতর উন্ডেড।"

বীরু কাঁপা গলায় বলে, "বিশ্বাস করুন বিপিনবাবু, আমার বাড়িতে কোনও দলবল নেই। কেউ বন্দুকও ছোড়েনি বরং কারা যেন আমার বাড়ির পাঁচিল ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।"

"পাঁচিল ভাঙা যদি কোনও অপরাধ হয়েই থাকে, তা হলে সেটা দেখার জন্য আমিই তো আছি। আপনি তো আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। বাই দা বাই, আপনার কি বন্দুকের লাইসেন্স আছে?"

"আজ্ঞে না, আমার বন্দুকও নেই।"

"পুলিশ শোনা কথায় বিশ্বাস করে না। আমরা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি। আপনার বাড়িতে তল্লাশি হবে। যাদের উপর হামলা হয়েছে তারা বলেছে, আপনার গ্যাংয়ের অনেকের হাতেই বন্দুক আর পিস্তল ছিল। ছিঃ, আপনাকে আমি একজন নিরীহ আর সজ্জন লোক বলে জানতুম। যদিও আপনার দাদু একজন কুখ্যাত ডাকাত ছিলেন, তবু আমার ধারণা ছিল, আপনি আপনার দাদুর মতো নন।"

"নইও। গাঁয়ের সবাই জানে আমি একজন ভিতু লোক।"

"তাদের ধারণা এবার পালটাবে। আর আপনার এই কাজের লোকটিকেও আমার সন্দেহ হচ্ছে। একে আমরা থানায় নিয়ে যাচ্ছি।"

হাত কচলে এক গাল হেসে রঘুনাথ বলল, "এই রে! দারোগাবাবু কি আমাকে ভুলে গেলেন নাকি? এই তো সেদিন আপনার কাজের লোক আসেনি বলে আপনার বাড়িতে গিয়ে মশলা বেটে দিয়ে এলুম, কাপড় কাচলুম, কুয়ো থেকে না হোক বিশ-পঁচিশ বালতি জল তুলে চৌবাচ্চা ভরলুম, মহিষগঞ্জ থেকে গিরিমার বাতের তেল এলে দিলুম। পরশুদিনও তো একঝুড়ি কালো জাম আর একঝুড়ি পাকা আম নিয়ে এসেছি। গত কাল দিয়ে এসেছি ছানা আর ক্ষীর।"

বিপিনবাবু বললেন, "আচ্ছা-আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার ব্যাপারটা না হয় পরে ভেবে দেখা যাবে।"

"যে আজ্ঞে, যত পরে হয় ততই ভাল।"

তল্লাশিতে অবশ্য কিছুই পাওয়া গেল না। সেপাইরা এসে বলল, "না বড়বাবু, কিছুই পাওয়া গেল না। কিছু পুরনো লোহালক্কড় আছে, কিন্তু বন্দুক, পিস্তল নেই।"

"তরোয়াল, ছোরা, বল্লম?

"আজ্ঞে না, তবে এই পাকা বাঁশের লাঠিটা আছে বটে।"

বিরক্ত হয়ে বিপিনবাবু বললেন, "আরে দূর, দূর। লাঠি দিয়ে তো আর গুলি চালানো যায় না। এত লোক যখন এখানে থাকে, তখন এ বাড়িতে নিশ্চয়ই অনেকের রান্নাও হয়। তাদের শোয়ার জন্য বিছানা, বালিশ বা শতরঞ্চিও দরকার। তেমন কিছু দেখলে?"

"আজ্ঞে না বড়বাবু। পিছনের দিকের একটা ঘরে একটা মাত্র বিছানা আছে, আর সামনের দিকের ঘরে বীরুবাবুর খাট। বেশি লোকের রান্না হওয়ার মতো হাঁড়িকুড়িও নেই।"

"মাটির নীচে কোনও গুপ্ত কুঠুরিটুঠুরি নেই?"

"আছে। ভাঁড়ার ঘরের নীচে একটা ছোট্ট কুঠুরি। তাতে শুধু কয়েকটা মাটির জালা ছাড়া কিছু নেই।"

"তা হলে এবার বাগানটা সার্চ করো। গাছপালা, ঝোপঝাড় কিছুই বাদ দিয়ো না।"

"ঠিক আছে স্যার," বলে সেপাইটা চলে গেল।

বিপিনবাবু বীরবাহাদুরের ফাঁকা চেয়ারটায় বসে, পা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে বীরুর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "এত আর্মস আর দশ-বারোজন গুন্ডাকে কোথায় চোখের পলকে হাপিস করে দিলেন বলুন তো। লোকে আপনাকে ন্যালাখ্যাপা মনে করে বটে, কিন্তু আমি তো দেখছি আপনি একজন ঝানু ক্রিমিনাল।"

চোখ কপালে তুলে বীরু বলল, "আমি, আমি ক্রিমিনাল!"

"তবে! এমন আটঘাট বেঁধে কাজ করেন যে, আমি ধ হয়ে গিয়েছি মশাই। এ বাড়িতে হানা দেওয়ার আগে আমি দোকানপাটে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ বাড়িতে রোজ কতজনের আন্দাজ চাল, ডাল, তেল, নুন বা আনাজপাতি আসে। তা হলে আপনার দলের দশ-বারোজন গুন্ডা কি হাওয়া খেয়ে থাকত? এটুকু একটা গাঁয়ে দশ-বারোজন বাইরের লোকের পক্ষে দিনের পর-দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাও সম্ভব নয়। অথচ অকাট্য প্রমাণ আছে, তারা এখানেই আছে। আর আছে যখন, তখন তাদের খোরাক আসছে কোত্থেকে? তারা তো আর হাওয়া, বাতাস খেয়ে থাকে না।"

রঘুনাথ ফস করে বলে উঠল, "আজ্ঞে, ঠিকই ধরেছেন দারোগাবাবু। তারা মোটেই কিছু খেতে চায় না।"

বিপিন দারোগা অবাক হয়ে বললেন, "কারা খেতে চায় না?"

বীরু বিনয়ের সঙ্গে বলে, "ওর কথা ধরবেন না বিপিনবাবু, ওর একটু মাথার দোষ আছে।"

"হুঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে বটে।"

"গরিবের দোষঘাটের অভাব কী? তা ধরুন, মাথার দোষও তার মধ্যে একটা।"

বিপিনবাবু বলেন, "হুঁ বুঝলাম। কিন্তু বীরুবাবু, এ কাজটা তো আপনি ঠিক করছেন না।"

"কোন কাজটা?"

"এই লোকমুখে শুনলাম, কে একজন পয়সাওয়ালা লোক এসে বেশ ভাল দামে আপনার বাড়ি আর বাগান কিনে নিতে চাইছে, কিন্তু আপনি রাজি হচ্ছেন না। এটা তো ঠিক হচ্ছে না মশাই। এই আজ পাড়াগাঁয় এই রকম একটা প্রস্তাব তো হাতে চাঁদ পাওয়ার শামিল। হাতের লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেলতে আছে? দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ হয় না বলে বাড়ি ঝুরঝুরে হয়ে যাচ্ছে। বাগান আগাছার জঙ্গল হয়ে উঠেছে। সাপখোপ, পোকামাকড়, মশামাছি, ভূতপ্রেতের আড্ডা বসে গিয়েছে।"

ফস করে রঘুনাথ ফের বলে বসল, "তা আর বলতে!"

"ওই যে শুনুন, রঘুনাথও সায় দিচ্ছে। বেচে দিন মশাই, বেচে দিন। যেসব ক্রিমিনাল আপনি পুষছেন, তাদেরই বিশ্বাস কী? একদিন তারাই হয়তো আপনার উপর চড়াও হয়ে সব দখল করে নেবে। তখন একূল ওকূল দুই-ই গেল আপনার।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীরু বলে, "হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে বটে।"

"এই তো বিবেচকের মতো কথা। পুরনো বাড়ি, পুরনো জিনিসপত্র আঁকড়ে থাকটা কোনও কাজের কথা নয়। দেখুন না, মহিমবাবু তাঁর কবেকার আম বাগান কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না। এমনকী যারা কিনতে এসেছিল, তাদের অকারণে বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিলেন। দেমাকি লোক, বন্দুক আছে, গোখরো সাপ পোষেন। তা সেই মহিমবাবুও শুনেছি নিমরাজি হয়েছেন। গাঁয়ের আর সবাই তো ভাল দাম পেয়ে তাদের বাড়তি জমি ছেড়ে দিচ্ছে। শুধু আপনারা দু'-একজন যা গাইগুঁই করছেন।"

"তা বটে।"

"ভাল কথাই বলছি, জমিজমা ভাল দামে বেচে দিয়ে একটা ছোটখাট বাড়ি কিনে নিয়ে আরামে থাকুন। আর্মস অ্যান্ড এবং হুলিগ্যানিজম্ অ্যান্ড রায়টিংয়ের জন্য আমি আপনার নামে কোনও চার্জ দেব না। নইলে জগত্যা নাচার হয়ে আপনাকে অনিচ্ছে সত্ত্বেও আমাকে অ্যারেস্ট করতে হবে।"

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীরু বলে, "বুঝেছি।"

সেপাইরা ফিরে এসে বলল, "বড়বাবু, সারা বাগান সার্চ করে দেখেছি। কোনও আর্মস পাইনি। কেউ গা-ঢাকা দিয়েও নেই।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। সব ভাল যার শেষ ভাল," বলে উঠে পড়লেন বিপিনবাবু। মুখে একটু হাসি-হাসি ভাব। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "আমি তদন্ত করে দেখছি। আপনার বাগানের দেওয়ালটা ভেঙেছে গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেরাই। আম, জাম লোভেই কাণ্ডটা করেছে বলে মনে হয়। তাই আমি ও ব্যাপারে কোনও অ্যাকশন নিচ্ছি না, বুঝলেন?"

"যে আজ্ঞে, বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।"

"বুঝবেন বইকী! আপনি বুদ্ধিমান লোক।"

বিপিনবাবু বিদেয় হওয়ার পর রঘুনাথ খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, "বাড়িটা কি বেচেই দেবেন নাকি কর্তা?"

বীরুর আজ সকাল থেকেই মেলা দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। কাহিল গলায় বলে, "কী আর করব বল দিকিং আমি দুর্বল মানুষ, জনবল নেই, অর্থবল নেই, ডাকাবুকো নেই। স্বয়ং দারোগাবাবুও ওদের পক্ষে। আমি তো ওদের ঠেকাতে পারব না।"

"তা তো ঠিকই, তবে কিনা বাড়িটা বেহাত হলে আপনার কুটুমরা ভারী দুঃখ পাবে। এতকালের আশ্রয় ছেড়ে তারা এখন কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজবে সেটাই চিন্তার কথা।"

এবারের দীর্ঘশ্বাসটাও চাপতে পারল না বীরু। বলল, "বাপু রঘুনাথ, আমার কুটুমের খাতে তুমি কাকে-কাকে ধরেছ তার একটা লিস্টি দিতে পার আমাকে? যার তিন কূলে কেউ নেই তার আবার কুটুম হয় কী করে সেটাই তো আমার মাথায় আসছে না। এরা তোমার সেই ঘনারাম, বংশীবদনরা নয় তো!"

ঘাড় চুলকে ভারী লাজুক মুখে রঘুনাথ বলে, "আজ্ঞে তেনারাই। আপনি তাঁদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন বটে, কিন্তু আপনার উপর তাঁদের যে বড্ড মায়া।"

"তা তাঁরা আমার কুটুম হতে যাবেন কোন দুঃখে? তাঁরা বরং তোমার কুটুম, তোমার সঙ্গেই ভাবসাব। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে ওই যারা দেওয়াল ভাঙতে এসেছিল, তাদের উপর তুমিই তোমার কুটুমদের নিয়ে হামলা করেছিলে। নইলে নবকুমারের দল পালানোর লোক নয়। কথাটা ঠিক কিনা বুকে হাত দিয়ে বলো তো রঘুনাথ!"

রঘুনাথ ভারী অপরাধী মুখ করে বলে, "আজ্ঞে আপনাকে গুরু বলে মেনেছি, মিছে কথা তো কইতে পারি না। কথাটা আপনি বেঠিকও বলেননি। নবকুমারের গুন্ডার দলের উপর হামলা তেনারাই করেছিলেন বটে, তবে আসল কথা কিন্তু তেনারা আমার কুটুম নন মোটেই। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, তেনারা আপনারই কুটুম বটে।"

বিরক্ত হয়ে বীরু বলে, "তোমার মতো পাগলের সঙ্গে কথা কয়ে লাভ নেই। মোদ্দা কথাটা হল, কুটুমরা তোমারই হোক কী আমারই হোক, এরকম কুটুম থেকে তফাত থাকা ভাল। একটা অকারণ গন্ডগোল পাকিয়ে তাঁরা কোন উপকারটা করলেন বলো তো? আর একটু হলে তো হাজতবাস করতে হত আমাকে।"

"তাঁরা মোটেই আপনার উপকার করতে চাইছিলেন না কর্তা।"

"তবে তাঁরা চাইছেন কী?"

"তাঁরা চাইছেন আপনার উপকার আপনি নিজেই করুন।"

"তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?"

"একবার লাফ মেরে উঠে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেই হয়।"

বীরু বিরক্ত হয়ে বলে, "যতসব পাগলের প্রলাপ।"

"আজ্ঞে তা বটে। তবে কিনা মাঝে-মাঝে মানুষের একটু খ্যাপামিরও দরকার হয় কিনা।"

বীরু হতাশ হয়ে বলে, "খেপে গিয়ে লাভ কী হে রঘুনাথ? সবকিছুই তো আমার বিরুদ্ধে। এমনকী এই তুমিও নিজের মুখে বলে ফেললে যে, ঘরের কাজকর্ম করে দাও, ফাইফরমাশ খাটো। তা হলে আমি আর কার উপর ভরসা রাখি বলো!"

"আজ্ঞে সে কথাও ঠিক। দারোগাবাবুর সঙ্গে দহরম মহরম এক রকম নেমকহারামিই দাঁড়ায় বটে। কারণ, দারোগাবাবু তো আর আপনার পক্ষের লোক নন। আমি এ বাড়িতে গিয়ে নানা কূটকচালি করছি কিনা, অন্ধিসন্ধির খবর দিচ্ছি কিনা, এরকম সন্দেহ তো আপনার হতেই পারে।"

"হচ্ছেও।"

"যে আজ্ঞে। তবে আমার তেমন দোষ নেই কর্তা। একদিন নীলরতন পাঠকমশাই এসে বললেন, 'ওরে রঘু, আমি তো ভাবগতিক বিশেষ ভাল বুঝছি না। লক্ষণ যা দেখছি তাতে তোকে না হাজতবাস করতে হয়। আর তুই যদি হাজতে যাস, তা হলে বীরু যে বড্ড কাহিল হয়ে পড়বে।' তা বাবা, তুই দারোগাবাবুর সঙ্গে একটু ভাবসাব বজায় রাখিস। দারোগা, পুলিশ হাতে থাকা ভাল। আলপটকা বিপদে পড়লে কাজে দেয়।"

"এ কথাটাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?"

"আজ্ঞে, শুনতে একটু মিথ্যের মতো লাগে বটে, কিন্তু কথাটা নির্জলা সত্যি। মুখপাতুকুন করে রেখেছিলুম বলে রক্ষে। নইলে আজ কোমরে দড়ি পরিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত।"

"দেখো রঘুনাথ, তোমাকে বুঝবার জন্য বোধ হয় একটা মানে বই দরকার। তুমি আমার শত্রু না বন্ধু তা-ই আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না। এই যে সকালে তুমি আমাকে মধু মিশিয়ে দুধ খাওয়ালে, তখন মনে হল, রঘুনাথের মতো বন্ধু হয় না। আবার পরে পরেই যা-যা হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে মোটেই শান্তিতে থাকতে দিতে চাও না। দুধটা খাওয়ার পর বেশ চনমনে লাগছিল। এখন উদ্বেগ, অশান্তিতে শরীরটা দুর্বল লাগছে।"

"ভাল কথা মনে করেছেন ওস্তাদ, স্নায়ুদৌর্বল্যে চ্যবনপ্রাশ। এই যে কর্তা, এই বয়াম থেকে এক খাবলা মেরে দেন তো।"

রঘুনাথের হাতের বয়ামটার দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বীরু বলে, "চ্যবনপ্রাশ! হঠাৎ চ্যবনপ্রাশ খেতে যাব কেন?"

"আজ্ঞে, আপনার ঠাকুরদাও খেতেন কিনা।"

রঘুনাথ অম্লানবদনে বলে, "কয়েকটা ডন-বৈঠক দিয়ে নেন কর্তা। দেখবেন শরীরটা বেশ চনমনে হয়ে উঠবে।"

"পাগল হয়েছ? জীবনে কখনও হুড়যুদ্ধ করিনি। ওসব আমার পোষাবে না বাপু। বয়সের কথাটাও তো মনে রাখতে হবে।"

"যে আজ্ঞে! তা ঠাকুরের ইচ্ছেয় বয়সও তো বড় কম হল না আপনার। সামনের অগ্রহায়ণে আপনি বত্রিশে পা দেবেন।"

বীরু গম্ভীর হয়ে বলে, "তা বত্রিশটা কি তোমার কাছে কাঁচা বয়স বলে মনে হচ্ছে নাকি?"

"আজ্ঞে না, বত্রিশ বছর তো বেশ যথা বয়স বলেই মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু রঘুনাথ, আমার বয়সের এত নিখুঁত হিসেব তুমি জানলে কী করে?"

"আমি আর কী করে জানব বলুন, তবে নীলরতন পাঠকমশাইয়ের কাছে পাকা হিসেব আছে।"

"নীলরতন পাঠক! তা তিনিই বা হিসেবটা পেলেন কোথায়?"

"বলেন কী কর্তা, তিনি যে আপনার ঠিকুজি কোষ্ঠী করেছিলেন।"

বীরু অবাক হয়ে বলে, "আমার ঠিকুজি কোষ্ঠী তো করেছিলেন বুলবুলি ঠাকুর।"

একগাল হেসে রঘুনাথ বলে, "তিনিই। কাঁধে পোষা বুলবুলি পাখি নিয়ে ঘুরতেন বলে তাঁর ওই নাম দিয়েছিল লোকে।"

"কথাটা ঠিক। তাঁর কাঁধে একটা পোষা বুলবুলি বসে থাকত বটে! কিন্তু তাঁকে তুমি পেলে কোথায় বাপু? তিনি না হোক বিশ বছর আগেই গত হয়েছেন।"

রঘুনাথ মাথা চুলকাতে-চুলকাতে বলে, "তা হয়েছেন বটে, তবে যাতায়াতও আছে।"

"তার মানে কী রঘুনাথ?"

রঘুনাথ ভারী কাচুমাচু হয়ে বলে, "মানে কি আমিই জানি কর্তা?"

"যিনি বিশ বছর আগে গত হয়েছেন, তিনি এখনও যাতায়াত করছেন কী করে?"

"এই তো মুশকিলে ফেললেন। তা তিনি যাতায়াত করলে আমাদের কী করার আছে বলুন?"

"একটা কাজ করার আছে বাপু। আর সেটা হল, মিছে কথা না বলা। তবে এ কথা স্বীকার না করেও উপায় নেই যে, আমার জন্ম অগ্রহায়ণেই হয়েছিল বটে। আমি বত্রিশে পা দেব, এটাও সত্যি। আর ঠিকুজি কোষ্ঠী যে বুলবুলি ঠাকুরই করেছিলেন একথাও ঠিক। কথা হল, তুমি এতসব খুঁটিনাটি জানলে কী করে? সত্যি কথা বলতে কী, এত সব তো আমার মনে ছিল না।"

"মুশকিল কী জানেন কর্তা, আপনার কাছে থেকে-থেকে অভ্যেস এমন খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, মিছে কথাগুলো কিছুতেই মুখে আসতে চায় না। আর সত্যি কথা বললে আপনার কেমন বিশ্বাস হয় না।"

॥ ৪ ॥

একটা বাঙ্কার দখল করার জন্য একটা খাড়া দুর্গম বরফে ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে পাকদণ্ডী দিয়ে সে উঠছে। হাতে রাইফেল, কাঁধে ভারী রাকস্যাক, মাথায় মিলিটারি হেলমেট। তার দলের মিলিটারিরা কেউ বেঁচে নেই। সে একা। উঠছে, উঠছে। চূড়ায় বাঙ্কারটা আর খুব দূরে নয়। দখল নিয়ে তার উপর জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবে সে। তারপর অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট করে বলবে 'জয় হিন্দ। কিন্তু হঠাৎ উপর থেকে ট্যাট ট্যাট করে ফের গুলির শব্দ আসতে লাগল। কিন্তু উপেনের ভয়ডর নেই। বাঙ্কারটা দখল করতেই হবে। সেও রাইফেল তুলে উলটে গুলি চালাল ট্যাট ট্যাট। ফের হামাগুড়ি দিয়ে এগোনো। প্রায় চূড়ায় বাঙ্কারটার কাছে পৌঁছে গিয়েছে সে। শেষ সৈনিক। দেখা

গেল বাঙ্কারেও আর-একজন মাত্র শত্রুসৈন্য বেঁচে আছে। দু'জনেই গুলি চালাল। উপেনের বুক থেকে অজস্র ফুটো দিয়ে ফুলঝুরির মতো রক্ত বেরচ্ছে।

উলটো দিকের শেষ সৈন্যটাও বুকে গুলি লেগে লুটিয়ে পড়েছে। যুদ্ধ শেষ। উপেন ধীরে-ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এই দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখতে-দেখতে কতবার তার চোখ ফেটে জল এসেছে। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার বড় ইচ্ছে ছিল উপেনের। কিন্তু মা সুবাসিনীদেবী কান্নাকাটি করায় তার আর মিলিটারিতে নাম লেখানোই হল না।

এর পর উপেন ঠিক করল এভারেস্টে উঠবে। সেই বাবদে সে রাকসাক আর বরফের গাঁইতিও কিনে ফেলল। রতনপুরে যে বেশ উঁচু একটা টিলার মতো আছে, সেখানে গিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে পাহাড়ে ওঠা প্র্যাকটিস শুরুও করেছিল সে। খবর শুনে তার বিধবা পিসি মন্দাকিনীদেবী এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন যে আর কহতব্য নয়, "ওরে, ওকী সব্বোনেশে কথা! ওটা যে শিবের পাহাড়। ওর মাথায় ওঠা মানে তো শিবঠাকুরের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ানো। নির্বংশ হবি যে! মাথায় বাজ পড়বে," পিসিকে বোঝায় কার সাধ্যি!

অবশেষে সে ঠিক করল ইংলিশ চ্যানেলটা সাঁতরে পার হবে। সেইজন্য প্রস্তুতি হিসেবে খালে, বিলে, পুকুরে ঘন্টার পর-ঘন্টা সাঁতার প্র্যাকটিস করতে লাগল। সেই সময় একদিন জ্যাঠামশাই হরশঙ্কর কানটা আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়ে বললেন, "ইংলিশ চ্যানেল? তার আগে ইংলিশ গ্রামারটা পার হয়ে দেখ দিকি মুখ্যু!"

এইসব নানাবিধ বাধায় উপেন জীবনে আর তেমন এগোতেই পারল না। কিন্তু যে জীবনে অ্যাডভেঞ্চার নেই, উদ্দীপনা নেই, সুদূরের ডাক নেই সে কেমন জীবন? নিজেকে চেপে রাখে বটে উপেন, কিন্তু বুকের ভিতরে একটা ড্রিমি ড্রিমি দামামা অনবরত বেজেই চলেছে। তার রক্ত ফুটছে টগবগ করে। একটা হেস্তনেস্ত, একটা এসপার-ওসপার করার জন্য তার হাত-পা নিশপিশ করে।

ঠিক এই সময়ে সে জটাবাবার সন্ধান পেল। বউডুবির ঝিলের ধারে বটতলায় তার ঠেক। জটাবাবা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "মায়ের ইচ্ছেয় কী না হয় রে! মায়ের সাধনা কর, তোর সব হবে।"

মন্ত্র নিয়ে উপেন সোৎসাহে সাধনায় নেমে পড়ল। কিন্তু সাধনা করারই কি জো আছে? বাড়িতে বেকার ছেলে থাকলে ফাইফরমাশের অন্ত থাকে না, "ওরে দোকান থেকে চিনি নিয়ে আয়," "যা তো বাজার করে আন," "পেতলের হাঁড়িটা ছ্যাঁদা হয়েছে, ঝালাই করে আন তো বাবা।" নিরিবিলিতে সাধনা করার জন্য অবশেষে সে খুঁজে-খুঁজে জঙ্গলবাড়ির ভাঙা কালী মন্দিরটাই পছন্দ করল। দিব্যি জায়গা। চারদিকে জনমনিষ্য নেই। একধারে রাজবাড়ির বিরাট ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। মন্দিরটা সাফসুতরো করে, আসন পেতে ধ্যান জুড়িয়ে সে বসে গেল। সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিনা বাধায় জপতপ চলতে লাগল তার। সাধনায় যে কাজ হচ্ছে তাও বুঝতে পারছিল সে। একদিন হয়তো শরীরে একটা কাঁপুনি উঠল, কোনওদিন বা শরীর ভারী হালকা হয়ে যেন ভেসে পড়ার উপক্রম হল। কোনওদিন বা মাথাটা হঠাৎ আগুনের হলকা ছাড়তে লাগল। কাজ যে হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

মাসখানেকের মাথায় গভীর রাতে সে হঠাৎ কত বুঝতে পারল একটা বড় রকমের কিছু ঘটতে যাচ্ছে। শরীরের ভিতর যেন একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। একটা কেমন যেন শিরশিরানি বয়ে যাচ্ছে হাতে, পায়ে। হঠাৎ মনে হয়, নির্জন মন্দিরে কেউ যেন এল। না, এল বলাটা ঠিক নয়, যেন আবির্ভূত হল। বন্ধ চোখেও সে যেন একটা নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছিল। যেন শূন্য থেকে দেহ ধারণ করে কেউ একজন সামনে এসে দাঁড়াল। ফিসফিস করে সে জিজ্ঞেস করল, "মা মহামায়া, মা শ্মশানেশ্বরী, মা ভবতারিণী কি এলি? মা... মা..."

বজ্রনির্ঘোষে কে যেন বলে উঠল, "মা নয় রে, বাবা!"

পট করে চোখ খুলে উপেন হাঁ। ধুনির আলোয় দেখতে পেল সামনে স্বয়ং শিব। সেই জটা, সেই ত্রিশূল, পরনে বাঘছাল, গলায় রুদ্রাক্ষ আর সাপ, সর্বাঙ্গে বিভূতি, বিশাল চেহারা, ভুঁড়ি। উপেনের চোখ জলে টলটল করতে লাগল। স্থলিত কণ্ঠে সে বলল, "জয় বাবা শিবশম্ভো! জয় বাবা বিশ্বনাথ!"

শিব হাত তুলে বললেন, "শুভমস্তু! শুভমস্তু!"

উপেন গদগদ হয়ে বলে, "বাবা, আপনি আবার কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন? আসবার কথা তো মা কালীর। বহুক্ষণ ডাকাডাকি করছি।"

শিব গম্ভীর গলায় বললেন, "কেন রে ব্যাটা, কালীর চেয়ে শিব কমতি কিসে?"

"আজ্ঞে না, কমতি হবেন কেন? বলছিলাম কী, এক গেলাস জল চাইলে যদি কেউ গেলাসভর্তি বেলপানা এনে দেয়, সেটা কি ভালং?"

"তা বেলপানাই বা খারাপ কী? তা আছে নাকি বেলপানা?"

"আজ্ঞে না, এই কখার কথা বলছিলাম আর কী।"

শিব বিরক্ত হয়ে বললেন, "খাবারদাবার কিছু নেই?"

"আজ্ঞে, এ আমার সাধনপীঠ। এখানে খাবারদাবার আসবে কোত্থেকে?"

নাক সিঁটকে শিব বললেন, "আহা, সাধনপীঠের কী ছিরি!"

বলতে-বলতে মাথা থেকে হঠাৎ জটাটা একটানে খুলে ফেলে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে টাক চুলকাতে-চুলকাতে শিব বললেন, "এই পত্রচুলাগুলো ব্যাটারা কী দিয়ে বানায় বল তো? মাথায় দিলেই এমন চুলকায় যে, পাট ভুলে যাওয়ার অবস্থা হয়।"

চোখ গোল-গোল করে দৃশ্যটা দেখছিল উপেন। হতাশ হয়ে বলল, "আপনি শিব নন?"

"একেবারেই নই, তাও বলা যায় না। আমার নামই হল মহাদেব সাঁতরা।"

"ব্যাপারটা কী হল আমি যে বুঝতে পারছি না।"

"আর বলিস না। এই পাশের গাঁ ফুলপুকুরে আজ দক্ষযজ্ঞ পালা ছিল। তাতে আমি হলুম গে শিব। যে মেয়েটা মেনকা সেজেছিল, সেই মিস মিনতি দক্ষযজ্ঞ পালায় ভুল করে রেহুলা লখিন্দর পালার ডায়ালগ বলে ফেলেছিল। মিনতিরও দোষ নেই। সাতদিন ধরে টানা সাত-সাতটা পালা করতে হচ্ছে রাত জেগে। দিনে পাট মুখস্ত করতে হয় বলে ভালো করে ঘুম হয় না। কবে কোন পালায় পার্ট করতে হচ্ছে তা খেয়াল রাখা কি চাট্টিখানি কথা! কিন্তু গাঁয়ের লোক পৌরাণিক পালা দেখে-দেখে ভারী পোক্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের সামনে ভুল পার্ট বললে রেহাই নেই। ট্যাঁকের পয়সা খসিয়ে পালা দেখতে এসেছে, ইয়ার্কি তো নয়। ভুল পার্ট শুনে প্রথমটায় হাসাহাসি হচ্ছিল, তারপর চেঁচামেচি। আর তারপরেই দমাদম ইট আর ঢিল পড়তে লাগল। কিছু লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এল। দক্ষযজ্ঞ আর কাকে বলে! চোখের পলকে সব লন্ডভন্ড কাণ্ড। কোনও রকমে আসর থেকে পালিয়ে প্রাণ ছুটতে-ছুটতে আসছি। অন্ধকারে এখানে একটু আলো জ্বলতে দেখে ঢুকে পড়েছি রে ভাই।"

উপেন তেতো গলায় বলে, "বেশ করেছেন। আজ আমার সাধন-ভজনটা বেশ জমে গিয়েছিল মশাই। দিলেন তো তার পিণ্ডি চটকে।"

মহাদেব সাঁতরা ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল, "ওরে তোর কাঁচা বয়স। এই বয়সে অত সাধনভজন করলে যে দড়কচা মেরে যাবি ভাই। ওসব রেসে সয়ে করতে হয়। তা হ্যাঁরে, কিছু খাবারদাবার জুটবে? অতিথি বলে কথা!"

উপেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "তা জুটবে। তা আজ রাতে কি এ গাঁয়েই দেহ রাখবেন নাকি?"

"তা রাখলে হয়।"

"তা হলে চলুন, আমার বাড়ি কাছেই।"

"ওরে বাপু, এই পোশাকে গেরস্থবাড়িতে গিয়ে পড়লে হুলুস্থুল হবে। তার চেয়ে এই বেশ নিরিবিলি জায়গা আছে। এখানেই বরং কয়েকটা দিন থেকে যাই।"

"কেন, আপনার ঘরবাড়ি নেই?"

''নারে, আমি বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো ছেলে। যাত্রাদলের সঙ্গেই ঘুরে-ঘুরে বেড়াই।''

''যাত্রাদলের লোকেরা আপনাকে খুঁজবে না?''

''তা খুঁজবে। তবে আগামী দিনপনেরো আমাদের কোনও বায়না নেই। ক'দিন একটু জিরিয়ে নিই। গায়ে-গতরের ব্যথাটা একটু মজুক। তা তোদের এই গাঁয়ের নামটা কী বল তো?''

''এ হল বিদ্যেধরপুর।''

মহাদেব চমকে উঠে বলে, ''কোন বিদ্যেধরপুর বল তো? পলতাবেড়ে বিদ্যেধরপুর নয় তো?''

''আজ্ঞে, সেই বিদ্যেধরপুরই বটে।''

মহাদেবের চোখ রসগোল্লার মতো বড়-বড় হয়ে গেল, ''বলিস কী? বিদ্যেধরপুরের কথা তো আমার বিস্মরণই হয়ে গিয়েছিল। পাকেচক্রে সেই গাঁয়েই এসে পড়েছি, এ যে ভাবা যায় না।''

''কেন মশাই, আপনার সঙ্গে কি বিদ্যেধরপুরের কোনও সম্পর্ক আছে?''

''আছে মানে! এ যে আমার পিসি রাসমণির গাঁ। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর তো আমি তেরো বছর বয়সে এই পিসির কাছেই এসে উঠেছিলাম। দুঃখ কী জানিস, মা-বাবা নয়, এই দুনিয়ায় এই পিসিমাই যা একটু ভালবাসত আমায়।''

''আপনার পিসি কোন পাড়ায় থাকতেন বলুন তো?''

''মালোপাড়ায়।''

''পিসেমশাই কে?''

''ব্রজমাধব রায়।''

''কিন্তু ওঁরা তো...''

''জানি, কেউ বেঁচে নেই। পিসির ছেলেপুলেও ছিল না। পিসি আমাকে বলেছিল, বিষয়সম্পত্তি সব আমার নামেই লেখাপড়া করে দিয়ে যাবে। তখন কাঁচা বয়স, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছেই হয়নি। এখন যাত্রা করার নেশায় পাগল হয়ে এদল-ওদলের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন মনে হয়, একটু জমিজমা পেলে থিতু হতাম।''

''ব্রজমাধব রায়ের বিষয়সম্পত্তি কিন্তু কম নয়। অনেক ধানী জমি, ফলন্ত বাগান, দোতলা বাড়ি।''

মহাদেব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ''তাতে আর আমার কী বল, আমাকে কি আর দিয়ে গিয়েছে?''

''তা বলতে পারছি না। তবে কানাঘুষো শুনেছি, গোবিন্দ ঘোষের কাছে ব্রজমাধব রায়ের উইল রাখা আছে। ওয়ারিশানকে খুঁজে পেলে বিষয় আশয় তার হাতেই তুলে দেওয়া হবে। এমন তো হতেই পারে যে, ব্রজমাধব রায় তাঁর সবকিছুই আপনাকে দিয়ে গিয়েছেন।''

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাদেব বলে, ''ওরে, আর লোভ দেখাসনি। আমার কপালটা তত ভাল নয় রে। যাত্রাদলে ঘুরে-ঘুরেই আমার জীবনটা কেটে যাবে।''

''তবু খোঁজ নিতে দোষ কী? আজ রাতের মতো আপনি এখানেই থাকুন। আমি আপনার খাবারদাবারের জোগাড় করি। দেখি, যদি বাবা বা জ্যাঠার পুরনো ধুতিটুতি আনতে পারি কিনা।''

''তুই যে একটা হিরের টুকরো ছেলে রে!''

গোবিন্দ ঘোষের নেশা হল সকালের দিকে ন'বছরের নাতনি বাবলির সঙ্গে কয়েক দান কাটাকুটি খেলা। বাবলির দারুণ বুদ্ধি। রোজই দাদুকে অনায়াসে হারিয়ে দেয়।

আজও গোবিন্দ ঘোষ যথারীতি পরপর তিন দান হারলেন। আফসোস করে বললেন, ''আসল কথা কী জানিস বাবলি, আমি বুড়ো হয়েছি তো, বুড়ো বয়সে মাথা ভাল কাজ করে না।''

বাবলি ঝামড়ে উঠে বলল, ''মোটেই তুমি বুড়ো হওনি। তুমি বুড়ো হলে আমি টের পেতাম না বুঝি? আসলে তুমি মন দিয়ে খেলছ না। আমি যখন বাঁ দিকের কোণে গোল্লা দিলাম, তুমি তখন মাঝখানের ঘরে ঢাড়া দিলে কেন? কোনা আটকে না খেললে তো হারতেই হবে।''

''ওরে ওটাই তো বুড়ো বয়সের দোষ।''

''মোটেই না। তোমার দাঁতও পড়েনি, চুলও পাকেনি, চোখে ছানিও আসেনি। বুড়ো হলেই হল? বুড়ো হওয়ার তো একটা নিয়ম আছে নাকি? ফের বুড়ো-বুড়ো বললে আমি তোমার সঙ্গে খেলবই না।''

''আচ্ছা বাপু, রাগ করিসনি। আয়, আর-একটা দান খেলি।''

''বুড়ো হওনি তো?''

''আরে না, কোথায় বুড়ো? কে বুড়ো? আমি তো একজন উগবগে মানুষ। কে আমাকে বুড়ো বলে ধরে নিয়ে আয় তো, কান মলে দিই।''

বাবলি হি হি করে হাসে। ঠিক এই সময় বাইরে থেকে কে ডাকল, ''গোবিন্দজ্যাঠা, ও গোবিন্দজ্যাঠা।''

''কে রে?''

''আজ্ঞে, আমি উপেন। উপেন সর্দার।''

গোবিন্দ ঘোষ বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, ''আয় রে উপেন, দাওয়ায় বোস। সঙ্গে উটি কে?''

''বলছি জ্যাঠা, কথা আছে।''

তিনজন মাদুরে মুখোমুখি বসবার পর উপেন বলল, ''ইনি হলেন রাসমণি রায়ের ভাইপো মহাদেব সাঁতরা। আপনার কাছে ব্রজমাধব রায়ের যে উইল আছে, তাতে কি এঁর নাম আছে জ্যাঠা?''

গোবিন্দ ঘোষ মহাদেবের দিকে চেয়ে বললেন, ''তা এতকাল কোথায় ছিলে বাপু? তোমার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি তুমি নাকি নিরুদ্দেশ। বাড়ির কেউ কোনও খবর রাখে না, রাখতে চায়ও না। তা এতকাল পরে হঠাৎ উদয় হলে কী করে?''

মহাদেব তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলে, ''আজ্ঞে সম্পত্তির লোভে আসিনি। ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি।''

''উইলে তোমার নাম আছে বটে, কিন্তু মুখের কথায় তো হবে না। তুমিই যে সেই লোক তার পাকা প্রমাণ চাই। ভোটের কার্ডটার্ড কিছু আছে বাপু?''

''আজ্ঞে না।''

''সেসব জোগাড় করে আনো, তারপরেও ফ্যাকড়া আছে।''

''কিসের ফ্যাকড়া?''

''তোমার পিঠের নীচের দিকে মেরুদণ্ডের বাঁ পাশে একটা আব থাকার কথা।''

''আজ্ঞে আছে।''

''যাক, তা হলে তো হয়েই গেল। বোঝা গেল, তুমিই মহাদেব।''

''যে আজ্ঞে।''

''তা লাঠি, সড়কি চালাতে পার?''

''আজ্ঞে না।''

''তরোয়াল খেলতে জান?''

''আজ্ঞে না।''

''বলি বন্দুক, পিস্তলে হাত আছে?''

''আজ্ঞে তাও না।''

''হাতে গুন্ডা-মস্তান আছে?''

''না তো।''

গোবিন্দ ঘোষ ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, ''তা হলে এতকাল করলে কী? এসব হাতের কাজ শিখে না রাখলে কি চলে? পিসির সম্পত্তি কি ছেলের হাতের মোয়া? নাকি হাত ঘোরালেই নাড়ু?''

মহাদেব ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে, ''পিসির সম্পত্তির সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী?''

''হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। যাও না, পিসির বাড়িটা এক পাক ঘুরে দেখেই এসো না। তা হলেই বুঝতে পারবে সম্পর্ক কী? এতকাল তোমার পিসির সম্পত্তি আগলে-আগলে রেখেছিলুম বটে, কিন্তু আমিও এই ঠিক তোমার মতোই আহাম্মক। তাই সময় থাকতে ওসব হাতের কাজ শিখে রাখিনি। রাখলে আজ কত কাজ হত বলো তো?''

কিছু বুঝতে না পেরে মহাদেব হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, ''আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই।''

''আহা, এ বোঝা আর শক্ত কী? সোজা কথা হল, আমাদের বিদেশধরপুরে এখন বীরেশের বড় অনটন চলছে। দু'-একজন বীর থাকলে বড় ভাল হত। তা বলে সুভাষ বোসের মতো বীর নয় হে। ফাটা বিষ্টু, হাতকাটা সুখেন, শ্মশান সমরের মতো বীর।''

মহাদেব ভারী হতাশ গলায় বলে, ''আমার মাথায় যে কথাগুলো কিছুতেই বসছে না মশাই। যদি একটু বাংলা করে বলেন!''

''বাংলা শুনতে চাও? বেশ, তা হলে বাংলা করেই বলছি। সোজা কথা হল তোমার পিসির সম্পত্তি বেওয়ারিশ বলে দেদে দিয়ে কর্নেলসাহেবের লোকজন তা দখল করে পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। তারা বলছে, এই সম্পত্তির মালিকের কোনও হদিশ নেই বলে সরকার বাহাদুর নাকি সব ভেস্ট করে নিয়েছে।''

''কর্নেলসাহেব? তিনি কে?''

''তা কে জানে! তিনি 'রক্তকরবী'র রাজা কিংবা 'রামায়ণ'-এর মেঘনাদের মতোই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন।''

''তা হলে হরেদত্তে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে বলুন তো? পিসির সম্পত্তির মালিক কি আমি নই?''

''কে বলল নও? বড় একখানা দোতলা বাড়ি, ফলন্ত বাগান, বিশ বিঘে সরেস ধানী জমির একচ্ছত্র এবং ন্যায্য মালিক যে তুমিই হে! ব্যাঙ্কে কয়েক লাখ টাকা আর গয়নাও আছে। ভেবে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?''

''কোথায় আর হচ্ছে মশাই! যা শুনলুম তারপর কি আনন্দ হয়?''

''এইটেই তো তোমাদের দোষ। খবরটা যখন আনন্দের তখন আগে একটু আনন্দ করে নেওয়াই তো ভাল। তারপর সম্পত্তি বেহাত হওয়ার দুঃখু তো আছেই। দুঃখের সঙ্গে আনন্দের কাটাকাটি হয়ে গেল, তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই রয়ে গেলে। দুঃখই বা কিসের, আনন্দই বা কিসের?''

''কিছু কি করার নেই মশাই?''

''তা থাকবে না কেন? আজ থেকেই ডন, বৈঠক, মুগুর ভাঁজা শুরু করে দাও। লাঠিখেলা, তরোয়াল চালানো শেখো। বন্দুক, পিস্তলের তালিম নাও। ষন্ডা-গুন্ডা জোগাড় করে দল পাকাও। নইলে জলের মতো টাকা খরচ করে মামলা, মোকদ্দমাতেও নামতে পার।''

''যদি পুলিশের কাছে যাই।''

''আহা, তা যাবে না কেন? যেতে বাধা কি? বিপিনদারোগা ভুঁড়ি ভাসিয়ে তোমাদের জন্যই বসে আছে। তার কথাবার্তাও ভারী মিষ্টি। শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। তার কাছে কিছুক্ষণ বসলেই তোমার মনে হবে বিদ্যাধরপুরে কোনও অন্যায়, অধর্ম নেই, কোনও অশান্তি নেই। সব নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলছে। বিপিনদারোগা এও বলে যে, কর্নেলসাহেব বিদ্যেধরপুরকে দুবাই বা সিঙ্গাপুর বানিয়ে তবে ক্ষান্ত হবেন। যাবে তাঁর কাছে? যাও না, গিয়ে বুঝে এসো।''

''একেই কি হরিষে বিষাদ বলে মশাই?''

''ঠিক ধরেছ। একেই বলে হরিষে বিষাদ। আরও আছে। ধরো, 'বাড়া ভাতে ছাই', 'মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া', 'তীরে এসে তরী ডোবা', 'এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা', 'খাচ্ছিল তাতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে'। তবু ভাল যে, তোমার গোখরো সাপ চুরি যায়নি। গেলে বুঝতে।''

মহাদেব চমকে উঠে বলে ''গোখরো সাপ?''

''গোখরো সাপ বললে কম বলা হয়। সে ছিল মহিমের মেয়ে। তা সেই গোখরো সাপকেই তুলে নিয়ে গেছে কর্নেলসাহেবের লোক। শোকে, দুঃখে মহিমের চেহারা এখন অর্ধেক। খবর এসেছে আম বাগানটা কর্নেলকে বিক্রি করলে গোখরো সাপ তরালকে ফেরত পাবে। তা এখন শুনছি মহিম রাজি হয়ে গেছে।''

''তা হলে কি আর কোনও আশাই নেই?''

''তা থাকবে না কেন? আশা-ভরসাই তো আমাদের সম্বল হে। যাদের অর্থবল, জনবল, বাহুবল নেই, তাদের আশা করা ছাড়া উপায় কী? ধরাই হাট অ্যাটাক হয়ে কর্নেলসাহেব মরো-মরো হলেন, কিংবা তোমার পিসে আর পিসেমশাইয়ের ভূত কর্নেলের গুন্ডাদের তাড়া করে বাড়ি থেকে বের করে দিল, কিংবা বিপিনদারোগার হঠাৎ ধর্মভাব আর ন্যায়পরায়ণতা জেগে উঠল। এমন কি হয় না?''

দুপুরে খেয়েদেয়ে এসে রাজবাড়ির কালীমন্দিরের উঁচু বাঁধানো চাতালটায় একটা চট পেতে শুয়ে চোখ বুজে আকাশ-পাতাল ভাবছিল মহাদেব। রাতারাতি লাখপতি আর ফের রাতারাতি ফকির হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটায় তার মাথা ঝিমঝিম করছে। কাল খবরটা হওয়ারও দরকার ছিল না তার। ফকির হওয়াটাও ঠিক হল না। ঘটনাটা না ঘটলে জীবনটা তো আনন্দেই কাটছিল তার। পিছুটান নেই, সংসার নেই, বন্ধন নেই। আজ রাজা সেজে, কাল ভিলেনের ভূমিকায় তো পরশু শিব বা ব্রহ্মা হয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল। এই ঘটনার পর মনটা বড় বিচ্ছিরি রকমের বিচ্ড়ে আছে।

কোনও সাড়াশব্দ হয়নি, তবু চোখ বুজে থেকেও কাছেপিঠে একটা নাড়াচড়া টের পেল মহাদেব। একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দও হল কি? পট করে চোখ চেয়ে সে দেখতে পেল উঁচু চাতালের কানার উপর দুটো হাত একটা কেউটে সাপকে চাতালে ছেড়ে দিচ্ছে।

যাত্রা করে-করে আর কিছু না হোক মহাদেবের বডি বেশ ফিট। চট করে পাদুটো টেনে নিয়ে সে সাপটা ছোবল তোলার আগেই একটা বলটান মেরে উঁচু চাতালটা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল। সামনেই কোলকুঁজো হয়ে লোকটা বসে আছে, তার সামনে একটা ঢাকনা খোলা সাপের ঝাঁপি।

অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে মহাদেব চোখের পলকে লোকটাকে দু'হাতে জাপটে ধরে দুটো রাম ঝাঁকুনি দিল। লোকটা নিতান্তই রোগাভোগা। এরকম পেল্লায় ঝাঁকুনিতে ককিয়ে উঠে বলল, ''ছাড়ুন, বাবু ছাড়ুন। আমার হাড়গোড় ভেঙে যাবে যে! আমি সদ্য ন্যাবায় ভুগে উঠেছি।''

''তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে?''

''বলছি, বাবু বলছি। একটু দম নিতে দিন।''

লোকটা হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে দেখে ছেড়ে দিল মহাদেব। বলল, ''খবর্দার পালাবার চেষ্টা করো না। তা হলে কিন্তু...''

লোকটা দম নেওয়ার চেষ্টা করতে-করতে হাত তুলে বলল, ''পালাতে পারবও না বাবু। শরীরের সেই তাকতই নেই। ন্যাবা বড় পাজি রোগ,'' লোকটা উঁচু হয়ে বসে খানিক জিরেন নিয়ে বলল, ''আমি শ্রীনাথ সাপুড়ে। আমার তেমন দোষ নেই বাবু। সাপটা আপনাকে কামড়ালে আমার পাপ হত ঠিকই, কিন্তু যা করেছি পেটের দায়ে।''

''খুলে বলো।''

''আজ্ঞে বলছি। মহিমবাবুর সাপটাকে চুরি করার জন্য নববাবুর সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার কড়ার হয়েছিল। নববাবু মোটে হাজার টাকা ঠেকিয়ে বললেন, 'ওতেই হবে।' তা তাঁর সঙ্গে তো ঝগড়া-কাজিয়া করা যায় না। গুন্ডা নিয়ে ঘোরেন।''

''নববাবুটা কে?''

''আজ্ঞে, শুনেছি তিনি কর্নেলসাহেবের ম্যানেজার।''

''তারপর বলো।''

''আজ সকালে নববাবু এসে হঠাৎ ঝপ করে দশ হাজার টাকা ফেলে দিয়ে বললেন, 'বাকি চার হাজারের সঙ্গে আরও দশ হাজার টাকা আগাম দিচ্ছি। রাজবাড়ির কালীমন্দিরে একটা লোক এসে জুটেছে। তার ব্যবস্থা করতে হবে।'''

''নববাবু আমাকে মারতে চায় কেন জান?''

''আজ্ঞে না বাবু, সেসব আমার জানা নেই। ন্যাবায় শয্যাশায়ী ছিলুম বলে রোজগারপাতি ছিল না। উপোস করার দশা। আমার ছেলেপুলেগুলোও ফলপাকুড় খেয়ে কাটাচ্ছে। তাই টাকাটা ফেরাতে পারিনি। রাজি হয়ে যাই। আপনি কে, কী বৃত্তান্ত কিছুই জানি না বাবু। আমাকে মাপ করে দিন।''

লোকটার চোখ থেকে অঝোরে জল পড়ছে দেখে মায়া হল মহাদেবের। বলল, "তোমার নববাবু যদি জিজ্ঞেস করে আমি সাপের কামড়ে মরেছি কিনা, তখন কী বলবে?"

"আমার বলা-কওয়ার ধার তিনি ধারেন না। তাঁর চর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন বাবু।"

সাপটা চাতাল পেরিয়ে মন্দিরে ঢোকার দরজার কাছটাতে গিয়ে চৌকাঠে উঠছিল। শ্রীনাথ চাতালে উঠে গিয়ে সাপটাকে অত্যন্ত দক্ষ হাতে ধরে নিয়ে এসে ঝাঁপিতে পুরে ঢাকনা দিয়ে বলল, "বাবু যদি অনুমতি দেন তো আজ আমি আসি।"

লোকটা চলে যাওয়ার পর স্তম্ভিত মহাদেব চাতালে ওঠার সিঁড়িটায় বসে রইল। মাথাটা একেবারে ভোঁ ভোঁ হয়ে গিয়েছে। নিজের অবস্থাটা ঠিক বুঝতেও পারছে না সে। আতঙ্কে হাত-পা একটু অসাড় লাগছে। হঠাৎ কাছেপিঠে কে যেন বলে উঠল, "এসব কী হচ্ছে কি?"

মহাদেব চমকে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বুঝতে পারল, গলার স্বরটা তার নিজেরই। ফের তার নিজের মুখ থেকেই কথা বেরিয়ে আসতে লাগল। যেন সে নয়, তার ভিতর থেকে অন্য কেউ কথা কইছে, "না-না আর এক মুহূর্তও এখানে নয়...ওরে বাবা, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে...নিকুচি করেছে পিসির সম্পত্তির, আমার যাত্রাদলই ভাল...এ বড় বিপদের জায়গা, মানে-মানে বিদেয় হতে পারলে বাঁচি..."

মহাদেব তাড়াতাড়ি গিয়ে তার জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। জিনিসপত্র বলতে পরচুলা, রুদ্রাক্ষের মালা, রবারের সাপ, কাপড়ের তৈরি বাঘছালটাল। সেসব পেটিলা করে বেঁধে ফেলল সে। হাতে নিল ত্রিশূলখানা, এমন সময় ফের কাছেপিঠেই কে যেন বলে উঠল, "মশাই কি চললেন নাকি?"

কথাটা তার নিজের মুখ থেকেই বেরিয়েছে মনে করে মহাদেব কোনও জবাব দিল না। এখন যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায়, ততই মঙ্গল। দরজার দিকে ফিরতেই দরজা জুড়ে একটা বেঁটেখাট, মজবুত চেহারার লোককে লাঠিহাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এমন আঁতকে উঠল সে যে, শিথিল হাত থেকে পোঁটলা আর ত্রিশূল দুটোই পড়ে গেল মেঝেয়।

প্রথমটায় "আঁ আঁ" করে উঠেছিল সে। তারপর হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে, আমি চলে যাচ্ছি। নাক-কান মলছি মশাই। আর কখনও এ গাঁয়ে আসব না। বলেন তো লিখে দিতে পারি যে, পিসির সম্পত্তি আমি মোটেই চাই না, উইলটুইল আমি ছিঁড়ে ফেলে দিতে রাজি।"

লোকটা গম্ভীর গলায় বলে, "তা বললে হবে কেন? পিসির সম্পত্তি ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়? ছাড়তে আপনাকে দিচ্ছে কে?"

"না-না, আপনি ওভাবে বলবেন না। ওতে আমি ভারী অপরাধী হয়ে যাই। আমি স্বীকার করছি যে, রাসমণি রায় মোটেই আমার পিসি নন। আসল কথা হল, আমার কখনও কোনও পিসিই ছিল না।"

"কিন্তু আপনার নাম যে মহাদেব সাঁতরা।"

"তাই বলেছি বুঝি? ও আমার আসল নামই নয়।"

"আপনার আসল নাম তা হলে কী?"

"আজ্ঞে, বিশ্বনাথ প্রামাণিক।"

"ওটা তো আপনার যাত্রার দলের অধিকারীর নাম।"

"অ্যাঁ! ও, তা বটে। আসলে আমাদের দু'জনের একই নাম।"

"আর আপনার পিঠে যে আব আছে।"

"আব! আব! তাই তো! তা আব তো অনেকের পিঠেই থাকে। কত আবওয়ালা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"তা হলে দাবিদাওয়া ছেড়ে দিচ্ছেন?"

"দাবিদাওয়া! কিসের দাবিদাওয়া? কার দাবিদাওয়া? দাবিদাওয়ার কথা উঠছে কিসে?"

"ভাল করে ভেবে বলছেন তো?"

"যে আজ্ঞে।"

"তা হলে চলুন আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে গ্রামের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

ভারী বিনয়ের সঙ্গে মহাদেব বলে, "না-না, আপনি কেন কষ্ট করবেন?"

"রাস্তাঘাট যদি চিনতে না পারেন!"

"এ গাঁয়ের রাস্তাঘাট সব আমার চেনা।"

"কী করে চিনলেন?"

"চিনব না? এখানে পিসির বাড়িতে ছিলুম যে!"

"রাসমণি রায়ের বাড়িতে?"

মহাদেব শশব্যস্তে বলে, "ওই দেখুন, ফের ভুলভাল বকছি! না-না, সে অন্য গাঁয়ে। আর গাঁগুলো তো সব এক রকম।"

"আপনার পিসির বাড়ি কোন গাঁয়ে?"

"মাধবপুর।"

"কিন্তু এই যে একটু আগে বললেন, আপনার কোনও পিসিই নেই!"

"সাক্ষাৎ পিসি নেই বটে, তবে লতায়পাতায় আছে।"

"কিন্তু আমার উপর হুকুম আছে আপনাকে গাঁয়ের সীমানা পার করে দিয়ে আসার।"

মহাদেব আমতা-আমতা করে বলে, "চলুন।"

"যে আজ্ঞে।"

"আপনি আগে-আগে হাঁটুন, আমি পিছনে আছি।"

মহাদেব সভয়ে বলে, "সেটা কি ভাল দেখাবে! আপনি মান্যগণ্য লোক।"

"পিছন থেকে মাথায় লাঠি বসিয়ে দেব বলে ভয় পাচ্ছেন তো! সে তো ইচ্ছে করলে সামনে থেকেও বসানো যায়।"

"আজ্ঞে তা তো বটেই।"

"ভাল কথা। কাল ফুলপুকুরে আমিও যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। 'দক্ষযজ্ঞ'। তা আপনি তো বেশ ভাল পার্ট করেন মশাই!"

ভারী অবাক হয়ে মহাদেব বলে, "আমি?"

"আপনি নন?"

"তা হবে বোধ হয়।"

একটা বাগানঘেরা বাড়ির ফটকের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়েই ঘটনাটা ঘটল, পিছন থেকে কী একটা যেন তার মাথায় লাগল। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মহাদেব।

॥ ৫ ॥

সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছিল বীরু। ফটক পেরিয়ে দুলিপ্রু চালে রঘুনাথ আসছে। তার ডান কাঁধে পাট করা চাদরের মতো ঝুলে আছে একটা লোক।

হাঁ বন্ধ করতে বেশ একটু সময় লাগল বীরুর। তারপর বলল, "এসব কী হচ্ছে রঘুনাথ? কাকে কাঁধে করে নিয়ে এলে?"

"আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। নিয়ে এলাম।"

"কুড়িয়ে পেয়েছ?"

"যে আজ্ঞে। মাথায় একটু চোট হয়ে মূর্ছা গেছে।"

লোকটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে চাতালে রাখা একখানা চেয়ারে হেলিয়ে বসিয়ে দিয়ে রঘুনাথ বলে, "চোট বেশি নয়।"

লোকটার মুখ দেখে বীরু চমকে উঠে বলল, "আরে! এ তো আমাদের মহাদেব!"

"চেনেন নাকি কর্তা?"

"চিনি মানে! এ তো আমাদের রাসুখুড়ির ভাইপো। আমরা একসঙ্গে পড়েছি। খুব বন্ধু ছিল আমার! মহাদেব যাত্রা করে বেড়ায় বলে রাসুখুড়ির খুব দুঃখ ছিল। কী হয়েছে ওর?"

"মরেই যাচ্ছিলেন। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন কর্তা। শ্রীনাথ সাপুড়ে ওঁর গায়ে কেউটে সাপ ছেড়ে দিয়েছিল।"

"সে কী! কেন?"

"নববাবুর যোগসাজশ। শ্রীনাথ গরিব মানুষ। তার প্রাণের দায়ও

আছে, পেটের দায়ও আছে।"

"কিন্তু মহাদেবকে মেরে নবকুমারের কী লাভ?"

"রাসমণি যে তার বিষয়সম্পত্তি সব মহাদেবকেই দিয়ে গেছে। সেই সব সম্পত্তি জবরদখল করে নিয়েছে কর্নেলসাহেব আর নববাবুর গুন্ডারা। পাকেচক্রে মহাদেব এসে পড়ায় তারা বিপদের গন্ধ পেয়েই এ কাজ করেছে।"

বীরু দুর্বল গলায় মিনমিন করে বলে, "এটা তো খুব অন্যায়।"

"যে আজ্ঞে, আপনার বন্ধুটি এখন বেশ বিপদের মধ্যে আছেন। একে নিকেশ না করলে নববাবু নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। নবকুমারের গুন্ডারা বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকবে বলে মনে হয় না। এসে পড়ল বলে।"

বীরু তেতো গলায় বলে, "এ তো বড় ঝঞ্ঝাট হল হে!"

"যে আজ্ঞে।"

"এখন আমাদের কী করা উচিত রঘুনাথ?"

"আপনি যা বলেন। আপনি হুকুম করলে মহাদেববাবুকে ফের রাস্তাতেই ফেলে রেখে আসতে পারি।"

"সেটা করা কি উচিত হবে রঘুনাথ? শত হলেও মহাদেব আমার ছেলেবেলার বন্ধু।"

"যে আজ্ঞে।"

বীরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "এ তো বড় বিপদেই পড়া গেল। বাপু হে রঘুনাথ, তুমি মাঝে-মাঝেই আমাকে বড় মুশকিলে ফেলে দাও।"

"যে আজ্ঞে, কর্তা যদি এই লাঠিখানা একটু ধরেন তা হলে আমি লোকটার চোখেমুখে খানিক জলের ঝাপটা দিই।"

ঘোর অনামনস্কতায় হাত বাড়িয়ে লাঠিটা নিল বীরু। তারপরই হঠাৎ চমকে উঠল। লাঠিটা কি একটা ঝটকা মারল নাকি তাকে?

চোখমুখে জলের ঝাপটা খেয়ে চোখ চেয়ে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মহাদেব। ক্ষীণ গলায় বলল, "আমি কোথায়? আমার কী হয়েছে?"

বীর বাহাদুর কাছে গিয়ে ঝুঁকে বলল, "আমাকে চিনতে পারছিস মহাদেব? আমি বীরু।"

মহাদেব হাঁ করে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সোজা হয়ে বসে বলল, "তাই তো! তুই তো বীরু! তোর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম!"

তারপর চারদিকে টালুমালু চোখে চেয়ে দেখে ফের মহাদেব বলল, "এটা তো তোর বাড়ি, তাই না! আমি এখানে কী করে এলাম?"

"সে অনেক কথা। তোর কী হয়েছিল বলবি?"

মহাদেব ক্লান্তিতে চোখ বুজে রইল খানিক। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে বলল, "আমার বড় বিপদ যাচ্ছে রে ভাই। পাশের গাঁ ফুলপুকুরে কাল যাত্রা ছিল। পাবলিক খেপে গিয়ে তাড়া করায় পালিয়ে এসেছিলাম। এখানে এসেই জানলাম, পিসি নাকি বিষয়সম্পত্তি সব আমাকে দিয়ে গেছে। আর তারপরেই রাজবাড়ির কালীমন্দিরে আমার গায়ে কেউটে সাপ ছেড়ে দেওয়া হল। বরাতজোরে বেঁচে গেলেও আর একটা গুন্ডা এসে আমাকে পাকড়াও করে গাঁয়ের বাইরে বের করার নাম করে নিয়ে যেতে গিয়ে পিছন থেকে লাঠির ঘা মেরে...."

রঘুনাথ তাড়াতাড়ি মহাদেবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে গুন্ডাটা আমিই। আপনি পালানোর জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বলেই হালকা করে এক ঘা মারতে হয়েছিল। মাপ করবেন মশাই। আপনি পালিয়ে গেলে নববাবুদের যে ভারী সুবিধে হয়ে যাবে।"

মহাদেব কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "কিন্তু আমি আর এখানে থাকতে চাই না রে ভাই বীরু। শ্রীনাথ বলে গেছে। নববাবু নাকি আমাকে ছাড়বে না। তুই ভাই আমাকে গাঁয়ের বাইরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দে।"

হঠাৎ বীরুর মুখ থেকে একটা আখাম্বা গর্জন বেরিয়ে এল, "না!"

সেই গর্জনে চারপাশটা যেন চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। বীরু নিজেও হতভম্ব। তার ভিতরে যে এরকম একটা গর্জন ছিল তা সে নিজে কখনও টের পায়নি।

নিজেকে সামলে সে গলা নামিয়ে বলল, "পালাবি কেন? আমি তো জানি রাসুখুড়ি তোকে মায়ের মতোই ভালবাসত। ভালবেসেই তার সব দিয়ে গেছে তোকে। কয়েকটা পাজি লোকের ভয়ে সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যাবি?"

মহাদেব ফোঁপাতে-ফোঁপাতেই বলল, "কী করব ভাই, আমার তো সহায় সম্বল কিছু নেই। আমি কি ওদের সঙ্গে পারব?"

বীরু খুব আনমনে তার বাগানটার দিকে চেয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, "আমরা তো আছি।"

রঘুনাথ বলে, "তা হলে কী ঠিক করলেন কর্তা, বন্ধুকে কি এবাড়িতেই রেখে দেবেন?"

বীরু প্রবল অন্যমনস্কতার মধ্যে শুধু বলে, "হুঁ।"

বিকেলবেলাতেই হন্তদন্ত হয়ে বিপিনদারোগা এসে হাজির। রাগে ফুঁসছেন। "কী ব্যাপার বীরুবাবু, এসব কী হচ্ছে? আপনি জেনেশুনে একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী, একজন ফিউজিটিভ ফেরারি আসামীকে আপনার বাড়িতে শেল্টার দিয়েছেন? এটা কত বড় অপরাধ জানেন? এ তো রীতিমতো সিডিশন, রাষ্ট্রদ্রোহ। এই অপরাধে আমি আপনাকেও অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে পারি, তা জানেন? কোথায় সেই লোক? কোথায় মহাদেব সাঁতরা? এক্ষুনি তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন।"

বীরু সামনের চাতালে চেয়ারের উপর চোখ বুজে যেমন ধ্যানস্থ হয়ে বসে ছিল, তেমনি বসে রইল। জবাব দিল না।

বিপিনদারোগা আবার হুঙ্কার দিলেন, "মহাদেবের নামে তিনটে এফ আই আর হয়েছে, তার খবর রাখেন? গতকাল রাতে সে ফুলপুকুরে দু'জনকে ঘায়েল করে এসেছে। সে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরে। এই গাঁয়েও ব্রজমাধব রায় আর রাসমণি রায়ের বাড়ি জোর করে দখল করার হুকও সে করেছিল। অথচ ওইসব সম্পত্তি ভেস্ট হয়ে যাওয়ার পর সব আইনকানুন মেনেই কর্নেলসাহেব লিজ় নিয়েছেন। এটা তো আর মগের মুলুক নয় যে, উটকো একটা লোক এসে অন্যের উপর হামলা চালাবে। তার উপর সে শ্রীনাথ সাপুড়েকেও আজ দুপুরে অকারণে মারধর করেছে।"

বীরু তবু নির্বিকার। যেমন চোখ বুজে ছিল তেমনি রইল।

বিপিনদারোগা এবার হুঙ্কার দিলেন, "ও মশাই, কথাগুলো কি কানে যাচ্ছে না নাকি? এর পর কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে লোকের সামনে দিয়ে হিড়হিড় করে থানায় টেনে নিয়ে যেতে হবে।"

বীরুর কোনও হেলদোল দেখা গেল না।

বিপিনদারোগা তার সেপাইদের হুকুম দিলেন, "তোমরা ভিতরে ঢুকে আগে মহাদেব সাঁতরাকে ধরে নিয়ে এসো। দু'জনকে একসঙ্গেই নিয়ে যেতে হব।"

এবার বীরুর মুখ থেকে একটা চাপা ধমক বেরিয়ে এল, "দাঁড়ান।"

বলে চেয়ার ছেড়ে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল বীরু। বিপিনদারোগার মনে হল, একটা বিশাল সাপ যেন শরীরের পাক খুলে ফণা তুলছে। আর তুলছে তো তুলছেই। বীরবাহাদুর সিংহ লম্বা, চওড়া লোক বটে, কিন্তু বিপিনবাবুর মনে হল, লোকটা আজ যেন আরও বিঘতখানেক লম্বা হয়ে গিয়েছে। আর চোখ! বাপরে, সেই গোরুর মতো নিরীহ চোখজোড়া তো আর চেনা যাচ্ছে না। পড়ন্তবেলার আলোয় এর চোখদু'খানা এমন ধকধক করে উঠল যে, বিপিনদারোগা নিজের অজান্তেই দু'পা পিছু হটে গিয়ে বললেন, "আহা, আপনাকে অ্যারেস্ট করার কথাটা কথার কথা। ওটা অত সিরিয়াসলি নেবেন না।"

বীরু একটাও কথা বলল না, শুধু তার চোখদুটো অঙ্গারের মতো জ্বলতে লাগল।

বিপিনদারোগা আর তার সেপাইরা আরও কয়েক কদম পিছিয়ে গেল।

বিপিনবাবু ফ্যাসিফ্যাসে গলায় বললেন, ''বুঝতেই তো পারছেন, সরকারি কাজ করতেই আসা। আমাদের আবার দোষ ধরবেন না কিন্তু। ঠিক আছে, আপনি না চাইলে আমরা না হয় আপনার বাড়িতে না ঢুকলুম।''

বেলা মরে গিয়ে একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব ঘনিয়ে এল চারদিকে। আর সেই আবছায়ায় বীরুর চোখদুটো আরও জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল।

সেপাইরা ফটক পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছে। বিপিনদারোগাও প্রায় কাছাকাছি। দূর থেকেই বললেন, ''আচ্ছা, আজ তা হলে আসি। আপনার বন্ধুটিকে একটু সাবধান হতে বলবেন। আমাদের তো শুধু কর্তব্যটুকু করতে আসা বই তো নয়। কিছু মনে করবেন না যেন।''

বর্ষাকাল শেষ হয়ে এসেছে। গরম নেই। বরং একটু শীত-শীত ভাব। তবু বিপিনবাবু গলগল করে ঘামছেন। রুমালে টাক, কপাল, মুখ মুছতে-মুছতে থানায় নিজের চেয়ারে বসে সেপাইদের দিকে চেয়ে বললেন, ''ব্যাপারটা কী হল বলতো? কিছু বুঝতে পারলি?''

সেপাইদেরও কেমন যেন হতভম্ব ভাব। তারা প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, ''আজ্ঞে না বড়বাবু।''

''তা হলে আমরা চলে এলুম কেন?''

সেপাইরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কেউ জবাব দিতে সাহস পেল না। সেপাই রামতারণ বয়স্ক লোক। সে বলল, ''আপনি তো ভয় পেয়ে গেলেন স্যার।''

বিপিনবাবু জ্ঞ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলেন, ''ভয়! আমি! বলিস কী?''

রামতারণ আমতা-আমতা করে বলে, ''আজ্ঞে না স্যার, ঠিক ভয়ও নয়। তবে অনেকটা ওরকমই কিছু।''

''আসলে কী জানিস, আমার হঠাৎ কেমন একটা দয়া, একটা দয়া, একটা করুণার ভাব এসে গিয়েছিল।''

সনাতন বলে উঠল, ''আমারও তাই মনে হল বড়বাবু। আপনার চোখ বেশ ছলছল করছিল।''

বিপিনবাবু একটা বড় এবং ঝোড়ো শ্বাস ফেলে বললেন, ''নিজেকে নিয়ে আমার ওইটেই মুশকিল। এমনিতে আমি দাপুটে, ডাকসাইটে লোক বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে হঠাৎ করে মানুষের দুঃখ-কষ্টে মনটা বড় নরম হয়ে পড়ে।''

রামতারণ জানতে চাইল, ''তা হলে কি বীরুবাবু আর মহাদেব সাঁতরাকে অ্যারেস্ট করা হবে না স্যার?''

বিপিনবাবু একটু ভাবিত হয়ে বললেন, ''তা হবে না কেন? আমার মনের ভিজে ভাবটা কমে গেলেই দু'জনকে বেঁধে নিয়ে আসব। অন্যায় আর অরাজকতা তো চলতে দেওয়া যায় না।''

সেপাইরা সবাই কথাটা স্বীকার করে নিল, ''তা তো ঠিকই।''

শুধু রামতারণ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, ''ভেজা ভাবটা কবে নাগাদ শুকোতে পারে স্যার।''

''শুকোবে রে শুকোবে। এখন যে যার কাজে যা তো। আমাকে একটু একা থাকতে দে।''

সেপাইরা বিদেয় হলে বিপিনবাবু সিংহর মতো পদচারণা করতে-করতে আপনমনেই স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, ''না, এবার ব্যায়ামটায়াম শুরু করতে হবে দেখছি। সকালে উঠে মাইলটাক দৌড়, ডাম্বেল, বারবেল, প্রাণায়াম আর যোগ, ক্যারাটে, কপালভাতি, সূর্যপ্রণাম...''

''বড়বাবু কি পার্ট মুখস্থ করছেন? যাত্রায় নামছেন নাকি?''

বিপিনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ''কে রে?''

দরজার আড়াল থেকে একটা রোগা মুখ বেরিয়ে এল, ''আজ্ঞে

বড়বাবু, আমি গুটে।"

"কী চাস?"

"একটা খবর আছে বড়বাবু।"

"খবর, কিসের খবর?"

"সেইটে বলতেই আসা। আজ সকালে বাজারে গিয়েছিলুম নাতনির জন্য একটু কুচো চিংড়ি খুঁজতে। বড্ড ভালবাসে কিনা। যত আবদার সব আমার কাছে। তা সকালের দিকে বাজারে ঘোঁতনার দোকানের এক ভাঁড় দুধ চা না খেলে আমার চলে না। চা-টা করেও বড় ভাল।"

বিপিনদারোগা ধমকে উঠে বলেন, "এগুলো কি খবর নাকি? কুচো চিংড়ি, ঘোঁতনার চা?"

"আজ্ঞে না বড়বাবু। এই বলছি আর কী? তা চা-টা খেয়ে নিয়ে বেরতে গিয়ে দেখি, উলটো দিকের বটতলায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। খুব কেতার মানুষ মশাই। গায়ে যি রঙা একখানা মারকাটারি পাঞ্জাবি, তাতে সোনার বোতাম। পরনে চুস্ত পায়জামা, পায়ে লপেটা চটি, হাতে আংটি। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা মশাই। দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। গাঁয়ে নতুন দেখে একটু এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে বললুম, তা ইদিকে কোথায় এসেছেন মশাই? বাবুভাইদের অনেককেই দেখেছি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন না। তা ইনি দেখলাম সেরকম নন। ভারী মিষ্টি হেসে বললেন, 'আমি তো এখানকারই লোক। মাঝখানে কিছুদিন ছিলাম না বটে, তবে এখন এসে পড়েছি।' বুঝলেন বড়বাবু, আমারও কেমন যেন মুখটা চেনা-চেনা লাগছিল। পষ্ট করে কিছু মনে মনে পড়ল না অবশ্য। তা বাবুটি রাগ করলেন না দেখে আমি ফস করে বলে বসলুম, 'বাবুর সিগারেটের গন্ধটা বড্ড ভাল ছেড়েছে তো, তখন বাবুটি ফের হেসে বললেন, 'কেন, তুমি একটা খাবে?' বলে পকেট থেকে বিলিতি সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে তা থেকে একটা আমাকে দিলেন। এমনকী আদর করে নিজেই লাইটার ধরিয়েও দিলেন। বড় ভাল সিগারেট মশাই।"

বিপিনদারোগা একটা শ্বাস ফেলে বলেন, "কুচো চিংড়ি গেল, দুধ-চা গেল, এখন কি সিগারেটে আটকে রইলি?"

"আজ্ঞে আগাপাশতলা না বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না কিনা, তাই বলছি। তা বাবুটির কাছ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে দু'-চারটে কথা কইব বলে ভেবেছিলুম মশাই। তা তখনই দুম করে একটা বেশ বড় ঝাঁ চকচকে গাড়ি এসে সামনে দাঁড়াল। আর বাবু আমার দিকে চেয়ে 'চলি হে' বলেই তাতে উঠে পড়লেন। গাড়িটা ফের হুশ করে চলে গেল।"

"এটাই খবর তো?"

"আজ্ঞে না মশাই, এর পরেই খবর।"

"তা হলে বলে ফ্যাল।"

"এই বলছি। তা বাবুটি চলে যাওয়ার পর গাছতলায় দাঁড়িয়ে আরাম করে সিগারেটটা ফুঁকছিলাম, এমন সময় চার-পাঁচটা ষণ্ডামার্কা লোক এসে আমাকে ঘিরে ফেলল। একটা তেড়িয়া চেহারার লোক আমার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তোর সাহস তো কম নয়। সাহেব তোর ইয়ার না বন্ধু যে, সিগারেট চেয়ে খেলি? এত বড় আস্পদ্দা হয় কোত্থেকে রে?' ঝাঁকুনির চোটে হাত থেকে দামি সিগারেটটা পড়ে ররবাদ। কী অন্যায় বলুন দিকি মশাই, তখনও অর্ধেকটারও বেশি বাকি ছিল।"

"সত্যিই তো! ভারী অন্যায়! এখন দয়া করে বাকি ঘটনা উগরে দিয়ে কেটে পড় তো!"

"যে আজ্ঞে। তা ষণ্ডাগুলো ভারী বেয়াদব মশাই। ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। আমি যতই বলি, 'ওরে ছেড়ে দে রে, আমি বুড়ো মানুষ। ঘাড়টা ভেঙে যাবে।' তা কে শোনে কার কথা, হেঁচড়েছিচড়ে ধাক্কা দিতে-দিতে সেই মালোপাড়া পর্যন্ত নিয়ে গেল মশাই। সোজা কোথায় নিয়ে তুলল জানেন! ব্রজমাধব রায়ের বাড়িতে। তারপর বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে তবে পৈতৃক ঘাড়খানা তাদের হাত থেকে রেহাই পেল। কিন্তু মশাই, সেখানে যা দেখলুম তাতে আমার চোখ চড়কগাছ। ব্রজকর্তার পুরনো বাড়ি আর চেনার জো নেই। দেয়ালে নতুন রং, নানা কেতার সব ফার্নিচার, দারুণ জম্পেশ একখানা বাড়লণ্ঠন, আরও কত কী। আর সেখানেই দেখি সেই বাবু মানুষটি ঘর আলো করে গা এলিয়ে সোফার উপর বসে আছেন। পাশেই গ্যালগ্যালে মুখে নবকুমারবাবু দাঁড়িয়ে। সঙ্গে আরও মেলা লোকজন।"

বিপিনবাবু উঠে বলেন, "বলিস কী! কর্নেলসাহেব নন তো!"

"তবে আর বলছি কী বড়বাবু! যেই তেড়িয়া চেহারার লোকটা আমাকে ঘাড় ধরে তাঁর সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে কর্নেলসাহেব, বেয়ারপটাকে ধরে এনেছি,'"

উত্তেজিত বিপিনবাবু বলেন, "তারপর?"

"আজ্ঞে, আমি তখন ঘাড়ে হাত বোলাচ্ছি। কর্নেলসাহেব ভারী মিষ্টি হেসে বললেন, 'তোমার নাম ঘটেশ্বর সাধু না?' আমি তো তাজ্জব। কী বলব মশাই পিতৃদত্ত নামটা আমি নিজে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলুম। আমি হাঁ করে থেকে বললাম, 'আজ্ঞে, এ নাম আপনি জানলেন কী করে?' উনি সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, 'শোনো গুটে, তুমি যে চোর তাও আমি জানি। তবে চোরছ্যাঁচড়দের আমি অপছন্দ করি না। তাদের দিয়ে অনেক কাজ হয়। তাদা এলাকার সব খবর আর অন্ধিসন্ধি জানে। তুমি যদি আমার হয়ে কাজ করো, তা হলে এই বুড়ো বয়সে তোমাকে আর ব্লোজগারের ভাবনা ভাবতে হবে না,"

বিপিনবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলিস কি? তুই তো দেখছি, কর্নেলসাহেবের নজরে পড়ে গিয়েছিস। তোর তো কপাল খুলে গেল রে গুটে!"

"যে আজ্ঞে। তা আমি বললুম, 'সে তো ভাল কথা কর্নেলসাহেব, তা কী কাজটাজ করতে হবে বলুন।' তখন সাহেব ফের তার একটা দামি সিগারেট ধরালেন। এবার অবশ্য আমাকে দিলেন না। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এই জায়গা নিয়ে আমার একটা স্বপ্ন আছে, বুঝলে! বিদেশরপুরের ভোল আমি পালটে দেব, কিছু বেয়াদব লোকের জন্য হচ্ছে না। আমি তাদের গতিবিধি আর মতলবের খবর চাই।'"

বিপিনবাবু গদগদ হয়ে বললেন, "বাহ বাহ, এ তো একেবারে তোর মনের মতো কাজ! তা বন্দোবস্ত কীরকম হল রে?"

"আজ্ঞে, দুশো টাকা আগাম দিয়েছেন। সঙ্গে এও বলে দিয়েছেন যে, ভুলভাল খবর দিলে বা বেইমানি করলে কেটে ফেলবেন।"

"ওরকম একজন মনিব পেয়ে তো বর্তে গেছিস রে! এরকম শাঁসালো লোককে হাতছাড়া করিস না বাপু। লেগে থাকিস," তারপর গুটের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "শাবাশ। এখন যা নাতনির জন্য মিষ্টিটিস্টি বা খেলনা কিনে নিয়ে বাড়ি যা। তোর হিল্লে হয়ে গেল।"

গুটে একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "কথাটা এখনও শেষ হয়নি কিন্তু বড়বাবু। বাকিটা কি শুনবেন?"

ভ্রূ কুঁচকে বিপিনবাবু বললেন, "আবার বাকিও আছে নাকি?"

"আছে।"

"তা হলে বলে ফ্যাল।"

"আপনি নোয়াপাড়ার নিবারণের ফুলুরি খেয়েছেন কখনও?"

বিপিনবাবু হাঁ। খানিক বাতাস গিলে বলেন, "ফুলুরি! হঠাৎ ফুলুরির কথা কেন?"

"অমন ফুরফুরে, হালকা আর খাস্তা ফুলুরি আর কোথাও হয় না কিনা।"

"আমাদের এখন ফুলুরির বৃত্তান্তের কী দরকার?"

"আজ্ঞে, আজ কর্নেলসাহেবের কাছ থেকে টাকা পেয়ে নিবারণের দোকানে গিয়ে যখন শালপাতার ঠোঙায় কয়েকখানা গরম ফুলুরি নিয়ে বসেছি তখনই পট করে মনে পড়ে গেল কিনা!"

"কী মনে পড়ল?"

"এই কর্নেলসাহেব লোকটাকে কোথায় দেখেছি। এত চেনা-চেনা লাগছে কেন! কথাটা হল, ওই নিবারণের ফুলুরির দোকানেই একবার অনেকদিন আগে, ঘ্যাচা আমার গেঁজে থেকে তিনশো টাকা কেড়েকুড়ে নিয়েছিল। তাই ফুলুরির দোকানে গিয়ে বসতেই মনে পড়ে গেল।"

"ঘ্যাচাটা কে রে?"

"আজ্ঞে, ঘ্যাচাই হচ্ছে কর্নেলসাহেব। তার আসল নাম অঘোরনাথ।"

"দূর-দূর আহাম্মক কোথাকার! কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস। তোর তো বোধ হয় সত্তর বছর বয়স হল। চোখে ছানিটানি পড়েছে বোধ হয়। আর ভীমরতি তো এই বয়সে হয় বলে শুনেছি।"

"আজ্ঞে না বড়বাবু, আমি চোখেও কম দেখি না। স্মরণশক্তিও বেশ টনটনে আছে। ঘ্যাচা তখন জং বাহাদুর সিংহর দলের লোক ছিল। দলে বেশ খাতিরও হয়েছিল ঘ্যাচার। ভাল প্যাচপয়জার জানত। বন্দুক-পিস্তলে অব্যর্থ টিপ, ডাকাবুকো। জং বাহাদুর সিংহ ভালওবাসত খুব। আমিও তখন তাঁর শাগরেদি করি কিনা, তাই জানি।"

"তোর মাথাটাই গেছে দেখছি! কোথায় কর্নেলসাহেব আর কোথাকার কে ঘ্যাচা! আর লোক হাসাস না বাপু। বাড়ি যা। এসব পাঁচকান করিস না যেন।"

"আপনার যখন বিশ্বাস হচ্ছে না, তখন না হয় না বললাম। তবে কিনা শুনলেও কিছু খারাপ হত না।"

"শুনছি। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি। বিশ্বাস করার জন্য চাপাচাপি করিসনি। বিশ্বাস করার অসুবিধে আছে।"

"ঘ্যাচা সবসময়েই বলত, ওর নাকি খুব টাকার দরকার। মেলা টাকা। দেশের গাঁয়ে গিয়ে ও নাকি চারতলা বাড়ি করবে। সিনেমা হল বানাবে। ব্যায়ামাগার তৈরি করবে। ওর গাঁয়ে কে একজন চারু গায়েন নামে পয়সাওয়ালা লোক আছে তার সঙ্গে পাল্লা দেবে বলে রোখ চেপেছিল খুব। সব আমার মনে আছে বড়বাবু। কিছু ভুলিনি। ঘ্যাচা লোভে পড়ে জংবাহাদুর সিংহর তবিল থেকে একদিন টাকা সরাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় ঘনারামের হাতে। ঘনারাম আর বংশীবদন মিলে খুব ধোলাই দিয়েছিল ঘ্যাচাকে। এর কয়েকদিন পরেই ঘ্যাচা এমন একটা কাণ্ড করল যা করতে বুকের পাটা লাগে মশাই। সে জংবাহাদুরের ফুটফুটে দেড় বছরের নাতি বীর বাহাদুরকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে চিঠি দিল জংবাহাদুরকে। আদরের নাতি চুরি হয়ে যাওয়ায় জং বাহাদুর খ্যাপা বাঘ হয়ে গিয়েছিল মশাই। কিন্তু কাজটা বড্ড কাঁচা করে ফেলেছিল ঘ্যাচা। জং বাহাদুর সিংহর জাল বহু দূর ছড়ানো। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি সোজা কথা! তিনদিন বাদে নাতি উদ্ধার হয়ে গেল, ঘ্যাচাকে নিয়ে আসা হল পিছমোড়া করে বেঁধে। কর্তাবাবু তাকে প্রথমটায় জুতোপেটা করলেন। তারপর বাজারের চৌপট্টিতে থামের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হল। লোকজন যেতে আসতে তাকে চড়টা চাপড়টা মেরে যেত।"

"এ তো ঘোর অরাজকতা রে! আমি তখন থাকলে..."

"ভাগ্যিস আপনি ছিলেন না!"

"তারপর কী হল বল। আমি কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করছি না।"

"তাতেও হবে। শুধু শুনে গেলেই হয়। দু'দিন ধরে ওই হেনস্থার পর কর্তাবাবু তাকে দয়া করে ছেড়ে দেন। তার দু'-চারজন পেয়ারের বন্ধুবান্ধব ছিল। তার মধ্যে আমিও ছিলুম। আমাদের কাছে সে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিল, 'যদি বাপের ব্যাটা হই তা হলে একদিন আমি ফিরে এসে জং বাহাদুরকে নির্বংশ করে ছাড়ব। আর এই বিদেশরপুরে তখন রাজত্ব করব আমি।'"

বিপিনবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এ তো ঘ্যাচার বৃত্তান্ত। এ তো আর কর্নেলসাহেবের গল্প নয় রে।"

"তবু বলি বড়বাবু, একটু সাবধান হওয়া ভাল। বীর বাহাদুরের কিন্তু বিপদ হতে পারে।"

"সে তো যে-কোনও মানুষেরই যে-কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। তা বলে তো আগাম কিছু করার উপায় নেই রে। ওসব চিন্তা করে খামোকা অস্থির হোস না তো! কর্নেলসাহেব যদি ঘ্যাচা হয় তবে পুন্নিমেও অমাবস্যা। বুঝলি! আর মনে রাখিস এখন উনি তোর অন্নদাতা। বেইমানি করলে কী ভাল হবে?"

"সেটাই তো চিন্তার কথা বড়বাবু! বুড়ো বয়সে এ কী বিপদ বলুন তো!"

"বিপদ! কীসের বিপদ? কার বিপদ? আরে, আমি আছি কী করতে? তার উপর তুই এখন কর্নেলসাহেবের দলের লোক। তোকে তো এখন গাঁয়ের একজন কেষ্টবিষ্টুই বলা যায়। যা, বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোগে যা। আমাকে আবার এখুনি বেরতে হবে। কর্নেলসাহেবের সঙ্গে এই প্রথম দেখা করতে যাচ্ছি, একটু ফল-মিষ্টি না নিয়ে গেলে কি ভাল দেখায়?"

"যে আজ্ঞে," বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল গুটে। তারপর চাপা গলায় বলল, "আর-একটা কথা বড়বাবু!"

বিরক্ত হয়ে বিপিনবাবু বললেন, "আবার কথা! তোর কি কথা আজ আর শেষ হবে না?"

বেশি সময় লাগবে না বড়বাবু। প্রায় পঁচিশ বছর আগে বীরবাহাদুরের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। তাতে বীরুর মা-বাবা খুন হয়ে যায়। মামাবাড়িতে ছিল বলে বীরু বেঁচে গিয়েছিল। লোকে জানে ডাকাতের হাতে তার মা-বাবা খুন হয়ে গেছে। আমি সাক্ষী আছি বড়বাবু, খুনটা কিন্তু করেছিল ঘ্যাচা।"

"উহু, বাপু রে, আজ তোকে দেখছি ঘ্যাচায় পেয়েছে! ঘ্যাচা খুন করেছে তো আমরা কী করতে পারি বল।"

"কথাটা জানানোর ছিল বলে জানিয়ে গেলাম। কাল সকালে যদি আমার লাশ পাওয়া যায়, অবাক হবেন না। আমি সত্যিই আজ বড্ড বেশি কথা কয়ে ফেলেছি।"

॥ ৬ ॥

অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাত গভীর হতে চলল। বীরু চুপ করে তার বাইরের চাতালে ঝুম হয়ে বসে আছে। নড়াচড়া নেই। সে অবিরল তার চারপাশে একটা চাপা ফিসফাস শুনতে পাচ্ছে। কথা আর কথা। যেন বাতাসে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর। পরস্পর কথা কয়ে চলেছে অবিরল। কথা আর কথা। কথার সঙ্গে কথার কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে। কথার গা বেয়ে উঠে আসছে কথা। কথায়-কথায় ঘুড়ির প্যাঁচ খেলে যাচ্ছে। শোনা যায়, কিন্তু কিছু বোঝা যায় না। মানুষ আবহমানকাল ধরে যত কথা বলে এসেছে সেগুলোই যেন আবহে রয়ে গিয়েছে আজও। কে বলছে, কাকে বলছে, কী বলছে বোঝা যায় না।

বীরু চুপ করে, চোখ বুজে কথাগুলো ধরার চেষ্টা করছে।

"বীরুকর্তা!"

"কে?"

"আমি গুটে, ঘটেশ্বর সাধু।"

"বলুন।"

"একটা কথা বলে যেতে এলুম। আর হয়তো সময় পাব না।"

"কী কথা?"

"আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন। সাবধান!"

"জানি! আর কিছু বলবেন?"

"আপনার মা-বাবাকে..."

"তাও জানি।"

"তা হলে কর্তা আসি গিয়ে? আপনি বরং ঘরে দোর দিয়ে দিন।"

"ভয় নেই।"

লোকটা চলে গেলে ফের ঝুম হয়ে বাতাসের ফিসফাস শুনতে

লাগল বীরু।

বাড়ি ফেরার পথে বউড়ুবির জলার ধারটায় নির্জনে চার-পাঁচজন এসে নিঃশব্দে ঘিরে ধরল গুটিকে।

"বড্ড বেশি কথা বলে ফেলেছিস রে নিমকাহারাম।"

গুটের গলা কাঁপল না, তেমন ভয়ও হল না, বলল, "কথাগুলো কাউকে বলার ছিল যে! নইলে বড্ড আঁকুপাঁকু হচ্ছিল ভিতরে। অনেককাল চেপে চেপে রেখেছিলুম তো! আজ খালাস করে দিয়েছি। বড় আরাম লাগছে হে!"

"তাই নাকি?"

অন্ধকারেও একটা হেঁসো ঝিকিয়ে উঠতে দেখতে পেল গুটো।

কিন্তু তারপরেও দিব্যি বেঁচে রইল গুটো। কারণ একটা ঝড়ের মতো কিছু বয়ে গেল চারধারে। লোকগুলো কোথায় যে ছিটকে পড়ল কে জানে।

গুটে ফের গুটিগুটি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। তার বড় খিদে পেয়েছে। কে জানে নাতনিটা এত রাত পর্যন্ত তার জন্যই জেগে বসে আছে কিনা। বড্ড মায়া।

অন্ধকারে যেমন বসেছিল বীরু, তেমনই বসে আছে। কেউ একজন পাশে এসে দাঁড়াল, "কাজ হয়ে গেছে ওস্তাদ। ঘন্টেশ্বর সাধু বেঁচে আছে।"

"রঘুনাথ!"

"যে আজ্ঞে।"

"ও লাঠিটা কার? যখন দুপুরে লাঠিটা আমার হাতে দিয়েছিলে তখন শরীরে একটা ঝটকা লেগেছিল।"

"কী যে বলেন ওস্তাদ! লাঠিতে কি করেন্ট থাকে?"

"লাঠিটা কার?"

"আপনার ঠাকুরদা জং বাহাদুর সিংহর।"

"হুঁ।"

"এবার বেরলে হয় কর্তা। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।"

চারদিকে একটা তুমুল ফিসফাস উঠল। হাওয়া বয়ে যায় মর্মরধ্বনি করে। আবহে অদৃশ্য মানুষের ছাপ। প্রচ্ছন্ন অবয়ব সব। আবছায়া। আছে কী নেই। যারা আর নেই, তাঁদেরই যেন ছাঁচ তুলে রাখা আছে চারদিকে। তারাই? নাকি, মনের ভুল। কিন্তু বাতাসে একটা প্ররোচনা আছে। কারা যেন বলতে চাইছে, "চলো-চলো।"

ফটকের পাশে টুলের উপর বসে ঘুমে ঢুলছিল শিবু। অভ্যাসবশে হাতে ধরা বন্দুক। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছিল, এক বুক তেষ্টা নিয়ে সে একটা মস্ত শাল জঙ্গল পেরোচ্ছে। হঠাৎ গভীর জঙ্গলের ভিতর একটা টলমলে পুকুর দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি জলের ধারে নেমে আঁজলা করে জল খেতে যাবে, দেখতে পেল, পুকুরের উলটো দিকে একটা কেঁদো বাঘও জল খেতে নেমেছে। শিবু আঁতকে উঠল। তড়িঘড়ি পালাতে যাচ্ছিল, কে যেন পিছন থেকে বলল, "পালাচ্ছিস কেন? জলে ভাল করে তোর ছায়া দেখ তো? তুইও তো বাঘ।"

চটকা ভেঙে সোজা হয়ে শিবু দেখে, ফটকটার ওপাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। শাল গাছের মতো সটান চেহারার লম্বা একটা লোক। তার চোখে চোখ রেখে গমগমে গলায় বলল, "ফটকটা খুলে দাও।"

শিবুর মনে হল, এ আদেশ লঙ্ঘনীয় নয়। সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খুলে ফটকটা ফাঁক করে দিল।

যে লোকটা বারান্দায় বসে ছিল তার নাম মহেন্দ্র। তার বন্দুকটা হাতের নাগালেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। সে ঘুমোয়নি। খবর এসেছে গাঁয়ের বাড়িতে তার ছোট ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছে। বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। টাইফয়েড খুব পাজি রোগ নয় তো! সামনেই হঠাৎ আখাম্বা লম্বা লোকটাকে দেখে সে বন্দুকের জন্য হাত বাড়িয়েও হাত সরিয়ে নিল। তার মন তাকে বলল, একে অভিবাদন জানানো উচিত। কেন মনে হল, সে বুঝতে পারল না। তবে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল।

বৈঠকখানায় বন্ধ দরজার ওপাশে মেঝেয় মাদুর পেতে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল কানাই। কে যেন তাকে খোঁচা দিয়ে জানিয়ে বলল, "ওরে ওঠ, দরজা খুলে দে! তিনি এসে গেছেন যে!" কানাই ধড়ফড় করে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বলল, "যে আজ্ঞে।"

দোতলার শোয়ার ঘরে খাটে শুয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিল কর্নেলসাহেব। একটা ঘরে অনেকগুলো চেয়ার উলটো পালটা করে রাখা। বেরনোর উপায় নেই। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ঘরে একটা গোখরো সাপ লিকলিক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে ছেড়ে দিয়ে গেল সাপটা? কর্নেল প্রাণভয়ে দৌড়য়। তার শরীরের ধাক্কায় একের পর-এক পড়ে যাচ্ছে চেয়ার। সাপটা চেয়ারের ফাঁকফোকর দিয়ে আঁকাবাঁকা তেড়ে আসছে। চেয়ারে হোঁচট খেয়ে বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। ফের তড়িঘড়ি উঠে ছুটছে। সে চিৎকার করে বলছে, "আর কতক্ষণ চলবে এ খেলা?"

কে যেন মন্দ্র গলায় বলল, "এ খেলা অন্তহীন। দৌড়ও, দৌড়ও, দৌড়তে থাকো থেমো না।"

দূরের পুঞ্জীভূত মেঘ থেকে কেমন গুরু গুরু শব্দ হয় তেমনই এক ধ্বনিতে কে যেন ডাকল, "অঘোরনাথ!"

কর্নেলসাহেব ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠে বালিশের পাশে রাখা পিস্তলটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "কে?"

কেউ জবাব দিল না।

কর্নেলসাহেব হাঁ করে সামনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে চেয়ে হঠাৎ ককিয়ে উঠল, "আঁ আঁ আঁ আঁ," তারপর বলল "কর্তাবাবু! কর্তাবাবু জং বাহাদুর সিংহ!"

শালপ্রাংশু মহাভুজ লোকটা শুধু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

কাঁপতে-কাঁপতে খাট থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসল কর্নেলসাহেব। হাতজোড় করে বলল, "কর্তাবাবু, আর-একবার আর মাত্র একবার আমাকে বাঁচতে দিন!"

"কী শর্তে অঘোরনাথ?"

"চিরদিনের মতো বিদেয় হয়ে যাব। আর কখনও আপনার রাজত্বে আসব না।"

"এখনই! এই দণ্ডে!"

"তাই হবে কর্তাবাবু, তাই হবে।"

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

মিলিয়ন ডলার ধাঁধা

প্রশ্ন সহজ, উত্তর কঠিন। গণিতে এমন উদাহরণ ভূরি-ভূরি।

পথিক গুহ

প্রশ্ন করা সহজ। উত্তর দেওয়া কঠিন। গণিতে এর উদাহরণ যে কত, তা বলে শেষ করা যাবে না। অনেক নমুনার মধ্যে একটা পেশ করছি, তা হলে বুঝবে ব্যাপারটা। জোড় সংখ্যা কেন দুটো মৌলিক সংখ্যার যোগফল? মৌলিক সংখ্যা হল সে সব সংখ্যা, যাদের কোনও উৎপাদক নেই। মানে, অন্য কোনও সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য নয়। যেমন ২, ৩, ৫, ৭, ১১...ইত্যাদি। ৪, ৬, ৮, ৯, ১০... এসব মৌলিক সংখ্যা নয়। কারণ, ৪= ২×২, ৬= ২×৩, ৮= ২×২×২, ১০= ২×৫। আবার ৪= ২+২, ৬=৩+৩, ৮= ৩+৫, ১০= ৩+৭= ৫+৫। দেখা যাচ্ছে, জোড় সংখ্যা দুটো মৌলিকের সমষ্টি। সব জোড় সংখ্যা কি এমন দুটো মৌলিক সংখ্যার যোগফল? সংখ্যার তো শেষ নেই। তারা অগুণতি। বড়, আরও বড়। তার চেয়েও বড়। তো তাদের সবাই কি দুটো মৌলিক সংখ্যার সমষ্টি? অগুণতি সংখ্যার ভিড়ে এমন একটাও কি মিলবে না, যা ওরকম দুটো মৌলিকের যোগফল নয়? কেন জোড় সংখ্যাকে দুটো মৌলিকের সমষ্টি হতেই হয়? প্রশ্নগুলো সহজ। উত্তর কঠিন। এমন কঠিন যে, আজ পর্যন্ত দিতে পারেননি কেউ। গণিতে এমন উদাহরণ ভূরি-ভূরি।

এরকম আর-একটা উদাহরণ এখন বলব। ধরো, কোনও বড় কোম্পানির একজন মার্কেটিং ম্যানেজার। তাকে চাকরির প্রয়োজনে ঘুরে বেড়াতে হয় এ-শহর সে-শহর। কোম্পানির প্রোডাক্ট কোথায় কত বিক্রি হচ্ছে, তার খোঁজ নিতে। কোথাও বিক্রি কমে গেলে, তা কীভাবে বাড়ানো যায়, তা দেখতে। এরকম একজন মার্কেটিং ম্যানেজারের দায়িত্ব পড়েছে তাঁকে ভিজিট করতে হবে তিনটে শহরে। কলকাতা (ক), দিল্লি (দি) এবং মুম্বই (মু)। শুধু তাই নয়, যে শহর থেকে যাত্রা শুরু করবে সে, তাকে ফিরে আসতে হবে সেই শহরেই। প্লেনভাড়া কোম্পানি দেবে। তাই কোম্পানি বলেছে, রুট ম্যাপ এমন বানাও, যাতে ওই ভাড়া বাবদ কোম্পানির খরচ হয় সবচেয়ে কম। গন্তব্য দূরে হলে বিমানভাড়া বাড়ে। তাই মার্কেটিং ম্যানেজারকে ভাবতে হবে কোন রুটে যাতায়াত করলে পথের দৈর্ঘ্য হবে সবচেয়ে কম। তিন শহরের মধ্যেকার দূরত্ব (কিলোমিটারে) এরকম,

	কলকাতা (ক)	মুম্বই (মু)	দিল্লি (দি)
কলকাতা (ক)	০	১৬৫৪	১৩০৫
মুম্বই (মু)	১৬৫৪	০	১১৫১
দিল্লি (দি)	১৩০৫	১১৫১	০

মার্কেটিং ম্যানেজার দেখল তাঁর রুট হতে পারে ছ'রকম।
ক-মু-দি-ক
মু-দি-ক-মু
দি-ক-মু-দি
ক-দি-মু-ক
মু-ক-দি-মু
দি-মু-ক-দি

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, ছ'টার মধ্যে তিনটে রুট দু'বার করে হিসেবে এসেছে। প্রথম এবং চতুর্থ, দ্বিতীয় এবং পঞ্চম তৃতীয় এবং ষষ্ঠ রুট আসলে এক। তা হলে, সম্ভাব্য রুট দাঁড়াচ্ছে তিন।
ক-মু-দি-ক
মু-দি-ক-মু
দি-ক-মু-দি

এই তিনটের মধ্যে কোন রুট দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে কম? দূরত্ব থেকে হিসেব করলে দেখা যাবে-

ক-মু-দি-ক = ৪১১০ কিলোমিটার
মু-দি-ক-মু = ৪১১০ কিলোমিটার
দি-ক-মু-দি = ৪১১০ কিলোমিটার

অর্থাৎ, তিনটে রুটই সমান দৈর্ঘ্যের। তা তো হবেই! তিনটে শহর যে একটা ত্রিভুজের তিনটে কৌণিক বিন্দু। ওই তিনটের যে বিন্দু থেকেই মাপা শুরু হোক না কেন, ত্রিভুজের পরিসীমা তো এক হবেই! তাই তিনটে শহর ভিজিট করতে হলে মার্কেটিং ম্যানেজারকে ঝামেলায় পড়তে হবে না। তাঁর রুটের দৈর্ঘ্য সব সময় সমান হবে।
কিন্তু, যদি তাকে তিনটের বদলে চারটে শহর ভিজিট করতে হয়। ধরা যাক, চতুর্থ শহরটা হল চেন্নাই (চে) এবং

ক-দি-মু-চে-ক
ক-দি-চে-মু-ক
মু-ক-দি-চে-মু
মু-দি-ক-চে-মু
মু-ক-চে-দি-মু
দি-ক-মু-চে-দি
দি-মু-ক-চে-দি
দি-মু-চে-ক-দি
চে-দি-ক-মু-চে
চে-ক-দি-মু-চে
চে-দি-মু-ক-চে

এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট রুট হল তিনটে। ক-দি-মু-চে-ক, মু-দি-ক-চে-মু এবং চে-ক-দি-মু-চে। তিনে রুটেরই দৈর্ঘ্য ৪৯০১১ কিলোমিটার। সুতরাং, মার্কেটিং ম্যানেজার ওই তিন রুটের যে-কোনও একটা নেবে।
এভাবে যদি পাঁচটা, ছ'টা বা সাতটা শহর নিয়ে গণনা করা যায়, তা হলে কোনটা তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের পথ, তা বলা কঠিন নয়। কিন্তু শহর যদি হয় অনেকগুলো তা হলেও কি ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘের পথ কোনটা, তা বলা সম্ভব? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বলা যাক একটা বিজ্ঞাপনের গল্প। বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়েছিল ৫৫ বছর আগে। খবরের কাগজে আর ম্যাগাজিনে। বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিল প্রসাধনী সামগ্রী উৎপাদনের বিখ্যাত কোম্পানি। এমন এক সংস্থা যার মার্কেটিং ম্যানেজারকে এ শহর থেকে ও শহর ঘুরে বেড়াতে হয়। দেখতে হয় কোথায় কত বিক্রি হচ্ছে কোম্পানির উৎপাদিত দ্রব্য। কোথায় তা বেশি বা কম বিক্রি হচ্ছে অন্য কোম্পানির উৎপাদিত দ্রব্যের তুলনায়। ওরকম মার্কেটিং ম্যানেজার একজন থাকে না। থাকে অনেকজন। তাদের সবাইকেই ওরকম ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে হয় আমেরিকার নানা শহরে। তো

	কলকাতা (ক)	দিল্লি (দি)	মুম্বই (মু)	চেন্নাই (চে)
কলকাতা (ক)	০	১৩০৫	১৬৫৪	১৪১৭
দিল্লি (দি)	১৩০৫	০	১১৫১	১৭৬০
মুম্বই (মু)	১৬৫৪	১১৫১	০	১০২৮
চেন্নাই (চে)	১৪১৭	১৭৬০	১০২৮	০

কিলোমিটারে দূরত্বগুলো হল এমন, এর মধ্যে মার্কেটিং ম্যানেজারের সম্ভাব্য রুট হতে পারে ১২ রকম।
ক-মু-দি-চে-ক

ম্যানেজারদের ভভাবে এশহর ওশহর পাঠাতে কোম্পানিকে খরচ করতে হয় অনেক ডলার। প্লেন ভাড়া আছে, হোটেল খরচা আছে। সেজন্য কোম্পানির কর্তাদের ভাবতে হয় ব্যয়ভার নিয়ে। ভাবতে হয়, কীভাবে মার্কেটিং ম্যানেজারদের টুরে পাঠালে কোম্পানির খরচ কমে। ওই যে বিজ্ঞাপনের কথা বললাম, সেটা ওই ভাবনা থেকেই। কী বিজ্ঞাপন?
বিজ্ঞাপনে সেসময় আমেরিকার জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের দুই চরিত্র। সিরিয়ালের হিরো দুই পুলিশ অফিসার। টুডি আর মুলডুন। ওঁরা দু'জনে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে ৫৪ নম্বর গাড়িকে, এই নিয়েই গল্প। আর সিরিয়ালে যা হয়, এপিসোডের পর-এপিসোড। তো ওই বিজ্ঞাপনে এক প্রতিযোগিতার কথা বলে প্রাইজ ঘোষণা করা হল। প্রাইজ় দশ হাজার ডলার। যা দিয়ে তখনকার দিনে একটা আস্ত বাড়ি কিনে ফলা যায়। এমনই মোটা পুরস্কার। বিজ্ঞাপনে লেখা হল, মনে করুন টুডি এবং মুলডুন ঘুরবে গোটা আমেরিকা। যাবে ৩৩টা জায়গায়। যাদের দেখানো হয়েছে মানচিত্রে। ঘুরতে গিয়ে ওরা দু'জন পাড়ি দেবে সবচেয়ে কম দৈর্ঘের পথ। ইলিনয় রাজ্যের শিকাগো শহর থেকে শুরু করে আবার শিকাগোতেই ফেরত আসবে ওরা। এই টুরে কোন পথে এগোবে টুডি এবং মুলডুন।
৩৩টা শহরের সবক'টায় যেতে হবে। টুর শুরু এবং শেষ হবে শিকাগোয়। ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের পথ কোনটা? এক শহর থেকে আর-এক শহরের দূরত্ব সহজে জানা যায়। এর পর কাগজ-পেনসিল নিয়ে হিসেব করতে হবে। দেখতে হবে পরপর কোন শহর ধরে এগোলে পথ হবে লম্বায় সবচেয়ে কম। সেই টুর প্ল্যান কোম্পানিকে পাঠালে মিলবে দশ হাজার ডলার ইনাম।
কিন্তু, বলা আর করা কি এক? ৩৩টা শহরের শর্টেস্ট টুর প্ল্যান করে ফেলা কি সহজ? তা যে কঠিন কাজ। দারুণ কঠিন। কত, তা দেখা যাক। ৩৩টা শহর সেগুলোকে A, B, C, D... ইত্যাদি এবং সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪... ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত করা যাক। তা হলে সেগুলো হবে ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ১২৩৪৫৬৭। এবার যেহেতু বলা হয়েছে, টুর শিকাগো শহরে শুরু হয়ে আবার শেষও হবে ওখানে, তাই ধরে নিচ্ছি, এক্ষেত্রে শিকাগো শহর যদি A হয়, তা হলে টুর A থেকে শুরু হয়ে

A-তে শেষ হবে। বাকি রইল ৩২টা শহর। তো শিকাগো থেকে যাত্রা শুরু করার পর প্রথম সম্ভব্য হিসেবে ওই ৩২টার যে-কোনও একটাকে বেছে নেওয়া যায়। তারপর সম্ভব্য বাকি ৩১টা শহরের যে-কোনওটা হতে পারে। এভাবে সম্ভাবনার সংখ্যা দাঁড়াবে ৩২×৩১×৩০×২৯×২৮...×৩×২×১। মানে, ফ্যাকটোরিয়াল ৩২। চিহ্ন দিয়ে বোঝালে ৩২!

মনে রাখতে হবে, কোন শহরের পর কোন শহর আসছে, সেই অর্ডার বা ক্রম বড় কথা, অন্য সব তুচ্ছ ব্যাপার। তাই কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাইয়ের মতো এখানেও দেখা যাবে হয়তো আপাতদৃষ্টিতে সম্ভাবনা দু'রকম। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। যেমন,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ১২৩৪৫৬৭A

এবং

A৭৬৫৪৩২১ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

এই দুটো সম্ভাবনা আসলে এক। কিন্তু ফ্যাকটোরিয়াল ৩২-এ এই দুটো আলাদা হিসেবে ঢুকে পড়েছ। তাই ট্রর প্ল্যানে প্রকৃত সম্ভাবনার সংখ্যা ৩২! ÷ ২। সংখ্যাটা কত? ১৩১,৫৬৫,৪১৮,৪৬৬,৮৪৬,৭৬৫,০৮৩,৬০৯,০০৬,০৮০,০০০,০০০। এতগুলো সম্ভাব্য ট্রর প্ল্যানের মধ্যে কোনটা ক্ষুদ্রতম, তা জানতে হলে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে পথের মোট দৈর্ঘ্য হিসেব করতে হবে। তাতে সময় লাগবে অনেক। কাগজ-পেনসিল নিয়ে মানুষের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, অত্যাধুনিক কম্পিউটারে হিসেব করলেও। কত সময় লাগবে কম্পিউটারের? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ২৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বছর! বিগ ব্যাংয়ের জন্মের পর এখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়েস নাকি ১৩,৭০০,০০০,০০০ বছর। অর্থাৎ, কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপনে যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিল, তাতে যোগ দিয়ে সাধারণ পদ্ধতিতে হিসেব কষতে অত্যাধুনিক কম্পিউটারের লাগত ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের ২০৪৪ গুণ বছর। মানুষে তো কোন ছার!

তবু একজন প্রাইজ় জিতেছিলেন সেই ১৯৬২ সালে। সেই একজন হলেন গণিতজ্ঞ। তিনি যে কাগজ-পেনসিলে হিসেব কষেননি, তা বলাই বাহুল্য। আমেরিকার মানচিত্রে ৩৩টা শহরের যেরকম ভৌগোলিক অবস্থান ছিল, তা থেকে জ্যামিতি মেনে আন্দাজে এগিয়ে ওই গণিতজ্ঞ ক্ষুদ্রতম রুটের আন্দাজ করেছিলেন। হ্যাঁ, সেটা ওই আন্দাজ মাত্র। মানচিত্রে ৩৩টা শহরের অবস্থান দেখে মনে হচ্ছিল, ওই গণিতজ্ঞের অনুমান ঠিক হতে পারে। তাই ওঁকে প্রাইজ় দেওয়া হয়েছিল। গণিতজ্ঞটি হলেন জ়েরাল্ড টম্পসন। নাহ, ক্ষুদ্রতম রুটের কোনও ফরমুলা বলতে পারেননি তিনি। এই যে সমস্যা, সম্ভাবনা অনেক, তার ভিড়ে সেরাটি খুঁজে পাওয়ার সহজ পন্থা নেই। প্রবাদবাক্যে যাকে বলে খড়ের গাদায় সূচ খুঁজে মরা। তবে সমস্যাটাকে গণিতশাস্ত্র বিখ্যাত করে তুলেছে। সমস্যাটা চিহ্নিত হয়েছে বিশেষ নামে। 'ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম'। ভ্রাম্যমান ফেরিওয়ালার সমস্যা। নামের উৎসটা নিশ্চয়ই আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। গণিতের বাঘা-বাঘা যেসব ধাঁধা রয়েছে, মর্যাদায় যাদের আসন খুবই উপরে, এমনকী যাদের সমাধানে দশ লক্ষ ডলার পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে ওই ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম। শুধু গ্ল্যামারে নয়, আক্ষরিক অর্থেও ওটা যাকে বলে মিলিয়ন ডলার প্রবলেম।

ধাঁধাটার সমাধান যে কেবল সেলসম্যানদের সবচেয়ে ভাল ট্রর প্ল্যান বানাতে উপকারী, তা কিন্তু নয়। অনেক সম্ভাবনার ভিড়ে সেরা কোনটি, তা বের করতে হয় অনেকক্ষেত্রে। কলকারখানার কাজে তো বটেই, কম্পিউটার বিজ্ঞানে, মস্তিষ্কচর্চায়, মনস্তত্ত্বে এমনকী শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম এসে পড়ে। যে ধাঁধার উত্তর পেলে উপকৃত হবে এতগুলো দিক, তা তো বিখ্যাত হবেই। ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম কেবল একটা মজার ধাঁধা নয়, এর খ্যাতি প্রয়োজনের বিচারেও। গণিতজ্ঞরা এই ধাঁধার লম্বা নাম ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেমের বদলে ওটাকে সংক্ষেপে বলেন টি এস পি। গণিত গবেষণায় ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম ঢুকেছে যাঁর সুবাদে তিনি অষ্ট্রিয়ার গণিতজ্ঞ কার্ল মেনগার। ওঁর গবেষণার বিষয় ছিল স্পেস বা শূন্যস্থানের মধ্যে কোনও রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়। অর্থাৎ, এক বিন্দু থেকে আর-এক বিন্দুর দূরত্ব মাপা। এভাবে অনেকগুলো বিন্দুর মধ্যেকার দূরত্ব নির্ণয়, সবচেয়ে কম বা বেশি দূরত্ব কত হতে পারে, সেসব নিয়ে ভাবতেন তিনি। সেই ভাবনা থেকে মেনগার টি এস পি-তে পৌঁছেছিলেন হয়তো। ১৯৩০ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি ভিয়েনা শহরে আয়োজিত গণিতের এক আলোচনাচক্রে মেনগার বলেন, ''ব্যাপারটাকে আমরা বলতে পারি বার্তাবাহক সমস্যা। কারণ, বাস্তবে এর মুখোমুখি হন প্রত্যেক পোস্টম্যান, প্রত্যেক ভ্রাম্যমান পথিক। নির্দিষ্ট সংখ্যক বিন্দু দেওয়া আছে। দেওয়া আছে জোড়ায়-জোড়ায় বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব। এবার সবক'টা বিন্দুকে

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

একবার মাত্র ছুঁয়ে চললে পথের নূন্যতম দৈর্ঘ্য কত হবে?"

মেনগার যা বলেন তা হল টি এস পি-র গাণিতিক সংজ্ঞা।

ওঁর দশ বছর পরে এক বিখ্যাত ভারতীয় এমন এক সমস্যার কথা বলেন, যা আসলে টি এস পি কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যে সমস্যাটিকে টি এস পি বলে উল্লেখ করেন না। খ্যাতনামা ওই ভারতীয় পণ্ডিত হলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। ভারতে স্ট্যাটিস্টিকস বা পরিসংখ্যান বিদ্যা চর্চার জনক এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আই এস আই) প্রতিষ্ঠাতা। এহেন মানুষটি ১৯৪০ সালে যে বিশেষ প্রবন্ধটি লেখেন, তাতে তিনি বর্ণনা করেন এই কাজ। প্রশান্তচন্দ্র সরাসরি উল্লেখ না করলে কি হবে, কাজটা কিন্তু টি এস পি-র সমগোত্রীয়।

প্রশান্তচন্দ্র যে পেপার লিখেছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত জার্নাল 'সংখ্যা'তে। উনিশ পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা প্রবন্ধের শিরোনাম 'আ স্যাম্পেল সার্ভে অফ দি একারেজ আন্ডার জুট ইন বেঙ্গল'। বাংলাদেশে পাট চাষ এলাকার নমুনা সমীক্ষা। তখন পূর্বভারতে কৃষকদের রোজগারের এক মস্ত উপায় পাট চাষ। ভারত থেকে রপ্তানি দ্রব্যের চার ভাগের এক ভাগ পাট। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার (তখন ভারত পরাধীন) পাটচাষের পরিস্থিতি (উৎপাদন কেমন হবে) আগাম জানতে চায়। হিসেবটা জরুরি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। জার্মানির আক্রমণে তখন ইংল্যান্ডের নাজেহাল অবস্থা। রফতানি বাণিজ্য ঠিকঠাক না-হলে ব্রিটিশ সরকার আর্থিক সমস্যায় পড়বে। তাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের উপর দায়িত্ব পড়েছে সমীক্ষা করে পাট চাষের হালহকিকত জানার।

সেজন্য দরকার সমীক্ষা। কোথায় কী পরিমাণ চাষ, তা থেকে কেমন ফলন অনুমান করা যায়, সেসব হিসেব। কাজটা কঠিন, প্রায় দুরূহ। কারণ পাট চাষ হয় ছড়িয়েছিটিয়ে। প্রায় ষাট লক্ষ চাষি পাট চাষে শামিল হলেও তাদের জমিগুলো পরপর সংযুক্ত নয়। একটা এখানে তো আর-একটা ওখানে। জমির চরিত্রও আবার আলাদা। কোনওটা উর্ব্বর, কোনওটা অনুর্বর।

এই পরিস্থিতিতে একজন পরিসংখ্যানবিদ যা করেন, তাই করলেন প্রশান্তচন্দ্র। র‍্যান্ডাম স্যাম্পেল সার্ভে বা কোনও কোনও জায়গায় নমুনা সমীক্ষা। জমির চরিত্রভেদে পাট চাষকে ভাগ করলেন কতকগুলো এলাকায়। তারপর সেই এলাকাগুলোর মধ্যে বেছে নিলেন কোনও-কোনও জমি। অনুমান করলেন ওই সব জমিতে ফলন কেমন হতে পারে। নমুনা, অনুমান থেকে সামগ্রিক হিসেবে যদি পৌঁছনো যায়।

না, সংখ্যা জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে প্রশান্তচন্দ্র কোনও ফরমুলায় পৌঁছতে পারেননি ওই নূন্যতম পথ বের করার। যদি তা পারতেন তিনি, তা হলে টি এস পি ধাঁধার সমাধান হয়ে যেত। তবে কী-কী হলে পথের দৈর্ঘ্য কমানো যায়, তার একটি ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন তাঁর পেপারে। সেটা যেমন একটা দিক, তেমনই আর-একটা বড় দিক হল যে সমস্যার উল্লেখ করলেন তিনি, তা যে আসলে একটি টি এস পি ছাড়া আর-কিছু নয়, তা কিন্তু বললেন না। এটাকে কী বলব? ত্রুটি? না, তা হয়তো বলা যায় না। যা বলা যায় তা হল প্রশান্তচন্দ্র টি এস পি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে টি এস পি গণিত গবেষণায় ততটা ঢুকে পড়েনি, যে হারে এখন ঢুকে পড়েছে।

হ্যাঁ, গুরুত্ব বিচারে এখন ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম গণিতের প্রথম সারিতে। একবিংশ শতাব্দী শুরুর মুখে প্যারিস শহরে ২০০০ সালে বসেছিলেন পৃথিবীর বাঘা-বাঘা গণিতজ্ঞরা। গণিতের সেরা সাতটি ধাঁধা বাছাই করতে। যেহেতু শুরু হতে চলেছে কেবল নতুন শতাব্দী নয় একটা নতুন সহস্রাব্দও, তাই পণ্ডিতেরা ওই ধাঁধা সমাধানে এক মিলিয়ন ডলার ইনামও ঘোষণা করেন। সাতটার মধ্যে একটা ধাঁধা সমাধান করে ফেলেছেন রুশ গণিতজ্ঞ গ্রিসা পেরেলম্যান। আপাতত ছ'টা মিলেনিয়াম প্রবলেম পড়ে আছে আনসলভ্ড। তার মধ্যে একটা টি এস পি। ভুল হল। আনসলভ্ড একটা প্রবলেমের নাম টি এস পি নয়। সেটি অন্য নামে পরিচিত। নাম যাই হোক, ওই ধাঁধাটা টি এস পি গোত্রের। এতটাই যে, টি এস পি সলভ্ড করলে ওটারও সমাধান মিলছে ধরে নেওয়া হবে। সুতরাং, টি এস পি যিনি সলভ্ড করবেন, তার পকেটে যাবে দশ লক্ষ ডলার। মিলেনিয়াম প্রবলেমগুলোর তালিকায় বিশেষ ওই ধাঁধাটা ঘোষিত তার টেকনিকাল নামে। P বনাম NP। ওই P এবং NP হল গণিতের বিশেষণ। নাম মাহাত্ম্য একটু জটিল। সে জটিলতায় না ঢুকেও কিন্তু দিব্যি ব্যাখ্যা করা যায় P বা NP আসলে কী। NP হল সেই সব ধাঁধা বা প্রশ্ন, যাদের সমাধান বা উত্তর আমরা পেতে চাই। কিন্তু সহজে পাই না। আর P হল সেইসব ধাঁধা বা প্রশ্ন যাদের সমাধান বা উত্তর আমরা সহজেই পাই।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ধরা যাক একটা সংখ্যা। ১৭৫,৮২৮,২৭৩। সংখ্যাটা মৌলিক না যৌগিক? সামান্য প্রশ্ন। ছোট্ট ধাঁধা। উত্তর? বের করতে গলদঘর্ম হতে হবে। একটার পর-একটা সংখ্যা দিয়ে পরখ করতে হবে সেটা দিয়ে এই ১৭৫,৮২৮,২৭৩ সংখ্যাটা বিভাজ্য কিনা। কতকগুলো সংখ্যা দিয়ে এভাবে পরখ করা? ১৭৫,৮২৮,২৭৩-এর বর্গমূল বা তার কাছাকাছি যে সংখ্যা হয়, তেবার পরীক্ষা করে দেখা। তার আগে বলা যাবে না ১৭৫,৮২৮,২৭৩ যৌগিক না মৌলিক। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ১৭,১৫৯ এবং ১০,২৪৭ এই দুটো সংখ্যার গুণফল কত? কম্পিউটার এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে বলে দেবে ১৭৫,৮২৮,২৭৩। উৎপাদক বের করা কঠিন, গুণফল বলা সোজা। প্রথম প্রশ্নটা NP গোত্রের। এই প্রশ্নের উত্তর চট করে দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় প্রশ্ন P গোত্রের। যার উত্তর চট করে দেওয়া যায়।

এই P আর NP নিয়েই মিলেনিয়াম ধাঁধা। P আর NP কি সমান? P = NP? নাকি ওদুটো সমান নয়? P ≠ NP? যদি কেউ সমাধান করতে পারে ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম, মানে দিতে পারে এমন ফরমুলা, যা চটপট বলে দেবে হাজার লক্ষ বা কোটিযানিক শহর ঘোরার নূন্যতম পথ, তা হলে প্রমাণ হবে P = NP। দশ লক্ষ ডলার পুরস্কার পাবে সে। আবার যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে সেরকম ফরমুলা আবিষ্কার অসম্ভব, তা হলে P ≠ NP। তা হলেও কিন্তু পুরস্কার মিলবে দশ লক্ষ ডলার।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

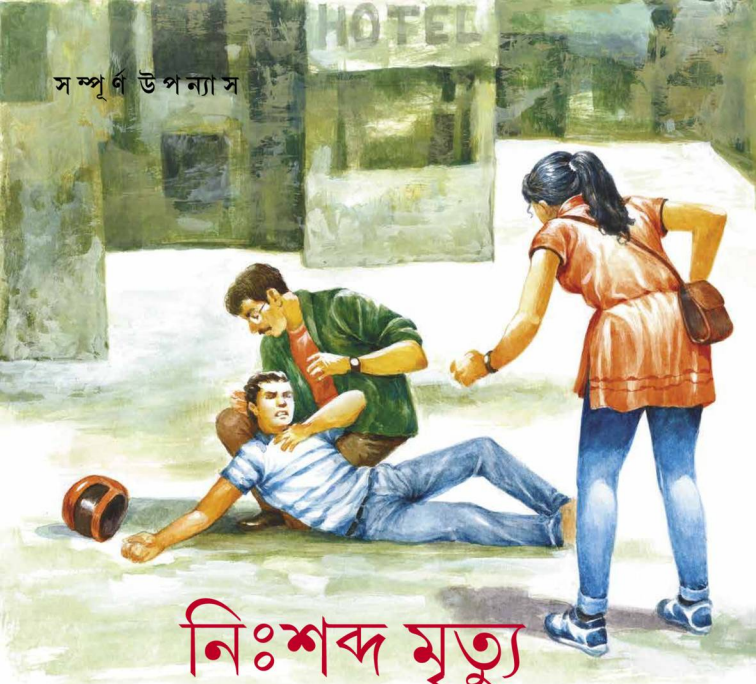

নিঃশব্দ মৃত্যু

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

আজকের সকালটা সব দিক থেকেই সুন্দর। ফুরফুরে মেজাজে আছে ঝিনুক। টানা দু'দিন ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদ উঠেছে আজ। তার উপর আবার ঝিনুক বাড়িতে ব্রেকফাস্ট না সেরে দীপকাকুর সঙ্গে এসেছে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের এক রেস্তরাঁয়। দীপকাকুই নিয়ে এসেছেন। রেস্তরাঁ মোটামুটি ফাঁকা। খাবার অর্ডার করে দীপকাকু মন দিয়ে পেপার পড়ছেন।

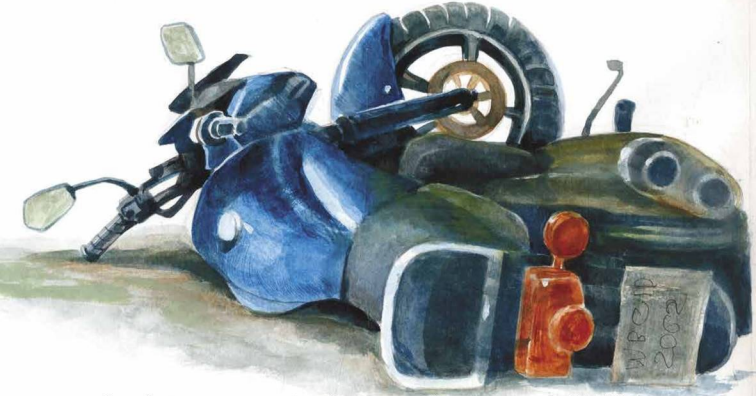

ঝিনুক তাকিয়ে আছে কাচের দেওয়ালের বাইরে। অভিজাত পাড়া। গাছে ছাওয়া রাস্তাতে লোকজন কম। ঘুম থেকে দেরি করে ওঠা দু'-একজন প্রাতঃভ্রমণকারীকে দেখা যাচ্ছে। ঝিনুকরা এখানে বসে আছে এক ব্যক্তির অপেক্ষায়। দীপকাকুর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন তিনি।

অনেকদিন পর দীপকাকু, ঝিনুক একসঙ্গে। গত কয়েক মাস ধরে ঝিনুকদের বাড়িতে কমই যাচ্ছেন দীপকাকু। রবিবার সকালে আসাটা তো নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও মাঝে-মাঝেই চলে আসতেন। মায়ের রান্নার বিরাট ভক্ত দীপকাকু। আসার আগ্রহ খানিকটা সেই কারণেও। বাবার সঙ্গে দাবা খেলেন, আলোচনা করেন হাতে থাকা কেস নিয়ে। সব তদন্তে তো দীপকাকু ঝিনুককে সহকারী হিসেবে নেন না। বাবা-দীপকাকুর আলোচনায় অংশ নিলে ব্রেন এক্সারসাইজ় হয়ে যায় ঝিনুকের। অন্য কেসগুলোয় অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি করতে না পারার আক্ষেপটা একটু কমে। ঝিনুকও বেশ অস্থির হয়ে পড়েছিল দীপকাকুর কেসে অংশ নিতে না পেরে। কিছুদিন আগেই বাবাকে বলেছিল, "কী ব্যাপার বলো তো, দীপকাকু আমাদের বাড়িতে আসা একেবারেই কমিয়ে দিয়েছেন? মা দু'দিন ফোন করে খবর নিয়েছে। 'আসব, আসব' করেও আসেননি।"

বাবা বললেন, "যত দিন যাচ্ছে, কাজ আসছে বেশি। ওর মতো দক্ষ গোয়েন্দার ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক। আড্ডা মারার মতো সময় আর পাচ্ছে না।"

ঝিনুক প্রমাদ গুনেছিল। নিজের প্রোফেশনটাকে দীপকাকু যদি আর পাঁচটা অফিস কাজের মতো দেখেন, তা হলে আর কোনওদিনই

ঝিনুককে অ্যাসিস্ট করতে ডাকবেন না। চাইবেন ঝিনুক লেখাপড়া শেষ করে নিরাপদ কোনও প্রোফেশন বেছে নিক। ঝিনুক তো ওঁর কেসে বিরাট কিছু সাহায্য করে উঠতে পারে না, দীপকাকু কাজের রোমাঞ্চটা ঝিনুকের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তাঁর ট্রেনিংয়ে ঝিনুক একদিন গোয়েন্দা হয়ে উঠবে। ক'দিন আগে এমনটাই ভাবতেন। ভাবনায় সমানে ইঙ্গন দিয়ে গিয়েছেন বাবা। কিন্তু কাজটা যদি দীপকাকুর কাছে রোজগারের রাস্তা হয়ে দাঁড়ায়, ঝিনুককে প্রস্তুত করার ইচ্ছেটাই থাকবে না।

সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল আজ সকালে। বিছানা থেকে ঝিনুককে ঠেলে তুলে মা বললেন, "দীপঙ্কর ফোন করেছে ল্যান্ডলাইনে। তোকে ডেকে দিতে বলল।"

মুহূর্তে ঘুম উধাও। ফোন ধরতে ঝিনুক দৌড়েছিল ড্রয়িংরুমে। শুধু যদি ঝিনুকের সঙ্গেই দরকার থাকে দীপকাকুর, নিশ্চয়ই মোবাইলে ফোন করেছিলেন। রাতে মোবাইল অফ রাখে ঝিনুক। দীপকাকু পাননি। ঝিনুক বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে বুঝে রাগ করবেন। হলও তাই, ফোন তুলতেই ভর্ৎসনার মুখে পড়ল ঝিনুক। দীপকাকু বললেন, "এখন ঘুম থেকে ওঠা হল? জগিং, ফ্রি হ্যান্ডের পাট কি চুকিয়ে দিয়েছ?"

ঝিনুকের বলতে ইচ্ছে করছিল। আর নিজেকে ফিট রেখে কী হবে! অ্যাসিস্ট করতে ডাকেন না তো আজকাল। মনের কথা চেপে গিয়ে অহ্বাহত হিসেবে বলেছিল, "না, না, এক্সারসাইজ চলছে। কাল শুতে গিয়েছি দেরিতে, তাই উঠতে পারিনি।"

দীপকাকু বললেন, "মিনিটকুড়ির মধ্যে রেডি হয়ে নাও। বাইরে ব্রেকফাস্ট করব। নিতে আসছি তোমায়।"

"ঠিক আছে, রেডি হয়ে নিচ্ছি," বলে ফোন ছেড়েছিল ঝিনুক। তখনই মুখ তুলে দেখে জানলার বাইরে আজকের সকালটা রীতিমতো ঝলমলে। সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন বাবা। বললেন, "কেসের মাঝপথে মনে হয়েছে তোকে দরকার, তাই এভাবে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। শুরুতে হলে কেসটার ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করত।"

সন্তানস্নেহেই বাবা ঝিনুককে এতটা দরকারি মনে করছেন। সে নিজেকে তেমনটা ভাবে না। নির্দিষ্ট সময়ে রেডি হয়ে বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ঝিনুক। দীপকাকু এসে বাইকে তুলে নিলেন। তারপর এই রেস্তরাঁ। ইতিমধ্যে দীপকাকু জানিয়েছেন এখানে আসার মূল কারণ। বাবার অনুমান ভুল। রহস্য ভেদ না হওয়া একটি অপরাধ নিয়ে দীপকাকুর সঙ্গে কথা বলতে আসছেন একজন। অপরাধটা এতই জোরদার, দীপকাকু আগ্রহ না দেখিয়ে পারেননি। মাসদুয়েক আগে ব্যাপারটা নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। খবরের কাগজ থেকেই বিষয়টা প্রথমে জেনেছিল ঝিনুক। বাবা একদিন কাগজ পড়া শেষ করে ঝিনুককে খবরটা দেখিয়ে বলেছিলেন, "এটা পড়ে দেখিস, বেশ অদ্ভুত।"

সম্ভবত হেডিংটা ছিল, 'শিল্পপতির রহস্যজনক মৃত্যু'। খবরটা মোটামুটি এরকম, কলকাতার এক ব্যবসায়ী নিজের অফিস থেকে বাড়ি ফিরে হঠাৎই প্রবল শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এসেও তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারেননি। একঘণ্টার মধ্যেই ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। রোগের কারণ এবং পরিণতি নিয়ে ওই চিকিৎসক সম্পূর্ণ অন্ধকারে। রোগের লক্ষণ যেহেতু অচেনা, চিকিৎসক ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতে চাননি। বিষয়টিতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। পোস্টমর্টেম হয়েছে দেহ। রিপোর্টে হৃদরোগে আক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। অসমর্থিত সূত্রে জানা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীর শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার কিছু পরেই অচেনা নম্বর থেকে একটি ফোন আসে বাড়িতে। তাতে বলা হয়, ডাক্তার ডেকে কোনও লাভ হবে না। ওই রোগ আমার দেওয়া, ওষুধ নিতে হবে আমার কাছ থেকেই, টাকার বিনিময়ে। নয়তো অবধারিত মৃত্যু। কোনও ডাক্তার বাঁচাতে পারবে না। হাতে সময় কিন্তু খুব কম। ফোনটাকে উড়ো ভেবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও ফোনের ঘটনার কথা এখনও পর্যন্ত স্বীকার করেনি ব্যবসায়ীর বাড়ির লোক। পুলিশও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। খবরটা পড়ে ঝিনুকের মনে হয়েছিল ওরকম ফোন যদি এসেই থাকে, তা হলে সেটা করেছে ব্যবসায়ীর কাছের লোক। যে প্রত্যক্ষ করেছে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়াটা। ভেবেছিল ডাক্তার আসার আগেই পরিবারটাকে আরও টেনশনে ফেলে যদি কিছু টাকা হাতিয়ে নেওয়া যায়। অথবা ওই ধরনের কোনও ফোন আসেইনি। খবরটাকে চাঞ্চল্যকর করার জন্য স্বয়ং সাংবাদিক বলে তাঁকে যাঁরা তথ্য সরবরাহ করেছেন, এ সব তাঁদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। নিজের অনুমান বাবাকে তখনই জানিয়েছিল ঝিনুক। বাবা বলেছিলেন, "মনে হচ্ছে তুই ঠিকই বলছিস।"

এই আলোচনার পর পনেরো-কুড়ি মিনিটের মাথায় ফোন এসেছিল দীপকাকুর। বাবাকে বলেছিলেন, "আজকের কাগজে ব্যবসায়ী মৃত্যুর খবরটা পড়েছেন?"

বাবা "পড়েছি" বলার পর দীপকাকুর মন্তব্য ছিল, "এর জের চলবে।"

"জের বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছ তুমি?" জানতে চেয়েছিলেন বাবা।

দীপকাকু বলেছিলেন, "ব্যবসায়ীর মতো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা আরও ঘটবে এবং ফোনও আসবে।"

বাবা তখন ঝিনুক যে সম্ভাবনার কথা বলছে সেটা জানিয়েছিলেন। দীপকাকু বললেন, "আমার মন বলছে ফোনটা উড়ো নয়। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। যেহেতু শিয়রে মৃত্যু, টাকা খুব তাড়াতাড়ি এসে যাবে ব্ল্যাকমেলারের হাতে। একই সঙ্গে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে সে। টার্গেটকে অসুস্থ করছে এবং টাকাও একঘণ্টার মধ্যে আদায় করে নেবে। অকুস্থলের কাছেই থাকছে অপরাধী, সহজে ধরা পড়ে যাওয়ার চান্স আছে জেনেও। নিশ্চয়ই ফাকি দিয়ে পালানোর উপযুক্ত রাস্তাও সে তৈরি রেখেছে। এখন দেখা যাক। তবে ঝিনুক যে ভাবছে খবরটা আপনারা যে পেপার নেন তার সাংবাদিক বানিয়েছে, তা কিন্তু নয়। আজ বেশ ক'টা পেপারে খবরটা বেরিয়েছে। সন্দেহ করা যেতে পারে তাদেরকে, যারা খবরটা প্রেসকে দিয়েছে।"

ফোনের একপ্রান্তের কথা ঝিনুক শুনতে পাচ্ছিল, অপর প্রান্তের সব কথা বাবা ফোন ছাড়ার পর জানালেন। বাংলা ছাড়াও ঝিনুককের বাড়িতে একটা ইংরেজি কাগজ আসে, সেটাতে ঘটনার উল্লেখ ছিল না। দীপকাকু যখন বলেছেন, নিশ্চয়ই অন্য কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। ঝিনুক আলাদা করে আর খোঁজ নেয়নি। এক সপ্তাহও হয়নি, একদিন পরপর দুটো ওই ধরনের ঘটনা ফিরে এল কাগজে। তবে তেমন জোরালোভাবে নয়। হেডিং হল, 'আবার রহস্যজনক রোগ, ধন্দে পুলিশ।' খবর মোটামুটি এরকম, কলকাতার ভিন্ন দুটো থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে দুটো পরিবার থেকে। বাড়ির প্রধান সদস্য আচমকাই শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন। অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। প্রথম ঘটনার মতোই ফোনের ওপারের ব্যক্তিটি জানায়, ওই রোগ তারই প্রদান করা। ওষুধ আছে ব্যক্তিটির কাছে। যা টাকার বিনিময়ে নিতে হবে। নয়তো একঘণ্টার একটু কম-বেশি সময়ের মধ্যে মৃত্যু হবে রোগাক্রান্ত মানুষটির। পরিবারের লোক কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। যেহেতু এরকম ঘটনার কথা আগে জেনেছে খবরের কাগজ থেকে, তাই ফোনের ওই ব্যক্তির নির্দেশমতো নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে টাকা রেখেছে এবং একইভাবে ওষুধ পেয়েছে। সেই ওষুধে রোগাক্রান্ত মানুষটি সুস্থ হওয়ার পর দুই পরিবারের লোক নিজেদের এলাকার থানায় গিয়ে জানিয়েছে ঘটনাটি। পুলিশ তাদের বলেছে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

খবরটা পড়ার পর বাবা ফোন করলেন দীপকাকুকে। বললেন, "তোমার কথা তো মিলে গেল দেখছি। আবার শিয়রে শমন রেখে টাকা আদায়।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "কাগজে তো দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছে। আমার তো মনে হচ্ছে আরও এরকম ঘটছে। সেই পরিবারগুলো পুলিশের কাছে যাচ্ছে না। নিজের লোককে বাঁচিয়ে নিয়ে চেপে যাচ্ছে ঘটনাটা। পুলিশ বা প্রেসও তাদের কাছে আসা সবক'টা ইন্সিডেন্ট প্রচার করবে না। জনসাধারণের মনে প্যানিক সৃষ্টি হবে। শ্বাসকষ্টে ভোগা যে-কোনও রোগীরই মনে হবে, এই বুঝি ব্ল্যাকমেলারের ফোন এল!"

একথার সূত্রে বাবার মন্তব্য ছিল, "এরকম অনেক কেস যদি ঘটতে থাকে, একটা-দুটো নিশ্চয়ই তোমার কাছে আসবে।"

দীপকাকু সহমত হননি। বলেছিলেন, "আসার চান্স প্রায় নেই-ই বলা যায়। আগাম কোনও আভাস ছাড়াই টার্গেটের উপর আঘাত হানছে অপরাধী। বাঁচার জন্য সময় দিচ্ছে অত্যন্ত কম। ওই সামান্য সময়টুকু, যা ভীষণই মূল্যবান, প্রাইভেট ডিটেকটিভের জন্য খরচ না করে আক্রান্তের পরিবার পুলিশের কাছে পৌঁছবে। অ্যাকশনটা ইমিডিয়েট নেওয়া চাই। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ যথেষ্ট দক্ষ। পদাধিকার বলে তারা যে-কোনও জায়গায় বিনা কৈফিয়তে ঢুকে যেতে পারে। প্রশ্ন করতে পারে যে কাউকে। আমরা সেটা পারি না। আমাদের অনেক আঁটঘাট বেঁধে এগোতে হয়। সময় লেগে যায় বেশ খানিকটা। আর যে সব পরিবার তাকা দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচিয়েছে, তারা তাকা উদ্ধারের জন্য সরাসরি থানাতেই যাবে। কারণ, তখন এটা নাগরিক সমস্যা। সামালানোর দায় অবশ্যই পুলিশ এবং প্রশাসনের।"

তদন্তের ভার যেহেতু দীপকাকুর হাতে আসছে না, কেসটার ব্যাপারে ঝিনুক তেমন মাথা ঘামাতে চায়নি। কাগজে আরও একবার ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তির খবর বেরিয়েছে। বিষয়টা নিয়ে টিভি চ্যানেলে চক শো হল একদিন। প্যানিক বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু এখনও ছড়িয়ে পড়েনি শহরে। দীপকাকুর বিবেচনা হয়তো এ ক্ষেত্রে সঠিক, ঘটনা আরও ঘটছে, নিজ-নিজ দায়িত্ববোধ থেকে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং সংবাদমাধ্যম তা প্রকাশ্যে আনছে না। কিন্তু দীপকাকুর একটা অনুমান মেলেনি। ভেবেছিলেন এই কেসের সমাধানের ভার তাঁর হাতে আসবে না। তা এখনও আসেনি ঠিকই, তবে এ বিষয়ে একজন কথা বলতে আসছেন। অর্থাৎ রহস্যটার সঙ্গে দীপকাকুর জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। কাল রাতের দিকে একজন দীপকাকুকে ফোন করে বলেন, আচমকা শ্বাসকষ্টের কেসটা নিয়ে তিনি দীপকাকুর সঙ্গে কথা বলতে চান। ফোনে ব্যাপারটা বলতে পারবেন না। সামনাসামনি বসে বলতে পারলে ভাল হয়।

বিষয়টা শোনার জন্য দীপকাকু উৎসাহী হয়ে বলেছিলেন, "কাল সকালেই চলে আসুন আমার বাড়ি। ফ্রি আছি। যদি বলেন আমিও আপনার বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারি।"

ভদ্রলোক দীপকাকুর বাড়ির ঠিকানা (কুঁদঘাট তিরপুকুর) জানার পর বলেছিলেন, "আমার বাড়ি থেকে অনেকটাই দূর। তার চেয়ে এক কাজ করুন, দু'জনের বাড়ির মাঝামাঝি কোনও জায়গায় দেখা করি।"

এই রেস্তরাঁয় মিট করার প্রস্তাব ওই ভদ্রলোকই দেন। ওঁর নাম-ধাম কোনও কিছুই জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাননি দীপকাকু। ভদ্রলোক ঝপ করে ফোন কেটে দিয়েছিলেন। কোনও মোবাইল সেট থেকে কল করেননি উনি। কলব্যাক করে দীপকাকু জেনেছেন, ওটা বেহালায় একটা ওষুধের দোকানের ল্যান্ডফোন নম্বর। সব শুনে ঝিনুক জানতে চেয়েছে, ফোনের গলা শুনে কী মনে হল তাঁর, লোকটা বয়স্ক না ইয়ং?

উত্তরে দীপকাকু বলেছেন, শুধু গলা শুনে বয়স আন্দাজ করা বেশ কঠিন কাজ। আর খানিকক্ষণ পরই তো দেখা পাওয়া যাবে তাঁর। আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে চলে আসবেন বলেছেন।

ঘড়ির কাঁটা এখন ন'টা ছুঁই-ছুঁই। বয়স যেহেতু জানা নেই, ঝিনুক কাচের জানলার বাইরে ফুটপাত দিয়ে যাকেই হেঁটে যেতে দেখছে, মনে হচ্ছে উনিই বুঝি তিনি। এখনই ঘুরে গিয়ে রেস্তরাঁর দরজা লক্ষ করে এগিয়ে আসবেন। বসে-বসে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে ঝিনুক। হাই পাওয়ারের চশমা পরা দীপকাকু নির্বিকারভাবে কাগজ পড়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক এখন কোথায় জানার জন্য দীপকাকু যে একটা ফোন করতে বলবেন সে রাস্তাও বন্ধ। মোবাইল থেকে ফোন করেননি লোকটি। ভাবনা থমকে গেল ফুটপাথ ঘেঁষে একটা মোটরবাইককে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কেমন যেন আনস্টেডি, এলোমেলো!

"ও মা! এ কী!" কথাটা মুখ ফুটে বেরিয়ে গেল ঝিনুকের। কারণ, আরোহী বাইকটাকে ঠিকমতো স্ট্যান্ড না করেই টলোমলো পায়ে এগিয়ে আসছেন রেস্তরাঁর দিকে। হেলমেটটা খোলার চেষ্টা করছেন অস্থির হাতে, তাড়াহুড়োর জন্য পেরে উঠছেন না। ফুটপাথে হেলে পড়েছে বাইক। ঝিনুকের বিস্মিত স্বরের কারণেই নিশ্চয়ই দীপকাকুর নজর গেল বাইরের দিকে। বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে ইনিই সেই লোক। ঘোর বিপদ। উঠে এসো।"

দীপকাকুকে অনুসরণ করে ঝিনুক বাইরে এসেছে, বাইক-আরোহী এখন মাটিতে কাত হয়ে শুয়ে, খাবি খাওয়ার মতো শ্বাস টানছেন। হেলমেটটা পেরেছেন খুলতে। ইনিও কি তা হলে শিকার হলেন সেই ব্ল্যাকমেলারের? ওই সংক্রান্ত কথাই তো বলতে আসছিলেন। দেরি করে ফেললেন তার মানে।

ভদ্রলোকের বয়স তিরিশের বেশি হবে না। শ্বাস নিতে না পেরে কষ্টে বেঁকে যাচ্ছে মুখ। গলার কাছে দুটো হাত জড়ো করে আছেন। পা ছুড়ছেন অস্থিরভাবে। দীপকাকু ওঁর মাথাটা প্রায় কোলে তুলে নিয়ে বলছেন, "আমার কাছেই আসছিলেন আপনি। আমি দীপকর বাগচী। কষ্টটা কখন শুরু হল, কী ভাবে?"

ঝিনুক অলরেডি উবু হয়ে বসে পড়েছিল। উত্তর শোনার জন্য আরও একটু ঝুঁকে পড়ে। প্রবল শ্বাসকষ্টের ফাঁকেই ভদ্রলোক বলতে থাকেন, "আমার কিছু হবে না। টাকা ডিমান্ড করে ফোন আসবে। বাড়িতে জানাবেন না। এমনিই ঠিক হয়ে যাব। ওষুধে-ওষুধ নেই। বুঝতে পার..."

থেমে গেল ভদ্রলোকের কথা। চোখটা ঠেলে বেরিয়ে রইল। দীপকাকু ভদ্রলোকের গলার কাছে হাত নিয়ে গিয়ে ক্যারোটিড পালস চেক করলেন, নাকের নীচে হাতের আঙুল রেখে বোঝার চেষ্টা করছেন শ্বাস পড়ছে কি না? দীপকাকুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে পড়ছে না। এবার ভদ্রলোকের ডান হাত তুলে নিয়ে কবজির পাল্স চেপে ধরলেন দীপকাকু। ঝিনুকের দিকে মুখ তুলে বললেন, "নেই।"

॥ ২ ॥

মাঝে দুটো দিন গেল। যিনি দীপকাকুর সঙ্গে দেখা করতে এসে মারা গেলেন, তাঁর নাম গৌরব বণিক। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় নিজের নামটা ফোনে বলেননি ভদ্রলোক। মারা যাওয়ার পরমুহূর্তে দীপকাকু ওঁর পরিচয় জানার জন্য উদগ্রীব হননি। ফোন করেছিলেন লোকাল থানায়। পুলিশ এসে ডেডবডির ওয়ালেট থেকে বের করেছিল সচিত্র পরিচয়পত্র। নামের সঙ্গে জানা গিয়েছিল ভদ্রলোক একটি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ম্যানেজার। দীপকাকু পুলিশকে জানাননি যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন গৌরব বণিক। বলেছিলেন, "ভদ্রলোককে ভভাবে পড়ে যেতে দেখে সৌড়ে আসি।"

ডেডবডি ঘিরে ভিড় জমে ছিল। দীপকাকু ছাড়াও আরও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে ঘটনাটা শুনল পুলিশ, তারপর বডি তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার মাঝেই দীপকাকু ঝিনুককে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। ঝিনুকের মনে হয়েছিল দীপকাকু বুঝি এড়িয়ে যাচ্ছেন এই রহস্যজনক মৃত্যুটাকে। রহস্যভেদের বরাত যেহেতু কেউ দেয়নি, মিছিমিছি খাটাখাটনির কী প্রয়োজন! দু'দিন পর যা দেখা যাচ্ছে, দীপকাকু সেই সময় আসলে পুলিশকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। নিজের পরিচয় দেননি, বলেননি গৌরব বণিকের এই রেস্তরাঁয় আগমনের হেতু। বললেই পুলিশ নিজেদের তদন্তে

দীপকাকুকে শামিল করে নিত। আপাতত দীপকাকু সেটা চাইছেন না। গৌরব বণিকের মৃত্যুর কারণটা আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করছেন। সেই অভিপ্রায়ে দীপকাকু এসেছেন গৌরব বণিকের কলকাতার বাড়িতে। সঙ্গে ঝিনুকও আছে। গৌরববাবুর কার্ডে ওঁর অফিসের যে ফোন নম্বরটা ছিল, দীপকাকু সেটা মনে রেখে কল করেন। ডেভবডির সঙ্গে ভিজিটিং কার্ডও চলে গিয়েছে পুলিশের হেপাজতে। অফিস থেকে গৌরববাবুর বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। নিজের বাড়ি নয়, আলিপুরে জামাইবাবুর বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়ির বৈঠকখানায় এখন ঝিনুক, দীপকাকু।

অনেকটা জায়গা জুড়ে এই বাড়িটার বয়স পঁচাত্তর-আশি তো হবেই। সদরে লোহার বিশাল গেট। দু'পাশে বাগান নিয়ে মোরাম ঢালা রাস্তা পৌঁছেছে পোর্টিকোর নীচে। তারপর এই বৈঠকখানা। বাড়ির কর্তা অমরেশ বসু। মানে, গৌরব বণিকের জামাইবাবু। ভদ্রলোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দীপকাকু দেখা করতে এসেছেন। বলেছেন, গৌরব বণিকের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চান। আজ সকাল ন'টায় আসতে বলেছিলেন অমরেশবাবু। বাইক সওয়ারি হয়ে ঝিনুকরা পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে গিয়েছে এ বাড়ির গেটে। বাড়ির নাম 'বসু ভিলা'। গেটের গায়ে সাদা পাথরের প্লেটে লেখা। দীপকাকু নিজের নাম বলতেই দরোয়ান গেট খুলে দিল। বোঝা গেল বাড়ির কর্তা দীপকাকুকে ঢুকতে দিতে বলে রেখেছেন। দরোয়ানের নির্দেশ মতো বৈঠকখানায় এসে বসেছে ঝিনুকরা। দীপকাকুর মোটরবাইক গেটের কাছে রয়েছে, দরোয়ানের জিম্মায়। আধঘণ্টা হতে চলল বাড়ির মালিকের দেখা নেই। মাঝে একজন কাজের লোক দু'কাপ চা আর প্লেট ভর্তি বিস্কুট রেখে গিয়েছে। ঝিনুকের চায়ের নেশা নেই, সময় কাটছে না দেখে খেয়ে নিল। এই ঘরের সমস্ত কিছুই মোটামুটি পর্যবেক্ষণ করা হয়ে গিয়েছে ঝিনুকের। বনেদি বাড়ির বসার ঘর যেমনটা হয়, তেমনই। কাঠের উপর কালো পালিশের আসবাব। কলকার কাজ করা। ঘরের কোণে পিতলের বড়সড় মূর্তি, গাছসুদ্ধ টব। বই ভর্তি একটা আলমারি। দেওয়ালে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। সোফাসেটের সেন্টারটেবিলের উপর ছাইদানিটাও বেশ অ্যান্টিক টাইপ। ঘরটা নিয়মিত ঝাড়পোঁছ হয়, সেটাও বেশ স্পষ্ট। সোফার টেবিলটায় একটা ম্যাগাজিন বা নিউজপেপার থাকলে, উলটে-পালটে দেখতে পারত ঝিনুক। কিছুই করার নেই, ভীষণ একঘেয়ে লাগছে। দীপকাকুর এই পরিস্থিতিতে কোনও সমস্যা হয় বলে মনে হয় না। শূন্যে দৃষ্টি ভাসিয়ে টানা বসে থাকতে পারেন। মাথায় হয়তো চিন্তার ঝড় বইছে, বাইরে তার কোনও ছাপ নেই। যেন হুঁশ নেই কোথায় বসে আছেন, কেন বসে আছেন? ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ঝিনুকের। দীপকাকুকে সবে বলতে যাবে, ''কী ব্যাপার বলুন তো? এতক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছে...'' বলা হল না।

ভিতরের দরজার ভারী পরদা সরিয়ে ঘরে এলেন বছরপঞ্চাশর সৌম্যকান্তি এক ভদ্রলোক। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। দীপকাকুর উদ্দেশে জোড় হাত করে বললেন, ''আমিই, অমরেশ বসু। সরি, আপনাদের অনেকক্ষণ বসতে হল।''

''না, না। ঠিক আছে,'' বললেন দীপকাকু। ভদ্রলোককে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, সঙ্গে ঝিনুকও। অমরেশ বললেন, ''বসুন, বসুন।''

দীপকাকুর মুখোমুখি সোফায় বসলেন অমরেশ। ঝিনুক সাইডের সিঙ্গল সোফায় বসে পড়ল। ফের অমরেশবাবুই বলতে থাকলেন, ''বুঝতেই তো পারছেন, সদ্য একটা মিসহ্যাপ হয়ে গিয়েছে বাড়িতে। আমার স্ত্রী এখনও স্বাভাবিক হননি। ওর দাদা-বউদিরাও এসেছে। সবাইকে সামলাতে গিয়ে আমি কেমন যেন পাগলুড হয়ে যাচ্ছি।''

''এর মাঝে আবার আমি এসে জুড়লাম,'' কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন দীপকাকু।

অমরেশ বললেন, ''ছি, ছি, আমি কিন্তু সেটা মিন করিনি। আমার বরং আপনার মতো কাউকেই এখন দরকার। সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আপনি নিজেই চলে এসেছেন।''

''আমার মতো কাউকে মানে?'' বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

অমরেশবাবু বললেন, ''মানে ডিটেকটিভ। একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরকে দরকার ছিল।''

''অর্থাৎ, শ্যালকের মৃত্যুটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে আপনার?''

''অবশ্যই।''

''পুলিশকে সে কথা জানিয়েছেন?''

''না, জানাতে গেলে নানা সমস্যায় জড়িয়ে যাব। বাড়ির লোকও মানা করছে। আমার স্ত্রী বলছে, পুলিশকে জানিয়ে কী লাভ! গৌরবকে তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না।''

''পুলিশকে জানালে কী ধরনের সমস্যায় পড়বেন?'' কপাল কুঁচকে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

অমরেশবাবু বললেন, ''সেটা পরে বলছি। আপনি আগে বলুন আমার কাছে কী জানতে এসেছেন?''

দীপকাকু একটু চুপ করে রইলেন। কথা সাজিয়ে নিচ্ছেন মনে হচ্ছে। নড়েচড়ে বসে বলতে শুরু করলেন, ''দু'মাস হল আমাদের শহরে এক ধরনের অপরাধের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটল, নিশ্চয়ই খেয়াল করছেন? ব্যাপারটা মিডিয়াতেও এসেছে। মোটামুটি সচ্ছল, সম্পন্ন ব্যক্তি শিকার হচ্ছেন প্রবল শ্বাসকষ্টের। তাঁর নিকটজনের কাছে ফোন আসছে দুর্বৃত্তের। বলছে, ওই কষ্টের প্রকোপ তার দেওয়া, ওষুধও তারই কাছে! নিতে হবে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে। হাতে একঘণ্টা সময়। ওষুধ না পেলে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যাবে।''

''হ্যাঁ, ঘটনাটা কাগজে পড়েছি। জেনেছি টিভি থেকেও,'' বললেন অমরেশবাবু।

দীপকাকু বলতে থাকেন, ''ব্যাপারটা নিয়ে আমি স্বাভাবিকভাবেই বেশ কৌতূহলী ছিলাম। যেহেতু গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা। ভাবছিলাম, রহস্য অনুসন্ধানের কাজটা শুরু করব কীভাবে? এমন সময় গৌরববাবুর ফোন। জানিয়েছিলেন, এই অপরাধটার ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমাদের মিটিং গ্লেস ক্রিক হয়েছিল সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ওই রেস্তরাঁয়। যার সামনে এসে উনি মারা যান। এবং আশ্চর্যভাবে শ্বাসকষ্টেই মৃত্যু হয়। আমার প্রথম প্রশ্ন, ওঁর কি হাঁপানি কিংবা অ্যালার্জির কোনও প্রবলেম ছিল?''

''না,'' বড় করে শ্বাস ফেলে বললেন অমরেশবাবু। মাথা নামিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে কী যেন ভাবছেন।

দীপকাকু জানতে চাইলেন, ''আপনার কি মনে হচ্ছে গৌরববাবুও ওই দুর্বৃত্তের শিকার? নাকি এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা মাত্র?''

''দুর্বৃত্তের শিকার,'' বলে মুখ তুললেন অমরেশবাবু।

ঝিনুক তো অবাক হয়েছেই, দীপকাকুও সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন, ''আপনি কী করে এতটা শিওর হচ্ছেন?''

''কারণ, ওর সুস্থতার জন্য টাকা চাওয়ার ফোনটা আমার কাছে এসেছিল।''

উত্তর শুনে দীপকাকু বুঝি কথা হারিয়ে ফেললেন। তাকিয়ে আছেন হাঁ করে। ঝিনুকের অবস্থাও প্রায় একই। একটু ধাতস্থ হয়ে দীপকাকু বললেন, ''তারপর, মানে ফোনটা পাওয়ার পর কী করলেন আপনি?''

''কী করব সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ফোনটা সত্যিকারের ওই দুর্বৃত্তের নাকি কেউ আমাকে মিছিমিছি হ্যারাস করছে, তাই নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম।''

''দ্বিধার কারণ?'' দীপকাকু প্রশ্ন করলেন।

অমরেশ বললেন, ''গৌরব তো তখন বাড়ি নেই। বেহালার সাইট ভিজিটে গিয়েছে। এদিকে লোকটা ফোনে বলছে, আপনার স্ত্রীর ভাই এখন যে কষ্টে ভুগছে, তার মেয়াদ মাত্র এক ঘণ্টা। তারপরেই চলে যাবে পরপারে। ওকে যদি বাঁচাতে চান দশ লাখ টাকা সুটকেসে ভরে

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকুন, উঠে পড়ুন তাতে। তখনই আমি বলে দেব ওষুধ কোথায় রেখেছি। এর মাঝে পুলিশকে ফোন করে সময় নষ্ট করবেন না। এটা শুনে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, এত টাকা আমি এখন পাব কোথায়! ফট করে ফোনটা কেটে দিল।''

''এর পর কী করলেন?'' বিষম আগ্রহে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

অমরেশবাবু বলতে থাকলেন, ''গৌরব আদৌ অসুস্থ হল কিনা জানার জন্য ওর মোবাইলে ফোন করলাম। ধরল না। বারদুয়েক করার পর বেহালার সাইটে কল করলাম। সেখানকার একজন মিস্ত্রি বলল গৌরব অফিসে এখনও ঢোকেনি।''

কথা কেটে দীপকাকু বললেন, ''বেহালার ওই সাইটে আপনার কোম্পানিই তো হাউজিং কমপ্লেক্স করছে। গৌরববাবু যে কোম্পানির ম্যানেজার।''

অমরেশবাবুর মুখে ফুটে উঠল অবাক ভাব। বললেন, ''আপনি তো অনেক খবরটবর নিয়ে তারপর আমার কাছে এসেছেন দেখছি।''

''এটা তো পার্ট অব মাই জব। আপনি বলতে থাকুন,'' বিনয়ের সঙ্গে বললেন দীপকাকু।

অমরেশবাবু ফের শুরু করলেন, ''ফোনের কথা আমার স্ত্রীকে জানাতে পারছি না। ও শুনলেই তক্ষুনি আমাকে টাকাসমেত রওনা করিয়ে দিত। দেখত না সত্যিই ভাই অসুস্থ কিনা। টাকাটা পেত উড়ো ফোনের লোকটা, যে আসল দুর্বৃত্ত নয়। একবার পুলিশে ফোন করার কথাও ভাবলাম, পরক্ষণেই মনে হল ফোনের লোকটা যদি আসল হয়? পুলিশে ফোন করছি জেনে যদি না দেয় ওষুধ? মানে, আমার তখন পুরো কনফিউজড অবস্থা। আমি সামনে গৌরবকে কষ্ট পেতে দেখলে এতটা সংশয়ে ভুগতাম না। ব্ল্যাকমেলারকে টাকাটা দিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতাম। গৌরবকে কোনও মূল্যেই হারাতে চাইতাম না আমি। ও শুধু আমার আত্মীয় ছিল না, কনস্ট্রাকশন বিজনেসের পুরোটাই দেখাশোনা করত।''

''হ্যাঁ, আপনি তো বিল্ডি থাকেন আপনার প্রাইভেট কলেজ নিয়ে।''

দীপকাকুর কথায় এবার আর অবাক হলেন না অমরেশবাবু, একটু থমকালেন। সামান্য হলেও দীপকাকুর উপর এখন রাগ হচ্ছে ঝিনুকের। অমরেশবাবুর ব্যাপারে এত ইনফরমেশন জোগাড় করেছেন, একটা কথাও তার সঙ্গে শেয়ার করেননি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমরেশবাবু বলতে লাগলেন, ''আমি শুধু একটা বিষয়ের উপর ভরসা করে অপেক্ষা করছিলাম। মনে হয়েছিল টাকা নিয়ে বেরোচ্ছি না দেখে ব্ল্যাকমেলার নিশ্চয়ই আমাকে একটা ফোন করবে, জানতে চাইবে আমার ডিসিশন। তখনই সংশয়ের কথাটা জানাব। বলব, গৌরব যে অসুস্থ তার প্রমাণ কোথায়? কিন্তু সেই সুযোগ সে আমাকে দিল না। একঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর যখন ধরে নিয়েছি ফোনটা আসল দুর্বৃত্তের ছিল না, অন্য কেউ তার পরিচয় ধার করে আমার কাছে টাকা হাতাতে চাইছিল, তখনই পুলিশের ফোনে খবর এল গৌরব মারা গিয়েছে।''

অমরেশবাবু চুপ করে গেলেন। দীপকাকুর মুখেও কথা নেই। ভ্রূ কুঁচকে গভীরভাবে কিছু ভেবে যাচ্ছেন। ঝিনুকের মনে একটা প্রশ্ন ভীষণভাবে খোঁচা দিচ্ছে। বলব না, বলব না করেও কথাটা জিজ্ঞেস করেই ফেলে অমরেশবাবুকে, ''আচ্ছা, গৌরববাবু যখন এতটাই আপনার কাছের মানুষ, তাঁকে যেন তেন প্রকারে বাঁচানোটাই প্রধান কর্তব্য ছিল না? আপনি সে জায়গায় একঘণ্টা সময় নষ্ট করলেন ফোনটা উড়ো ছিল ধরে নিয়ে। টাকা যদি আসল ব্ল্যাকমেলারের হাতে নাও যেত, গৌরববাবুকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারতেন?''

শান্ত হয়ে বসে থাকা মেয়েটা হঠাৎ এরকম বাঁকা প্রশ্ন তুলবে, ঠিক আশা করেননি অমরেশবাবু। হকচকিয়ে দীপকাকুর দিকে তাকালেন। হাতের ইশারায় ঝিনুককে দেখিয়ে দীপকাকু বললেন, ''আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, আঁখি সেন। তবে ঝিনুক নামটাই বেশি পপুলার।''

''ও আচ্ছা,'' বলে ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যের হাসি হাসলেন অমরেশবাবু। কথার রেশ ধরে বলতে থাকলেন, ''আমি ভেবেছিলাম আপনার আত্মীয়, ভাইবি কিংবা ভাগনি। গোয়েন্দাদের কাজে ইন্টারেস্ট আছে, তাই এসেছে। এত অল্প বয়স, অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারে একবারও মনে হয়নি।''

থামলেন অমরেশবাবু। ঝিনুক ভাবে, কবে যে তাকে একটু বড়-বড় দেখতে লাগবে! এবার থেকে ফল্‌স ডখল পরবে কি? ফের অমরেশবাবুই বলতে শুরু করলেন, ''যাই হোক, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কিন্তু একটা ভ্যালিড প্রশ্ন তুলেছে। হ্যাঁ, গৌরবের কাছে আমি খুবই স্নেহ করতাম, ভরসাও করতাম তীষণ রকম। এদিকে ফোনকলটাকে ঠিক আসল দুর্বৃত্তের মনে হচ্ছিল না। কারণ, সে তাঁর কাজ করবে না। এই ধরনের ব্ল্যাকমেলিং আগেও বেশ ক'টা করেছে। জানে, চোখের সামনে ভিকটিমের কষ্ট দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত, এত টাকা কেউ বের করবে না। কষ্টটা আমি দেখতে পাচ্ছি অথবা খবর নিয়ে জানছি বেহালার অফিসে গিয়ে গৌরব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তবেই আমি টাকাটা দেওয়ার কথা ভাবব।

''এই দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আসল ব্ল্যাকমেলার আমাকে ফোন করবে। আর নকল লোকটা যেটা করবে, গৌরবকে বাইক নিয়ে বেরতে দেখেই ফোন করবে আমাকে। ঘটনাটা কনফার্ম করার জন্য আমি ফোন করব গৌরবকে। বাইক চালাচ্ছে বলে গৌরব ফোনের রিং শুনতে পাবে না। আমি তখন কল করব বেহালার অফিসে, সেখানেও পাব না গৌরবের খবর। তখন ফল্‌স ব্ল্যাকমেলারের হাতে টাকা তুলে দেওয়া ছাড়া আমার কাছে আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।''

''তার মানে আপনারই সন্দেহ পড়েছিল এমন একজনের উপর, যে জানত গৌরববাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেহালার অফিসে যাবেন না। হয়তো সে জেনেছিল গৌরববাবু আমার কাছে আসবেন। কে সেই লোকটি?'' প্রশ্ন রাখলেন দীপকাকু।

অমরেশবাবু বললেন, ''একটি লোক নয়, একাধিক। বেশ বড় আকারে বিজ্‌নেস করি, শত্রু তো থাকবেই। তাদের মধ্যেই কোনও একজন হবে বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল তা নয়।''

থামলেন অমরেশবাবু। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ''আমার কী মনে হয় জানেন, আসল ব্ল্যাকমেলার জানত না গৌরব আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ভেবেছিল, অন্যান্য দিনের মতোই বেহালার সাইটে যাচ্ছে। যাওয়ার পথে গৌরবের শরীরে কোনওভাবে শ্বাসের কষ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্ত। এর পরই গৌরব অপরাধীর নাগালের বাইরে চলে যায়। মানে, আপনার সঙ্গে দেখা করার পথ ধরে। দুর্বৃত্ত ওদিকে নজর রেখেছে বেহালার অফিসে। সেখানে গৌরব না পৌঁছনোতে তার সমস্ত ছক গুলিয়ে যায়। তাই আমাকে টাকা দেওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার তাগাদা দেয়নি। জানে, খবরটার সত্যতা না জানা পর্যন্ত আমি কেন, কেউই টাকা দেবে না।''

''হুম, আপনার অনুমান ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে বেশ আশ্চর্য বোধ করছি,'' বললেন দীপকাকু।

''কোন ব্যাপারে?'' অমরেশবাবুর গলায় সবিস্ময় কৌতূহল।

''কথাটা বলতে খারাপ লাগছে, তবু বলি, টাকা যখন আপনার থেকেই আদায়ের প্ল্যান ছিল দুষ্কৃতীর, তা হলে শ্বাসকষ্টটা আপনাকে দিল না কেন সে?''

দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে অমরেশবাবু বলতে থাকলেন, ''আমাকে শ্বাসকষ্ট দেওয়ার সুযোগ কম। আমি যথেষ্ট প্রোটেকটেড অবস্থায় থাকি। বাড়ি থেকে গাড়িতে কলেজে যাই, সোজা চেম্বারে ঢুকে পড়ি। একইভাবে বাড়ি ফিরে আসি। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সাইটে আমায় যেতেই হত না। গৌরব সব সামলাত। ওই বিজ্‌নেস নিয়ে কোনও আলোচনা করার থাকলে আমরা বাড়িতে বসেই করে নিতাম। তিনটে নামী ক্লাবের মেম্বারশিপ আছে আমার। আড্ডা মারতে, ডিনার করতে যাই না। ভাল লাগে না। এক সময় খুব যেতাম। সিনেমা, নাটক, শপিং

মল কোথাও আর যাওয়া হয় না। ইচ্ছেই করে না। এই নিয়ে আমার স্ত্রীর অনেক অনুযোগ। আমার কারণে ওরও বড় একটা বাইরে বেরনো হয় না। এ বাড়ির বাকি দুই ইম্পর্ট্যান্ট মেম্বার, আমার ছেলে আর গৌরব নানান জায়গায় যায়, বাইরে অনেকটা সময় কাটায়। দু'জন আমার সমান প্রিয়। এদের একজনকে শিকার বানালে আমি যে টাকা দিতে রাজি হয়ে যাব, ব্ল্যাকমেলার ভালমতেই জানত। বিশেষ কোনও সুবিধের কারণে টার্গেট করল গৌরবকে।"

"আচ্ছা, আপনার কি এ কথা মনে হচ্ছে না, গৌরববাবুর কাছে ব্ল্যাকমেলারের সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য ছিল, যা তিনি আমাকে বলতে আসছিলেন, সেটা টের পেতেই ব্ল্যাকমেলার তাকে সরিয়ে দিল জীবন থেকে?"

দীপকাকুর প্রশ্ন শুনে একমনে ভাবতে থাকলেন অমরেশবাবু। বলে উঠলেন, "জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেই যদি ছিল, তা হলে ওকে বাঁচানোর জন্য আমার কাছে টাকা চাইল কেন?"

"এটা অবশ্য আপনি ভুল বলেনি। তবে ব্ল্যাকমেলারের সম্বন্ধে কথা বলতে আসার সময় ওই দুষ্কৃতীর প্ল্যানেই মৃত্যু, ব্যাপারটাকে আমার পুরোপুরি কাকতালীয় ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনও একটা যোগসূত্র আছেই," স্বগতোক্তির ঢঙে কথা শেষ করলেন দীপকাকু।"

অমরেশবাবু বললেন, "দেখুন, আমি গোয়েন্দা নই। আপনাদের মতো করে ভাবা আমার আয়ত্ত বাইরে। সাধারণ বুদ্ধিতে যা বুঝছি, সেটাই বললাম।"

"আপনার বুদ্ধি মোটেই সাধারণ নয়, এতক্ষণ কথা বলে সেটা আমি ভালমতোই টের পেয়েছি। এক্সট্রাঅর্ডিনারি বুদ্ধি ছাড়া কি এতবড় বিজনেস সামলানো সম্ভব? আমার শুধু একটাই আক্ষেপ, এই ঘটনাটি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি পুলিশ। মানে, আপনিই বলেননি। বললে পুলিশের গোয়েন্দাদের হয়তো উপকার হত," থামলেন দীপকাকু। কিছু একটা মনে পড়াতে ফের বলে উঠলেন, "ও আচ্ছা। আপনি কিন্তু এখনও বলেননি পুলিশের কাছে মৃত্যুটা অস্বাভাবিক বলেল আপনার কী সমস্যা হত?"

"দেখুন, পুলিশ এই ধরনের ঘটনার তদন্ত অনেক আগে থেকেই করছে। এখনও পর্যন্ত অপরাধীর টিকি ছুঁতে পারেনি। গৌরবের ব্যাপারটা নিয়ে গেলে আলাদা করে কোনও সুবিধে করতে পারত বলে মনে হয় না। উলটে আমাকে নিয়ে পড়ত। জানতে চাইত, বাড়িতে দশ লাখ টাকা ছিল, না কারও থেকে ধার করতেন? কারা ধার দিত আপনাকে? কার নাম নেব আমি? বলতে হত টাকা বাড়িতে ছিল। তখন প্রশ্ন উঠত, টাকাটা সাদা না কালো? এরকম নানান ফ্যাকড়া। ওদের তো কাজ দেখাতে হবে। আমি তাই স্ত্রীর কথাই মেনে নিলাম। পুলিশের কাছে গেলে তো গৌরব ফিরবে না। নিজেরা উত্যক্ত হওয়ার চেয়ে চুপ থেকে যাওয়াই শ্রেয়। তা ছাড়া শুধু তো পুলিশ নয়। এই শোকের সময় মিডিয়ার লোকজন এসে নানান প্রশ্ন করত।"

"তবু বলব, পুলিশেরর কাছে যাওয়া আপনার উচিত ছিল। অপরাধের প্রতিটি ইন্সিডেন্ট থেকে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই কেসে পুলিশ ইতিমধ্যে বেশ কিছু ইনফরমেশন পেয়েছে। আপনারটা পেলে হয়তো অপরাধীর আরও কাছে পৌঁছতে পারত। জানি, গৌরব ফিরবে না। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না গৌরবের দশা আরও অনেকের হোক।"

দীপকাকুর কথার উত্তরে অমরেশবাবু বললেন, "অপরাধী ধরা পড়ুক আমিও চাই। আমাদের শোকে তাতে একটু প্রলেপ পড়ত। আমি শুধু পুলিশি ঝামেলায় জড়াতে চাই না। পুলিশের বদলে আপনার মতো কোনও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর যদি কেসটার তদন্তভার নেন, তাঁর ফিজ দিতে আমি তৈরি। আপনি নেবেন এই তদন্তের ভার?"

"আপনার থেকে নেব না। আমি নিজের থেকেই ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাব। কারণ, কেসটা নিয়ে আপনি আমার কাছে আসেননি, আমি এসেছি। ফিজ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অমরেশবাবু বললেন, "হ্যাজ ইউ উইশ। আমি সব সময় আপনার পাশে থাকব। যখন যা হেল্প লাগবে বলবেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ," বলে সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন দীপকাকু, ফের বসে পড়লেন। মনে হচ্ছে নতুন কোনও প্রশ্নেট মাথায় এসেছে। বলে উঠলেন, "আচ্ছা, গৌরববাবু কি সম্প্রতি শ্বাসকষ্ট দেওয়া ওই ব্ল্যাকমেলারের বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোনও কথা বলেছেন? বলে থাকলে অপরাধীর ব্যাপারে সামান্য হিন্ট পাওয়া যেতে পারে।"

"না, আমার জন্যে এ ব্যাপারে কোনও কথাই হয়নি।"

"আপনার ছেলের সঙ্গে গৌরববাবুর সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"বেশ ভাল, একেবারে বন্ধুর মতো। কেন এ কথা জানতে চাইছেন?" ভীষণ অবাক হয়েছেন অমরেশবাবু।

দীপকাকু বললেন, "হয়তো আপনার ছেলেকে ওই অপরাধীর ব্যাপারে কিছু বলে থাকতে পারেন গৌরববাবু। ছেলেকে কি একবার ডাকা যায়? জেনে নিতে পারতাম কোনও কথা হয়েছিল কিনা?"

"ও হয়তো এখনও ফেরেনি। বেলা করে মর্নিংওয়াকে বেরয়।"

"আমার মনে হচ্ছে ফিরেছে। আশপাশেই আছে হয়তো। একবার হাঁক দিয়ে দেখুন না।"

দীপকাকু কী করে বুঝছেন অমরেশবাবুর ছেলে কাছাকাছি আছেন, ধরতে পারে না ঝিনুক। প্রশ্নটা অমরেশবাবুর মাথাতে এল কিনা কে জানে! ভিতরের দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ডাক দিলেন, "বাবান, বাবান। সত্য, দ্যাখো তো বাবান ফিরল কিনা?"

ডাক শেষ হতে না-হতেই ভিতর থেকে পরদা সরিয়ে ঘরে পা রাখলেন বছর ছাব্বিশ-আটাশের যুবক। চেহারায় অমরেশবাবুর আদল। পরনে ট্র্যাকসুট, জগিং শু। অমরেশবাবু আলাপ করালেন দীপকাকুর সঙ্গে, "আমার ছেলে সৌম্যদীপ। দুটো ব্যবসার কাজই দেখাশোনা করে।"

সৌম্যদীপকে বললেন, "ইনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর দীপঙ্কর বাগচী। গৌরবের ঘটনাটা নিয়ে কথা বলতে এসেছেন।"

দীপকাকু জোড়হাত করে নমস্কারের সৌজন্য দেখালেন। সৌম্যদীপের দিক থেকে কোনও প্রত্যুত্তর এল না। কেমন যেন ভাষাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সরাসরি প্রশ্নে চলে গেলেন দীপকাকু। সৌম্যদীপকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মামা, মানে গৌরববাবু কি কখনও শ্বাসকষ্ট দেওয়া ব্ল্যাকমেলারের প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে কোনও কথা বলেছেন?"

দু'পাশে ঘাড় নেড়ে 'না' বোঝালেন সৌম্যদীপ। ফের চেয়ে রইলেন বোবা দৃষ্টিতে। অমরেশবাবু দীপকাকুর উদ্দেশে বলে উঠলেন, "ওকে আপনি-আপনি করার দরকার নেই। আপনার চেয়ে অনেকটাই ছোট।"

"হুম," বলে উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। ডুব দিয়েছেন চিন্তায়। ঝিনুকও সোফা ছেড়ে উঠল। দীপকাকু বললেন, "আজ তা হলে আসি। প্রয়োজনমতো আপনাকে ফোন করে নেব।"

॥ ৩ ॥

সকাল ন'টা। ক্যারাটে ক্লাস থেকে ফিরল ঝিনুক। সাইকেল থেকে নেমে গেট খুলে ঢুকল বাড়ির চত্বরে। আজ রবিবার। দীপকাকুর আসার চান্স আছে। ব্ল্যাকমেলারের কেসটা নিয়ে বাবার সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় এখনও বসেননি। ঝিনুককে ট্র্যাকসুটে দেখলে খুশি হবেন দীপকাকু। বুঝবেন প্র্যাকটিসে আছে। ক্যারাটের ড্রেস অবশ্য আলাদা, ক্লাব থেকে বেরনোর আগে স্পোর্টস কিটে পুরে নিয়েছে ঝিনুক।

বাড়ির বাগানে নিজের সাইকেল স্ট্যান্ড করতে গিয়ে ঝিনুক টের পায় দীপকাকু আসেননি এখন পর্যন্ত। এলে ওঁর বাইক দেখা যেত।

ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই বাবা বলে উঠলেন, "কাগজে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অ্যাডটা দ্যাখ।"

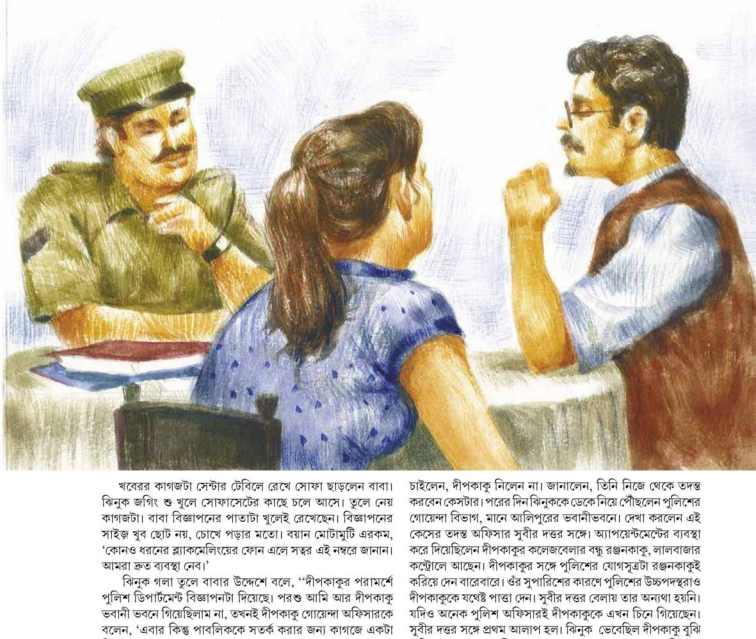

খবেরর কাগজটা সেন্টার টেবিলে রেখে সোফা ছাড়লেন বাবা। ঝিনুক জগিং শু খুলে সোফাসেটের কাছে চলে আসে। তুলে নেয় কাগজটা। বাবা বিজ্ঞাপনের পাতাটা খুলেই রেখেছেন। বিজ্ঞাপনের সাইজ খুব ছোট নয়, চোখে পড়ার মতো। বয়ান মোটামুটি এরকম, 'কোনও ধরনের ব্ল্যাকমেলিংয়ের ফোন এলে সত্বর এই নম্বরে জানান। আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেব।'

ঝিনুক গলা তুলে বাবার উদ্দেশে বলে, ''দীপকাকুর পরামর্শে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে। পরশু আমি আর দীপকাকু ভবানী ভবনে গিয়েছিলাম না, তখনই দীপকাকু গোয়েন্দা অফিসারকে বলেন, 'এবার কিন্তু পাবলিককে সতর্ক করার জন্য কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। নয়তো ব্ল্যাকমেলারকে থামানো যাবে না।'''

''পুলিশ এতদিন অ্যাডটা দেয়নি কেন?'' জানতে চাইলেন বাবা।

ঝিনুক বলল, ''পুলিশের ওই একটাই ভয়, পাবলিক লাইফে সাফোকেটরকে নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে যাবে।''

বাবা ভিতর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্ময়ের গলায় বলে ওঠেন, ''সাফোকেটরটা আবার কে?''

মিচকি হেসে ঝিনুক বলে, ''পুলিশের দেওয়া নাম। অপরাধী শ্বাসকষ্ট দিচ্ছে বলে সাফোকেটর।''

''বাহ, বেড়ে নাম দিয়েছে তো পুলিশ! ভবানী ভবনের এপিসোড তো শোনাই হয়নি, যা ব্যস্ত ছিলাম কাল। দাঁড়া, তোর মায়ের কাছ থেকে জেনে নিই বাজার যেতে হবে কিনা? যেতে হলে ফিরে এসে শুনব,'' বলে কিচেনের দিকে এগোলেন বাবা।

ঝিনুক সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে। বাইরের হাত-মুখ ধোবে, পোশাক বদলাবে ঘরে গিয়ে। ভবানী ভবনের পর্বটা ঝিনুক ইচ্ছে করেই বাবাকে ডেকে বসিয়ে বলেনি। ভেবেছিল, দীপকাকুর তো রবিবার আসার কথা আছে, যা বলার উনিই বলবেন। এখন দেখা যাক দীপকাকু আসেন কিনা? এই কেসটা নিয়ে দীপকাকু কতটা এগোবেন, এখনও ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। অমরেশ বসু ইনভেস্টিগেশনের বরাত দিতে চাইলেন, দীপকাকু নিলেন না। জানালেন, তিনি নিজে থেকে তদন্ত করবেন কেসটার। পরের দিন ঝিনুককে ডেকে নিয়ে পৌঁছলেন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ, মানে আলিপুরের ভবানীভবনে। দেখা করলেন এই কেসের তদন্ত অফিসার সুবীর দত্তর সঙ্গে। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন দীপকাকুর কলেজবেলার বন্ধু রঞ্জনকাকু, লালবাজার কন্ট্রোলে আছেন। দীপকাকুর সঙ্গে পুলিশের যোগসূত্রটা রঞ্জনকাকুই করিয়ে দেন বারেবারে। ওঁর সুপারিশের কারণে পুলিশের উচ্চপদস্থরাও দীপকাকুকে যথেষ্ট পাত্তা দেন। সুবীর দত্তর বেলায় তার অন্যথা হয়নি। যদিও অনেক পুলিশ অফিসারই দীপকাকুকে এখন চিনে গিয়েছেন। সুবীর দত্তর সঙ্গে প্রথম আলাপ হল। ঝিনুক ভেবেছিল দীপকাকু বুঝি পুলিশের থেকে তথ্য নিতে এসেছেন। দেখা গেল তথ্য যেমন নিলেন, দিলেনও। অমরেশ বসু চাননি তাঁদের বাড়ির ঘটনাটা পুলিশকে জানাতে। দীপকাকু রঞ্জনকাকুকে আগেই জানিয়ে গৌরব বণিকের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং সেলফোনের কললিস্ট সংগ্রহ করেছেন। ময়নাতদন্তে হার্ট অ্যাটাক ছাড়া আর কিছু বলা নেই। কললিস্ট দেখে কলারদের খোঁজখবর নিচ্ছেন দীপকাকু। গৌরব বণিকের মৃত্যুর আগে ওঁর মোবাইলে অমরেশ বসু দু'বার ফোন করেছিলেন, সেটা কললিস্টে পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত তথ্য সুবীর দত্তকেও জানালেন দীপকাকু। একই সঙ্গে অনুরোধ করেন, ''আপাতত অমরেশ বসুদের ইন্টারোগেট করার দরকার নেই। ওঁদের বাড়িতে শোকের আবহাওয়া। গৌরব বণিকের মৃত্যুর ঘটনা বললাম এই কারণে, হয়তো আপনাদের ইনভেস্টিগেশনে কিছু সুবিধে হবে।''

ভারী চেহারার সুবীর দত্তর ব্যবহার বেশ আন্তরিক, ঘরোয়া টাইপ। দীপকাকুকে বলেছিলেন, ''আপনি ওঁদের যে ভাবে খুঁটিয়ে ইন্টারোগেট করছেন, আমাদের আলাদাভাবে করার প্রয়োজন নেই। আমরা যে পাঁচটা পার্টিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, আপনার মতোই তথ্য পেয়েছি। লাভ তো কিছু হয়নি। অপরাধী ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছে। লোকটা ভয়ানক চালাক। কোনও ফাঁক রাখে না ব্ল্যানে।''

দীপকাকু তখন জানতে চেয়েছিলেন, ''আপনার যে পাঁচটি আক্রান্ত

পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন, তারা কী পদ্ধতিতে টাকা পৌঁছে দিয়েছে ক্রিমিনালের কাছে, ওষুধ পেয়েছে কীভাবে?"

গোয়েন্দা অফিসার সুবীর দত্ত ক্রমানুসারে পাঁচটি পরিবারের ঘটনাগুলো বললেন। প্রথম আক্রান্ত পরিবার পুলিশের কাছে সাহায্য চায়নি। ভেবেছিল উড়ো ফোন। বাড়ির কর্তা মারা যাওয়ার পর ডাক্তার যখন ডেথ সার্টিফিকেট না দিতে চেয়ে মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করতে বলেন, পুলিশের গোচরে আসে বিষয়টা। ঘটনাটা ঘুরিয়ে ভবানীপুরে। মারা গিয়েছিলেন বাড়ির কর্তা বিজন সাহা। পুলিশ সাহা পরিবারকে তদন্তের আশ্বাস দেয়। বলে, ব্যাপারটা পাঁচকান না করতে। করলে লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। ওই বাড়ির কোনও এক বা একাধিক সদস্য পুলিশের নির্দেশ মানেনি, তাই ঘটনাটা খবরের কাগজে প্রকাশ হয়ে যায়। টাকা দেওয়া এবং ওষুধ নেওয়ার ব্যাপারে ব্ল্যাকমেলারের নির্দেশ ছিল, 'আমি যে নম্বরে কল করলাম, এই ফোন সেটটা সঙ্গে রেখে পরিবারের কোনও একজন সুটকেসে টাকা ভরে বাড়ি থেকে বেরবে। এই নম্বরে ফের কল করে বলে দেব সুটকেস কোথায়, কীভাবে দিতে হবে। দেওয়ায় আগে পর্যন্ত ওই ফোন থেকে কোনও কল করা যাবে না। আমার ছাড়া অন্য কোনও কল ধরাও যাবে না।'

সাহা পরিবার যেহেতু টাকা নিয়ে বেরয়নি, পরবর্তী পর্যায়ের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এমনকী, টাকা নিয়ে বেরনোর জন্য তাগাদাও আসেনি ব্ল্যাকমেলারের থেকে।

দ্বিতীয় আক্রান্ত পরিবার মানিকতলার ঘোষালবাড়ি। টাকা ভর্তি সুটকেস নিয়ে বাড়ির সদস্য গেট থেকে বেরতেই ফোন আসে ব্ল্যাকমেলারের। বলা হয়, শিয়ালদাগামী যে বাসটা আসছে উঠে পড়ুন। পরের ফোনটা আসে বাস শিয়ালদা পৌঁছলে। নির্দেশ আসে, নেমে পড়ুন বাস থেকে। স্টেশনের ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে চলে যান। ওয়েটিং রুমের চেয়ারে আধঘণ্টা বসার পর ফোনে বলা হয়, সুটকেসটা রেখে চলে যান। আপনাদের বাড়ির লেটার বক্সে ওষুধ রাখা আছে। পুরোটাই খাইয়ে দেবেন অসুস্থকে। এখনই বাড়ির লোককে ফোন করে জানিয়ে দিন ওষুধের ঠিকানা। নয়তো দেরি হয়ে যাবে। তৃতীয় পরিবার যাদবপুরের। আক্রান্ত হন বাড়ির কর্তা প্রিয়নাথ পোদ্দার। টোটো রিকশায় চেপে ঠিকানা রেখে আসতে হয় নিমীয়মান ফ্ল্যাট বাড়ির ছ'তলায়। ওষুধ পাওয়া যায় ওই ফ্ল্যাটেরই তিনতলায় প্লাস্টার না হওয়ায় থামের পাশে।

চতুর্থজন সুকিয়া স্ট্রিটের বনেদি বাড়ির কর্তা মিলন রায়চৌধুরী। বাড়ির লোককে বলা হয় শাটল ট্যাক্সি ধরে ডানলপে যেতে। ভাড়া মেটানোর সময় টাকার ব্যাগ নামিয়ে রাখতে হবে রাস্তায়। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া দেওয়ার পর চৌধুরী বাড়ির সদস্য দেখে পাশে রাখা সুটকেসটি হাওয়া। ওরা ওষুধ পায় সুকিয়া স্ট্রিটের এক পোড়ো বাড়ির দেওয়ালের কোটরে।

পঞ্চমজন হেমন্ত সাংভি, গুজরাটি ব্যবসায়ী। থাকেন সাউথ সিটি কমপ্লেক্সের দশতলায়। তাঁদের টাকা রাখতে বলা হয়েছিল সাউথ সিটির আইনক্সে। বাকি সকলের ক্ষেত্রে দশ লাখ চাওয়া হলেও, সাংভি ফ্যামেলির কাছে ডিমান্ড করা হয় কুড়ি। আইনক্সের ওই শোটাইমে হল ছিল প্রায় ফাঁকা। গোটাবিশেক দর্শক। হয়তো তাদের মধ্যেই কোনও একজন সেই ব্ল্যাকমেলার। ওষুধ রেখেছিল সাংভি ফ্যামেলি সাউথ সিটির যে টাওয়ারে থাকে, তার ফাঁকা লিফ্‌টে।

কথা এখানে পৌঁছতে দীপকাকু জানতে চেয়েছিলেন, "আইনক্স এবং লিফ্‌টের করিডরগুলোর সি সি টিভি ফুটেজ চেক করেছেন?"

অফিসার সুবীর দত্ত বলেছিলেন, "করেছি। এমন কোনও কমন লোককে পাইনি যে আইনক্সেও ছিল, লিফ্‌টের করিডরেও।"

এর পর দীপকাকু জানতে চান, "ব্ল্যাকমেলার যে ওষুধটা দিচ্ছে, সেটা লিকুইড, না সলিড?"

"ডাস্ট, সাদা রঙের। হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো কাগজের পুরিয়ায় রাখা," বলেছিলেন সুবীর দত্ত।

দীপকাকু বলেছিলেন, "ওষুধের সামান্য স্পেসিমেন আপনাদের হাতে এসেছে নিশ্চয়ই? কোনও না-কোনও আক্রান্তের পরিবার দিয়েছে আপনাদের। ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করিয়েছেন?"

"কেউ দেয়নি। ওই যে ব্ল্যাকমেলার বলে দিচ্ছে, ওষুধের পুরোটাই খাইয়ে দেবেন। কম খাওয়ালে যদি কাজ না হয়, এই ভেবে সকলেই পুরো ওষুধ খাইয়েছে। পুরিয়ায় কাগজটা অন্তত রেখে দেওয়ার দরকার, সেটাও ভাবেনি।"

সুবীর দত্তর কথা শুনে নিয়ে দীপকাকু পরের প্রশ্নে গিয়েছিলেন, "কীভাবে শ্বাসকষ্ট দেওয়া হচ্ছে শরীরে। তার কোনও প্রমাণ এসেছে হাতে?"

"দু'জনের বডি, মানে প্রথমজন আর আপনাদের গৌরব বণিকের পোস্টমর্টেম হয়েছে। কীভাবে রোগের শিকার করা হচ্ছে বোঝা যায়নি। শরীরে ইনজেকশনের চিহ্ন নেই। শ্বাসের সঙ্গে যদি বিষ বাতাস ঢোকানো হয়ে থাকে, তারও কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি শরীরের ভিতর। বাকি আক্রান্তর পরিবার ডেথ সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছিল ডাক্তারদের থেকে। বডি পোস্টমর্টেমের জন্য আসেনি পুলিশের কাছে। দাহর্পর্ব মেটার পর পরিবারের লোক থানায় কমপ্লেন নিতে আসে।"

সুবীর দত্তর বলা শেষ হতেই দীপকাকু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্রথম আক্রান্তের ডাক্তার মৃত্যুটাকে অস্বাভাবিক মনে করে ডেথ সার্টিফিকেট দেননি। পোস্টমর্টেম করাতে হয়েছে তাদের। গৌরব বণিকের মৃত্যু হয়েছে যেহেতু রাস্তায়, পুলিশের বিবেচনায় ময়নাতদন্ত হল। বাকি আক্রান্তদের বেলায় ডাক্তারেরা ডেথ সার্টিফিকেট দিল কেন? জেরা করেছেন সেই সব ডাক্তারদের?"

"করা হয়েছে জেরা। আক্রান্তর মৃত্যুর পর পরিবার থেকে ডাকা হয়েছিল তাঁদের। শরীর পরীক্ষা করে ডাক্তারদের অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। হার্টফেল করে মৃত্যুই মনে হয়েছে। আসলে তাঁরা তো আক্রান্ত ব্যক্তির হঠাৎ পাওয়া কষ্টটা দেখেননি। যেটা প্রথমজনের ডাক্তার দেখেছিলেন। মানে, কল দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ওই কষ্টটাকে কোনও ওষুধ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারেননি। মনে হয়েছিল ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। হয়তো বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই বডি পোস্টমর্টেমে পাঠান।" বলার পর থেমেছিলেন সুবীর দত্ত। কয়েক সেকেন্ড বাদেই অনামনস্ক গলায় বলে ওঠেন, "কেসটা এত সেনসেটিভ, আমরা ঠিক মতো মুভ করতে পারছি না।"

"কেন বলছেন এ কথা?" কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

সুবীর দত্ত বললেন, "প্রথমত আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে আক্রান্তের মৃত্যুর পর পরিবার চাইছে তাদের খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে দেওয়া হোক। কীভাবে করব? অপরাধী এতক্ষণে যা ঘটানোর ঘটিয়ে চলে গিয়েছে তার নিরাপদ আস্তানায়। হুমকির ফোন আসার সঙ্গে-সঙ্গে যদি আক্রান্তের পক্ষ থেকে আমাদের ইনফর্ম করা হয়, আমরা লোকটাকে ধরার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু সেখানে একটা বড় ঝুঁকি থেকে যায়।"

"কী রকম ঝুঁকি?" জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

সুবীর দত্ত জানালেন, "ধরুন, ব্ল্যাকমেলিংয়ের ফোন পেয়ে পরিবারটি আমাদের ইনফর্ম করল, আমরা ফোনে কথা শুরু করলাম পরিবারের পক্ষ থেকে যে লোকটি টাকা নিয়ে বেরল, তাকে। সুটকেস হস্তান্তরের পর আমরা ধাওয়া করতে লাগলাম টাকাগুলো যে নিল তাকে। ব্ল্যাকমেলার সেটা যদি টের পায়, জানাবে না ওষুধ কোথায় আছে। শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত মানুষটি মারা যাবে। তার পরিবারের লোক কিন্তু তখন দোষ দেবে পুলিশকে। বলবে, পুলিশ কেন এমনভাবে ফলো করবে যে, অপরাধী টের পেয়ে যাবে! এই সাফোকেটরটা আমাদের পুরোপুরি দর্শকের ভূমিকায় রেখে দিয়েছে।"

আচমকা 'সাফোকেটর' সম্বোধনটা উঠে আসতে, ঝিনুক ধন্দে

পড়ে গিয়েছিল। দীপকাকু স্মিত হেসে বলেছিলেন, ''শ্বাসকষ্ট দেয় বলে ওই নাম দিয়েছেন?''

''হ্যাঁ, এত ধূরন্ধর অপরাধী পুলিশজীবনে প্রথমবার ফেস করছি,'' বিরস মুখে বলেছিলেন সুবীর দত্ত।

দীপকাকু বলেন, ''অ্যাক্সেস্ড ঘনিষ্ঠকে টাকা নিয়ে বেরনোর পর আপনারা ফলো করবেন কেন? যে নম্বর থেকে হুমকির ফোন আসছে, সেটা ট্র্যাক করে অপরাধীকে ধরুন।''

''পাঁচজন পার্টির কাছেই আমরা হুমকি দেওয়া ফোনের নম্বর পেয়েছি। পাঁচটা আলাদা নম্বর। অপারেশনের পরেই নম্বরগুলো ডিঅ্যাক্টিভেট করা হয়েছে। সম্ভবত জাল সিমকার্ড ব্যবহার করেছে অপরাধী। ইদানীং সীমান্ত পেরিয়ে প্রচুর ভুয়ো সিমকার্ড ঢুকছে ভারতে।''

সুবীর দত্তর বলা শেষ হতে দীপকাকু খানিকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বলে উঠেছিলেন, ''জনসাধারণের উদ্দেশে একটা বিজ্ঞাপন আপনারদের দিতেই হবে। হয়তো এখনও ওই অপরাধী অবলীলায় নিজের কুকীর্তি চালিয়ে যাচ্ছে। অাক্রান্তের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ আসছে না পুলিশের কাছে। যেমন গৌরব বণিকের বাড়ির ব্যাপারটা আমি এসে না জানালে, জানতেই পারতেন না। এভাবে কতদিন চলবে? খবরগুলো এক সময় ছড়িয়ে পড়বেই। তখন সবাই আঙুল তুলবে পুলিশের দিকে। ততদিনে আরও অনেক এরকম অপরাধ ঘটে যাবে।''

''সবই তো বুঝলাম, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভ তো কিছু হবে না। আমাদের হাত-পা বাঁধা। ব্ল্যাকমেলারের ফোন পেয়ে কেউ যদি আমাদের জানায়, সেই মুহূর্তে কোনও ব্যাকশনই নিতে পারব না। অসুস্থ ওষুধ পাওয়ার পরই তদন্তে নামতে হবে। আগের কেসগুলো নিয়ে তাই তো করে যাচ্ছি। কাগজে অ্যাড দিলে আরও ফোন আসবে, নতুন অাক্রান্তের পরিবার অতিষ্ঠ করে মারবে আমাদের। এর মধ্যে কিছু ভুয়ো ফোন চালাচ্ছি হবে।''

সুবীর দত্তর কথায় সহমত হননি দীপকাকু। বলেছিলেন, ''এতটা সময় বা সুযোগ অপরাধীকে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। লোকটা যদি একটা টার্গেট ঠিক করে রাখে, এতটা টাকা তোলায় পর আমি ব্ল্যাকমেলিং বন্ধ করে দেব, তখন ওর কাছে পৌঁছনো আরও কঠিন হয়ে যাবে। অন্য অনেক অাসনলভ্ড কেসের মতো পুলিশের ব্যর্থতার খাতায় লেখা থাকবে এই অপরাধটাও। সেই কারণেই বলছি লোকটা যখন অপাংক্তেয় আপনাটা চালাবে, তখনই ওকে ধরার চেষ্টা করতে হবে। তাই বিজ্ঞাপনটা দেওয়া প্রয়োজন। নয়তো অাক্রান্তর পরিবারার থেকে ফোন পাবেন না আপনারা।''

''ফোন পাওয়ার পর আমাদের করণীয়টা বলুন?'' জানতে চেয়েছিলেন সুবীর দত্ত।

দীপকাকু বললেন, ''বিজ্ঞাপনটাকে আমি টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। মানে, অপরাধীকে ধরার প্রথম পদক্ষেপ। আপনারা যে ব্ল্যাকমেলারকে ধরার জন্য উদগ্রীব এবং সক্রিয়, কাগজে অ্যাড বেরলে টের পাবে জনসাধারণ। কোনও না-কোনও অাক্রান্তের পরিবার একটু সাহসী হয়ে ফোন করবে আপনাদের। অবাধে অপরাধ করে যাওয়াটা যে ফ্যামেলি নিতে পারবে না। সবাই পারে না। প্রতিরোধের জন্য একটু ঝুঁকি নেবেই। আপনাদের অ্যাডটা হবে তাদের একমাত্র ভরসা। এবার আপনারা যেটা করবেন, একটা সুটকেসে এমনভাবে টাকাগুলো সাজানো, যার বান্ডিলের উপরের এবং নীচের দু'-তিনটে নোট আসল। মাঝের কাগজগুলো ফলস, বান্ডিলের সাইজ় করে কাটা। অাক্রান্তর পরিবার থেকে ফোন পেয়ে সুটকেসটা ওদের হাতে ধরিয়ে দিন। বলুন অপরাধীকে ওই সুটকেসটা দিতে।''

''তাতে লাভ কী হবে! ফলস টাকা পেলে কী ওষুধ দেবে সাফেকেটর?''

সুবীর দত্তর প্রশ্নর উত্তরে দীপকাকু বলেছিলেন, ''অপরাধীর প্ল্যান একবারে নিখুঁত হলেও, এই একটি জায়গায় সামান্য ফাঁক থেকে গিয়েছে এবং সেটা হয়েছে পরিকল্পনা নিশ্ছিদ্র করতে চাওয়ার কারণেই। অাক্রান্তর পরিবারকে সে খুব কম সময় দিচ্ছে। মাত্র একঘন্টা। যাতে টাকাটা তাড়াতাড়ি হাতে এসে যায়। ওইটুকু সময়ের মধ্যে টাকাটা না দেওয়ার কোনও ফন্দি আঁটতে পারবে না অাক্রান্তের পরিবার। একঘণ্টার মধ্যে ওষুধ খাওয়াতেই হবে অসুস্থকে। অর্থাৎ অপরাধীকেও ওষুধের হদিশ দিতে হবে ওই সময়ের ভিতরেই। যে পরিবার আপনাদের থেকে ফলস টাকার সুটকেসটা নেবে, তাদের বলা হবে খানিকটা গড়িমসি করে, ফোন পাওয়ার পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট পর যেন টাকাটা অপরাধীর হাতে তুলে দেয়। টাকাগুলো ভাল করে দেখার আগেই অপরাধীকে ওষুধের হদিশ জানিয়ে দিতে হবে। কেননা, অসুস্থকে বাঁচানোর জন্য ওই একঘণ্টা সময় তারই দেওয়া।''

''ভাল প্ল্যান,'' মাথা নেড়ে বলেছিলেন সুবীর দত্ত। ঝিনুকেরও তাই মনে হয়েছিল। শুধু বুঝে উঠতে পারছিল না দীপকাকু কেন কোন প্ল্যানটা দিচ্ছেন পুলিশকে? হয়তো ভাবছেন নিজে কাগজে অ্যাড দিলে যতটা নাম সাড়া পাবেন, তার চেয়ে পুলিশ বেশি পাবে। প্রাইভেট ডিটেকটিভের চেয়ে লোকে পুলিশের উপর বিশ্বাস করবে বেশি। ভাবনা শেষ হতেই ঝিনুকের মনে একটা প্রশ্ন উঁকি মারে, গৌরব বণিক কেন এই কেসে দীপকাকুর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন? পুলিশের কাছে গেলেন না কেন?

দীপকাকুর দেওয়া পরিকল্পনাটা ভাল করে ভেবে নিয়ে সুবীর দত্ত বলে উঠেছিলেন, ''সাফোকেটরকে ঠকিয়ে আমরা না হয় একজন অাক্রান্তকে বাঁচালাম। বারবার তো তা হবে না। পরের বার সাফোকেটর সময় কম দেবে অাক্রান্তর পরিবারকে, টাকাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করার সময় রাখবে হাতে। তা ছাড়া সাফোকেটরকে ধরার ব্যাপারটা তো অধরাই থেকে যাচ্ছে।''

''পুরো প্ল্যানটা তো এখনও বলিনি আমি,'' বলে থেমেছিলেন দীপকাকু। তারপর বলতে থাকেন, ''জানি, অপরাধীকে একবারই ফলস টাকার সুটকেস দিতে পারা যাবে। ওই সুটকেসে লুকিয়ে রেখে দেবেন এমন কোনও ডিভাইস, যার সেন্সর আপনাদের সংকেত দেবে সুটকেসটা নিয়ে দুষ্কৃতী কোথায় যাচ্ছে। সংকেত অনুসরণ করলে অপরাধীর অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যাবে। এমনকী, সে ধরাও পড়ে যেতে পারে।''

ঝিনুককে চমকে দিয়ে সুবীর দত্ত চেঁচিয়ে ওঠেন, ''এক্সেলেন্ট! এই হল প্ল্যান! আপনি যা বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে সাফোকেটরের থেকে আমাদের দূরত্ব হাফ কিলোমিটারও নয়। এর আগে তো দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাচ্ছিলাম না।''

মুখটা হাসি-হাসি করে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন দীপকাকু, দেখাদেখি ঝিনুকও। সুবীর দত্ত বলে উঠলেন, ''আরে যাচ্ছেন কোথায়! এখনও পর্যন্ত আপনাকে তো এক কাপ চা অফার করা হয়নি। কথায়-কথায় ভুলেই গিয়েছিলাম। দাঁড়ান, চায়ের সঙ্গে ভাল টা-এর বন্দোবস্ত করছি। লালবাজারের রঞ্জন তো দুর্দান্ত কাজ করছে আপনাকে পাঠিয়ে!''

দীপকাকু আর চেয়ারে বসেননি। বলেছিলেন, ''অন্যদিন চা খাব। আর-একটা জায়গায় যাওয়ার আছে। আপনারা কেসটা নিয়ে কতটা কী করলেন পারলে আমাকে জানাবেন।''

''নিশ্চয়ই জানাব। এটা তো আমার কর্তব্য। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমার চলতেই হবে। অন্য কেসেও আপনার সাজেশন লাগবে আমার। আমি চাইব, আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক।''

এই ছিল দীপকাকু চলে আসার আগে সুবীর দত্তর শেষ কথা। বন্ধুত্ব বলতে অসমবয়সি। সুবীর দত্ত দীপকাকুর চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড় তো হবেনই। ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে দীপকাকুর বাইকে চাপার

আগে ঝিনুক একটু ক্ষোভের গলায় বলেছিল, "পুলিশকে বুদ্ধি দিয়ে আমাদের কী লাভ? অপরাধীকে ধরার পর পুলিশ পুরো ক্রেডিট নিয়ে চলে যাবে। আপনার নাম মিডিয়ার সামনে আনবেই না।"

হেলমেট পরতে-পরতে দীপকাকু বলেছিলেন, "মিডিয়ায় নিজের নাম প্রচারের চেয়েও অপরাধীকে ধরা অনেক জরুরি। লোকটা মারাত্মক চালাক। পুলিশ এবং আমি একসঙ্গে উঠেপড়ে না লাগলে ওকে ধরা মুশকিল।"

ঝিনুক আশ্বস্ত হয়েছিল এই ভেবে, যাক, দীপকাকু তার মানে কেসটা পুরোপুরি তুলে দিয়ে আসেননি পুলিশের হাতে। গতকাল দীপকাকু কোনও যোগাযোগ করেননি ঝিনুকের সঙ্গে। আজ কাগজে বেরল পুলিশের দেওয়া বিজ্ঞাপন। দীপকাকুর চোখে নিশ্চয়ই পড়েছে। একটু সাবধানে বিজ্ঞাপনের বয়ানটা দেওয়া হয়েছে, সরাসরি শ্বাসকষ্ট দেওয়া ব্ল্যাকমেলারের কথা বলা হয়নি। যে-কোনও ধরনের ব্ল্যাকমেলিংয়ের ফোন এলে ইনফর্ম করতে বলা হয়েছে। এটা সম্ভবত সাংবাদিকদের দূরে রাখার প্রয়াস। শ্বাসকষ্ট দেওয়া ব্ল্যাকমেলারের উল্লেখ করলেই সাংবাদিকরা সঙ্গত প্রশ্ন তুলত যে, হঠাৎ বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করা কেন? তার মানে, এই ধরনের অপরাধ ঘটে চলেছে। পুলিশ চেপে যাচ্ছে। এদিকে বিজ্ঞাপনে বুদ্ধি করে এমন দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে বোঝা যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট দেওয়া ব্ল্যাকমেলারকে ধরার জন্য এই আয়োজন। বলা হচ্ছে, ফোন পেলে সত্বর জানান এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মানেই সাফোকেটরের দেওয়া একঘণ্টা সময়ের মধ্যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা হবে। সত্যিই কি সম্ভব হবে সেটা?

দীপকাকু কতটা অশশ্রূষণ করবেন এই অভিযানে? আজ এখনও এলেন না দীপকাকু। এলে এ ব্যাপারে একটু আলোচনা করে নেওয়া যেত। ঝিনুক ড্রেস চেঞ্জ করে বাড়ির পোশাকে অনেকক্ষণ হল ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে আছে। টেবিলে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে আজকের খবরের কাগজটা। কিচেন থেকে ভেসে আসছে হাতা-খুন্তি নাড়ার আওয়াজ আর নতুন কোনও পদের সুগন্ধ। দীপকাকুর কথা ভেবেই পদটা হয়তো বানাচ্ছেন মা। গতরাতে কথায়-কথায় ঝিনুকই মাকে বলেছিল, "কাল রবিবার, দীপকাকুর আসার চান্স আছে খুব। নতুন কেসটা নিয়ে বাবার সঙ্গে হয়তো আলোচনায় বসবেন।"

বাবা বাজারে বেরিয়ে গিয়েছেন অনেকক্ষণ হল। দীপকাকু না এলে ঝিনুককেই ভবানী ভবনের রিপোর্ট দিতে হবে বাবাকে। ভাবনা শেষ হতে না-হতেই বাড়ির সামনে মোটরবাইকের আওয়াজ। সোফা থেকে তড়াক করে উঠে ঝিনুক দরজা খুলতে যায়।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঝিনুক দেখে, দীপকাকুর সঙ্গে বাবাও ফিরেছেন। দীপকাকুর বাইকে এসেছেন বাবা। রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল। দু'জনের মাথাতেই হেলমেট। বাগানে বাইক স্ট্যান্ড করছেন দীপকাকু। বাবার একহাতে বাজারের থলি, অন্য হাত দিয়ে হেলমেট খোলার চেষ্টা করছেন। খুলতে অসুবিধে হচ্ছে, আসলে ওটা ঝিনুকের হেলমেট। বাবার কাছে চলে এসেছে ঝিনুক, খুলতে সাহায্য করে হেলমেটটা। খোলার পর দম ছেড়ে বাবা বলেন, "কী করে যে তোরা এটা পরে থাকিস, আমার তো হাঁসফাঁস অবস্থা।"

"এর বেল্টটা তো আমার মাথার সাইজ অনুযায়ী টানা ছিল, বড় করে নেবে তো," হাসতে-হাসতে বলে ঝিনুক। দীপকাকু বাবার হাত থেকে হেলমেটটা নিলেন এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। এমন ভাবে দেখছেন, যেন অচেনা কোনও হেলমেট।

বাবা বলে ওঠেন, "কী হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন! ভিতরে চলো। তোমাদের নতুন কেসটা নিয়ে আমাকে তো ডিটেলে কিছু বলছই না। যদিও গত দু'দিন ব্যস্ত ছিলাম। আজ একদম ফ্রি।"

বাবার কথাগুলো দীপকাকুর কানে গেল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এখনও হেলমেটটাকে দেখে যাচ্ছেন। নিজেরটা খুলে রেখেছেন আগেই। ওটা কি পরবেন এখন? মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? শেষমেশ ঝিনুকের হেলমেট পরেননি দীপকাকু। কী যে দেখলেন বোঝা গেল না। ড্রয়িং রুমের সোফায় এসে বসেছেন। কিচেনে বাজারের ব্যাগ রাখতে গেলেন বাবা। ঝিনুক দীপকাকুর দিকে আজকের খবরের কাগজটা খোলা অবস্থাতেই এগিয়ে দেয়। বলে, "পুলিশ আউট দিয়েছে।"

"দেখেছি," বলার পরও কাগজটা হাতে নিলেন দীপকাকু। বিজ্ঞাপনটা আবার করে পড়ছেন। ভিতরের ঘর থেকে বাবা-মা দু'জনেই ড্রয়িংরুমে এলেন। মা দীপকাকুর উদ্দেশে বললেন, "ব্রেকফাস্ট সেরে আসোনি তো? আমি কিন্তু বানাচ্ছি।"

"মাথা খারাপ? আপনার বাড়িতে আসার আগে কেউ খেয়ে আসে? আপনি বানান ব্রেকফাস্ট। খেয়েদেয়ে ঝিনুককে নিয়ে বেরতে হবে পরিক্রমায়।"

কথাটা শুনে নিয়ে মা গেলেন রান্নাঘরে। বাবা চলে এসেছেন সোফার সামনে। বসার আগে জানতে চাইলেন, "কোথায় যাবে?"

"এখন পর্যন্ত আমাদের জানা যে সব ফ্যামিলি ব্ল্যাকমেলারের শিকার হয়েছে, তাদের সকলের বাড়িতে যাব জিজ্ঞাসাবাদ করতে। আমি যে সাহিত্য, পুলিশ তাদের জানিয়ে রেখেছে। তাই কেসটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনার সময় এখন নেই। আলোচনা করার মতো অবস্থায় পৌঁছয়ওনি ব্যাপারটা।"

"তবু ভেটা করে বলো ভবানী ভবনে গিয়ে কী কথা হল পুলিশের সঙ্গে?"

"বলছি," বলে দীপকাকু ঝিনুককে বললেন, "তুমি তৈরি হতে থাকো। আমরা অলরেডি লেট। অনেক ক'টা বাড়িতে যেতে হবে আজ।"

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে ঝিনুক। আজ থেকে কেসটার জমজমাট পর্ব শুরু হচ্ছে। অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন দীপকাকু, কত জায়গায় যাওয়া হবে! ডায়েরিতে সব নোট রাখতে হবে ঝিনুককে। দীপকাকু কখন কী জানতে চাইবেন কোনও ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে একটু বেহুল হয়ে পড়েন।

॥ ৪ ॥

কলেজ থেকে সোজা দীপকাকুর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে চলে এসেছে ঝিনুক। দীপকাকুই ডেকে পাঠিয়েছেন। ফোন করে বলেছিলেন, "দুই আক্রান্ত পরিবার থেকে দু'জন কথা বলতে আসছে অফিসে, বিকেলে চারটে নাগাদ। কী বলছে, শোনার যদি ইন্টারেস্ট থাকে, চলে এসো।"

"আসছি," বলে ফোন কেটে দিয়েছিল ঝিনুক। কেসটা নিয়ে ঝিনুকের অদম্য কৌতূহল। এই প্রথম দীপকাকু এমন একটা কেস হ্যান্ডেল করছেন, যার ক্ষেত্রটা বিশাল। কোনও ব্যক্তি বা একটি পরিবারের বিষয় নয়। সমস্যাটা গোটা শহরের উচ্চবিত্তদের। ছড়িয়ে থাকা অপরাধগুলোর সূত্র ধরে অপরাধীকে শনাক্ত করা যে কতটা কঠিন, ঝিনুক টের পেয়েছে রবিবার, মানে পরশু। পাঁচটি আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি যাওয়া হয়েছিল। যাদবপুর আর সাউথ সিটি টাওয়ারের দুই পরিবার যা একটু কাছাকাছির মধ্যে। বাকিগুলো শহরের তিনপ্রান্তে। দীপকাকু তাঁদের সঙ্গে শুধু কথা বলে ক্ষান্ত হননি, আক্রান্ত কিংবা বাড়ির কাউকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখেছেন শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার জায়গাগুলো। কখনও অফিস, কখনও বা রাস্তায়, লিফটে এবং শপিংমলে। স্পটগুলো দেখার সঙ্গে-সঙ্গে ঝিনুকের বাড়তি কাজ ছিল সমস্ত কিছু নোট করে রাখা। দীপকাকু আলাদা করে বলে দিয়েছিলেন, "আক্রান্তের নাম ধরে তাঁর সম্বন্ধে যা দেখছ, লিখে রাখো। পরে আমার কাজে লাগবে।"

আধঘণ্টা আগে কাচঘেরা চেম্বারে ঝিনুক পা রাখতেই দীপকাকু জানতে চাইলেন, "তোমার নোটবুকটা সঙ্গে আছে তো?"

ভাগ্যিস ছিল। কলেজ যাওয়ার সময় সে ব্যাকপ্যাকে ভরে নিয়েছিল। নোটবুকটা দীপকাকুকে দিয়েছিল ঝিনুক। মন দিয়ে পড়লেন।

সুদর্শনকাকা দীপকাকুর জন্য চা আর ঝিনুকের জন্য কোল্ড ড্রিংক নিয়ে এসেছিল। দীপকাকুর অফিস দেখাশোনা করে সুদর্শনকাকা। চা শেষ করে দীপকাকু সিগারেট খেতে গেলেন অফিসের করিডরে। অধুমপায়ীর উপস্থিতিতে ঘেরা জায়গায় ইদানীং আর স্মোক করেন না। ফিরে এসে ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলেন, ''এই পাঁচটা বাড়িতে ঘুরলাম, গৌরব বণিকের বাড়ি ধরলে ছয়। এই ক'টা পরিবারের মধ্যে কোন-কোন জিনিসটা কমন?''

''এরা প্রত্যেকে উচ্চবিত্ত এবং একঘণ্টার মধ্যে দশ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পারে। হেমন্ত সাংঙি কুড়ি লক্ষ,'' বলেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু ততক্ষণে নিজের চেয়ারে বসে পড়েছেন। বললেন, ''গৌরব বণিকের অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। ওর হয়ে টাকা দেবেন অমরেশ বসু। অপরাধী অমরেশ বসুকে অন্যান্য আক্রান্তের মতো ফাঁকা জায়গায় পায়নি, তাই প্রিয় পাত্রর উপর আক্রমণ। শিকার হতে পারত অমরেশবাবুর পুত্র সৌম্যদীপ, ঘটনাচক্রে হয়নি। এই ঘটনাচক্র ব্যাপারটাতে এসেই আমার খটকা লাগছে। মনে হচ্ছে ঘটনাচক্র নয়, গৌরব বণিককে খুন হতে হল অপরাধীর বিষয়ে কিছু তথ্য জেনে যাওয়ার জন্য। যে কথাগুলো আমাকে সে বলতে আসছিল। দেওয়া হল না বলতে।''

একটা প্রশ্ন অনেক আগেই ঝিনুকের মাথায় এসেছিল। এই সুযোগ সেটা জানতে চাইল, ''আচ্ছা, গৌরববাবু ব্ল্যাকমেলারের সম্বন্ধে যদি কিছু জেনে থাকেন, পুলিশের কাছে না গিয়ে আপনার কাছে, মানে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন কেন?''

''হয়তো পুলিশকে বলার মতো খাস প্রমাণ তার হাতে ছিল না। কিছু অনুমান-নির্ভর তথ্য ছিল। যার পিছনে ছুটে যদি সময় নষ্ট হত পুলিশের, কৈফিয়ত দিতে হত গৌরবকে,'' বলেছিলেন দীপকাকু। গৌরববাবু যেহেতু বয়সে দীপকাকুর চেয়ে ছোট, এই প্রথম তুমি সম্বোধন করলেন। এর পর ঝিনুক জানতে চেয়েছিল, ''আপনার হদিশ তাঁকে দিয়েছিল কে?''

কোনও জবাব না দিয়ে দীপকাকু ডেস্কটপ অন করেছিলেন। দীপকাকুর এক্সপ্লেশন দেখেই ঝিনুক নিজের ভুল বুঝতে পারে। শুধরে নিয়ে বলেছিল, ''গোয়েন্দা হিসেবে আপনি অবশ্য বেশ পরিচিত নাম, অনেকেই রেফার করতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যিনি আপনার কাছে যেতে বলেছিলেন গৌরব বণিককে, তিনি কেন আপনার সঙ্গে দেখা করছেন না। কাগজ লেখা না হলেও গৌরববাবুর মৃত্যুর খবর নিশ্চয়ই এতদিনে পেয়েছেন। সেই মানুষটিকে গৌরববাবু বলে থাকতে পারেন, কী ব্যাপারে আপনার সাহায্য চান। তিনি যদি এসে আপনাকে জানাতেন গৌরববাবুর কী বলার ছিল, কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেত।''

''হয়তো তাকে বিশদে কিছু বলেনি গৌরব। অথবা পুলিশ এবং গোয়েন্দার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকতে চাইছে সেই লোক। যেচে ঝামেলা ঘাড়ে নিতে চাইছে না,'' বলার পর দীপকাকু একটু চুপ করে থেকে বললেন, ''আমাকে কিন্তু একটা তথ্য দিতে পেরেছিল গৌরব। বলো তো কী?''

''ওষুধে ওষুধ নেই,'' শেষ কথা ছিল গৌরববাবুর।

ঝিনুকের উত্তর শুনে খুশি হলেন দীপকাকু। বলেছিলেন, ''ভেরি গুড। এবার বলো আমি কেন পুলিশ বা গৌরব বণিকের বাড়িতে শেষ কথাটা জানাচ্ছি না?''

''এই তথ্যটার উপর সম্পূর্ণ অধিকার আপনার। কেননা, আর কাউকে না বলে গৌরববাবু আপনাকেই দিতে চেয়েছিলেন ইনফরমেশনটা। আপনার মনে হচ্ছে, ওষুধে ওষুধ নেই কথাটাই রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠি। এটা যদি পাচিকা হয়ে যায় অপরাধী সতর্ক হয়ে যাবে,'' বলেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, ''খানিকটা ঠিক বলেছ। পুরোটা নয়। কারণ, ওই তথ্যটা আদৌ চাবিকাঠি কিনা, আমি নিজেও বুঝে উঠতে পারছি না। যেন একটা সংকেত। ধাঁধার মতো। আরও কয়েকটা কথা যদি বলতে পারত গৌরব, তা হলে হয়তো ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হত। আমি যা নিজে বুঝিনি, পুলিশ বা গৌরবের বাড়িতে বলে কী লাভ? পুলিশের কাছে প্রশ্নচক্রী ঘুরিয়ে তুললাম, জানতে চেয়েছিলাম ওষুধের স্পেসিমেন পাওয়া গিয়েছে কি না? পাওয়া গেলে টেস্ট করে বোঝা যেত 'ওষুধ ওষুধ নেই'-এর মানেটা কী?''

কথা কেড়ে নিয়ে ঝিনুক বলে উঠেছিল, ''ওষুধে কিন্তু ওষুধ আছে। সেটা সংগ্রহ না করার কারণে মৃত্যু হয়েছে প্রথম আক্রান্ত ভবানীপুরের বিজন সাহার। গৌরববাবুরও মৃত্যু হল ওষুধ না পাওয়ার জন্য। বিশ্রাম্ভি কাটিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারেননি অমরেশ বসু।''

হাতে মাউন্ড ধরে অন্যমনস্কভাবে দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, ''তা হলে কি গৌরবের কাছে ভুল ইনফরমেশন ছিল? প্রবল শ্বাসকষ্টের মধ্যেও সে বলেছিল ওর কিছু হবে না। টাকা ডিমাণ্ড করে ফোন আসবে। বাড়িতে জানাতে বারণ করেছিল। গৌরব বুঝে উঠতে পারেনি তাকে শিকার বানানো হয়েছে অমরেশ বসুর বদলে। ব্ল্যাকমেলারের ফোন তার কাছে না এসে গিয়েছিল আসল জায়গায়। অমরেশ বসুর কাছে, টাকাটা যিনি দেবেন।''

''তা হলে তো এক্ষুনি একটি সম্ভাবনার কথা বাতিল করতে হয় যে, আপনার কাছে ব্ল্যাকমেলারের ব্যাপারে তথ্য দিতে আসার জন্য মৃত্যু হয়নি গৌরববাবুর। এমন হতে পারে তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, শিকার হতে চলেছেন। তাই দেখা করতে চাইছিলেন সাহায্যের আশায়,'' বলেছিল ঝিনুক।

উদাসভাবেই দীপকাকু বলেছিলেন, ''হাই ইউ আর প্রোগ্রেসিং। বাট, ওই ভুল ইনফরমেশন ওষুধে ওষুধ নেই, গৌরব জোগাড় করল

কীভাবে? কেউ কি নিজের স্বার্থে ওই তথ্যে কাবু করে সরবরাহ করেছিল? বলেছিল, তুমি আক্রান্ত হলে দেখে নিয়ো, নিজের থেকেই কষ্ট কমে যাবে। ব্ল্যাকমেলারকে টাকা দিতে যেয়ো না। শ্বাসকষ্টের বিষে ডোজ় কম থাকবে তোমার বেলায়। গোটা ব্যাপারটাই ভয়ানকভাবে জট পাকিয়ে আছে।''

দীপকাকুই যখন বলছেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে, ঝিনুকের আর বেশি মাথা না ঘামানোই ভাল। ছোট্ট একটা কৌতূহল মিটিয়ে নেওয়ার জন্য সে বলেছিল, ''আক্রান্ত দুই পরিবারের কোন 'দু'জন আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসছে? ইন্টারোগেট করার সময় তাঁদের কি আমরা দেখেছি?''

উত্তর পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে দীপকাকুর মনোযোগ কম্পিউটার স্ক্রিনে। ঝিনুক খেয়াল করেছে দীপকাকু গুগ্‌ল সার্চ করে চলে গিয়েছেন শ্বাসকষ্টের ওষুধ খুঁজতে। কত রকম অ্যান্টি হিসটামিনিক ড্রাগ আছে দেখছেন। গোটা অফিস নিস্তব্ধ। যে দু'জনের আসার কথা ছিল, তাঁরা কি আসছেন না? চারটে তো বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ! ভাবনা শেষ হতে না-হতেই ঝিনুক দেখল, অফিসের মেন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক। ইন্টারোগেট করতে গিয়ে মানুষটিকে দেখেছে কিনা, মনে করতে পারল না ঝিনুক। এই চেম্বার থেকে মেন দরজার দূরত্ব অনেকটাই। দরজার পাশেই চোখের আড়ালে একটা কিচেনস্পেস আছে, সেখান থেকে বেরিয়ে এল সুদর্শনকাকা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে সুদর্শনকাকা হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল দীপকাকুর কাচঘেরা চেম্বার।

ঝিনুক দীপকাকুর উদ্দেশে বলল, ''দু'জনের একজন মনে হচ্ছে এলেন। কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে সামনের দিকে তাকালেন দীপকাকু। বললেন, ''সুকিয়া স্ট্রিটের মিলন রায়চৌধুরীর দাদা শোভন রায়চৌধুরী।''

''ইনি কি ইন্টারোগেট করার সময় ছিলেন? আমার তো মনে পড়ছে না,'' বলল ঝিনুক।

''ছিলেন, সবার থেকে একটু দূরে। কেউ একজন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। উনি আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে আসেননি। আমিও প্রশ্ন

করিনি কোনও। কিন্তু ওঁর মুখ দেখে মনে হয়েছিল অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু সেটা সকলের সামনে নয়। তাই যখন দেখা করতে আসব বলে ফোন করলেন, আশ্চর্য হইনি।"

দীপকাকুর কথার শেষের দিকে শোভনবাবু কাচের সুইংডোর ঠেলে ঢুকলেন ভিতরে। নমস্কার বিনিময় করলেন দু'জনে। শোভনবাবু নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন, দীপকাকু বললেন, "মনে আছে, বসুন।"

টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসলেন শোভন রায়চৌধুরী। ঝিনুক এখনও ওঁকে মনে করতে পারছে না। আসলে সেদিন এতজনকে মিট করেছে, গুলিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। দীপকাকু কথা শুরু করলেন, "বলুন, কী বলতে এসেছেন?"

বনেদি চেহারার মানুষটির চোখমুখ ভারী বিমর্ষ। বলে উঠলেন, "আমাকে ঠকানো হয়েছে। এর একটা বিহিত আপনাকে করতে হবে। তার জন্য যা ফিজ লাগে আমি দেব।"

"কে ঠকিয়েছে আপনাকে? আপনি যে ফোনে বললেন আপনাদের বাড়ির ঘটনাটা নিয়ে কথা বলতে আসছেন?" বিস্ময় প্রকাশ করলেন দীপকাকু।

শোভনবাবু বললেন, "ওই ঘটনাটা দিয়ে আমাকে ঠকানো হয়েছে। ব্যাপারটা পুরো ফল্‌স সাজানো ঘটনা।"

"যেমন?" দীপকাকুর গলায় কৌতূহল। ঝিনুকও নড়েচড়ে বসল।

ভদ্রলোক বলতে থাকলেন, "আপনি তো জেনেছেন আমাদের আয়রন ফ্যাক্টরি, লোহার রড তৈরি হয়। তিন পুরুষের ব্যবসা। কারবার মন্দ চলে না। তিন ভাই ব্যবসাটার অংশীদার। দুই ভাই যখন কলেজে পড়ে, বাবা মারা গেলেন। আমি ব্যবসাটা খেটেখুটে বড় করেছি। পরে মিলন আর নিখিল এসে বিজনেসে যোগ দেয়। মিলন মানে, যার শ্বাসকষ্ট..."

"বুঝেছি। বলে যান," বললেন দীপকাকু।

প্রসঙ্গে গেলেন শোভনবাবু, "বছরপাঁচেক হল শারীরিক অসুস্থতার কারণে ব্যবসার কাজ বন্ধ করেছি আমি। সমস্তটা মিলনই সামলায়। নিখিল ব্যবসা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। ও পাড়ার ক্লাব নিয়ে থাকে। ব্যবসার কিছু অফিসিয়াল কাজ দরকার মতো সে করে দেয়। অর্থাৎ আমরা দুই ভাই মিলনের উপর নির্ভরশীল। মিলন একটা ব্যাপারে আমাদের উপর নির্ভরশীল, নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবসার টাকা থেকে কোনও খরচ করতে পারে না। আমাদের মতামত নিতে হয়।"

কথার মধ্যে দীপকাকু বলে উঠলেন, "সম্প্রতি মিলনবাবু ব্যবসা থেকে দশ লাখ টাকা তোলার অনুমতি চেয়েছিলেন।"

"আপনাকে কে বলল ব্যাপারটা? সেই বলে থাকুক, অ্যামউন্টটা ভুল বলেছে। ওটা কুড়ি লক্ষ," বললেন শোভনবাবু।

দীপকাকু বলতে থাকলেন, "কেউ বলেনি। আপনার কথা থেকে আন্দাজ করলাম। এখন এটাও বুঝতে পারছি যে, আপনি ঠিক কী জানাতে এসেছেন। মিলনবাবু শ্বাসকষ্টের ভান করে ব্যবহা করেছেন টাকাটার। দোষ পড়েছে আসল ব্ল্যাকমেলারের উপর। এখন কথা হচ্ছে ওঁর দরকার ছিল কুড়ি, অর্ধেকে সন্তুষ্ট হলেন কেন?"

"বাকিটা বোধ হয় জোগাড় করেছে অন্য কোথাও থেকে।"

"টাকাটা ওঁর দরকার পড়েছিল কেন?"

"মেয়ে জামাইকে দামি গাড়ি কিনে দেবে। মেয়ে বায়না ধরেছিল।"

"কেনা হয়েছে গাড়ি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু মেয়ে বলছে তারা কিনেছে নিজেদের পয়সা দিয়ে। আসলে এরা অনেকে মিলে ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছে।"

কথাটা শুনে দীপকাকু একটু ভাবতে সময় নিলেন। তারপর বললেন, "ব্ল্যাকমেলারের ফোনটা মিলনবাবুর স্ত্রী ধরেছিলেন, আপনাদের বাড়ি গিয়ে তেমনটাই তো শুনলাম।"

"হ্যাঁ, সেইজন্যই তো বলছি ষড়যন্ত্র।"

"আপনার ছোটভাইয়ের কোনও আপত্তি ছিল না, ওই কুড়ি লাখ টাকা মিলনবাবুকে দেওয়ার ব্যাপারে?"

"না, মিলন যা বলে তাই শুনে চলে সে। না শুনলেই ব্যবসার কাজে ফাঁকি মারবে কী করে? আমি শারীরিকভাবে ব্যবসার কাজ না করতে পারি, বাড়িতে বসে সমস্ত হিসেবপত্তর দেখি।"

"আপনার এক ছেলে, এক মেয়ে। দু'জনেই বিয়ে করে প্রবাসে সেটেলড। মিলনবাবুর এক মেয়ে। সল্টলেকে শ্বশুরবাড়ি। নিখিলবাবুর ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে, কলেজে পড়ছে। হিসেবমতো আপনি এবং আপনার স্ত্রী সংসারে সংখ্যালঘু। একটু কোণঠাসা অবস্থায় আছেন," ইন্টারোগেট করতে গিয়ে দীপকাকু যেমনটা জেনেছেন, তার ভিত্তিতে কথগুলো বললেন।

শোভন বলে ওঠেন, "পরিস্থিতি কিন্তু তেমনটা নয়। বাড়িতে সবাই আমাকে সমঝে চলে। প্রধান ব্যক্তি মান্য করেই মর্যাদা দেয়। কারণ, ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত আমার হাত ধরেই। মিলনের সঙ্গে ঝগড়াটা হল তা নিয়েই। টাকা দিতে রাজি নই শুনে ও বলল, 'আমি যে বিজনেসের পিছনে এত খাটি, তার জন্য আলাদা কোনও টাকা পাই না। লাভের অংশ তিন ভাইয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আলাদা করে টাকা চাইওনি কোনওদিন। ওই প্রথমবার চাইলাম, মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে আমার প্রেস্টিজ বাড়বে।' এর উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'ব্যবসাটা দাঁড় করানোর পিছনে আমার অবদানটা ভুলে যাস না। তখনও কিন্তু প্রফিট তিন ভাগে ভাগ হত।' তারপর আর কথা বাড়ায়নি মিলন। বড়-বড় পা ফেলে চলে গিয়েছিল। তার চারদিন পরেই বাড়িতে ওই ঘটনা।"

ঘাড় হেলিয়ে মন দিয়ে কথাগুলো শুনলেন দীপকাকু। বলে উঠলেন, "আপনার সন্দেহটা পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"অবশ্যই জানিয়েছি। খোদ ভবানী ভবনে গিয়ে এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সুবীর দত্তকে বলেছি। উনি তো আমার কথা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না।"

"কী বলছেন অফিসার?"

"বলছেন, 'আগে আসল ব্ল্যাকমেলার ধরা পড়ুক, তাকে চাপ দিয়ে বের করব এই অপরাধের লিঙ্ক। সেখানে যদি আপনাদের বাড়ির উল্লেখ না থাকে, তখন আলাদা করে তদন্ত করা হবে।"

শোভনবাবুর কথা শুনে অবাক হয় ঝিনুক। পুলিশ যে ঠাট্টা করে কথাগুলো বলেছে, অসুবিধে হয় না বুঝতে। ঝিনুক দীপকাকুকে বলে, "পুলিশ কি ওভাবে কারও অভিযোগ এড়িয়ে যেতে পারে?"

"পারে, যদি সেই ব্যক্তির সমস্ত অভিযোগই অনুমানির্ভর হয়।"

দীপকাকুর কথাটা মানতে পারলেন না শোভনবাবু। বলে উঠলেন, "অপরাধের পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর নজর রেখেই তো অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়।"

"তা করা হয়। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণ করতে গেলে স্পষ্ট কিছু সাক্ষ্য, নিদর্শন লাগে। তেমন কোনও এভিডেন্স আছে কি আপনার হাতে?"

"না, নেই। আমি জানি সেরকম জোরালো কোনও এভিডেন্স থাকলে পুলিশ কেসটা টেকওভার করত। এরকম কাজ প্রাইভেট ডিটেকটিভদের দিয়েই করানো ভাল। লাস্ট যেদিন গেলাম ভবানী ভবনে সুবীর দত্ত এই পরামর্শই দিলেন। উনিই দিয়েছেন আপনার ফোন নম্বর। আমি আপনাকে তদন্তভার দিতে চাই।"

"আমি নিতে চাই না। পুলিশ আপনাকে হালকা চালে বললেও উচিত কথাই বলেছে। আসল ব্ল্যাকমেলার ধরা পড়লে আপনার অভিযোগের ভিত্তিটা জোরালো হবে। তখন না হয় তদন্ত করা যাবে।"

দীপকাকুর কথা শেষ হতেই দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকল সুদর্শনকাকা। শোভনবাবু, দীপকাকুর সামনে কাপ নামিয়ে দেওয়ার পর ঝিনুককে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে কী দেব দিদিমণি?"

"আমার কিছু লাগবে না," জানানোর পর ঝিনুকের চোখ যায় অফিসের মেন দরজায়। একজন বছরচল্লিশের ভদ্রলোক। ঝিনুক সুদর্শনকাকাকে বলে, "কে এসেছেন দ্যাখো।"

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল সুদর্শনকাকা। ঝিনুক দীপকাকুর উদ্দেশে বলে, "মনে হচ্ছে দ্বিতীয়জন। এঁকেও তো চিনতে পারছি না।"

"আমিও না। ফোনে শুধু বলেছেন অমরেশ বসুর বাড়ি থেকে আসছি," বলে কাপ তুলে চুমুক দিলেন দীপকাকু।

শোভনবাবু কাপ হাতে তুলে অন্যমনস্কভাবে বসে আছেন। বিমর্ষ গলায় বলে উঠলেন, "আসল ব্ল্যাকমেলার ধরা না পড়লে আমাদের বিজনেসের দশ লাখ জলে। এ কেমন বিচার?"

সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে দীপকাকু বলেন, "আরও অনেকেই টাকা খুইয়েছেন। একজন তো কুড়ি। একটু ধৈর্য ধরুন না। আসল ব্ল্যাকমেলার ধরা পড়বেই। ইতিমধ্যে আপনিও মিলনবাবুর বিরুদ্ধে খাস কিছু সাক্ষ্য, নিদর্শন জোগাড় করুন।"

"আমার কিছু অনুমান প্রমাণের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়," বলে কাপে চুমুক দিলেন শোভনবাবু।

দীপকাকু জানতে চাইলেন, "শুনি দু'-একটা।"

কোনগুলো বলবেন ভাবছেন শোভনবাবু। একটু আগে অফিসে যিনি ঢুকলেন, সুদর্শনকাকার নির্দেশে চেম্বারের বাইরে ভিজিটার্সদের সোফায় বসেছেন। শোভনবাবু বলে ওঠেন, "এই যেমন ধরুন, আমরা কখনওই বাড়িতে অত টাকা নগদ রাখি না। খোলামেলা পুরনোদিনের বাড়ি। লোকজনের আনাগোনা লেগেই আছে। মোটা টাকা যা থাকে আমাদের ফ্যাক্টরি অফিসের ভল্টে। আগের দিনই একজন সাপ্লায়ারকে পেমেন্ট দেওয়ার নাম করে সাড়ে এগারো লাখ টাকা বাড়িতে এনে রেখেছিল মিলন। আমাকে জানায়নি। শ্বাসকষ্ট যখন শুরু হল, মানে অ্যাক্টিং, তখন মিলন নিজেই বলল টাকা কোথায় রাখা আছে।"

"অফিসে যখন মোটা টাকা থাকে, পেমেন্ট নিশ্চয়ই ওখান থেকেই হয়? এই সাপ্লায়ারকে বাড়িতে ডেকে পেমেন্ট দেওয়ার দরকার পড়ল কেন, প্রশ্নটা ভাইকে করেছিলেন?"

"করেছিলাম। বলল, অনেকের পেমেন্ট বাকি, এই সাপ্লায়ারের বাবা হাসপাতালে, টাকাটা দিতেই হবে। অফিসে দিলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেত, অন্য সাপ্লায়ারেরা চাপ দিত টাকা মেটানোর জন্য।"

"এই সাপ্লায়ারের বাবা কি সত্যিই হাসপাতালে? খোঁজ নিয়েছেন?"

"নিয়েছি, ঘটনাটি সত্যি। আবার এটাও সত্যি, সাপ্লায়ারটির যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে। আমাদের পেমেন্টের উপর সে নির্ভরশীল নয়। বড়জোর ওই অছুহাতে টাকাটা আদায় করার চেষ্টা করতে পারে। কোনটা অজুহাত আর কোনটা বাস্তব প্রয়োজন আমরা ভালমতোই বুঝি, সেইমতো পেমেন্ট করি।"

"বুঝলাম," বলে শ্বাস ছাড়লেন দীপকাকু। ফের বললেন, "পরের অনুমানটা বলুন।"

শোভনবাবু বলতে থাকলেন, "এটা এমন এক অনুমান, যা প্রায় অভ্রান্ত। ব্ল্যাকমেলারের কথা মতো ওষুধ পাওয়া গেল আমাদের পাড়ার সেনবাড়ির দেওয়ালের কোটরে। ওই কোটরটা আমাদের তিন ভাইয়ের খুব চেনা। ছেলেবেলায় ওই কোটরে পা রেখে সেনবাড়ির পাঁচিল ডিঙোতাম। ওদের বাগানে তখন নানান ফলের গাছ। সেনরা বসবাস করত ওই বাড়িতে। বহু বছর হল ওরা থাকে না। বাগান জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। পাঁচিলের সেই কোটরটাও রাস্তা থেকে চট করে চোখে পড়ে না। নিমাইয়ের চা গুমটির আড়ালে চলে গিয়েছে। ব্ল্যাকমেলার যদি আমাদের পাড়ার বাসিন্দা হয়, তবেই কোটরটার কথা জানবে। আমি যত দূর শুনেছি আসল ব্ল্যাকমেলার কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় অপরাধ ঘটিয়ে চলেছে। এত আনকমন প্লেসে ওষুধও রাখেনি।"

"হ্যাঁ, এই অনুমানটা সেখে জোরালো। আর কিছু আছে এরকম?"

"লাস্ট একটা বলি, ব্ল্যাকমেলারকে টাকা দিতে গিয়েছিল মিলনের জামাই। ওকে বেছে নেওয়াটা বেশ সন্দেহজনক। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনি যখন গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি, জানলেন শাট্‌ল ট্যাক্সি ধরে ডানলপে টাকা দিতে গিয়েছিল জামাই। মিলনকে প্রশ্ন করেছিলেন জামাই ট্যাক্সিটার নম্বর রেখেছে কিনা? মিলন লেনদেখানো ফোন করল জামাইকে। তারপর আপনাকে বলল, জামাইয়ের মাথায় আসেনি নম্বরটা লিখে রাখার কথা। কেন আসবে না মাথায়? তুমি অত টাকা ব্ল্যাকমেলারের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছ, তোমার তো সব ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখা উচিত। কোন পয়েন্ট পুলিশের কাজে লাগবে, কে বলতে পারে? এছাড়াও ট্যাক্সি থেকে নেমে টাকার ব্যাগ পাশে নামিয়ে রাখল এবং ম্যাজিকের মতো সেটা উধাও হল। মিলনের জামাই এতটুকু টের পেল না। এটাও আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে," একটানা কথা বলে থামলেন শোভনবাবু। রীতিমতো হাঁপাচ্ছেন।

একটু চুপ করে থেকে দীপকাকু বললেন, "আপনার অনুমানগুলো অবশ্যই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। আমি একটা-দুটো দিন একটু ভেবে নিই। আরও কিছু তথ্য জোগাড় করি। তারপর দেখছি, কী করা যায়।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। আমি কিছু অ্যাডভান্স করে যাই?" বললেন শোভনবাবু। দীপকাকুর আশ্বাস পাওয়ার পর ওঁকে বেশ ঝরঝরে লাগছে।

দীপকাকু বললেন, "না-না। এখন কিছু দেওয়ার দরকার নেই। পরে ফোন করে যোগাযোগ করে নেব। আপনার নম্বর সেভ করে রেখেছি।"

জোড়হাত করে নমস্কার জানিয়ে চেয়ার ছাড়লেন শোভনবাবু। সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর দীপকাকু দম ছেড়ে বলে উঠলেন, "লোকটা ভুল লাইন চুজ় করে জীবন কাটাল। গোয়েন্দাগিরি করলে এতদিনে বিরাট নাম করত।"

দরজা ঠেলে চেম্বারে এলেন দ্বিতীয় সাক্ষাৎপ্রার্থী। এক হাত তুলে দীপকাকুর উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "বসুভিলার তরফ থেকে আমিই ফোন করেছিলাম।"

হাতের ইশারায় ভদ্রলোক বসতে বললেন দীপকাকু। মানুষটির চেহারা বসুভিলার সদস্য হিসেবে ঠিক মানানসই নয়, একটু বুঝি মলিন। চেয়ারে স্থিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম প্রভাকর, প্রভাকর বণিক।"

"গৌরব বণিকের দাদা। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বসুভিলায় এসেছেন। এখনও কি আছেন ও বাড়িতে?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

আক্ষরিক অর্থে হাঁ হয়ে আছেন প্রভাকর। বিস্ময় কাটিয়ে বলে উঠলেন, "আমি তো ফোনে ওকে ছাড়া বলিনি। আপনি কীভাবে জানলেন?"

"কয়েকটা সূত্র জুড়ে নিলাম। এটাই তো আমাদের কাজ। অমরেশবাবু বলেছিলেন বাড়িতে ওঁর স্ত্রীর ভাই, ভাইবউ এসেছে। সকলেই শোকাচ্ছন্ন। আপনার পদবি থেকে আন্দাজ করলাম, গৌরবের দাদা আপনি," বললেন দীপকাকু।

প্রভাকরবাবু সপ্রশংস চোখে দেখছেন দীপকাকুকে। ফের দীপকাকুই বলে ওঠেন, "আপনি সম্ভবত নিজের থেকেই এসেছেন আমার কাছে। অমরেশবাবু পাঠাননি। পাঠালে উনি আমাকে ফোন করে জানিয়ে দিতেন। আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, একথাও নিশ্চয়ই জানাননি জামাইবাবুকে। ঠিক বলছি কি?"

মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন প্রভাকর। ভাইকে হারানো শোক এখনও লেগে রয়েছে চোখেমুখে। দীপকাকু জানতে চাইলেন, "এবার বলুন আমার কাছে আসার কারণ?"

প্রভাকর শার্টের পকেট থেকে বের করলেন সাদা কাগজের একটা পুরিয়া। হোমিওপ্যাথি ওষুধ যেমন পুরিয়ায় দেওয়া হয়। দীপকাকুর সামনে রাখলেন সেটা।

দীপকাকুর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী?"

"আপনি যা ভাবছেন সেটাই। আগাম অনেক কিছুই বোঝার ক্ষমতা আছে আপনার। তার প্রমাণ একটু আগেই পেলাম,"

বিমর্ষভাবেই কথাগুলো বললেন প্রভাকর।

দীপকাকু কপাল কুঁচকে প্রভাকরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সামান্য বিরক্তির পর বললেন, "আপনার আন্দাজটা আমার মুখ দিয়ে বলাতে চাইছেন কেন?"

"আমি কতটা সত্যি একজন গোয়েন্দার কাছে বুঝতে চাইছি। যিনি শ্বাসকষ্টের কেসটা নিয়ে তদন্ত করছেন।"

উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন দীপকাকু। বললেন, "ওকে, আমার তো মনে হচ্ছে এটা সেই ওষুধ, শ্বাসকষ্ট থামার জন্য ব্ল্যাকমেলার যেটা দেয়। এরকমই হোমিওপ্যাথির পুরিয়ায়। আমি নিশ্চিত আপনারও তাই মনে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, আপনি এই পুরিয়া কোথায় পেলেন?"

"ভাইয়ের ঘরে," বললেন প্রভাকর।

ঝিনুক চমকে উঠলেও, দীপকাকুর এক্সপ্রেশনে তেমন কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। পুরিয়াটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছেন। ঝিনুকের অবাক হওয়ার কারণ, যে ওষুধের সামান্য স্পেসিমেন পাওয়া যাচ্ছিল না, তার গোটা পুরিয়াই এখন তাদের সামনে। পুরিয়া খুলে ফেললেন দীপকাকু, ভিতরে সাদা মিহি পদার্থ। আক্রান্ত পরিবারগুলোর থেকে এমন ওষুধেরই বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল। এই ওষুধ গৌরব বণিকের ঘরে গেল কী করে?

দীপকাকু মোড়ক বন্ধ করে টেবিলে রাখলেন ওষুধটা। প্রভাকরবাবুর উদ্দেশে বললেন, "আপনার বন্ধুবা, ব্ল্যাকমেলার ওষুধ গৌরবের ঘরেই রেখেছিল। টাকা পেলে বলে দিত কোথায় আছে।"

"কারেক্ট। এর সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই, টাকা দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জামাইবাবু দেননি। এটা শ্যালক বলেই করতে পেরেছন, ছেলের বেলায় হলে পারতেন না। বিনা অপরাধে আমার ভাইটাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেত হল।"

"তা হলে তো বলতে হয় অপরাধী ভাল করে খোঁজখবর নেয়নি। অমরেশবাবুর ছেলেকে শিকার বানালে টাকাটা হাতে এসে যেত।"

দীপকাকুর মন্তব্যের উত্তরে প্রভাকরবাবু বলে ওঠেন, "ভুলটা অনেকেই করবে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত জামাইবাবু বুঝি গৌরব অন্তপ্রাণ। আসলে ভাই নিজের কাজটা খুব মন দিয়ে করত। অনেক ঝড়ঝাপটার মধ্যে একাই জামাইবাবুর প্রোমোটারি বিজনেসকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছিল।"

"ঝড়ঝাপটা বলতে?" কথা কাটলেন দীপকাকু।

প্রভাকর বললেন, "প্রমোটারি বিজনেস মানে তো জানেন, গুড্ডারা টাকা ডিমান্ড করে, রাজনৈতিক পার্টির সিন্ডিকেট খারাপ বিল্ডিং মেটিরিয়াল বেশি দামে কিনতে বাধ্য করে, এইসব গৌরবই হ্যান্ডেল করেছে। জামাইবাবুকে ঘুরেও দেখতে হয়নি। সৌম্যর তো দেখার প্রশ্ন ওঠে না। ছেলেটা একেবারে অপদার্থ।"

"অপদার্থ বলতে কী বোঝাচ্ছেন? অমরেশবাবুর ছেলে আড্ডা-ফূর্তিতে মন বেশি, নাকি বোকসোকা, অকাজের?"

"শেষেরটা," বললেন প্রভাকর। ফের বলে ওঠেন, "সর্বসমক্ষে ছেলেকে তিরস্কার করতেন জামাইবাবু। কিন্তু আজ ওর জীবন সংশয় হলে জামাইবাবু রক্তের টান অস্বীকার করতে পারতেন না।"

"অমরেশবাবু যে টাকাটা দিতে চাননি, বাড়ির আর কেউ কি টের পেতে পারে বলে মনে হয়?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

প্রভাকরবাবু বললেন, "দিদি টের পায়নি। পেলে নিজের গয়না খুলে টাকা জোগাড় করতে বলত জামাইবাবুকে। আর গয়নাগুলোর বেশির ভাগই বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া। অর্থাৎ, আমার বাবা দিয়েছেন। দিদির আড়ালেই ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে কথা বলেছেন জামাইবাবু। সেই ফোনালাপ বাড়ির কাজের লোক শুনে ফেলতে পারে। কাজ খোয়ানোর ভয়ে তারা এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না। আর একজন হয়তো টের পেয়েছে জামাইবাবুর টাকা না দিতে চাওয়াটা। সে হচ্ছে খোদ সৌম্যদীপ। গৌরব মারা যাওয়ার পর থেকে সৌম্য বড্ড বেশি চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। দেখলে মনে হবে কোনও অপরাধবোধে ভুগছে সে। ছেলেটা হয়তো তেমন স্মার্ট নয়, মনটা বড় ভাল। গৌরবের সঙ্গে খুবই ভাল ছিল তারা।"

টেবিলে ঝুঁকে পড়া অবস্থা থেকে চেয়ারে হেলান দিলেন দীপকাকু। বললেন, "সবই তো বুঝলাম, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টও পেলাম। এখন বলুন আমার থেকে কী ধরনের হেল্প চাইছেন? নিশ্চয়ই অমরেশবাবুর শাস্তির ব্যবস্থা করতে বলবেন না। তা হলে পরোক্ষে ব্ল্যাকমেলারের অপরাধটা সমর্থন করা হয়ে যায়।"

"না, আমি সেই রকমটা চাইছি না। আমি চাই ব্ল্যাকমেলার ধরা পড়ুক। গৌরবের পরিণতি বা কারও আর্থিক ক্ষতি চাই না। সেইজন্য ওষুধের মোড়কটা নিয়ে এলাম। এর সূত্র ধরে হয়তো ব্ল্যাকমেলারকে চিহ্নিত করা যাবে। আমার আরও একটা ইচ্ছে, আপনি জেরা করে জামাইবাবুর থেকে আরও ইনফরমেশন বের করুন। ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে জামাইবাবুর যা কথা হয়েছে, তার অনেকটাই চেপে গিয়েছেন। যা জানলে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধে হবে আপনার।"

কথাগুলো শুনতে-শুনতে দীপকাকু সম্ভবত অন্য প্রশ্ন ভাবছিলেন, প্রভাকরবাবু থামতেই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি পুরিয়াটা কবে পেয়েছেন এবং ঘরের কোথায়?"

"গতকাল পেয়েছি। ভাইয়ের ঘরে গিয়েছিলাম। ও চলে যাওয়ার পর থেকে ঘরটা তালা মারা ছিল। প্রথম ক'দিন আমারও যেতে ইচ্ছে করেনি। কাল ভাবলাম যাই, খানিকক্ষণ ওর ঘরে কাটিয়ে আসি। ভাই না থাকুক, জিনিসপত্রের মাঝে ওকে একটু হলেও পাব। গৌরবের রেখে যাওয়া জামাকাপড়, বইখাতা গুলটাছি, চেয়ারে বসে টেবিলের জিনিসগুলো দেখছিলাম। ড্রয়ার টানতেই দেখি এই পুরিয়াটা।"

"অমরেশবাবুকে বলেছেন এটার কথা?"

"না, কাউকেই বলিনি।"

"আমার ফোন নম্বর কোথা থেকে জোগাড় করলেন?"

"জামাইবাবুর মোবাইল ফোন থেকে, লুকিয়ে। আপনি যেদিন বসুভিলায় গিয়েছিলেন আমি, আমার স্ত্রী তখন শোকাহত দিদির পাশে। জামাইবাবু এসে বললেন একজন ডিটেকটিভ এসেছেন গৌরবের মৃত্যুর বিষয়ে খোঁজখবর করতে। তখনই আপনার নাম জানলাম। কাল ওই নাম ধরেই জামাইবাবুর ফোন সার্চ করেছি।"

"আমাকে তো তা হলে একবার গৌরবের ঘরটা দেখতে হয়। আপনি কাল আছেন তো ও বাড়িতে?"

"না, কাল সকালের ট্রেন ধরে আসানসোল, মানে আমাদের বাড়ি ফিরে যাব। গৌরবের পারলৌকিক কাজ ও বাড়িতে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"ঘর থেকে গৌরবের জিনিসপত্র নিয়ে যাবেন নাকি? তা হলে তো আমার যাওয়াটাই বৃথা," বললেন দীপকাকু।

"না, না। ভাইয়ের জিনিসপত্র যেমনকার তেমনি থাকবে। পরে কোনও একসময় এসে নিয়ে যাব। জামাইবাবু ওই ঘরের মালপত্র সরাবে বলে মনে হয় না, অন্তত কালকের মধ্যে তো নয়ই। মূল বাড়ির অনেক ঘর এমনিই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। আউট হাউজে গৌরবের ঘর তালামারাই থাকবে।"

"দেখি, কাল তা হলে একবার যাব। অমরেশবাবু ক'টা নাগাদ বেরন কলেজে, গৌরবের অনুপস্থিতিতে বেহালার সাইটে কি যাচ্ছেন?"

"বেহালার সাইটে যাচ্ছেন না। বলছেন, প্রোমোটরি বিজনেস বন্ধ করে দেবেন। কলেজে যাওয়ার দিনক্ষণের কোনও ঠিক নেই। বেরনোর হয়তো ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ির লোক জানতে পারে, তিনি বেরবেন। আমার মনে হয় সেই কারণেই ব্ল্যাকমেলার জামাইবাবুকে টার্গেট করতে পারেনি, বেছে নিয়েছে আমার ভাইকে। গৌরব একেবারে রুটিনমাফিক কাজ করত," বলে সামান্য বিরক্তি নিলেন প্রভাকর। ফের বলে ওঠেন, "আপনি জামাইবাবুকে ফোন করেই যাবেন না হয়। গৌরবের ঘরটা দেখবেন, সেটা বলবেন না। তা হলে ঘরটা

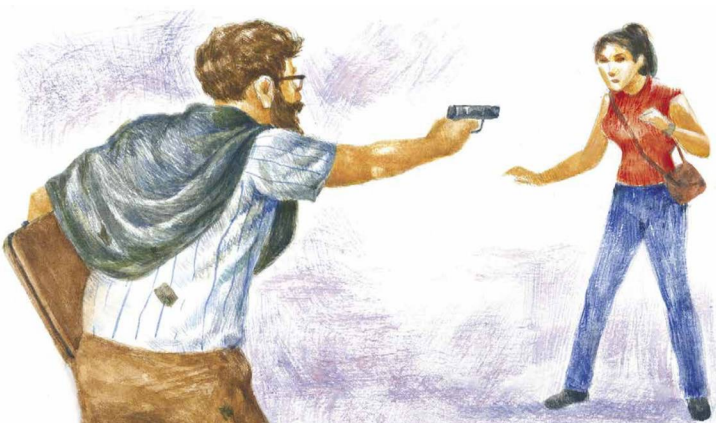

আগের অবস্থায় হয়তো পাবেন না। জামাইবাবু লন্ডভন্ড করে ফেলতে পারেন।''

দীপকাকু মিটিমিটি হাসছেন। মানেটা ধরতে পেরে প্রভাকর কুণ্ঠিত গলায় বললেন, ''জানি গোয়েন্দাকে জ্ঞান দেওয়া ঠিক হল না। তবু সাবধানের মার নেই।''

চেম্বারে এল সুদর্শনকাকা, দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করল, ''ওঁর জন্য চায়ের জল বসাচ্ছি, আপনাকে কী দেব?''

যাঁর জন্য চা বানানোর কথা অর্থাৎ প্রভাকরবাবু বলে উঠলেন, ''না, আমার আর চা খাওয়ার সময় নেই। এক বন্ধুর কাছে যেতে হবে। অলরেডি লেট করে ফেলেছি।''

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন প্রভাকর। টেবিলে রাখা পুরিয়াটা নির্দেশ করে দীপকাকুকে বললেন, ''ওষুধটা টেস্ট করার পর রিপোর্ট কী বেরল, প্লিজ় ফোন করে একটু জানবেন।''

''এটাকে এখনই শ্বাসকষ্টের ওষুধ বলে ধরে নেবেন না। রিপোর্ট সম্পূর্ণ অন্য কিছু বলতে পারে।''

কথা বাড়ালেন না প্রভাকরবাবু, নমস্কার জানালেন দীপকাকুকে। ঝিনুকের সঙ্গে সৌজন্যের হাসি বিনিময় করে বেরিয়ে গেলেন চেম্বার ছেড়ে।

দীপকাকু স্বগতোক্তির ঢঙে বলে উঠলেন, ''সৌম্যদীপ, সৌম্যদীপ। অনেক কিছু জানে, তাই এত চুপ করে আছে। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম বসুভিলায় সে একটা কথাও খরচ করেনি।''

''কিন্তু আপনি আর অমরেশবাবু যখন কথা বলছিলেন, সৌম্যদীপ ঘরের বাইরে থেকে সব শুনছিল। আচ্ছা, সেটা আপনি সেদিন টের পেলেন কী করে?'' জানতে চাইল ঝিনুক। দীপকাকু বললেন, ''ভিতর দরজার পরদার নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা জগিং শু পরা পা অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করছে।''

॥ ৫ ॥

কলেজের প্রায়ান্ধকার কেমিষ্ট্রি ল্যাব। ঝিনুক সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। বেশ খানিক দূরে অ্যাপ্রন পরা কেমিষ্ট্রির কোনও প্রোফেসর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু একটা টেস্ট করছেন। আলো শুধুমাত্র সেখানটাতেই। প্রোফেসরকে চিনতে পারছে না ঝিনুক, যেহেতু ওঁর পিঠের দিকটা দেখছে। দীপকাকুর নির্দেশেই ঝিনুক এখানে এসেছে। চুপিচুপি দেখতে হবে কী পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিড়াল পায়ে আরও খানিকটা এগোয় ঝিনুক, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। কীভাবে জানি টের পেয়ে ঘুরে তাকালেন প্রোফেসর। আরে, উনি তো প্রোফেসর নন, শোভন রায়চৌধুরী। মিলন রায়চৌধুরীর দাদা। ঝিনুক এখন খেয়াল করল ওঁর গায়ে অ্যাপ্রন চড়ানো থাকলেও পরনে ধুতি। শোভনবাবু ঝিনুককে দেখে এতটুকু বিস্ময় বা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, ''তুমি এসে ভালই করেছ। এটা টেস্ট করে বলো তো স্বাদ কেমন?''

শোভনবাবু সরে দাঁড়াতে টেবিলের জিনিসগুলো এখন দেখা যাচ্ছে। পিতলের একটা ছোট্ট তুলাযন্ত্র, যার এক পাল্লায় পাতলা একটা কয়েন, অন্য পাল্লাটায় এক চিমটে সাদা ডাস্ট।

ঝিনুকের প্রথম প্রশ্নটা হওয়া উচিত ছিল ''আপনি এখানে কেন?'' তার চেয়েও যেটা জানা জরুরি মনে হল, সেটাই বলল, ''কী টেস্ট করছেন আপনি?''

সাদা ডাস্টের শিশিটা রাখা ছিল তুলাযন্ত্রের পাশেই, সেটা হাতে তুলে শোভনবাবু বলছেন, ''শ্বাসকষ্টের ওষুধ। কী-কী ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে বের করে ফেলেছি। স্বাদটা টেস্ট করা বাকি। তুমি জিভে একছিটে লাগিয়ে বলো না স্বাদটা কেমন!''

''আমি কেন, আপনিই চেক করে দেখুন না,'' সামান্য ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল ঝিনুক।

একগাল হেসে শোভনবাবু বললেন, ''আমি তো বছরকুড়ি হল জিভে কোনও স্বাদ পাই না। আমার বিচ্ছিরি অসুখ। তোমরা কেসটা নিয়ে যখন তদন্ত করছ, এর স্বাদ তো তোমাদের জানতেই হবে।''

''আমি কোনও মতেই টেস্ট করব না,'' বলে ঝিনুক প্রায় দৌড় দিতে গেল দরজা লক্ষ করে। খপ করে ঝিনুকের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান

মারলেন শোভনবাবু। "না, না" শব্দ তুলে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে ঝিনুক, এমন সময় মায়ের গলা শুনে হাত-পা ছুড়ছিস কেন? তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ক্লাবে যেতে পারিস তো! শুয়ে-শুয়ে ব্যায়াম হচ্ছে?"

ঝিনুক লজ্জায় পড়ে যায়। এখনও মায়ের তালুতে ধরা আছে ওর হাত। বোঝাই যাচ্ছে মা টানছিলেন। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানায় উঠে বসে ঝিনুক। উৎকট স্বপ্ন দেখল। বিরক্তিকর!

"বিছানা ছাড় এবার। বাবার কাছে গিয়ে বোস। সে অনেকক্ষণ হল চা-চা করছে," বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মা। ঝিনুক চা খায় না। তার বরাদ্দ কোনও একপ্রকার গরম হেলথ ড্রিংক। বাবা চান ঝিনুক সেটা তাঁর সঙ্গে বসে পান করুক। তারপর যে যার সময় সুবিধেমতো খাওয়াদাওয়া করে নিজের কাজে বেরিয়ে যাক। রাতে আবার তিনজনে ডিনার টেবিলে। স্বপ্নে যে বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়েছিল ঝিনুকের, তা এখনও পুরোপুরি থামেনি। এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন বড় একটা দেখে না ঝিনুক। দীপকাকুর এবারের কেসটা এর জন্য দায়ী। এত ক্যারেকটার, কত রকম ঘটনা, একটার ঘাড়ে অন্যটা উঠে পড়ছে। ওদিকে কে যে অপরাধী, তার বিন্দুমাত্র আভাস কোথাও নেই।

বালিশের পাশ থেকে নিজের মোবাইল টেনে নেয় ঝিনুক, মিস কল বা এস এম এস নেই কোনও। হোয়াটসঅ্যাপ আছে। নিশ্চয়ই পরিচিত জনদের 'গুড মর্নিং' উইশ। কিন্তু মর্নিং আর নেই। আটটা পনেরো। ফোন রেখে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে আসে ঝিনুক।

বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে ঝিনুক ড্রয়িংরুমে এল। বাবা কাগজ পড়ছেন। ঝিনুকের উপস্থিতি টের পেয়ে বললেন, "গুড মর্নিং।"

"মর্নিং," বলে ঝিনুক সোফায় গিয়ে বসে। মা টেবিলে দু'জনের পানীয় দিয়ে গিয়েছেন সদ্য। ধোঁয়া উঠছে। ঝিনুক নিজের মগটা তুলে নেয়।

কাগজ নামিয়ে বাবা বললেন, "এত দেরি হল উঠতে? কেসটা নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছিস মনে হচ্ছে?"

"আমি আবার কী ভাবব! দীপকাকুই ভেবে কোনও কূলকিনারা করতে পারছেন না," বলে বাংলা কাগজটা টেবিল থেকে নিজের কাছে টেনে নিল ঝিনুক।

চা খেতে-খেতে বাবা বললেন, "দীপঙ্করের এবারের কেসটা মনে হচ্ছে স্টোনম্যানের মতোই আনসল্‌ভড থেকে যাবে। জানাই গেল না কে বা কারা রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত ফুটপাথবাসীর মাথা থেঁতলে দিত পাথর দিয়ে। সাফোকেটরকে ধরতে না পারার জন্য কিন্তু সবচেয়ে বেশি দায়ী আক্রান্ত পরিবারের লোকরা। আসল অপরাধীদের ধরতে সাহায্য করার বদলে নিজেরাই নিজেদের আপনজনদের সন্দেহ করে কেসটাকে পুরো ঘেঁটে দিচ্ছে। লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না দীপঙ্কর।"

গতকাল রাতে কেসের ব্যাপারে ঝিনুকের থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেছেন বাবা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলো বলছেন। উত্তরে কী আর বলবে ঝিনুক। খবরের কাগজ উলটে দেখতে থাকে পুলিশ অ্যাডটা রিপোর্ট করল কিনা? সাফোকেটরের কাছে চটজলদি পৌঁছনোর একটাই রাস্তা, বিজ্ঞাপনের বার্তা অনুযায়ী ব্ল্যাকমেলারের ফোন পাওয়ার পর যদি কোনও পরিবার সাহায্য চায়, দীপকাকুর প্ল্যান মাফিক কাজ করবে পুলিশ। বিজ্ঞাপনটাও ওই প্ল্যানেরই অংশ।

বাবা বলে উঠলেন, "গোয়েন্দাদের থেকে মিলিটারিদের কাজ অনেক সোজা। লক্ষ্য ঠিক করা থাকে, সময় বুঝে হামলা চালাও।"

বাবা অক্স মিলিটারিম্যান। প্যারাট্রুপার। তাই মেয়ের অ্যাডভেঞ্চারে এত উৎসাহ দেন। বাবার কথার উত্তরে ঝিনুক বলল, "মিলিটারিদেরও গোয়েন্দা বিভাগ থাকে।"

"তা অবশ্য ঠিক। আসলে গোয়েন্দা ব্যাপারটাকে ঠিক কাজের পর্যায় ফেলা যায় না। ওটা একটা সত্তা। সব মানুষের ভিতরেই থাকে, কারও মধ্যে বেশি, কারও বা কম।"

গোটা কাগজ উলটেপালটে দেখল ঝিনুক, পুলিশের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল না। ইংরেজি কাগজে কি দেবে? বাবার হাতে এখন কাগজটা, চাইতে যাবে ঝিনুক, বাবা বলে উঠলেন, "দীপঙ্করকে একটা ফোন কর না, প্রভাকরের দিয়ে যাওয়া ওষুধটার রিপোর্ট কী এল জিজ্ঞেস কর। ওটার রেজাল্টের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

ঝিনুকের খেয়াল হল, তাই তো! দীপকাকু কি রিপোর্টটা পেলেন হাতে? কাল বিকেলেই অবশ্য পুরিয়াটা দিয়ে গিয়েছেন প্রভাকর। এত তাড়াতাড়ি টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। তবু একবার ফোন করে দেখা যেতে পারে। ড্রয়িংরুমের ল্যান্ডফোন থেকে কলটা করতে যাবে ঝিনুক, ঘরে ওর নিজের সেলফোনটা বাজতে শুরু করল। এত সকালে কোন বন্ধু আবার ফোন করল? কল রিসিভ করতে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় ঝিনুক।

ঘরে এসে স্ক্রিন অলাউট হয়ে ওঠা ফোনটা বিছানা থেকে তুলে নিল ঝিনুক। আরে দীপকাকু কল করছেন! সেট কানে নিয়ে "বলুন" বলল ঝিনুক। ওপ্রান্তে দীপকাকুর গলা, "কুড়ি মিনিটের মধ্যে বসুশ্রী সিনেমা হলের সামনে চলে এসো। চেনো তো হলটা?"

"চিনি। যদি কুড়ি মিনিটের মধ্যে না পারি আসতে? অনেকটাই তো দূর, কুঁদঘাট থেকে হাজরা।"

"পঁচিশ-তিরিশ হলেও চলবে। তার বেশি যেন না হয়।"

"ঘটনাটা কী?" না জিজ্ঞেস করে পারে না ঝিনুক।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে দীপকাকু বলে উঠলেন, "পুলিশের বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া গিয়েছে। হুমকির ফোন পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনোহরপুকুরের এক পরিবার জানিয়েছে পুলিশকে।"

ঝিনুকের মুখে কথা সরছে না। অবশেষে সাফোকেটরের কাছে পৌঁছনো যাচ্ছে। হাত-পা কাঁপছে ঝিনুকের। সে কী পারবে আধঘণ্টার মধ্যে বসুশ্রী হলের সামনে পৌঁছতে?

সময়ের আগেই জায়গা মতো পৌঁছে গেল ঝিনুক। দ্রুত পোশাক বদলে বাড়ি থেকে ট্যাক্সি ধরেছিল। বসুশ্রী হলের সামনে দাঁড়িয়ে দীপকাকুকে খুঁজছে। পেয়েও গেল। দীপকাকুকে ছাড়িয়ে এসেছে সে। বাইক স্ট্যান্ড করে হেলমেট না খুলে দাঁড়িয়ে আছেন দীপকাকু। হাতের ইশারায় ডাকছেন ঝিনুককে। তড়িঘড়ি দীপকাকুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ঝিনুক। হেলমেট মাথায় চাপানো অবস্থাতেই দীপকাকু বললেন, "রাস্তার ওপারে মনোহরপুকুর রোড। খানিকটা এগোলেই হলুদ রঙের চারতলা বাড়ি। ও বাড়ির কর্তা এখন শ্বাসকষ্টে ভুগছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ও বাড়ির এক সদস্য পুলিশের দেওয়া সুটকেস নিয়ে বেরবে।"

"বেরিয়ে গিয়েছে কিনা আপনি কী করে জানছেন? বাড়িটা তো এখন থেকে দেখা যাচ্ছে না।"

"বেশ কিছু পুলিশ ছদ্মবেশে বাড়ির আশপাশে ছড়িয়ে আছে। সুবীর দত্তও আছেন কাছেপিঠে। সুটকেস নিয়ে কেউ বের হলেই আমাকে খবর দেবেন।"

"বেরনোর সঙ্গে-সঙ্গে খবর পেয়ে বিশেষ কোনও লাভ তো হবে না। বাড়ির সদস্যকে ফলো করতে পারব না পুলিশ বা আমরা। করলেই দুষ্কৃতী ওষুধ দেবে না। মারা যাবেন আক্রান্ত ব্যক্তি," বলার পরই কথার সূত্রে ঝিনুকের মনে পড়ল জরুরি প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল, "প্রভাকরবাবুর দিয়ে যাওয়া স্যাম্পেলের রিপোর্ট এসেছে?"

"না, এখনও আসেনি। বিকেলের আগে পাব না। তার আগেই যদি অপরাধীকে ধরা যায়, নব্বই ভাগ কাজ মিটে গেল।"

"আসল অপরাধী সুটকেসটা নিতে আসবে, নাকি কাউকে পাঠাবে, সে ব্যাপারে তো শিওর হওয়া যাচ্ছে না।"

"যাবে, যদি লোকটাকে কেউ সামনে থেকে দেখে রাখে। দেখতে হলে হলুদ বাড়ির সদস্যকে ফলো করতে হবে।"

"কে ফলো করবে? ফলো করার রাস্তা তো বন্ধ করে দিয়েছে ব্ল্যাকমেলার।"

"তুমি ফলো করবে।"

"আমি!" যেন আকাশ থেকে পড়ল ঝিনুক। হেলমেটের ভিতর থেকে আসা কথাটা ঠিক শুনল কি?

হেলমেট পরা মাথা 'হ্যাঁ' সূচকভাবে নড়ল। ভীষণ নার্ভাস লাগতে শুরু করেছে ঝিনুকের। পায়ে যেন ঠিক জোর পাচ্ছে না। হেলমেটের ভিতর থেকে দীপকাকু বলে উঠলেন, "আমার ধারণা ব্ল্যাকমেলার এখনও জানে না যে আমি এই কেসটার তদন্ত করছি। যদি জানত, এতদিনে আমাকে একটা সাবধানবাণী শোনাতই। প্রাইভেট ডিটেকটিভকে হুমকি দেওয়া সহজ, পুলিশকে থ্রেট করা মানে পুরো ডিপার্টমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করা। তবু আমি ফলো করব না পুরুষ মানুষ বলে। তুমি ফলো করলে চট করে সন্দেহ হবে না দুষ্কৃতীর। ভাববে কলেজ, টিউশন অথবা বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে মেয়েটা।"

"কত দূর ফলো করতে হবে আমাকে?"

"দুষ্কৃতী সুটকেস নিয়ে কোথায় যাচ্ছে, তা দেখতে হবে না তোমাকে। লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে চেহারাটা ভাল করে দেখে আসবে," বলার পর কী একটা ভেবে নিয়ে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "তোমার ব্যাগে ইয়ারফোন আছে?"

"আছে, সব সময় থাকে। কেন?"

"ফোনে ইয়ারফোনের প্লাগ গুঁজে ফোনসেটটা রাখবে সাইড ব্যাগে। পিপকার দুটো কানে। মনোহরপুকুর ঢোকার আগেই আমার নম্বরে কল করে অন রাখবে ফোন। প্রয়োজন বুঝে আমার সঙ্গে কথা বলবে, ভঙ্গিটা হবে এমন যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছ। ঠিক আছে?"

ঘাড় কাত করে ঝিনুক কাঁধে ঝোলানো ছোটখাট ব্যাগটা থেকে ইয়ারফোন বের করে। মোবাইল সেট জিন্সের পকেটে আছে। এখন ঝিনুক বুঝতে পারছে দীপকাকু কেন হেলমেট চাপিয়ে আছেন, এই অপারেশনে চেহারাটা পুরোপুরি প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন না। দুষ্কৃতীও হয়তো কোনও টিম নিয়ে কাজ করছে, তারা লক্ষ রাখছে চারপাশ।

দীপকাকুর ফোন বাজছে। পকেট থেকে সেট বের করে স্ক্রিনটা দেখলেন। অস্ফুটে বলে উঠলেন, "পুলিশ!"

সুইচ টিপে ফোন সেটটা হেলমেটের তলা দিয়ে কানের কাছে নিলেন দীপকাকু বললেন, "হ্যালো!" ও প্রান্তের কথা শুনে জানালেন, "ওকে, ফাইন!"

ফোনসেট হেলমেটেই ঢোকানো থাকল। দীপকাকু ঝিনুককে বললেন, "যাও, রাস্তা পার হও সাবধানে। হলুদ বাড়ির লোক সুটকেস নিয়ে বেরছে।"

ঝিনুক এগোচ্ছে, দীপকাকু তার দিকে থামস্ আপ করলেন। ঝিনুক একইভাবে প্রত্যুত্তর দিল। নেমে পড়ল রাস্তায়।

মনোহরপুকুর রোডে পা দেওয়ার আগেই ফোনে দীপকাকুর নম্বরে কল করে রেখেছে ঝিনুক। পায়ে-পায়ে এগোচ্ছে এখন। দেখতে পেল চারতলা হলুদবাড়ি, সামনে লোহার গেট। ওই তো, একজন হাতে সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে আসছে। হলুদবাড়ির প্রতিনিধি লোকটি। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। কিন্তু মুশকিল হল লোকটি এগিয়ে আসছে ঝিনুকের দিকে মুখ করে। একে কী করে ফলো করবে ঝিনুক? এখনই ঘুরে দাঁড়াবে কি? তা হলে আবার সন্দেহ হতে পারে আড়ালে থাকা দুষ্কৃতীর বা তার টিমের লোকেদের। ভাববে, মেয়েটা যাচ্ছিল সোজা, ঘুরে দাঁড়াল কী উদ্দেশ্যে? ঝিনুকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে একজনের জীবন, শ্বাসকষ্টে ভুগছেন যে ব্যক্তি। দুষ্কৃতী যদি টের পায় ঝিনুক ফলো করছে গোটা ঘটনাটা, ওষুধ দেবে না। এ সব ভাবনা ঝিনুকের হাঁটা একেবারে স্লো করে দিয়েছে। ইয়ারফোন মারফত হঠাৎ কানে আসে দীপকাকুর গলা, "দাঁড়িয়ে পড়ছ কেন? স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে থাকো, হলুদ বাড়ির লোকটাকে ক্রস করে গেলেও চলবে। তুমি ফলো করছ এটা বুঝতে দিয়ো না।"

মনে বল পেয়ে যায় ঝিনুক, এমনভাবে মাথা নাড়তে-নাড়তে হাঁটতে থাকে, যেন মোবাইলে গান শুনছে। হঠাৎ লক্ষ করে হলুদ বাড়ির লোকটা বুক পকেট থেকে মোবাইল বের করছে। নির্ঘাত ব্ল্যাকমেলারের ফোন। ব্ল্যাকমেলার অন্য কারও ফোন ধরতে বারণ করে দেয় সুটকেস বদলের সময়।

লোকটি কথা শেষ করে ফোনসেট ঢোকাল পকেটে। কী নির্দেশ পেল বোঝা যাচ্ছে না। ঝিনুকের পাশ দিয়ে অনেকেই হেঁটে যাচ্ছে। পায়ে চটি নেই, মলিন পোশাকের একজন হলুদ বাড়ির লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভিখারি বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, কী যেন বলে হাত বাড়ল ভিখারি। ভিক্ষে চাইছে। হলুদ বাড়ির লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঝিনুকের থেকে দূরত্ব এখন ফুটবিশেক। কিন্তু এ কী! ভিখারির হাতে সুটকেস তুলে দিল হলুদবাড়ির লোকটা। ঝিনুকের মধ্যে টানটান উত্তেজনা, তা হলে ভিখারি নয়, দুষ্কৃতী। মলিন পোশাক, গায়ে ছেঁড়াফাঁটা চাদর। সুটকেসটা চাদরের আড়লে নিয়ে হলুদ বাড়ির প্রতিনিধির হাতে কী যেন দিল। মনে হতে হচ্ছে ওষুধ। ঝিনুকের এখন কাজ মলিন পোশাক পরার কাছাকাছি চলে যাওয়া। ভাল করে চিনে রাখতে হবে লোকটাকে।

সুটকেস আড়াল করে ভবঘুরে মানুষের মতো এলোমেলো পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতী। বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ফলো করে যাচ্ছে ঝিনুক। লোকটার দিকে তাকাচ্ছে না, আড়চোখে লক্ষ রাখছে আগের মতোই মোবাইলে গান শোনার অ্যাক্টিং করে মাথা দোলাচ্ছে। যদি শিগ্‌গর হওয়া যেত দুষ্কৃতী একটু আগে ওষুধই দিল হলুদবাড়ির লোকটাকে, তা হলে এখনই ঝিনুক দৌড়ে গিয়ে ভিখারির সাজা দুষ্কৃতীর ঘাড় চেপে ধরত। যতক্ষণ না দীপকাকু ফোনে জানাচ্ছেন ওষুধ পাওয়া গিয়েছে, তার আগে যেতা ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না। লোকটার কাছাকাছি পৌঁছনোর জন্য হাঁটার জোর বাড়ায় ঝিনুক। আচমকা ডানহাতি গলিতে ঢুকে পড়ল মলিন পোশাক। এবার যদি দৌড় লাগিয়ে পালিয়ে যায় সে? ঝিনুক দেরি করে না, ছুটে যায় গলি লক্ষ করে।

মুখটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়তেই হয় ঝিনুককে, হুদপিণ্ডটা যেন পায়রার মতো উড়ে গেল তার বুক থেকে। ভিখারি সাজা লোকটা তার দিকে পিস্তল তাক করে আছে। চোখে ঘোলাটে চশমা, ঝাঁকড়া চুল, এক মুখ দাড়ি, গোঁফ। বুকের কাছে ধরা আছে সুটকেস, সরে গিয়েছে চাদর। পিস্তল ধরা হাত দিয়েই ঝিনুককে পিছিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। পায়ে-পায়ে পিছতে থাকে ঝিনুক। লোকটা ইশারায় আরও দূরে চলে যেতে বলছে। লোকটার দিকে চোখ রেখেই ঝিনুক গলির বাইরে চলে এল, মানে বাধ্য হল আসতে। পাশে বাইক থামার শব্দ। যের একবার বুক ফাঁকা হয়ে যায় ঝিনুকের, ব্ল্যাকমেলারের টিমের কেউ নাকি? না, হেলমেটের ভিতর থেকে ভেসে আসে দীপকাকুর গলা "এতক্ষণে পালিয়ে গিয়েছে। চলো, দেখে আসি কোন রাস্তা ধরে পালাল।"

দীপকাকুর বাইকের পিছনে উঠে বসল ঝিনুক। বাইক ঢুকল গলিতে। শুনশান গলি। কে বলবে একটু আগে এখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছিল। কিছু দূর গিয়ে ভাঙা একটা পাঁচিলের পাশে বাইক থামালেন দীপকাকু। বললেন, "মনে হচ্ছে এটা ডিঙিয়ে পালিয়েছে। নেমে পড়ো, দেখি জায়গাটা।"

সিট থেকে নামল ঝিনুক। বাইকস্ট্যান্ড করলেন দীপকাকু। হেলমেট খুলে পোড়ো পাঁচিলটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝিনুকও চলে এল পাশে। দীপকাকু ঝুঁকে গিয়ে পাঁচিলের ওধারের নীচটা দেখে-দেখতে বললেন, "ছদ্মবেশের জামাকাপড় এখানে ফেলেনি। সব সুদ্ধ রওনা দিয়েছে।"

"আমাদের অপারেশন তা হলে ফ্লপ! লোকটার আসল চেহারা তো দেখতেই পেলাম না।"

সোজা হয়ে চারপাশে চোখ বোলাতে-বোলাতে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "লোকটা তোমায় কী বলছিল?"

"মুখে কিছু বলেনি। ইশারায় চলে যেতে বলছিল।"

কথাটা শুনে একটু যেন উৎসাহিত হলেন দীপকাকু। বললেন,

"এই তো, এটা একটা পঞ্জেটিভ পয়েন্ট। লোকটা নিজের কণ্ঠস্বর তোমাকে চেনাতে চায়নি। হয়তো তার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে হতে পারে।"

পাঁচিলের ধার থেকে সরে এসে দীপকাকু বাইকের দিকে এগোলেন। অনুসরণ করল ঝিনুক। বলতে থাকল, "পুলিশ নিশ্চয়ই সেন্সর ডিভাইস রেখেছে সুটকেসে। লোকটা যেখানেই থাক, পুলিশ ঠিক জানতে পারবে।"

"সেন্সর ডিভাইস বলতে আলাদা কিছু জোগাড় করতে পারেনি পুলিশ। একটা মোবাইল ফোন অন অবস্থায় সুটকেসে রেখেছে," বলে বাইকে উঠে বসলেন দীপকাকু। বললেন, "মোবাইল ট্র্যাক করে লোকটা কোথায় যাচ্ছে জানা গেলেও, এক্ষুনি ধরা যাবে না। আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

"ভিষারি সাজা লোকটা সুটকেসটা নিয়ে কী যেন একটা দিল হলুদ বাড়ির লোকটাকে। ওটা কি ওষুধ?" জিজ্ঞেস করে ঝিনুক।

"তাই তো মনে হচ্ছে। ওষুধটা তখনই দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না দুষ্কৃতীর। ব্ল্যাকমেলার নিজের দেওয়া সময়ে নিজেই বন্দি হয়ে পড়েছিল। আমার পরামর্শমতো পুলিশ আক্রান্তর পরিবারকে সুটকেস পৌঁছে দেয় তাদের ফোন পাওয়ার চল্লিশ মিনিট পরে। সাদা পোশাকে গিয়েছিল পুলিশ। দুষ্কৃতী যদি নজর রেখে থাকে হলুদ বাড়িটার উপর, সাদা পোশাকের পুলিশকে ভাববে এই পরিবারের কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী, টাকা নিয়ে এল। সুটকেস পেয়ে ওদের বাড়ির লোক যখন বেরল, একঘণ্টার পঞ্চাশ মিনিট পার। ব্ল্যাকমেলার বাধ্য হবে তখনই ওষুধটা হাতে-হাতে ডেলিভারি করতে বা তার লোকটাকে দিয়ে করাতে। পরে যখন অপরাধী দেখবে টাকার বান্ডিলে কাগজ ঢোকানো, হাত কামড়াবে। তার আগেই যদি পুলিশ সুটকেস নিয়ে যাওয়া লোকটাকে ধরতে পারে, তার চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না। এখন দেখতে হবে সত্যিই হলুদ বাড়ির লোক ওষুধ পেল কিনা?" কথা শেষ করলেন দীপকাকু। ঝিনুকরা এসে পড়েছে হলুদ বাড়ির গেটে।

দীপকাকুর আন্দাজ মিলে গিয়েছে। ওষুধই দিয়েছে ভিখারি সাজা লোকটা। বাড়ির কর্তা ওষুধ খেয়ে এখন অনেকটাই সুস্থ। ওঁকে দেখে, কথা বলে দীপকাকু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সঙ্গে ঝিনুকও। সুটকেস নিয়ে যিনি বেরিয়েছিলেন তিনি আক্রান্ত ব্যক্তির বড় ছেলে। বাবার ঘরেই ছিলেন। দীপকাকু ইশারায় ডেকেছেন ওঁকে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ঝিনুকরা। বড় ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালেন। দীপকাকু জানতে চাইলেন, "হুমকির গলা রেকর্ড করেছেন ফোনে?"

"করেছি, দ্বিতীয়বারের কলটা। ফোনে হুমকি শুনছি স্যাডে যে নম্বরটা দিয়েছে, তাতে যোগাযোগ করলাম। অফিসার বললেন টাকার সুটকেস পাঠাচ্ছেন। একটু দেরি হবে। লোকটা যদি তাগাদা দেয়, কলটা ফোনে রেকর্ড করে একটু বেশিক্ষণ কথা চালাতে হবে। বলতে হবে, খুব চেষ্টা করছি টাকা জোগাড় করার।"

"গুড," বলার পর দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "ওষুধ পুরোটা খাইয়ে দেননি তো?"

"না, স্পেসিমেন হিসেবে কিছুটা রাখা আছে। অফিসার সেরকমই বলে রেখেছিলেন। ফোন, স্পেসিমেন এসব কি দেব আপনাকে?"

"না, যত্ন করে রেখে দিন সব। কোনওভাবেই যেন বেহাত না হয়।"

ভদ্রলোক ঘাড় হেলিয়ে বোঝালেন বেহাত হবে না। দীপকাকু এবাড়িতে নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় পাননি। এঁরা পুলিশের লোক বলেই ধরে নিয়েছেন। ঝিনুক এটাও বুঝতে পারছে অফিসার যা-যা নির্দেশ দিয়েছেন এ বাড়িতে, সবই দীপকাকুর পরামর্শে। ফোন বেজে উঠল দীপকাকুর। সেট বের করে স্ক্রিন দেখে কানে লাগালেন ফোন। বললেন, "বলুন স্যার, কোনও ট্রেস পাওয়া গেল?"

সম্ভবত গোয়েন্দা অফিসার সুবীর দত্তর ফোন। ওপারের কথা শুনছেন দীপকাকু, মুখ দেখে মালুম হচ্ছে খবর ইতিবাচক নয়। ফোন কেটে মোবাইল পকেটে পুরলেন দীপকাকু। ঝিনুককে বললেন, "চলো, লোকটা শুনছি মাঝরাস্তা থেকে উধাও।"

এক্সাইড মোড়ে এসে বাইক থামালেন দীপকাকু। সিগন্যাল লাল। পিছনে বসে ঝিনুক ভেবে যাচ্ছে মাঝরাস্তা থেকে দুষ্কৃতী উধাও মানে ওর সুটকেসে রাখা মোবাইল ফোনটাকে আর ট্র্যাক করা যাচ্ছে না। লোকটা কি এইটুকু সময়ের মধ্যেই সুটকেস খুলে লুকনো মোবাইলটা পেয়ে গিয়েছে? ফেলে দিয়েছে ফোনে লাগানো সিমকার্ড? তা হলে তো ফল্‌স টাকাগুলোও চোখে পড়েছে। তার মানে ঝিনুকরা এখন যেখানে যাচ্ছে, তার আশপাশে পড়ে থাকবে মোবাইলের সিম, ফল্‌স টাকার সুটকেস। সবুজ হল সিগনাল। দীপকাকু ডান দিকের রাস্তা ধরলেন।

খুব একটা দূরে যেতে হল না। ক্যামাক স্ট্রিট পড়ার আগেই প্রাচীন বাড়ির সামনে বাইক থামালেন দীপকাকু। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ-ছ'জনের একটা দল। যাদের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশের সুবীর দত্তকেও দেখা গেল। সকলেই সাদা পোশাকে। দীপকাকু হেলমেট খুলে বাইকে ঝোলালেন, ঝিনুকও তাই করল। তারপর দীপকাকুর সঙ্গে পা চালিয়ে উঠে এল ফুটপাথে।

পুলিশের দল ঘিরে দাঁড়িয়েছে দীপকাকুকে। সুবীর দত্ত বলছেন, "এত দূর পর্যন্ত সিমকার্ডের সিগনাল পাওয়া গিয়েছে। আশপাশের দোকানপাট, ঘোরঘুঁজি সব দেখলাম। কোনও চিহ্ন নেই লোকটার। যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে।"

"এখানে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত একটানা সিগন্যাল পেয়েছেন, নাকি মাঝে-মাঝে ব্রেক হয়েছে?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"না, ব্রেক হয়নি। এখানে আসার পরই একেবারে অফ।"

সুবীর দত্তর কথা শুনে নিয়ে দীপকাকু দৃষ্টি বোলাতে লাগলেন চারপাশে। বলতে থাকলেন, তার মানে মেট্রো চেপে আসেনি। এলে সিগনাল কেটে যেত মাঝে-মাঝে। ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কারে এসেছে। বাসে চড়লে এত কম সময়ে এখানে পৌঁছনো যেত না।"

কথা শেষ করে দীপকাকু ফুটপাথ ঘেঁষা দোকান-বাড়ির উপর নজর রেখে বেশ কয়েক পা এগোলেন এবং পিছোলেন। মাথা তুলে ফ্লাইওভারটাও দেখলেন একবার। তারপর সুবীর দত্তর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "সুটকেসটা নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে যত গাড়ি গিয়েছে, তার সি সি টিভি ফুটেজ জোগাড় করুন ট্রাফিক পুলিশের থেকে।"

"তাতে লাভ?" জিজ্ঞেস করলেন সুবীর দত্ত।

দীপকাকু বললেন, "হয়তো ফুটেজে আমরা দেখতে পাব লোকটা কোন গাড়িতে উঠছে।"

"গুড আইডিয়া!" উৎসাহের গলায় বলে উঠলেন অফিসার। ফের বললেন, "ট্র্যাফিক বুথে সি সি ক্যামেরার বন্দোবস্ত ইদানীং অনেক জোরদার করা হয়েছে।"

"কিন্তু লোকটা যদি গাড়িতে ওঠার আগে মেকআপ খুলে ফেলে, কী করে চেনা যাবে তাকে? ওই পরচুলা আর ড্রেস খুলতে কতটুকুই বা সময় লাগবে?" এটা বললেন অন্য এক পুলিশকর্মী।

"তা ঠিক। তবে আমাদের চেষ্টা তো চালাতে হবে। কোনও সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না," বলে ফুটপাথ থেকে নেমে এলেন দীপকাকু। অফিসার সুবীর দত্তের উদ্দেশে বললেন, "ফুটেজে যদি লোকটাকে নাও পাওয়া যায়, আপনার কাছে ব্রেকে দেবেন ক্লিপিংসটা। আমি একবার দেখব। এখন চলি।"

বাইকে উঠে বসলেন দীপকাকু। ঝিনুকও উঠে পড়ে। ক্লিপিংসে লোকটাকে যদি না পাওয়া যায়, দীপকাকু সেটা কেন দেখবেন, মাথায় ঢুকল না ঝিনুকের। বাইক চালু করলেন দীপকাকু। ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"ভীষণ জরুরি একটা জায়গায়।"

জায়গাটির নাম বলার হলে বলেই দিতেন দীপকাকু। প্রশ্ন করে

বিরক্ত করতে চাইল না ঝিনুক।

দীপকাকু বাইক থামালেন ক্যামাক ষ্ট্রিটের এক রেস্তরাঁর সামনে। ঝিনুক বিস্ময় প্রকাশ করে বলে ওঠে, ''ভীষণ জরুরি জায়গা কি এটাই?''

''হ্যাঁ, কারণ আমাদের দু'জনেরই ব্রেকফাস্ট হয়নি।''

কথাটা শোনার পরমুহূর্তে প্রচণ্ড খিদে অনুভব করল ঝিনুক। একেই বলে বোধ হয় ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলে থাকা।

॥ ৬ ॥

''এলেন যখন, ফোন করে এলেই পারতেন। আমি যদি না থাকতাম?'' দীপকাকুর উদ্দেশে হালকা চালে বললেন অমরেশ বসু। ঝিনুকরা আবার বসুভিলার বৈঠকখানায়। দীপকাকু বললেন, ''যাচ্ছিলাম এই রাস্তা দিয়েই, ভাবলাম কাজটা সেরেই যাই। কাল এলেও চলত।''

''তা কাজটা কী?'' জানতে চেয়ে সোফায় বসলেন অমরেশবাবু। উত্তর আসার আগেই বললেন, ''আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।''

দীপকাকু বসলেন সোফায়, পাশে বসল ঝিনুক। দীপকাকু বলে ওঠেন, ''তদন্তের প্রয়োজনে গৌরবের ঘরটা একবার দেখা দরকার। মানে, ওর জিনিসপত্র থেকে যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়।''

''নিশ্চয়ই দেখবেন। ঘরটায় তালা মারা আছে। আমি সত্যকে বলছি খুলে দিতে। তার আগে একটু চা খাবেন তো?''

''না, থ্যাঙ্ক ইউ। চা খাওয়ার মতো সময় হাতে নেই। ঘরটা একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে যাব।''

''সন্ধেবেলায় এলেন, একটু চা খাবেন না!'' আক্ষেপের গলায় বললেন অমরেশবাবু।

দীপকাকুর মুখে না-বাচক সৌজন্যের হাসি। ভিতর বাড়ির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিলেন অমরেশবাবু, ''সত্য, সত্য।''

বাড়ির কাজের লোকটি হুটতে-পুটতে এসে দাঁড়াল পিছনের দরজায়। অমরেশবাবু তাকে বললেন, ''বাগানের ঘরের চাবিটা আন। এঁরা গৌরবের জিনিসপত্র দেখবেন।''

কাজের লোকটি চলে গেল। অমরেশবাবু জানতে চাইলেন, ''আপনাদের কাজ কত দূর এগোল? ধরা সম্ভব হবে ব্ল্যাকমেলারকে?''

''চেষ্টা তো চলছে,'' অন্য কিছু একটা ভাবতে-ভাবতে উত্তর দিলেন দীপকাকু।

অমরেশবাবু বললেন, ''সেদিন পুলিশ খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে দেখলাম। মনে হল এই ব্ল্যাকমেলিংটাকেই উদ্দেশ্য করে। নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেলার এখনও তার দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।''

''হ্যাঁ, আজকেই তো একটা ইন্সিডেন্ট হয়েছে,'' দীপকাকু।

অমরেশবাবু ভয়ার্ত গলায় বলে উঠলেন, ''তাই নাকি! কোন অঞ্চলে ঘটেছে ঘটনাটা?''

''হাজরার কাছে।''

দীপকাকুর বলা শেষ হতেই কাজের লোকটি ঘরে ঢুকল। অমরেশবাবুর কাছে এসে দিল গৌরববাবুর ঘরের চাবি। সেটা নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন অমরেশবাবু, দীপকাকু বললেন, ''আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন? আপনার লোক আমাদের নিয়ে গেলেই চলবে। বেশিক্ষণ তো লাগবে না।''

সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে অমরেশবাবু বললেন, ''যাক, তা হলে সত্যই যাক।'' এর পর কাজের লোকটিকে চাবিটা দিয়ে বললেন, ''বাবুদের সঙ্গে থাকবি। হেল্প করবি কাজে।''

চাবি নিয়ে ঘাড় কাত করল মাঝবয়সি লোকটা। পা বাড়াল বাইরের দরজার দিকে। সোফা থেকে উঠে ঝিনুকরাও চলল।

আলো-আঁধারি বাগান। পাঁচ-ছ' ফুটের তফাতে হেঁটে যাচ্ছে এ বাড়ির কাজের লোক। সন্ধে উতরে যাওয়ার পর ঝিনুকরা এ বাড়িতে এসে পৌঁছয়। বাইকে চেপে আসার পথে ঝিনুক দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''আমরা যাচ্ছি, অমরেশবাবুকে জানিয়েছেন?''

''না, সারপ্রাইজ ভিজিট,'' বলেছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক জানতে চায়, ''সারপ্রাইজ দেওয়ার দরকার পড়ছে কেন?''

''প্রভাকরবাবুর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, ভদ্রলোক আমাদের কাছে অনেক কিছু লুকিয়ে গিয়েছেন। হঠাৎ পৌঁছলে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার সময় পাবেন না,'' বলেছিলেন দীপকাকু। তাই যদি হত, ঝিনুকরা বিনা নোটিশে পৌঁছনোতে অমরেশবাবুকে অপ্রস্তুত দেখাত। তেমনটা কিন্তু মনে হয়নি।

গেট থেকে খানিক তফাতে পাঁচিলের গায়ে গৌরববাবুর ঘর, অনেকটা ছোট কোয়ার্টার বাড়ির মতো। অন্ধকার বারান্দায় উঠে গিয়েছে কাজের লোকটি, কুঁকে গিয়ে তালা খুলছে। ঝিনুকরা এসে পৌঁছল বারান্দাটায়। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কাজের লোক, সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল।

একটাই ঘর, লাগোয়া কিচেন, বাথরুম। ঘরটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। খাটের চাদর, বালিশ পরিপাটি করে রাখা। দেওয়ালে টাঙানো গৌরববাবুর হাসিমুখের পোর্ট্রেট ছবি। বইয়ের তাক, স্টিল আলমারি, টেবিল, চেয়ার প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। দীপকাকুর সঙ্গে ঝিনুকও ঘুরে-ঘুরে দেখছে জিনিসগুলো। বইয়ের তাকের সামনে বেশিক্ষণ সময় কাটালেন দীপকাকু, বিভিন্ন প্রকার বই। নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ের উপর ঝোঁক ছিল না গৌরববাবুর। স্টিল আলমারির হ্যান্ডেলে চাপ দিলেন দীপকাকু, খুলল না। তার মানে চাবি অমরেশবাবুর কাছে। দীপকাকু কাজের লোকটির দিকে ঘাড় ফেরালেন, মনে হচ্ছে আলমারির চাবিটা আনতে বললেন। তা না বলে জিজ্ঞেস করলেন, ''এই ঘরটা শেষ কবে ঝাড়পোঁছ করা হয়েছে?''

''ঠিক বলতে পারব না। দাদাবাবু মারা যাওয়ার পর ঘর যেমনকার তেমনিই ছিল। ওঁর বড়দা এখান থেকে যাওয়ার আগে একবার ঢুকেছিলেন।''

উত্তর শুনে দীপকাকু স্বগতোক্তির ঢঙে বললেন, ''প্রভাকর যা বলেছেন, সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। পুরিয়া এ ঘর থেকেই পাওয়া গিয়েছে।''

কথাগুলো এত আস্তে আর জড়িয়ে বললেন, কাজের লোকটির শুনতে পাওয়ার কথা নয়। সম্ভবত পায়ওনি। ঝিনুকদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। দীপকাকু এবার পরিষ্কার উচ্চারণে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ''সত্য, তোমার ছোট দাদাবাবু কি এখন বাড়িতেই আছে?''

''না, নেই। কাজে বেরিয়েছে। আমি ওকে সমুদাদা বলি,'' বলল কাজের লোকটি।

আবার অস্ফুটে দীপকাকু বলে উঠলেন, ''এই রে, ভেবেছিলাম আছে। থাকলে ডেকে পাঠাতাম।'' একটু বিরতি নিয়ে দীপকাকু ফের কাজের লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, ''সমুদাদা ক'টা নাগাদ ফিরতে পারেন?''

মাথা নেড়ে লোকটি বলল, ''কোনও ঠিক নেই।''

মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে দীপকাকু যেন বাতাসে কান পাতলেন। বলে উঠলেন, ''মনে হচ্ছে এসে গিয়েছে।''

কথাটার মানে বুঝতে অসুবিধে হল না ঝিনুকের। বাড়িতে গাড়ি ঢোকার শব্দ। কাজের লোকটি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যেহেতু পিছন ফিরে আছে, দীপকাকু তড়িৎগতিতে টেবিলের সামনে গেলেন, ড্রয়ার টেনে কী যেন ঢুকিয়ে ফের ঠেলে দিলেন।

দীপকাকুর অনুমান মিলে গেল। ঘরে এসে দাঁড়ালেন সৌম্যদীপ। চোখেমুখে বিস্ময়। বললেন, ''কী হচ্ছে এ ঘরে?''

''তল্লাশি। তোমার কী মনে হয়েছিল, চোরটোর ঢুকেছে?'' ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বললেন দীপকাকু। আসলে ঘুরিয়ে জানতে চাইলেন এই ঘরে চুরি যাওয়ার মতো কোনও সামগ্রী আছে কি না?

"না, মানে হঠাৎ এ ঘরে আলো জ্বলতে দেখে..." কথা শেষ করলেন না সৌম্যদীপ।

দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "গৌরব বেঁচে থাকতে এ ঘরে আপনার যাতায়াত ছিল?"

"ছিল। মাঝে-মাঝে এখানে এসে মামার সঙ্গে আড্ডা মারতাম।"

দীপকাকু এবার কাজের লোকটিকে বললেন, "এ ঘরের আলমারির চাবিটা নিয়ে এসো তো বাবুর থেকে।"

কাজের লোকটি চলে গেল ঘর ছেড়ে। ফের সৌম্যদীপের উদ্দেশে দীপকাকু বললেন, "গৌরব মারা যাওয়ার পর আপনি কি এ ঘরে একবারও এসেছেন?"

"এসেছি। সত্যকাকুর সঙ্গে এসেছিলাম আলমারি আর ঘরে তালা মারতে।"

"তারপর এসেছিলেন আপনার বড়মামা। সম্ভবত একা। ঘরের জিনিসপত্র সব কি আগের মতোই আছে, নাকি এদিক-ওদিক হয়েছে অথবা কিছু মিসিং।"

"ছোটখাট কিছু মিসিং হলে বলতে পারব না। উপর থেকে সব কিছু ঠিকঠাক আছে বলেই মনে হচ্ছে। ঘরটা একটু গোছানো লাগছে। মনে হচ্ছে গুছিয়েছে বড়মামা। গৌরবমামা এত গোছানো ছিল না।"

"ল্যাপটপ ব্যবহার করত গৌরব?"

"করত। আলমারিতে তোলা রয়েছে।"

"আচ্ছা, মারা যাওয়ার আগে গৌরব কি কোনও অসুখবিসুখে ভুগছিল?"

"না তো!" বিস্ময়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন সৌম্যদীপ। বুঝতে পারছেন না প্রশ্নটা কেন উঠল?

দীপকাকু টেবিলের দিকে ঘুরে গিয়ে ড্রয়ার টানলেন। হাতে তুলে নিলেন ছোট্ট পুরিয়া। একটু আগে এটাই বোধ হয় ঢুকিয়েছিলেন ড্রয়ারে। পুরিয়াটা দেখিয়ে দীপকাকু কড়া গলায় সৌম্যদীপকে প্রশ্ন করলেন, "তা হলে এটা কার ওষুধ?"

"এটা তো বাবার," বলে চুপ করে গেলেন সৌম্যদীপ। বোঝা গেল কৌশলী জেরার কারণে কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে।

দীপকাকু জিজ্ঞেস করছেন, "বাবার ওষুধ মানে? বাবার মেডিসিন এই ঘরে থাকবে কেন?"

কোনও কথা নেই সৌম্যদীপের মুখে। একেবারে যেন পাথরের মূর্তি। এমন সময় বারান্দায় পায়ের শব্দ। দীপকাকু পুরিয়াটা পকেটে চালান করলেন। ঘরে এলেন অমরেশবাবু। দীপকাকুকে বললেন, "সরি, আমারই উচিত ছিল দুটো চাবি একসঙ্গে দেওয়া। এই নিন আলমারির চাবি। লকারেরটাও আছে এর সঙ্গে।"

দীপকাকু লম্বা চাবিটা দিয়ে আলমারি খুললেন। ভিতরের জিনিসপত্র নেড়েঘেঁটে দেখছেন। খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা অমরেশবাবু বললেন, "এতক্ষণ পর্যন্ত কোনও ক্লু কি পাওয়া গেল?"

"কী ধরনের ক্লু-র কথা বলছেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু। আলমারি সার্চ চলছে, লকারটাও খুলে ফেলেছেন ছোট চাবিটা দিয়ে।

অমরেশবাবু বললেন, "ওই যে আপনি বলেছিলেন, ব্ল্যাকমেলারের ব্যাপারে গৌরব কিছু তথ্য পেয়েছিল, যা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলত।"

"না, সেরকম কোনও তথ্য পাওয়া গেল না," বলা শেষ করে আলমারি থেকে বের করলেন একটা ল্যাপটপ। অমরেশবাবুর উদ্দেশে বললেন, "এটা নিশ্চয়ই গৌরব ইউজ় করত। আপনি অনুমতি দিলে নিয়ে যেতে পারি। যদি কোনও তথ্য পাওয়া যায়।"

"নিয়ে যান। তদন্তের স্বার্থে কাজে লাগলে তো ভালই। কিন্তু কোনও ইনফরমেশন পেতে গেলে তো গৌরবের পাসওয়ার্ড জানা দরকার। মেলটেল চেক করবেন কী করে?"

"ওটা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন," বলে আলমারি বন্ধ করে একহাতে ল্যাপটপ নিয়ে এগিয়ে এলেন দীপকাকু। চাবিদুটো অমরেশবাবুকে দিয়ে বললেন, "এ ঘরে যা দেখার দেখে নিয়েছি। এখানকার কাজ শেষ। বাকি থাকল ল্যাপটপ। কী পেলাম, না-পেলাম জানাব আপনাকে।"

দরজার দিকে পা বাড়ালেন দীপকাকু। অমরেশবাবু বললেন, "চলুন আপনাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিই।"

"না, না, আপনাকে যেতে হবে না। আমরা নিজেরাই চলে যেতে পারব।"

বারান্দা থেকে নামছে সকলে। খানিক দূরে মোরাম ঢালা রাস্তাটায় একটা গাড়ি। সম্ভবত সৌম্যদীপের। এটারই আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল। গেটে যেতে হলে এ বাড়ির মোরাম রাস্তাটাই ধরতে হবে, বাকিটা গাছপালা। একটু অন্যদিকের গার্ডেনিং। হাঁটতে-হাঁটতে অমরেশবাবুর উদ্দেশে দীপকাকু বললেন, "বেহালার সাইটটা এখন কে দেখাশোনা করছে?"

"সমুই করছে। কাউকে না-কাউকে দেখতে তো হবেই। এই বয়সে আমি দু'দিক সামলাতে পারব না। গৌরব চলে গিয়ে আমার বিরাট ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। কোনও একটা ব্যবসা মনে হচ্ছে গুটিয়ে নিতে হবে।"

অমরেশবাবুর কথা শেষ হল, ঝিনুকরা উঠে এল মোরাম রাস্তায়। গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন দীপকাকু। লেটেস্ট মডেল, মনে হচ্ছে দীপকাকুর মনে একটা গাড়ি কেনার বাসনা হয়েছে। সৌম্যদীপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো এটাতেই এলেন? নিজে চালালেন, না ড্রাইভার?"

সৌম্যদীপ আগের মতোই নিশ্চুপ, ওঁর হয়ে অমরেশবাবু বললেন, "নিজেই চালায়। গৌরবও চালিয়েছে বেশ কয়েকবার। মাসদুয়েক হল কেনা হয়েছে এক্সচেঞ্জ অফারে। এদের তো সব সময় নতুন মডেল চাই।"

গাড়ির জানলার কাছে গিয়ে ভিতরটা দেখতে-দেখতে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কত মাইলেজ দিচ্ছে? কোম্পানিরা তো অনেক কথাই বলে।"

অমরেশবাবু ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে জানতে চাইলেন, "হ্যাঁ রে, দেখেছিস তেল কত যাচ্ছে?"

সৌম্যদীপ মাথা নেড়ে 'না' বোঝালেন। অমরেশবাবু ফিরিয়ে নিলেন মুখ। খানিক বিরক্তির গলায় বললেন, "আমার ছেলেটা টাকাপয়সার ব্যাপারে একেবারে সচেতন নয়। গৌরবকে জিজ্ঞেস করলে ঠিক বলে দিত। আমি শিওর ও দু'-চারদিন চালিয়েই হিসেব করে নিয়েছিল।"

"আপনি তার মানে এ গাড়ি চালাননি?"

"না, আমার পুরনো গাড়ি। তাও আবার ড্রাইভার চালায়।"

গাড়ির সামনে থেকে সরে এসে দীপকাকু বললেন, "চলি তা হলে। প্রয়োজন পড়লে আবার বিরক্ত করতে আসব।"

"বিরক্তির কী আছে? আপনার প্রয়োজনটা তো আমারও। আপনি শুধু আমার হয়ে কাজ করতে রাজি হলেন না," বললেন অমরেশবাবু।

সৌজন্যের হাসি হেসে গেটের দিকে এগোলেন দীপকাকু। অনুসরণ করতে একটু দেরি করল ঝিনুক, গাড়ির নম্বরটা দেখে গেঁথে নিল মনে।

॥ ৭ ॥

এত ভোরে লাস্ট কবে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়েছে মনে পড়ছে না ঝিনুকের। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় হয়তো বেরিয়েছে। কিন্তু কলকাতাকে এত সুন্দর কখনও লাগেনি। বর্ষা শেষ। ভাল করে এখনও আলো ফোটেনি। রাস্তাঘাট কী পরিষ্কার! আকাশটাকেও যেন ধুয়ে ফেলা হয়েছে পুজো আসছে বলে। ঝিনুক, দীপকাকু এখন আলিপুরের এক পার্কের সামনে। এখান থেকে বসুভিলা অনেকটাই দূর, তবে গেটের পুরোটা দেখা যাচ্ছে। আজ আর বাইক নয়, গাড়িতে বসে ঝিনুকরা নজর রাখছে বাড়িটার উপর। ঝিনুকদের গাড়ি।

দীপকাকু কাল রাতেই বাবাকে বলে রেখেছিলেন আজ ভোরে গাড়িটা লাগবে। বাবা আশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন এই ভেবে, অত তাড়াতাড়ি হয়তো ড্রাইভার আশুদা এসে পৌঁছতে পারবে না। দীপকাকু জানিয়ে দেন তিনিই ড্রাইভ করবেন। আশুদার দরকার নেই।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বাবা বলেছিলেন, ''পারবে তুমি! লাইসেন্স থাকলেও, প্র্যাকটিস নেই তো তোমার। তার চেয়ে বরং আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে।''

তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব নাকচ করে দেন দীপকাকু। বলেছিলেন, ''এই অপারেশনটায় দল ভারী করলে সমস্যা হতে পারে। ইদানীং হাত-প্র্যাকটিসের জন্য এক বন্ধুর গাড়ি আমি হামেশাই চালাচ্ছি। অত ভোরে রাস্তায় তেমন গাড়িঘোড়াও থাকবে না। মনে হয় না কোনও অসুবিধে হবে।''

দীপকাকু যে চার চাকা কিনতে চলেছেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ঝিনুক। সৌম্যদীপের গাড়ি আহ্লাদভরে দেখছিলেন, বন্ধুর গাড়িতে ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করছেন। আজ এখানে আসার পথে প্রমাণ দিলেন হাত কতটা সড়গড় হয়েছে। দারুণ চালালেন!

ভোর পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ঝিনুকরা। ছ'টার আগেই আলিপুরের এই পার্কের পাশে দাঁড়িয়েছে। দীপকাকু এখন পর্যন্ত একটাই নির্দেশ দিয়েছেন, ''বসুভিলার গেটের দিকে নজর রাখো।''

নিজেও চোখ রেখেছেন। ঝিনুক এখনও জানে না তারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে। গতকাল সন্ধেবেলা বসুভিলা থেকে বেরিয়ে ঝিনুককে যখন বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন দীপকাকু, একেবারেই চুপচাপ ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল বেশ দিশেহারা অবস্থায় আছেন কেসটাকে নিয়ে। ওই সময় এমন একটা ফোন এল, দীপকাকু আরও গুম মেরে গেলেন। বাইক থামিয়ে ফোন ধরেছিলেন দীপকাকু। গোয়েন্দা অফিসার সুবীর দত্তর ফোন। ফোনের বার্তা ঝিনুককেও জানালেন দীপকাকু। অফিসার বলছেন, ''প্রভাকরবাবুর দিয়ে যাওয়া পুরিয়ার পদার্থ টেস্ট করে জানা গিয়েছে ওটা শুধুই সুগার অফ মিল্ক। কোনও ধরনের ওষুধের অস্তিত্ব নেই।''

ঝিনুক জানে লিকুইড হোমিওপ্যাথি ওষুধের ফোঁটা সুগার অফ মিল্কে ফেলে পুরিয়া বানানো হয়। সেই ওষুধের অস্তিত্ব খুব বেশিদিন থাকার কথা না। হাওয়ায় উবে যাবে। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথি ওষুধের রাসায়নিক বিশ্লেষণও নাকি নিশ্চিতভাবে করে ওঠা যায় না। অর্থাৎ ওতে আদৌ কোনও ওষুধ ছিল টেস্ট করার আগে, নাকি প্রথম থেকেই সুগার অফ মিল্ক? এ ব্যাপারে ধন্দ থেকে গেল।

ঝিনুককে বাড়ির গেটে নামিয়ে চলে যাননি দীপকাকু। বলেছিলেন, ''এক কাপ চা এখন না খেলেই নয়। মাথাটা একেবারে জ্যাম হয়ে গিয়েছে।''

দীপকাকুকে পেয়ে বাবা কেসের অগ্রগতি জানতে চাইলেন। সকালের ঘটনা, মানে সুটকেসসমেত দুষ্কৃতীর উবে যাওয়া পর্যন্ত বাবাকে বলে রেখেছিল ঝিনুক। দীপকাকু বললেন বিকেলের পর। কথাগুলো বেশির ভাগ বললেন ড্রয়িংরুমে পায়চারি করতে-করতে। হাতে ছিল মায়ের দিয়ে যাওয়া চায়ের মগ।

বৃত্তান্তর শেষে বলেছিলেন, ''এই কেসটাতে প্রতি পদে ঠোক্কর খাচ্ছি। কোনও অনুমানই সেভাবে কাজে লাগছে না। ব্ল্যাকমেলার বা তার পাঠানো লোককে চিনে রাখার জন্য ঝিনুককে পাঠালাম, সে ছদ্মবেশে অবতীর্ণ হল। চেনার কোনও সুযোগ রইল না, এমনকী ওকে ট্র্যাক করার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও উধাও হল ম্যাজিকের মতো, সিমকার্ড সুদ্ধ। ভেবেছিলাম, প্রভাকর দিয়ে গেলেন গৌরবকে বাঁচানোর ওষুধ, সৌম্যদীপ বলছে ওটা নাকি ওর বাবার ওষুধ। তাই যদি হবে ওষুধটা গৌরবের ঘরে কেন? ল্যাবরেটরি টেস্টের পর এখন জানা যাচ্ছে সাদা পদার্থটা সুগার অফ মিল্ক। ওষুধ ছিল কিনা, শিওর হওয়া যাচ্ছে না।''

ঝিনুক এই ফাঁকে বলে উঠেছিল, ''গৌরববাবুর দেওয়া লাস্ট ইনফরমেশনের সঙ্গে কি কোনও যোগসূত্র আছে? উনি বলেছিলেন, ওষুধে ওষুধ নেই। তা হলে কি শুধুই সুগার অফ মিল্ক?''

''বাহ, গুড অবজারভেশন। এটা নিয়ে আমিও ভাবছি। কিছু ওষুধে যে কাজ হচ্ছে, তার প্রমাণও পেয়েছি। এখন ওটা হোমিওপ্যাথির ওষুধ হলে, টেস্ট করিয়ে বিশেষ কোনও সুবিধে হবে না,'' বলেছিলেন দীপকাকু।

বাবা বললেন, ''অত অস্থির হচ্ছ কেন? এর চেয়েও অনেক কঠিন কেস তুমি আগে সলভ করেছ। ঠান্ডা মাথায় ভাবো, রাস্তা খুঁজে পাবেই।''

পায়চারি না থামিয়েই দীপকাকু বলে যাচ্ছিলেন, ''এই কেসটা আর পাঁচটার মতো নয়। এই সিরিয়াল অপরাধ হঠাৎ করে যদি বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার কিনারা করা আরও মুশকিল। যা করার আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। এখনও জানা যায়নি অপরাধী কীভাবে শিকারকে শ্বাসকষ্ট দিচ্ছে। ওষুধের হদিশও পাওয়া গেল না। এখনই কিছু বোল্ড অ্যাকশন নেওয়া দরকার।''

''মনোহরপুকুর রোডের বাড়ি থেকে যে ওষুধের স্পেসিমেন পেয়েছে পুলিশ, তাতে হয়তো অন্য কিছু পাওয়া যেতে পারে। শুধুই সুগার অফ মিল্ক নয়,'' কথাটা সাহস করে তুলেছিল ঝিনুক। যেহেতু তার আগের মন্তব্যে দীপকাকু প্রশংসা করেছেন।

দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দীপকাকু তেমন উৎসাহিত হলেন না। বললেন, ''পাওয়া যেতেই পারে শ্বাসকষ্টের অ্যাফিবিও। তাতে কেসটার জটিলতা এতটুকু কমবে না।''

পরের পাঁচ-ছ' মিনিট ঘরের তিনজনই কোনও কথা বলেনি। মা কিছু বলতে এসে ঘরের গম্ভীর পরিস্থিতি দেখে ফিরে গিয়েছিলেন। নীরবতা ভেঙেছিলেন দীপকাকু। ঝিনুককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''তুমি কত কেজি পর্যন্ত লিফট করতে পার?''

''মানে!'' প্রশ্নটা ধরতে না পেরে বলে উঠেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু ভেঙে বললেন, ''ক্লাবে গিয়ে ওয়েট লিফ্‌ট নিশ্চয়ই করেছ? কত কেজি তুলতে পারবে?''

''ক্যারাটে প্র্যাকটিসের সঙ্গে অল্পস্বল্প ওয়েট লিফ্‌ট তো করতেই হয়। একশো কেজি নিশ্চয়ই তুলে দেব,'' বলেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, ''তাতেই হবে। এনাফ।''

এর পরই বাবাকে বলেছিলেন গাড়ির কথা। ভোরবেলা ঝিনুককে নিয়ে বেরবেন। গাড়ির ব্যাপারটা ফাইনাল হওয়ার পর বাবা জানতে চান, ''তোমরা কী কাজে যাবে ওই সাতসকালে?''

''অপারেশনটা আগে সাকসেসফুল হোক তারপর বলব। ফেল হওয়ারও চান্স আছে,'' বলেছিলেন দীপকাকু।

যখন কোনও ব্যাপার ভাঙতে চান না দীপকাকু, ঝিনুক তো বটেই, বাবাও খুব একটা জোর করেন না। দীপকাকুর মনঃসংযোগ তাতে ব্যাহত হতে পারে। কাল রাতের সিরিয়াস সিচুয়েশন হালকা করতে চেয়ে ঝিনুক হাসিমুখে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''গৌরববাবুর টেবিলের ড্রয়ারে আপনি তো ডামি পুরিয়া ঢোকালেন, আসলটা পাঠানো হয়েছে ল্যাবরেটরিতে? তা ওই ডামি পুরিয়ার ভিতরে কী রেখেছিলেন?''

''ট্যালকম পাউডার,'' বলার পর দীপকাকু নিজেই হেসে ফেলেছিলেন। হেসে উঠেছিলেন বাবা, ঝিনুকও।

পরিস্থিতি অনুকূল বুঝে মা এলেন ঘরে। দীপকাকুকে বলেছিলেন, ''ডিনারটা আমাদের সঙ্গেই সেরে যাও। আইটেম খুব খারাপ নেই।''

ঝিনুকদের অবাক করে দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, ''না বউদি, এখনই ডিনার সারা উচিত হবে না। আপনার কাছে তো নয়ই। আরও কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে আমাকে। আপনার রান্না খেলেই শরীর আরাম চাইবে। মনে হবে বাড়ি গিয়ে ঘুমোই।''

দীপকাকু সম্ভবত এই প্রথমবার মায়ের রান্না খাওয়ার লোভ সংবরণ করলেন। অত রাতে কোথায়-কোথায় যাবেন? যেমন কাল

দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করেনি ঝিনুক, আজ এখানে আসার পথেও জানতে চায়নি। যখন বলার নিজে থেকেই বলবেন। ভাবনা থেমে গেল বসুভিলার গেট খুলতে দেখে, ঝিনুক বলে উঠল, "কেউ বেরবে মনে হচ্ছে।"

"সৌমাদীপ মনিং ওয়াকে বেরবে। ওর অপেক্ষাতেই বসে আছি," বললেন দীপকাকু।

এতেও ঝিনুক আজকের অভিযান বিষয়ে কোনও ধারণা করে উঠতে পারল না। হ্যাঁ, বসুভিলার গেট দিয়ে ট্র্যাকসুট পরা সৌমাদীপ বেরিয়ে এলেন। বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছেন ঝিনুকদের দিকেই। দীপকাকু বললেন, "মুখ আড়াল করে থাকো। আমাদের দেখতে পেলে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। তা হলেই আমার অপারেশন পণ্ড।"

কী কাণ্ড ঘটতে চলেছে আন্দাজ করতে না পারলেও, ঝিনুক উত্তেজনায় টানটান হয়ে বসে। জানলা থেকে মুখ আগেই সরিয়ে নিয়েছে। ফের দীপকাকু বলে উঠলেন, "ছেলেটাকে ভুলিয়েভালিয়ে গাড়িতে তুলতে হবে। রাজি না হলে তুলে নিয়ে আসবে তুমি। আমাকে ড্রাইভিং সিটে থাকতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সৌমাদীপকে পাড়া থেকে বের করে নিয়ে যাব। ঝামেলায় পড়ে যাব যদি টেচামেচি জুড়ে দেয়।"

এতক্ষণে ঝিনুক বুঝতে পারে দীপকাকু কেন কাল রাতে জানতে চেয়েছিলেন সে কত কেজি ওজন লিফ্‌ট করতে পারে। অর্থাৎ দরকার পড়লে সৌমাদীপকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলতে হবে। একশো কেজির অনেক নীচেই সৌমাদীপের ওজন। ঝিনুকের কোনও অসুবিধে হবে না। তবে স্ব-ইচ্ছায় তো উঠবে না, হাত-পা ছুড়বে। ম্যানেজ করতে হবে সেটাই।

সিটে মাথা ঠেসান দিয়ে রেখেছে ঝিনুক, দেখতে পায় তাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হালকা জগিং করতে-করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সৌমাদীপ। বোঝাই যাচ্ছে ঝিনুকদের নজর করেননি। দীপকাকুর থেকে কোনও নির্দেশ আসছে না। ঝিনুক বলে, "অনেকটা এগিয়ে গেল তো।"

"আরও একটু যেতে দাও," বলে দীপকাকু গাড়ির আশপাশ এবং পিছনটা ভাল করে জরিপ করে নিলেন। ঝিনুকের আন্দাজ দীপকাকু দেখে নিচ্ছেন এই মুহূর্তে রাস্তায় লোকজনের উপস্থিতি কেমন? সৌমাদীপ যদি ভালয়-ভালয় গাড়িতে উঠতে না চান, তাকে তো একপ্রকার অপহরণই করতে হবে। ওই দৃশ্য যদি পথচলতি কেউ দেখে নেয় এবং তার কাছে যদি গাড়ি বা বাইক থাকে, ঝিনুকদের ধাওয়া করবে। তখন আবার বাড়তি ঝামেলা। অপহরণের সাক্ষী কোনও ব্যক্তি খবরটা পৌঁছে দিতে পারে বসুভিলায়। অমরেশবাবু লোকাল থানায় যাবেন। তাতে অবশ্য লাভ কিছু হবে না। দীপকাকু কেসটার তদন্ত করছেন পুলিশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে।

গাড়ি স্টার্ট দিলেন দীপকাকু। সৌমাদীপ এখন অনেকটাই দূরে। তার চারপাশ একেবারেই ফাঁকা, লোকজন নেই। গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দীপকাকু পৌঁছে গেলেন সৌমাদীপের পাশে। দীপকাকুর ডান পাশে এখন সৌমাদীপ। দীপকাকু বললেন, "হ্যালো, গুড মর্নিং!"

দীপকাকুকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন সৌমাদীপ। থতমত ভাব কাটিয়ে অ্যাবাউট টার্ন নিলেন। দীপকাকু ঝিনুকের উদ্দেশে বললেন, "যাও, ভয় দেখিয়ে তুলে আনো।"

ভয় তো ঝিনুকই পেয়ে গেল। দীপকাকু ওর কোলে ছুড়ে দিয়েছেন নিজের পিস্তল। জীবনে প্রথমবার পিস্তল হাতে কাউকে ধাওয়া করবে ঝিনুক। বেশি ভাবার সময় নেই। পিস্তল হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আসে ঝিনুক। খুব একটা দূর যেতে পারেননি সৌমাদীপ। দৌড়তে-দৌড়তে একবার করে পিছন ফিরে দেখছেন ঝিনুকদের। ঝিনুককে বেরিয়ে আসতে দেখে স্পিড বাড়ালেন। স্প্রিন্ট টানতে লাগল ঝিনুক। অচিরেই পৌঁছে গেল সৌমাদীপের পাশে। দৌড়নো অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করল, "আমাদের দেখে পালাচ্ছেন কেন?"

দাঁড়িয়ে পড়লেন সৌমাদীপ। আবার সেই বোবা চাহনি! ছেলেটা অদ্ভুত ধরনের! ঝিনুক আড়চোখে দেখে নিতে চায় তাদের গাড়ি এখান থেকে কত দূর। এই অবসরে ফের পালাতে চায় সৌমাদীপ, ঝিনুক প্রায় লাফিয়ে গিয়ে ওর কনুই ধরে সামনে দাঁড় করায়। কাছাকাছি হয়ে পিস্তল ঠেকায় পেটে। বলে, "আমার সঙ্গে হাঁটতে থাকুন চুপচাপ।"

বেশি দূর হাঁটতে হল না। দীপকাকু ব্যাক গিয়ারে গাড়ি নিয়ে এলেন। পিছনের দরজা খুলে ঝিনুক হাঁচকা টানে সৌমাদীপকে পিছনের সিটে বসিয়ে, নিজেও উঠে এল। দরজা বন্ধ করতেই দীপকাকু গাড়ি ছুটিয়ে দিলেন। মনে তো হচ্ছে ফুলপ্রুফ অপারেশন। রাস্তার কেউ যদি দেখেও থাকে মনে হবে না অপহরণ।

ভিক্টোরিয়া ছাড়িয়ে ময়দানের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়েছেন দীপকাকু। ড্রাইভিং সিট থেকে একটু সরে মাথা ঘুরিয়েছেন পিছনে। সৌমাদীপকে বলছেন, "কিছু কথা আছে। প্রাইভেটলি। তাই এভাবে নিয়ে আসতে হল। কথাগুলো বন্ধুক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করব, নাকি এমনই উত্তর দেবে?"

"বলুন, কী জানতে চান," নিস্তেজ গলায় বললেন সৌমাদীপ। দীপকাকু প্রশ্ন রাখলেন, "গৌরবের ঘরে আপনার বাবার ওষুধ কেন? বাবার কোন রোগের ওষুধ?"

"শ্বাসকষ্ট। ব্ল্যাকমেলারের দেওয়া শ্বাসকষ্ট। ওষুধ আনতে গিয়েছিল গৌরবমামা।"

উত্তর শুনে মাথা পাক খেয়ে যায় ঝিনুকের। দীপকাকুর পরের প্রশ্নটা কানে ঢোকে না। আপ্রাণ চেষ্টা করে মাথা ঠান্ডা রেখে দু'জনের কথা শোনার।

এই কেসের সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্যটি জানার পর দীপকাকুও খানিকক্ষণ থম মেরে বসেছিলেন গাড়িতে। তারপর ড্রাইভ করে সৌমাদীপকে পৌঁছে দেন বসুভিলার কাছাকাছি। গাড়িতে বসেই বলে রেখেছিলেন, "আমার সঙ্গে যা কথা হল বাবাকে বলবে না। বিপদ বাড়বে তোমার।"

সৌমাদীপ মাথা নেড়ে বুঝিয়েছিলেন বলবেন না। ঝিনুকরা ওখান থেকে সোজা ভবানী ভবনে আসে। আসার পথে দীপকাকু ফোন করেছিলেন অফিসার সুবীর দত্তকে। বলেছিলেন, "আপনার অফিসে যাচ্ছি। রাস্তার ওই সি সি টিভি ফুটেজটা দেখব। ল্যুটকেস নিয়ে যে সময় পালিয়েছিল লোকটা।"

অপরপ্রান্তের উত্তর জানতে পারেনি ঝিনুক। তারা ভবানী ভবনে পৌঁছতেই এক পুলিশকর্মী সাদরে গিয়ে পৌঁছে দিলেন সুবীর দত্তর চেম্বারে। সুবীর দত্ত বললেন, "অফিসে ছিলাম না। আপনার ফোন পেয়েই চলে এসেছি। নিন, ডেস্কটপে রেডি করে রেখেছি আপনার ফুটেজ। আমরা অবশ্য বারবার দেখেও দুষ্কৃতীর হদিশ পাইনি।"

দীপকাকু ডেস্কটপের সামনে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। স্ক্রিনে পজ় করে রাখা ছিল ফুটেজটা। চালু করে দীপকাকু ঝুঁকে পড়ে স্ক্রিনে চোখ রাখলেন। এখনও পর্যন্ত ওই ভঙ্গিতেই রয়েছেন। স্ক্রিন জুড়ে ছুটে যাচ্ছে শয়ে-শয়ে গাড়ি।

অফিসার দত্তর চেম্বারে এখন দীপকাকু-ঝিনুক ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি নেই। দীপকাকু চেয়ারে বসার পর সুবীর দত্ত চেম্বার ছেড়ে চলে যান। যাওয়ার আগে দীপকাকুকে বলেছিলেন, "আপনি দেখুন। আমি একটা কাজ সেরে আসছি।" এর পর ঝিনুককে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট হয়নি? বলে দিচ্ছি দিয়ে যেতে।"

ঝিনুক কিছু বলার আগেই দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, "বলে দিন। একদম ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছে।"

"নিশ্চয়ই!" বলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সুবীর দত্ত। খানিকক্ষণের মধ্যেই ডবল ডিমের ওমলেট, বাটার টোস্ট, কলা, মিষ্টি

হাজির। দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পুলিশকর্মী, যিনি নিয়ে এসেছিলেন চেম্বারে। দ্রুত খাওয়া শেষ করেছিলেন দীপকাকু। এক রাউন্ড চা-ও হয়ে গিয়েছে। ঝিনুক চা খায়নি। দীপকাকু ফের মনোনিবেশ করেছেন কম্পিউটার স্ক্রিনে। ফুটেজটার প্রতি এত আগ্রহ দেখে বেশ অবাকই হচ্ছে ঝিনুক। সৌমাদীপ যে অজানা ঘটনার কথা বলেছে, দীপকাকুর তো এখন সেটা নিয়েই ভাবা উচিত। গৌরববাবুর ঘরে অমরেশবাবুর ওষুধ কী ভাবে গেল, তার ব্যাখ্যা হিসেবে সৌমাদীপ বলেছেন, "দিন নেরো আগে প্রবল কষ্ট নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন অমরেশবাবু। কোনও রকমে নিজের বেডরুমে ঢুকে ছেলে এবং স্ত্রীকে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে এটা সেই ব্ল্যাকমেলারের দেওয়া কষ্ট। খবরে বেরিয়েছিল। তোমরা ফোন নিয়ে রেডি থেকো।"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বেজে উঠেছিল উপরে বসার ঘরে থাকা বাড়ির ল্যান্ডফোন। অমরেশবাবুর স্ত্রী এবং ছেলে দৌড়ে গিয়েছিলেন ফোন ধরতে। সৌমাদীপ রিসিভার তোলেন। অপরপ্রান্ত অন্যদের ক্ষেত্রে যা নির্দেশ দিয়েছিল, সেরকমটাই বলে। সৌমাদীপ বাবাকে গিয়ে বলেন ফোনের বার্তা। মা ততক্ষণে আলমারি থেকে টাকা বের করতে চলে গিয়েছেন। অমরেশবাবুর কষ্ট ক্রমশ বাড়ছিল। ওঁর স্ত্রী টাকার সুটকেস ছেলের হাতে তুলে দেন। অত কষ্টের মধ্যেও অমরেশবাবু বলেছিলেন, কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। টাকা রেখে ওষুধ নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। গৌরবকে তো বলবিই না। টাকাটা বাঁচানোর চেষ্টা করবে সে। পুলিশে খবর দেবে। তখন ওষুধ পাব না। বেঘোরে মরতে হবে।

বাবার কথা শুনে সৌমাদীপ টাকার সুটকেস হাতে নিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে যান। এত নার্ভাস লাগছিল, বের করার সময় দু'বার ছোট ধাক্কা লাগান গাড়িতে।

কথার এই অংশে দীপকাকু প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমাকে কি নিজের গাড়িতে যেতে বলেছিল ব্ল্যাকমেলার?"

"না, শুধু বলেছিল টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসুন। আমি বলে দেব কোথায় রাখতে হবে," বলেছিলেন সৌমাদীপ।

দীপকাকু বললেন, "ঠিক আছে, বলে যাও।"

প্রসঙ্গে ফিরে সৌমাদীপ বলেছিলেন, "বাড়ির গেট ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েছি, দেখি গৌরবমামা আসছে। অন্যদিনের তুলনায় সেদিন তাড়াতাড়িই ফিরছিল সাইট থেকে। বাইকে বসেই হাতের ইশারায় গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। গৌরবমামাকে দেখে মনে একটু বল পেলাম। গাড়ির জানলার কাছে এসে হেলমেট খুলে মামা জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছি? বাবার নিষেধ সত্ত্বেও সব বললাম। গৌরবমামা বলল, ও সঙ্গে যাবে। আমি একা এ সব ঝামেলা সামলাতে পারব না। আমি খুবই নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। তবু গৌরবমামাকে বললাম, 'তুমি কিন্তু পুলিশকে ফোন করবে না। বাবা ওই জন্যই তোমাকে বলতে বারণ করেছে।' গৌরবমামা বলেছিল, ফোন করবে না। এমনকী ও যে আমার সঙ্গে আছে সেটাও কেউ জানতে পারবে না। রাস্তার পাশেই সোমনাথদার দোকানে বাইক রেখে মামা উঠে এসেছিল আমার গাড়িতে। আমাকেই বলেছিল গাড়ি চালাতে। গৌরবমামা ড্রাইভ করলে কেউ দেখে ফেলতে পারে। তার খানিক বাদে ফোন এল ব্ল্যাকমেলারের। ইশারায় গৌরবমামা আমাকেই ধরতে বলল কলটা। গাড়ি চালাতে-চালাতে ধরলাম ফোন। ব্ল্যাকমেলার বলল, টাকার সুটকেস আমাদেরই বেহালা সাইটের বি ব্লকের সেকেন্ড ফ্লোরের কমপ্লিট ফ্ল্যাটটায় রাখতে। ওষুধ কোথায় আছে তখনই জানিয়ে দেবে। জায়গামতো রেখে এলাম সুটকেস। ফোন এল। বলা হল, ওষুধ আছে আমাদের পাড়ার পার্কে, ইলেকট্রিক কোম্পানির ট্রান্সফরমারের পিছনে। একটা চশমার খাপে থাকবে ওষুধটা। ফিরে এলাম পাড়ায়। ট্রান্সফরমারের পিছনে পেলাম চশমার খাপ। খুলে দেখলাম একটা পুরিয়া।"

আবার কথা কেটে দীপকাকু জানতে চান, ''ব্ল্যাকমেলার কি পুরো ওষুধটা খাইয়ে দিতে বলেছিল?''

''কিক মনে পড়ছে না,'' বলে নিজেই ঘটনার সূত্র ধরে এগিয়েছিলেন সৌম্যদীপ। বলছিলেন, ''ওষুধ নিয়ে গাড়িতে উঠে এলাম। গৌরবমামা ওষুধটা দেখতে চাইল। ওর হাতে দিলাম চশমার খাপটা। বাড়ি ঢোকার আগে গাড়ি দাঁড় করালাম সোমনাথদার দোকানের সামনে। গৌরবমামা বাইক আনতে গেল। বাড়ির পার্টিকোর নীচে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওষুধ খুঁজতে গিয়ে দেখি, নেই। খেয়াল হল, গৌরবমামাকে দেওয়ার পর আর নিইনি। ওর কাছেই রয়ে গিয়েছে। ওষুধ আনতে মামার ঘরের দিকে এগোলাম। ততক্ষণে ফিরে এসেছে সে, বাইকটা ওর কোয়ার্টারের সামনে দাঁড় করানো ছিল। মামার ঘরে ঢুকে দেখলাম চশমার খাপটা টেবিলের উপর, পাশে দাঁড়িয়ে জামা ছাড়ছে মামা। বললাম, 'আসল জিনিসটাই তো নিতে ভুলে গিয়েছি।' গৌরবমামা আমার হাতে খাপটা তুলে দিয়ে বলেছিল, 'তাই তো। আমিও খেয়াল করিনি প্যান্টের পকেটে রয়ে গিয়েছে। গিয়ে দিতেও পারছি না। আমাকে তো বলা বারণ ঘটনাটা।'''

এতদূর পর্যন্ত শুনে নিয়ে দীপকাকু প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে গিয়েছিলেন। বললেন, ''অমরেশবাবু কি পরে জেনেছিলেন গৌরব ব্যাপারটা জানে?''

''বাবা নিজেই বলেছেন মামাকে। তখন বলেননি, মামা পুলিশে যেতে পারে ভেবে।''

উত্তর শুনে দীপকাকু জানতে চান, ''গৌরব কি আপনার বাবাকে জানিয়েছিল যে, টাকা দেওয়া এবং ওষুধ নেওয়ার সময় সে আপনার সঙ্গে ছিল?''

''না, জানায়নি। জানালে বাবার কাছে বকুনি খেতাম। গৌরবমামা সবসময় আমায় সেভ করত।''

এর পর দীপকাকু একটা জরুরি প্রশ্ন তুলেছিলেন, ''ওষুধ তো অমরেশবাবুকে খাওয়ানো হয়েছিল। তুমি নিজে গিয়ে দিয়েছ। উনি সুস্থও হন। তবু সেদিন সন্ধেবেলা আমার হাতের পুরিয়াটাকে বাবার ওষুধ বললে কেন?''

''রিফ্রেক্সে বেরিয়ে গিয়েছে মুখ থেকে। আসলে টেবিলের উপর থেকেই তো নিয়েছিলাম ওষুধটা। আপনিও দাঁড়িয়েছিলেন ওখানেই। হঠাৎ মাথায় এল ব্ল্যাকমেলার কি দু'পুরিয়া ওষুধ দিয়েছিল? একটায় যদি না কাজ হয়, তখন দুটো। আপনার সামনে দাঁড়িয়েই মন দিয়ে ভেবে দেখলাম দুটো নয়, একটাই ওষুধ দিয়েছিল ব্ল্যাকমেলার। পরে তো আর কিছু বলতে পারলাম না। বাবা চলে এলেন।''

কথাটা শুনে দীপকাকু বলেছিলেন, ''বাবাকে খুব ভয় পাও?''

''হ্যাঁ, গৌরবমামা অবশ্য পেত না। বাবা যখন ব্ল্যাকমেলারের ঘটনাটা বললেন, গৌরবমামা রেগে অস্থির। বলেছিল, কোনও মানে হয় এভাবে এক কথায় টাকা দিয়ে দেওয়ার? বাঁচানোর সামান্য চেষ্টা তো করা যেতেই পারত। আমাকে কিছুই জানান হল না। ব্যবসায় টাকা জোগাড়ের জন্য মামাকেই তো প্রাণপাত করতে হয়,'' বলেছিলেন সৌম্যদীপ।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, ''আচ্ছা, এই যে তোমাদের বাড়িতে দু'বার হুমকি দিল ব্ল্যাকমেলার, টাকা যদিও একবারই পেয়েছে। তবু কেন পুলিশের কাছে গেলেন না তোমার বাবা? এ ব্যাপারে তোমার কী মত?''

''নিন্দে করা হলেও বলি, আমার বাবা ভীষণ অহংকারী মানুষ। কেউ বেকায়দায় ফেলে টাকা হাতিয়েছে, খবরটা বাবা আত্মীয় পরিজনের মধ্যে ছড়াতে চাননি। গৌরবমামার জন্য যে ফোনটা আসে, বাবা ধরে নিয়েছিলেন কোনও রিলেটিভের বদমাইশি। আসল ব্ল্যাকমেলারকে অনুসরণ করে ওই টাকা হাতিয়েছি।''

''সন্দেহ করাটাই তো স্বাভাবিক। আপনার পাসবুকে সদ্য দশ লাখ জমা পড়েছে, খবর আছে আমার কাছে,'' বললেন দীপকাকু।

দীপকাকু সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন রাখেন, ''আমাকে ইনভেস্টিগেট করতে বলেছিলেন কেন?''

''যেহেতু আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনাকে মানা করলে আপনি মিডিয়ায় যাবেন না। পুলিশ সেকথা শুনবে কেন? তারা সাফল্যের প্রচার তো চাইবেই।''

এখানেই শেষ হয় জিজ্ঞাসাবাদ। দীপকাকু বলেছিলেন, ''চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। গাড়িতে যেতে-যেতে সেই সতর্কবার্তা শোনান, ''আমাদের সাক্ষাৎপর্ব গোপন রাখতে হবে। নয়তো বিপদ।''

''ঝিনুক, এদিকে এসো।''

দীপকাকুর ডাকে সংবিত ফেরে ঝিনুকের। চেয়ার ছেড়ে উঠে যায়। কম্পিউটার স্ক্রিনে ভিডিয়োর একটা ফ্রেম স্টিল করেছেন দীপকাকু। দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার যানবাহন, পথচারী। স্ক্রিনের উপর ঝুঁকে পড়ে ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, ''কী দেখব?''

জুম করে রাস্তার একটা গাড়িকে বড় করলেন দীপকাকু। বললেন, ''গাড়িটাকে সম্প্রতি দেখেছ? চেনা মনে হচ্ছে?''

প্রথমটায় চেনা লাগেনি। খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে নম্বরটা চেনা লাগে ঝিনুকের। বলে ওঠে, ''এটা তো সৌম্যদীপের গাড়ি। রাতে দেখেছি বলে রংটা কালো মনে হয়েছিল। এখানে তো দেখছি বটল গ্রিন। নম্বর মিলে যাচ্ছে, আমি মনে রেখেছি।''

''হুম,'' বলে চেয়ারে হেলান দিলেন দীপকাকু। দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন।

ঝিনুক এদিকে উত্তেজনায় ফুটছে। বলে ওঠে, ''তা হলে কি ব্ল্যাকমেলার সৌম্যদীপ? এ তো বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না।''

''এখনই কে বিশ্বাস করতে বলেছে? এমন হতেই পারে ব্ল্যাকমেলার বা তার লোক যখন পালাচ্ছে, একই সময় সৌম্যদীপও কোনও কাজে ওই রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। অথবা অন্য কেউ চালাচ্ছিল তার গাড়ি। কে ড্রাইভ করছিল, ফুটেজটায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।''

দীপকাকুকে একটা ক্লু দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছে না ঝিনুক। এতক্ষণ বলেনি কারণ, নিজের কাছেই ব্যাপারটা বোকা-বোকা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এটা তার কল্পনা। এখন দেখা যাচ্ছে তা নয়, ক্লটা দীপকাকুর কাজে লাগবে। বলেই ফেলে ঝিনুক, ''আজ যখন সৌম্যদীপের পেটে পিস্তল ঠেকালাম, ওর দৃষ্টিটা বড্ড চেনা-চেনা লাগল। মনে হচ্ছিল সেই দুষ্কৃতীর চাউনি, আমার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে চলে যেতে বলছিল। তারও ছিল কথা বলার অনীহা, সৌম্যদীপেরও তাই।''

ঝিনুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে কথাগুলো শুনলেন দীপকাকু। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চেম্বারে ঢুকলেন অফিসার সুবীর দত্ত। বললেন, ''কি, পাওয়া গেল কোনও সূত্র?''

''খুব সামান্য, ওটা আদৌ কোনও ক্লু কিনা তার জন্য আরও খোঁজখবর নিতে হবে।''

দীপকাকুর কথার মধ্যেই নিজের সিটে গিয়ে বসেছেন অফিসার। চেম্বারের বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে হাঁক দিলেন, ''চলে আসুন।''

সুইংডোর টেনে ঘরে ঢুকি এলেন, তাঁর সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবেনি ঝিনুক। সুকিয়া স্ট্রিটের শোভন রায়চৌধুরী, আক্রান্ত মিলন রায়চৌধুরীর দাদা। দীপকাকুকে দেখে জোড়হাত করলেন। সংক্ষেপে প্রতি নমস্কার জানালেন দীপকাকু। সুবীর দত্ত ওঁকে বললেন, ''বসুন, আপনার ব্যাপারটা দীপঙ্করবাবুকে জানান।''

''কী হয়েছে নতুন করে?'' দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন।

শোভনবাবু চেয়ারে গুছিয়ে বসে একটু সময় নিয়ে বললেন, ''বাড়ির কিছু মেম্বার এবং মিলন আমাকেই সন্দেহ করছে। বলছে, আমিই নাকি আসল ব্ল্যাকমেলারকে অনুসরণ করে ওই টাকা হাতিয়েছি।''

শোভনবাবুর থেকেও বেশি অবাক হয়েছে ঝিনুক, দীপকাকু এত খবর জোগাড় করেন কীভাবে?

দ্রুত বিরত ভাবটা কাটিয়ে শোভনবাবু বললেন, "ওই টাকা তো আমার ছেলে পাঠিয়েছে দিল্লি থেকে। ওর রোজগারের টাকা।"

"আগে কখনও তো এত টাকা পাঠায়নি। আসলে আপনার হাতানো ক্যাশ টাকাটা ওকে পাঠিয়েছেন, ও সেটাই নিজের অ্যাকাউন্টে ফেলে সেখান থেকে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা করেছে। আপনার কাছে থাকা সন্দেহজনক কালো টাকা সাদা হয়ে গেল। কোনও সন্দেহ রইল না," বললেন দীপকাকু।

শোভনবাবু স্পষ্টতই বিরক্ত। বলে ওঠেন, "এ তো মহা মুশকিল হল! এখন তা হলে ছেলের ইনকাম ট্যাক্স ফাইল আপনাদের দেখাতে হয়। তা হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে দশ লাখ টাকা পাঠানোর ক্ষমতা আছে কিনা আমার ছেলের।"

"ও সব এখন থাক। আগে বলুন হঠাৎ করে আপনার ছেলে দশ লাখ পাঠাল কেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

একটু ইতস্তত করে শোভনবাবু বললেন, "আমাদের পাড়ার সেনবাড়ীটা প্রোমোটার কিনেছে। হাউজিং কমপ্লেক্স হবে। একটা বড় দেখে দোকানঘর কেনার ইচ্ছে আছে আমার। ইলেকট্রনিক্স গুড্‌সের শো-রুম করব। যেহেতু পাড়ার মধ্যে দোকান, বাড়িতে তো বসেই থাকি এবার না হয় দোকানে বসব। যাতায়াতের ঝক্কি থাকবে না।"

একটু ভেবে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "সেনবাড়ি প্রোমোটিং হবে?"

"হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম," শোভনবাবুর গলায় বিস্ময়।

দীপকাকু বললেন, "গুড। এই ইনফরমেশনটা দরকার ছিল," চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপকাকু। সুবীর দত্তকে বললেন, "চলি, অনেক কাজ পড়ে আছে।"

"আর এঁর ব্যাপারটা?" খানিক অসহায় গলায় বলে উঠলেন অফিসার।

"আপনি সামলান," বলে সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে গেলেন দীপকাকু। ঝিনুক অনুসরণ করল।

॥ ৮ ॥

গত চারদিন ঝিনুককে কোনও কাজে ডাকেননি দীপকাকু। ঝিনুক নিয়মিত কলেজে যাওয়া শুরু করেছিল। লাস্ট যেদিন দীপকাকুর সঙ্গে দেখা হয়, রাতে একবার ফোন করে জানালেন, "মনোহরপুকুরের বাড়ি থেকে ওষুধের যে স্পেসিমেন পাওয়া গিয়েছে তা দুষ্প্রাপ্য কিছু নয়, বাজারের কমন হাঁপানির ওষুধ। ট্যাবলেট গুঁড়ো দেওয়া হয়েছিল পুরিয়ায়। যেন এক্সক্লুসিভ কোনও ওষুধ। আর-একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, বেছে-বেছে সেই পরিবারের লোককে টার্গেট করা হচ্ছে যে বাড়িতে কোনও হাঁপানির পেশেন্ট নেই। থাকলে ওই পেশেন্টের ওষুধই দেওয়া হত আক্রান্তকে, কাজও হত তাতে।"

ঝিনুক বুঝে গিয়েছে এই কেসে দীপকাকুকে বিপুল ঘোরাফেরা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে, কোথায় কখন যাবেন, সময়ের ঠিক থাকছে না। সর্বক্ষণ ঝিনুককে নিয়ে ঘোরা সম্ভব নয়। সে রাতে যেমন মায়ের রান্না না খেয়ে দীপকাকুকে বেরতে হয়েছিল কাজে। শোভনবাবুর অ্যাকাউন্টে দশ লাখ টাকা জমা পড়েছে, খবর নিয়েছেন সেটারও। আরও কত খবর এখন তাঁর ভাঁড়ারে, কে জানে!

সেদিন ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে ঝিনুক দীপকাকুকে জিজ্ঞেস না করে পারেনি, "শোভনবাবুর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়াটা আপনি জানলেন কী করে?

"ওঁর ভাই মিলন রায়চৌধুরীকে যখন গিয়ে বললাম, আপনার দাদা এই-এই অ্যালিগেশন তুলছেন, কী বলবেন আপনি? উনি তখন দাদার বিরুদ্ধে ওই অভিযোগগুলো আনলেন। জানালেন যে, লুকিয়ে উনি দাদার পাশবুক দেখেছেন। তবে আমার মনে হচ্ছে ওই সব পারিবারিক ব্যাপারে আমার এখন মাথা না ঘামালেও চলবে।"

কথার পিঠে ঝিনুক বলেছিল, "তা হলে এখন কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন? আমাদের বাড়ির ডিনার না খেয়ে কোথায় গেলেন সে রাতে?"

দার্শনিকসুলভ উত্তর দিয়েছিলেন দীপকাকু। বললেন, "দিনের বেলায় রাস্তাঘাটে এত লোক, যানবাহন, ইনভেস্টিগেশনে ঠিক ফোকাস করা যায় না। সে রাতে আবার সেই সব জায়গায় গেলাম, যেখানে ব্ল্যাকমেলারের অপরাধের ছায়া পড়েছিল।"

কথা বাড়ায়নি ঝিনুক। এর পর দীপকাকু যা বলতেন, সব মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে পারত। আজ ঝিনুক যখন কলেজে বেরচ্ছে, ফোন এল দীপকাকুর। বললেন, "এখনই একবার আসতে পারবে অফিসে? দারুণ একটা নাটক অপেক্ষা করছে।"

ঝিনুক তক্ষুনি জানিয়ে দিল সে আসছে। এমনিতেই আজ অনার্স ক্লাস নেই। কলেজে না গেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়েছে ঝিনুক। নাটক বলতে দীপকাকু ঠিক কী ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত দিলেন, ঝিনুকের মাথায় আসছে না।

ক্যামাক স্ট্রিটের বহুতলের চারতলায় দীপকাকুর অফিস। ঝিনুক দরজা ঠেলে ঢুকল। কোথাও কোনও নাটকের আবহ নেই। ভিজিটার্স এরিয়ায় সোফায় বসে আছেন দীপকাকু। খোশমেজাজে গল্প করছেন দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শনকাকার সঙ্গে। ঝিনুককে দেখে দীপকাকু বললেন, "যাক, এসে গিয়েছ! ওঁরও সময় হল আসার। চলো, চেম্বারে গিয়ে বসি।"

তার মানে কেউ একজন আসছেন। কে তিনি? ঝিনুক দীপকাকুকে অনুসরণ করে চেম্বারে যায়। বসে পড়ে দীপকাকুর পাশের চেয়ারে। সুদর্শনকাকা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখন কি একবার চা দেব? দিদিভাই তুমি কী নেবে?"

"উনি আসার পর দিয়ো," উত্তর দিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক জিজ্ঞেস করতে যাবে, "উনিটা কিনি?" উত্তর শোনার দরকার পড়ল না। অফিসে পা রাখলেন অমরেশ বসু। চারপাশে চোখ বোলাচ্ছেন। সুদর্শনকাকা দরজার কাছে গিয়ে দীপকাকুর চেম্বারটা দেখিয়ে দিল। ঝিনুকের পাশ থেকে দীপকাকু বলে উঠলেন, "এবার শুধু মজা দেখে যাও।"

চেম্বারে ঢুকে অমরেশবাবু শ্লেষের সুরে বললেন, "কী ব্যাপার, হঠাৎ তলব?"

হাতের ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে দীপকাকু বললেন, "আমি তলব দেওয়ার কে? আপনি অগ্রাহ্য করতেই পারতেন। নেহাত আপনার বাড়িতে বসে কথাগুলো বলতে অসুবিধে হত, তাই এখানে ডেকে পাঠালাম।"

টেবিলের ওপারে দীপকাকুর মুখোমুখি বসলেন অমরেশবাবু। বললেন, "বলুন কী বলবেন?"

"সরাসরি কয়েকটা প্রশ্নে যাই। আপনার উপর ব্ল্যাকমেলারের আক্রমণ আমার কাছে চেপে গিয়েছিলেন কেন?"

দীপকাকুর কথায় সামান্য ভাবান্তরও হল না অমরেশবাবুর। বললেন, "ওই একই কারণে পুলিশি ঝামেলা এড়াতে চেয়ে। গৌরবের ঘটনায় আমি আপনাকে ডাকিনি, আপনি এসেছিলেন কথা বলতে।"

"একই বাড়ির দুই সদস্যকে শিকার বানানোটা বড্ড অব্যস্তব লাগছে না? দশ-দশ কুড়ি লাখ দিতে চাইত চাইত ব্ল্যাকমেলার, একজনকে টার্গেট করলেই তো হত। যেমন সাউথ সিটি কমপ্লেক্সের গুজরাতি ফ্যামিলির ক্ষেত্রে করেছে। কুড়ি লাখ দেওয়ার ক্ষমতা আপনারও ছিল। অনেক বড় ব্যবসা আপনার।"

"এ ব্যাপারে আমি কী বলব! ব্ল্যাকমেলারকে ধরুন, উত্তর তার কাছে আছে।"

এমন সময় ছাপোষা চেহারার একটা লোক উদ্‌ভ্রান্তের মতো দীপকাকুর অফিসে ঢুকল। সুদর্শনকাকা তাকে দেখাল দীপকাকুর

চেম্বার। প্রায় দৌড়ে এল লোকটা। চেম্বারের কাচের দরজা টেনে সরাসরি অমরেশবাবুকে বলল, ''বাড়ি থেকে ফোন এসেছে স্যার, বউয়ের অবস্থা এখন-তখন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমাকেও যেতে হবে স্যার।''

''যাও। অনেকদিন চালাইনি গাড়ি, আস্তে-ধীরে চালিয়ে নেব। সঙ্গে কিছু টাকা রাখো,'' বলে প্যান্টের পকেট থেকে পার্স বের করে বেশ কিছু পাঁচশো টাকার নোট লোকটিকে দিলেন অমরেশবাবু। বেরাই গেল মানুষটি অমরেশবাবুর ড্রাইভার। দীপকাকুর অফিস পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে।

ড্রাইভার চলে যাওয়ার পর অমরেশবাবু দীপকাকুকে বললেন, ''হ্যাঁ, কী প্রসঙ্গে যেন ছিলাম আমরা?''

''আমি ক'টা প্রশ্ন করেছিলাম। সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। তাই এবার আমি বলছি, আপনি শুনুন,'' বলে লম্বা কথার জন্য দম নিলেন দীপকাকু। শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য, ''গৌরবের ল্যাপটপ পরীক্ষা করে পুলিশ দেখেছে ওটা নতুন করে ফরম্যাট করা হয়েছে। কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। গৌরবের মৃত্যুর পর ফরম্যাট আপনি নিজের কলেজের একজন টিচারকে দিয়ে করিয়েছেন, সে তথ্য আমার হাতে আছে। আপনি জানতেন গৌরবের মৃত্যুর তদন্ত যদি কখনও হয়, ল্যাপটপটার খোঁজ পড়বেই।

''ও যে ল্যাপটপ ব্যবহার করত চেনা পরিচিতরা জানে। ল্যাপটপে কিছু না পেয়ে আমি গৌরবের স্মার্টফোনের শরণাপন্ন হই, যেটি এখন পুলিশের হেফাজতে এবং প্রায় ভাঙা অবস্থায়। এ খবরও পাই, পুলিশের কাছে আপনি বারবার গিয়েছেন গৌরবের জিনিসপত্র ফেরত নিতে, আসল লক্ষ্য ওই স্মার্টফোন। কোর্টের কিছু ফর্মালিটির কারণে ওটা এখনও আপনার হস্তগত হয়নি। ভাগ্যিস হয়নি, তাই তো আমি ফোনসেটটায় পেলাম গৌরবের সোশ্যাল সাইট অ্যাকাউন্ট। সেখানে হদিশ পেলাম ওর বাল্যবন্ধু তমালের। যার সঙ্গে প্রায়ই চ্যাট করত।''

''এত সব ফিরিস্তি আমি কেন শুনব বলুন তো? আমার কি অন্য কাজ নেই?'' বিরক্তি প্রকাশ করলেন অমরেশবাবু।

দীপকাকু বললেন, ''একটু ধৈর্য ধরে শুনুন না। অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার জানতে পারবেন,'' একটু থেমে শুরু করলেন দীপকাকু, ''দুই বন্ধুর চ্যাট পড়ে আপনার কাজকারবার সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পেলাম। তমালের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলাম আসানসোল। ওর থেকে জানলাম আপনার অতীত। বনেদি বংশের ছেলে আপনি। চাকরি করতেন ফিক্স, এ সি মেশিনের কারখানায়। ম্যানেজার পোস্টে ছিলেন। চাকরি, মানে পরের গোলামি আপনার পোষাচ্ছিল না। ব্যবসায় নেমে পড়েন।

''বাবার জমানো টাকা ছিলই, বিবাহের সময় প্রচুর যৌতুক নিয়েছিলেন। সোনারপুরে আপনার প্রাইভেট কলেজ ভালই চলছিল। প্রোমোটিংয়ের ব্যবসায় এলেন। তখনই আপনার পতনের শুরু। প্রচুর টাকা লস করে আপনি আর্থিক সাহায্যের জন্য শ্বশুরবাড়ির শরণাপন্ন হন। তাদের অবস্থাও তখন পড়তির দিকে। একসময় কোলিয়ারি ছিল, সরকার অধিগ্রহণ করার পর যে টাকা পেয়েছিলেন, সেই সময় অনেক মনে হয়েছিল। বাজারদর বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার মূল্য কমে আসে। তার আগে মেয়ের বিয়েতে প্রচুর খরচ হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনও আর্থিক সাহায্য না পেলেও, আপনি পেয়েছিলেন গৌরবের মতো বুদ্ধিমান কাজের ছেলে। যে আপনার প্রোমোটিং বিজনেসটাকে প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। যদিও তা ছিল প্রায় অসাধ্য। এতটাই দেনায় ডুবে গিয়েছিলেন আপনি। হঠাৎই আপনার হাতে প্রচুর অর্থের জোগান দেখা যায়।

''গৌরব চ্যাট করে তমালের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করে। আপনাকেও ও প্রশ্ন করে টাকা কোথা থেকে আসছে? আপনি বলেন, ও সব নিয়ে ভাবতে হবে না। বুদ্ধিমান ছেলেকে ধমকে ভাবা বন্ধ করা যায় না। গৌরব আপনার গতিবিধির উপর নজর রাখতে শুরু করে। শঙ্কিত হয়ে পড়েন আপনি। মনে হতে থাকে বিষ বাতাসের সাহায্যে যেভাবে আপনি টাকা সংগ্রহ করছেন, মিডিয়ায় উঠেছে যে খবর, সেটাকেই আপনার অপরাধ বলে ধরে নেবে গৌরব। আপনার অপরাধী মনই এই ভাবনায় ভাবিত করেছিল আপনাকে। গৌরবের মাথায় যাতে এই সন্দেহ না আসে, সেই চেষ্টায় আপনিও গ্যাস-আক্রান্তর অভিনয় করেন। টাকা রেখে আসতে বলেন সৌমাদীপকে। আপনি জানতেন না সৌমাদীপ গৌরবকে সঙ্গী করবে। ছেলের হাতে ওষুধ খেয়ে আপনি সুস্থ হয়ে ওঠার ভান করেন। ওষুধটা খাওয়ার সময় আপনার খটকা লাগেনি। কারণ, আপনিও পুরিয়ার সুগার অফ মিল্ক রেখেছিলেন নিজের ওষুধ হিসেবে। গৌরব ওষুধ পালটাতে গিয়ে আপনাকে সুগার অফ মিল্কই খাওয়ায়। ভেবেছিল আসল ওষুধ না পেয়ে আপনি মরে যাবেন। মরেননি। আপনি ভেবেছিলেন পরের দিন বেহালার সাইটে গিয়ে আপনারই নির্দেশ দেওয়া ফ্ল্যাট থেকে টাকার সুটকেসটা পেয়ে যাবেন। পেলেন না।''

দীপকাকুকে দম নেওয়ার সুযোগ করে দিল সুদর্শন কাকা। ট্রেতে করে ধোঁয়া ওঠা তিনটে মগ নিয়ে এল। একটা মগ বিনুকের সামনে রেখে বলল, ''তোমার জন্য কফি।''

বাকি দু'জনকে চা দিয়ে বেরিয়ে গেল কাকা। দীপকাকু মগে চুমুক মেরে কথা শুরু করতে যাবেন, অমরেশবাবু কবজি তুলে ঘড়ি দেখে বললেন, ''গল্পটা আর কতক্ষণ চলবে?''

''অল্পই বাকি আছে। প্লিজ অ্যালাউ মি,'' বলে নতুন উদ্যমে বলতে থাকলেন দীপকাকু, ''সুটকেসটা গৌরবই সরিয়েছিল। যেহেতু সে জেনে গিয়েছিল কোথায় টাকার সুটকেস রাখা হচ্ছে। ওষুধ পালটানোর সুযোগ পেয়েছিল, যখন সৌমাদীপের গাড়ি থেকে নেমে নিজের বাইক আনতে যায় গৌরব। চশমার খাপে রাখা আপনার ফল্স্ ওষুধকে আসল জ্ঞান করে খাপটা ইচ্ছে করেই নিজের কাছে রাখে। বাইক ছিল সোমনাথের দোকানের সামনে। যার পাশে হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান। গৌরবের মাথায় আসে সুগার অফ মিল্কের কথা। আসল ওষুধের বদলে ওটা দিই পুরিয়া বানিয়ে দেওয়া হয়, দেখতে একই রকম হবে। মিডিয়ায় ততদিনে প্রচার হয়েছে ব্ল্যাকমেলারের ওষুধ থাকে হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতো পুরিয়ায়। সোমনাথের পাশের দোকান থেকে সুগার অফ মিল্কের বোতল, পুরিয়ার কাগজ কেনে গৌরব। এ ব্যাপারে দোকানদারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। গৌরব ওইসব চাইছে দেখে সে প্রশ্ন করেছিল, 'হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস শুরু করবি নাকি গৌরব?' গৌরব বলেছিল না, দেশের বাড়ির একজন তাকে আনতে দিয়েছে।

''যাই হোক, গৌরব ঘরে সুগার অফ মিল্ক দিয়ে পুরিয়া বানায়। যে ওষুধটা আসল ভেবেছিল, রাখে টেবিলের ড্রয়ারে। সঙ্গে ওষুধ নেই দেখে সৌমাদীপ গৌরবের কোয়ার্টারে আসে। গৌরব তাকে নিজের বানানো পুরিয়াটা চশমার খাপে দেয়। তারপর যা হয়, নকল ওষুধ খেয়েও আপনি বেঁচে ওঠাতে ধন্দে পড়ে যায় গৌরব। ভাবে, ব্ল্যাকমেলার যে ওষুধ দিচ্ছে, তাতে কি সত্যিকারের ওষুধ নেই? আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কারও থেকে হয়তো রেফারেন্স পেয়েছিল। আমি লোকটা কেমন, বুঝে নেওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের মোবাইল নম্বর গোপন রাখতে চেয়েছিল। সে দেখে নিল, আমি তার হয়ে কাজ করব, নাকি নিরপেক্ষভাবে? টাকার সুটকেস হাতিয়ে, ওষুধ পালটিয়ে গৌরব নিজেও তখন অপরাধী। আমাকে ফোনটা করেছিল বেহালা সাইটের লাগোয়া ওষুধের দোকান থেকে। এখানেই একটা বড় ভুল করে গৌরব। সে জানত না দোকানের মালিক ছিল আগে ওষুধের ইনফরমার, গোপনে সাইটের কাজের খবর দিত। সেই দোকানের মালিকই আপনাকে খবর দেয় গৌরব আমার সঙ্গে কী ব্যাপারে, কখন দেখা করতে আসছে। ইন্টারকম সেটে গৌরব আর আমার কথা শুনে নিয়েছিলেন দোকানের মালিক নন্দীবাবু। তার কিছুদিন আগে ওই নন্দীবাবুর দেওয়া খবরে আপনি নিশ্চিন্ত হন সৌমাদীপ একাই টাকা রাখতে যাচ্ছে ফ্ল্যাটে।

ওষুধ কোথায় আছে ফোনে বলে দেন সৌম্যদীপকে। বাড়ির লোককে ফোনগুলো করছিলেন গাড়ি থেকে নকল করে।

''আপনাকে দ্বিতীয় খুনটা করতে হয় বাধ্য হয়ে। গৌরব যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, নন্দীবাবুর থেকে টাইম জানা ছিল আপনার। গৌরবের হেলমেটে বিষগ্যাস স্প্রে করে দেন।''

ঝিনুকের চকিতে মনে পড়ে যায় দীপকাকুর বাইকে চেপে বাজার ফেরত বাবা হেলমেট খুলে বলেছিলেন, তোরা কী করে পরে থাকিস! দীপকাকু অনেকক্ষণ ধরে হেলমেটটা দেখছিলেন। তখনই নিশ্চয়ই মাথায় এসেছিল, গৌরবের হেলমেটে বিষগ্যাস দেওয়া থাকতে পারে। আগের কথায় দীপকাকু একটু ফাঁক রেখে গিয়েছিল। ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, ''প্রথম খুন হয়েছিল কে?''

''প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তিই খুন হন। ভবানীপুরের বিজন সাহা। অমরেশবাবু ও বাড়িতে ওষুধ দিতেন না। তাই দ্বিতীয়বার ফোন করে টাকা চাননি। ওই মৃত্যুটা ব্ল্যাকমেলারকে প্রচার দেয়। এমনটাই চেয়েছিলেন অমরেশবাবু। যাতে পরের আক্রান্তরা টাকা দেওয়ার আগে দু'বার না ভাবে। বিজন সাহার পারিবারিক ডাক্তারকেও উনি উড়োফোনে জানান যে, শ্বাসকষ্টটা বিষপ্রয়োগের ফলে হচ্ছে। বিজন সাহার মৃত্যুর পর ডাক্তার উড়োফোনের জন্য ডেথ সার্টিফিকেট দেননি। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠান। পুলিশের এক্তিয়ারে চলে যাওয়া মানেই প্রচার।''

''আপনার বলা তা হলে শেষ? এবার উঠি?'' বললেন অমরেশবাবু।

দীপকাকু বলে ওঠেন, ''দাঁড়ান, দাঁড়ান। বিষগ্যাস কোথা থেকে পেলেন সেটা বলি। প্রথম জীবনে এ সি, ফ্রিজ, টিভির যে ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন, তার ল্যাবরেটরিতে ক্লোরোফ্লুরো গ্যাস না কিনে নিজেরা বানানো যায় কিনা পরীক্ষা হচ্ছিল। সায়েন্টিস্টের ভুলে রসায়নাগারে একদিন অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। মারাত্মক অসুস্থ হন সায়েন্টিস্ট সমেত, কিছু কেমিস্ট। ল্যাবরেটরি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার ফলে তাঁরা বেঁচে যান। পরে আপনি সেই সায়েন্টিস্টের থেকে জেনে নেন ভুলটা কী হয়েছিল। টাকা রোজগারের জন্য ওটাকেই অস্ত্র করছিলেন এতদিন পর। সায়েন্টিস্টের সঙ্গে দেখা করে তথ্যগুলো জোগাড় করেছি,'' একটু থেমে দীপকাকু ফের বললেন, ''এ সব শুনে এখন কী মনে হচ্ছে অমরেশবাবু? গোয়েন্দা হিসেবে কত মার্কস দেবেন আমাকে?''

''গোয়েন্দা হিসেবে কোনও নম্বরই দিতে পারছি না। তবে গল্পটা ভাল। সিনেমাওয়ালাদের দিলে লুফে নেবে,'' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন অমরেশবাবু। ফের বললেন, ''আপনি যদি এই গল্প নিয়ে পুলিশের কাছে যান, মানহানি মামলার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। চলি।''

চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন অমরেশবাবু। ঝিনুক বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠে, ''লোকটার তো ইম্পাতের স্নায়ু।''

''চলো, ইম্পাতকে এবার বেঁকিয়ে দিই,'' বলে উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। কী ঘটাবেন আন্দাজ করা যাচ্ছে না। ঝিনুক এটুকু বুঝতে পারে অমরেশবাবুকে ফলো করতে হবে।

দীপকাকুর অফিস থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে ঝিনুকরা। অমরেশবাবু গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, থমকে গেলেন। ঘাড় ঘোরালেন রাস্তার চারপাশে। দীপকাকু ঝিনুককে টেনে নিয়েছেন ফুটপাথের গাছের আড়ালে। গাড়িতে উঠে পড়লেন অমরেশবাবু। ঝিনুকরা বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। এগিয়ে যাচ্ছে অমরেশবাবুর গাড়ি। জানলা দিয়ে কী একটা ফেলে দিলেন বাইরে। দীপকাকু ছুটে গেলেন, সঙ্গ নিল ঝিনুক। ফেলে দেওয়া জিনিসটা দীপকাকু কুড়নোর আগেই কোথা থেকে এক ট্রাফিক সার্জেন্ট এসে তুলে নিলেন। ওদিকে অমরেশবাবুর গাড়ির সামনে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন আর এক ট্রাফিক সার্জেন্ট। ঝিনুকের বুঝতে অসুবিধে হয় না এসব ঘটছে দীপকাকুর প্ল্যানমাফিক।

ঝিনুকরা পৌঁছে গেল অমরেশবাবুর গাড়ির কাছে। ট্রাফিক সার্জেন্ট কুড়িয়েছেন এয়ার পিউরিফায়ারের ছোট্ট মেশিন। গাড়ির এ সির সামনে যেটা লাগানো থাকে। সার্জেন্ট গাড়ির জানলা দিয়ে অমরেশবাবুকে বলছেন, ''স্যার এটা ফেলে দিলেন কেন?''

''দরকার নেই। ফুরিয়ে গিয়েছে ফাইল,'' বললেন অমরেশবাবু।

মেশিন থেকে কন্টেনার বের করে সার্জেন্ট বললেন, ''কই, ফুরোয়নি তো। অনেকটাই আছে। লাগিয়ে নিন।''

''বলছি তো লাগাব না। গন্ধটা ভাল লাগে না আমার,'' বেশ ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন অমরেশবাবু। এমন সময় কোথা থেকে যেন উদয় হলেন গোয়েন্দা অফিসার সুবীর দত্ত। গাড়ির জানলার কাছে গিয়ে কড়া গলায় বললেন, ''ওই কন্টেনার লাগিয়েই আপনাকে গাড়ি চালাতে হবে।''

ঝিনুক স্পষ্ট বুঝতে পারে অমরেশবাবুর ড্রাইভার চলে যাওয়াটাও এই নাটকের অংশ। নির্দেশনায় দীপকাকু। সুবীর দত্ত গাড়ির সামনের দরজা খুলে বলছেন, ''সরুন, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি মেশিনটা।''

গাড়ি থেকে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এলেন অমরেশবাবু। সুবীর দত্তকে বললেন, ''আপনি এরকম জোর জবরদস্তি করছেন কেন বলুন তো?''

''এভাবেই তো শ্বাসকষ্টে ফেলতেন শিকারকে। কষ্টটা নিজে একবার পরখ করুন,'' বলার পর পকেট থেকে নিজের পরিচয়পত্র বের করে দেখালেন সাদা পোশাকের সুবীর দত্ত।

দীপকাকু এগিয়ে এলেন অমরেশবাবুর সামনে। শ্লেষের হাসি সমেত বললেন, ''গল্পের শেষটা কেমন লাগল, বেশ ইন্টারেস্টিং না?''

॥ ৯ ॥

গতকাল অ্যারেস্ট হলেন অমরেশবাবু। আজ ঝিনুকরা এসেছে সেক্টর ফাইভে ঝিলের ধারের এক নতুন রেস্তোরাঁ। লাঞ্চ অফার করেছেন গোয়েন্দা অফিসার সুবীর দত্ত। শ্বাসকষ্ট কেসের সাফল্য উপলক্ষে। দীপকাকুকে বলেছিলেন, ''হোল ফ্যামিলি নিয়ে আসুন।''

কলকাতায় দীপকাকুর ফ্যামিলি বলতে ঝিনুকরাই। একা থাকেন। দেশের বাড়ি মেদিনীপুরে। বাবা এসেছেন ঝিনুকদের সঙ্গে। মা কিছুতেই এলেন না। বললেন, ''তোদের ওই চুরি, ছিনতাই, খুনের গল্প আমার একেবারেই ভাল লাগে না। তাও আবার পুলিশের সঙ্গে লাঞ্চ, ভয়ে গলা দিয়ে খাবার নামবে না।''

ক্লাবটা খুবই সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। গাছ, ফুল। সবচেয়ে ভাল লাগছে দিগন্তবিস্তৃত বিলটা। স্থির জলে ছোট মারছে মাছরাঙা। বাগানে ছাতার তলায় ঝিনুকদের টেবিল। সুবীর দত্ত খাবার অর্ডার করেছেন। কাল বিকেল থেকে টিভিতে সম্প্রচার হচ্ছে সায়োকেটের ধরা পড়ার খবর। আজ কাগজেও বেরিয়েছে। কোথাও দীপকাকুর নাম নেই। তবে এ কথা বলা হচ্ছে, পুলিশের গোয়েন্দা এবং বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতায় ধরা পড়েছে অপরাধী। দীপকাকু নিজেই পুলিশকে বলেছেন, তাঁর নামটা যেন প্রেসের কাছে গোপন রাখা হয়। অপরাধীরা যদি গোয়েন্দাকে চিনে রাখে, আরও কঠিন হয়ে যায় তদন্তের কাজ। এদিকে আবার দীপকাকুর নাম কাগজে, টিভিতে এলে বন্ধুদের কাছে ঝিনুকের প্রেস্টিজ বাড়ে। তদন্তের গল্প করতে গিয়ে যতটুকু রোমহর্ষক অংশ বানায় ঝিনুক, সেটাও সত্যি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেত। বন্ধুরা গল্পটা বিশ্বাস করছে কিনা, তা নিয়ে সংশয় থাকত না।

খাবার নিয়ে এসেছে ওয়েটার। অফিসার সুবীর দত্ত এতক্ষণ বাবার সঙ্গে গল্প করছিলেন। জানছিলেন বাবার মিলিটারি জীবনের কথা। যে গল্প অনেকবার শুনেছে ঝিনুক। খাবার এসে যেতে বাবাদের আলোচনার তাল কাটল। সার্ভ করে দিচ্ছে ওয়েটার। হাতের সিগারেট ফেলে সুবীর দত্ত দীপকাকুকে বললেন, ''অপরাধীর সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আপনি তো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। চরম শাস্তি অপেক্ষা করছে ওর কপালে। এবার আপনি বলুন লোকটাকে কবে থেকে এবং কী উপায়ে চিহ্নিত করলেন?''

কাঁটা-চামচ তুলে নিলেন দীপকাকু। খাবার খেতে-খেতে বলতে থাকলেন, ''প্রথম যেদিন জানলাম অমরেশবাবু আক্রান্ত হওয়ার পর ব্ল্যাকমেলার বলেনি টাকা পৌঁছনোর জন্য কোন গাড়িতে উঠতে হবে, তখনই সন্দেহ হল। অন্যদের ক্ষেত্রে কখনও অটো, শাট্‌ল ট্যাক্সি, বাস এমনকি হেঁটে যেতে বলেছিল। কারণ, ব্ল্যাকমেলার লক্ষ করছিল তার নির্দেশ অমান্য করে টাকার সুটকেস হাতে থাকা কাউকে ফলো করছে কিনা? আমার ধারণা, অমরেশবাবু ছদ্মবেশে শাট্‌ল ট্যাক্সি, অটো এবং বাসে ছিলেন।''

''ভেরি গুড,'' বলে উঠলেন সুবীর দত্ত।

দীপকাকু বলতে থাকলেন, ''বিনুকের একটা অবজ়ার্ভেশন আমার খুব কাজে লেগেছে। ও যখন ভয় দেখিয়ে সৌম্যদীপকে গাড়িতে তুলছে, সৌম্যদীপের দৃষ্টির সঙ্গে মিল পেয়েছিল ভিখারী সাজা দুষ্কৃতীর। যে বন্দুক তাক করেছিল বিনুকের দিকে। আমি মোটামুটি শিওর ছিলাম, অপরাধী পিতা-পুত্রের মধ্যে কোনও একজন। কারণ, দু'জনের দৃষ্টির মিল থাকা স্বাভাবিক।''

বাবা, সুবীর দত্ত প্রশংসার চাউনিসহ তাকিয়ে রয়েছেন বিনুকের দিকে। লজ্জা পেয়ে মাথা নামিয়ে নেয় বিনুক। দীপকাকুর এ সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। নজর খাবার প্লেটে। বলে যাচ্ছেন, ''খুব বড় উপকারটা করলেন শোভনবাবু। বললেন, সেনবাড়ি প্রমোটিং হবে। ঝট করে মাথায় খেলল, অমরেশবাবুও তো প্রমোটার। উনি কি গিয়েছিলেন সেনবাড়ি দেখতে? পাঁচিলের কোটটা কি তখনই চোখে পড়ে তাঁর? ওখানেই কি রেখেছিলেন মিলন রায়চৌধুরীর ওষুধ? সেনবাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলে নজরদারি করলাম, অমরেশবাবু গিয়েছিলেন বাড়িটা দেখতে। কেননেনি। পোষায়নি দরে। এর পর থেকে আমি অমরেশবাবুকে ফলো করা শুরু করলাম। একদিন দেখি, যে প্রাচীন বাড়ির সামনে থেকে সুটকেস-ফোনসমেত উধাও হয়েছিল দুষ্কৃতী, তার পাশের গলিতে ঢুকছেন অমরেশ। প্রাচীন বাড়ির পিছনে একটা ব্যাঙ্ক। অমরেশ ঢুকলেন সেখানে। বুঝলাম ওই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে ওঁর। খেয়াল করলাম কখন জানি আমার ফোনের সিগনাল চলে গিয়েছে। প্রাচীন বাড়ি, গলির কারণেই সেটা হয়েছে। টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে দুষ্কৃতীর উধাও হওয়ার দিনের সি সি টি ভি ফুটেজ চাইলাম। ব্যাঙ্কের ভিতরেও ফোনের সিগন্যাল আসছিল, যাচ্ছিল। ফুটেজে পেলাম অমরেশবাবুকে। ভিখারির সাজ ছেড়েছেন গাড়িতে। হাতে টাকার সুটকেস আছে। ব্যাঙ্ক থেকে বেরলেন সুটকেস নিয়েই। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের থেকে জানলাম, ওই ব্যাঙ্কে লকার আছে অমরেশবাবুর। ব্ল্যাকমেলিংয়ের টাকা তার মানে ওখানেই রাখেন। সেদিনের নকল টাকাটাও রেখেছেন নিরুপায় হয়ে। বুঝে গিয়েছেন তাঁকে ট্র্যাক করা হচ্ছে। ফোনটাও রয়ে গিয়েছিল লকারে, তাই আর সিগন্যাল পাওয়া যায়নি।''

''এটার পরেই তো লোকটাকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারত,'' খাওয়া থামিয়ে বলে উঠলেন বাবা।

দীপকাকু বললেন, ''না, তখনও একটা বড় ব্যাপার জানা বাকি। অপরাধী কী উপায়ে শিকারের উপর বিষপ্রয়োগ করছে। আমি আবার করে আক্রান্তদের কাছে গেলাম। ভাল করে ভেবে দেখতে বললাম, কখন থেকে অস্বস্তিটা শুরু হয়েছিল। কথা বলে যা বুঝলাম সকলেরই কষ্টের উৎস হচ্ছে গাড়ি। বিষগ্যাসটার উপসর্গ দেখা দেয় ধীরে-ধীরে। এবার আমি আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিয়মিত যেখানে গাড়ি পার্ক করেন, সেখানে গেলাম। বেশির ভাগই অফিসের বেসমেন্ট। সেখানকার ফুটেজ দেখলাম যেদিন আক্রান্ত হচ্ছেন ব্যক্তি। তার গাড়ির পিছন-পিছন পার্কিং লটে ঢুকছে সৌম্যদীপের গাড়ি।''

''ডিরিবাস!'' বলে উঠলেন বাবা।

চিড়িয়ে খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে দীপকাকু বললেন, ''সৌম্যদীপের গাড়ি থেকে বেরল টুপি পরা লোক, সি সি টিভি থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা আর কী! লোকটা টার্গেট করা ব্যক্তির গাড়ির সামনের দরজার কী হোলে কিছু ঢুকিয়ে লক খুলে ফেলল। বডির উপরের অংশ ঢোকাল গাড়িতে, খুব তাড়াতাড়িই বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল গাড়ির।''

''এক মিনিট,'' কথা থামালেন বাবা। বললেন, দরজা না হয় বন্ধ করল, লকটা তো ভাঙা রইল। লক ভাঙলে পালটানো ছাড়া উপায় নেই। যার গাড়ির ভাঙা হল লক, সে যখন উঠতে যাবে গাড়িতে লক খারাপ নিয়ে প্রশ্ন জাগবে মনে।''

''সকলেরই জেগেছিল। আক্রান্ত হওয়ার পর ঘটনাটা মাথা থেকে উড়ে যায়। আমি মনে করাতে এখন সবারই মনে পড়ছে,'' বলে নিয়ে দীপকাকু নতুন উদ্যমে শুরু করলেন, ''আমার মাথায় ঘুরতে লাগল গাড়ির ভিতর ঢুকে লোকটা কী ঘটাল? সব ক'টা গাড়ির স্টিয়ারিং প্যানেল দেখলাম। সৌম্যদীপ, অমরেশের গাড়ি আগেই দেখেছি। তফাত চোখে পড়ল, পিতা-পুত্রের গাড়িতে এয়ার পিউরিফায়ার নেই। আক্রান্তদের আছে। বুঝতে অসুবিধে হল না, ওই পিউরিফায়ার বদল করে এমন কিছু রাখা হচ্ছে, যা কন্টামিনেট করছে বন্ধ গাড়ির এ সির হাওয়াকে। অসুস্থ হয়ে পড়ছে আরোহী।''

''বিষাক্ত তরলভরা শিশিটা কি রয়ে যাচ্ছিল গাড়িতে? তা হলে তো পরের বার যিনি গাড়িতে উঠবেন, অসুস্থ হয়ে ওঠের চান্স আছে তাঁরও। তেমন কেস তো আসেনি,'' বলল বিনুক।

প্লেট থেকে মুখ তুলে দীপকাকু বললেন, ''ঠিক ধরেছ, সেই কারণেই বিষ তরল দেওয়া গাড়িকে টানা ফলো করে যেত অপরাধী। আক্রান্ত ব্যক্তি গাড়ি থেকে নামলেই, সেই বিষ তরলের শিশি মেশিন থেকে খুলে নিয়ে আগেরটা লাগিয়ে দিত।''

''তারপর?'' জানতে চাইলেন অফিসার।

দীপকাকু বললেন, ''তারপর আর কী, ওই তরল কী করে বানাচ্ছেন অমরেশ যা হাওয়ায় মিশত, শ্বাসবায়ুর সঙ্গে ঢুকে যেত মানুষের শরীরে? সেটা জানার জন্য অমরেশবাবুর অতীত উদ্ধারে নামলাম। জানলাম কোন ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন, কী ঘটেছিল সেখানে। ব্যস, দন্ড শেষ।''

''আপনি তো একেবারে মিরাক্‌ল করেছেন মশাই। এমন ভাব করছেন, যেন কিছুই নয়। মানছি, আপনি গোয়েন্দাগিরিতে আমাকে টেক্কা দিয়েছেন। কিন্তু বলতে পারবেন, কেন এখানে খাওয়াতে নিয়ে এসেছি আপনাদের?'' বলে মিটিমিটি হাসছেন সুবীর দত্ত।

দীপকাকু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ''না, মাথায় আসছে না কিছু।''

''আরে বাবা, বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে কাজ করলেন এত ক'টা দিন, তাই মুক্ত বাতাসে লাঞ্চ করাতে আনলাম,'' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই জোরে হেসে উঠলেন সুবীর দত্ত। বাবা হাসছেন, দীপকাকুর মুখেও হাসি। বিনুক বুক ভরে শ্বাস নেয়। ভাবে, শুধু জল কেন, বায়ুরও নাম হওয়া উচিত জীবন। দেখা যায় না বলে কি মানুষের মনে থাকে না? আর এই বাতাসে যারা বিষ ছড়ায়, তাদের এ পৃথিবীতে না থাকাই ভাল।

নতুন হেডমাস্টারমশাই

প্রচেত গুপ্ত

আমাদের স্কুলে স্যারদের নানা রকম গোপন নাম আছে।

এসব আমাদের কীর্তি। আমরা খুবই চেষ্টা করি, গোপন নামের খবর স্যারেরা যেন জানতে না পারেন। তারপরেও দেখেছি, কীভাবে যেন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। স্যারেরা জেনে গিয়েছেন। প্রতিবারই ভাবি, এবার বকুনি খাব। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, কোনওদিনই স্যারেরা কিছু বলেন না। বরং উলটো হয়। কোনও স্যার হয়তো ক্লাসে এসে, মুচকি হেসে জিগ্যেস করেন, "কীরে! আর কারও নাম দিলি নাকি? দিলে আমাকে আগে জানাবি।"

কোনও স্যার হয়তো বলেন, "আমার নামটা কিন্তু জব্বর হয়েছে। কার মাথা থেকে বেরল? ইস! এই মাথা যদি লেখাপড়ায় খাটাতিস কত ভালই না রেজাল্ট করতিস।"

কোনও স্যার হয়তো এসে রাগ-

রাগ গলায় বলেন, "শুনলাম, তোমরা নাকি স্যারেদের গোপন নাম দাও, কই, আমার তো কোনও নাম দাওনি। কেন? আমি কি গোপন নাম দেওয়ার যোগ্য নই? নাকি তোমরা আমাকে তেমন পছন্দ করো না?"

আমরা লজ্জা পেয়ে মাথা চুলকাই। আমতা-আমতা করি। স্যার কড়া গলায় বললেন, "এক সপ্তাহ সময় দিলাম। এর মধ্যে যদি আমার নাম না পেয়েছি, সবার পরীক্ষার খাতায় পাঁচ নম্বর করে মাইনাস।"

আমরা বুঝতে পারি, গোপন নামে স্যারেরা রাগ করেননি। আনন্দ পেয়েছেন। যাকে বলে নির্মল আনন্দ। পাবেন না কেন? আমরা তো রাগ করার মতো নাম দিই না। মজা পাওয়ার মতোই নাম দেওয়া হয়। নামগুলো শুনলেই বোঝা যাবে।

অঙ্কস্যার বীরেনবাবুর নাম আমরা দিয়েছি, 'থরহরিকম্প স্যার'। উনি সবসময় রেগে থাকেন। ছেলেরা দেখলেই ভয় পায়। বুক ধুকপুক করে, হাঁটু কাঁপে। তাই থরহরিকম্প। বীরেনস্যার যে আমাদের বকাবকি করেন, অঙ্ক ভুল করলে কান মুলে দেন, ছুটির পর আটকে রেখে দশটা অঙ্ক কষান এমন নয়। এমনকী, তিনি তেমন জোরে ধমকধামকও দেন না। মুশকিল অন্য জায়গায়। অঙ্ক পারা এবং না-পারা দুটোই স্যারের কাছে সমান। অতি অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা যদি অঙ্ক ভুল করি স্যার চোখ কটমট করে বলেন, "ইস, রকম একটা সহজ পাটিগণিত পারলি না! তা হলে আর কোন অঙ্ক পারবি? অঙ্ক তোর জন্য নয়, তোর জন্য হল সারাদিন ফুটবল খেলা।"

আবার কেউ যদি অঙ্ক ঠিক করে তা হলেও স্যারের চোখ কটমট করে উঠবে। বলবেন, "এই বীজগণিতটা করার মধ্যে বাহাদুরি কী আছে? কোনও বাহাদুরিই নেই। এ তো অঙ্ক নয়, এ তো খানিকটা জল। ধরে নে, তুই অঙ্ক করিসনি, ঢক করে খানিকটা জল খেয়েছিস। অঙ্ক যখন পাথরের মতো কঠিন হবে আর সেই পাথর যখন হজম করতে পারবি, তখন বুঝব ক্ষমতা।"

বোঝো কাণ্ড! পারলেও দোষ, না পারলেও দোষ। এই স্যারকে ভয় না পেয়ে উপায় কী?

আমাদের ইতিহাসস্যার হলেন 'কান্নাকাটি স্যার'। ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবসময়েই স্যারের মুখ বেজার। কেমন যেন কান্না-কান্না ভাব। আমরা ইতিহাসের সাল, তারিখ, রাজা-রাজরাজড়ার নাম গোলমাল করে ফেললে স্যার পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের কোণ মোছেন। নিশ্চয়ই ধুলো পড়ে, কিন্তু মুখ দেখে মনে হয়, স্যার কাঁদছেন। কী বিপদ! ইতিহাস ভুলে গেলে ছাত্রদের কান্নাকাটি করা উচিত। শিক্ষক কেন কান্না-কান্না মুখ করে থাকবেন? রতনস্যার অমনই থাকেন। বলেন, "তোমাদের ইতিহাসের জ্ঞান দেখে দুঃখে, শোকে চোখে জল চলে আসে। মনে হয়, ডাক ছেড়ে কাঁদি। বুঝতে পারি, আমি তোমাদের কিছুই শেখাতে পারিনি। ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না।"

কথা শেষ করে স্যার আবার রুমাল বের করে চোখ মোছেন। রতনবাবুকে কান্নাকাটি স্যার না বলে অন্য কিছু বলা যায়?

'যা খুশি স্যার' হলেন বিমানবাবু। বাংলা পড়ান। ক্লাসের পড়া তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারলে আমাদের ছুটি দিয়ে দেন। যা খুশি করার ছুটি। আমরা মাঠে চলে যাই। ছুটোছুটি করি, খেলি, গাছে চড়ি। স্যার বলেন, "আমার খুশিমতো পড়া করেছ, এবার তোমাদের খুশি মতো যা চাও করো। তবে অন্য ক্লাসের লেখাপড়ায় অসুবিধে করলে কুড়িটা সমাস আর দশটা সন্ধি বিচ্ছেদ দিয়ে বসিয়ে দেব। মনে থাকে যেন।" এই স্যারের নাম যে আমরা 'যা খুশি স্যার' দিয়েছি, সেটা কি ভুল করেছি?

কৃপেশবাবু ভূগোল পড়ান। 'মিটিমিটি হাসি স্যার' হিসেবে ছাত্রমহলে সবিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। স্যারের মুখে সবসময় মিটিমিটি হাসি। ম্যাপ দেখিয়ে যখন পড়ান, তখনও আলতো হাসেন। আবার বকাঝকার সময়ও ঠোঁটের কোনায় হাসি। স্যারকে দেখলে মনে হয়, ভূগোল সাবজেক্টটাই আসলে হাসি-খুশির সাবজেক্ট। মুখ গোমড়া করে সাবজেক্টের মজা নষ্ট করে দেওয়ার কোনও মানে নেই। সত্যি কথা বলতে কী, 'মিটিমিটি হাসি স্যার'-এর জন্যই আমরা ভূগোল পড়ে আনন্দ পাই। স্যারের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করি।

নামের লিস্ট এখানেই শেষ নয়, আরও আছে।

গেম টিচার সপ্তক রায়ের নাম আমরা দিয়েছি 'ভেঙে পড়া স্যার'। উনি আমাদের স্কুলে যাবতীয় খেলাধুলোর ব্যবস্থা করেন। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল। সঙ্গে প্রতি বছরের স্পোর্টস। স্যার খুব পরিশ্রম করেন। ছেলেদের ট্রেনিং দেন। কিন্তু খেলার মাঠে গিয়ে সবসময়ে ভেঙে পড়েন। বড় মজার কাণ্ড।

ক্লাস টেনের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচে এইটের অর্ধশ গোল মিস করলে স্যার মাঠের বাইরে কপাল চাপড়াতে-চাপড়াতে বলবেন, "ইস, কী করলি...কী করলি! এমন সহজ বলটা গোলে ঢোকাতে পারলি না!"

ক্লাস টেনের অনুপম ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বাউন্ডারি হাঁকাতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসলে স্যার দু'হাতে মুখ ঢাকেন। গভীর হতাশায় মাথা নাড়তে-নাড়তে বলেন "অনুপম, এ তুই কেমন ব্যাট চালালি? আমি কত আশা করেছিলাম, আজ তুই সেঞ্চুরি করবি। তার বদলে সতেরো রানে আউট হলি! ছি-ছি! আমার মুখ ডোবালি।"

স্পোর্টসের দিন ক্লাস সেভেনের সুমন হাই জাম্প দেওয়ার সময় দড়ি ছিঁড়ে পড়লে স্যার যেমন 'গেল গেল' করে ওঠেন তাতে মনে হয় উনি নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

এই স্যার কোনও ছাত্রের জেতা নিয়ে লাফালাফি করেন না, কেউ হেরে গেলেই মুখ শুকিয়ে আমসি। উনি চান, সবাই জিতুক। এরকম হয় নাকি? খেলাধুলোয় হারজিত তো আছেই। স্যারকে কে বোঝাবে? তাই

স্যারের জন্য নাম ঠিক হয়েছে 'ভেঙে পড়া স্যার'।

আবার বিজ্ঞানের শিক্ষক বিকাশ পানের গোপন নাম হল, 'না স্যার'। আমরা যা-যা ভালবাসি, স্যারের সবেতেই 'না'। "কথা বলবি না, লাফাবি না, ছুটবি না, হুটোপাটি করবি না, মারপিট করবি না, পাঁচিলে উঠবি না, গাছে চড়বি না।" টিফিন টাইমে বা ছুটির পর না স্যারকে দেখলেই আমরা লুকিয়ে পড়ি। লাফালাফি, হুটোপাটি, ছোটাছুটি না করলে কীসের টিফিন টাইম? কীসেরই বা ছুটি?

যাই হোক, সব মিলিয়ে স্কুলে আমরা খুব মজায় ছিলাম। একদিন হঠাৎ খবর এল, আমাদের আগের হেডমাস্টারমশাই অবসর নিচ্ছেন, তাঁর জায়গায় আসছেন নতুন হেডমাস্টারমশাই অলক সেন। আমাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। নতুন হেডমাস্টারমশাই কেমন হবেন? এই হেডমাস্টারমশাইকে তো আমরা চিনি। কখন রাগ করেন, কেন রাগ করেন, রাগ কখন পড়ে যায় এতদিনে অনেকটা জেনে ফেলেছি। স্কুলে রাউন্ড দেওয়ার সময় তাঁর জুতোয় মসমস আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজ শুনেই আমরা হুল্লোড় থামিয়ে গুড বয় হয়ে যাই। নতুন হেডমাস্টারমশাইয়ের তো কিছুই জানি না। রাউন্ড দেওয়ার সময় তাঁর জুতোয় কি কোনও আওয়াজ হয়? না হলে তো বিরাট সমস্যা। এমনিতেই হেডমাস্টারমশাই মানেই একটা ভয়-ভয় ব্যাপার। গুরুগম্ভীর, রাশভারী, থমথমে মুখ। কথায় বলে, কোনও ছাত্র কখনও হেডমাস্টারমশাইয়ের হাসিমুখ দেখতে পায় না। নতুন হেডমাস্টারমশাই কি পুরনো হেডমাস্টারমশাইয়ের চেয়ে বেশি রাগী? ছাত্রদের হইহট্টগোল কি তিনি মোটে সহ্য করতে পারেন না? পান থেকে চুন খসলেই ধমক? নাকি বাবা-মাকে ডেকে এনে নালিশ? পরীক্ষায় কম নম্বর পেলেই হাতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেবেন নাকি?

স্কুল জুড়ে ছাত্রদের মধ্যে টেনশন আর ফিসফাস। কী হবে, কী হবে ভাব।

এই টেনশনের মধ্যেই একদিন নতুন হেডমাস্টারমশাই চলে এলেন। তাঁকে দেখে আমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার জোগাড়। ভারিক্কি চেহারা, গোল মুখ, চোখে মোটা কাচের চশমা। রাগী মানুষের সবক'টা লক্ষণই রয়েছে। মানুষটা রাগীও। মুখে কিছু বলেন না। শুধু নাকের উপর চশমা নামিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকান। ব্যস, তাতেই আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ। আমরা বুঝতে পারলাম, হট্টগোলের দিন শেষ। খুব সাবধানে থাকতে হবে। সবসময় মুখের সামনে খুলে রাখতে হবে বই-খাতা। রাউন্ডে বেরিয়ে হেডমাস্টারমশাই যেন দেখতে পান, এই স্কুলের ছেলেরা হিরের টুকরোর মতো এক-একটা 'লেখাপড়ার টুকরো'। লেখাপড়া ছাড়া কিছুই জানে না। এর সঙ্গে আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সেই সিদ্ধান্তের কথা মুখে-মুখে ছড়িয়ে দেওয়া হল। স্যারেদের নতুন নাম দেওয়ার খেলা এবার থেকে বন্ধ। নতুন হেডমাস্টারমশাই ব্যাপারটা জেনে গেলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে। অতএব চুপ।

সাতদিন যেতে না-যেতে সত্যিই আমরা একবারে চুপ করে গেলাম। তবে ভয়ে নয়, চুপ করলাম বিস্ময়ে। হেডমাস্টারমশাই রাগী আমরা জানি, কিন্তু তিনি যে এমন অদ্ভুত মানুষ সেকথা তো জানতাম না! স্কুলে খবর ছড়িয়ে পড়ল ঝড়ের বেগে।

প্রথম খবর এল তিনদিনের মাথায়।

ক্লাস নাইনের নীলের চিরকালই অঙ্কে আতঙ্ক। পরীক্ষার সময়ে ঘেমে-নেয়ে একশা কাণ্ড হয়। ও যে অঙ্ক পারে না, এমন নয়। কিন্তু একটা অঙ্ক আটকে গেলে এমন ঘাবড়ে যায় যে মাথাটাই এলোমেলো হয়ে যায়। স্যারেরাও নীলকে নিয়ে হতাশ। সে নিজেও। এবার ক্লাস পরীক্ষায় নীল পেয়েছে শূন্য। জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠালেন নতুন হেডমাস্টারমশাই। নীল তো কাঁপতে-কাঁপতে গেল। সে নিশ্চিত, এই স্কুলে তার আর থাকা হবে না। এতদিন যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, কড়া হেডমাস্টারমশাই অঙ্কে শূন্য পাওয়া ছেলেকে স্কুলে রাখবেন না। কিন্তু যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য। হেডমাস্টারমশাই নীলকে সামনে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তার অঙ্কভীতির কথা শুনলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, "দূর বোকা, এ সমস্যা তো আমারও ছিল। আমিই তো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হাতে পেলে কেঁদেই ফেলতাম। তোর মতো সাহসী ছেলে অঙ্ককে ভয় পেলে মানায়? কোনও চিন্তা করবি না। সব ঠিক হয়ে যাবে। যে ক'টা অঙ্ক পারবি সেই ক'টা করবি। সবাইকে সব অঙ্ক পারতে হবে তার তো কোনও মানে নেই। তবে ঘামতে-ঘামতে নয়, হাসতে-হাসতে পরীক্ষা দিবি। এর পরের পরীক্ষার সময় আমি বাইরে থেকে লক্ষ রাখব। যদি, মুখে হাসি না দেখেছি তোর বিপদ আছে। মনে থাকবে?"

এমন কথা নীল আগে কোনওদিন শোনেনি, শুধু বকাবকাই শুনেছে। সে প্রবল উৎসাহে অঙ্ক প্র্যাকটিস শুরু করেছে।

পরের দিনের ঘটনায় আমরা আরও থ'।

ভেবেছিলাম, নতুন হেডমাস্টারমশাই ভাল-ভাল কথা শুধু লেখাপড়ার জন্য বলেছেন। কিন্তু সেদিন ক্লাস সেভেন বনাম ক্লাস এইটের ফুটবল ম্যাচের পর একেবারে মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এইটের অর্ক তিনটে গোল খেয়ে মুষড়ে পড়েছিল। মাঠের এক কোণে বসেছিল হাঁটুতে মাথা গুঁজে। নতুন হেডমাস্টারমশাই তার কাছে গেলেন। পিঠে হাত রেখে বললেন, "একটা ম্যাচে তিন গোল খাওয়াটাই বড় হল? এতদিন যে তিনশো গোল আটকেছিস, সেটা কিছু নয়? আজও তো অনেক গোল বাঁচিয়েছিস শুনলাম। বাঁচিয়েছিস না?"

অর্ক ভয়ে-ভয়ে মাথা নাড়ল। নতুন হেডমাস্টারমশাই দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "তবে? তুই কি বোকা? গোলকিপারের গোল খাওয়াটাই শুধু

দেখা হবে? গোল বাঁচানোটা দেখা হবে না? উঠে পড়, যা গিয়ে আনন্দ কর। হাফ ডজন গোলে হারিসনি, এই কারণে আনন্দ। আমি গেম টিচারকে বলে দিয়েছি, বেস্ট প্লেয়ারের প্রাইজটা যেন তোকে দেওয়া হয়।"

অর্ক এর পরেও থম মেরে বসেছিল। বেচারি ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছিল না। নতুন হেডমাস্টারমশাই এবার দিলেন এক ধমক।

"কীরে, কথা কানে যাচ্ছে না? গাট্টা দেব নাকি?"

অর্ক আর এক মুহূর্ত দেরি না করে লাফ দিয়ে উঠল। নতুন হেডমাস্টারমশাইকে প্রণাম করে দৌড় দিল হাসিমুখে।

তিন নম্বর অবাক করা ঘটনাটা ঘটল কয়েকদিন পরে।

বার্ষিক অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও গান, আবৃত্তি, নাটক হবে। কে কী করবে তাই নিয়ে চলছে হইচই। অনেক ছেলেমেয়ে যেমন বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চায়, অনেকে আবার চায়ও না। এদের মধ্যে কয়েকজনের আছে স্টেজ ফোবিয়া। যাকে মঞ্চভীতি বলে। স্টেজে উঠলেই পা কাঁপে। গলা শুকিয়ে যায়। আমাদের ক্লাসের দিব্য গত বছর কেলেঙ্কারি করেছিল। সে দারুণ আবৃত্তি করে। কিন্তু গত বছর কী যে হল, স্টেজে বলতে গিয়ে মাঝপথে গেল ভুলে। সেই ভুল ম্যানেজ করতে গিয়ে অন্য কবিতা বলতে শুরু করে দিল। দর্শকদের মধ্যে হাসির তুফান উঠল। ফলে সেটাও গুলিয়ে ফেলল। এবার শুরু হল হাততালি। দুঃখে, লজ্জায় দিব্য ক'দিন স্কুলে পর্যন্ত আসেনি। এবছর আর অনুষ্ঠানের ধারেকাছে গেল না। নতুন হেডমাস্টারমশাই এই খবর জেনে একদিন সটান ক্লাসে চলে এলেন। দিব্যকে চোখ পাকিয়ে বললেন, "অ্যাই বাঁদর ছেলে, তুই নাকি ভাল আবৃত্তি করিস?"

দিব্য কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "আগে পারতাম স্যার, গতবছর থেকে আর পারি না।"

নতুন হেডমাস্টারমশাই চাপা গলায় হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কেন? গত বছর থেকে কি তোমার গলা ধরে আছে?"

ধমক খেয়ে দিব্যর প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। বলল, "স্টেজে উঠে সব ভুলে যাই। সবাই হাসে। তাই ঠিক করেছি, আর কখনও আবৃত্তি করব না।"

নতুন হেডমাস্টারমশাই দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "করব না মানে? মামাবাড়ির আবদার? একটি চড়ে তোমার আবদার বের করে দেব। স্কুলের কোনও ইচ্ছে, অনিচ্ছে নেই? একবার ভুলে গিয়েছিস বলে, চিরকালের মতো বাদ? অবশ্যই আবৃত্তি করবি। কাল থেকে রিহার্সালে না গেলে তোমার দুঃখ আছে। ভাল করলে যেমন হাততালি মেলে, ভুল হয়ে গেলে তেমন লোকে হাসে। সব মেনে নিতে হয়। আবার ভাল করবি, আবার হাততালি জুটবে। থামলে চলবে না। কাল যেন রিহার্সালে দেখতে পাই।"

পরের ঘটনা ঘটল স্কুলের পত্রিকা বের করবার সময়। নতুন হেডমাস্টারমশাই নোটিশ দিলেন, সবাইকে লেখা, আঁকা ছবি জমা দিতে হবে। যাদের লেখা, ছবি কোনওবার প্রকাশিত হয়নি, তাদের জমা দিতে হবে সবার আগে। যে জমা দেবে না তার জন্য কঠিন শাস্তি। লেখা, ছবি জমা দেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

নতুন হেডমাস্টারমশাইয়ের এই আচরণে আমরা যেমন বিস্মিত, তেমনই অভিভূত। এই কাণ্ড চলতে লাগল। লেখাপড়া, খেলাধুলো, গান, আবৃত্তি, পত্রিকায় লেখা কোনও কিছুতে স্যারের ধমক বাদ নেই। স্কুলের পিছিয়ে পড়া, হেরে যাওয়া, হতাশ ছেলেরা উৎসাহে টগবগ করতে লাগল। তারা অপেক্ষা করে থাকে, নতুন হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘর থেকে কখন তাদের ডাক আসবে। কখন তারা ধমক খাবে।

বছর ঘুরতে না-ঘুরতে দুঃসংবাদ এল। নতুন হেডমাস্টারমশাইকে আমাদের স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে। জরুরি অর্ডার এসেছে। ওঁকে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের মন খুব খারাপ। একজন রাগী হেডমাস্টারমশাইয়ের জন্য কেন এত মনখারাপ হচ্ছে বুঝতে পারছি না। শেষদিন আমরা ক্লাস এইটের ক'জন মিলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রণাম করলাম। নতুন হেডমাস্টারমশাই বললেন, "ভাল করে লেখাপড়া করবি।"

আমরা সবাই ঘাড় কাত করলাম। আমি মনে সাহস এনে বললাম, "স্যার, আপনার কি মনখারাপ?"

নতুন হেডমাস্টারমশাই বললেন, "একটু মন খারাপ। ও ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তোদের গোপন নামের কী খবর?"

আমরা তো হাঁ। উনি এখবর কোথা থেকে পেলেন?

"শুনেছি তোরা নাকি মাস্টারমশাইদের দারুণ সব গোপন নাম দিস। আমারও নাকি দিয়েছিস।"

আমরা কী উত্তর দেব? এর ওর মুখের দিকে তাকালাম। যতই সিদ্ধান্ত নিই, গোপন নামের খেলা বন্ধ রাখব, শেষ পর্যন্ত পারিনি। তবে এবারের নামটা আমরা সত্যি গোপন রাখতে পেরেছিলাম। এভাবে হাতেনাতে ধরা পড়ব বুঝতে পারিনি।

নতুন হেডমাস্টারমশাই বললেন, "কীরে বলবি না কী নাম? যাওয়ার আগে শুনে যাই।"

আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, "হ্যাঁ বলব। আমরা আপনার নাম রেখেছি, উৎসাহস্যার। নাম কি খারাপ হয়েছে? আপনি আমাদের এত উৎসাহ দিয়েছেন, তাই উৎসাহস্যার।"

নতুন হেডমাস্টারমশাই একটু চুপ করে রইলেন, তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,"নাম চমৎকার হয়েছে। উৎসাহস্যার।" কথা শেষ করে আবার হেসে উঠলেন।

রাগী মানুষের হাসি এত সুন্দর! আমাদের মনখারাপ অনেকটা কেটে গেল।

ছবি: শুভম দে সরকার

শহর কুবের পেডি

পাতাল শহর কুবের পেডি

এ এক আশ্চর্য শহর। উপর থেকে দেখলে শুধুই ধু ধু মরভূমি। যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য মাটির নীচে। দোকানপাট, ঘরবাড়ি, গির্জা, বিলাসবহুল মোটেল।

সুদেষ্ণা বসু

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ও কুইন্সল্যান্ড। যে আশ্চর্য পাতাল শহরের হদিশ তোমাদের দেব, তা দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উপরের দিকে বা বলতে পার উত্তরে অবস্থিত। শহরের নাম কুবের পেডি। স্টুয়ার্ট হাইওয়ে ধরে সেই শহরে যদি পৌঁছ যাও, তো দেখবে শহর কোথায়? চারিদিকে ধু ধু মরুভূমি। কেবলই শুকনো, লালমাটির উপত্যকা। অনেকটা ঠিক আমাদের বীরভূম, বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার রুক্ষ অঞ্চলের মতো। শহরের অস্তিত্ব নেই? শহর আছে, মাটির নীচে। জায়গাটা এতই গরম যে, মাটির উপর থাকাটা অসম্ভব। কিন্তু না থাকলেও তো চলবে না। কারণ, কুবের পেডি এমন এক জায়গা যেখানে মাটির নীচে রয়েছে মহা মূল্যবান উপল (ওপাল) পাথরের খনি। খনিজ এই মূল্যবান পাথরের রাজধানী বলা হয় কুবের পেডিকে। খনির কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের পরিবারের থাকার জায়গা খুঁজতে বসেই মাটির নীচে আস্ত একটা শহর গড়ে তোলা হয়েছে। ২০১১ সালের এক জনগণনা থেকে জানা গিয়েছে, কুবের পেডি শহরে ১৬৯৫ জন মানুষ বাস করেন। যাঁদের মধ্যে সাদা চামড়ার পুরুষ ৯৫৩ জন। ৭৪২ জন মহিলা। আর আছেন ২৭৫ জন স্থানীয় আদিবাসী। ভূমিপুত্র বলে এঁদের গণনার বাইরে রাখা হয়েছিল। কাজের সূত্রে এঁরা এখানে আসেননি।

শহরের গির্জা

পর্যটকদের থাকার ঘর

এই পাতাল শহরকে স্থানীয় লোকেরা বলেন ডাগ আউট বা গুহা। যদিও শহরের নামের উৎপত্তি স্থানীয় ভাষায় 'কুপা পিটি' শব্দ থেকে। যার মানে ছেলেদের জন্য জলাধার। ১৯১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কুবের পেডিতে উপল খনির সন্ধান পাওয়া যায়। সত্তরটিরও বেশি খনি রয়েছে এখানে। এখান থেকেই বিশ্বের সর্বত্র দামি এই পাথর সরবরাহ করা শুরু হয়। অন্যদিকে এই খনি ও পাতাল শহর দেখতে পর্যটকরা ছুটে আসেন দূরদূরান্ত থেকে। ক'টা দিন কাটিয়েও যেতে চান তাঁরা। এসেই ফিরে যেতে কারই বা ইচ্ছে করে! তাই তাঁদের জন্য থাকার ব্যবস্থারও দরকার ছিল। অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে এই কুবের পেডির যোগাযোগ অনেক দিনের। ১৮৫৮ সালে স্কটিশ অভিযাত্রী জন ম্যাকডোয়াল স্টুয়ার্ট প্রথম এই অঞ্চলে এসে পৌঁছন। তাঁর নাম অনুসারে অঞ্চলটি স্টুয়ার্ট রেঞ্জ ওপাল ফিল্ড নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ১৯১৫ সালে এক মজার ঘটনা অঞ্চলের ভাগ্যকেই বদলে দেয়। মাসটা ছিল জানুয়ারি। নিউ কলোরাডোর একদল খনিবিশারদ সোনার খোঁজে ঘুরতে-ঘুরতে এসে পৌঁছয় কুবের পেডি অঞ্চলে। কিন্তু সোনার খোঁজ না পেয়ে তাঁরা বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। দল বলতে জিম হ্যাচিনসন ও তাঁর চোদ্দো বছরের ছেলে উইলিয়ম, পি জে উইঙ্ক এবং এম ম্যাকেনঞ্জি। সকলে ক্লান্ত হয়ে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কয়েকজন তেষ্টা মেটাতে মাটি খুঁড়ে জলের খোঁজ করতে শুরু করেন। উইলিয়ম এগিয়ে চলে জলের খোঁজে। যেতে-যেতে হঠাৎই সে কিছু সুন্দর পাথরের টুকরো মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে নেয়। সেই পাথরের টুকরোগুলো ছিল মূল্যবান ওপাল (উপল)। যা তার বাবা একবার দেখেই চিনতে পারেন। এর ঠিক আট দিন পর হ্যাচিনসন উপল খনি আবিষ্কারের খবর সকলকে জানান। এই আবিষ্কারের পরই এখানে খনিবিশারদদের যাতায়াত শুরু হয়ে যায় ও কুবের পেডি ক্রমশ একটি জনবসতির চেহারা নিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখনও পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি দেশের মানুষ এই শহরের বাসিন্দা হয়েছেন। এঁদের সংখ্যা ষাট শতাংশের মতো। আজ এখানে সাড়ে তিন হাজার মানুষ বসবাস করেন। খনির কাজে যুক্ত থাকা ছাড়াও সেখানকার বাসিন্দাদের নিজস্ব একটা সামাজিক জীবন আছে। গল্‌ফ ও ফুটবল খেলায় তাঁরা অত্যন্ত পারদর্শী। এখানে পর্যটনও একটা বড় শিল্প। পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই আছে। প্লেনে, ট্রেনে, গাড়িতে বা বাসে করে কুবের পেডিতে পৌঁছনো যায় কাছের শহর অ্যাডিলেড থেকে। পাতাল শহরের ভিতরে যেমন দোকানপাট আছে, তেমন আছে গির্জা। থাকা-খাওয়ার জন্য মোটেল তো আছেই। মরুভূমির মধ্যে এই অদ্ভুত শহর সিনেমার লোকেশন হিসেবেও আদর্শ। ১৯৯১ সালে জার্মান চলচ্চিত্রকার উইম ওয়েনডার এখানে শুটিং করতে আসেন তাঁর 'অ্যানটিল দি এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' ছবির জন্য। আরও একটি অস্ট্রেলিয়ান ছবিরও শুটিং এখানে হয়। ছবির নাম 'ওপাল ড্রিম'। পরিচালক পিটার ক্যাটেনিও।

কুবের পেডির আবহাওয়া একেবারে মরুভূমির মতোই। গরমকালে খুব গরম, টিকে থাকা কষ্ট। আবার শীতকালে ঠান্ডা পড়ে প্রচণ্ড। বৃষ্টি তেমন হয় না। তবে একবার অতি বৃষ্টিতে বন্যা হয়েছিল কুবের পেডিতে। একটা কথা বলে রাখি, পাতাল শহর পৃথিবীতে কেবল এই একটাই আছে, এমন কিন্তু নয়। প্রায় খানদশেক পাতাল শহরের খোঁজ পাওয়া যায় বিশ্বের নানা দেশে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রয়োজনে এইসব পাতাল শহর তৈরি হয়েছিল। যার মধ্যে আজও কিছু শহর বেঁচে আছে। কিছু আবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেখানকার বাসিন্দারা অন্যত্র চলে গিয়েছেন বলে।

পাতালের দোকান

ইউ এস এস এলড্রিজ। এই যুদ্ধজাহাজটির উপরই চালানো হয়েছিল পরীক্ষা

অদৃশ্য জাহাজ

পরীক্ষার ফলাফল অবিশ্বাস্য, মুহূর্তে অদৃশ্য মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউ এস এস এলড্রিজ। ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটার শুরুও এর পরই।

জয় সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে সাংঘাতিক লড়াই চলছে মিত্রশক্তির। সেসময় একটা এক্সপেরিমেন্ট করলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। তার ফলাফল হল বিস্ময়কর এবং একই সঙ্গে ভয়ঙ্করও। যুদ্ধে ধ্বংস হচ্ছে দু'পক্ষেরই অসংখ্য বোমারু বিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন। মার্কিন সমরবিশেষজ্ঞেরা ভাবলেন, যদি এরকম কিছু আবিষ্কার করা যায়, যাতে সমুদ্রের বুকে ভেসে চলা যুদ্ধজাহাজের অস্তিত্বের কথা জানতে পারবে না শত্রুপক্ষের রেডার, কেমন হয় তা হলে? যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। শুরু হল গবেষণা। তারপর এক্সপেরিমেন্টের জন্য বেছে নেওয়া হল একটি ডেসট্রয়ার, ইউ এস এস এলড্রিজ। সময়টা ১৯৪৩-এর ২৮ অক্টোবর। ফিলাডেলফিয়ার নেভি ইয়ার্ডে চালানো হয়েছিল এই এক্সপেরিমেন্ট। ঘটেছিল ভয়াবহ সব ঘটনা। আর একারণেই হয়তো পরবর্তীকালে মার্কিন নৌসেনা

বলেছিল, এরকম কোনও পরীক্ষাই চালায়নি তারা।

সবুজ কুয়াশা

ঠিক কী হয়েছিল এই পরীক্ষার ফলাফল? ইউ এস এস এলড্রিজের চারপাশ ঘিরে ফেলা হল শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে, যাতে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের রেডার তরঙ্গকে বিপথগামী করে দেয়। রেডার কাজ না করলে, শত্রুদেশ টের পাবে না কোথায় আছে এই যুদ্ধজাহাজ। পুরো জাহাজটিকে মুড়ে দেওয়া হল টেলসা কয়েল (ইলেকট্রিক্যাল রেজোন্যান্ট ট্রান্সফরমার) দিয়ে। এই টেলসা কয়েল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক জেনারেটরের কাজ করতে লাগল। প্রচণ্ড শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রটিকে ঢেকে ফেলার পর যেই বাড়ানো হল এর শক্তি, ইউ এস এস এলড্রিজ ছাড়িয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ল একশো মিটার পর্যন্ত। ক্রমে ঝাপসা এবং অস্পষ্ট হয়ে এল ডেসট্রয়ারটি। একটা হালকা সবুজ কুয়াশা যেন মুড়ে ফেলল সেটিকে। এবার অবাক হওয়ার পালা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন উপস্থিত দর্শকরা। তাঁরা দেখলেন, হঠাৎই মানুষসমেত বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ইউ এস এস এলড্রিজ! অবাক হওয়ার বাকি ছিল তখনও, শুধু ফিলাডেলফিয়া নেভি ইয়ার্ড থেকে নয়, জাহাজটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে একেবারে ফিলাডেলফিয়া থেকেই! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া থেকে জাহাজটি পৌঁছে গিয়েছিল কয়েকশো মাইল দূরের নরফোকে। সেখান থেকে আবার সেটি ফিরে আসে ফিলাডেলফিয়ায়। মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েক মুহূর্ত।

কল্পবিজ্ঞান থেকে বাস্তবে

অকল্পনীয় সাফল্য পেল মার্কিন নৌফেনা। রেডারকে বোকা বানানো তো গেলই, বাড়তি লাভ, পুরো জাহাজটিই অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষজনের সামনে থেকে! উবে গেল একেবারে। সেই সঙ্গে টেলিপোর্টেশনের কাজটিও সারা হয়ে গেল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েকশো মাইল দূরে জাহাজটি পৌঁছে গিয়ে আবার ফিরে এল! এ তো কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মতো! সত্যিই, এই এক্সপেরিমেন্ট মনে করিয়ে দিচ্ছে এইচ জি ওয়েলসের ১৮৯৭ সালে লেখা কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস 'দি ইনভিজিবল ম্যান' এবং 'স্টার ট্রেক' টেলিভিশন সিরিজের কথা। ওয়েলসের উপন্যাসে ছিল গ্রিফিন, যে আবিষ্কার করে ফেলেছিল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার উপায়। তারপর অদৃশ্য অবস্থায় ঘটিয়েছিল নানা অদ্ভুত সব কাণ্ড। আর স্টার ট্রেকে? সেখানে তো জীবন্ত মানুষকেই আলোর বিমের আকারে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হাজার-হাজার মাইল দূরের কোনও জায়গায়, যার নাম টেলিপোর্টেশন।

বাস্তবের চেয়েও ভয়ঙ্কর

আসলে মার্কিন নৌসেনার এই পরীক্ষা, যুদ্ধজাহাজটিকে আশপাশের জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, যার ফলে সেটি তৎক্ষণাৎ ফিলাডেলফিয়া থেকে পৌঁছে গিয়েছিল নরফোকে। কিন্তু এই পরীক্ষা ক্রু-মেম্বারদের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁদের অবস্থা হয়েছিল খুব শোচনীয়। কেউ-কেউ সলিড কোনও বস্তু, যেমন কংক্রিটের দেওয়াল ভেদ করে চলে যাচ্ছিলেন দেওয়ালের ওপারে। চৌম্বক ক্ষেত্র বন্ধ করে দেওয়ার পর তাঁদের অনেকে আটকে গিয়েছিলেন জাহাজের ভিতরকার দেওয়ালে, ডেকে, জাহাজের রেলিংয়ে। কেউ-কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মস্তিষ্কবিকৃতিও দেখা গিয়েছিল কারও-কারও মধ্যে। পরবর্তীকালে কয়েকজন ক্রু-মেম্বার জাহাজটির মতোই হঠাৎ-হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতেন, আবার ফিরেও আসতেন। একজন তো আবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে ডিনার করতে-করতে হঠাৎই দেওয়াল ভেদ করে হেঁটে চলে যান। আর ফিরে আসেননি কোনওদিন। অনেকে আবার জমে যেতেন একেবারে, নড়াচড়া করতে পারতেন না, তারপর আস্তে-আস্তে কীরকম যেন অস্পষ্ট, ঝাপসা হয়ে যেতেন তাঁরা। এ এক অদ্ভুত অবস্থা! কখনও কয়েক মিনিট, আবার কখনও-বা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত চলত এরকমই। এই ভয়ানক সব ঘটনা ঘটার পর মারাও গিয়েছিলেন অনেকে।

বই থেকে রুপোলি পরদায়

রহস্যে ঘেরা এই নিরীক্ষা নিয়ে আরও জানার জন্য পড়তে হবে চার্লস বার্টলিজ় এবং উইলিয়াম মুরের লেখা 'দ্য ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট' বইটি। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে, বিভিন্ন গোপন ফাইল ঘেঁটে তাঁরা পেয়েছিলেন ওই এক্সপেরিমেন্ট সংক্রান্ত অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই একই নামে ১৯৮৪ সালে স্টুয়ার্ট রাফিল এই বই নিয়ে সিনেমাও করেন। সিনেমাটা অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেই সময়। এই বইটি ছাড়াও আগ্রহী পাঠকরা পড়তে পারেন, 'দ্য মনটাউক ফাইল: দ্য ফিনিক্স কনস্পিরেসি' অথবা 'ভ্যানিশিড: ফ্যাক্টস অর ফিকশন?' বই দু'টি।

শেষ কথা

ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট কি সত্যিই করা হয়েছিল? ঘটেছিল ওরকম আশ্চর্য সব ঘটনা? নাকি পুরোটাই মিথ্যে, যা কিনা দাবি মার্কিন নৌসেনার? এ নিয়ে এখনও বিতর্কের শেষ নেই, যেমন নেই ইউফো অর্থাৎ ফ্লাইং সসারের পৃথিবী ভ্রমণ নিয়ে মতবিরোধ। বিজ্ঞানীরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায়। তবে একথা সত্যি, এই এক্সপেরিমেন্টের সত্যতা প্রমাণিত হলে খুলে যাবে বিজ্ঞানের অনেক নতুন দিগন্ত।

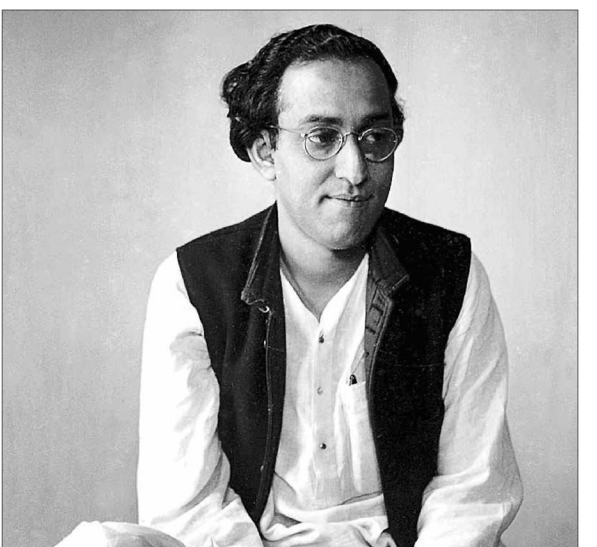

ডি-লা-গ্রান্ডি...

আগামী বছর একশোতে পা দেবেন অবিস্মরণীয় টেনিদার স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি কিশোর। তার বাড়ির সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছে লাল আর সবুজ রঙের গভীর বন্ধুতা, সেই গাছ থেকে আর-একটু দূরে চোখ চালালেই দিনাজপুরের আত্রাই নদীর নীল জলের ছুটোছুটি, তার ওপারে বাঁশ আর আখের খেতের ভিতর দিয়ে কোথায় কোন দূরে চলে গিয়েছে লালমাটির পথ... এমন পরিবেশেও কি আর ঘরে আটকে থাকা সম্ভব? বাড়ি থেকে দূরে যাওয়ার অনুমতি যদি না-ও মেলে, মনটাকে তো ছুটিয়ে দেওয়াই যায় যেখানে খুশি, কল্পনার কোনও বেড়া-নিষেধ নেই যে! অতএব ছোট ছেলেটি লিখে ফেলে কবিতা, 'ঘরের কোনে থাকতে বসে/ চায়না যে আজ মন/ হাতছানি দে' ডাকে আমায়/ মাঠ ঘাট, পথ বন।'

প্রকৃতির পাশাপাশি আর-একটি জিনিসের আকর্ষণ তখন ছেলেটিকে পেয়ে বসেছে। বই পড়া। 'খোকাখুকু',

'সন্দেশ', 'মৌচাক', 'শিশুসাথী'র গণ্ডি পেরিয়ে সে তখন ডুব দিয়েছে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'-তে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এও বই সে পেয়ে যায় পুলিশের দারোগা এবং বইপাগল বাবার লাইব্রেরি থেকে। এই পড়া থেকেই এল লেখার শখ।

ছেলেটি বাড়িতেই আবিষ্কার করে ফেলেছিল অপূর্ব সুন্দর এবং নিরুপদ্রব একটি লেখার জায়গা। বাড়ির বারান্দার একপাশে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র আর প্যাকিং বাক্সের একটি স্তূপ ছিল, সেই স্তূপের নীচে রাখা থাকত প্রচুর কাঁঠাল আর ছেলেটি সেই পাহাড়ের একেবারে চুড়োয় উঠে কেরোসিন কাঠের বাক্সে গলা ডুবিয়ে লিখে যেত কবিতা, গান, মহাকাব্য, নাটক... কী নয়। এমনকী, 'চিত্র বিচিত্র' নামে একখানি হাতে-লেখা পত্রিকাও বের করে ফেলেছিল সে, যেখানে ছেলেটিই 'একাধারে সম্পাদক, শিল্পী, লেখক, মুদ্রাকর ও পাঠক'। দুর্বার গতিতে চলতে লাগল সাহিত্যচর্চা। এসব যে নেহাতই কৈশোরক খেয়াল নয়, সেটা খুব ভালভাবেই বোঝা গেল পরে। একসময় বড় হয়ে গেল ছেলেটি, কিন্তু সেই লেখার নেশা তাকে কখনও ছেড়ে গেল না। তাই আমরাও আর বেরতে পারলাম না নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)-এর আশ্চর্য নেশা-ধরানো শব্দ-বাক্যের জাদুজাল থেকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আসল নাম তারকনাথ, গবেষণা করেছেন ছোটগল্প নিয়ে, বড়দের জন্য লিখেছেন অনেক, সেসব গল্প-উপন্যাসের প্লট, লেখার ধরন, ভাবনার ধার চমকে দিয়েছে পাঠককে, তবুও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামটি উচ্চারণ করলেই যে কিশোর-প্রৌঢ় সকলের ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে, তার দাম বড় কম নয়! এবং এই আনন্দের একমাত্র উৎস যদি কেউ ভাবে পটলডাঙার বিখ্যাত চারমূর্তি টেনিদা, প্যালা, হাবুল আর ক্যাবলা, তা হলে একটু ভুলই হবে। টেনিদারা অতুলনীয় নিঃসন্দেহে, কিন্তু যেসব কাহিনিতে এরা নেই, যেমন, 'প্যাঁচা ও পাঁচুগোপাল', পটলডাঙারই দুই খুদে বিরিঞ্চি আর নীরদের দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার 'থলে রহস্য', কিংবা 'হারপুন', 'ভজরামের প্রতিশোধ', 'দাদা হওয়ার দাম', 'অন্যমনস্ক চোর', 'পঞ্চাননের হাতি', 'অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ', সেসব পড়তে-পড়তেও যে মনটা ভরে ওঠে একেবারে খাঁটি খুশিতে। সব দুঃখ-কষ্ট এক নিমেষে কোন দূরে পাড়ি দেয়। কিংবা, 'ভাড়াটে চাই', 'বারো ভূতে', 'ভীম বধ'-এর মতো কৌতুক নাটকের দমফাটা হাসির কার্নিভালে আমরা ভেসে পড়তে রাজি হয়ে যাই যে-কোনও সময়ে। আসলে, ছোটদের মনটাকে তিনি বুঝতেন খুব ভালভাবে। ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একবার লিখেছিলেন, 'গোমরা মুখ করে মাস্টারি করি—বলতে গেলে ছেলেদের হাসি বন্ধ করাই আমার কাজ, হাসির গল্প কোত্থেকে আসবে।' নিজের ছেলেবেলায় ফিরে গিয়েই লেখক তুলে এনেছিলেন হাসির গল্পের অফুরান খনিটিকে। সব অবিশ্বাস্য গল্পই, তা সে কুকুরের টেনিদা সাজা হোক, কিংবা ইয়েতির দেখা পাওয়া বা কুট্টিমামা-ঘোড়ামামার কাণ্ডকারখানা, মনে হয় খুব সত্যি, খুব স্বাভাবিক। বললে বিশ্বাস করবে? আমরা চার মূর্তি— পটলডাঙার সেই চারজন—টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি—স্বয়ং শ্রীপ্যালারাম, চারজনেই এবার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে ফেলেছি! আর বাধা কোথায়, শুরু হয়ে যায় 'চারমূর্তির অভিযান'। নিতান্ত সহজসরলভাবে দিন কাটায় তারা, ছোট-ছোট কয়েকটি স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে। এই সুকুমার-দুনিয়াটায় ইস্কুলের ফার্স্টবয় কুশল মিত্তির (মানে আমাদের ক্যাবলা) চপ-কাটলেট রাবড়ি চমচমের স্বপ্ন দেখে, বেশি বকবক করলে এক ঘুসিতে কারও নাক নাসিকে পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে টেনিদা, প্যালার পিসতুতো ভাই ফুচুদা ধোপার খাতায় কবিতা লেখে, 'মনোদুখে খালি বোঝা টেনে ফেরে গাধা/ একখানা ধুতি-প্যান্ট পরিতে না পায়!' প্যালারামও ছড়া লেখে, 'হাতে নিয়ে তলোয়ার/ কাট্—কাট্—মার্—মার্—/ ছাড়ে ঘোর হুঙ্কার,/ বীররসে মত্ত,/ কী হল যে তারপর/ খট্—খট্—মড়্—মড়্—/ স্টেজ ভেঙে চিৎপাত/ হারাধন দত্ত।' এক ছন্দোময় নদীর মতো চলতে থাকে ওদের জীবন।

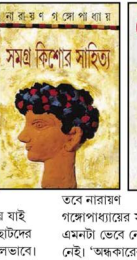

তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সব গল্পই যে হাসির, এমনটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। 'অন্ধকারের আগন্তুক' উপন্যাসের ভয়াবহ পরিবেশ, লোমশ কালো হাত কে ভুলতে পারে? কিংবা, 'সেই বইটি' গল্পের কিশোর নায়কের দুঃখ, যে একখানা বইয়ের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, অথবা 'লাল ঘোড়া' গল্পের সেই সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা?

জীবনে সব ধরনের স্বাদই তো থাকা ভাল। যেমন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবা নিজে দারোগা হওয়া সত্ত্বেও ছেলেবেলাতেই কিশোর নারায়ণ রাজনীতিতে যোগ দেন, 'প্রথম প্রথম দাদাদের কাছে নানা রকম সাহসের পরীক্ষা দেওয়া; বাজেয়াপ্ত বই লুকিয়ে সরবরাহ করা এবং নিজে পড়া'র কথা লিখেছেন তিনি। মনে রাখতে হবে, আমাদের টেনিদাও কিন্তু দারুণ সাহসী, গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন! ছোটরা যখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে, তারা সহজেই মিশে যেতে পারে ঘটনাগুলোর সঙ্গে, চরিত্ররা হয়ে ওঠে নিজেরই খুব কাছের বন্ধু। চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে সে-ও টেনিদা প্যালা হাবুল ক্যাবলার সঙ্গে আলুকাবলি কিংবা ডালমুট চিবোয়, হাঁ করে শুনে যায় ভজহরি মুখুজ্জের দুর্দান্ত সব গুলগাপ্প, সত্যি-মিথ্যের সীমারেখা ডিঙিয়ে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় অন্য এক খুশিয়াল জগতে। আর বড়রা যখন ফিরে-ফিরে পড়ে এইসব গল্প, তারা দিব্যি কোনও টাইম মেশিন ছাড়াই পৌঁছে যেতে পারে নিজেদের ফেলে আসা দিনগুলোয়। এমন রচনার যিনি স্রষ্টা, তাঁর একশো বছরে পা দেওয়ার শুরুতে তাই সমস্বরে হইহই করে বলতেই হয়, 'ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস— ইয়াক্ ইয়াক্'!

চলমান পাথরের রহস্য

ক্যালিফোর্নিয়ার এই উপত্যকার পাথরগুলো স্থির নয়, তা চলতে পারে! কিন্তু কেমন করে?

পারমিতা মুখোপাধ্যায়

আশ্চর্যে ভরা এই বিশ্বের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক রহস্য। তার মধ্যে কিছু-কিছু জিনিস বিস্ময়ের বস্তু হিসেবেই থেকে যায় অনেকটা সময় জুড়ে। ঠিক যেমন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরের 'ডেথ ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক'-এর চলমান পাথরগুলো।

বিস্ময়কর 'রেসট্র্যাক প্লেয়া'

উপত্যকার চারিদিকে ধু-ধু করছে শূন্যতা। শুধু খটখটে শক্ত মাটির উপর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে

রেসট্র্যাক প্লেয়ার চলমান পাথর

ছোট-বড় নানা মাপের অনেক পাথর। কিন্তু প্রত্যেকটা পাথরের পিছনেই একটা রাস্তার মতো তৈরি হয়ে গিয়েছে (যেমন হাই স্পিড কার রেসিং ট্র্যাকে জোরে গাড়ি চলার ফলে হয়ে যায়)। এই কারণেই জায়গাটির নাম দেওয়া হয় রেসট্র্যাক প্লেয়া। দেখে মনে হবে যেন পাথরগুলো জায়গা থেকে সরার কারণে, শক্ত মাটির উপর পাথরের নীচের অংশ ঘষা লেগে ওই 'ট্র্যাক'গুলো তৈরি হয়েছে। কয়েকটা পাথরের ট্র্যাক সমান্তরালভাবে এসেছে, আবার অনেক পাথরের ট্র্যাক একে অপরকে আড়াআড়িভাবে কেটে চলে গিয়েছে। কিন্তু চিরন্তন সত্য এটাই যে পাথর জড় বস্তু। তা নিজে থেকে সরতে পারে বললে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা হবে। আবার কোনও পশু বা মানুষ সকলের আড়ালে বসে এই পাথরগুলো সরাচ্ছে, সেই অজুহাতও ধোপে টেকে না। পাশাপাশি বড় কোনও ঝড় বা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এর জন্য দায়ী বলেও কোনও প্রমাণ মেলেনি। এই চলমান পাথরের সঙ্গে এলিয়েনদের কোনও যোগাযোগ রয়েছে, এক সময় এমনটা ভাবা হলেও, তাও প্রমাণ করা যায়নি।

রহস্য অনুসন্ধানের পথে...

১৯৪৮ সালে এই নিয়ে প্রথম রিপোর্ট তৈরি হয়। তবে পাথরগুলো কীভাবে স্থান পরিবর্তন করে তা তখনও কারও নজরে আসেনি। তারপর ২০১১ সালে এই রহস্যের উন্মোচন করতে মাঠে নামেন একদল বিজ্ঞানী। প্রথমে রেসট্র্যাক প্লেয়ার পাশে তাঁরা একটা ওয়েদার স্টেশন নির্মাণ করে সেখানকার পাথরগুলোর সঙ্গে নিজেদের ১৫টি পাথর রেখে দেন। এগুলোর মধ্যে ফুটো করে 'জি পি এস ট্র্যাকার' বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪ এবং ২০ তারিখে সেই 'টাইম ল্যাপ্স ক্যামেরা'য় ধরা পড়ে চাঞ্চল্যকর ছবি! দেখা যায়, পাথরগুলো মিনিটে প্রায় তিন থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ত অতিক্রম করছে। একটি পাথরকে ২২৪ মিটার পর্যন্ত অতিক্রম করতেও দেখা যায়। এর পর ওই বিজ্ঞানীদের দলের দুই অনুসন্ধানকারী রিচার্ড ডি নরিস এবং তাঁর ভাগনে জেম্‌স নরিস দাবি করেন যে, তাঁরা এই চলমান পাথরের পিছনের রহস্যটি উন্মোচন করে ফেলেছেন!

জি পি এস ট্র্যাকার বসানো হচ্ছে

আসল সত্যটি কী?

জায়গাটিকে রেসট্র্যাক কেন বলে তা আগেই বলেছি। কিন্তু রেসট্র্যাক প্লেয়ার বাকি রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে প্লেয়া কথাটির মধ্যে। প্লেয়া মানে হচ্ছে খটখটে মাটি, যেখানে আগে হয়তো হ্রদ বা জলাশয় ছিল। অনুসন্ধানে উঠে আসে যে, রাতে যদি এই এলাকায় বৃষ্টি হয়, তা হলে এই গোটা উপত্যকাটি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু জমা জলের গভীরতা দুই থেকে তিন ইঞ্চির বেশি হয় না। তখন তাপমাত্রা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা নেমে যায়, তা হলে এই জমা জলের উপরে বরফের আস্তরণ পড়ে যায়। এবং এর মধ্যেই আটকে পড়ে ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলো (যদিও এই রকম আবহাওয়া ও অনুকূল পরিস্থিতির সংযোগ খুব বেশি হলে তিন বছরে একবারই হয়)। তারপর যখন সূর্যের আলো ফোটে ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন বরফের আস্তরণ পাতলা হয়ে ভেঙে যায় এবং বরফের চাকের মধ্যে আটকে থাকা পাথরগুলো হালকা হওয়ার ধাক্কায় ভেজা মাটির উপর পিছলে যেতে থাকে। মোটের উপর এই হল পাথরগুলোর চলমান হয়ে ওঠার আসল রহস্য! প্রায় ৩০০ কেজি ওজনের পাথরগুলো যখন ভেজা মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, তখন ওই রেসট্র্যাকের মতো দাগগুলো সৃষ্টি হয়। সকালে তাপমাত্রা বাড়তেই সব জল শুকিয়ে পুরো উপত্যকাটি আবার খটখটে হয়ে গেলেও, পাথরগুলোর অতিক্রম করে আসা পথের দাগগুলো থেকেই যায়। যা কি না সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, এই ডোলোমাইট বা সাইনাটের ভারী পাথরগুলো কতটা পথ অতিক্রম করেছে। আর এটাই হল এই বিস্ময়ের পিছনের মূল বিজ্ঞান!

সম্পূর্ণ উপন্যাস

কঙ্কালতটের ভয়ঙ্কর

রাজেশ বসু

ছবি: *প্রত্যয়ভাস্কর জানা*

কাবুলদা জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে, ‘‘হরিণের সঙ্গে অ্যান্টিলোপের মূল পার্থক্যটা কি জানিস তো?’’

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গাড়ি এখন ভাল গতিতেই ছুটছে। দু’পাশে সাঁইসাঁই পিছলে যাচ্ছে রুক্ষ পাথুরে জমি। ছোট-বড় টিলা। পাম গাছ। বাবলা গাছ। দূরে-দূরে ছোট-বড় পাহাড়ের সারি।

দ্যুতির হাতে গোচিগানাস নেচার রিজার্ভের একটা গাইড বই। অ্যান্টিলোপের পাতাটাই দেখছিল ও। হরিণের মতোই তৃণভোজী জীব, দেখতেও প্রায় এক, কিন্তু সঠিক অর্থে হরিণ না বলে অ্যান্টিলোপ বলা হয় এদের।

"হরিণের শিং গাছের ডালের মতো, মানে শাখাপ্রশাখা যুক্ত," দ্যুতির উত্তরের অপেক্ষা না করে বলল কাবুলদা, "আর অ্যান্টিলোপের শিং সম্পূর্ণ শাখাহীন। এল্যান্ড, ডুইকার, ওয়াটারবিস্ট, স্প্রিংবক, জেমসবক, কুডু, এরা সব আসলে অ্যান্টিলোপ। কিংবা ধর আমাদের রাজস্থানের ব্ল্যাকবাক মানে কৃষ্ণসার মৃগ। আমরা হরিণ বলে দিই বটে, আদতে এরা সবই অ্যান্টিলোপ। বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাসে পরিবারও আলাদা। হরিণের পরিবার সারভিডি। অ্যান্টিলোপের বোভিডি।"

দ্যুতি বইটা বন্ধ করে বলল,"অত জানি না, তবে আরও একটা পার্থক্য আছে। অ্যান্টিলোপের শিং ফাঁপা হয়, আর হরিণের মতো ঝরে গিয়ে নতুন করে গজায় না।"

"বইয়ে লেখা আছে বুঝি," বলল কাবুলদা। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, ড্যানিয়েল, এ গাড়ির ড্রাইভার, সে বলে উঠল, "স্যার, আপনারা স্কেলিটন কোস্ট পার্কে যাবেন তো?"

কাবুলদা বলল, "এ দেশে এসে স্কেলিটন কোস্টে যাব না, তা কি হয়?"

ড্যানিয়েল বলল, "তাই বলছি স্যার। হাতি, সিংহ, গন্ডার, জেব্রা, জিরাফ এখানে কেন আফ্রিকার প্রায় সব দেশেই পাবেন।

"কিন্তু এখানে মরুভূমির উপর যে দৃশ্য দেখবেন, পৃথিবীর কোথাও নেই। কত নৌকো, জাহাজ, ট্রলার যে ওখানে এসে উধাও হয়ে গিয়েছে, কেউ ঠিক হিসেব দিতে পারবে না। এমনকী এরোপ্লেন পর্যন্ত। দেখবেন কত কঙ্কাল এখনও পড়ে আছে বালির মধ্যে। তাদের আত্মারা এখনও সব ঘুরে বেড়ায় রাতবিরেতে।"

এই স্কেলিটন কোস্ট বা কঙ্কালতটের বিষয়টা পড়ে নিয়েছে দ্যুতি। নামিবিয়ার পূর্ব সীমানা জুড়ে আটলান্টিক সমুদ্র বরাবর দেড় হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নামিব মরুভূমি। এখানেই রয়েছে স্কেলিটন কোস্ট। বছরে দশ মিলিমিটারও বৃষ্টি হয় না নামিবে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মরুভূমিও এই নামিব। তবে জাহাজ দুর্ঘটনার কারণটা হল সাংঘাতিক কুয়াশা। আসলে আটলান্টিক সমুদ্রের শীতল বেঙ্গুয়েলা জলস্রোত মরুভূমির উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে ঘন কুয়াশা তৈরি করে। এতই ঘন হয় যে, দৃশ্যমানতা থাকেই না প্রায়। বাড়াবাড়ি রকমের দুর্ঘটনার সেটাই হল কারণ। তবে সে সব অনেককাল আগের কথা। তখন তো এখনকার মতো উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। নাবিক বা পাইলটের বুঝতে অসুবিধে হত। এখন তো কঙ্কাল সেকত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র।

কাবুলদা মজা করে বলল,"ওরে বাবা, সে তো খুব ভয়ের ব্যাপার। ভূত আছে বলছ?"

ড্যানিয়েল ছেলেটি বেশ সরল। বলল,"আছে তো। তবে ভূতের কথা বললে শুধু স্কেলিটন কোস্ট কেন, ওই মরুভূমির উপরেই কোলম্যানস্কোপে যান না। ছবির মতো সাজানো। স্কুল, অফিস, বাড়ি, রেস্তরাঁ, ক্লাব সব আছে। কিন্তু একটাও জীবন্ত মুখ মিলবে না। সব ফাঁকা। কেবল বালির স্তূপে ভর্তি। রাত্তিরেলো পাঁচটা মিনিটও কাটাতে পারবেন না।"

কাবুলদা বলল, "আরে, সেগুলো তো এখানে ডায়মন্ড রাশের সময় তৈরি হয়েছিল। হিরে মিলত বালিতে। তুলতে-তুলতে এক সময় হিরেও ফুরোল, লোকজনও কেটে পড়ল সব। ধু-ধু মরুভূমিতে থাকবে কী করে! সেগুলোই সব টুরিস্ট স্পট এখন। তুমি চাইলে পাঁচ মিনিট কেন, গোটা রাতটাই না হয় কাটিয়ে আসব। গোস্ট-সাইট ক্যাম্পিং হয়ে যাবে।"

ড্যানিয়েল এবার কিছু বলল না। বেশি বয়স না ছেলেটির। বড় জোর কুড়ি-বাইশ। কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। দ্যুতিদের সঙ্গে কথাবার্তা ইংরেজিতে বললেও জার্মানও জানে ভালই। ড্রাইভিংয়ের হাতও মন্দ না। তবে এই বয়সি ছেলেদের যা হয়, গতির প্রতি খুব আকর্ষণ।

এ দেশে আবার গাড়ির স্পিড নিয়ে খুব কড়াকড়ি। শহরে ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার আর শহরের বাইরে এলাকা বুঝে আশি থেকে একশো কুড়ি। এর বেশি হলেই ট্র্যাফিক পিছনে পড়ে। লেসার গান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশ। লিমিট ভেঙেছে বুঝলেই মোটা জরিমানা। ইংরেজির সঙ্গে জার্মান বা আফ্রিকান ভাষায় সতর্কীকরণ মাঝে-মাঝেই চোখে পড়ছে। জার্মান ভাষার কারণ, একটা সময় নামিবিয়া জার্মানির উপনিবেশ ছিল। তারই প্রভাব রয়ে গিয়েছে আজও। ১৯১৫ সালে জার্মানিকে হটিয়ে দেশের দখল নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। তারপর দীর্ঘ এক লড়াইয়ের ইতিহাস। নামিবিয়ার তখন নাম হল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। অবশেষে ১৯৯০ সালে দেশ স্বাধীন হয়। নাম হয় নামিবিয়া।

নামকরণের উৎসও ওই নামিব মরুভূমি। তবে কেবল নামিব-ই নয়, পৃথিবী বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমিরও কিছুটা অংশ দেশের পূর্ব দিকে পড়ে। স্বভাবতই একসঙ্গে দু'-দুটো মরুভূমি দেখার জন্য টুরিস্টের যথেষ্ট আধিক। বড়-বড় ল্যান্ডক্রুজার আমেরিকান-ইউরোপিয়ানরা দাপিয়ে বেড়ায় দেশ জুড়ে। ট্র্যাফিক আইনে হয়তো সে কারণেই এত কড়াকড়ি।

ড্যানিয়েল অবশ্য এতক্ষণ ধরেই চালাচ্ছিল। কিছুক্ষণ হল স্পিড তুলেছে। গোচিগানাস রিজার্ভের দূরত্ব তেমন কিছু না। উইন্ডহক সিটি থেকে তিরিশ কিলোমিটার মতো। ছ' হাজার হেক্টর জুড়ে বিশাল প্রকৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র। আফ্রিকার সব জন্তুই দৃশ্যমান। এখন সবে সকাল ন'টা। সারাদিন থেকে সন্ধের সময় উইন্ডহকে ফিরে আসবে ওরা।

কাবুলদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, আচমকা কাছেই কোথাও টায়ার ফাটার আওয়াজ। যদিও ঠিক টায়ার নয় যেন। কাবুলদা সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থামাতে বলল ড্যানিয়েলকে। সবেমাত্র একটা ফুয়েল পাম্প পেরিয়েছে ওরা, শব্দটা মনে হল ওখান থেকেই এসেছে।

"নামবেন স্যার," ড্যানিয়েল একটু ইতস্তত করছে। পাম্পটা ছাড়া চারিদিকেই ধু-ধু রুক্ষ প্রান্তর। মিনিটকয়েক ধরে গাড়িটাড়িও আসছে না।

কাবুলদা বলল,"অবশ্যই। আওয়াজটা বন্দুকের গুলির। ব্যাকগিয়ার করো। হেল্প বলে কেউ চিৎকার করেছে, আমি শুনেছি। মনে হচ্ছে পাম্পের পাশের দোকানটা থেকে আওয়াজটা এসেছে।"

পাম্পের একটু তফাতে আফ্রিকান ভাষায় 'স্যাপ পাণ্ট' লেখা ফলের রসটসের একটা ছোট দোকান। নামী ব্রান্ডের সফটড্রিঙ্কের বোতলের ছবিটবিও পেস্ট করা কালো কাচের দরজায়।

গাড়ি ব্যাকগিয়ারে পিছিয়ে দোকানের সামনে থামতেই নেমে পড়ল কাবুলদা। দ্যুতিও নামতে যাচ্ছিল, বারণ করল। আওয়াজটাওয়াজ এখন আর নেই কিছু। শুনশান চারিদিক। পাম্পটাও বন্ধ দেখা যাচ্ছে। ডিসপেন্সার মেশিনের উপরে বোর্ড ঝুলছে 'ক্লোজড টুডে'।

দ্যুতির একটু ভয়-ভয় করছে। বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ করে এভাবে বন্দুকের গুলির মধ্যে খালি হাতে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা কে জানে! কাবুলদা অবশ্য এমনিভাবে যাচ্ছে যেন, পাম্প বন্ধ দেখে ঠান্ডা পানীয়ে গলা ভেজাতে চলেছে। পাম্পের থেকে বিশ গজ মতো তফাত দোকানটার। মধ্যে একটা বড় পাম গাছ। সেটার গায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো ভ্যান।

কাবুলদা একটু থামল। ড্যানিয়েলকে ইশারায় হর্ন বাজাতে বলল জোরে-জোরে।

প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ করে তিনবার হর্ন দিল ড্যানিয়েল। মিনিটখানেকের মতো কাটল। ফের হর্ন। এবার কাজ হয়েছে।

আচমকাই দুটো লোক বেরিয়ে এসেছে দোকানের পিছন থেকে। দ্যুতিদের গাড়ির দিকে এক পলক তাকিয়েই উঠে পড়ল কালো ভ্যানটায়। একরাশ লাল ধুলো উড়িয়ে শহরের উলটো দিকে চলে গেল ভ্যানটা। যে চালাচ্ছিল সে কৃষ্ণাঙ্গ। দু'হাতের কবজির উপরে মানুষের খুলির উল্কি। বেশ তাগড়াই গড়ন। কালো টি-শার্ট। অন্যজন সফেদ ত্বকের। এও বেশ গাট্টাগোট্টা। চালকের তুলনায় একটু লম্বা। এর পরনে লাল স্যান্ডো গেঞ্জি আর জিন্স।

কাবুলদা খালি বিড়বিড় করে বলল , "এক্স নাইন জিরো ওয়ান এইচ। গাড়ির নম্বরটা।"

ড্যানিয়েল গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে, বলল, "ফলো করব স্যার?"

"ছেড়ে দাও। ভিতরের অবস্থাটা দেখার দরকার আগে।"

সামনের কাচের দরজা বন্ধ দেখাই যাচ্ছে। লোক দু'জনও পিছন থেকে বেরিয়েছিল। সেদিকেই এগোল দ্যুতিরা। যেমন ভেবেছিল, সবুজ রঙের টিনের আখবোলা দরজা। কাবুলদা ঢুকল প্রথমে। কম পাওয়ারের একটা এল ই ডি ল্যাম্প জ্বলছে ভিতরে।

ভিতরে একটা রট-আয়রনের ছোট খাট। সামান্য টুকিটাকি কিছু আসবাব। একটা গ্যাস বার্নার, চা-কফি তৈরির মেশিন। কয়েকটা জামাকাপড় আর এসবের সঙ্গে ক্রেট-ক্রেট বোতল ডাঁই করা। ফ্রুট-জুসের স্টল লেখা হলেও বেশির ভাগই বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোল্ডড্রিঙ্কের বোতল। এবং এসবের মধ্যে মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছেন মাঝারি গড়নের একজন মানুষ। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন নিঃসাড়। মুখের গড়ন এ দেশীয় হলেও গায়ের রং তেমন কালো নয়। মাথার

কার্পেটের মতো ঘন ছোট-ছোট কোঁকড়া চুলে একটিও কালো নেই। পরনে হলদে একটা গেঞ্জি আর পকেটওয়ালা সবুজ হাফপ্যান্ট। বয়স সত্তরের বেশি বলেই মনে হল। চিত করে শুইয়ে দিতে দেখা গেল নিচের ঠোঁট বিচ্ছিরিভাবে ফেটে রক্তারক্তি ব্যাপার।

"বেঁচে আছে তো?" ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে।

কাবুলদা গলার কাছে ক্যারোটিড ধমনী পরীক্ষা করে বলল, "হ্যাঁ, তবে বেশ মারধর করা হয়েছে, জ্ঞান নেই।"

ইতিমধ্যে দ্যুতি সামনের ঘর, যেটা আসলে কাউন্টার, সেখানে আর-একজনকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। মেঝে ভর্তি ভাঙা কোল্ডড্রিঙ্কের বোতলের কাচের টুকরোয়। তারই মধ্যে ভারী চেহারার বয়স্ক মহিলা একজন। লম্বা বুল স্কার্ট আর চকরাবকরা ঢোলা ব্লাউজ গায়ে। গলায় প্যাঁচানো বুটিদার স্কার্ফ। সেটা অবশ্য নিজেই গলা থেকে খুলে ফেললেন।

ড্যানিয়েল আর কাবুলদাও এসে পড়েছে। মহিলা উঠে বসতে পারছেন না। হামলাকারীরা মহিলা বলে ছাড় দেয়নি। নির্মমভাবে হাত চালিয়েছে। ঠোঁট না ফাটলেও ফুলে গিয়েছে বিচ্ছিরিভাবে। বাঁ চোখের নীচে কালশিটে। একটা কথাই বললেন কোনওমতে "বায় দাছি।"

আফ্রিকান হলেও অর্থটা এখানে এসে শিখে গিয়েছে দ্যুতি। ধন্যবাদ। জার্মান হলে হয়তো শুধু 'ডাঙ্কো' বলতেন।

কাবুলদা ড্যানিয়েলকে বলল, "সময় নষ্ট করে লাভ নেই। গাড়ি যতটা পার দরজার সামনে আনো। হাসপাতাল যেতে হবে এক্ষুনি। আর হ্যাঁ, ১০১১১তে কল করে দাও তোমার সেলফোন থেকে।"

তাই করল ড্যানিয়েল। এটা এ দেশের এমারজেন্সি নম্বর। পুলিশ চলে আসবে সঙ্গে-সঙ্গে। ড্যানিয়েল লাইন পেয়েছে। ভ্যানগাড়ির নম্বরটা জানিয়ে সে মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে দিল চটপট।

মহিলা একটু বল পেয়েছেন। ক্ষীণস্বরে যা বললেন তাতে বোঝা গেল, বৃদ্ধের নাম স্যামুয়েল রুউই। এই দোকানের মালিক। সে কর্মচারী। স্যামুয়েলকে অ্যাসিস্ট করে। নাম হিলমা কানদিজি। তবে যে কাণ্ডটা ঘটল, এমন ঘটনা এ তল্লাটে আগে কখনও হয়নি।

ইতিমধ্যে ড্যানিয়েল গাড়ি নিয়ে পিছনের দরজার কাছে চলে এসেছে। বলল, "পুলিশ উইন্ডহুকের কাছেই আছে, অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে এখুনি এসে পড়বে।"

কাবুলদা অপেক্ষা করতে রাজি না। বৃদ্ধের অবস্থা সুবিধের না। সুতরাং সবাই মিলে ধরাধরি করে গাড়িতে তোলা হল তাঁকে। হিলমা হেঁটেই চললেন। চাপাচাপি করে বসেছে সবাই। দ্যুতি আর কাবুলদার কোলে বৃদ্ধ। হিলমা সামনের সিটে। গাড়ির মুখ ফের উইন্ডহুক সিটির দিকে। নেচার রিক্রাঁডেল প্রোগ্রাম আপাতত বাতিল। মনটা একটু খারাপ হল দ্যুতির। কী আর করবে, এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে কে জানত?

গাড়ি শহরে ঢোকার আগেই লাল-নীল আলো লাগানো পুলিশের সাদা গাড়ি দেখা গেল। পিছনে অ্যাম্বুলেন্সও। ১০১১১ থেকে একটা কলও এল ড্যানিয়েলের মোবাইলে।

॥ ২ ॥

দ্যুতিদের হোটেলের নামটা বেশ জম্পেশ। রুফ অফ নামিবিয়া। পাঁচতলা হোটেল। দ্যুতিদের জন্যে একটা সুইট। একদম টপ ফ্লোরে। সঙ্গে লাগোয়া ব্যালকনি। দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। পশ্চিমে চাইনিজ দূতাবাস, ঝাঁ চকচকে পাঁচতারা হিলটন হোটেল, স্যাম নুজোমা স্টেডিয়াম। এসব তো আছেই আর আছে চারদিক জুড়ে উঁচু-নিচু কত টিলা, পাহাড়, মালভূমি। আসলে উইন্ডহুক শহরের গোটাটাই এখানকার পার্বত্যভূমি খোমাস অঞ্চলে পড়ে। গড় উচ্চতা পাঁচ হাজারের ফুটের উপর। ফলে গরমটাও সেভাবে নেই। যদিও এখন নভেম্বর মাসের শেষ। দেশটা দক্ষিণ গোলার্ধে হওয়ার কারণে গ্রীষ্মের মরসুম। দুপুরের তাপমাত্রা রোজই বত্রিশ থেকে চৌত্রিশে ঘোরাফেরা করছে। কলকাতার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত বলে দ্যুতিদের তেমন অসুবিধে না হলেও আমেরিকান বা ইয়োরোপিয়ান ট্রুরিস্টের সংখ্যা বেশ কম। তাদের কাছে পারদ তিরিশ পেরনো মানে রীতিমতো গরম। তবে রাতের দিকে তাপমাত্রা কমে প্রায় অর্ধেকে নেমে যায়।

এই এখনই যেমন রাত প্রায় আটটা। সূর্য সবে ডুবেছে। এর মধ্যেই ঘরের রুম ম্যামোমিটারে তাপমাত্রা দেখাচ্ছে চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাত বাড়লে এটা আরও কমে সতের-আঠারো পর্যন্ত নেমে যায় রোজ। যাই হোক, আসল কথা হল স্যামুয়েল রুউই, মানে গতকালের সেই বৃদ্ধ হঠাৎ সংকটজনক অবস্থায়। কাটটুরা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। ভর্তির পরও বেশ কিছুক্ষণ হাসপাতালে ছিল দ্যুতিরা। পুরো কেসটার একটা বিবরণ নিয়েছিল পুলিশ। তখন কিন্তু বৃদ্ধ মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। কথা বলতে পারছিলেন না ঠিকই, কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার হবে বোঝাই যায়নি। আজ সকাল সাতটা নাগাদ হঠাৎ স্ট্রোক হয়। স্ট্রোক মানে হাঁট্যাটাক না কিন্তু, সহজ কথায় মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে বাধা অথবা হঠাৎ কোনও কারণে সেখানে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ। কাবুলদা খবরটা পায় আটটার সময়। কাটটুরা হসপিটালেই টপিক্যাল ডিজিজ়েজ়ের উপর একটা ওয়ার্কশপ ছিল আজকে। এমন সময় এই দুঃসংবাদ। তড়িঘড়ি বেরিয়েছিল দ্যুতিরা। বৃদ্ধ আই সি ইউ-তে ছিলেন। কাবুলদা ডাক্তার বলে ঢুকতে দিয়েছিল। দ্যুতি ফিমেল ওয়ার্ডে ছিলমা কানদিজির সঙ্গে বসেছিল। তিনি মোটামুটি সুস্থ। বরঞ্চে ইংরেজি বলেন। দ্যুতি কী করে, কেন এসেছে এ দেশে সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। খুব ভাল নাকি চাকালাকা রান্না করেন। সুস্থ হয়ে দ্যুতিকে কবে খাওয়াবেন বললেন। জিনিসটা না খেলেও নামিবিয়ান কুইজিনে পড়েছে ও। এ মুলুকের খাবার। ভুট্টার পরিজে মাংসের টুকরো, বিন, গাজর, আলু, পেঁয়াজ আর প্রচুর মশলা দিয়ে ঝাল-ঝাল করি ধরনের খাবার। খুব জনপ্রিয় এখানে।

দ্যুতি গতকালের ঘটনাটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। টাকাপয়সা লুঠের হলে ওরকম বেধড়ক মারামারির দরকারটা কী ? বিশেষ করে বৃদ্ধ ম্যুয়েলকে। হাত-পা মুখ বেঁধে দিলেই তো হত। তা ছাড়া বন্দুকও ছিল সঙ্গে। ব্ল্যাংক ফায়ারও করেছে। বন্দুক দেখিয়েই তো ক্যাশ লুট করা যায়। আরও গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে ক্যাশও তেমন একটা কিছু ছিল না।

হিলমা খালি বললেন, স্যামুয়েলের সঙ্গে আর নেই সে। অন্য জায়গায় কাজ নেবে। কিন্তু কেন কাজ ছেড়ে দেবেন সে কথা কিছুতেই বললেন না। শেষে 'গেট ওয়েল সুন'-এর শুভকামনা জানিয়ে চলে এসেছিল দ্যুতি। তবে ওর সন্দেহ যে অমূলক না সেটা বোঝা গেল সব কাজ সেরে হোটেলে ফিরে আসার পর।

স্যামুয়েল রুউই কাবুলদার উদ্দেশে একটা লম্বা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন। জেলডা নামে রাতের যে অ্যাটেনডিং নার্স ছিল, সে নাকি বৃদ্ধের মুলুকের বাসিন্দা। ভোরে তার ডিউটি ঢেঞ্জ হয়। অনেক রাত জেগে কষ্ট করে চিঠিটা লিখে খামে বন্দি করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

কেকের সঙ্গে নামিবিয়ান কফি সহযোগে এতক্ষণ সেই চিঠি নিয়েই বসেছিল কাবুলদা। পড়া শেষ করে প্রথম কথা বলল, "প্রস্পেকটরস কাদের বলে জানিস তো?"

"আফিকার এই মুলুকে এসেছি, প্রস্পেকটরস জানব না? সোনা, হিরে, পেট্রোলিয়াম বা মূল্যবান খনিজের খোঁজ করে বেড়ায় যারা। বেন, চিঠিতে সেরকম ইঙ্গিত আছে বুঝি?" দ্যুতির ধৈর্যে কুলোচ্ছে না। কাবুলদা সোজাসুজি কোনও কথা বলবে না।

"তার চেয়েও অনেক," বলল কাবুলদা, "জেলডাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, চিঠিটা আমাকে ঠিকমতো দিয়েছে। ঠিকমতো বলছি কেন জানিস? সে চলে যাওয়ার পর একজন ডাক্তার ঢোকেন ওঁর কেবিনে। রিলিভিং নার্স সবে এসেছে তখন। ডাক্তার তাকে কেবিনের বাইরে অপেক্ষা করতে বলেন। বেশিক্ষণ না, মিনিট পাঁচ-সাত ছিল। ঘটনা

হয়েছে সেই ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে-পরেই নাকি স্ট্রোকটা হয়।"

"মানে বলতে চাইছ সে এমন কিছু করেছিল, যাতে উত্তেজিত হয়ে এমন কাণ্ড হয়?"

"সম্ভবত। সবে একটা খবর রেকর্ডার করছিলেন। ব্রাডশেশারউঁও বিপদসীমার উপরে ছিল আনেকটা," বলল কাবুলদা,"দোষটা পুলিশের। একজনকে পাহারায় রাখা উচিত ছিল।"

"ঠিক। কিন্তু হামলার কারণ নিয়ে ওরা কেউ তেমন কিছু বলেনি। পুলিশ তাই গুরুত্বও দেয়নি অতটা," বলল দ্যুতি, "কিন্তু লোকটা বলছ কেন, যে চুকেছিল সে ডাক্তার ছিল না?"

"না, কারণ ডিউটি রোস্টার চেক করেছি। ফিক্সিশিয়ান কেউ যায়নি স্যামুয়েলের কেবিনে।"

"সি সি টিভি? সি সি টিভি ছিল না? এরা তো ভালই উন্নত।"

"সি সি টিভি আছে। তবে সব জায়গাতে নেই। তা ছাড়া সিস্টেমটাকে আরও ভাল করার জন্যে কাজ চলছে। তবে হতাশ হওয়ার কারণ, চেহারার একটা আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ, মজবুত গড়ন। হাতে শ্লাভস ছিল। কবজিতে খুলির উল্কি থাকলেও দেখা যায়নি তাই।"

"মানে, তুমি কালকের সেই দু'জনের একজন বলে মনে করছ?"

"হতেই পারে। চিঠিটা পড়বি না?"

"পড়ব না মানে, কখন থেকে বসে আছি চাতকের মতো," খামটা নিয়ে একলাফে বিছানায় উঠে পড়ল দ্যুতি। এ ঘরের মাপের কাগজে পুরো পাঁচ পাতা জুড়ে লেখা। ইংরেজিতে। হাতের লেখা একটু এঁকেবেঁকে গিয়েছে কয়েক জায়গায়। তবে বড়-বড় করে লেখাতে পড়তে অসুবিধে হয় না।

অনেকক্ষণ ধরে সময় নিয়ে দু'বার করে চিঠিটা পড়ল দ্যুতি। বৃদ্ধ যা লিখেছেন সত্যি হলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। ডক্টর রয় বলে সম্বোধন করে লিখেছেন কাবুলদাকে। জীবন বাঁচানোর জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুরু চিঠির। যদিও পরের লাইনেই লিখেছেন এ বাঁচা সাময়িক। মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না, তিনিও পারবেন না। দুঃখের বিষয় সেই মৃত্যুটা হবে অপঘাতে। এমন শঙ্কার কারণ বলতে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে গুছিয়ে শুরু করেছেন, 'আজ বিদেশি পানীয় সওদা করে বেঁচে থাকলেও একটা সময় আমরা এসবের তোয়াক্কা করতাম না। কারণ, এই ভূখণ্ড প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই ছিল। ঐতিহ্যশালী নামা জনজাতি আমরা। সেই কত যুগ ধরে সান উপজাতির সঙ্গে এ মুলুকে সুখে কাটিয়েছি আমরা। তবে সানদের মতো শিকারবৃত্তি ছিল না আমাদের। জীবজন্তু পালন করেই জীবনযাপন করতাম আমরা। আজ তোমরা খেইখেই ভাষা শুনছ, সে ভাষার সম্ভবত শেষ জীবিত উত্তরাধিকারী আমরা।

'একটা সময় কত সুন্দর ছিল আমাদের জীবন। তথাকথিত ইউরোপীয় সভ্যতা আসেনি যে। কত প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল আমাদের। আমরা তার খোঁজও রাখতাম না। কারণ, ইউরোপীয় সমাজের কাছে যা অমূল্য, আমাদের কাছে তার কোনও গুরুত্বই ছিল না। কিন্তু সভ্য দুনিয়ার মানুষের লোভের তো সীমা-পরিসীমা নেই। আমাদের বিপুল সম্পদের লোভে প্রথমে এল পর্তুগিজ় হানাদারেরা। তাদের পিছনে এল ওলন্দাজেরা। জংলি, অসভ্য শব্দগুলো তখনই প্রথম জানলাম আমরা। তাদের কাছে আমরা হলাম জংলি হটেনটট। একসময় এল জার্মানরা। আমাদের জমিটমি সব কেড়ে নিল তারা। যারা প্রতিবাদ করল, কচুকাটা হল।

'আগেই বলেছি, সম্পদশালী দেশ আমাদের। নামিব মরুভূমির বালিতে হিরে খুঁজে পেল বিদেশিরা। দলে-দলে ইউরোপীয় প্রস্পেকটর দল এসে ভিড় জমাল সেখানে। নিজেদের তাগিদেই রেলের লাইন বসাল। এখানকার লিউডারিৎস শহরের পত্তন হল। রাতারাতি কত মানুষ ধনী হয়ে গেল। ভেবো না, আমরা কিছু পেলাম। সবই সাদা ত্বকের তথাকথিত সভ্য মানুষ। আমরা তাদের সেবাদাস হয়ে রইলাম। পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে কুলি বানিয়ে রাখল আমাদের। আমরা বাবা-ঠাকুরদার চোখের সামনেই খাড়ি-বড় হিরের কোম্পানি মাথা তুলল এ দেশে। শুনছি মাত্র ছ'সাত বছরের মধ্যে হাজার কিলোগ্রাম হিরে কেবল লিউডারিৎস শহর থেকেই তোলা হয়েছিল।

'শেষে আমরা চলে যাই আরও দক্ষিণে। অরেঞ্জ নদীর কাছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সীমানায়। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। সেখানেও হিরে আবিষ্কার করে ধন-শিকারিরা। আবার সেই একই তাণ্ডব। তবে হ্যাঁ, অস্বীকার করব না, সব বিদেশিই লোভী অত্যাচারী না। আমাদের হয়ে লড়ার জন্য, আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও অনেক শ্বেতাঙ্গ এসে ভিড় করল। এমনকী, খোদ জার্মানরাও। কার্ল হুগো হান, ফ্রানৎস হেনরিক ক্লাইন্সমিডট সরাসরি আমাদের হয়ে লড়াইয়ে নামল। আমরা পাশে পেলাম ফিনিশ মিশনারি, লন্ডন মিশনারি, রাইনিশ মিশনারিদের মতো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে।

'যদিও স্বাধীন হতে আমাদের অনেক সময় লেগে গেল। কেটে গেল কত-কত বছর। কত লড়াই। রক্তক্ষয়। যাই হোক, এটুকু ইতিহাস বললাম, কারণ তুমি ভারত থেকে এসেছ। দুশো বছর ধরে তোমরাও বিদেশিদের দাসত্ব করেছ অনেক। পরাধীন থাকার যন্ত্রণাটা তোমরা হয়তো কিছুটা বুঝবে।

'আসল কথায় আসি এবার। এই দীর্ঘ সময়ে আমি তো বটেই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কত রকম জীবিকা করে সংসার চালিয়েছে। এক দিকে লড়াই যেমন করেছে বিদেশিদের সঙ্গে, তেমনি হাতে হাত মিলিয়ে তাদের মতোই ভাগ্যান্বেষণে ছুটে বেড়িয়েছে জঙ্গল থেকে কালাহারি মরুভূমিতে।

'এরকমই একজন মানুষ ছিলেন আমার কাকা, গ্যারিয়েল। আমাদেরই দেশের ধনসম্পদ সাদা চামড়ারা দখল করে রাজা-উজির বনে যাচ্ছে, এটা পছন্দ ছিল না তাঁর। অবশ্য এই বোধটা তাঁর মগজে ঢোকায় ব্রিটিশ আর্মির এক গুপ্তচর। আলেকজান্ডার স্কট ছিল তার নাম। যদিও সে জার্মানদের কাছে ধরা পড়ে যায়। কালাহারি মরুভূমি পেরিয়ে বেচুয়ানাল্যান্ড মানে, আজকের বোৎসোয়ানায় পালিয়ে গিয়েছিল সে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির পতন হলে সে আবার ফিরে আসে। কালাহারির এক প্রান্তে সে নাকি এক অপার ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু একলা সেখানে যাওয়ার মানসিক বা শারীরিক বল কোনওটাই নেই তার তখন। বয়সও প্রায় ষাটের কাছাকাছি। এই সময়ই কাকার সঙ্গে পরিচয় হয় তার। কাকা তখন খনিবিদ্যা নিয়ে লেখাপড়া করছেন। স্কটের কথা শোনামাত্র তিনি রাজি। কাজ ছেড়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়েন ট্রেক্সারহান্টে।

'কিন্তু মাসের পর-মাস ঘুরেও সে জায়গা আর খুঁজে পায় না স্কট। তিন-তিনটি দেশ বিস্তৃত সাড়ে তিন লক্ষ বর্গমাইল মরুভূমিতে তুচ্ছ একটা করোটি আকারের গুহা খুঁজে বের করা তো সহজ ব্যাপার না। হ্যাঁ, কচ্ছপের মতো দেখতে একটা পাহাড়ের নীচে লুকনো খুলি গুহাতেই নাকি ছিল সেই সাতরাজার ধন। আসলে স্কট যখন সেখানে প্রস্তরীভূত নমুনা পায়, তখন তার কোনও ধারণা ছিল না। পরে বইপত্র, কাগজটাগজ পড়ে সে বুঝতে পারে কী ধন সে হারিয়েছে। কোনও রকম ম্যাপ সে তৈরি করেনি। কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে অনন্ত মরুভূমিতে বৃথাই কাকারা ঘুরে বেড়ায় দিনের পর-দিন। এর মধ্যে বিষাক্ত সাপের কামড়ে স্কট মারা যায় অকস্মাৎ। কাকা ফিরে আসেন। তবে মনোবল তখনও তাঁর অটুট। কয়েকটি বছরের বিরতির পর ফের অভিযান। এবারের দল ভারী। আয়োজনও বেশি। মালবাহক বাদে মূল সদস্য তিনজন। কাকা। আমি নিজে। আর কাকার ঘনিষ্ঠ এক জার্মান বন্ধু। রুপার্ট কোহেন। আমার চেয়ে বছরপাঁচেকের ছোট। তিরিশের নীচে বয়স। বেশ মিশুকে ছেলে। ভূতত্ত্বের গবেষক।

'কিন্তু এবারেও বিধি বাম। ঘুরেই চলেছি খালি। মালবাহকেরা

সরে পড়ল সব। অবশেষে ফেরার পথ ধরেছি, এমন সময় আমাদেরই মতো এক প্রস্পেকটরের সঙ্গে দেখা। জরজিওস পাপাদস। ভূবিজ্ঞানী এবং ভূপর্যটকও নাকি। কিন্তু সে অত্যন্ত অসুস্থ। মৃত্যুপথগামীও বলা যায়।

'কোনওমতে সে যা বলল তাতে আমাদের হৃৎপিণ্ড ফের গলার কাছে। যে কঙ্কপপাহাড় বা খুলিগুহার খোঁজ করছি আমরা, তা সে পেয়েছে এবং সেখানে যে দামি আকরিকের খনি আছে তাও সে বুঝেছে। শুনে তো আমরা ভীষণ উত্তেজিত। বললাম, 'সঙ্গে চলো।' সে মাথা নাড়ল। ওইসব তুচ্ছ সম্পদে তার বিন্দুমাত্র মোহ নেই। তার চেয়েও বড় ধন নাকি সে পেয়েছে। আমরা কী নির্বোধ! চেপে ধরলাম তাকে, সে ধনের ও সন্ধান দিতে হবে। কেমন কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল তার শ্রান্ত মলিন ঠোঁদুটোয়।

'থাক সে কথা। চিঠি সংক্ষিপ্ত করি। পাপাদস সে রাত্রেই মারা যায়। স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়েছিল সে। স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছিল ক'দিন আগে। সেও তার অনুগামী হল। মৃত্যুর আগে পাপাদস তার স্ত্রীর একটি ডায়েরি দেয় আমাদের। সেটি মূলত তাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত। কঙ্কপপাহাড়ের অমূল্য সম্পদের কথা বিশেষ কিছু নেই, তবে হ্যাঁ, পাপাদস হাতে এঁকে একটি ম্যাপ দিয়েছিল আমাদের। কঙ্কপপাহাড়ের খুলিগুহায় পৌঁছনোর জন্য বেশ ডিটেল ম্যাপ। রুপার্ট কার্টোগ্রাফি জানত। সে হিসেব করে বলল, ''পাপাদস যদি সত্যি বলে থাকে তবে সে পাহাড় খুব দূরে নেই।''

'সুতরাং পাপাদসকে সমাধিস্থ করে নতুন উদ্যমে ফের চলা শুরু হল আমাদের। কিন্তু ওবার আমাদের রসদে টান পড়ল। তা ছাড়া কালাহারির আগুন গরমে জ্বলেপুড়ে প্রত্যেকেই আমরা জীবন্ত কঙ্কাল তখন। বাধ্য হই ফিরে আসতে। কপাদের ফের এমন, দেশের গোবাবিস টাউনে যেদিন পৌঁছই, সেদিন সন্ধেতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কাকা মারা যান হঠাৎ।

'সত্যি বলতে তখন থেকেই মামার কেমন ভয় ধরে গেল ওই ধনের প্রতি। অভিশপ্ত ওই ধন। কেড়ে নিচ্ছে একের পর-এক প্রাণ। পাপাদস বলেছিল সে ধন আসলে স্বর্গের দেবতার। তবে রক্ষী শূন্য নয়। স্বর্গেরই এক দেবতা তার পাহারাদার। তাকে টপকে ধন পর্যন্ত পৌঁছনো অসম্ভব বা হলেও ভীষণ রকম কঠিন। এসব বিচিত্র কথা হয়তো তার প্রলাপ। মৃত্যু আসন্ন তখন তার। অতএব ভেবেচিন্তে আমিও হাল ছেড়ে দিই। মরীচিকার পিছনে কত আর ছুটব! পাপাদসের ম্যাপটা দিয়ে দিই রুপার্টকে। তার যা মন চায় করুক। কিন্তু তারও দেখলাম আগ্রহ নেই। ম্যাপ না নিয়ে জার্মানি ফিরে যায় সে।

'সে সময়ে ভয়ানক অশান্তি এখানেও। স্বাধীনতার জন্যে লড়ছি আমরা। আমিও পরিবারকে গ্রামে রেখে কাজের জন্যে উইন্ডহুক শহরে এসে থাকতে শুরু করি। দেবতার ধন তখন আর মগজে নেই। সত্যি বলতে সে ধনের কথা মন থেকে উধাওই হয়ে গিয়েছিল একেবারে। মাসতিনেক আগে অ্যাডলার কিটনার নামে বছরতিরিশের এক জার্মান যুবক আমার দোকানে এসে খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, আমি রুপার্ট কোহেনকে চিনি কিনা। স্বভাবতই আমি হ্যাঁ তো বলিই, রুপার্ট কেমন আছে তাও জিজ্ঞেস করি। সে জানায় রুপার্ট মারা গিয়েছে গত বছর। এবং সে ছিল তার প্রাইভেট সেক্রেটারি। ভূগোল নিয়ে সে লেখাপড়া করেছে। এখন সে খনি বিশেষজ্ঞ। আমাদের কালাহারি অভিযানের কথা সে রুপার্টের মুখে শুনেছে। এখন সে নিজেই একবার অভিযানটা করতে চায়। এজন্য সেই ম্যাপটা তার চাই। কারণ, রুপার্ট নাকি সেটা হারিয়ে ফেলেছে। তার আচরণেই এমন কিছু ছিল আমার ঠিক বিশ্বাস হল না। তা ছাড়া রুপার্ট তো ম্যাপ নেয়ইনি। ছেলেটি বেমালুম মিথ্যে বলেছে। মনে-মনে ভাবলাম এর কাছে রুপার্টকে চিনি বলাটা ঠিক হয়নি। ওর কাছে জানতে চাইলাম, ''আমার খোঁজ ও পেল কী করে?''

সে রুক্ষ গলায় উত্তর দিল, খোঁজ সে পেয়েছে এটাই বড় কথা। কীভাবে পেয়েছে জেনে আমার কী লাভ? যেটা চাইছে সেটা দিতে বলল।

'উত্তরে বলেছিলাম, সে ম্যাপ আমি হারিয়ে ফেলেছি কবেই। বলা বাহুল্য সে বিশ্বাস করেনি। খোঁজার সময় দিয়ে ফিরে গেল। ফিরে এল ঠিক সাতদিন পর। এটা সত্যি নয় যে, ম্যাপ আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি আসলে ওটা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। তাও ভেবেছিলাম যা তোমাকে লিখলাম, সেটাই না হয় ওকে বলে দেব। কিন্তু কেন বললাম না জান? সেও এক কাকতালীয় ঘটনা।

'ইঙ্গরাজল থেকে একদল ট্রুরিস্ট এসেছিল আমার দোকানে গলা ভেজাতে। অ্যাডলার যেদিন হুমকি দিয়ে যায় ঠিক তার দু'দিন পর। বেশ কিছুক্ষণ আমার দোকানে ছিল তারা। আলাপপরিচাটাও হয় সেইজন্য। কথায়-কথায় তোমারই বয়সি একটি তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়। সে বলে তার নাম নামা। নামা লেমনিখ। ইহুদিতে নামার অর্থ মনোরম। তার এক আত্মীয় একটা সময় এ দেশে ছিল। আমাদের নামা জনজাতির একজনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। রুপার্ট কোহেন তার নাম। বোঝো কাণ্ড!

'শুনেই তো আমি আত্মহারা। নিজের পরিচয় দিলাম। দেখা গেল আমার অনুমান সঠিক। এই তরুণী রুপার্টের এক আত্মীয়ের কন্যা। কিন্তু, সে যা জানাল, তাতে আমি হতবাক। রুপার্ট নাকি বছরদুয়েক আগেই ঘরছাড়া হয়ে ভবঘুরের জীবন নিয়েছে। তোমাদের হিমালয়ের পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। আর ওই অ্যাডলার ছোকরা তার সেক্রেটারির কাজ করত। কিন্তু রুপার্টের সই জালিয়াতি করে সে ফেঁসে যায়। কয়েদবাস কপালে ছিল তার। রুপার্ট তাকে ক্ষমা করে। এর কিছুদিন পরেই নাকি রুপার্ট বিবাগী হয়। শুনে তখনই ঠিক করি, যে করেই হোক অ্যাডলারকে ঘাড় থেকে নামাতে হবে।

'কিন্তু বুঝতেই পেরেছ, তা আমি পারিনি। সে হামলা চালাতেই থাকে। ভাবছি পুলিশে খবর দেব কিনা, এর মধ্যে গতকালের হামলা। কাল যারা এসেছিল তাদের আমি চিনিও না। অ্যাডলার যে দল ভারী করছে, এটাই বুঝতে পারছি খালি। আমার মুখের কথা বিশ্বাস করতে কিছুতেই রাজি না এরা। আমি জানি, ফের আসবে ওরা। অত্যাচার করবে। বুঝতে পারছি ওদের হাতেই নিয়তি আমার। বিয়ে-থা করিনি। পঁচাত্তরে পা দিয়েছি। চেনা পরিজনও পরপারে সব। মৃত্যুকে ভয় করি না। কেবল এই গোপন কথাটুকু কাউকে বলে যেতে চাই। তোমরা উত্তম মানুষ। বিদেশবিভূঁইয়ে এসে বিপদকে পরোয়া না করে মানুষের জীবন বাঁচায় যারা, তাদের হৃদয়ে বিষ নেই। সত্যিই মানুষ তারা। প্রকৃত মানুষ। যদি কখনও উদ্ধার করতে পার সে ধন, আশা করি আমাদের দেশকে বঞ্চিত করবে না। আর-একটা কথা, বিপদ আছে মনে করলে এ চিঠি ছিঁড়েও ফেলতে পার। সাবধানে থেকো বন্ধু। আমেন!'

''বাপরে। এ তো বেশ সিনেমাটিনেমার মতো ব্যাপার! কী করবে তুমি?'' চিঠিটা শেষ করে বলল দ্যুতি। উত্তেজনায় নেমে পড়েছে বিছানা থেকে।

''কী আর করব, আমরা তো আর প্রস্পেকটর না। যে কাজে এসেছি সেটাই করব। আর ফাঁক পেলেই আফ্রিকার জন্তু-জানোয়ারের ফোটো তুলব। গোচিগানাস যেতে পারলি না বলে দুঃখ করিস না। কাল যেখানে যাচ্ছি সেখানে আরও অনেক কিছু পাবি। সাজানো নেচার পার্ক না, আসলি ওয়াইল্ড আফ্রিকা।''

যেখানে যাচ্ছি মানে, ওতজিয়ারোঙ্গো বলে একটা শহর। উইন্ডহুক থেকে আড়াইশো কিলোমিটার উত্তরে। আগামিকালই যাওয়ার কথা।

এমন সময় মোবাইলে রিং টোন। মায়ের কল কলকাতা থেকে। টাইম দেখল দ্যুতি। ন'টা। মানে কলকাতায় রাত সাড়ে-বারোটা। সাড়ে তিনঘণ্টার পার্থক্য ভারতের সঙ্গে এ দেশের।

কাবুলদারও একটা কল এসেছে। দ্যুতি ব্যালকনিতে চলে গেল

ওর সেলফোন নিয়ে। মিনিটিতিন-চার পর ফিরল, যখন কাবুলদা বলল, "ভিক্টিরে আসছে। পিটার আগুটাকে মনে আছে তো?"

"খুব মনে আছে। এয়ারপোর্টে আমাদের রিসিভ করতে এসেছিলেন না?"

"ঠিক, রিসেপশন থেকে কল করেছিলেন আগুটা। বললেন, কাকে নাকি সঙ্গে আনছেন।"

বলতে-বলতেই দরজায় বেল। কাবুলদা দরজা খুলে ঠিকমতো সরে দাঁড়ানোর সময় পেল না। ঝড়ের মতো ভিতরে ঢুকল দশাসই চেহারার এক লালমুখো সাহেব। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। গোঁফ, দাড়ি ভরা মুখ। মাথায় কাঁকড়া এলোমেলো চুল। লোকটি ঢুকেই কাবুলদার দিকে ডানহাতের তর্জনীটা বন্দুকের মতো উঁচিয়ে হুংকার ছাড়ল, "ইউ আর অ্যাপ্রাঞ্চিভ রয়?"

॥ ৩ ॥

এবারও সেই সেভেনসিটার ঝকঝকে এস ইউ ভি আর ইয়াংস্টার ড্যানিয়েল। তবে এবার কেবল দ্যুতি আর কাবুলদা নয়, সঙ্গে এলমো কাটিজপো নামে একজন রয়েছেন। বছরপঞ্চাশেক বয়স। নামিবিয়ার বনদফতরের একজন কর্তাব্যক্তি। কাবুলদার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়েও কাজটাজ করেন। দ্যুতিদের সঙ্গে ইনিও ওতজিয়ারোঙ্গোয় যাবেন।

ভদ্রলোককে দেখলেই ভয় করে। যেমন ছ'ফিটের উপর লম্বা, তেমনি পেল্লাই বুকের ছাতি। মিল সিটে দ্যুতির পাশে বসেছেন ভদ্রলোক। কাবুলদা সামনে, ড্যানিয়েলের পাশে।

সাড়ে সাতটায় স্টার্ট করার কথা ছিল। কাবুলদা পিছিয়ে দিল। ন্যামুয়েল রুউইয়ের খোঁজ নিতে হাসপাতালে গেল। বৃদ্ধ এখনও আই সি ইউ-তে। জীবনের আশঙ্কা নেই। তবে শরীরের একটা দিক প্যারালিসিস হয়ে গিয়েছে। কাবুলদা বলল, ''ঠিকমতো ফিজিওথেরাপি করাতে পারলে ঠিক হয়ে যাবেন মনে হয়। কথাও বলতে পারবেন।'' ওদিকে গতকাল রাতেই হিলমাকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। ওছাড়াও টুকিটাকি আরও কীসব কাজ ছিল।

এইসব করে বেরতে-বেরতে সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। ড্যানিয়েল হয়তো সেই জন্যেই কালকের চেয়েও পিডেল চালাচ্ছে। রাস্তাও অনেক বেশি। মাঝে দুপুরের খাওয়া আছে। সন্ধে হয়ে যাবে পৌঁছতে।

"তোমরা নাকি একটা গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছ শুনলাম?" একটা ফুয়েল পাম্পের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা প্রশ্নটা করলেন এলমোসাহেব।

"ইজ় ইট টু?" এলমোসাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন। কাবুলদা কি শুনেছে? বুঝতে পারছে না দ্যুতি। চোখদুটো তো মনে হচ্ছে উইন্ডস্ক্রিনে সেঁটে আছে।

"ঠিক বুঝলাম না স্যার? এরকম কিছু আমি জানি না তো,'' একটু ভেবে বলল দ্যুতি।

"মিথ্যে বোলো না। ন্যামুয়েল আর হিলমাকে তোমরা উদ্ধার করেছিলে না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাঁরা কোনও গুপ্তধনের কথা তো বলেননি।"

"হোটেলে টেলিভিশন সেট নেই? নাকি খোলেইনি?" কৌতুকের স্বরে বললেন এলমো কাটিজপো।

"হিলমা নামে যে মহিলা ছিলেন ন্যামুয়েলের সঙ্গে, তিনি তো কাল সন্ধেবেলা রিলিজ পেয়ে গিয়েছেন হসপিটাল থেকে। আজ সকালে প্রাইভেট একটা চ্যানেলে তাঁকে উল্লেখ করে এরকম একটা খবর দেখানো হয়েছে। হামলাটা হয় কী একটা গুপ্তধনের সন্ধান বলে দেওয়ার জন্যে। বুড়ো ন্যামুয়েল বহু বছর ধরে জেনেও চেপেছিলেন। মে বি, তিনি নিজে খুঁজে পাননি বলে। তবে ওঁর কিন্তু সরকারকে বলা উচিত ছিল।"

"জানি না। আমরা এমন কিছু শুনিনি। আর ওঁকে যখন উদ্ধার করি, তখন উনি পুরো অজ্ঞান। আমাদের সামনে জ্ঞানও ফেরেনি। আমাদের বলবেন কীভাবে?"

"বলেননি তো। চিঠিতে লিখে জানিয়েছেন। একটা ম্যাপও এঁকে দিয়েছেন," দ্যুতির চোখে চোখ রেখে বললেন এলমো কাটিজপো।

এবার কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না দ্যুতি।

"মিস্টার কাটিজপো," কাবুলদা মাথাটা একটু পিছনে হেলিয়ে বলে উঠল, মানে কানদুটো সজাগ আছে, "আপনি যা ভাবছেন, একেবারে ভুল। গুপ্তধনের কোনও ম্যাপটাপ তিনি আমাদের দেননি।"

এলমোসাহেব কিন্তু নিমমুখে বললেন, "তাই হলেই ভাল। নয়তো অযথা বিপদে জড়িয়ে পড়বে। অত দূর থেকে একটা সেবার কাজে এসেছ, তোমাদের ক্ষতি হোক চাই না আমি।"

মুডটা একটু তেতো হয়ে গেল দ্যুতির। ভদ্রলোক বিশ্বাস করেননি ওদের। মুখটা গম্ভীর। কিন্তু, ব্যাপারটা ঘটছে কী? সবাই হঠাৎ গুপ্তধন নিয়ে পড়ল কেন? ইনি নিজে সরকারি কর্তা। পদাধিকার বলে খবর পেতেও পারেন। তা ছাড়া টিভিতেও নাকি বলেছে। কিন্তু ম্যাপের প্রসঙ্গটা জুড়ে গেল কী করে? গতকাল পিটার আগুটা যে লোকটিকে দ্যুতিদের রুমে নিয়ে এলেন, সেও একই কথা বলছিল। ফ্রেডেরিক নাম ছিল লোকটার। প্রশ্ন হচ্ছে, সে গতকালই জানল কীভাবে? হিলমা যা বলেছেন তা সবেমাত্র আজ সকালে প্রচার হয়েছে। তা হলে কি ভিতরে-ভিতরে এমন কেউ আছে, যে খবরগুলো লিক করছে? হতেই হবে।

গতকাল পিটার আগুটাও সে রকম ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রেডেরিক লোকটা মিনিটদশেক ছিল ওদের ঘরে। সেটুকু সময়ের মধ্যে যা ব্যবহার করল, ফিল্মের ভিলেনরাও লজ্জা পাবে। যে অসভ্যতার সঙ্গে কথা শুরু করেছিল!

কাবুলদা ''হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার অপরাজিত রায়,'' বলার পর লোকটা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কী, "তুমি আমার পরিবারের একটা সম্পত্তি জোর করে নিজের কাছে রেখেছ!"

"বুঝতে পারলাম না,'' কাবুলদা বলেছিল ভুরু কুঁচকে।

"ন্যাকামি করে লাভ নেই। ন্যামুয়েলবুড়ো ওটা তোমাকে কাল দিয়ে গিয়েছে। সাক্ষী আছে, সে মিথ্যে বলবে না। ভালয়-ভালয় ম্যাপটা হ্যান্ডওভার করো, নয়তো বিপদে পড়বে।"

শুনেই রাগ যেমন হচ্ছিল দ্যুতির, ভয়ও করছিল যথেষ্ট। কথা বলতে-বলতে বাঁ-হাতটা কেবলই জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে ঢোকাচ্ছিল লোকটা। পিস্তলটিস্তল এনেছিল হয়তো। পিটার আগুটা সামাল দেন, "আমি বলছি বুঝিয়ে, ফ্রেডরিকের একটা পারিবারিক ইতিহাস আছে," বলে আগুটা যা বলেছিলেন তাও যেন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার ঠিক বিশ্বাসও হয় না।

আলেকজান্ডার স্কট মানে যে ইংরেজ সৈনোর কথা চিঠিতে লেখা ছিল, এই ফ্রেডরিক নাকি তাঁরই বংশধর। ফ্রেডরিক কেনেথ স্কট। আলেকজান্ডারের খোঁজে তাঁর ছেলে অ্যালান ব্যক্তিগত প্লেন নিয়ে একাই আসেন নামিবিয়ায়। তিনিও ছিলেন সৈনিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করে মেডেলটেডেলও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নামিব মরুভূমির স্কেলিটন কোস্টের কুখ্যাত কুয়াশায় তাঁর প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে। ফ্রেডরিক স্কটের দাবি তিনি অ্যালানের নাতি। তাঁর পূর্বপুরুষের আবিষ্কৃত ধন তিনিই উদ্ধার করবেন। এটা তাঁর ফ্যামিলি রাইট।

"সব বুঝলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। ন্যামুয়েল রুউইয়ের সঙ্গে আমাদের কোনও রকম কথা হয়নি। তেমন সুযোগও ছিল না। তবে হ্যাঁ, উনি আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন। পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলি। চিঠিতে গুপ্তধনের কোনও ম্যাপটাপ ছিল না,''

বলেছিল কাবুলদা।

কথাগুলো শুনে আধমিনিট কাবুলদার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ফ্রেডরিক। হাতটাও তক্ষণ্ড জ্যাকেটের পকেটে স্থির ছিল। বুকটা সে সময় বেশ ধ্বকধক করছিল দ্যুতির। শেষ পর্যন্ত ভালমন্দ কিছু তেমন হয়নি।

"ইউ উইল বি পেরিং ফর দিস?" বলে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

"সরি অপরাজিত," কাবুলদার ডান হাতটা ধরে বলেছিলেন পিটার আগুস্টা, "জানি না, কী সোর্সে তোমার নামটা ও পেল, ছেলেটা আসলে ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার। ভাল হাত। তবে বদমেজাজি খুব। স্থায়ী কোনও কাজ পায় না বদমেজাজের জন্যে। আমাদের এন জি ও-তে ঢুকবে বলে ক'দিন ধরে ঘোরাঘুরি করছিল। আজ বিকেলে হঠাৎ এসে বলল, তুমি নাকি ওর কী একটা পারিবারিক সম্পত্তি আটকে রেখেছ। বুঝলাম সব ফালতু কথা। তাও নিয়ে এসেছিলাম ভুল ভাঙাতে। জানি না এতে উলটো ফল হল কিনা।"

কাবুলদা উত্তর দেয়নি। কাঁধটা ঝাঁকিয়ে হেসেছিল একটু।

পিটার আগুস্টা বলেছিলেন, "তুমি চাইলে দেশে ফিরে যেতে পার। আমি কর্তাদের বলতে পারি। অকারণ কেউ তোমাকে ট্রাবল দিক চাই না আমি। তা ছাড়া এবার তোমার সঙ্গে তোমার বোন রয়েছে। বেড়ানোর মেজাজে আছ।"

দ্যুতি জানে কাবুলদা এসবে ভয় পায় না। কিন্তু একদম অবাক করে দিয়ে বলেছিল, "ওতজিয়ারোজেস ঘুরে আসি। তারপর ঠিক করব। এটা ঠিক, যা নেই তা নিয়ে ঝামেলা নেওয়ার মানে হয় না। ভাবছি ফিরেই যাব।"

শুনেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দ্যুতির। সত্যি-সত্যি ফিরে না যায় কাবুলদা। এখনও পাক্কা দু'সপ্তাহ বাকি। সেভাবে দেখাও হয়নি কিছুই। কলকাতা থেকে ছ'হাজার মাইল এমনি-এমনি উড়ে এসেছে বুঝি? তাও চলে যাবে ছুটকো কে একজনের ফালতু হুমকিতে! দু'-চারটে অ্যাডভেঞ্চার ওরা নিজেরাও কি করেনি? এর চেয়েও অনেক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছিল ওরা। কাবুলদা নিজের উৎসাহেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেগুলোয়।

আসলে কাবুলদা একটু অন্য রকম। পিসতুতো দাদা ওর। বাঁশবেড়িয়ায় বাড়ি হলেও ডাক্তারি পড়ার সময় থেকে দ্যুতিদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে থাকে। দ্যুতির চেয়ে প্রায় দশ বছরের তফাত। এম বি বি এস পাস করে ডাক্তার হয় বেশ অল্পবয়সে। কিন্তু সবাই যা করে, এম ডি মানে, পোস্টগ্র্যাজুয়েশনের জন্য উঠে-পড়ে লাগল না। একটা নার্সিংহোমে পার্টটাইমের চাকরি নিয়ে নিজের শখ মেটাতে খুব মেতে গেল দিবি। শখ মানে, ছোট থেকে ডিটেকটিভ গল্পের পোকা ছিল। হয়তো সে কারণে নিজেরই গোয়েন্দা হওয়ার ইচ্ছে মাথায় চেপে বসে। পাশে পেয়ে গেল দ্যুতিকে। দু'জনেরই একই পছন্দ-অপছন্দ। সঙ্গে জুটে গেল হিতৈষীও। দ্যুতির প্রাণের বন্ধু, ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাসমেটো।

তিন মক্কেল জমে গিয়েছিল দিবি। একটু নামডাক হচ্ছে, এমন সময় কাবুলদা হঠাৎ এম ডি-তে অ্যাডমিশন নিয়ে বসল। একটি এন জি ও সংস্থার হয়ে রুটিন্‌গিরি দেখা শুরু করে দিল। গোয়েন্দাগিরি, রহস্যাভিযান সব বন্ধ। একদিকে অবশ্য ভালই হয়েছিল। দ্যুতিরাও তখন ব্যস্ত বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ে।

নামিবিয়ায় আসাটাও আকস্মিক। মাসছয়েক আগে কাবুলদার এম ডি শেষ হতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি পুরো তিন মাসের জন্য উইন্ডহুক পাঠিয়েছিল ওকে। পরীক্ষার জন্য যেতে পারেনি দ্যুতি। খুব মন খারাপ হয়েছিল। সেই সুযোগই ফিরে এল সেপ্টেম্বর মাসে। তবে এবার তিন মাস নয়, তিন সপ্তাহের জন্যে কাবুলদাকে ফের যেতে হবে আফ্রিকায়। পেডিয়াট্রিক মানে, কচিকাঁচাদের হাইজিন এবং টিপিক্যাল দেশের রোগের উপর একটা ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে তারা।

কাবুলদা এসে প্রথম খবরটা দিতে দ্যুতির গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল উত্তেজনায়। আসলে আফ্রিকা নামটা শুনলেই গা ছমছম করে ওঠে কেমন। যেমন বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি, গাছপালা, তেমনি সেখানকার মানুষজন এবং জীবজন্তু। হাতি, গন্ডার, সিংহ, চিতা, হায়েনা, নেকড়ে, ভিঁয়া, জিরাফ কী নেই! তেমনি জুলু, বান্টু, মাসাই, পিগমি, ইটেনটট কত রকম জনজাতি!

দ্যুতির ইচ্ছে ছিল কেনিয়া, তানজানিয়া অথবা চিরহস্যময় মিশর হোক। মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো তো আছেই, সেই সঙ্গে পৃথিবীবিখ্যাত সেরেংগেটি ন্যাশনাল পার্ক, লেক ভিক্টোরিয়া। যদিও শেষ পর্যন্ত যেন নামিবিয়ার জন্যেই বিবেচিত হল কাবুলদা। তাই বা কম কী! তা ছাড়া আরও একটা ভাল ব্যাপারও আছে। এবার কাজের চাপটা নেই তেমন। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ফ্রি-ডে থাকবে। বেড়ানো যাবে এবং এই জন্যেই সঙ্গে একজনকে আনতে পারবে ডাক্তাররা। ভিসাটিসার সমস্যা নেই, সংস্থাই সব করে দেবে। আর পাসপোর্ট তো করাই আছে দ্যুতির। সুতরাং এর চেয়ে ভাল খবর আর কী হয়! লাফিয়ে উঠেছিল দ্যুতি। ভেবেছিল, বাড়িতে হয়তো একটু লড়াই করতে হবে। আশ্চর্য, তাও হল না।

বাবা বললেন, "আমার কোনও আপত্তি নেই। নামিবিয়া শান্তিপূর্ণ দেশ। হিরেটিরের খনি থাকায় উন্নত বলা যায়। জনপ্রতি রোজগারও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া ও যখন জুলজি নিয়ে পড়ছে, প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতাটা দারুণ হবে।"

হিতৈষীর বাড়িও রাজি ছিল। কিন্তু সময় পেল না ও। ভেটেরিনারি মেডিসিন মানে, পশুচিকিৎসা নিয়ে পড়ছে ও। পরীক্ষা পড়ে গেল নভেম্বরের শেষে। নভেম্বরের একুশ তারিখ প্লেনে ওঠার সময় কী যে মন খারাপ লাগছিল দ্যুতির।

জোহানেসবার্গে স্টপওভার হয়ে উইন্ডহুক সিটি। নামিবিয়ার রাজধানী শহর। বিমানবন্দরের নাম হোসিয়া কুটাকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। দেশের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী হোসিয়া কোমোনবুম্বি কুটাকোর নামে। হিরিও জনজাতির মানুষ ছিলেন। নামিবিয়ায় এরকম অনেক স্থানীয় জনজাতি আছে। স্যামুয়েল রুউই যেমন নামা জনজাতির ছিলেন। তবে এদেশে লোকসংখ্যা খুবই কম।

এলমোসাহেবের মোবাইলে কল এসেছে একটা। মিনিটপাঁচেক ধরে কথা বলার পর মুখটা বিরক্ত। বলেন, "সামনে ওকাহান্ডজা আসছে। বড় শহর। আমাকে নেমে যেতে হবে। এখানে একটা কাজ পড়ে গিয়েছে। তোমাদের শুধু কজন মিট করব।"

ড্যানিয়েল আবার সাইটসিয়িং নিয়ে কথা জুড়েছিল, ওর কথার রেশ টেনে বললেন, "ওতজিয়ারোজেসে দেখার অনেক কিছু পাবে। ওয়াটারবার্গ ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে কাছে। চিতা কনজারভেন্সি সেন্টার আছে। দেখার অভাব নেই। আমি বরং বলব, সামনে ফন বাক ড্যামটা পড়বে। দেখিয়ে দিতে পার। স্বোয়াকপ নদীর উপর বিশাল ড্যাম। উইন্ডহুক শহরের জলের রিসোর্স। চারদিক পাহাড়। সবুজ আছে। এদিকটার মতো এত শুকনো না। ভাল লাগবে।"

কিন্তু কাবুলদা আর ব্রেক জার্নি করতে রাজি হল না। বিশ মিনিটের মধ্যে ওকাহান্ডজা পৌঁছে গেল দ্যুতিরা। চমৎকার সুন্দর ছিমছাম শহর। স্থানীয় পুরসভা গর্ব করে 'গার্ডেন টাউন অফ নামিবিয়া' ফলক লাগিয়েছে অনেক জায়গায়। এলমো কাটিজেপো বললেন, "চলো একটু কফি খাওয়াই তোমাদের। বেশি সময় লাগবে না।"

আপত্তি করল না কাবুলদা। দেড়ঘণ্টা টানা বসে থেকে দ্যুতিরও একটু হেঁটে চলে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল। ড্যানিয়েলকে গাইড করে একটা কফি পার্লারের সামনে গাড়ি নিয়ে এলেন এলমোসাহেব। মনে হয় চেনা পার্লার। তিনিই খাওয়াবেন। ভিতরে না ঢুকে সাইডওয়াকে

রাখা টেবিলে বসল দ্যুতিরা। বসতে না-বসতে দ্যুতির বয়সি দু'জন মেয়ে পেপার প্লেটে কীসব ফ্রাই সাজিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্যুতি দেখে ঢোক গিলেছে। প্লেটভর্তি কোনও পোকাটোকার কালচে-কালচে পিউপা, পেঁয়াজটোয়াজ দিয়ে ভাজা।

এলমোসাহেব বললেন, "এই ক্যাটারপিলার খাওয়া যায়। এম্পেরর মথ হয় এই শুঁয়োপোকা থেকে। আফ্রিকার এই দিককার একটা ডেলিকেসি। খেয়ে দেখো। ডিলিশিয়াস।"

এমনিতে সন্দেহজনক লাগছিল দ্যুতির। শুঁয়োপোকা শুনে আরও খারাপ অবস্থা। কাবুলদা কিন্তু প্লেট হাতে নিয়ে দিব্যি চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। মেয়ে দু'টি খুব খুশি। ইংরেজিতে বারেবারে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

এলমোসাহেব বললেন, "এই শহরটা কিন্তু উইন্ডহকের চেয়েও পুরনো। সেই ১৮০০ সালে হিরিও আর নামা জনজাতি মিলে তৈরি করে ওকাহান্ডজা। তবে দুঃখের কথা কী জান, এরাই আবার একটা সময় নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে বসে। প্রচুর লোক মারা যায়। বিচ্ছিরি ব্যাপার।"

দ্যুতি জানে এসব কাবুলদা আগেই পড়ে নিয়েছে। ভদ্রলোক যাতে কিছু মনে না করেন, তাই শুনে যাচ্ছে মন দিয়ে। কিন্তু সত্যি মন দিয়ে কিঃ চোখজোড়া যেন অন্য কোথাও আটকে আছে। সেটা কী বুঝতে পারছে না দ্যুতি। রাস্তার অন্য ধারে কাঠের কাজের পরপর অনেক শপ। কাঠের হাতি, জিরাফ, গন্ডার, হরিণটরিন। লম্বা-লম্বা আফ্রিকান স্টাইলের মুখোশ। আদিবাসী মানুষজন। সবই বিভিন্ন সাইজ আর শেপের। বেশ ভাল কাজ। খদ্দের তেমন একটা নেই। উইন্ডহকের রাস্তাতেও এরকম অনেক স্টল দেখেছে দ্যুতি।

উডক্রাফ্টের এধারে চিনা সামগ্রীর একটা দোকান। মোবাইলকভার থেকে এল ই ডি ল্যাম্প, জুতো, ছাতা কী নেই। এগুলোও উইন্ডহকে অনেক চোখে পড়েছে। চিনারা দেখা যাচ্ছে সুদূর আফ্রিকাতেও ব্যবসা ছড়িয়ে দিয়েছে ভালই। মাটিতে লুটনো টাউস-টাউস গাউন আর মাথায় শিঙের মতো কাপড় জড়ানো হেডড্রেস পরা দু'জন আফ্রিকান মহিলা এসে চিনা দোকানটায় ঢুকল।

এলমোসাহেব বললেন,"এরা হল হিরিও গোষ্ঠীর। জার্মান মিশনারিরা ওদেরকে এমন পোশাক পরতে শেখায়। দেখতেই পাচ্ছ, অভ্যেসটা এখনও রয়ে গিয়েছে। অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তো বিরাট কার্নিভাল হয় হিরিওদের। তখন এরকম ড্রেস পরে বেরনোটাই দস্তুর। হেডগিয়ার যেটা দেখছ, গোরুর শিঙের আদলে করেছে। অনেক সময় ওটা দিয়ে সামাজিক অবস্থানও বোঝানো হয়।"

ভদ্রলোক বেশ মুডে এসেছেন। আরও কত কী বলে যাচ্ছেন। কাবুলদা কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। ঘড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে বলল,"যদি কিছু মনে না করেন স্যার, এবার আমরা যাই। কাল দেখা হবে।"

গাড়ির দিকে এগোতে-এগোতে কাবুলদা চাপা গলায় বলল, "চাইনিজ স্টোরটার সামনে কালো ভ্যানটার নম্বরটা লক্ষ করেছিসঃ"

দ্যুতি সঙ্গে-সঙ্গে পিছন ঘুরতে যাচ্ছিল। কাবুলদা হাতটা ধরে বলল, "ওইভাবে না, ক্যাজুয়াল দ্যাখ।"

ঠিকই। একেবারে নিজেদের গাড়ির দরজার সামনে এসে ভ্যানটাকে দেখল দ্যুতি। এইচ একশো ছয় এক্স।

"কিছু বুঝলি?" গাড়িতে উঠে বাংলায় বলল কাবুলদা।

"না," বলল দ্যুতি ,"তুমি কি স্যামুয়েল রুউইয়ের দোকানে যে গাড়িটা এসেছিল সেটা বলছ? একই মডেলের অবশ্য।"

"একই মডেল না, সেই গাড়িটাই। নম্বরপ্লেটটা জাস্ট উলটো করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ হয়তো এই জন্যেই খুঁজে পায়নি। সম্ভবত এটাই আসল নম্বর।"

"কিন্তু ওটার নম্বর আমার মনে আছে, এক্স নাইন জিরো ওয়ান এইচ," বলল দ্যুতি। পরক্ষণেই খেয়াল হল, কাবুলদা ঠিকই বলছে সংখ্যাগুলো এমন, জাস্ট নম্বরপ্লেটটা উলটো করে দিলেই হয়।

"গাড়িটা আমাদের অন্তত শেষ দশ কিলোমিটার ধরে ফলো করে আসছে," কঠিন গলায় বলল কাবুলদা।

ইতিমধ্যে ড্যানিয়েল গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দ্যুতি পিছন ফিরে দেখল, কালো ভ্যানটাও স্টার্ট নিল। ছাইভারের সিটে একটাই লোক। আফ্রিকান এইটকুই বোঝা যাচ্ছে। চোখে কালো গগল্‌স। হাতে সাদা গ্লাভ্‌স।

॥ ৪ ॥

নামিবিয়া দেশটার পুরোটাই যেন পাহাড় মালভূমি বা বন-জঙ্গল। লোকজন যেন থাকেই না। শহরের সীমানা পেরোতে না-পেরোতেই ধু-ধু অবারিত দিগন্ত, নয়তো মাইলের-পর মাইল জনহীন রুক্ষ পাহাড়। মধ্যে দিয়ে শুনশান জনশূন্য রাস্তা। কখনও ঢেউ খেলানো, কখনও সমতল। সবচেয়ে বড় কথা, মনে হয় রাস্তার শেষ নেই যেন।

আসলে দ্যুতিরা বি-ওয়ান হাইওয়ে ধরে না গিয়ে ওকাহান্ডজা থেকে বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে বি-টু রোড ধরেছে। ননস্টপ ষাট কিলোমিটার এসে বি-টু ছেড়ে এখন সি-থার্টিসিক্স রোড ধরে চলছে। সি বা ডি অক্ষরের সড়ক এ দেশে সেকেন্ডারি রাস্তা। বি-এর মতো ঝকঝকে হাইওয়ে না। সাধারণ পিচের, কখনও নুড়িপাথর মানে, গ্রাভেলডও হয়ে যাচ্ছে। ফলে গাড়ির স্পিডও কমছে। আপাতত ওরা যাবে ওমারুরু বলে একটা শহরে। সেটা এখনও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর। ওমারুরু থেকে মূল গন্তব্য ওতডিয়ারাঙ্গো প্রায় দেড়শো কিলোমিটার। মানে, অন্তত ঘণ্টাতিনেক ধাক্কা।

তবে যে জন্য এত ঘোরাঘুরি, সেটা হয়তো সার্থক হয়েছে। উইলহেমসটাম বলে একটা লোকালয় ছাড়ানোর পর থেকে যা দেখা যাচ্ছে তা শুধুই বন্য না, আদিম নামিবিয়া। অ্যান্টিলোপ বা হরিণের দলটলও হঠাৎ-হঠাৎ নজরে লে আসছে। অনেকে তো রাস্তা পেরিয়েও চলে যাচ্ছে সটান। গাড়িচালকের উদ্দেশে বনদফতরের বোর্ডও নজরে পড়ছে মাঝেমধ্যেই।

মিনিটনিকেন আগে তো দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হল। গোরুর মতো দেখতে লালচে বাদামি রঙের একটা প্রাণী বেশ হেলেদুলে রাস্তা পার হচ্ছিল। কাবুলদার বি কেয়ারফুল বে সাবধান করার দরকার ছিল না। ড্যানিয়েল সতর্ক ছিল। এমন ঝকঝকে নীল আকাশের প্রখর দিবালোকে অত বড় প্রাণীটিকে মিস করার কথাও ছিল না।

"কুদু স্যার। লুক আউট দ্য স্পাইরাল হর্নস," বিশ গজ মতো তফাতে গাড়ি থামিয়ে বলেছিল ড্যানিয়েল।

প্রায় ফুটদুয়েক লম্বা চমৎকার প্যাঁচানো শিং জোড়াই না, পিঠের উপরেও সাদা-সাদা স্ট্রাইপ। যেন চক দিয়ে কেউ দাগ দিয়ে দিয়েছে। জন্তুটা লম্বা-ডওচ্ছতেও বেশ বড়সড়। মাটি থেকে অন্তত পাঁচ ফুট উঁচু তো হবেই। দ্যুতি দরজা খুলে ফোটো তুলল কয়েকটা।

কাবুলদা বলল,"এটা পুরুষ। মেয়েদের সাধারণত শিং থাকে না। থাকলেও খুব ছোট হয়। যেটা দেখছিস, সম্ভবত গ্রেটার কুদু, তাই এত বড়। খুব লাকি আমরা।"

দ্যুতিদের মতো কুদুটাও যেন ওদের দেখছিল। জোরে হর্ন দিতে লেজটা বেঁকিয়ে ছুট দিল সে।

ড্যানিয়েল এনজয় করছে খুব। কুদুর মাংস যে খুব টেস্টফুল তাই নিয়ে বলতে শুরু করে দিয়েছে। কুদু যে অ্যান্টিলোপ সেও জানে। দেখা গেল শুধু কুদু নয়, ওরিক্স, স্প্রিংবক, এল্যানড, ওয়ার্টারবিস্ট, হার্টবিস্ট প্রায় সবেরই মাংস সে খেয়েছে।

দ্যুতি বলল,"ওরিক্স মানে তো জেমসবক, তোমাদের জাতীয় পশু। সরকারি সিলেও ছবি রয়েছে। তাও খাওয়া যায়?"

ড্যানিয়েল হাসল। ঠিকই বলেছে দ্যুতি। নিরীহ জানোয়ারদের মারাটা ঠিক না। আসলে টুরিস্টরা সবাই এসে জন্তু দেখেই শিকারের কথা ভাবে। তাই দ্যুতিদের খুশি করতেই বলেছিল।

কাবুলদা বাংলায় বলল,"এ দেশে বন সংরক্ষণে যেমন জোর দেওয়া হয়, তেমনি আবার গেমহান্টিং, মানে শিকারেও বাধা নেই। ডলারের বিনিময়ে যা খুশি শিকার করা যায়। চিতা, গন্ডার, হাতি জিরাফ, সব।"

"হ্যাঁ, আমিও দেখছিলাম ট্রোফিহান্টিং নিয়ে গাইডবুকে ফলাও করে লেখা হয়েছে। কিন্তু এরা তো বিপন্ন প্রাণী।"

"ইচ্ছে করলেই মারতে পারবি না। কন্সিশনস অ্যাপ্লাই। কিন্তু মানে কে? আইন থাকলে আইনের ফাঁকও থাকে। ইনফ্যাক্ট আমাদের গতবারের ট্রিপটার একটা অংশ এসব নিয়েও ছিল।"

কথা শেষ করল না কাবুলদা। সামনে বনকর্মীদের গাড়ি দেখা যাচ্ছে একটা। একটা জিপ। তার সামনে একটা বড় সবুজ রঙের ভ্যান। উর্দিধারী দু'জন দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি জিপের পাশে। তাদের হাতের ইঙ্গিত দেখে মনে হল দ্যুতিদের গাড়ি থামাতে বলছে।

ড্যানিয়েল ইতিমধ্যেই ব্রেক চেপেছে। লোকগুলোর কিছুটা তফাতে থেমে গেল দ্যুতিদের সাদা এস ইউ ভি। দুটো লোকই আফ্রিকান। লম্বা, পেটানো চেহারা। চোখে কালো সানগ্লাস। একজনের কোমরে রিভলভার ঝুলছে। সে এসে ড্যানিয়েলের কাছে লাইসেন্স চাইল। ড্যানিয়েল দিতে সেটার উপর একবার নজর বুলিয়েই ইশারায় নেমে আসতে বলল।

ড্যানিয়েল খুব অবাক। সে কিছু একটা বলতে শুরু করেছিল আফ্রিকান ভাষায়। কী কাণ্ড! লোকটা হাত বাড়িয়ে টেনে থাপ্পড় মারল সঙ্গে-সঙ্গে। অন্যজন রিভলভারও বের করে ফেলেছে।

"ব্যাপারটা কী?" কাবুলদা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

লোকটা জানাল, ড্যানিয়েল নকল লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। ওকে আর যেতে দেওয়া হবে না।

"নো স্যার। আই সোয়ার ইন দা নেম অফ গড! এরা মিথ্যে বলছে," বলল ড্যানিয়েল। বলতেই সে আবার একটি থাপ্পড় খেল। গাড়ি থেকেও নামানো হল এবার। টেনে তোলা হল অন্য ভ্যানটায়। সেটার পিছনের দরজায় 'ওনলি ফর ভেটেরিনারি ইউক্সেন' লেখা। ভ্যানটা থেকে নতুন দু'জন বেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। একজনের মুখটা খুব চেনা-চেনা। সাদা চামড়ার। কাবুলদার মতো হাইট। হাতে ওয়ারলেসের মতো দেখতে একটা যন্ত্র। অনেক ছোট-ছোট পেনসিল সাইজের অ্যান্টেনা সেটায়।

কাবুলদা এবার নিজের পরিচয় দিল। এন জি ও তো বটেই, সরকার থেকেও ওকে একটা পরিচয়পত্র দিয়েছে। এরকম কোনও অসুবিধেয় পড়লে সেটা ব্যবহার করার কথা। কিন্তু লোকগুলো নাছোড়বান্দা। কাবুলদা ফোন করার চেষ্টাও করল। সিগন্যাল নেই।

পিস্তলধারী বলল, "তোমাদের অসুবিধে হবে না। যেখানে যাবে আমাদের লোক ড্রপ করে দেবে।"

সে বলামাত্র একজন দ্যুতিদের গাড়ির দরজা খুলে সটান ড্রাইভারের সিটে বসে পড়ল।

কাণ্ড দেখে দ্যুতির বেশ ভয়-ভয় করছে। এই লোকগুলো সত্যিই বনবিভাগের কর্মচারী কি ? অনেক লোক রয়েছে। ভ্যানটা থেকে আরও দু'জন নামল। এদেশে ট্র্যাফিক আইন খুব কড়া। তাই বলে বনবিভাগের লোক কি লাইসেন্স চেক করতে পারে? কে জানে! যত দূর চোখ যায় কোথাও একটা জনমনিষ্যি নেই। একটা গাড়িটারিও আসছে না। জায়গাটা পাথুরে হলেও গুল্মজাতীয় ঝোপঝাপড়া ভর্তি রাস্তার দু'পাশ।

ইতিমধ্যে দ্যুতিদের গাড়িতে সেই পিস্তল আর টকিমেশিনধারী লোক দু'জন উঠে পড়েছে। ছাড়ার সময় আরও একজন উঠল। কাবুলদা একদম চুপ। লোকগুলো একবারও জিজ্ঞেস করেনি কোথায় যাবে দ্যুতিরা।

মিনিটপনেরো সোজা রাস্তায় চলার পর বাঁ দিকে নুড়ি ফেলা রাস্তায় দ্যুতিদের জিপ। সবুজ ভ্যানটা মনে হল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এবার দু'দিকে লম্বা-লম্বা ঘাস।

কাবুলদা বলল, "ভয় পাচ্ছিস?"

"একটু-একটু," বলল দ্যুতি।

"পাস না। আপাতত কিছু করবে না এরা। ব্যাপারটা কিছুই না

এমন মুখ করে বসে থাক,” বাংলায় বলল কাবুলদা।

কিন্তু তাই কী হয় ? হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। বুকটা ধকধক করছে কী ভীষণ। কোথায় নিয়ে চলল কে জানে!

এসব ভাবতে-ভাবতে সামনে একটা ঢেউ খেলানো টিলামতো পাথুরে জায়গা এসে পড়ল। গাড়িটা সেখানে থামল হঠাৎ। কেউ কোথাও নেই। রোদ বেশ চড়া। দূরে এক ঝাঁক সাগুল্লাউঁস উড়ে গেল দল বেঁধে।

বন্দুক এখন সাদা চামড়ার হাতে। সেটার নলটা কাবুলদার মাথার পিছনে ঠেকিয়ে বেশ ফিক্সি কায়দায় বলল, “অনেক চ্যারিটি করেছ। এবার ভালয়-ভালয় ম্যাপটা বের করো বাছা।”

কাবুলদা পিছনে না তাকিয়ে নিষ্কম্প গলায় বলল, “কীসের ম্যাপ?”

কী সাহস! লোকটা ঠাঁই করে বন্দুকের নলটা কাবুলদার কপালের পাশে মারল জোরে। দুতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অন্য লোকটা ওকে চেপে ধরেছে।

এই তো শুরু। লোকগুলো কোনও কথাই শুনবে না। গুপ্তধনের ম্যাপ চাই। নাইলনের রোপ এনেছিল পকেটে করে। এবার দুতির কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে তাই দিয়ে বাঁধল দু'জনকে। তারপর সেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মিনিটদশেক এলোপাথারি কিল-চড়-লাথি যা পারে মেরে হাতের সুখ করল তিনজনে। সিংহভাগ অবশ্য কাবুলদার উপর দিয়ে হল। এখানেই শেষ নয়, এর পর লাগেজগুলোও সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লন্ডভণ্ড করল।

সাদা চামড়ার লোকটাই সম্ভবত পালের গোদা। স্যামুয়েল রুউইয়ের কাছে সেই-ই হয়তো গিয়েছিল। কারণ, অন্য লোকগুলো অ্যাডলার বলে ডাকছে তাকে। এমন সময় সেই 'ওনলি ভেটেরিনারি ইউক্সেস' লেখা সবুজ ভ্যানটা এসে হাজির হল কোত্থেকে। ভ্যান থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে কীসব বলল অ্যাডলারকে। মাথা দোলাল অ্যাডলার। আবার গাড়িতে তোলা হল দুতিদের। তবে এবার আর ওদের এস ইউ ভি না, সবুজ ভ্যানটায় ঢোকানো হয়েছে। লাগেজগুলোও চালান হল সঙ্গে। দুতি ভাবছিল ড্যানিয়েলের কথা। তাকে কোথাও দেখা গেল না।

॥ ৫ ॥

আঘাত আর ক্লান্তিতে কতক্ষণ আচ্ছন্নের মতো ছিল দুতি। চোখ খুলতে চারিদিকে জমাট অন্ধকার। প্রথমে মনে হল ট্রেনে চেপে যাচ্ছে কোথাও। উঁহু ট্রেন না, গাড়ি। গাড়ির ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ। দুলে-দুলে চলছে গাড়িটা। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল সব। কয়েকবার কাবুলদা বলে ডাকল দুতি। সাড়াশব্দ নেই।

উঠে বসল দুতি। হাতে-পায়ে ভীষণ ব্যথা। তাও ব্যালান্স রেখে উঠে দাঁড়াল। খুব গন্ধ ভিতরটায়। ভেটেরিনারি অর্থাৎ জীবজন্তু সংক্রান্ত ব্যবহারের জন্য এই গাড়ি। সে গাড়িতেই তুলেছে ওদের। তা গোরু-ছাগলের মতো অবস্থা এখন। জবাইও করবে সেভাবে। হাতড়াতে গিয়ে একধারে সুটকেস আর রাকস্যাকের মতো কিছুতে হাত লাগল। ওদের লাগেজগুলো হয়তো। লোকগুলো যে সব নকল, কথা বলার ভঙ্গি দেখেই মনে হচ্ছিল। ইস! তখনই যদি গাড়ি না থামিয়ে পালাত ওরা। একটু হাতড়াতে এবারে কাবুলদার গায়ে হাত পড়ল। দুতির মতোই অবস্থা। হাত পড়তে ক্ষীণ গলায় বলল, “ঠিক আছি। ভয় পাস না।”

কেমন ঠিক আছে সে তো দেখতেই পাচ্ছে। প্রাণটা বাঁচবে কিনা তারই কোনও নিশ্চয়তা নেই। লোকগুলো এমন ছিনে জোঁকের মতো পিছনে পড়ে আছে কেন কে জানে? ম্যাপ যে সত্যিই নেই বুঝতে পারছে না? কী কুক্ষণে যে স্যামুয়েল রুউই চিঠিটা লিখল কাবুলদাকে! চিঠিটা সত্যিই ছিঁড়ে ফেলেছে কাবুলদা। তার আগে অবশ্য মোবাইলে ফোটো তুলে ল্যাপটপ থেকে মেল করে দিয়েছে দুতি আর হিতৈষীর মেল অ্যাকাউন্টে। লোকগুলো সেটা ধরেছে কিনা কে জানে। ধরুক না-ধরুক একটা বিষয় স্পষ্ট, এরা সংখ্যায় অনেক আর সঙ্ঘবদ্ধও বেশ। শুরু থেকে ঠিক নজরে রেখে আসছে। ওতজিয়ারোজে যাচ্ছিল সেটাও হয়তো জানত। কষ্ট লেখক করেও তাই লাভ হয়নি। কিন্তু ভিতরের কালপ্রিটটা কে বা কারা? ভালমানুষ দেখতে পিটার আগুটা? কিংবা এলমোসাহেব? তাঁকেও কি বিশ্বাস করা যায়? নাকি ওপরের কোনও ব্যক্তি? এরকম একটা কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে বলেই কি? গুপ্তধনের কথা তিনিও জিজ্ঞেস করেছিলেন? নাকি গুপ্তধন ছাড়াও অন্য কোনও রহস্য আছে? নিশ্চয়ই আছে। এবং কাবুলদা জানে সেটা। নয়তো উড়ো একটা গুপ্তধনের জন্যে বিদেশিদের কিডন্যাপ করবে না কেউ। তাও আবার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য। যারা কিনা সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে।

ন্-না। আর ভাবতে পারছে না দুতি। অসংখ্য উত্তরহীন প্রশ্ন। জিন্সের পকেট থেকে মোবাইলটাও বের করে নিয়েছে। চার্জ ছিল অনেকটা, সিগন্যাল না এলেও সময়টা দেখা যেত অন্তত।

বসে থেকে-থেকে ঘুমিয়েই পড়ল আবার। চোখ খুলল তীব্র আলোর ঝলকানিতে। গাড়ি থেমেছে। কেউ টর্চের জোরালো আলো ফেলেছিল চোখে। আলোটা সরিয়ে নিয়ে সে ইংরেজিতে হুকুম করল নেমে আসতে। ভোর হচ্ছে। চারিদিকে নরম আলো। গাছটাছও অনেক। একটা বড় বাংলো বাড়ির অংশ দেখা যাচ্ছে। তবে গাছপালা থাকলেও চারিদিকে খয়েরি-খয়েরি বালিতে ভর্তি। খুলির উল্কিওয়ালা একটা হাত এসে টেনে নামাচ্ছিল দুতিকে। নোংরা হাতটাকে এড়িয়ে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল দুতি। কাবুলদাকে আগেই নামিয়েছে। দু'জন ধরাধরি কোথাও একটা নিয়ে যাচ্ছে ওকে। এলোপাথারি মারে বাঁ পাটা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। ভেঙে গিয়েছে কিনা কে জানে! ভর দিতেই পারছে না। তুলে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

পিছনে দুতিও দৌড়েছিল, উল্কিধারী এসে এবার জাপটে ধরল ওকে। লোকটাকে ওকাহান্ডজার দেখেছিল। ওদের আগেই চলে এসেছে দেখা যাচ্ছে। দুতির ইচ্ছে করছিল কামড়ে দেয় জোরে। থাক, লাভ তো নেই। অত্যাচার আরও বাড়বে। কাবুলদা বলে বিপদে সবচেয়ে কঠিন হল মাথাটা ঠান্ডা রাখা। যে পারে সে বিপদটাও কাটাতে পারে। সেই চেষ্টাই করবে দুতি। যতক্ষণ পারে।

“কাম অ্যালং উইথ মি,” বলল লোকটা।

“আমার দাদা কোথায়?” যতটা পারে গলাটা গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করল।

লোকটা বিচ্ছিরিভাবে হেসে একই কথা রিপিট করল, “কাম অ্যালং উইথ মি।”

জোরে হাওয়া বইছে। দূর থেকে একটা সোঁ-সোঁ আওয়াজ আসছে। মনে হচ্ছে সমুদ্রের ধারে কোথাও রয়েছে।

বালির উপরে পাথর বসিয়ে রাস্তা। ধারে-ধারে পামজাতীয় গাছের সারি। একধারে তিন-চারটে বড় গাড়ি। তার মধ্যে সেই কালো ভ্যানটা। কিন্তু যেটা খুঁজছিল দুতির চোখ, ওদের সাদা এস ইউ ভি-টা, সেটা দেখতে পেল না কোথাও। একবার ভাবল ছুটে পালায়, কিন্তু পামগ্রোভের ফাঁকে-ফাঁকে কালো উর্দিপরা সিকিউরিটি গার্ড। একজনের হাতে আবার লিশ বাঁধা একটা বাঘা জার্মান শেপার্ড। অ্যালসেশিয়ান বলে যাকে চেনে সবাই। গরগর করছে চাপা গলায়।

“হে ইউ গার্ল, হারি আপ, হারি আপ,” উল্কি তাড়া দিচ্ছে।

বাংলোটা প্রায় দোতলা সমান কংক্রিটের পিলারের উপরে তৈরি হয়েছে। অনেক পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হল। নিশ্চয়ই সি সি টিভিতে লক্ষ রাখা হচ্ছে। বিশাল কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াতেই কেউ খুলে দিল ভিতর থেকে।

ঢুকে বড় হলঘর। গোড়ালি ডুবে যাওয়া সবুজ কার্পেট। বড়-বড় সোফা। টেবিল, আলমারি, ঘড়ি সব সাহেবি ডিজাইনের। এমনকী,

ফায়ারপ্লেস পর্যন্ত রয়েছে। আর রয়েছে দেওয়াল জুড়ে অসংখ্য প্রাণীর সটাফ করা মাথা। দুটো বড়-বড় চিতার ছালও টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। কাবুলদা বলেছিল ট্রোফি হান্টিংয়ের কথা। এগুলো মনে হচ্ছে সেইভাবে হান্ট করা হয়েছে।

"সিট ডাউন ইয়ার লেডি," গরম কোনও পানীয়ের ট্রে নিয়ে একজন কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধ ঢুকেছে সাইডের দরজা দিয়ে। এই ভোরেই বোপদূরস্ত। সাদা প্যান্ট, শার্ট আর বো-টাই লাগিয়েছে গলায়।

"আমি এ বাড়ির বাটলার বলতে পার। টম আমার নাম। ইউ ক্যান কল মি আঙ্কলটম। হাউএভার দিস ইজ নট মাই কেবিন। আয়াম আ মেয়ার সারভেন্ট হিয়ার। চা এনেছি। পান করে নাও আগে," বৃদ্ধ বেশ আমায়িক গলায় বলল।

কাণ্ডকারখানা কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না দ্যুতি। ভেবেছিল সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে চলেছে। সেখানে কিনা বইয়ের পাতার আঙ্কলটম এসে আদর করে চা খাওয়াতে চাইছে!

"আমার দাদা, হিজ নেম ইজ অপরাজিত রয়, সে কোথায়? তাকে না দেখলে আমি কিছু খাব না। আর আমাকে এভাবে ধরেই বা এনেছ কেন তোমরা? আমরা তোমাদের দেশের লোকেদের উপকার করতে এসেছিলাম," বলতে-বলতে দ্যুতি টেল পেল ও কেঁদে ফেলেছে। জল গড়াচ্ছে দু'চোখ দিয়ে।

বৃদ্ধ সত্যিই হয়তো ভাল। ট্রে নামিয়ে দ্যুতির কাছে এসে বলল, "তোমার দাদা এখানেই আছে। সুন ইউ উইল মিট হিম। ভয় পেয়ো না। আমার বস যা জানতে চায় বলে দিয়ো। ইউ উইল বি ফ্রি এগেন। বাই দ্য ওয়ে, তুমি কি 'আঙ্কল টমস কেবিন' বইটা পড়েছ?"

মাথা নাড়াতেই হল দ্যুতিকে। বৃদ্ধ সত্যিই আন্তরিক। কিন্তু ইনিও এক কথাই বলছেন। গুপ্তধনের হদিশ। কোথায় পাবে দ্যুতিরা? তবুও একটু ভরসা, কাবুলদার একটা খবর অন্তত পাওয়া গেল এতক্ষণে। তবে যাই হোক, যতক্ষণ না কাবুলদাকে দেখছে কিছু মুখে দিচ্ছে না আর।

এমন সময় বৃদ্ধ হঠাৎ নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকেছে দু'জন। একজন লালমুখো সাহেব। দৈত্যাকার চেহারা। লম্বায় এলমোসাহেবের চেয়েও ছ'ইঞ্চি বেশি হবে। চওড়াতেও তাই। মাথা জুড়ে টাক। মুখটাও বিশাল। হাতির মতো দুটো চোখ। চুল, দাড়ি না থাকায় বয়স ঠিক বোঝা না গেলেও পঞ্চাশটিফাশ হবে। অন্যজন চিনা। দ্যুতির চেয়েও এক-দেড় ইঞ্চি বেঁটে। রোগাপাতলা চেহারা। নির্লোম মুখ। চুলগুলো সব কুচকুচে কালো হলেও গলা আর চোখের দু'পাশের ভাঁজ দেখে এর বয়সও পঞ্চাশের বেশি বলেই মনে হয়।

লালমুখো কোনও ভূমিকা না করে গমগমে গলায় ইংরেজিতে বলল, "তুমিই ওই ডাক্তার ছোকরার বন্ধু?"

"হি ইজ মাই কাঞ্জিন," চোখে চোখ রেখে বলল দ্যুতি। কিছুতেই সাহস হারাবে না ও।

"যেই-ই হও, ম্যাপটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

"কীসের ম্যাপ? আমরা কোনও ম্যাপটাপ পাইনি।"

এর মধ্যে উদ্ভিঙওয়ালা লোকটাও ফের হাজির হয়েছে। হাতে একটা তেল চুকচুকে মোটা রুলার। পিছনে সেই অ্যাডলার লোকটাকেও দেখা গেল। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন ভঙ্গি করল যেন মুখের কথায় কিছু হবে না এদের।

লালমুখো বলল, "জেদ করো না। নিজের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করো। সত্যিটা বলো। উই উইল লেট ইউ ফ্রি।"

দ্যুতি ভেঙে পড়েছে আবার। তবে এদের সামনে কক্ষনও নিজের দুর্বলতা দেখাবে না।

"আমি সত্যিই বলছি। হ্যাঁ, একটা চিঠি স্যামুয়েল রুউই আমাদের দিয়েছিলেন। তাতে ওঁর নিজেদের ট্রাইব্যাল স্লোরির কথাই লিখেছিলেন। কালাহারির কোথাও একটা ট্রেজারহান্টে একবার গিয়েছিলেন, তাও লিখেছিলেন। সেইজন্যে কয়েকজন গুন্ডা ওঁকে মারধর করে। কোনও ম্যাপ সে আমাদের দিয়ে যাননি। বিশ্বাস না করলে ধরে তো এনেছ, মেরেই ফেল গুলি করে।"

যতটা পারে রাগ, দুঃখ,অপমান, সংযমে রেখে গড়গড় করে বলে গেল দ্যুতি।

টমআঙ্কল বলল, "স্যার, আমার মনে হয় মেয়েটা সত্যি কথাই বলছে।"

"ইউ কিপ মাম," লালমুখো ধমক দিল। তারপর দ্যুতির দিকে ফিরে বলল, "শুনলাম। কিন্তু বিশ্বাস করলাম না। তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু জানারও আছে। কী, সেটা তোমার ওই কাঞ্জিন জানে। ওকে বোঝাও। আটচল্লিশ ঘণ্টা টাইম দিলাম। এখন সকাল ন'টা। টাইম স্টার্টস নাও। আর হ্যাঁ, পালাবার চেষ্টা করো না। কেন? হাংগো বুঝিয়ে দেবে," বলেই খুব জোরে হেসে উঠল লোকটা। চিনা লোকটা হাসল না। সে দ্যুতির দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে।

দ্যুতি একটু সাহসী হল, "কিন্তু তোমরা কারা সেটা জানতে পারি নিশ্চয়ই?"

লালমুখো চোখ নাচিয়ে বলল, "আমরা কারা? সেটাও তোমার ওই কাঞ্জিন জানে। আস্ক হিম," বলে দ্যুতিকে উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যে অন্য কী ভাষায় আলোচনা শুরু করে দিল।

উদ্ভিঙওয়ালা লোকটা, নামটা জানা গিয়েছে হাংগো, ফের দ্যুতির হাতটা ধরল খপ করে।

॥ ৬ ॥

মস্ত একটা থাম্বার উপরে ওঠার টাওয়ারের মতো এই ছোট্ট ঘরটা। কোনও একটা সময়ে লাইটহাউজ জাতীয় কিছু একটা ছিল হয়তো। জাহাজের পোর্টহোলের মতো সমুদ্রের দিকে দুটো জানলা আছে সেইজন্য। আগে হয়তো ফাঁকাই ছিল। এখন কাচ লাগানো। তবে এমন নয় যে, কাচ ভেঙে পালানো যায়। মিনারটা অন্তত তিনতলা সমান উঁচু। আর ঠিক নিচটাই পাথর দিয়ে বাঁধানো। পাথর পেরিয়ে বালিতে ঝাঁপ দিতে হলে অতিমানবীয় লম্ফ দিতে হবে একটি। নীচে নামার সিঁড়ি আছে ভিতর দিয়ে, মিনারে যেমন থাকে। বড়-বড় ধাপের প্যাঁচালো সিঁড়ি। তবে ওঠানামার কসরতটা নেই। ঘরটার একটা দিকে এক চিলতে বাথরুম আছে। আসলে সেটা একটা ঝুলন্ত ব্যালকনি। ঘিরে দিয়ে বেসিন আর কমোড বসান হয়েছে। কলও আছে জলের। নয়তো কী অবস্থা যে হত দ্যুতিদের, বিশেষ করে কাবুলদার!

ওর দিকে আর চাইতে পারে না দ্যুতি। ঠোঁটের কোণে রক্ত শুকিয়ে আছে। ডান চোখে কালশিটে। নেহাত বয়সটা অনেক কম তাই স্যামুয়েল রুউইয়ের অবস্থা হয়নি। তবে বাঁ পা-টা ভাঙেনি। ইচ্ছে করেই ভাঙার অভিনয়টা চালিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন কেতরে পড়ে থাকে। হয়তো এ জন্যে হাত, পা বেঁধে রাখা হয়নি দ্যুতিদের। দরজাটা অবশ্য পিছন থেকে বন্ধ করে দেয় হাংগো। সে ব্যাটা বসে থাকে সিঁড়ির মুখটাতে। মোবাইল বাজিয়ে ঝিনচাক রক মিউজিক শোনে, আর মোটা-মোটা চুরুট খায়। এত কড়া তামাক, এত উপরেও দ্যুতির কাশি পেয়ে যায়।

কাল দ্যুতিদেরকে যখন এনেছিল ওরা এখানে, মোটেই ভোর ছিল না তখন। যন কুয়াশার জন্য ওরকম মনে হচ্ছিল। লালমুখো তো বলেই সকাল ন'টা বাজে। শুনেই হদপিণ্ডটা যেন উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছিল দ্যুতির। সমুদ্রের ঢেউয়ের এমন আওয়াজ। ঘন কুয়াশা। তবে কি ওদেরকে বিখ্যাত বা কুখ্যাত সেই স্কেলিটন কোস্টে তুলে আনা হয়েছে? সে তো নামিব মরুভূমিতে। তাই তো হবে। সমুদ্র আর কোথায় আছে এ দেশে? জিজ্ঞেস করতে টমআঙ্কল মাথা নেড়েছিলেন। এই মানুষটা যতটা পারে যত্ন নিচ্ছে দ্যুতিদের। ট্রে-তে করে খাবার সাজিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে দু'বেলা। দুটো হাইলিটারের প্লাস্টিকের বোতল দিয়েছে। বেসিন থেকেই ভরে খায় দ্যুতিরা।

কাবুলদা তো স্ট্যাচু হয়েই কাটিয়ে দিল একটা দিন। বারবার বলছিল, "আমার জন্যে কী বিপদে পড়লি তুই।"

"তোমার জন্য কেন, আমি তো জোর করেই এসেছি," কাবুলদার হাতটা ধরে বলেছিল দ্যুতি।

কতক্ষণ চুপ করে ছিল কাবুলদা। দেখাদেখি দ্যুতিও কথা বলেনি। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে দূর সমুদ্রে। ঘন নীল সবুজ জলে কে যেন রাশি-রাশি আবির ফেলে লাল-কমলায় রাঙিয়ে দিচ্ছে। কত পাখি উড়ে যাচ্ছে। নামও জানে না দ্যুতি। এসব হিঁতেখী সাবজেক্ট। এমন সময় একটা পাখি জানলাটা প্রায় ছুঁয়ে দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। অত বড় ডানার পাখি কখনও দেখেনি দ্যুতি। ডানাদুটো হালকা বাদামি, বাকিটা সব সাদা। গোলাপি রঙ ঠোঁট, ডগাটা একটু বাঁকানো।

"কাবুলদা অ্যালবাট্রস!" বেশ উঠে দাঁড়িয়ে ছিল সঙ্গে-সঙ্গে। জানলায় গিয়ে পাখিটাকে দেখার চেষ্টা করল। তক্ষুনি বিকট গুড়ুম শব্দ। নিচ থেকে কেউ গুলি ছুড়েছিল অ্যালবাট্রসটাকে লক্ষ করেই হয়তো। সম্ভবত হাংগোই হবে। লোকটার কোমরে একটা পিস্তল গোঁজা থাকে দেখেছে দ্যুতি। পাখি মরেনি, তবে কিচিরমিচির ঢ্যাঁ টি করে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল অন্য পাখিগুলো। আর কাবুলদা মুহূর্তে আগের কাবুলদা হয়ে গিয়েছিল।

"শয়তানটা পাখিটাকে শুট করতে চাইছিল," দাঁতে-দাঁত চেপে বলেছিল কাবুলদা, "বুঝলি, আর ভয় নেই। পাশা পালটে গিয়েছে। ভাগ্যদেবী আবার আমাদের দিকে। কেন জানিস?" বাচ্চা ছেলের মতো মুখ, চোখ করে বলে উঠেছিল কাবুলদা।

দ্যুতির খুব আনন্দ হচ্ছিল। যত বিপদ আসুক, এই কাবুলদাকে চায় সে। অকুতোভয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সব সময়ই পয়লা নম্বর।

"অ্যালবাট্রস দেখা মানেই গুডলাক। অরণ্যদেব কমিক্‌সের প্রাচীন জঙ্গলপ্রবাদের মতো সত্যি এই কথা। আর যারা অ্যালবাট্রসকে মারতে চায় তাদের দিন শেষ। কোলরিজের কবিতাটা পড়িসনি, 'দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট ম্যারিনার'। পৃথিবীবিখ্যাত 'ওয়াটার ওয়াটার এভরিয়্যোয়ার, নর আ ড্রপ টু ড্রিংক' লাইনগুলো ওটাতেই আছে," সব অবসাদ, ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে বলছিল কাবুলদা।

পড়েনি বুঝি অত বিখ্যাত কবিতা! খুব বড়ও। সিলেবাসে নির্বাচিত কয়েকটা পংক্তি ছিল। দ্যুতিদের 'প্রত্যুষামিস' অবশ্য পুরোটা পড়িয়েছিলেন। বিশেষ করে মেটাফরের অংশটা। বরফে আটকে যাওয়া একটি জাহাজকে অ্যালবাট্রস দিক দেখিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করে, কিন্তু এক নাবিক গুলতি ছুড়ে মেরে ফেলে পাখিটিকে। পরিণামে জাহাজটিই ধ্বংস হয়ে যায়। মানে, অ্যালবাট্রস একই সঙ্গে শুভ এবং অশুভের প্রতীক, বলেছেন কোলরিজ। আসলে এই মেটাফর বা মিথটা বহু যুগ ধরেই চলে আসছে। কোলরিজ হয়তো সেটা বেস করেই লিখেছেন।

কাবুলদা তখন পুরনো মেজাজে, বলল, "অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। এখান থেকে বেরনোর কিছু একটা উপায় করতে হবে। সময় ফুরিয়ে আসছে।"

একদম। এটাই চাইছিল দ্যুতি। ও নিজে ভেবেও কিছু কূলকিনারা করতে পারেনি। নিচে অতন্দ্র বন্দুকধারী পাহারাদার। সঙ্গে ট্রেন্‌ড অ্যালসেশিয়ান। এদেরকে ম্যানেজ করলেও পুরো সীমানাটাই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, উচ্চতা সাতফিট তো হবেই। পাঁচিলের উপরেই ফুটতিনেক উঁচু কাঁটাতারের ফেন্সিং। কোনওভাবে এই হার্ডলটা পেরতে পারলেও পাঁচিলের ওপারে তো খালি বালি আর বালি। কিছু দূরে আটলান্টিক মহাসাগর। মানে, যে পথে এসেছিল সেদিক ছাড়া বেরনোর উপায় নেই কোনও।

আর পালাতে না পারলে ভবিতব্যে কী আছে বলাই বাহুল্য। কারণ, এদের মেনে নিয়ে সব বলে দিলেও এরা আদৌ ছাড়বে না। সব মানে কেবল ওই গুপ্তধনের ম্যাপট্যাপ না। কাবুলদাকে টার্গেট করার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। কাবুলদার এন জি ও গোপনে আন্তর্জাতিক পশু চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে নেমেছে। 'ট্র্যাফিক'-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা পিছনে আছে কাবুলদাদের।

কাবুলদা আপাতত যুক্ত সেভ-রাইনো বিভাগে। সরাসরি সম্মুখ সমর নয়। প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে আদিবাসী উপজাতিদের সংরক্ষণ বিষয়ে বোঝানোই ওর দায়িত্ব ছিল। গতবার ও এই কাজটাই করেছিল। আসলে সরকার বা ট্র্যাফিকের মতো সংস্থা যতই লড়ুক, সাধারণ মানুষের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া জঘন্য এই চোরাই ব্যবসা বন্ধ করা অসম্ভব। খালি আফ্রিকাতেই নাকি ফি বছর তেরোশো গন্ডার মারা হয় খড়্গের জন্যে। ভাবা যায়!

সবচেয়ে দুঃখের কথা, এশিয়া মহাদেশই এই চোরাই ব্যবসার প্রধান বাজার। চিন, ভিয়েতনামের মতো দেশ স্রেফ কুসংস্কারজন্ধ হয়ে কোটি-কোটি টাকার চোরাই লেনদেন করে চলেছে জীবজন্তুদের নিয়ে। এর মধ্যে গন্ডারের খড়্গের বিশাল চাহিদা। শোপিস তো আছেই, নানা রকম টোটকা মেডিসিন তৈরি হয় খড়্গ থেকে। সেগুলো নাকি বিশল্যকরণীর মতো সর্বরোগহর। অথচ এইসব মিথ্যে দাবির যে আদৌ কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই, বহুবার তা পরীক্ষা করে দেখানো হয়েছে।

তবু হুজুগ কমেনি। বরং দিন কে-দিন যেন এই নিষ্ঠুরতা বেড়েই চলেছে।

কাবুলদা বলছিল, আসলে এই বিজ়নেস যারা চালাচ্ছে তারা বিরাট ক্ষমতাবান। হয় বড় বিজ়নেস ম্যাগনেট, নয়তো রাজনৈতিক বা সরকারি হোমরাচোমরা। নিজেদের পাশিষ্ঠ সামাজিক মুখোশের আড়ালে জঘন্য এই দুষ্কর্মটি চালিয়ে যাচ্ছে এরা। তাই এদের সঙ্গে লড়াইটাও কঠিন।

দ্যুতিদের যারা কিডন্যাপ করে এনেছে তারাও এরকম দু'জন মাতব্বর। লালমুখো হল জার্মান, নাম গুস্তাভ কিটনার। তিনপুরুষ ধরে এদেশে আছে। মূল ব্যবসা হোটেলের। দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে ফরেস্ট লজ আর রিসর্ট খুলে হাতে প্রচুর ডলার। চাইনিজ লোকটার নাম গং জিয়াও। এরও ব্যবসা। সস্তা ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আমদানি করে এ দেশে। সম্প্রতি এই কিটনারের সঙ্গে মিলে নামিবিয়ার অতলান্তিক সৈকতের কিছু সামুদ্রিক প্রাণী চিনে রপ্তানির চেষ্টা করছে। এ নিয়ে সরকারি-বেসরকারি স্তরে বিশাল হইচই চলছে। কারণ রফতানি তালিকায় আফ্রিকান পেঙ্গুইন, ডলফিন আর কিলার হোয়েল বা ওরকা রয়েছে। এগুলো, বিশেষ করে ওরকা তিমি রফতানি দূরের কথা, ধরা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। গং জিয়াও অবশ্য এখানে সামান্য এজেন্টমাত্র। তবে সে যে অন্য অপকর্মেও জড়িত, এখন তা পরিষ্কার।

এরা চায় কাবুলদার সংস্থা কত দূর এগিয়েছে, সে বিষয়ে সব রকম তথ্যও। কারা-কারা কাবুলদাদের টিমে আছে, তাদের কী দায়িত্ব, কিংবা এখানে কাদের উপর সরকার গোপনে নজর রাখছে সব ইনফরমেশন দিতে হবে এদের। এর মধ্যে ভারতের বনগুলোও বাদ যাচ্ছে না। আর উপরি বলতে গুপ্তধনের হদিশ। সেটা ওই অ্যাডলারের সংযোজন। রুপার্ট কোহেনের সেক্রেটারি। রুপার্টের কাছে কোনওভাবে গুপ্তধনের কথা শুনে স্যামুয়েল রুউইয়ের উপর হামলা চালাচ্ছিল। লোকটা সম্পর্কে ওই গুস্তাভ কিটনারের তুতো ভাইটাই নাকি।

যাই হোক, এসব নিয়েই কেটেছিল প্রথমদিনটা। টমআঙ্কল আর একটা উপকার করেছে। দ্যুতিদের লাগেজ যা ছিল এ ঘরে তুলে এনেছে। তাতে আস্ত বলতে ক'খানা জামাকাপড় মাত্র। পাসপোর্ট আর ভিসার কপিটা আছে অবশ্য। কপি বলেই আছে হয়তো। অরিজিনালগুলো উইহুকের নেলসন ম্যান্ডেলা অ্যাভিনিউতে ভারতীয় দূতাবাসে জমা দিয়ে রেখেছে কাবুলদা। কয়েকশো নামিবিয়ান ডলার ছিল, নেই। ল্যাপটপটিও অকেজো, স্ক্রিনটাই ভেঙে

দেওয়া হয়েছে। এখানের কাজের কোনও তথ্য হার্ড কপিতে রাখেনি কাবুলদা। ল্যাপটেপেই কিছু ছিল। পাসওয়ার্ড হ্যাক করতে না পেরে আক্রোশে ল্যাপটপের বারোটা বাজিয়েছে। এমনকী, মেমারি কার্ড খুলে নিয়ে ক্যামেরাদুটোও ভেঙেছে।

এসব দেখে লজ্জার শেষ নেই টমআঙ্কলের। দ্যুতিদের সম্বন্ধে সব জেনেছে সে। এ বাংলোয় স্যাটেলাইট টিভি আছে। তাতে দ্যুতিদের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার খবর দেখিয়েছে। দ্যুতিরা নাকি তাদের ড্রাইভারকে জোরজবরদস্তি মাঝরাস্তায় নামিয়ে দেয়। খবর বলছে গুপ্তধনের লোভেই নাকি ভারতীয় ডাক্তার তার বোনকে নিয়ে কালাহারির দিকে গিয়েছে। ওকহানভা শহরের পাশ দিয়ে ট্রান্স কালাহারি হাইওয়ে গিয়েছে। সে সড়কে দ্যুতিদের এস ইউ ভি-কে দেখা গিয়েছে যেতে। ভাবা যায় কী মিথ্যে খবর!

টমআঙ্কল অবশ্য ওসব এখন ভুলে থাকতে বলছে। আজ দুপুর থেকে বারোবার মেল করিয়ে দিচ্ছে, আগামিকাল সকাল ন'টায় আটচল্লিশ ঘণ্টার সময় সীমা শেষ হয়ে যাবে দ্যুতিদের। কিটনার খুব খারাপ মানুষ। সে করতে পারে না এমন কিছুই নেই।

এই বাংলোর অবস্থানটাও ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে টম। অতলান্তিক সমুদ্র বরাবর স্কেলিটন কোস্টেই রয়েছে ওরা। মাইলদুয়েক দূরেই মোউই মোহানা। দেশের সড়কপথের শেষও মোউইতে। এর পর বিচে প্রবেশের অনুমতি নেই। একদম অ্যাঙ্গোলা সীমানা পর্যন্ত পুরো আড়াইশো কিলোমিটার পর্যন্ত এই নিয়ম। তবে উত্তরে নাকি গেলে সোজা পুব দিকে যাওয়া যায়, মোটামুটি ষাট থেকে আশি কিলোমিটারের মধ্যে মরুভূমির সীমানা শেষ হয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত কাওকোল্যান্ড পড়বে। সেদিকে কিছু প্রাইভেট টুরিস্ট লজ আছে। আরও পুবে গেলে ইতোসা সংরক্ষিত অরণ্যও পড়বে। ছোটখাট শহর এবং লোকালয়ও আছে। সুতরাং যা প্ল্যান করার এইসব ভেবেই করতে হবে।

একটা সুবিধে কিটনার বা অ্যাডলার এখানে থাকে না। বিশ মাইল দূরে এদের আর একটা লজ আছে। চিনা শাগরেদকে নিয়ে এখন সেখানেই আছে তারা। উইন্ডহক হয়ে চিনা শাগরেদ ফিরে যাবে তার দেশে। তারপর কিটনারেরা আবার আসবে এখানে। এ আস্তানা খুব গোপনীয় তার। ঝকঝকে লজের আড়ালে পোচিং করে আনা আইভরি, মানে হাতির দাঁতের স্টক কড়া হয় এখানে। কিচেনের নীচে আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর আছে, সেটাই গুদামঘর। কিচেন ক্যাবিনেটের একটা সাইড পুরো ফল্স। ওটার পিছনেই আছে নীচে নামার দরজা।

টমআঙ্কল যখন প্রথম কাজে ঢোকে, তখন এসব ছিল না। কিটনারেরই অন্য লজে কাজ করত। বছরখানেক আগে আনা হয়েছে তাকে। রান্নাটাই করে সে। ছাড়তে চায়, উপায় নেই। এত কিছু জেনে যাওয়ার পর তাকে আর ছাড়বে না এরা। এ বয়সে আর পালানোও সম্ভব না। এটা তাকে মোবাইল ব্যবহার করতেও দেয় না। তা হলে তো একটা ব্যবস্থা করা যেত। এখানে একটিই মোবাইল আছে, সেটি সবসময় হাংগোর কাছেই থাকে।

এখন রাত আন্দাজ সাড়ে আটটা। রাতের খাবারের সময় হয়নি। তাও টমআঙ্কল উঠে এসেছে। মুখে চিন্তার ছাপ। চিনেমাটির দুটো প্লেটে খাবার এনেছে। শুকনো মাংস, বিটলং বলে এখানে। সঙ্গে পাউরুটি। প্লেটদুটো নামাল ম্যাটেসের উপর। তারপর শুকনো মুখে বলল, "খারাপ খবর। কিটনার ফোন করেছিল হাংগোকে। হাংগো আমাকে রাতের খাবার করতে বলল। কিটনার ফিরে আসছে হঠাৎ। তবে তাদের আসতে অন্তত আধঘণ্টা সময় লাগবেই। তোমরা কী করতে তাড়াতাড়ি ভাবো। আমার হাতঘড়িতে এখন ঠিক আটটা চল্লিশ।"

কাবুলদা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ে বলল,"ভাবা আছে। তোমার শার্ট ট্রাউজার সব খুলে ফেলো চটপট। ফাস্ট!"

"মানে, তু-তুমি আমার শার্টপ্যান্ট পরবে, অত লম্বা..." আমতা-আমতা করছে টমআঙ্কল।

দ্যুতি জানে প্ল্যানটা কী। সে সাজবে আঙ্কলটম। হাইট মোটামুটি একই, অসুবিধে হবে না। একটু ঢোলা হবে, রাত্তিরে কে খেয়াল করবে। তা ছাড়া আর একটা সুবিধে আছে, কোনও কারণে রাত্তিরে আলো জ্বালানো হয় না এ বাংলোয়। আঙ্কল ভিতরে হাফপ্যান্ট পরেছিলেন। খুলতে দেরি করল না। বো-টাইও পরেনি আঙ্কলে। দু'মিনিটের মধ্যে পোশাক পরে ফেলল দুটো। নিচে ওর শার্ট আর জিন্‌স থাকায় ঢিলেঢালা ভাবটাও নেই।

কাবুলদা ইতিমধ্যে ম্যাট্রেসের কভার দিয়ে বৃদ্ধের হাত-পা বেঁধে ফেলেছে। রাকস্যাক খুলে দরকার যা লাগে, ভরছে প্যান্টের পকেটে। লাইটার, কিছু ওষুধপত্র। নাইফ। দু'ব্যাটারির একটা টর্চ। ভাগ্যিস চার পকেটওয়ালা কার্গো প্যান্ট পরেছিল। দ্যুতিরও তাই। শার্টেও জোড়া পকেট। বাবারগুলোও তাই পুরে ফেলা হল।

টমআঙ্কল বলল, "মুখটা আর বেঁধো না। আমার জামার ভিতরের পকেটে ঘুমের ওষুধ আছে। গোটাকয়েক বাকি আছে। খেয়ে নিচ্ছি। মরব না, কিন্তু কাল দুপুরের আগে চোখ খুলছি না। বলব, মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে গিয়েছ।"

পকেটে হাত দিতে টাবলেট পেয়ে গেল দ্যুতি। বৃদ্ধ সবক'টি খেয়ে ফয়েলটা দ্যুতির হাতে দিয়ে বলল, "হাংগোর গাড়ি লক থাকে না। থাকলেও চাবি নিজের পকেটেই রাখে ও। দেখে নিয়ো। আর-একটা কথা, কিচেনের পাশে স্টোররুমে ডিজেল ভর্তি কয়েকটা জ্যারিক্যান আছে। পারলে একটা সঙ্গে নিয়ো।"

সব শেষে হাতজোড় করে মার্জনা চাইল দু'জনেই। কাবুলদা টমআঙ্কলের হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, "আটটা পঁয়তাল্লিশ। আন্দাজ আর বিশ মিনিট হাতে। আমরা দশ মিনিটে সারব। ঠিক?"

"ঠিক," বলল দ্যুতি।

টমআঙ্কল বলল, "জলের বোতলদুটোও ভরে নিয়ে যাও। বেশি বড় তো না।"

ঠিক। তা নিয়ে নেওয়া হল। এবার চিনামাটির প্লেটদুটো নিয়ে নামলে দু'জনে। প্রথমে কাবুলদা। পিছনে দ্যুতি। হাংগো এ সময়ে মোজাজে থাকে। মোটা একটা চুরুট ধরায়। কানে হেডফোন। হাতে মোবাইল। কাবুলদার টার্গেট ওর কোমরে গোঁজা পিস্তলটা।

॥ ৭ ॥

সময্যা হচ্ছে সিঁড়িটা একে তো প্যাঁচানো, তার উপর এবড়োখেবড়ো আর অসমান। যত নামছে হাঁপিয়েউটাও তত লাফাচ্ছে। প্লেট ধরা হাতটা কেঁপে যাচ্ছে সমানে। জগঝম্প এটা মিউজিক বাজাচ্ছে হাংগো। নাকে আসছে তামাকের উগ্র গন্ধ। কিন্তু শব্দ, গন্ধ সব কেমন বেশি-বেশি মনে হচ্ছে না?

"হাংগো উঠে আসছে দেখে," ফিসফিস করে বলল কাবুলদা, "দেওয়ালের সঙ্গে লেপটে যা একদম।"

এক, দুই, তিন, চার... সেকেন্ড গুণে যাচ্ছে দ্যুতি। আর কত দূরে হাংগো? গানের গুঁতো আরও স্পষ্ট।

পরক্ষণেই "হে ইও ?" হাংগোর গলা। সঙ্গে-সঙ্গে কিছু একটা ঘটল, লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিঁড়ির ধাপে। পরের সেকেন্ডটাও গুনতে পারল না দ্যুতি। ঠকাস করে একটা শব্দের সঙ্গে ঠনঠন করে ভেঙে পড়ল চায়না ক্লের প্লেট। ব্রহ্মতালুতে কাবুলদার প্লেটের মোক্ষম বাড়ি খেয়ে ব্যাটা মনে হয় সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান। বেচারি। কাবুলদার পা ভেঙেছে ধরে নিয়ে একটু বেশিই লিবার্টি দিয়ে দিয়েছিল।

কাবুলদা এক সেকেন্ড দেরি করল না। হাংগোর কালো শার্ট খুলে ফেলেছে। পিস্তলও চলে এসেছে কোমরে। চুরুট আর সেলফোন দুটোই ছিটকে দু'ধাপ নিচে। মিউজিক এখনও চলছে। কাবুলদা কোনওমতে শার্টটা গলাল। তারপর সেলফোন বুকপকেটে গুঁজে চুরুটটা হাতে নিয়ে বলল, "বাছাধন আপাতত ঘণ্টাদুয়েকের আগে

উঠছে না। তবে ব্যাটার পকেটে গাড়ির চাবি নেই।"

দ্যুতির হাতে এখনও ওর প্লেটটা ধরা। উত্তেজনায় সমানে ধড়ফড় করছে বুক। এবার সবচেয়ে কঠিন কাজ। কুকুরটা ছাড়া আছে হয়তো। গা-ছাড়া হয়ে থাকলেও মালিক আসছে বলে রক্ষী দু'জন আরও বেশি সজাগ নিশ্চয়ই। প্লেট ভাঙার শব্দও হয়েছে। অবশ্য গানের গুঁতোয় যদি চাপা পড়ে কিছু।

সিঁড়ির মুখটায় হাংগোর আরামচেয়ার। এখানে বসে থাকে ব্যাটা। মিটমিট করে একটা আলোও জ্বলে বাহারি স্ট্যান্ড থেকে। তাতে আবছা-আবছা হলেও সবকিছু বোঝা যায়। তিনটে পামগ্রোভ পেরিয়ে বাংলোর ডান কিংবা বাঁ দু'দিক দিয়েই সামনে যাওয়া চলে। কিন্তু এত খোলামেলা গেটের সামনে গেলে নজরে পড়তেই হবে। বাংলোতেও ঢুকে যাওয়া যায়। পিছনের দরজাটা বন্ধ মনে হলেও খুব সম্ভব ভেজানো। টমআঙ্কল ওটা দিয়েই যাওয়াআসা করে।

কাবুলদা একটু দাঁড়াল, দু'সেকেন্ড ভেবেই বলল,"ভিতরে চল। আইডিয়া আছে।"

পিছনের দরজা ঠেলে বাংলোর ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। সামনে চওড়া লবি। দু'পাশে পরপর রুম। দুটো মাত্র রুম খোলা। একটা কিচেন। অন্যটা সম্ভবত স্টোর রুম। বাতিল আভেন, বার্নারের সঙ্গে কার্ডবোর্ডস, খাবারের প্যাকেট, টিনের ক্যান, বোতল, কী নেই। এসবের মধ্যে দেওয়ালে সারি দেওয়া অনেক তেলের জ্যারিক্যান। আদ্যিকালের জার্মান মেড। সব বিশ বিলিটারের। আর সবক'টাই দেখা গেল ডিজেলে ভর্তি। ফুয়েল পাম্পের অভাবের জন্যে তেল স্টক করে রাখা হয়েছে।

কাবুলদার চোয়াল শক্ত। চুরুটটা এখনও নেভায়নি। কিন্তু নিভে আসছে। জোরে একটা টান দিয়ে কড়া ধোঁয়াটা ফুসফুসে না নিয়ে গালে রেখেই ছেড়ে দিল, "এমন কিছু একটা করতে হবে, সিকিউরিটি গার্ডগুলো ঘাবড়ে যায়। একটা ক্যান তোল, কুইক," বলে নিজেই একটা জ্যারিক্যান তুলল।

এবার প্রায় ছুটেই কিচেন রুমে। সাকুল্যে ছয় কী সাতজন লোক। কিন্তু আয়োজন ব্যাপক। আয়তনেও বেশ বড়। আর ক্যাবিনেট তো তিন দেওয়াল জুড়েই। এর মধ্যে কোনও একটি ফলস। তার পিছনে সিক্রেট দরজা। এত কম সময়ে সেসব খোঁজার মানেই নেই। বিশ-বিশ চল্লিশ লিটার ডিজেল পুরো গড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর ডিজ়েলে ভর্তি টাইলসের মেঝেতে চুরুটটা ছুড়ে দিয়েই দরজা বন্ধ করে ছুট। প্রথমে সেঁওও করে একটা শব্দ পরক্ষণেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। ততক্ষণে ওরা পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে।

গার্ডরাও এসে পড়ল চিৎকার করে। পামগ্রোভে লুকিয়ে রয়েছে দ্যুতিরা। কুকুরটাও সঙ্গে এসেছে। কিন্তু হতভম্ব এত আগুন দেখে। কে একজন দ্যুতিকে দেখেই হয়তো "টম-টম," বলে চেঁচাল। অন্যজন ভিতরে ঢুকতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে। আগুন ছড়াচ্ছে দ্রুত।

কাবুলদা দ্যুতির হাত ধরে টান দিল। ছুটছে বাংলোর উলটো দিক দিয়ে। সামনেই হাংগোর কালো ভ্যান। কিন্তু ওঠার আগেই কুকুরটা কোত্থেকে হাজির হয়ে গেল। ওদিকে লোকগুলোও সম্ভবত গোলমাল বুঝতে পেরেছে। আফিকানে কেউ চিৎকার করে কিছু বলছে। সম্ভবত টাওয়ারে উঠতে গিয়ে হাংগোকে দেখতে পেয়েছে।

কাবুলদা বলল, "দেখছিস কী, প্লেটটা আছড়ে ভাঙ কুকুরটার সামনে।"

তাই করল দ্যুতি। শব্দ করে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল প্লেটটা। কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। কুকুরটা একটু থমকে গিয়েছে। কাবুলদা একটা গুলি ছুড়ল আকাশে। দুটো লোক ছুটে আসছিল। থমকে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। কুকুরটা গর্জন করছে খুব, কিন্তু এগোচ্ছে না। যথেষ্ট সময়।

গাড়িতে উঠে পড়ল দ্যুতিরা। সাংঘাতিক ভাগ্য! চাবি ইগনিশন সকেটেই ঝুলছে। যদিও একটা মুশকিল, গাড়িটা গেটের উলটো মুখ করে রাখা। কাবুলদা আবার একটা গুলি ছুড়েই ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। লোকগুলো এখন পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ। কুকুরটিও ঘাবড়ে গিয়েছে কেমন। এমন শব্দকল্পদ্রুম অগ্নিকাণ্ডের অভিজ্ঞতা নেই মনে হচ্ছে। এদিকে গাড়ি দ্রুত গতিতে যাচ্ছে গেটের দিকে। দু'জনেই সিটবেল্ট পরে নিয়েছে। চরম মুহূর্ত এবার। দ্যুতি চোখ বুজে ফেলল ভয়ে।

ঝনঝন করে ভীষণ একটা শব্দ হল। গাড়িটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠেই থেমে গেল। গেটদুটো এখনও ঠনঠন করে কাঁপছে।

"ধ্যাত্ত গড!" বলল কাবুলদা। চোখ খুলল দ্যুতি। গাড়ি বেরিয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিন অফ হয়ে গিয়েছে। কাবুলদা চাবি ঘুরিয়েই যাচ্ছে ইগনিশন সকেটে। ক্র্যাঙ্ক হচ্ছে না। স্টার্ট নিচ্ছে না ইঞ্জিন।

এর মধ্যে গেটের ওপার থেকে এই প্রথম একটা গুলির শব্দ হল। লোকগুলো হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। হয়তো সঙ্গে বন্দুক ছিল না এতক্ষণ। গুলিটা ঠং করে লেগে ছিটকেছে কোথাও। কাবুলদাও একটা গুলি ছুড়ল। প্রতিপক্ষ একটু চুপ। পরক্ষণেই ফের চুপ। কপালজোরে এবারেও ফসকেছে।

তবে আজ দ্যুতিদের দিন। ইঞ্জিন স্টার্ট নিল হঠাৎ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ি টপ গিয়ারে। পিছনে পড়ে রইল গুস্তাভ কিটনারের দাউদাউ বাংলো।

কিন্তু তিনশো মিটারও যায়নি। উলটো দিক থেকে জোরালো হেডলাইট ধাঁধিয়ে দেল দৃশ্যপট।

"কিটনারের গাড়ি! ফোনে খবর চলে গিয়েছে," চোয়াল শক্ত করে বলল কাবুলদা। রাস্তার একদি কে টিলা উঠেছে। অন্য দিকে নামিব মরুভূমির বালির সাগর। এ বাংলোয় ঢোকার বা বেরনোর এই একটাই গাড়ি চলার রাস্তা।

কাবুলদা সটান বালির দিকেই ঘুরিয়ে দিল ওপ্যাল।

নেহাত সমুদ্র থেকে অনেকটা দূরে ওরা। তাই চাকা পিছলোচ্ছে না। কিন্তু বেশি স্পিডও উঠছে না। সামনের গাড়িও নাছোড়বান্দা। সেও নেমে পড়েছে বালিতে। যদিও কাবুলদা প্রথম দফায় অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ওদের হেডলাইটের আলো এখনও দ্যুতিদের ধরতে পারেনি। কাবুলদা পুরোপুরি আন্দাজে চালিয়ে যাচ্ছে। হেডলাইট, টেললাইট, ডিমার সব অফ। সাংঘাতিক রিস্ক নিয়েছে ও। হঠাৎ-হঠাৎ পাথরের স্তূপ এসে যাচ্ছে সামনে। কীভাবে শেষ মুহূর্তে কাবুলদা সামলাচ্ছে ওই-ই জানে। তবে বেপরোয়া ড্রাইভে আরও অনেকটা দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলল দ্যুতিরা।

ঝাড়া একঘণ্টা এভাবে চলার পর আচমকা কিছুতে সজোরে ধাক্কা লেগে কাত হয়ে থমকে গেল গাড়ি। ফুল থ্রটল করেও উঠছে না। বরং ডিজ়েলের গন্ধ বেরচ্ছে ভগভগ করে।

হেঁচড়েপেঁচড়ে নেমে পড়ল দু'জন। স্রোভবঙ্গে জলের বোতলদুটো রেখেছিল, সটা ছাড়া নেওয়ার কিছু নেই। টুকিটাকি যা নিয়েছিল, নিজেদের পকেটেই আছে। টমআঙ্কলের জামাকাপড় গাড়িতে উঠেই খুলতে শুরু করেছিল দ্যুতি। কাবুলদার গায়ে হাংগোর কালো ফুলশার্টটা আছে এখনও। ও গাড়িটা পরীক্ষা করে বিরক্ত গলায় বলল, "ফুয়েল ট্যাঙ্কটা গিয়েছে। যাক। গোল্লায় যাক। কতটা আর এড়াব! বালিয়াড়ির দিকে চল।"

অনেক দূরে কিটনারদের গাড়ির হেডলাইটদুটো বুনো জানোয়ারের চোখের মতো লাগছে। সম্ভবত দ্যুতিদের গাড়ির টায়ারমার্ক ধরে-ধরে সাবধানে আসছে ওরা। আকাশে আধখানা চাঁদ। এতে দু'তরফেই সুবিধে। দ্যুতিরা যেমন চারপাশটা একটু আন্দাজ করতে পারছে, কিটনাররাও হয়তো ওদের স্পট করতে পারে। উপায় এখন একটাই, যতটা সম্ভব দূরে যাওয়া যায়।

যেখানে নেমেছে চারিদিকেই কেবল বালি আর বালি। মধ্যে-মধ্যে ছোট-বড়ো মাঝারি নানা মাপের পাথর। গাড়িটা বিগড়েছেও জায়েগা একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে।

দ্যুতি বলল, "বালি দিয়ে আমাদের গাড়িটা ঢেকে দিলে হয় না?"

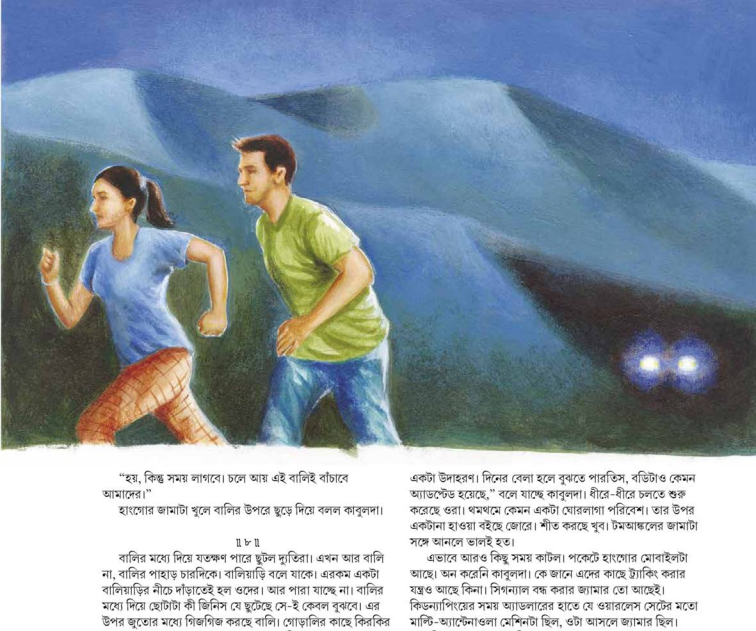

"হয়, কিন্তু সময় লাগবে। চলে আয় এই বালিই বাঁচাবে আমাদের।"

হাংগোর জামাটা খুলে বালির উপরে ছুড়ে দিয়ে বলল কাবুলদা।

॥ ৮ ॥

বালির মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ পারে ছুটল দ্যুতিরা। এখন আর বালি না, বালির পাহাড় চারদিকে। বালিয়াড়ি বলে যাকে। এরকম একটা বালিয়াড়ির নীচে দাঁড়াতেই হল ওদের। আর পারা যাচ্ছে না। বালির মধ্যে দিয়ে ছোটাটা কী জিনিস যে ছুটেছে সে-ই কেবল বুঝবে। এর উপর জুতোর মধ্যে গিজগিজ করছে বালি। গোড়ালির কাছে কিরকির করে লাগছে পা ফেলার সময়। এর চেয়ে খালি পায়ে দৌড়নো ঢের ভাল।

কাবুলদাকে এ কথা বলতে বলল, "ভুলেও জুতো খুলিস না। মানুষ না থাকলেও সাপ, বিছের অভাব নেই।"

"আর যদি পা দিয়ে বসি? দেখতে তো পাচ্ছি না সেভাবে," বলল দ্যুতি।

"সেই জন্যেই তো বললাম জুতো খুলিস না," বলে নিজেই কিছু না দেখে ধপ করে বসে পড়ল বালিতে। আর সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"সাপ?" দ্যুতি ফের দৌড়তে যাচ্ছিল।

"আরে না, দেখবি আয়," বলল কাবুলদা।

তিন-চার ইঞ্চি লম্বা একটা পুঁচকে জীব। ফুলোফুলো গোলগাল। একটা না দুটো। বালির মধ্যে ঢুকেছিল। কাবুলদা বসতে নড়েচড়ে উঠেছিল। কিছুটা ছুটে ফের বালির মধ্যেই কেমন লুকিয়ে পড়ল।

"গোল্ডেন মোল," বলল কাবুলদা।

"মানে ছুঁচো?"

"ছুঁচোরই প্রজাতি। এ মরুভূমিতেই দেখা যায়। বালির মধ্যে থাকার জন্যে কেমন নিজেকে বদলে নিয়েছে দেখলি তো, ছুঁচো বলে চিনতেই পারলি না। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দারুণ একটা উদাহরণ। দিনের বেলা হলে বুঝতে পারতিস, বডিটাও কেমন অ্যাডপ্টেড হয়েছে," বলে যাচ্ছে কাবুলদা। ধীরে-ধীরে চলতে শুরু করেছে ওরা। থমথমে কেমন একটা ঘোরলাগা পরিবেশ। তার উপর একটানা হাওয়া বইছে জোরে। শীত করছে খুব। টমআঙ্কলের জামাটা সঙ্গে আনলে ভালই হত।

এভাবে আরও কিছু সময় কাটল। পকেটে হাংগোর মোবাইলটা আছে। অন করেনি কাবুলদা। কে জানে এদের কাছে ট্র্যাকিং করার যন্ত্রও আছে কিনা। সিগন্যাল বন্ধ করার জ্যামার তো আছেই। কিডন্যাপিংয়ের সময় অ্যাডলারের হাতে যে ওয়ারলেস সেটের মতো মাল্টি-অ্যান্টেনাওলা মেশিনটা ছিল, ওটা আসলে জ্যামার ছিল। তাই কিছুতেই লাইন পায়নি কাবুলদা। সুতরাং জ্যামার থাকলে হয়তো সিগন্যাল ট্র্যাক করারও যন্ত্রপাতি আছে এদের। ফোন অন করে তাই সময়টাও দেখা যাচ্ছে না।

"দাঁড়া তো," হঠাৎ হাতটা ধরেছে কাবুলদা, "পিছনে দ্যাখ।"

তাকাতেই গা ছমছম। কী গুগুলো সিংহটিহ না তো? এমন অন্ধকারেও পাঁচ-ছটা চোখ জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। দ্যুতিরা থামতে জন্তুগুলোও থামল মনে হচ্ছে।

কাবুলদা টর্চ বের করে জন্তুগুলোর চোখে আলো ফেলতে সেগুলো একটু সরে গেল।

"শিয়াল মনে হচ্ছে," চাপা গলায় বলল কাবুলদা।

"কী করে বুঝছ?"

"ক'মাস আগে আমি একবার এসেছিলাম। তা ছাড়া হায়েনা এতটা ভদ্র না বোধ হয়। সিংহর কথা ছেড়ে দে। তবে তারাও আছেন এখানে। তোর প্যান্টের পকেটে খাবারের টুকরো আছে না, মনে হচ্ছে গন্ধে-গন্ধে এসেছে।"

ঠিক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চেপ্টে যাওয়া মাংস আর পাউরুটি বের করল দ্যুতি। শিয়ালগুলো যেন একটু নড়েচড়ে উঠল।

"ছুড়ে দেব?"

"ওদেরকে না, আমাকে দে। খুব খিদে পেয়েছে অনেকক্ষণ," বলে

দ্যুতির হাত থেকে একটা টুকরো নিয়ে দিব্যি খেতে শুরু করে দিল কাবুলদা। বলল, "চুইঙ খা।"

দ্যুতি একটু কামড়ে খেল। ইচ্ছে করছে না। ছুড়েই দিল বালিটা। সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এল শিয়ালগুলো। কাবুলদা আবার এক চুটি আলো ফেলল চোখে। তারপর ফের হাঁটা। আবার বারেবারে পিছনে তাকাতে হচ্ছে। শিয়ালগুলো কিন্তু সত্যিই ভদ্র। আর ফলো করল না।

এখনও পর্যন্ত একটুও জল খায়নি দু'জনেই। যতক্ষণ না খেয়ে পারা যায়। পাঁচশো এম এল করে মোটে এক লিটারের স্টক। এতবড় মরুভূমি পায়ে হেঁটে পেরনোর জন্যে এক ফোঁটাও ধরা যায় না। ওদিকে কিটনারররাও রয়েছে। তারা এখন খুঁজে না পেলেও সূর্যের আলো ফুটতেই নতুন উদ্যমে বেরবে। এক তো তাদের ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়েছে দ্যুতিরা। তার উপরে তাদের মুখোশেও টান দিয়েছে। মরিয়া হয়ে খুঁজবে দ্যুতিদের।

আরও ঘণ্টাখানেক হাঁটল দ্যুতিরা। এখনও সোজা বিচ বরাবর, উত্তর দিকে। কিছুটা পশ্চিমমুখীও হয়েছে। অতলান্তিক সাগরের গর্জনও বেড়েছে কানে। একেবারে বিচে না গেলেও দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে বিরাট-বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালির উপর।

সামনে বালিতে বসে যাওয়া গাড়িটারির কঙ্কাল একটা। গাড়ি না, এরোপ্লেন মনে হচ্ছে। কাত হয়ে আছে। একটা ডানা বালিতে বসে গিয়েছে পুরোপুরি। অন্যটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে দাঁড়িয়ে আছে। ককপিটের লোহার খাঁচাটার প্রায় পুরোটাই বালির নীচে। যেটুকু উপরে দ্যুতি সেখানে বসতে যাচ্ছিল, তখনই একটা কাণ্ড হল। কাউকাউ শব্দ করে কতগুলো জন্তু ডানাটার আড়াল থেকে বেরিয়েই ছুটে পালাল ওদের সামনে দিয়ে। পরক্ষণেই কানফাটানো গুড়ুম শব্দ। ওদের কিছুটা তফাতে আর একটা বালিয়াড়ির মাথা। মনে হল সেদিক দিয়ে কিছু একটা ছিটকে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে। পুরো ঘটনাটা কিন্তু চোখের পলক ফেলার মতো দ্রুত।

"নামিব মরুভূমির সস্যাটের সঙ্গে টক্করটা প্রায় হয়েই যাচ্ছিল। এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম," কাবুলদা টর্চটা বের করে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ফেলছে চারদিকে। কোনও প্রাণীর আধখাওয়া মাংস পড়ে রয়েছে ভাঙাডানার নীচে। দ্যুতি এখনও উত্তেজনায় কাঁপছে।

"প্রিয়বকের ছানা," আধখাওয়া মাংসের উপর আলো ফেলে বলল কাবুলদা, "সিংহটার শিকার। অর্ধেক ভোজনের পর মহারাজ টহল দিতে বেরিয়েছিলেন। হায়েনাগুলো সেই সুযোগে হাজির হয়েছিল। আমরাও এলাম। স্বয় মহারাজও এলেন। হয়তো আমাদের পিছনেই আসছিল নিঃশব্দে। কপাল জোরে বেঁচে গেলাম। তবে ফায়ার করেছি যখন, আপাতত নাও আসতে পারে। তুই ডানাটায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে নিতে পারিস।"

দ্যুতি এবার একটু জল খেল। কাবুলদাই খাওয়াল জোর করে। সাহস করে হাতের আড়ালে মোবাইলটাও অন করল। যা থাকে কপালে। সিগন্যাল থাকলে কোনওভাবে যদি ভারতীয় দূতাবাসে একটা খবর পাঠানো যায়। লাভ হল না। মোবাইল অন হয়েই নিভে গেল। ব্যাটারি শেষ।

"ওই জোরে মিউজিক শুনলে কি আর চার্জ থাকে?" বলল দ্যুতি, "ভাবছি, আরও একটা অ্যালবাট্রস দেখলে ভাল হত।"

"মজা করছিস? ভাল। খুব ভাল। পজিটিভ স্পিরিট। কিপ ইট আপ," বলল কাবুলদা।

টর্চ জ্বালিয়ে আরও একপ্রস্থ জায়গাটা দেখে নিল ভাল করে। সাপ বা বিছেটিছে থাকে যদি। তারপর দ্যুতিকে জোর করেই বলল চোখ বুজতে কিছুক্ষণ। প্রিয়বকের আধখাওয়া মাংসটা সামনেই পড়ে আছে। রক্তে যে গন্ধটন্ধ বেরচ্ছে না। অবশ্য যা জোরে বাতাস বইছে। মাংসটাতে পচন ধরেনি। ভেজা-ভেজা শীত কেমন।

ভাঙা ডানাটার উপরে শরীরটাকে এলিয়ে দিল দ্যুতি। পাদুটো বালিতে। স্লিপে উঠে শুয়েছে যেন। এইভাবে কি ঘুম আসে? বাড়ির কথা মনে পড়ছে। কলকাতায় এতক্ষণে ভোর হয়ে গিয়েছে। ওদের বাড়ির পাঁচিল ঘেঁসে একটা জাম গাছ আছে। একজোড়া তিলেঘুঘু ভোর না হতেই গুরগুর করে ডাকে। এখনও হয়তো ডাকছে। বাবা আজকাল সকালে হাঁটতে বেরন লেকে। মা-ও যান মাঝে-মাঝে। আজ কি গিয়েছেন? ওঁরা কেউ জানেন না দ্যুতিরা এখন কোথায়, কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে। আর কি কখনও বাড়িতে ফিরতে পারবে দ্যুতি! এসব ভাবতে-ভাবতে সত্যি-সত্যি কখন চোখ বুজে এল ওর।

॥ ৯ ॥

এ যেন রূপকথার দেশ। এক দিকে অতলান্তিক সাগরের ঘন সবুজ-নীল জল। অন্য দিকে লাল টুকটুকে বালির সমুদ্র। আর সামনে তটের উপরে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে দ্যুতিরা, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে অসংখ্য অগুন্তি রংবেরংয়ের মণিমাণিক্য। হেলায় পড়ে আছে সাতরাজার ধন মানিক।

কাবুলদা বলল, "সব সেমি প্রেশাস স্টোন। অ্যামিথিস্ট অ্যাগেট, টুরমালিন। বিচে সাধারণের অবাধ প্রবেশের অনুমতির না দেওয়ার এটাও একটা কারণ। দক্ষিণের দিকেও এরকম জেমস্টোন বিচ দেখা যায়। সেখানে ঢোকার অনুমতি থাকলেও হাত দেওয়া রীতিমতো বারণ। যা বলিস, কিটনারের তাড়ায় অভিজ্ঞতা কম কিছু হচ্ছে না।"

সে কথা আর বলতে! কেবল এই অভিজ্ঞতাটা ফাঁসির আসামির শেষ ইচ্ছের মতো হয়ে না দাঁড়ায়। ঘণ্টাখানেক হল ফের হাঁটছে দ্যুতিরা। গতকাল খানিক ঘুমিয়ে শরীর কিছুটা হলেও ঝরঝরে। কাবুলদা বলল, ও নাকি একটা সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। শিকার হয়ে পশুরাজের মাংসের স্টক যে বাড়ায়নি সেটা অ্যালবাট্রসেরই আশীর্বাদ।

আসল কথা হল, উড়োজাহাজের যে কঙ্কালের ভিতর ওরা আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে চমকপ্রদ একটি জিনিস পাওয়া গেল। সকালে কুয়াশা কম ছিল। আলো ফুটতে ডানায় অস্পষ্ট অ্যাভিয়ান লেখাটা পড়া যাচ্ছিল। কাবুলদা একটু জ্ঞান দিল, বলল, "অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্টের নাম হয়তো শুনেছিস। প্রথম মহিলা পাইলট হিসেবে সামনের ওই অতলান্তিক সমুদ্র পেরিয়েছিলেন একলা। সোলো ফ্লাইটে। খালি এটাই না, এরকম অনেক কীর্তি আছে অ্যামেলিয়ার। প্রথম দিকে এই অ্যাভিয়ান প্লেনই চালাতেন অ্যামেলিয়া।"

অ্যামেলিয়ার নামটা দ্যুতি জানত। যদিও সাহসী এই মহিলার পরিণতিটা এখনও রহস্যময়। প্লেনে গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন। একদম শেষের মুখে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপের কাছে নিখোঁজ হয়ে যান। আজ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত কোনও তথ্য মেলেনি অ্যামেলিয়া বা তাঁর সঙ্গী ন্যাভিগেটরের।

কাবুলদাকে বলতে চোখ গোল-গোল, ভেবেছিল দ্যুতি জানে না।

যাই হোক, প্লেনটা দেখবে বলে উৎসাহ নিয়ে বালিটালি অনেকটা সরিয়েছিল ওরা। প্লেনটা আসলে টু-সিটার বাই-প্লেন। মানে দু'জোড়া ডানা। কেবিনের নীচ দিয়েও একজোড়া ডানা রয়েছে। সে দুটোর হাল খুব খারাপ। খোঁড়াখুঁড়ি করে মনুষ্যদেহাবশেষ কিছু না মিললেও ইঞ্চি ছয়েকের একটা বাক্স পাওয়া গেল। অনেকটা চশমার কেসের মতো দেখতে। তামা বা নিকেলটিকেলের তৈরি। রং চটে যাওয়া ঢাকনায় অস্পষ্টভাবে লেখা অ্যামো বক্স।

কাবুলদা বলল, "অ্যামো মানে অ্যামিউনিশন। বুলেট রাখা হয়। আদিকালে এমন সব বাক্স ব্যবহার হত।"

তবে বাক্সে বুলেট নেই। খোপটোপও নেই। রয়েছে কালচে হয়ে যাওয়া একটা মেডেল। সম্ভবত ব্রোঞ্জের। একপিঠে লেখা GEORGIVS V BRITT —সঙ্গে রাজা পঞ্চম জর্জেরই ছবি খোদাই করা। উলটো পিঠে তরোয়াল হাতে অশ্বারোহী। সেটা নাকি সেন্ট জর্জের ছবি। সঙ্গে ইংরেজিতে ১৯১৪-১৯১৯ লেখা। মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এই স্মারক। মেডেলের নিম্নে প্রাপক

এবং তাঁর রেজিমেন্টের নামটাম লেখা। কিন্তু কেবল A SCOTT টুকুই পড়া যাচ্ছে।

"পাইলটের পদবি যে স্কট এটায় সন্দেহ নেই। সে ক্ষেত্রে ফ্রেডরিক লোকটাকে কি বিশ্বাস করা যায়? তার ঠাকুরদা বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করে মেডেল পেয়েছিলেন, হতে পারে এটাই সেই মেডেল। এ মানে অ্যালান," বলেছিল দ্যুতি।

"এখনই বলা যাচ্ছে না। এ দিয়ে অসংখ্য নাম আছে। তা ছাড়া ফ্রেডেরিকের দাদু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই মেডেলটি ১৯১৪ থেকে ১৯১৯, মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া মুশকিল। তা ছাড়া মনে রাখিস, অ্যাডলার রুপার্টের সেক্রেটারি ছিল। আলেকজান্ডার স্কট নামটা জানা স্বাভাবিক। আমার ধারণা, ফ্রেডরিকও এদের লোক," মেডেলসুদ্ধ বাক্সটা পকেটে পুরে বলেছিল কাবুলদা।

"তা হলে তো পিটার আগুটাকেও সন্দেহ করতে হয়," বলেছিল দ্যুতি।

"ঠিকই। সন্দেহের উপর কেউই নেই," বলেছিল কাবুলদা। হাঁটতে-হাঁটতে সৈকতের কাছে চলে এসেছিল ওরা তখন। দূর থেকে পাথরগুলো কী সুন্দর রং ছড়াচ্ছিল।

"একটাও কি আমরা স্মারক হিসেবে নিতে পারি না?" অনেকটা চলার পর রক্তপাতস্তরের শেষ সীমায় এসে বলেছিল দ্যুতি।

"সামনে হয়তো আরও থাকতে পারে। তবে খুব দামি না এগুলো। উইন্ডহকে দেখিসনি, ফুটপাতে দোকানে সবাই পসরা সাজিয়ে বসে থাকে।"

তা বটে। ওকহানডজাতেও দেখছিল দ্যুতি। ডালা সাজিয়ে আফ্রিকান মেয়েরা সব বসে আছে ধংবেরঙের পাথর নিয়ে। ঘরে রাখার শো পিস থেকে শুরু করে হার, দুল, বালা, সব নানা রঙের পাথর বসানো। তবে দামের কথা কে ভাবছে! একটা ডিপ সবুজের সঙ্গে লালচে আভাওলা ইঞ্চিদুয়েক লম্বা পাথর হাতে নিয়েও থমকে গেল ও। পাথরটার একটু তফাতে বালির নীচ থেকে কী একটা প্রাণীর হাড়ের অংশ বেরিয়ে আছে মাথা তুলে। দেখেই বুকটা ধক করে উঠেছে দ্যুতির। ফেলে দিল পাথরটা। কী-ই বা করবে নিয়ে। প্রাণটা নিয়েই ফেরা বড় কথা এখন!

চিন্তাটা হতেই গরম লাগল ওর। মরুভূমি তার আসল রূপ ধরতে শুরু করেছে। ভুলেই গিয়েছিল কী পরিস্থিতিতে রয়েছে।

কাবুলদাও বলল, "জোরে-জোরে পা চালা। গরমটা বাড়ছে টের পাচ্ছিস তো, পঞ্চাশ-ষাট ডিগ্রি উঠে যায় এসময়ে। পোকাগুলোও পালাচ্ছে সব।"

পোকা! হ্যাঁ, তাই তো। বালির উপরে সার দিয়ে অনেক কালো রঙের পোকা পিঠ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা গুটি-গুটি হাঁটাও লাগিয়েছে।

কাবুলদা বলল, "ফগ বিট্‌ল বলে এগুলোকে। জুলজি নিয়ে পড়ছিস, ভাল করে দেখে নে। জীবনসংগ্রামের আশ্চর্য টেকনিক। পিঠটা একটা নির্দিষ্ট কোণে উঁচু করে আছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোরের কুয়াশায় যে জলকণা থাকে, সেগুলো পিঠে জমানো। কাচে যেমন বাষ্প জমে। জমতে-জমতে চার-পাঁচ মিলিমিটারের মতো একটা বড় ফোঁটা তৈরি হয় জলের। তারপর তাঁটা নেমে এদের মুখে। এভাবেই জল খেয়ে তেষ্টা মেটায় এরা। জল জমার জন্য এদের পিঠও কাচের মতো মসৃণ। দারুণ না?"

সত্যিই দারুণ। এক ইঞ্চি মতো লম্বা কালো-কালো পোকা। দু'-চারটের কালোর উপরে সাদা দাগও আছে। পিঠগুলো চকচক করছিল রোদ্দুরে। অভিজ্ঞতার ঝুলি বেড়েই চলেছে। শুধু এইসব নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

এদিকে তাপমাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কোনও একটা ছায়াটায়া খুঁজে না পেলে সাংঘাতিক অবস্থা হবে। সুতরাং ফের হাঁটতে শুরু করেছিল দ্যুতিরা। কিছুটা এগোনোর পর কক-কক-কক করে অদ্ভুত আওয়াজ। উৎসটা হল সিল ফিশ। বিচের ধারে বোল্ডারের উপরে শয়ে-শয়ে দিব্যি শুয়েছিল। কেউ-কেউ হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিল, খেলছিল। ডিসুমঢাসামও করছিল কয়েকটা। এসবের মধ্যে ইতিউতি কয়েকটা সেই শেয়াল ঘুরছিল। পুরো গা-টা লালচে। মাথার পিছন থেকে মোটা লেজের আগে পর্যন্ত কুচকুচে কালো। নামটাও তাই সেরকম ব্ল্যাক ব্যাকড জ্যাকেল।

এই শিয়ালগুলো কিন্তু সিল শিকার করে না। ছানাটানা কোনও একটা মরে গেলে তবেই সেটাকে মুখে তুলে খাবে। তা ছাড়া হায়না আসলে শিয়ালগুলোকেই সাবধান করে আগেভাগে। সিলদের সঙ্গে শিয়ালগুলোর এরকম মিথোজীবীত্ব এই মরুভূমির নাকি আরও একটা আশ্চর্য ঘটনা।

সিলদের অতিক্রম করে তীর ছেড়ে বালিয়াড়ির চূড়া দিয়ে এগোচ্ছিল ওরা। এতে অনেক দূর পর্যন্ত নজর থাকে। এই সময় একসঙ্গে চার-পাঁচটা সিংহর দলের সঙ্গে দেখা। সোজা ওদের দিকেই তাকিয়েছিল ঠায়। শরীরের সব রক্ত যেন জমে গিয়েছিল দ্যুতির।

"হাংগোর বন্দুকে আর একটিমাত্র বুলেট আছে। খরচ করে লাভ নেই। রুট পালটানো বেটার। ব্যাটারা যদি ফলো করে তখন ভয় দেখানো যাবে। তা ছাড়া রাত্রিবাসের ব্যাপারও আছে। সেক্ষেত্রে আরও কত কিলোমিটার হাঁটতে হবে ঠিক নেই," চিন্তিত গলায় বলেছিল কাবুলদা।

সেই থেকে উত্তর ছেড়ে পূব দিকে হাঁটছে দ্যুতিরা। গতি খুব কম। ঠিক যে নাক বরাবর চলেছে তাও বোঝার উপায় নেই। দিক ভুল করলে একই পথে চক্কর দিতে হবে। কয়েকটা গাড়ির কঙ্কালও নজরে পড়ল। বালিতে আটকে বালুকা সমাধি হয়েছে। কাবুলদা বারেবারে পিছনে দেখছে। পিছন কেন, সব দিকেই। পশুরাজের দল যে কোথায় ঘাপটি দিয়ে আছে কে জানে।

কাবুলদা বলল, "সিংহগুলোর গলায় মনে হল রেডিয়ো-কলার লাগানো আছে। মানে, সব ক'টাই প্রোটেক্টেড। গুলিটুলি করে মারলে আর দেখতে হবে না। এমনিতেই হ্যান্ডগান রয়েছে সঙ্গে। রাইফেল ছাড়া যে-কোনও রকম হ্যান্ডগান বা অটোমেটিক গান নিষিদ্ধ এখানে।"

যাই হোক, সিংহগুলো পিছু নেয়নি আপাতত। কিন্তু মরুভূমি কেমন অঞ্চল, হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে এতক্ষণে। সূর্য একদম মাথার উপর। আক্ষরিক অর্থে চাঁদিফাটা গরম বলে যাকে। পায়ের নীচেও ঝলসানো বালি। প্রাণান্তকর অবস্থা। পেটেও আর কিছু না ফেললে নয়। তেষ্টাতেও ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জলের বোতল দু'জনেরই অর্ধেকে নেমেছে।

একটু করে জিরোনো, ফের চলা। রোদে ভাজা-ভাজা অবস্থা। আড়াল নেই কোথাও। যত দূর চোখ যায় বালি আর বালি। এদিকে টুরিস্ট গাড়ির অনুমতি না থাকলেও আকাশপথে ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। চার, সাত কী বারো সিটারের ছোট-ছোট প্লেনে করে ঘোরানো হয় টুরিস্টদের। এরকম একটা প্লেনও নজরে এল না এখনও পর্যন্ত।

তবে বন্য নামিবিয়ার বুনোদের কিছু দেখার সৌভাগ্য হয়েই চলেছে। তাপমাত্রার সঙ্গে দেহের রং-পালটানো নামাকুয়া ক্যামেলিয়ন, বালিতে ডলার জন্য হাঁসের মতো লিপ্তপদ তক্ষক, চরকির মতো ঘড়িয়ে চলা হুইল স্পাইডার কিংবা এই সবে একদল মিরকাটের সঙ্গেও মোলাকাত হল।

একটা বালিয়াড়ির উপর থেকে নীচে নামার সময় দলটাকে দেখা গেল। বেজির মতোই দেখতে। বেজিরই একটা প্রজাতি। সামনের পা দুটো নিচের দিকে রেখে পিছনের দু'পায়ে দিব্যি দাঁড়িয়েছিল টিমটা। হঠাৎই তীক্ষ্ণ হুইস্‌লের মতো ডাক দিয়ে নিমেষে সব উধাও। দ্যুতি ভেবেছিল ওদের দেখে পালাল। পরক্ষণেই প্রায় কাবুলদার মাথা ঘেঁষে ইয়া বড় একটা বাজপাখি উড়ে গেল সাঁই করে।

একটুপর অদ্ভুত দেখতে গাছ দেখা গেল। লিলি জাতীয় ফুলের পাতার মতো লম্বা-লম্বা হলদেটে সবুজ পাতা গাছটার। ডগা আর ধারের দিকগুলো প্রচণ্ড গরমেই হয়তো কুঁচকে গিয়েছে। পাতাগুলো যেন বালির থেকেই বেরিয়ে অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো ছড়িয়ে গিয়েছে চারদিকে। অন্তত দশ ফুট ব্যাসের জায়গা নিয়ে গাছটা হয়ে আছে। লম্বাতেও দ্যুতির মাথা পর্যন্ত।

কাবুলদা একটু উৎসাহ পেয়েছে গাছটা দেখে। ঘুরে-ঘুরে দেখছে। বলল, "খুব ভাল করে দেখে নে। গতবারেও একটা দেখেছিলাম। সেটা কোস্টের একটু কাছে ছিল অবশ্য। সারা পৃথিবীতে একমাত্র এই মরুভূমিতেই এই গাছ দেখা যায়। নামিবিয়া আর উত্তর অ্যাঙ্গোলায়। নামটা একটু খটমটে। অয়েলিটিঙ্কিয়া, এর আবিষ্কর্তা অষ্ট্রিয়ান বটানিস্টের নামে নামা। এক-একটা গাছ কত বছর বাঁচে ভাবতে পারবি না, এক থেকে দু'হাজার বছর!"

দ্যুতি আর দাঁড়াতে পারছিল না। তবুও কাবুলদার কথা শুনে আর একবার ভাল করে গাছটা দেখল। এমন সময় মনে হল দূরে একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে।

কাবুলদা বলল, "গাছটার আড়ালে বসে পড়। কিটনারের দলবল না হলেই বাঁচি।"

লোকটার নাম শুনলে রাগে যেমন সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে তেমনি বুকের ভিতরটা কেমন ধকধক করেও ওঠে। গাছটার পিছনে দ্যুতি হামাগুড়ির কায়দায় বসে পড়ল। কাবুলদাও তাই করেছে। লম্বা বলে বালির মধ্যে প্রায় শুয়েই পড়েছে।

খেলনার মতো একটা গাড়ি চলে গেল অনেকটা দূর দিয়ে। মনে হল ল্যান্ডক্রুইজার টাইপ কিছু একটা ছিল। কিটনারের হওয়াও অসম্ভবের না।

ঠিক এই সময় সাংঘাতিক কাণ্ডটা হল।

সাপের কামড় খেল কাবুলদা।

মাত্র দু'-তিন মিনিটের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। সাপটাকে লক্ষ করেনি। অবশ্য লক্ষ করাও কঠিন ছিল। সাপটা বালির মধ্যে পুরো শরীরটা লুকিয়ে শুধু চোখদুটো বের করে রেখেছিল। এই সাপগুলো নাকি এমনই হয়। বালির মধ্যে ঘাপটি দিয়ে থাকে। সে জন্য সাধারণ সাপের মতো এদের চোখ মাথার দু'ধারে না হয়ে মাথার সামনে থাকে পাশাপাশি। কাবুলদাকে কামড়েছে গোড়ালির একটু উপরে। শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়াতে ঠিকমতো ছোবল দিতে পারেনি। সরু পেরেক ফোটার মতো লাল একটা ক্ষতচিহ্ন।

ওই অবস্থাতেও সাপটাকে দেখার কাবুলদা। কমলাটে বাদামি রং। পিঠে অনিয়মিত হলদেটে ছ্রাইপের সঙ্গে ছোট-ছোট কালো স্পট। আর একদম পুঁচকে। একফুটও হবে না। বালিতে এস-এর মতো ঢেউ তুলে খুব তাড়াতাড়ি সাপটা উধাও হল। রয়ে গেল কোনাকুনি কতগুলো সমান্তরাল দাগ। পিছন থেকে পালাচ্ছিল বলে চোখদুটো দেখা গেল না ঠিক করে।

কাবুলদা ইতিমধ্যে প্যান্টের পকেট থেকে অ্যান্টিবায়োটিক মলম বের করে ক্ষতের উপরে লাগিয়েছে। রুমাল দিয়ে জায়গাটা বাঁধতে-বাঁধতে বলল, "ঘাবড়াস না। বিষে জোর নেই এ সাপের। মরছি না।"

"তুমি ঠিক জান?" খুব ভয় করছে দ্যুতির। শরীরটা শিরশির করছে কেমন।

"জানি না!" বলল কাবুলদা, "সাইড-ওয়াইন্ডার স্নেক। নামটা এসেছে ওইরকম অদ্ভুত গতির জন্য। আবার ওইটুকু সাইজ বলে ড্যুয়ারফ-অ্যাডারও বলা হয়। বুঝতেই পারছিস ইনিও এই মরুভূমিরই লোকাল জীব।"

"বুঝেছি," ম্লানমুখে বলল দ্যুতি। কাবুলদা যতই সাহস দেখাক, ভয় যাচ্ছে না ওর।

বিষ যাতে ছড়াতে না পারে সে জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্রাম নিল কাবুলদা। তারপর আবার হাঁটা। আন্দাজ ঘণ্টাদুই হাঁটার পর অবশেষে টোপোগ্রাফির পরিবর্তন হল কিছুটা। কিন্তু আচমকা আকাশটাকাশ কালো হয়ে বৃষ্টি নামল হঠাৎ। বালির মধ্যে ন্যাড়া-ন্যাড়া টিলা পাহাড়। তাতেই আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল কিছুক্ষণ। দু'জনেই ভিজে চুপ্পস। একটু পরে শেষ বিকেলের রোদও উঠল আবার। দ্যুতিকে আড়াল করতে গিয়ে কাবুলদার অবস্থাই অবশ্য বেশি খারাপ। পুরো বৃষ্টিটা নিজের মাথায় নিয়েছে, হাঁচল কয়েকবার।

এভাবেই ফের কিছুক্ষণ হাঁটার পর সামনে ষাট-সত্তর ফুটের মতো উঁচু একটা টিলা। চারিদিকে ছোট-বড় পাথরে ভর্তি। একটা দিকে বড় একটা পাম গাছ। বেশ অদ্ভুত দেখতে। লম্বায় তিরিশ ফুট মতো হবে। মোটা গুঁড়ি। সেটা আবার রোদে পোড়া মাটির মতো ফেটে-ফেটে গিয়েছে যেন। ডালপালা সব গাছের ডগায়। অ্যালোভেরার মতো গোছা-গোছা মোচার মতো পাতা। সেগুলো সব যেন উলটে হয়ে যাওয়া ছাতার মতো আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

কাবুলদা বলল, "কুইভার ট্রি। অ্যালোভেরা প্রজাতির। গাছের ছালগুলো নরম বলে আদিবাসীরা ধনুক রাখার কুইভার, মানে তূণ বানায়। তার থেকেই নাম। এছাড়াও আরও কীসব গুণটুন আছে যেন। কান্ডের তৈরি পাত্রে জল রাখলে ঠান্ডা থাকে অনেকক্ষণ। খাবারও রাখা যায়, চট করে পচন ধরে না। ভাবছি আজকের রাতটা এখানেই থাকি। টিলার উপরে উঠে বসব। জানোয়ার এলে সামনে দিয়েই আসবে। একটু বিশ্রামের দরকার আজকে, আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।"

বিশ্রামের যে দরকার তা তো দ্যুতি বুঝতেই পারছে অনেকক্ষণ ধরে। বিষ নেই বললেও যন্ত্রণা যে হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরেই বাঁ পাটা টেনে-টেনে হাঁটছে। খিদেতে পেট জ্বলছে, তাও বমি করল একবার। সবুজ পিত্ত জল ছাড়া কিছুই বেরল না। জোর করে বোতলের বাকি জলটা খাইয়ে দিল দ্যুতি। এখন আর এক ঢোকের বেশি জলও নেই।

"আশপাশে শুকনো ঘাস আছে। যতটা পারিস উপড়ে আন। খুব সাবধান, ভাল করে দেখে নিবি চারিপাশ। সন্ধে নামতে দেরি নেই," কথাগুলো খুব কষ্ট করে বলল কাবুলদা।

"খুব ভয় করল দ্যুতির। কাবুলদার কিছু হলে সর্বনাশ! এই খাঁ-খাঁ প্রান্তরে কী করবে ও একলা-একলা!

ঘাস নিয়ে ফিরতে দেখে কাবুলদা বাঁ পা তুলে চিত হয়ে শুয়ে আছে। চোখ সূর্য ডুবে যাওয়া আকাশের দিকে স্থির। দ্যুতির বুকটা ধক করে উঠল।

"অ্যাই কাবুলদা?" বলে ডাকতে মাথাটা ওদিকে ঘুরিয়ে দেখল একপলক। তারপর বলল, "খাবার পেলি কিছু?"

"খাবার?" এই রে ভুল বকছে নাকি।

"ঘাস আনতে গিয়েছিলাম না, রাতে লাগবে।"

"ঘাস? তা ভাল। ঘাসে আছে ভিটামিন। গোরু, ভেড়া, অশ্ব ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে," আকাশের দিকে মুখ করে উদাস গলায় বলল কাবুলদা।

॥ ১০ ॥

রাত্রিটা কী ভয়ঙ্কর কাটাল দ্যুতি!

বিষের প্রকোপে, না বৃষ্টিতে ভিজে কে জানে একটু পর জ্বর এল কাবুলদার। সঙ্গে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ছিল। ওষুধগুলো ভাগ্যিস বৃদ্ধি করে নিয়েছিল কাবুলদা। বৃষ্টি একটা উপকারও করেছে, বোতলদুটোয় কিছুটা জল ভরে গিয়েছে। তার একটু খরচ করে ওষুধটা কোনওমতে খাওয়াল দ্যুতি। বাচ্চা ছেলের মতো খেল অবশ্য। তারপর আবার উলটোপালটা কথা। এর মধ্যে একদল জেব্রা কোত্থেকে এসে হাজির। আকাশে তখনও আলোর সামান্য রেশ রয়ে গিয়েছে। কাবুলদাকে জোর করে ঠেলে দেখাতে গম্ভীর হয়ে বলল,

"জেব্রা দু'রকমের, পাহাড়ি আর সমতলের জেব্রা। এগুলো পাহাড়ি। মানুষের শিকারের ঠেলায় এরাও নির্মূল হতে বসেছে। বুঝলি?"

"হ্যাঁ।"

"এদের বিশেষত্ব কী জানিস?"

"কী?"

"গায়ের ষ্ট্রাইপ দেখে এরা একে অন্যকে ঠিক চিনে রাখে। হাজার চেষ্টা করলেও তুই, আমি পারব না। মেমারিটা ভাব।"

"দারুণ তো," ভাল লাগছিল দ্যুতির, স্বাভাবিক হচ্ছে তা হলে কাবুলদা।

জেব্রার দলটা চলে যাওয়ার পর পকেট থেকে একটা চকোলেটের প্যাকেট বের করল দ্যুতির। চকোলেট গলেটলে যাচ্ছেতাই অবস্থা। অসুবিধে নেই। ফয়েলের ভিতরেই তো আছে। কাবুলদাকে খাওয়াল জোর করে। রাত বাড়ছিল। লাইটার খুঁজে শুকনো ঘাস ধরাল। পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে নিভে গেল। কাবুলদা ফের যেন ঝিমিয়ে আসছে। জ্বরটা কমেনি, তবে বাড়েওনি নেশে হচ্ছে। কিন্তু বড় আবোলতাবোল বকছে।

শেষে দ্যুতি জোরে ধমক দিল, "অ্যাই কাবুলদা কী হচ্ছে, ইয়ার্কি করছ? কোথায় আছি আমরা খেয়াল আছে?"

"কে দ্যুতি?" চোখের পাতা কি বুজে আসছে? জোর করে যেন তুলে ধরে দেখল ওকে, "ভয় পাস না। আমার সঙ্গে বন্দুক আছে। কিটনার কিছু করতে পারবে না তোকে। কীটের মতোই বুটের ডগায় পিষে ফেলব ব্যাটাকে। তুই শুধু একটা কাজ করিস মনে করে। মেডেলটা সত্যিই ফ্রেডরিকের সম্পত্তি হলে ওকে ফেরত দিস," বলেই পকেট থেকে সেই অ্যামো বাক্স বের করে দিতে গেল দ্যুতিকে। বাক্সটা ঢাকনা খুলে পড়ল পাথরের উপর। মেডেলটা ছিটকে বেরয়নি, ভিতরেই রয়েছে। বাক্সটা তুলল না দ্যুতি। ইচ্ছেই করছে না। কাউকে কিছু দেবে না দ্যুতি, যতক্ষণ না কাবুলদা ঠিক হচ্ছে।

এদিকে রাত যত বাড়ছে, চারদিকেই কত রকম আওয়াজ। খসখস। খচরমচর। গতকাল রাতেও এসব যেন টের পায়নি দ্যুতি। হায়না না শিয়ালের একটা দল ঘুরে-ঘুরে আসছে থেকে-থেকে। নাকি বুনো কুকুর? বুনো কুকুর কি আছে এ প্রান্তে? আছে বলছিল কাবুলদা। খুব বিপন্ন হয়ে টিকে আছে। আবার কিছুটা শুকনো ঘাস ধরাল দ্যুতি। চারপেয়ে শ্বাপদের দলটা একটু থমকে গিয়ে সরে পড়ল এবার।

কাবুলদা কিছু একটা বলল বিড়বিড় করে। বুঝতে পারল না দ্যুতি। গায়ে হাত দিতে মনে হল জ্বরটা আবার বাড়ছে। বিষাক্ত কিছু কামড়ায়নি তো? সেৎসি মাছির উপদ্রব নামিবিয়ায় না থাকলেও ম্যালেরিয়া বা মশাবাহিত রোগভোগ ভালই আছে। কাবুলদার কাজের মধ্যেও সে নিয়েও প্রচুর কর্মসূচি ছিল। ওতজিয়ারোন্দো সে জন্যেই যাচ্ছিল। আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন, ভ্যাক্সিনেশন কত কী আয়োজন করেছিল ওর এন জি ও।

সব বাতিল হয়ে মানুষটা নিজেই এখন জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। আশ্চর্য যে পিটার আগুটা, এলমোসাহেব কেউ কিছুই করে উঠতে পারল না এখনও। কালাহারির দিকে যেতে দেখা গিয়েছে বলেই কি খোঁজাখুঁজি সব বন্ধ? কে জানে! আর এটা রটাল কে? ডানিয়েল? সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হল কে জানে। গাড়িটা কালাহারির রাস্তাতেই বা দিকে গেল কী করে? এরাই নিয়ে গিয়ে রটিয়ে দেয়নি তো!

আগুনটা নিভু-নিভু হয়ে আসছে। আরও কিছু ঘাস দিল দ্যুতি। স্টকে আর বেশি নেই। রাতের সবে শুরু। একটা কাজ করবে কী? কুইভারের বাকল কিছু ছিঁড়ে আনলে হয়। বড়-বড় আঁশের মতো হয়ে লেগে আছে গুঁড়িতে। কয়েকটা খসাতে পারলে রাতটা কেটে যেতে পারে। একটু রিস্ক নিতে হবে খালি। তা হোক। আরও কিছুটা ঘাস আগুনে ফেলে সাহসে ভর করে পাথর টপকে গাছটার দিকে এগোল ও। দেব-নাইফ আছে। খুব একটা কষ্ট করতে হল না। বড়-বড় কিছু ছাল জোগাড় হয়ে গেল। ইস, আর একটু আগে যদি বুদ্ধিটা আসত!

কিন্তু ফিরে এসে আর এক কাণ্ড!

কয়েকটা কাঁকড়া-বিছে এসে হাজির কোত্থেকে। আগুন নেভেনি, কাবুলদার পায়ের দিকে বিকিধিক জ্বলছে, তাও বিছেগুলো এসেছে। চার-পাঁচটা। পাথরের খাঁজেখাজে ছিল হয়তো। প্রথমটায় মেয়াল করেনি দ্যুতি। গাছের ছালগুলো পাথরের উপরে রাখতে গিয়ে নজরে পড়ল ভীষণদর্শন কীটগুলোকে। চকোলেটের ছেঁড়া প্যাকেটটাকেই ধরেছে। চকোলেটের গুঁড়োটুড়ো লেগে আছে। জুতোর সোল দিয়ে দু'-চারটে তক্ষুনি খতম করল দ্যুতি। মারতে ইচ্ছে না করলেও ভয়েই করল। দু'-তিনটে বেশ স্পিডেই পাথরের নীচে-টিচে কোথাও পালাল। কৃচকুচে কালো রঙের সব ক'টা। গা শিরশির করছিল দ্যুতির। দু'-তিন ইঞ্চি খুদে থেকে পাঁচ-ছ'ইঞ্চির ধেড়েও ছিল। হুলগুলো কয়েল হয়ে উঁচিয়ে রয়েছে পিঠের উপর। বিঁধলে কী হবে ভগবানও জানেন না। পুঁচকে একটা পোকার কামড়েই যা অবস্থা হয় এখানে।

অ্যামো বাক্সটা ঠকাস করে বন্ধ করে শার্টের ঢোলা পকেটদুটোয় ভরল। কাবুলদা ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকটা ওঠানামা করছে ভীষণ জোরে-জোরে। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে না তো! তবে জ্বরটা মনে হয় গিয়েছে। ঘাম হচ্ছে। তাও একটু হালকা লাগল। লাইটার ধরিয়ে সদ্য আনা গাছের একটা ছাল ধরাল। নরম শুকনো কাঠ। ধরতে সময় লাগল না। ধুনো-ধুনো একটা গন্ধও বেরোচ্ছে। এবার জ্বলন্ত ছালটা ধরে কাবুলদার চারপাশটা দেখে নিল ভাল করে। বিশেষ করে শরীরের ধারটারগুলো। পকেটগুলোও বাদ দিল না। বিছেটিছেগুলো আবার ঘাপটি না মেরে থাকে।

নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে না-বসতে গুড়গুড় করে উঠল আকাশ। সঙ্গে ই সি জি কার্ভের মতো বিদ্যুতের ঝলসানি। সর্বনাশ! আবার এক চোট বৃষ্টি আসবে নাকি? আকাশের অবস্থা কখন এমন হল খেয়ালই হয়নি। তারাটারা উধাও হয়ে কেমন ধোঁয়াটে একটা রং হয়ে আছে আকাশের। থেকে-থেকে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। একসঙ্গে হাজার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ যেন। মুহূর্তে গোটা প্রান্তর ধরা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। কী মায়াময় দৃশ্য! সায়েন্স ফিকশন মুভিতে দেখা গ্রহান্তরের কোনও এক কন্ধারালে চলে এসেছে যেন। এমন সংকটেও কতক্ষণ হাঁ করে বসে থাকল দ্যুতি।

একটা সময় হয়তো চোখ দুটো লেগে গিয়েছিল। চটকটা ভাঙল ধপ করে একটা আওয়াজে। পাথরের উপরে পাথর পড়লে যেমন আওয়াজ হয় তেমন একটা শব্দ হল যেন। আগুন প্রায় নিভু-নিভু। তবে আকাশ কখন পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে দ্যুতি শব্দের কারণ বুঝতে পারল। ভাগিয়স!

জ্বলন্ত চোখের একটি শ্বাপদ ধারের পাথরগুলোর উপর থেকে চাতালে লাফ দিয়েছিল জব্বর। কিন্তু ক্যালকুলেশন ঠিক মেলেনি। পিছলে গিয়ে পড়েছে নিচের পাথরগুলোর উপর। সেগুলোরই দু'-চারটে স্থানচ্যুত হয়ে আরও নীচে পড়েছে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। কাবুলদার বন্দুক কোমরেই গুঁজে রেখেছিল। দেরি না করে ট্রিগার টেনে দিল দ্যুতি। আগুনের হলকার সঙ্গে গুলি ছুটল ভীষণ শব্দ করে। পশুরাজের মতো আফ্রিকান চিতাও উধাও হল চোখের পলকে।

কাবুলদার ঘোর কেটে গিয়েছে, ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। দ্যুতির হাত কাঁপছে এখনও। গুলিটা কি জখম করল চিতাবাঘটাকে? মনে হয় না। তাক তো করেনি। গুলি করেছে শুধু। ওর নিজেরই দোষ। কী করে যে চোখ লেগে গেল!

কাবুলদা সব শুনে বলল, "তুই রেস্ট নে এবার, আমি জাগছি। বন্দুকটা দে।"

কিন্তু বন্দুক দেব কী দ্যুতি, কপালে হাত দিয়ে দেখে আবার জ্বর এসেছে। গা বেশ গরম। ট্যাবলেট বের করে খাইয়ে দিল জোর করে।

কিন্তু শোবে না কিছুতেই। জোর করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বসে থেকে-থেকেই মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে।

খুব খারাপ হয়ে গেল দ্যুতির মনটা। যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভিতর রয়েছে। সত্যি বলতে ওর নিজের শরীরটাও আর বইছে না। সেই কখন একটু চকোলেট খেয়েছিল। তারপর কয়েক ঢোক জল ছাড়া পেটে আর কিছু পড়েনি। অথচ খিদেটিদেও যেন কিছু পাচ্ছে না। যেটা পাচ্ছে, তা হল ঘুম। ভীষণ ঘুম। আর সাংঘাতিক অবসাদ। কিন্তু না, মনকে শক্ত করল দ্যুতি। ফাঁড়া তো একবার না, অনেকবার গেল। এখন আর হার মানবে না কিছুতেই।

চিন্তাটা হতে শরীরেও যেন শক্তি ফিরল কিছুটা। গাছটার কিছু ছাল, কিছু ঘাস যা ছিল, নিজেদের চারদিকে জ্বালাল গোল করে। ফের চাঁদ উঠে দিগন্তরেখায় ঢলে পড়েছে কখন। ভোর হতে বেশি দেরি নেই।

একটা সময় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল দ্যুতি। চোখ খুলতে মনে হল ঘোড়ায় চড়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ডাকছে ওর নাম ধরে। উঁহু, ওর নাম না। কাবুলদার নাম ধরে যেন। নামও না, ডাক্তার বলে ডাকছে। এবার উঠে বসল দ্যুতি। ওরে বাবা, লোকটার হাতে একটা তিরধনুক!

॥ ১১ ॥

উঠে বসল দ্যুতি। ঘোরটা কেটেছে। সকাল হয়ে গিয়েছে কখন। আকাশ যদিও ফের মেঘলা। এবং স্বপ্নটন্না, সামনে সত্যিই একটি লোক এসে হাজির হয়েছে। তবে ঘোড়া না, গাধা মনে হচ্ছে। যদিও ঘোড়ার মতোই লাগাম পরানো। হাতে তিরধনুকও আছে বটে। সে একা নয়। দূর থেকে আরও একজন গর্দভ আরোহী এগিয়ে আসছে। তার হাতেও তিরধনুক। দু'জনেই কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। প্রথমজনের পোশাক বনরক্ষীদের মতো। খাকি হাফশার্ট সবুজ প্যান্ট, খাকি বুট। মাথায় টাইট করে কাপড় বাঁধা। পিছনের জনের মাথা গা। কোমরে লুঙ্গির মতো কাপড় জড়ানো। বয়স বেশ কম। দ্যুতির চেয়েও কম হতে পারে। এর মাথায় সামনে চুল না থাকলেও পিছনে উঁচিয়ে আছে একটা মোটা বিনুনি। গোরুর শিঙের মতো বেঁকানো। হাত-পা আর গলায় মোটা-মোটা লোহা আর তামার বালা পরা। পায়ে রাবারের কালো সস্তা চপ্পল। দেখে মনে হচ্ছে গাড়ির বাতিল টায়ার কেটে তৈরি।

নিজেদের ভাষায় দ্যুতিদের দেখিয়ে একটু আলোচনা করল দু'জন। তারপর প্রথমজন দ্যুতিকে অবাক করে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে গেল, "হু আর ইউ? হোয়েট ডুইয়িং হিয়ার? ইজ দ্য ম্যান ডক্টর?"

"ইয়েস, ইয়েস দ্য ম্যান ইজ আ ডক্টর। ইউ নো হিম?" তাড়াতাড়ি বলল দ্যুতি।

লোকটা মাথা নাড়ল, "ইয়া, ইয়া।"

ইতিমধ্যে কাবুলদা চোখ মেলে উঠে বসেছে। দেখা গেল লোকটিকে কাবুলদাও চেনে, "ইউ, ইউ বেন.." বলে চেঁচিয়ে উঠল ও।

"ইয়া, ইয়া। বেন্দুরা। ইউ ডক্টর ইনডিয়ান?"

কাবুলদাও মাথা ঝাঁকিয়ে "ইয়া ইয়া" বলল। লোকটি, মানে বেন্দুরার মুখে কান পর্যন্ত হাসি। সে তিন-চারটে লাফ দিয়ে চলে এল দ্যুতিদের সামনে। কাবুলদা উঠে দাঁড়িয়েছে। বাঁ পায়ের ব্যথা যায়নি। পুরো ভর দিচ্ছে না। দু'জনে মিলে হাত ঝাঁকিয়ে করমর্দন চলল বাড়া এক মিনিট ধরে। কাবুলদাকে গতকালের চেয়ে একটু বেশ ভাল মনে হচ্ছে। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা দেখিয়ে ইংরেজি আর নিজের নভিস আফ্রিকানে কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ।

সব শুনে বেন্দুরা প্রথমে জল খাওয়াল ওদের প্রাণ ভরিয়ে। প্লাস্টিকের দু'লিটারের জল। কম্মিনকালেও খেয়ে শেষ হবে কিনা কে জানে। জলটাও লালচে। কিন্তু সে জলই তখন অমৃতবারির মতো লাগল দ্যুতির। ধড়ে প্রাণ ফিরল এতক্ষণে।

কাবুলদা বলল, "আগের বার যখন সেভ রাইন প্রোজেক্টে এসেছিলাম, বেন্দুরার সঙ্গে আলাপ হয় তখন। আমাদের সঙ্গে কাজ করেছিল। এখন ও আমাদের ভলান্টিয়ার। রাইনো টাকার বলতে পারিস। সে বলব বুঝিয়ে। আমাকে যে মেরে রেখেছে বিশাল ভাগ্যি। পিছনের ছেলেটি ওর জাতি ভাই। ভেকুম্বা। ওরা একটা বুনো ঘোড়া পোষার চেষ্টা করছিল। গতকাল রাতে উধাও হয়েছে সে। খুঁজতে বেরিয়েছে তাই," বলল কাবুলদা।

বেন্দুরা ওর ঝোলা থেকে দু'মুঠো শুকনো কিছু ফল বের করেছে। ছোট-ছোট টুকরোয় কাটা। শুকিয়ে বাদামি হয়ে গিয়েছে। দ্যুতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ইট, ইট। নো প্রবলেম। ওনডুংগা ফ্রুট।"

কাবুলদা কয়েকটা মুখে পুরে চিবোতে-চিবোতে বলল, "মাকালানি পাম নামে এক ধরনের তাল গাছ হয় দেশে। অনেকটা আমাদের নারকেলের মতো খেতে। শক্ত খোলের ভিতরে নরম শাঁসটা থাকে। সেটাই কেটে শুকিয়ে রেখেছে।"

দ্যুতিও ওল কয়েকটা। খুব শুকনো বলে স্বাদটান নেই। যা হোক, এবার গাধায় চেপে এদের মুলুকের উদ্দেশে চলল সবাই মিলে। দ্যুতি উঠেছে বেন্দুরার গাধায়। সে সবে বিয়ে করেছে। বিয়ে হয়েছে বলেই মাথা আবৃত তার। ভেকুম্বার এখনও বিয়ে হয়নি। সে যে ব্যাচলর তা বোঝাতেই তার চুলের অমন সজ্জা। এদের গোষ্ঠীর এমনই রুল।

যেতে-যেতে এসব তথ্য বলে যাচ্ছে কাবুলদা। গাইডের মতো বুঝিয়ে যাচ্ছে কত কী। ভাল লাগছে দ্যুতির। অনেকক্ষণ পর একটু দম নিতে পারছে ও।

এই বেন্দুরারা হল হিম্বা উপজাতির লোক। বান্টু, হটেনটট বা খোইসোইয়ের মতো হিম্বারাও এই তল্লাটের অতি প্রাচীন বাসিন্দা। সেমি-নোম্যাডিক বা অর্ধ যাযাবর এরা। জীবিকা মূলত পশুপালন। আর আফ্রিকার সব দেশজ জনজাতির মতো এদের ইতিহাসও সংগ্রামের। উপনিবেশকারীরা ভিটেমাটি, গো-সম্পদ থেকে উৎখাত করেইছে। কচুকাটাও করেছে হাজারে-হাজারে। একটা সময় জার্মানদের অত্যাচারে ওপারে আঙ্গোলায় পালিয়ে যায় অনেক হিম্বা। পরে ফিরে আসে সাহস করে। বর্তমানে দেশের উত্তর-পশ্চিমের কাওকাভেলড, কিউনিন নদী উপত্যকার কাছে থাকে এরা। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে তুমুল শহুরে সভ্যতার দাপটের মধ্যেও এরা এখনও নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রেখেছে। অনেকটা আন্দামানের জারোয়াদের মতো। শহুরে মানুষদের দেখে পালিয়েও যায় না এরা। শুধু এদের বিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধা বা ব্যঙ্গ করাটা মেনে নেয় না। তবে এরা এখন নিজেরাই কেউ-কেউ শহরে চলে আসতে কাজের আশায়। সরকারের পক্ষ থেকেও শিক্ষার ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। জাম্যামাণ স্কুল খোলা হয়েছে দূর-দূর প্রান্তরে। বেন্দুরা যেমন ইংরেজি শিখেছে। টাকার্সের কাজও করছে সেভ-রাইনো প্রোজেক্টে। যদিও এটাও একটা লড়াই। কারণ, এই কাজে মূলত হিরিও আর দামারা উপজাতির লোকই ভিড় করে আছে। হিম্বারা তুলনায় অনেক কম।

এতটা বলে হাঁপিয়ে গিয়েছে কাবুলদা। হাসল। দ্যুতির তাই ভালই লাগছে। এও এক অভিজ্ঞতা বটে। বালিপাথর, মালভূমি পেরিয়ে গাধা চলেছে। ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে দুরন্ত গতিতে না হলেও টুকটুক করে মোটামুটি পিণ্ডেই যাচ্ছে ওরা। রুক্ষপ্রান্তরে মাঝে মধ্যে ছোট-ছোট ঝোপঝাড় নজরে আসছে।

বহুপত্রিত বাওবাব গাছও দেখা হল একটি। বিশাল গাছ। বিশালহাট্টা ডালপালায় তো বটেই, গাছটার কাণ্ডও কম কিছু নয়। অন্তত পনেরো-কুড়ি ফুটের ব্যাস সেটার, এত চওড়া। এর মধ্যে নাকি গাছটা জল ধরে রাখে। একটুআধটু না। হাজার-হাজার লিটার। হাতিরা সে জন্যে এ গাছের বাকল ছিঁড়ে জল বের করে তৃষ্ণা মেটায়। ফলও খাওয়া যায়। নারকোলের সাইজের ফল। টকটক স্বাদ।

পুষ্টিকরও।

অন্য গাছটাছ বা পশুপাখি ভালই দর্শন হচ্ছে। যেন সাফারিতে বেরিয়েছে দ্যুতিরা। তবে বিগ গেম বলতে তিন-চারশো মিটার দূরে আট-দশটা বিশালাকায় হাতির দর্শন মিলল। কিছু গেজেল্‌স চোখে পড়ল। ছোট প্রজাতির অ্যান্টিলোপদের গেজেল্‌স বলা হয় একসঙ্গে।

উঁচু একটা প্রান্তর দিয়ে যাওয়ার সময় আরও একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। দূরের রুক্ষ জমিতে অসংখ্য বড়-বড় গোলগোল বৃত্ত। কোনওটির চারধারে হলদেটে ঘাস রয়েছে। কিন্তু বৃত্তের মধ্যে একটিও ঘাস নেই। শুধু লাল মাটি।

কাবুলদা বলল, "তোর মোটামুটি সব ভ্রষ্টব্যই দেখা হয়ে গেল। বৃত্তগুলোকে কী বলে জানিস, ফেয়ারি সার্কল। পরিদের বৃত্ত বলতে পারিস। বৃত্তের মধ্যে কেন ঘাস গজায়নি এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু কোনওটাই ঠিক ধোপে টেকে না। পেরুর নাঙ্কা লাইনের মতো এও এক রহস্য যা আজও ঠিকভাবে ব্যাখ্যা হয়নি। এখানে না কেবল, গোটা নামিব মরুভূমি জুড়েই এগুলো আছে। বেন্দুরারদের মতে এটা ওদের দেবতাদের পায়ের ছাপ। তাই তো বেন্দুরা?"

মাথা দুলিয়ে হাসল সে।

যা হোক, এভাবে ঘণ্টাখানেক চলার পর গাছের ডালপালা দিয়ে বেড়া লাগানো একটা গ্রাম দেখা দিল। গ্রাম বললেও বড়জোর তিরিশ-চল্লিশজন মানুষ। তার অর্ধেকের বেশির বয়স দশের নীচে। গাছের ডালের দেওয়ালে মাটি আর গোবর লেপে এক কামরার ছোট্ট-ছোট্ট গোল-গোল ঘর। ছোট একটা দরজা। জানলাটানালা নেই।

দ্যুতিদের দেখে একদল পুঁচকে ছেলেমেয়ের সঙ্গে দু'-চারজন বয়স্ক লোকও এগিয়ে এসেছেন। পিছনে কয়েকজন মহিলা। মহিলারা চামড়ার স্কার্ট পরেছেন। পুরুষেরাও তাই। কেউ-কেউ ভেকুন্থার মতো কাপড়ের লুঙ্গি পরেছেন। হাতে-পায়ে আর গলায় সবারই সরু, মোটা নানা মাপের বালা। যেটা দর্শনীয় সেটা হল, মহিলাদের মাথার সাজ। চুলের পরিবর্তে লম্বা-লম্বা চামড়ার বিনুনি ঝুলছে প্রত্যেকের মাথা থেকে। গায়ে প্রায় সকলেই লালরঙের কিছু একটা মেখেছে। গা মানে কেবল গাইই না, হাত, পা, মুখ, কপাল সব। খালি পুঁচকেগুলোর স্বাভাবিক কোঁচকানো উস্কি চুল। তবে তাদেরও দু'-চারজন প্যাঁচানো শিঙের মতো বিনুনি করে সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

বেন্দুরা হাত, পা নেড়েটেড়ে দ্যুতিদের পরিচয় দিতে যে সবচেয়ে বয়স্ক সে গম্ভীর মুখে যা বলল তার অর্থ, কোনও দুষ্ট আত্মা 'ওমিতি' বা ব্ল্যাকম্যাজিক করেছে দ্যুতিদের উপর। সেইজন্যেই এত বিপদ। তবে ভয় নেই, দেবতা মুকুরুর আশীর্বাদ পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে ফের।

দ্যুতিদের একটা মাটির গোল ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরে আসবাব কিছু নেই। দড়িতে টাঙানো জামাকাপড়, টুকিটাকি সংসারের জিনিস। এমনকী, একটা কোল্ড ড্রিংকের ক্যান। একটা পকেট আয়না। বিদেশি টুরিস্টের উপহার হয়তো। বিশ্রামের স্থান বলে খড় বিছানো একটু জায়গা। একটি মেয়ে এসে ভেড়ার লোমের একটা চাদর পেতে দিল।

কাবুলদা বলল, "খাতির কেমন দেখছিস?"

"রাজকীয়। তোমার শরীর কেমন বলো।"

"আগের চেয়ে ভাল। দুর্বলতাটা আছে। কামড়ের ব্যথাটাও। তবে ভয় নেই আর। বলেছিলাম না, এই সাপের বিষে জোর নেই তেমন। জ্বরটা মনে হয় বৃষ্টিতে ভিজে এসেছিল। উলটোপালটা অনেক বকেছি না রে?"

"তেমন আর কোথায়, রবিঠাকুরের কত ছড়া-কবিতা শোনালে।"

"তাই বুঝি!" হাসল কাবুলদা, প্রাণ খুলে। কী যে ভাল লাগল দ্যুতির।

এর মধ্যে বেন্দুরার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ হাজির। হাতে পুজোয় যে ধুনো, গুগুল জ্বালানো হয়, সেরকম কিছু ধুনো জাতীয় গুঁড়ো। সাপের ক্ষত নিরাময়ের জন্যে এনেছেন।

কাবুলদা একটু ধুনো হাতে নিয়ে বলল, "উড়িয়ে দিস না। কমিফোরা গোয়ের একঘরনের গাছ আছে এখানে। রেঞ্জিনটা সেই গাছের। এতে সতিই ব্যাকটিরিয়ানাশক গুণ আছে। এদের মেয়েরা যে লাল রঞ্জক মাখে তার মধ্যেও এই রেঞ্জিন মেশানো হয়। চর্মরোগ স্পর্শ করে না। একদম খাঁটি প্রাকৃতিক ওষুধ। এখন তো অনেক সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এর থেকে নানা রকম হার্বাল প্রোডাক্ট তৈরি করছে। পারফিউমও হয়ে আছে। এক-এক আউন্স পঞ্চাশ-ষাট ডলার দাম।"

কথা শেষ করে নিজের ক্ষতটা পরিষ্কার করে তাতেও একটু রেঞ্জিনের গুঁড়ো ছড়াল কাবুলদা। বৃদ্ধ যারপরনাই খুশি। করমর্দন করে বিদায় নিল। ক্ষতটা এখন শুকিয়েছে অনেকটা। গোল একটা কালো ফোঁটার মতো হয়ে আছে। চারপাশের লাল ভাবটাও কম।

কাবুলদা বলল, "সাইড ওয়াইন্ডার সাপ অ্যাডার গোত্রের। এদের ভেনম সাধারণত সাইটোটক্সিক মানে, কোষগুলোকে নষ্ট করে দেয়। ব্যথার কথাটা ছেড়ে দে, সে সাংঘাতিক। কপাল ভাল যে পর্ব পেরিয়ে এসেছি।"

এর মধ্যে স্ত্রী কোচিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল। সে এনামেলের বাটিতে গরম দুধ আর চারটে মুরগির ডিম নিয়ে এসেছে। ছাগলের দুধ। দেরি করল না দ্যুতিরা। ইশারা করা মাত্র বাটি খালি। দরজার মুখে উৎসাহী ছোটদের ভিড়। সেই বয়স্ক বৃদ্ধ সম্ভবত হেডম্যান বা দলপতি। তিনি এলেন এবার। দেবতা মুকুরুর আশীর্বাদ নিতে যেতে হবে।

শুকনো ডালপালা দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। সামনে ইটপাথরের ছোট বেদি। তার মধ্যে আগুন জ্বলছে মিটিমিট করে। সেটাই ভগবান মুকুরু। অন্য জায়গায় উঠে না গেলে এই আগুন কক্ষনও নেভায় না হিয়ারা। সে জন্য ডালপালা সঞ্চয় করে রাখা আছে অনেক। এবার মাঝবয়সি একজন এগিয়ে এসে মাথাটাথা ঝুঁকিয়ে কীসব মন্ত্র বললেন। দ্যুতিরাও মাথা নোয়াতে লোকটি খুশি। বেন্দুরা বলল, "এতো আশীর্বাদ করেছেন তোমাদের। আর বিপদ নেই।"

সবাই খুব খুশি। এবার কাজের কথা। কত তাড়াতাড়ি শহরে ফিরতে পারবে দ্যুতিরা। নিজের সংস্থায় এবং ভারতীয় দূতাবাসে সংবাদ পাঠাতে পারবে।

বেন্দুরা জানাল, কাওকোল্যান্ডেস রয়েছে ওরা। এই গ্রামটা হল হাঁটম্যান পাহাড়ের কাছাকাছি। তাও অন্তত পঞ্চাশ মাইলটাক হবে দক্ষিণে। সবচেয়ে কাছে ওমবিভাঙ্গো। বড় ভিলেজ। বনদফতর একটা চৌকি আছে বটে। তবে সেও যথেষ্ট দূর। যাওয়ার পথ খুব দুর্গম। লেপার্ডের ভয় আছে। তবে কষ্ট করে উত্তরে একশো মাইল যেতে পারলে অ্যাঙ্গোলার সীমানা পড়বে। কিউনিন নদীও বইছে সীমানা বরাবর। সেখানে টুরিস্ট লজ, গেম হান্টিং লজ, থানা-পুলিশ, বনদফতর সবই মজুত।

"আবার বনদফতর!" না বলে পারল না দ্যুতি, "তা ছাড়া লজ? সেটা যদি কিটনারেরই হয় কিংবা ওর কোনও শাগরেদের?"

বেন্দুরা বলল, "ঠিক আছে, এত ভাবতে হবে না। মাইলবিশ দূরে ক্যামেল ট্র্যাকার্সদের একটা গুমটি অফিস আছে। সেখানে সেলফোন আছে। টকি আছে। অসুবিধে হবে না। আর আমি তো থাকছিই সঙ্গে, দেখি না ক'টা কিটনার আসে সামনে!"

তাই ঠিক হল শেষে। তবে বেন্দুরা আজকে কিছুতেই ছাড়বে না। রাত এখানে কাটিয়ে শরীর আরও চাঙা করে তারপর যা ইচ্ছে।

সত্যি বলতে দ্যুতিও আর পারছিল না। শরীরের সব কলকবজা জয়েন্ট খুলে-খুলে আসছে যেন। সবচেয়ে বড় কথা, ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু'চোখ। সুতরাং বিশ্রাম নেওয়াই ঠিক হল।

দুপুরে ভুট্টার ছাতুর সঙ্গে গরম দুধ আর মধু দিয়ে পরিজ় মতো খাবার এল। সঙ্গে ডিম আর আলুসিদ্ধ। দ্যুতির ইচ্ছে করছিল স্নান করে একটু। এক তো চিনিফাটা গরম। তার উপর সারা গায়ে এত ধুলোবালির আস্তরণ জমেছে গন্ডারের চামড়ার চেয়েও মোটা হয়ে গিয়েছে নির্ঘাত। কিন্তু, স্নানের উপায় নেই। জল খুব মেপে-মেপে খরচ করে এরা। অনেক দূর থেকে জল বয়ে আনতে হয়। মেয়েরা তো স্নান করেই না। সেই কমিফোরা গাছের রেঞ্জিন পুড়িয়ে শ্মোক-বাথ নেয় মেয়েরা। এই ধোঁয়াও কীটনাশক। চাদর মুড়ি দিয়ে নেওয়ার জন্য গরমে ঘামও হয় অনেক। আর তাতে শরীর ভিজে স্নানও হয়ে যায় খানিক।

যাই হোক, খেয়ে আর ঘুমিয়ে সেদিনটা কেটে গেল। পুরোপুরি তরতাজা তো হওয়ার না, তবুও গত ক'দিনের চেয়ে দু'জনেই অনেকটা চাঙা। সকলের থেকে বিদায় নিয়ে গাধার পিঠে চেপে ফের যাত্রা শুরু। এবার দ্যুতি আর কাবুলদা একটা গাধায়, অন্যটায় বেন্দুরা। আবার সেই রুক্ষ বালি, পাথুরে পথ। রোদে পোড়া ঘাস। ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকা বড় গাছ। ক্যাকটাসের ঝোপ। ছোট-বড় টিলা। কোপি নামে ন্যাড়ামাথা একলা অনুচ্চ পাহাড়। কিছুক্ষণ চলার পর বেন্দুরার ক্যামেল ট্রাকার্স বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। দুটো উটের পিঠে চেপে উলটো দিক থেকে আসছিল তারা। বেন্দুরার বয়সিই দুটি লোক। বেন্দুরার মতোই কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান, তবে গলায় বা পায়ে বালাটালা কিছু পরা নেই। মাথায় ব্রিম হ্যাট। একজনের কোমরে বেল্টের সঙ্গে গোঁজা ওয়াকিটকি রয়েছে। গলায় ঝুলছে বাইনোকুলার। বেন্দুরাকে দেখে দু'জনেই নেমে পড়েছে উট থেকে। দূরবিন ঝোলানো লোকটি একটু গোলমেলে। দ্যুতিদের উপরেই শিয়াল চাউনি তার। আঙুল দেখিয়ে কীসব বলল বেন্দুরাকে। বেন্দুরা পালটা উত্তর দিতে আচমকা তর্কাতর্কি বেধে গেল। ভাষা বোঝার উপায় নেই। আফ্রিকানও না। একদম স্থানীয় উপভাষা। অন্য লোকটি কিছুটা নিরপেক্ষ। যদিও সে বেন্দুরাকেও হাত-পা নেড়ে বোঝাচ্ছে কিছু।

"ডক্টর ইউ গো, রান, রান অ্যাওয়ে!" হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল বেন্দুরা।

নিমেষে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বাইনোকুলার ঝোলানো লোকটা জামার ভিতর থেকে পট করে একটা ছুরি বের করে নাইফঅয়োয়ারের মতো ছুড়েছে। লক্ষ্য ছিল কাবুলদা। ব্যাপারটা বুঝে বেন্দুরা ঠিক সময়ে ধাক্কা দিয়েছিল। ছুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিঁধল অন্য লোকটির গায়ে। মুহূর্তে রক্তারক্তি ব্যাপার। কাবুলদার বন্দুকে গুলি নেই, তবু ভয় দেখাতে তো বাধা নেই। তাই করল ও। বেগতিক দেখে বাইনোকুলারওয়ালা সঙ্গে-সঙ্গে উট ছুটিয়েছে। উটও যে কখনও এত গতিতে ছুটতে পারে জানত না দ্যুতি। লম্বা-লম্বা পায়ে দ্রুত একটা টিলার আড়ালে উধাও।

॥ ১২ ॥

গাধাটা থামল অবশেষে। দ্যুতিরা নেমে পড়েছে সঙ্গে-সঙ্গে। যতই হোক, ঘোড়া তো না, গাধা। অশ্বশক্তি নেই। তবুও ঘোড়ার পিঠেই ছুটেছে বেচারি এতক্ষণ। দ্যুতিদের তাগিদে নয়। একদল অষ্টিচদের সামনে পড়ে গিয়েছিল দ্যুতিরা। বিশাল-বিশাল পাখি। বাদামি পিঠগুলো মেয়ে, কালো পিঠওলাগুলো পুরুষ। দু'-চারটে পাখি হঠাৎ কী মনে করে তেড়ে এসেছিল দ্যুতিদের দিকে।

স্থলপথে চিতা ছাড়া অষ্টিচদের নাকি কেউ দৌড়ে হারাতে পারে না। ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত ছুটতে পারে এরা। তা ছাড়া রেগে গেলে এরা খুব হিংস্র। কপাল ভাল যে বেশি দূর পিছু নেয়নি। একশো মিটার মতো এসে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু, গাধা আর থামতেই চায় না। এই না হলে গর্দভ নাম! পিঠের উপর দু'-দুটো মানুষ নিয়ে অন্তত আরও আধমাইলের ছুটে তবে থেমেছিল। কাবুলদা লাগামও টানেনি। ছুটকে। দ্যুতিদেরই লাভ। যতটা দূর চলে যাওয়া যায়।

দূরবিনওয়ালা লোকটা যে কিটনারের দলের না বললেও চলে। দ্যুতিদের খবর ভালভাবেই কানে দিয়ে রাখা হয়েছে। গন্ডারের বদলে দ্যুতিদেরই ট্র্যাক করে বেড়াচ্ছিল হয়তো। বেন্দুরা ঠিক সময়ে হাতে

ধাক্কা না দিলে কী হত ভাবতেই রক্ত চলাচল সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দ্যুতির। লোকটির চোট খুব গুরুতর না হলেও চিকিৎসার দরকার ছিল। কলারবোনের নীচে বুকের ডানদিকের মাস্‌লে আঘাতটা লেগেছিল। কাবুলদা ব্যান্ডেজ করে দেওয়ার পর ওরই উটে চাপিয়ে গাধার দড়ি হাতে টেনে নিজেদের গ্রামে নিয়ে গিয়েছে বেন্দুরা।

কাবুলদাকেও যেতে বলছিল। গেল না ও। বলল, "ঠিক হবে না। লোকটার কাছে টকিমেশিন রয়েছে। এতক্ষণে কি আর খবর পৌঁছে দেয়নি ঠিক জায়গায়! কিউনারের দল তোমাদের গ্রামে গিয়েও হাজির হতে পারে। বিপ্লবি কাণ্ড হবে তখন। এমনিতেই আমার জন্য কত কষ্ট করতে হচ্ছে তোমাকে।"

"কী যে বলেন স্যার, আমার খারাপ লাগছে এদের জন্যে আমাদের নামও ডুবছে। বদনাম হচ্ছে।"

মাথা নিচু করে বলেছিল সে।

এ কথাটা অবশ্য একদম ঠিক। চোরাচালানকারীরা টাকার লোভ দেখিয়ে ট্র্যাকার্সদের হাত করছে। সব দেশেই এক সমস্যা। ট্র্যাকার্সরা হল একদম মাটির লোক। স্থানীয় অধিবাসী হওয়ার জন্য বনজঙ্গল-পাহাড় এদের একদম নখদর্পণে। সরকার বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাই এদেরই প্রাণী সংরক্ষণে নিয়োগ করে। জানোয়ার বাঁচলে যে পরিবেশ বাঁচবে বোঝানো হয় তাদের। গন্ডারের সংখ্যা থেকে শুরু করে তার খাওয়াদাওয়া, প্রজনন, অসুস্থতা সব দেখে নিয়মিত রিপোর্ট করাই রাইনো ট্র্যাকার্সদের কাজ। টুরিস্টদের গন্ডার দর্শনও এরাই করিয়ে থাকে। সুতরাং গন্ডার খুঁজে বের করতে হলে এদের হাত করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কিউনারের মতো দুর্বৃত্তরা ঠিক এটাই করে চলেছে।

আপাতত দ্যুতিদের সামনে একটা গিরিশিরা এখন। পাহাড় এড়িয়ে যেতে হলে অনেকটা ঘুরতে হবে। গাধাটা সে জন্যে হয়তো ক্ষান্ত দিয়েছিল। দ্যুতিরাও নেমে পড়েছিল বেচারির পিঠ থেকে।

কাবুলদা বলল, "গাধাটাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। ধু ধু প্রান্তর দিয়ে গেলে দূরবিনের আওতায় পড়ার সম্ভাবনা বেশি। টিলা-পাহাড়ের আবডাল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।"

দ্যুতি ভাবছিল, নিরাপদ আর কোথায়। পথটথ হারিয়ে তো একাকার সব। সূর্যের গতি দেখে কতটা আর বোঝা যায়। বেন্দুরাকে পেয়ে একটু আশার আলো ফুটছিল, আবার সব অন্ধকার। গাইড বা নিদেনপক্ষে ফুলপ্রুফ জি পি এস ফোনটোন ছাড়া এসব জায়গায় আসা মানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনা। হোটেলের গাইডবুকে অনেকবার করে কথাটা লেখা আছে। এমন অঞ্চল আছে যেখানে কদাচিৎ হয়তো সেদ্দা মানুষের পা বা গাড়ির টায়ারমার্ক পড়েছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে সে চিহ্নও নাকি অক্ষত থেকে যায়। এভাবে দিকশূন্য না ঘুরে বেড়িয়ে বেন্দুরার গ্রামেই ফিরে গেলে হয়তো ভাল হত।

কাবুলদা বলল, "পাহাড়ের সারিটা পেরতে পারলে ভাল হয়। যদি এটা হাঁটম্যান মালভূমি হয়, পূর্ব দিকে আরও গেলে ম্যারিয়েনফ্লাস গিয়ে পড়ব। সেটাও একটা উপত্যকা। তবে এরকম রুক্ষ না। কিছু একটা উপায় হবে।"

তাই ঠিক হল। গাধা রেখে পাহাড় ডিঙোতে শুরু করল দ্যুতিরা। খাড়াই না। বরং সেই বালি ভর্তি লাল পাথুরে মাটি। মধ্যে-মধ্যে তুলিতে ছোপ দেওয়ার মতো বুনো ঘাস বা ঝোপঝাড়। খানিক তফাতে নদীখাতের মতো একটা উপত্যকা। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে একদল হাতি শুঁড় আর পা দিয়ে বালি তুলে গর্ত করছে খাতের একটা জায়গায়।

কাবুলদা বলল, "বিপদের কথা না ভেবে দেখে নে। হাতিগুলো কী করছে জানিস, জলের খোঁজ করছে। সব কটা ডেজার্ট এলিফ্যান্ট। বিরাট এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। দিনে দেড়শো লিটার জল যেমন খায়, তেমনি একটানা তিন-চারদিন জল না খেয়েই কাটাতে পারে।"

বলতে-বলতে হাতিগুলো সত্যিই জল বের করে ফেলেছে। শুঁড় দিয়ে খানিকটা জল খেয়ে একটু ছিটিয়েও নিল নিজের মাথায়। তারপর হেলেদুলে চলে গেল সবাই। একটি যেন একটু আহত। পিঠের কাছে ক্ষতচিহ্ন। এত দূর থেকেও লাল-লাল ছোপ দেখা যাচ্ছে।

কাবুলদা বলল, "নির্ঘাত গুলি করেছিল কেউ। পোচার্স ছাড়া আর কে হতে পারে। এবং হয়তো কোয়েপিঠেই আছে কোথাও।" তারপর সূর্যের অবস্থানটাস্থান দেখে অনেক হিসেবটিসেব কষে বলল, "নদীটা উত্তর-পূর্ব থেকে বেরিয়েছে। আমরা নদীখাত ধরে এগোতে পারি। দেখা যাক লোকালয় মেলে যদি।"

দ্যুতির মাথাটা খুব ভারী-ভারী লাগছে। এতটা উঠে পা টনটন করছে। কাবুলদা বলছে বটে, কিন্তু ক্রমেই যেন সাহস হারিয়ে ফেলছে ও।

যাই হোক, শেষমেষ আবার পথ ভাঙা। একঘণ্টা মতো চলার পর নদীখাতটাই হঠাৎ যেন ভ্যানিশ হয়ে গেল। চারদিকে হলদেটে ঘাস। আর ফের সেই ছোট-বড় টিলা পাহাড়। জিরাফের দল গেল একটা হেলেদুলে। আর কোনও প্রতিক্রিয়াই হওয়ার জন্য বনজঙ্গল-পাহাড় এদের একদম নখদর্পণে। সরকার বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাই এদেরই প্রাণী সংরক্ষণে নিয়োগ করে। জানোয়ার বাঁচলে যে পরিবেশ বাঁচবে বোঝানো হয় তাদের। গন্ডারের সংখ্যা থেকে শুরু করে তার খাওয়াদাওয়া, প্রজনন, অসুস্থতা সব দেখে নিয়মিত রিপোর্ট করাই রাইনো ট্র্যাকার্সদের কাজ। টুরিস্টদের গন্ডার দর্শনও এরাই করিয়ে থাকে। সুতরাং গন্ডার খুঁজে বের করতে হলে এদের হাত করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কিউনারের মতো দুর্বৃত্তরা ঠিক এটাই করে চলেছে।

আপাতত দ্যুতিদের সামনে একটা গিরিশিরা এখন। পাহাড় এড়িয়ে যেতে হলে অনেকটা ঘুরতে হবে। গাধাটা সে জন্যে হয়তো ক্ষান্ত দিয়েছিল। দ্যুতিরাও নেমে পড়েছিল বেচারির পিঠ থেকে।

কাবুলদা বলল, "গাধাটাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। ধু ধু প্রান্তর দিয়ে গেলে দূরবিনের আওতায় পড়ার সম্ভাবনা বেশি। টিলা-পাহাড়ের আবডাল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।"

দ্যুতি ভাবছিল, নিরাপদ আর কোথায়। পথটথ হারিয়ে তো একাকার সব। সূর্যের গতি দেখে কতটা আর বোঝা যায়। বেন্দুরাকে পেয়ে একটু আশার আলো ফুটছিল, আবার সব অন্ধকার। গাইড বা নিদেনপক্ষে ফুলপ্রুফ জি পি এস ফোনটোন ছাড়া এসব জায়গায় আসা মানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনা। হোটেলের গাইডবুকে অনেকবার করে কথাটা লেখা আছে। এমন অঞ্চল আছে যেখানে কদাচিৎ হয়তো সেদ্দা মানুষের পা বা গাড়ির টায়ারমার্ক পড়েছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে সে চিহ্নও নাকি অক্ষত থেকে যায়। এভাবে দিকশূন্য না ঘুরে বেড়িয়ে বেন্দুরার গ্রামেই ফিরে গেলে হয়তো ভাল হত।

কাবুলদা বলল, "পাহাড়ের সারিটা পেরতে পারলে ভাল হয়। যদি এটা হাঁটম্যান মালভূমি হয়, পূর্ব দিকে আরও গেলে ম্যারিয়েনফ্লাস গিয়ে পড়ব। সেটাও একটা উপত্যকা। তবে এরকম রুক্ষ না। কিছু একটা উপায় হবে।"

তাই ঠিক হল। গাধা রেখে পাহাড় ডিঙোতে শুরু করল দ্যুতিরা। খাড়াই না। বরং সেই বালি ভর্তি লাল পাথুরে মাটি। মধ্যে-মধ্যে তুলিতে ছোপ দেওয়ার মতো বুনো ঘাস বা ঝোপঝাড়। খানিক তফাতে নদীখাতের মতো একটা উপত্যকা। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে একদল হাতি শুঁড় আর পা দিয়ে বালি তুলে গর্ত করছে খাতের একটা জায়গায়।

কাবুলদা বলল, "বিপদের কথা না ভেবে দেখে নে। হাতিগুলো কী করছে জানিস, জলের খোঁজ করছে। সব কটা ডেজার্ট এলিফ্যান্ট। বিরাট এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। দিনে দেড়শো লিটার জল যেমন খায়, তেমনি একটানা তিন-চারদিন জল না খেয়েই কাটাতে পারে।"

গন্ডার নোটিস করে। চওড়া মুখের জন্যে ওয়াইজড বলত তারা। সেটাই ইংরেজিতে ওয়াইড হয়ে শেষে হোয়াইট হয়েছে। এদের দুটো ভাগ। নর্দান হোয়াইট আর সার্দান হোয়াইট। নর্দান আর পাবি না। মানুষ সব খতম করে দিয়েছে। গোটা পৃথিবীতে টিকে আছে মাত্র তিনটে। নাইরোবির অল-পেজেতা সংরক্ষণ সেন্টারে। এরাও প্রায় নিকেশ হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কিছু ভালমানুষের জন্যে টিকে আছে এখনও।"

বলতে না-বলতে দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের আড়াল থেকে একটা গাড়ি হাজির হল হঠাৎ। তিনজন নামল গাড়ি থেকে। একজন সম্ভবত গাইড। সে আগে-আগে হাঁটছে। অন্য দু'জনের একজন বিশাল লম্বা। গায়ে খাকি শার্ট। হাতে বড়সড় একটা রাইফেল। দ্বিতীয়জন লম্বা হলেও প্রথমজনের চেয়ে খাটো। এর পরনেও খাকি শার্ট। হাতে কিছু নেই।

কাবুলদার মুখে চিন্তার ছাপ। চোয়াল শক্ত করে বলল, "পৃথিবীটা সত্যিই গোল রে। চিনতে পারছিস তো? স্পিক অফ দ্য ডেভিল, অ্যান্ড ই উইল অ্যাপিয়ার। বুঝলি!"

সত্যিই তাই। কিটনারের নাম মুখে না তুললেও প্রতি মুহূর্তে শয়তানটার কথাই ভেবে চলেছে দ্যুতি। শেষে ঠিক তাই হল। মূর্তিমান ডেভিল-ই এসে হাজির। সঙ্গে সম্ভবত সেই অ্যাডলার শয়তানটা। যেভাবে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে এদিকে। ঈশ্বরই জানেন কী হবে!

কিটনাররা অবশ্য আর এগোল না। দ্যুতিদের মতোই ওদিকের পাহাড়ের একটা পাথরের আড়ালে বসল ঘাপটি দিয়ে। দ্যুতিদের থেকে অনেকটাই দূর। সাধারণ রাইফেল হলে রেঞ্জের বাইরে। কিন্তু এরা কি আর অর্ডিনারি রাইফেল ব্যবহার করবে!

কাবুলদা বলল, "গন্ডারের খোঁজে এসেছে। সহজে নড়বে বলে মনে হচ্ছে না। সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারে।"

"আমরা তো পালিয়ে যেতে পারি, টিলাটার নীচ দিয়ে গেলে দেখতে পারবে না ওরা।"

"পাগল না কি!" বলল কাবুলদা, "তারপর যদি গন্ডাররুলো ফিরে আসে? খাওয়া ফেলে রেখে গেছে। মনে রাখবি, যেখানে আছি গন্ডার সাধারণত খুব একটা দেখা যায় না। তাও দেখলাম কেন জানিস, এরাও খাদ্যসংকটে ভুগছে। এত দূর-দূর চলে আসছে তাই। কী যাচ্ছিল জানিস, মিঙবুশ নামে এক ধরনের বিষাক্ত ক্যাকটাস। একমাত্র গন্ডাররাই সাবাড় করতে পারে এগুলো। বুঝেছিস?"

"বুঝেছি। কিন্তু এটা বুঝছি না, খালি হাতে তিন-তিনটে লোকের সঙ্গে কী করে লড়ব আমরা?"

"উপায় বের করতে হবে। সত্যি শুনবি, কিটনারের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার আছে। আমার তো ধারণা হাতিগুলোর উপর এরাই গুলিটা চালিয়েছিল।"

কী আর বলবে দ্যুতি। ইতিহাসী থাকলেও হয়তো এই কথাই বলত। কিছু মানুষ হয়তো এমনই হয়। আর পালিয়েও বা কত দূর যাবে দ্যুতিরা। সঙ্গে গাড়ি রয়েছে ওদের। আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। তার উপর কত লোককে হাত করে রেখেছে কে জানে!

কাবুলদা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে-পিছিয়ে পুরো জায়গাটা জরিপ করল। পকেটে হাত দিয়ে কী-কী স্টক আছে দেখে নিল একবার। বেন্দুরা সেই শুকনো ফল কিছু দিয়েছিল। সেগুলো চিবোতে-চিবোতে বলল, "ওদের গাড়িটা দেখেছিস, মুখটা ঢালের দিকে। মানে হয় গিয়ারে বা হ্যান্ডব্রেক উঠিয়ে রেখেছে। আমরা এদিক দিয়ে ঘুরে একদম গাড়ির পিছনে যেতে পারি।"

"স্টার্ট করবে কী করে? চাবি নিশ্চয়ই ওদের কাছেই আছে। হয়তো ড্রাইভারও আছে গাড়িতে।"

"মনে হয় না। ওদের কেউই ড্রাইভ করে এসেছে। আর এই গরমে কাচ তুলে ভিতরে কেউ বসে থাকতে পারবে না। এ সিও চালানো যাবে না। শব্দ বা ভাইব্রেশন দুটোই হবে। গন্ডার আর আসবে না। গাড়িটা লক করেনি, কেউই করে না। কখন কী বিপদ আসে ঠিক তো নেই। আমি চাইছি মোক্ষম সময়ে ওদের নজরটা ঘুরিয়ে দিতে। হ্যান্ডব্রেক নামিয়ে দিলে বা গিয়ার নিউট্রালে রাখলেই গাড়ি গড়িয়ে নেমে আসবে নীচে। তুই বা আমি যে কেউ কাজটা করতে পারি। তবে আমরা সেটা করব না, গাড়িটা দখল করতে হবে আমাদের। দেখতে হবে ইগনিশনে আছে কিনা?"

"আর যদি দেখা যায় চাবি ইগনিশনেই ঝুলছে?"

"তা হলে তো কোনও ফতে। বাক গিয়ার করে ঘুরিয়ে নিয়েই পালাব।"

"তোমার মাথাটা বেশি কাজ করছে কাবুলদা, লোকগুলো টের পাবে না? তা ছাড়া ভুলে যাচ্ছ, রাইফেল রয়েছে ওদের সঙ্গে।"

"থাক না। চেষ্টা করতেই হবে। সেক্ষেত্রে আমরা দু'জনেই যাব। রিস্ক নিতেই হবে। চাবি না থাকলে ফিরতে হবে আবার। আর গাড়ি নিয়ে পালালে ওদের শিকার তো বন্ধই, ফেরার চিন্তাতেও মাথা খারাপ হবে। হয়তো দু'-চার রাউন্ড গুলিটুলিও ছুড়বে। তাতে আগামী সাতদিনেও গন্ডার আর আসছে না।"

প্ল্যানটা খারাপ না। কিন্তু সাংঘাতিক রিস্কি। তা ছাড়া গুলি ছুড়লে সেটা টায়ারেও লাগতে পারে। কেবল একটাই সুবিধে যে প্রতিপক্ষ দ্যুতিদের উপস্থিতি জানে না এখনও।

যদিও এরকম কিছুই করতে হল না। ট্র্যাকার লোকটি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সন্তর্পণে চারদিক দেখতে-দেখতে সেই মিঙবুশটার দিকেই এগোচ্ছে। এর বয়স বেশি। থুতনিতে একচিলতে দাড়ি পুরো সাদা। লোকটা এখনও দূরবিন চোখে লাগায়নি। মাটিতে কান পাতল মিনিটখানেক। এবার পিছন ফিরে ইশারা করল হাত দিয়ে। কিটনাররাও বেরল এবার। ট্র্যাকারটার থেকে অন্তত একশ গজ দূরে তারা।

ট্র্যাকারটা হঠাৎ বসে পড়তে ইশারা করল তাদের। সে নিজেও উবু হয়ে বসে পড়েছে। হাঁটু সমান লম্বা হলদেটে ঘাসে ভর্তি জায়গাটা। এভাবে প্রায় মিনিটপনেরো কাটল। সূর্য ঢলতে শুরু করেছে। পাহাড় শীর্ষ আর বড়-বড় পাথরগুলোর নানা রকম ছায়া পড়েছে এখানে-ওখানে। দলে-দলে পাখি উড়ে যাচ্ছে কোত্থেকে। বাতাস তেমন একটা নেই। সব মিলিয়ে অদ্ভুত দমবন্ধ পরিবেশ।

আরও মিনিটদশ কাটতে ঝোপটা একটু নড়ে উঠল মনে হল। পরক্ষণেই গন্ডারগুলোকে দেখা গেল। সেই পরিবারটিই। মা, বাবা আর ছানা।

ট্র্যাকার লোকটি বুড়ো আঙুল তুলে থাম্বস-আপ দেখাল পিছনে। এবার সে দ্যুতিদের আস্তানার দিকেই এগোতে শুরু করছে। এই মুহূর্তে ত্রিভুজের তিনটি বিন্দুর মধ্যে রয়েছে ওরা। দ্যুতিদের মিঙবুশের দূরত্ব সবচেয়ে কম। বড়জোর তিনশো গজ। কিটনাররা কিছুটা পিছনে। এগিয়ে আসাতে দ্যুতিদের চেয়ে ওদের দূরত্বও এখন আন্দাজ তিনশো গজ। গন্ডার বধ করতে হলে দ্যুতিদের টিলার দিকেই আসার কথা ওদের। পাথরের আড়াল আর নৈকট্য দুটোই পাবে। এবং সেটাই করছে ওরা।

ঠিক এমন মুহূর্তে কাণ্ড ঘটল একটি।

কালো মুখ বেবুনের একটা দল কোত্থেকে লাফঝাঁপ দিয়ে হাজির। ডান দিক বা গাড়িটার দিক থেকে আসলে কিটনারদের দেখতে পেত। এসেছে দ্যুতিদের বাঁ-দিক থেকে। এবার এত জনসমাগম দেখে কিচ-ক্যাচ শব্দ তুলে ফের ছুট। একটি প্রায় দ্যুতির কাঁধেই পা রেখে পালাল। কাণ্ড হল তাতেই। জলের বোতলটা হাতে ধরা ছিল। ফসকে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল নীচে। গন্ডারগুলো আগেই সজাগ হয়েছিল, নিমেষে পালাল।

আসল কথা হল, দ্যুতিদের দেখে ফেলল কিটনারের দল। এমন একটা চমকের জন্যে প্রস্তুত ছিল না তারা। রাগের মাথাতেই

রাইফেল থেকে পরপর কয়েকটা গুলি ছুড়ল কিটনার। শব্দ নেই। মানে সাইলেন্সার পর্যন্ত লাগিয়ে নিয়েছে রাইফেলে। নিয়ম-কানুনের পরোয়া নেই কোনও। গন্ডারের মতোই ঘোঁত-ঘোঁত করে ছুটে আসছে দ্যুতিদের টিলার দিকে।

আসুক। তার আগেই টিলা থেকে নেমে পালাবে দ্যুতিরা। কিন্তু তারপর? ভাবতে গিয়ে গা ফসকে যাচ্ছিল আর একটু হলে। কিন্তু বিপদ তার আগেই ঘটে গেল।

লাফিয়ে নামতে গিয়ে কাবুলদা ব্যালান্স রাখতে পারল না। বাঁ-পায়ে আসলে বেশি চাপ নিতে পারছে না। ছেতরে গিয়ে একেবারে হাফমেন গাছটার গুঁড়ির গিয়ে পড়ল। পড়েই গড়িয়ে গেল নীচে। ওখানটা একটু ঢালু গর্তের মতো। কাবুলদা উঠে আসার সময় পেল না, অ্যাডলার কী ধুরন্ধর! ঠিক সেখানেই হাজির হল কীভাবে। হাতে স্টিল রঙের একটা ছোট্ট পিস্তল।

কাবুলদা হাত বাড়িয়ে টোটাইল বন্দুকটাই উঁচিয়ে রেখেছে। দ্যুতিও ক্লিপ কষে নেমে পড়েছে ওর পাশে। অ্যাডলারের মুখে কী কুটিল হাসি! সে ইশারা করল বন্দুকটা ফেলে দিতে। কাবুলদারও কী নার্ভ! ও একই কথা বলল অ্যাডলারকে। ট্র্যাকার লোকটি বেশি এগোয়নি। কাণ্ড দেখে সে একটু তফাতেই রয়েছে।

"ডুপ ইয়োর গান!" অ্যাডলার ইংরেজিতে বেশ হুকুম দিল। দাঁত কিড়মিড় করছে সে, এগোচ্ছে এক-পা এক-পা করে। দু'তরফে বিশ গজ মতো ব্যবধান। কাবুলদা যদি পুরো মাথা নামিয়ে নেয় অ্যাডলার আর দেখতে পাবে না ওকে। এগিয়ে আসতে হবে।

দ্যুতির পিছন দিকটায় ফাটল আছে একটা। কাষ্টেসুষ্টে গলে যেতে পারে। কিন্তু সেটা কোনও গুহার মুখ কী? তা ছাড়া অতটা সময় নিশ্চয়ই ওরা দেবে না। মানে একদম কলে পড়া ইঁদুরের মতো অবস্থা দ্যুতিদের।

এমনসময় আচমকা কিটনারের চিৎকার, "কাইক তেরগ, কাইক তেরগ!"

সে হাজির হয়েছে দ্যুতিদের পিছন দিক থেকে। মানে টিলার উপরে থেকে নয়। কথাটার অর্থ হয়তো 'পিছনে তাকাও', কারণ সঙ্গে-সঙ্গেই পিছন ঘুরেছে অ্যাডলার। ব্যাপারটা কী বোঝা যাচ্ছে না। অ্যাডলারের পিছনটা দেখতে হলে উঠে বেরতে হয়। চড়াইয়ে কিছুটা উঠে এসেছে সে।

আসল কথা, পাশা কি ঘুরল? অ্যাডলার ফায়ার করেছে পিছন ঘুরে। প্রচণ্ড আওয়াজ করে আগুনের ঝলকা ছুটল একটা। এর বন্দুকে সাইলেন্সার নেই। কিটনার আচ্ছিকানে কিছু একটা বলল চেঁচিয়ে, তারপর সোজা পিঠটান দিয়ে টিলার আরও উপরে চড়তে শুরু করেছে। এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ে কোথাও উধাও হল সে।

কয়েক মুহূর্ত এভাবে কাটল। এবার সাহসে ভর করে উঠে এল দ্যুতিরা।

অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় দৃশ্য!

হাতির একটা পাল হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে। হয়তো কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই দলটিই। এখন আরও ভারী। একটির গা থেকে রক্ত ঝরছে। তিন-চারটি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল অ্যাডলার আর ট্রাকার লোকটি দু'জনেই দু'টি দাঁতাল হাতির শুঁড়ে ঝুলছে। তারাও রক্তাক্ত। সম্ভবত প্রাণহীনও। হস্তীযূথ তাদের নিয়ে লোফালুফি খেলছে। বৃংহণও শুরু করল এবার। কী ভীষণ দৃশ্য!

"প্রতিশোধ! ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!" ফিসফিস করে বলল কাবুলদা। দ্যুতি কী বলবে, ওর হাত-পা কাঁপছে থরথর করে।

কাবুলদা বলল, "বলেছিলাম না ওদের একটা হাতি জখম ছিল। হয়তো এই অ্যাডলারই কিটনারের রাইফেল থেকে গুলিটা ছুড়েছিল। সাংঘাতিক স্মরণশক্তি হাতিদের। হয়তো এমনই যাচ্ছিল, লোকগুলোকে দেখেই প্রতিহিংসা জাগে। কেমন নিঃশব্দে এসে তা চরিতার্থ করে গেল। তাও যদি গুলি না চালাত, ব্যাপারটা এত ভয়ঙ্কর হত না!"

এ দৃশ্য আর দেখা যাচ্ছে না। যদিও হাতির দল শান্ত ক্রমশ। কয়েকটি পিছনে ফিরতে শুরু করেছে। গাড়িটাও আস্ত রাখেনি। উলটে দিয়ে গিয়েছে। সেটা কিছুটা গড়িয়ে একটা পাথরে আটকে আছে। উইন্ডস্ক্রিনটা মনে হচ্ছে চেটিচ।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন এখনও শেষ হয়নি। বন্দুকের গুলি লাগল কাবুলদার!

॥ ১৩ ॥

কিটনার সরে পড়েনি। ঘাপটি দিয়েছিল কোথাও, আচমকাই বেরিয়ে এসে গুলি করে দিয়েছে কাবুলদাকে। বক্ষে গুলিটা বাঁ-দিকের কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। রক্তের দাগ ফুটে উঠছে জামায়। কাবুলদা বসে পড়েছে পাথরের উপরে। হাতের বন্দুকটা ছিটকে পড়েছিল, সেটা এখন কিটনারের পকেটে। খুব চেঁচাচ্ছে সে। আফ্রিকান না জার্মান ভাষায় কীসব বলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে হাতের রাইফেল যেন তাক করেছে কাবুলদার উদ্দেশে।

কী সাংঘাতিক! দ্যুতি সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রাণভিক্ষা চাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই আর। কিন্তু গলায় স্বরই ফুটছে না। কিটনার হাসছে। সাড়ে-ছ'ফিট বিশাল দেহটা থরথর করে কাঁপছে হাসির দমকে। অতি-প্রাকৃতিক কোনও দানবের মতো লাগছে তাকে। কিন্তু লোকটা গুলি করছে না তো। হাসি থেমে গিয়েছে হঠাৎ।

কাবুলদা চেঁচিয়ে বলল, "পালা দ্যুতি, ওর বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেছে!"

লম্বা একটা শ্বাস নিল দ্যুতি। এবার হাতাহাতি ড়ুয়েল ছাড়া গতি নেই কিটনারের। হোক না দানব। যতক্ষণ জ্ঞান আছে দ্যুতিও লড়বে। কিটনারের হাতে এবার কাবুলদার বন্দুক। এবার সেটা তাক করেছে কাবুলদার উপর। শিকার যখন মুঠোয়, তখন একটু খেলান যায় বইকি!

কিটনারও তাই করল। আবার হাসি ফিরেছে তার। সিনেমার খলনায়কের মতো বলছে কেন কাবুলদার উপর গুলি চালাচ্ছে। এক তো হাগেণার বন্দুক বাটপাড়ি করার জন্যে। দ্বিতীয় এবং মুখ্য কারণ তার সাঙ্গের চোরাই সম্পত্তির ভাণ্ডার উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তারপরেও বলল, "এখনও পালাতে দিতে পারি, তোমাদের পিছনে কে-কে আছে যদি বলো?"

বন্দুকে তো বুলেট নেই। কাবুলদা খুব নিঃস্পৃহ গলায় বলল, "পিছনে হাতি ছিল এতক্ষণ। গন্ডারও আছে। আর আছে তোমার মতো কিছু মুখপোড়া হনুমান। বুঝেছ?"

আর কী সহ্য হয়! কিটনার টিগার টিপে দিল। গুলি তো নেই। ক্লিক করে একটু শব্দ হল কেবল। কাবুলদা আঘাতের পরোয়া না করে উঠে দাঁড়িয়েছে এবার। কিন্তু কিটনার সত্যি ডেভিল। জামার ভিতরে হাত চালিয়ে একটা ফোল্ডিং-নাইফ বের করে ফেলল ধাঁ করে। একই ক্ষিপ্রতায় আচমকা দ্যুতির হাত ধরে টান দিয়ে নিজের সামনে এনে ফেলল কীভাবে। ঝটকায় দ্যুতির বুকপকেটে যা ছিল ছিটকে পড়েছে পাথরে। শুকনো পল। লাইটার। আর স্কটসাহেবের সেই অ্যামো-বক্স।

বাহ! এই তো চাই। নিচু হয়ে বাঁ হাতে বক্সটা তুলল কিটনার। তারপর থুতনিতে চেপে ধরে খট করে খুলে ফেলল বাক্সটা। ভাবছে ওর মধ্যে যেন সত্যি টোটা রেখেছে দ্যুতিরা। স্রেফ একটা মরচে ধরা মেডেল দেখে কী করে দেখার অপেক্ষা।

কিন্তু শুধু দেখাই না, কিটনারের দুনিয়াকাঁপানো একটা চিৎকারও শুনল ওরা।

কিটনারের গলার উপরে অন্তত চার ইঞ্চি লম্বা কুচকুচে কালো একটা কাঁকড়া বিছে! সেটা বারেবারে পিছনের হুলটা নিক্ষেপ করছে কিটনারের গলায়। কিটনার এত ভয় পেয়েছে, বিছেটাকে হাত দিয়ে

সরাতেও ভুলে গিয়েছে। অমানুষিক চিৎকার করতে-করতে প্রথমে বসে পড়ল সে। তারপর চোখমুখ কেমন করে একেবারে শুয়েই পড়ল পাথরের উপর। বিছেটা ধীরে-ধীরে গলা থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের খাঁজে।

দ্যুতি বুঝেছে কাণ্ডটা। এরকমই একটা পাথরের চাতালে সেই রাত্তিরে বিছেটা উঠে এসেছিল দলবল নিয়ে। কয়েকটা তো দ্যুতি নিজেই পিষে মেরেছিল। এই চরম মুহূর্তে তাদেরই একজন বাঁচিয়ে দিল ওদের। কখন ঢুকে বসেছিল বাক্সে। দ্যুতি না দেখেই বন্ধ করে দিয়েছিল লিডটা।

কাবুলদা বলল, "কিটনার শেষে কীটদষ্ট হয়েই ঘায়েল হল।"

তা বটে। পকেটে নাইলনের দড়ি ছিল। তাই দিয়ে বেঁধে ফেলা হল কিটনারকে। অত্যাধুনিক সেলফোনও মিলল প্যান্টের পকেট থেকে। সুইচ-অফ করা। অন করে প্রথমেই ভারতীয় দূতাবাসে ফোন। যতটা সম্ভব বলা হল সব। একটু পর দূতাবাস থেকেই ফোন কলব্যাক এল, সরকারকে জানানো হয়েছে। হেলিকপ্টার আসছে। আপাতত ওখানেই যেন কাবুলদারা থাকে।

কাবুলদা বলল, "বিছেটা যা মনে হল, থিক-টেইলড স্করপিয়ন। খাবার না পেয়ে মাসের পর-মাস থাকতে পারে এরা। বাক্সটার কবজার কাছটা ফুটো-ফুটো ছিল। মরে যায়নি সে জন্য। তবে এদের বিষে মানুষ মারা যায় না। কিউনার সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শকেই নার্ভ ফেল করে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবে ভাব ওটা বুকে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ালি অ্যাদ্দিন।"

সে কথা আর বলতে, ভাবতেই গা শিরশির করছে দ্যুতির।

ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে দু'টি কপ্টার চলে এল। আবছা-আবছা অন্ধকার চারিদিকে। কাবুলদা অনেকটা ঘাস জ্বালিয়ে নিশানা করেছিল।

কপ্টারের একটিতে দ্যুতিরা ফিরবে। অন্যটিতে কিটনার আর তার বাকি শাগরেদদের খোঁজাখুঁজি করে তোলা হবে। পাইলট ছাড়া দ্যুতিদের কপ্টারে রয়েছেন তিনজন। পুলিশের একজন বড়কর্তা। একজন নার্স। আর আছেন এলমো কাটিজপো। দ্যুতি ভেবেছিল হয়তো পিটার আগুটা আসবেন।

কিন্তু কপ্টার ওড়ার পর এলমোসাহেব যা বললেন শুনে হতবাক দ্যুতি। পিটার আগুটা ইতিমধ্যেই নামিবিয়া থেকে সরে পড়েছেন। সেই-ই ছিল নাটের গুরু। ফ্রেডরিকও তার লোক। সেও উধাও হয়েছে কোথাও। সম্ভবত সীমানা পেরিয়ে বোতসোয়ানা বা সাউথ-আফ্রিকায় পালিয়েছে। মেডেলটা পুলিশকর্তার কাছে জমা দিল কাবুলদা।

এলমোসাহেব বললেন, "আগুটাই আমাকে বিশেষ কাজ আছে বলে ওকাহানডজায় নেমে যেতে বলে। তাও হয়তো কিডন্যাপিংয়ের মতো ঘটনা ঘটাত না। আচমকা গুগুধনের ব্যাপারটা ঢুকে যাওয়ায় আরও লোভে পড়ে যায় ওরা। ড্যানিয়েলের বন্ধব্যও নিতে হবে। তোমরা নিশ্চিন্ত হওয়ার পরের দিন উইন্ডহুকে ফিরে আসে সে। সেইই বলেছিল তোমরা জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলে ওকে। আসলে বলানো হয়েছিল। কারা বলিয়েছিল, সে জবানবন্দিও পুলিশ নেবে এবার। দলের একটা বড় মাথা তো ধরা পড়েছে। দেখা যাক কী হয়। একটা ভাল খবর। স্যামুয়েল রুউই একটু ভাল আছেন। মৃত্যুভয় নেই। তবে সুস্থ হতে অনেক সময় লাগবে।"

দ্যুতি এসব আর শুনছিল না।

হেলিকপ্টার ক্রমেই উচ্চতা বাড়াচ্ছে। নীচে অনেক নীচে আবছা আবছা ধূ-ধূ প্রান্তর। পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে আলো ঝলমলে ঝাঁ চকচকে আধুনিক উইন্ডহুক শহর। দূরে, কত দূরে পড়ে থাকবে ছেড়ে যাওয়া এইসব জীবজন্তুর দল। হাতিগুলো শুঁড় দিয়ে জল শুঁড়বে বালিতে। গন্ডার বিষ-ক্রোশ খাবে কচকচ করে। সিলমাছের মধ্যে শিয়াল ঘুরে বেড়াবে লোভী চোখ নিয়ে। হায়েনা চুপি-চুপি ভাগ বসাবে পশুরাজ সিংহের খাবারে। বেন্দুরার সঙ্গেও কি আর দেখা হবে? কিংবা টমআঙ্কলও? পিটার আগুটারা যেমন আছে, তেমনি এরাও তো আছেন এখানে। একই রকম দেহ। অথচ মনে-মনে কত বিভেদ। যাদের জানোয়ার বলা হয়, তারা তো এমন না!

ফিরে যাচ্ছে দ্যুতি, কে জানে কেন, তবুও এই ক'দিনের রোমাঞ্চকর জীবনটাই হঠাৎ পিছু টানছে ওকে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

কাবুলদাও চুপচাপ। গুলিটা ওর বাঁ-হাতের বাইসেপ ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আঘাত গুরুতর না। তবে ব্যথা তো হচ্ছেই। নার্স ভদ্রমহিলা ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন। পায়ের ক্ষতেরও চিকিৎসা করাতে হবে। বেচারি, একা কুম্ভের মতো দ্যুতিকে রক্ষা করে গেল সারাটা ক্ষণ।

"কী রে এত চুপ কেন? কী ভাবছিস?" বাংলায় বলল কাবুলদা।

কী বলবে দ্যুতি? মনটা একটু খারাপ-খারাপ লাগছে!

"গুপ্তধনের তা হলে কিছু ছিল না?" কথাটা হঠাৎ মাথায় এল ওর।

"ছিল না বলা যায় না। দামি আকরিকের কোনও খনি অবশ্যই আছে। আসলে কী জানিস, নামিবিয়া কেন, আফ্রিকার অর্ধেক জায়গাই এখনও এক্সপ্লোর করা হয়ে ওঠেনি। এই নামিবিয়াতেই তো হরদম খোঁড়াখুঁড়ি লেগে আছে। গুপ্তধন মানে তো শুধু সোনার সিন্দুক বোঝাই মণিমাণিক্য, হিরে, জহরত না। মূল্যবান কোনও নতুন খনির আবিষ্কার।"

দ্যুতি বলল, "কালাহারি অভিযানে যাওয়া যায় না?"

হেসে ফেলল কাবুলদা, "সেটা সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে। এখন তো বাড়ি চল। এক ধাক্কায় দু'-দুটো মরুভূমি, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে! তার উপর সেখানেও কড়া পাহারা। স্বর্গেরই আর এক দেবতা তার রক্ষক, মনে আছে তো!"

তা ঠিক। অ্যাডভেঞ্চার মানেই পাগলামি না। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করেই ঝাঁপানো উচিত।

তবে সরকার বা কাবুলদা যে যাই-ই করুক। এই ক'দিনের অভিজ্ঞতা ওর জীবনটাকে পালটে দিয়েছে একদম। ডানা মেলে উড়ে যাওয়া অ্যালব্রাটসটা এখনও ভাসছে চোখের সামনে। পাখিটার মতোই ডানা মেলে থাকবে দ্যুতি। অ-নে-ক অ-নে-ক বড় হবে ওর পৃথিবী। আর সে পৃথিবীতে কিটনার, আগুটাদের কোনও স্থান নেই। বেন্দুরা, টমআঙ্কলদের মতো মানুষে ভরে থাকবে সে দুনিয়া।

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা
আমি শেষবারের মতো বলছি, ওই সিন্দুকের নম্বর আমার চাই!
আমার টিয়া জানে ওর থেকে জেনে নাও...আমি বলব না
বলবে না
না
আহ!
টিয়া-য়া-য়া...

শ্রী প্রদোষচন্দ্র মিত্র মহাশয় সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন,
আপনার কীর্তিকলাপের বিষয় অবগত হইয়া আপনার সহিত একটিবার সাক্ষাতের বাসনা জাগিয়াছে। ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে অবশ্যই। সেটি আপনি...
আসিলে জানিতে পারিবেন। আপনি যদি তিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হন, তবে অবিলম্বে পত্র মারফত জানাইলে বাধিত হইব। ঘুরঘুটিয়া আসিতে হইলে পলাশি স্টেশনে নামিয়া সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে যাইতে হয়। শিয়ালদহ হইতে একাধিক ট্রেন আছে; তন্মধ্যে ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার দুপুর একটা আটান্ন মিনিটে ছাড়িয়া সন্ধ্যা ছ'টা এগারো মিনিটে পলাশি পৌঁছায়। স্টেশনে আমার গাড়ি থাকিবে। আপনি রাত্রে আমারই গৃহে অবস্থান করিয়া পরদিন সকালে সাড়ে দশটায় একই ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন।
ইতি আশীর্বাদক,
কালীকিঙ্কর মজুমদার
পলাশি মানে কি সেই যুদ্ধের পলাশি?
আর ক'টা পলাশি আছে ভাবছিস বাংলাদেশে?
পলাশি!

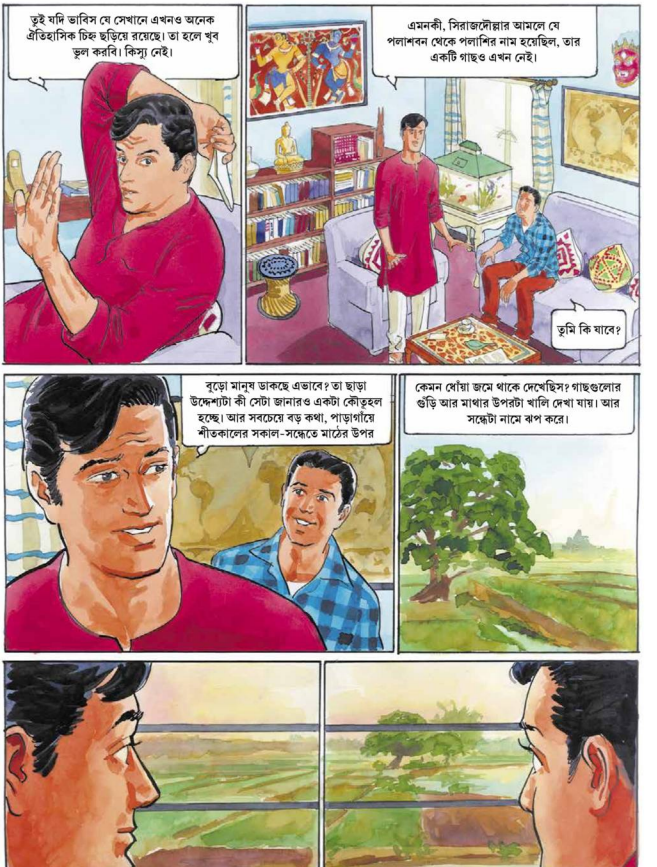
তুই যদি ভাবিস যে সেখানে এখনও অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। তা হলে খুব ভুল করবি। কিস্যু নেই।
এমনকী, সিরাজদৌল্লার আমলে যে পলাশবন থেকে পলাশির নাম হয়েছিল, তার একটি গাছও এখন নেই।
তুমি কি যাবে?
বুড়ো মানুষ ডাকছে এভাবে? তা ছাড়া উদ্দেশ্যটা কী সেটা জানারও একটা কৌতূহল হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, পাড়াগাঁয়ে শীতকালের সকাল-সন্ধেতে মাঠের উপর
কেমন ধোঁয়া জমে থাকে দেখেছিস? গাছগুলোর গুঁড়ি আর মাথার উপরটা খালি দেখা যায়। আর সন্ধেটা নামে ঝপ করে।

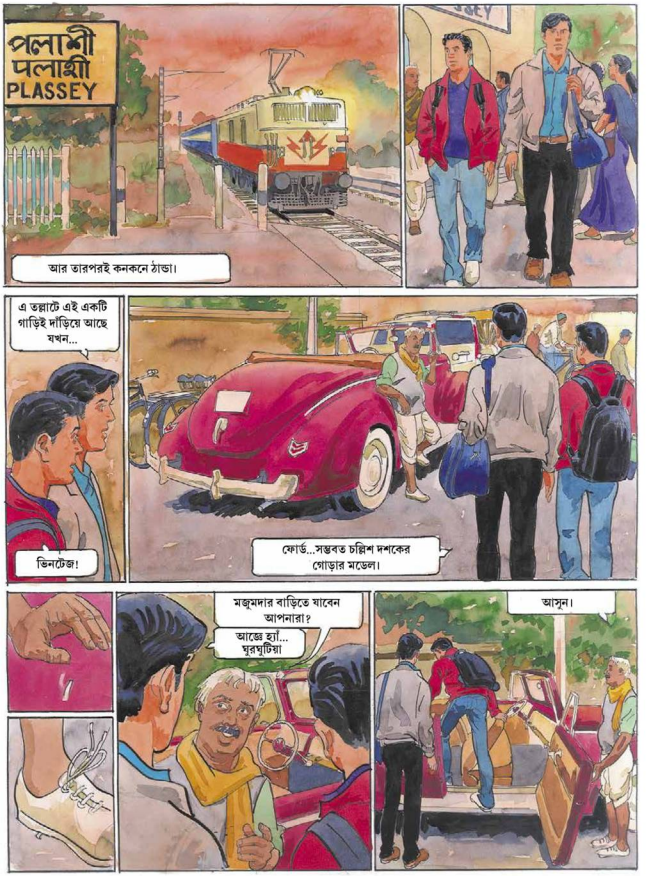
পলাশী
পলাশী
PLASSEY
আর তারপরই কনকনে ঠান্ডা।
এ তল্লাটে এই একটি গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে যখন...
ভিনটেজ!
ফোর্ড...সম্ভবত চল্লিশ দশকের গোড়ার মডেল।
মজুমদার বাড়িতে যাবেন আপনারা?
আজ্ঞে হ্যাঁ... ঘুরঘুটিয়া
আসুন।

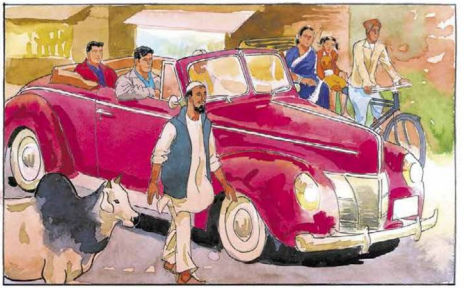

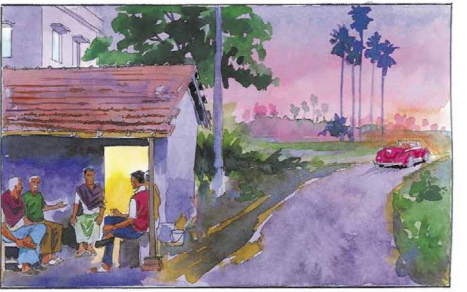

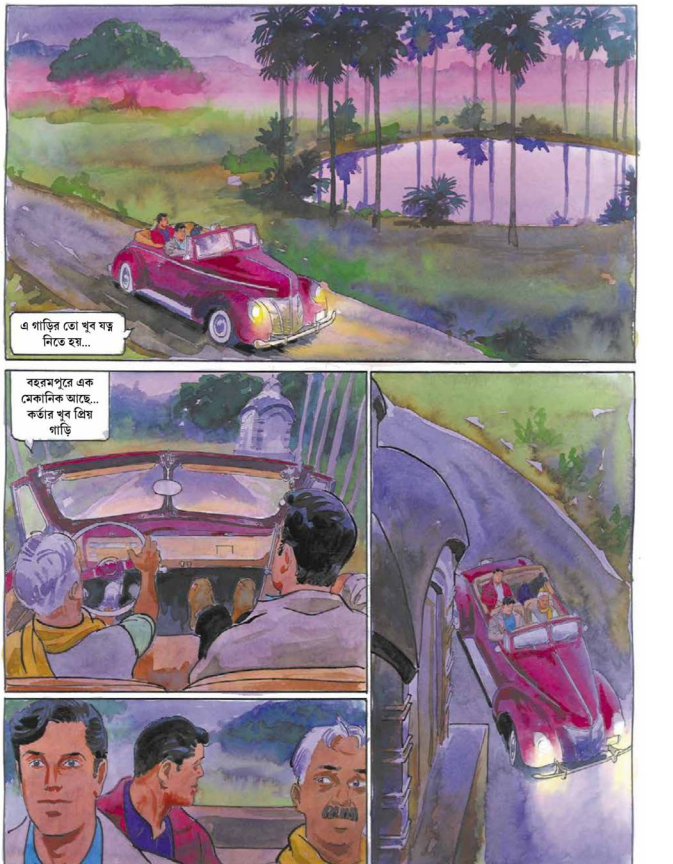
এ গাড়ির তো খুব যত্ন নিতে হয়...
বহরমপুরে এক মেকানিক আছে... কর্তার খুব প্রিয় গাড়ি

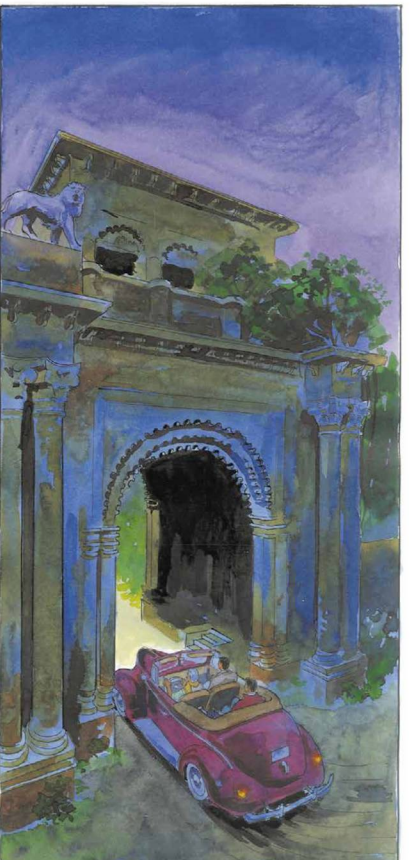

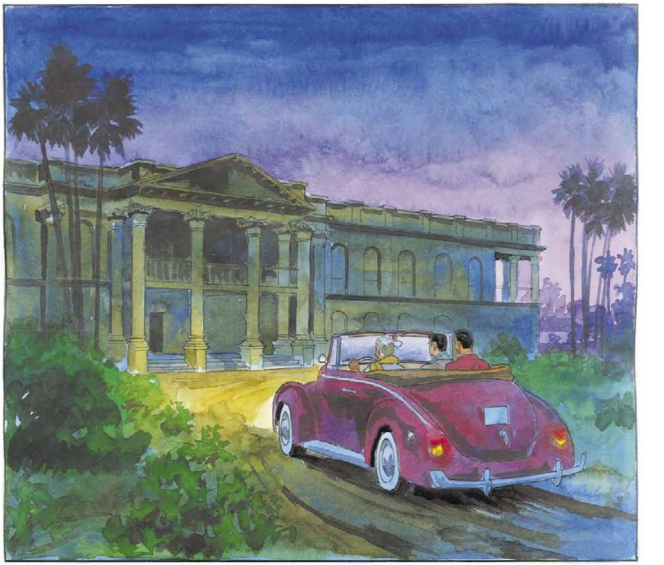

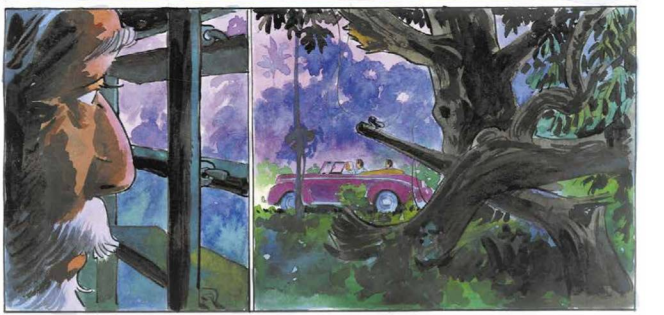

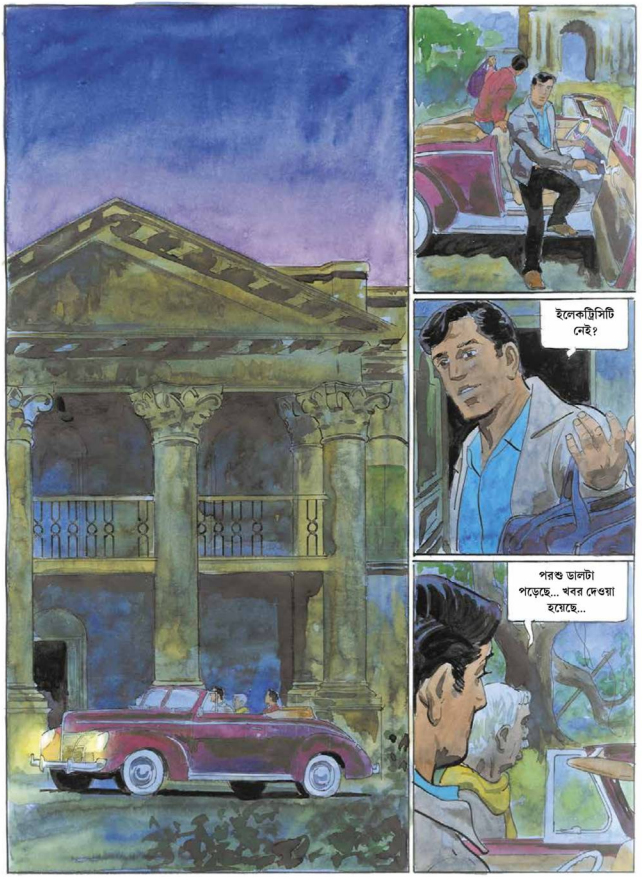
ইলেকট্রিসিটি নেই?
পরশু ডালটা পড়েছে... খবর দেওয়া হয়েছে...

আসুন

এত বড় বাড়ি... দরজাগুলো বেঁটে-বেঁটে। ছাদটা প্রায় হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়।
দু'শো বছর আগের বাংলাদেশের জমিদার বাড়িগুলো বেশির ভাগই এরকমই ছিল।
একে বলে চাপা-দরজা। দরজা বন্ধ করলে মাথার উপরে সিলিংয়ের মতো টেরচাভাবে শুয়ে পড়ে।

ডাকাতদের আটকাবার জন্য এরকম দরজা তৈরি হত। ফুটোগুলো দেখছিস। এগুলো দিয়ে বল্লম ঢুকিয়ে ডাকাতদের খুঁচিয়ে তাড়ানো হত।
দিন, আপনাদের ব্যাগগুলো ঘরে রেখে আসি।
আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ মিত্র।
বসুন, নাকি বোসো বলব? তুমি তো বয়সে আমার চেয়ে অর্ধেকেরও বেশি ছোট। তুমিই বলি। কী বলো?
নিশ্চয়ই।

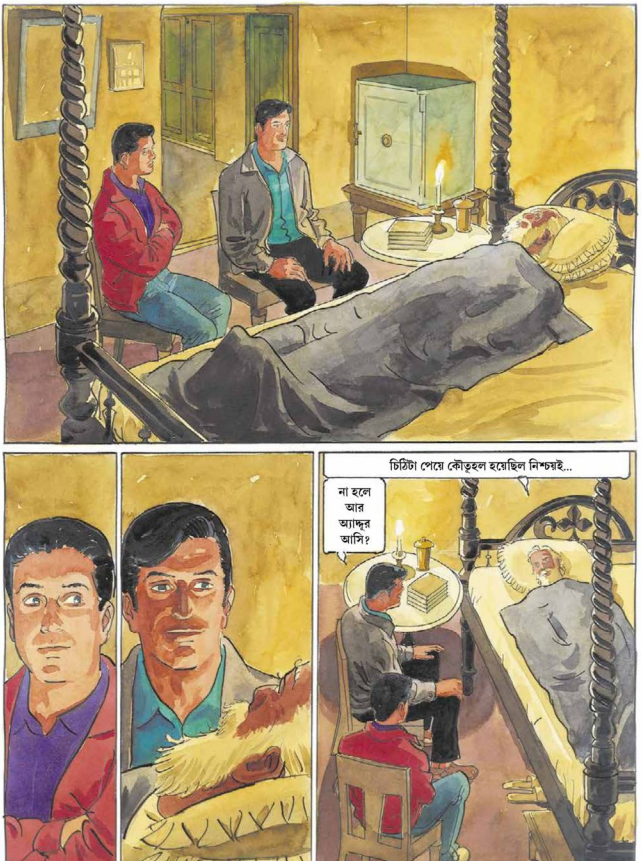
চিঠিটা পেয়ে কৌতূহল হয়েছিল নিশ্চয়ই...
না হলে আর অ্যান্দুর আসি?

বেশ-বেশ, না এলে আমি দুঃখ পেতাম। মনে করতাম তুমি দাম্ভিক। আর তুমিও একটা পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে।
অবিশ্যি জানি না এ সব বই তোমার আছে কিনা।
সর্বনাশ! এ যে দেখছি সবই দুষ্প্রাপ্য বই।
আর প্রত্যেকটা আমার পেশা সম্পর্কে। আপনি নিজে কি কোনও কালে...
না, আমি নিজে কোনওদিন গোয়েন্দাগিরি করিনি। ওটা বলতে পার আমার যুবাবয়সের একটা শখ বা হবি।

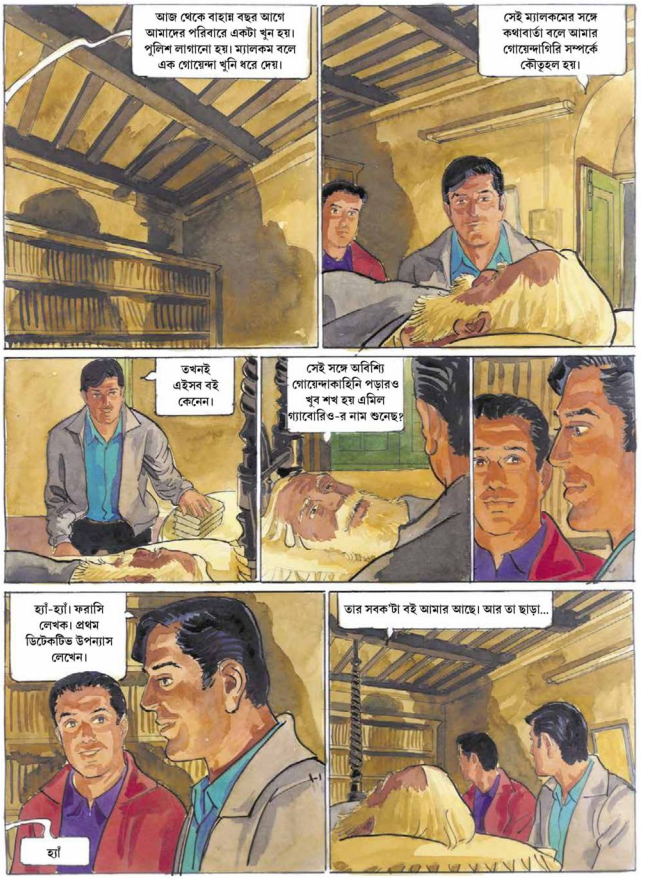
আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে আমাদের পরিবারে একটা খুন হয়। পুলিশ লাগানো হয়। ম্যালকম বলে এক গোয়েন্দা খুনি ধরে দেয়।
সেই ম্যালকমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে কৌতূহল হয়।
তখনই এইসব বই কেনেন।
সেই সঙ্গে অবিশ্যি গোয়েন্দাকাহিনি পড়ারও খুব শখ হয় এমিল গ্যাবোরিও-র নাম শুনেছ?
হ্যাঁ-হ্যাঁ। ফরাসি লেখক। প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন।
হ্যাঁ
তার সবক'টা বই আমার আছে। আর তা ছাড়া...

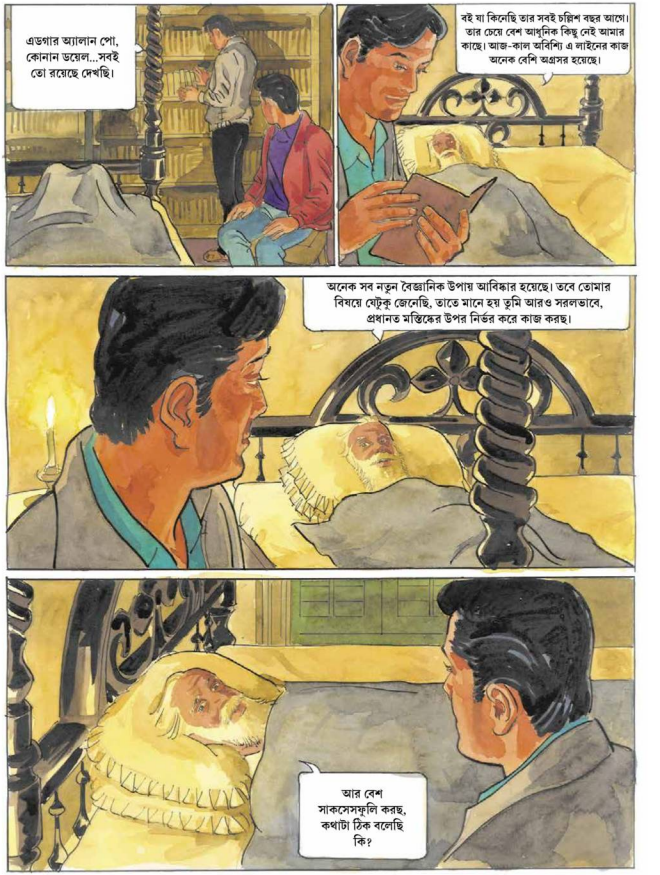
এডগার অ্যালান পো, কোনান ডয়েল...সবই তো রয়েছে দেখছি।
বই যা কিনেছি তার সবই চল্লিশ বছর আগে। তার চেয়ে বেশ আধুনিক কিছু নেই আমার কাছে। আজ-কাল অবিশ্যি এ লাইনের কাজ অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে।
অনেক সব নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তবে তোমার বিষয়ে যেটুকু জেনেছি, তাতে মানে হয় তুমি আরও সরলভাবে, প্রধানত মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে কাজ করছ।
আর বেশ সাকসেসফুলি করছ, কথাটা ঠিক বলেছি কি?

সাকসেসের কথা জানি না, তবে পদ্ধতি সম্বন্ধে যেটা বললেন সেটা ঠিক।
সেটা জেনেই আমি তোমাকে ডেকেছি।
আমার যে শুধু সত্তরের উপর বয়স হয়েছে তা নয়। আমার শরীরও ভাল নেই। আমি চলে গেলে এ সব বইয়ের কী দশা হবে জানি না।
তাই ভাবলাম অন্তত এই ক'টা যদি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে এগুলোর যত্ন হবে, কদর হবে।
এ সবই কি আপনার নিজের বই?
বইয়ের শখ মজুমদার বংশে একমাত্র আমারই। আরও নানা বিষয়ে যে উৎসাহ ছিল আমার সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

তা তো বটেই। আর্কিয়োলজ়ির বই রয়েছে। আর্টের বই, বাগান সম্বন্ধে বই, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনি... এমন কী থিয়েটারের বইও তো দেখছি।
তার মধ্যে কিছু বেশ নতুন বলে মনে হচ্ছে। এখনও বই কেনেন নাকি?
তা কিনি বইকী। রাজেন বলে আমার একটি ম্যানেজার গোছের লোক আছে। তাকে মাসে দু'-তিনবার করে কলকাতায় যেতে হয়। তখন লিস্ট করে দিই। ও কলেজ স্ট্রিট থেকে নিয়ে আসে।
আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।
বইগুলো নিজের হাতে করে তুলে দিতে পারলে আরও বেশি খুশি হতাম। কিন্তু আমার দুটো হাতই অকেজো হয়ে আছে। আরথ্রাইটিস... গেঁটে বাত। হাতের আঙুলগুলো আর ব্যবহার করতে পারি না।

এখন অবিশ্যি আমার ছেলে কিছুদিন হল এখানে এসে রয়েছে। নইলে আমার চাকর গোকুলই আমাকে খাইয়েটাইয়ে দেয়।
আপনার চিঠিটা কি আপনার ছেলে লিখেছিলেন?
না। ওটা লিখেছিল রাজেন। বৈষয়িক ব্যাপারগুলো ওই দেখে। ডাক্তার ডাকার দরকার হলে গাড়ি করে গিয়ে নিয়ে আসে বহরমপুর থেকে। পলাশিতে ভাল ডাক্তার নেই।
আপনার সিন্দুকে একটু বিশেষত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। কম্বিনেশনে খোলে বুঝি?
ঠিক ধরেছ। একটা বিশেষ সংখ্যা আছে; সেই অনুযায়ী নম্বরটা ঘোরালে তবে খোলে। এসব অঞ্চলে এককালে ডাকাতদের খুব উপদ্রব ছিল। জান তো?
আমার পূর্বপুরুষই তো ডাকাতি করে জমিদার হয়েছে। তারপর আবার আমরাই ডাকাতের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। ...তাই তালার বদলে কম্বিনেশন করলে হয়তো আর-একটু নিরাপদ হবে।

গোকুল...
একবার খাঁচাটা আন তো গোকুল। এঁদের দেখাব।
বলো তো...ত্রিনয়ন, ত্রিনয়ন বলো তো...

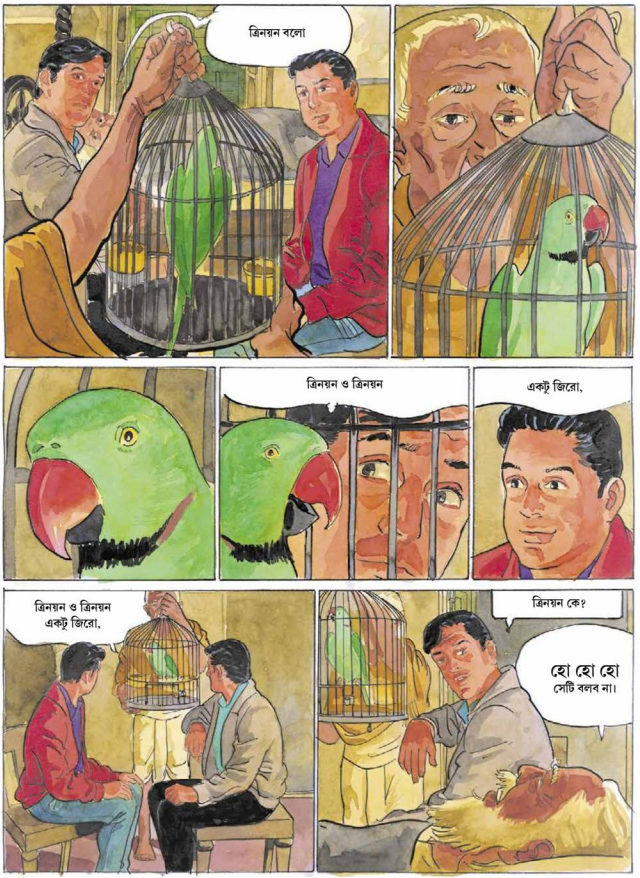
ত্রিনয়ন বলো
ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন
একটু জিরো,
ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন
একটু জিরো,
ত্রিনয়ন কে?
হো হো হো
সেটি বলব না।

শুধু এইটুকু বলব যে যেটা বলছে, সেটা হল একটা সংকেত। বারো ঘণ্টা সময় আছে তোমার। দেখো তো তুমি সংকেতটা বের করতে পার কিনা। আমার সিন্দুকের সঙ্গে সংকেতটার যোগ আছে বলে দিলাম।
টিয়াকে ওটা শেখানোর পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা সেটা জানতে পারি কি?
নিশ্চয়ই পার। বয়সের সঙ্গে অধিকাংশ মানুষের স্মরণশক্তি কমে আসে। বছরতিনেক আগে একদিন দেখি সিন্দুকের সংকেতটা মনে আসছে না। বিশ্বাস করবে? পরদিন চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। শেষটা মনে পড়ল মাঝরাত্তিরে।
নম্বরটা লিখে রাখিনি কোথাও, কারণ কখন যে কার কী অভিসন্ধি হয়, সেটা তো বলা যায় না।
যাও, ওকে নিয়ে যাও।
তাই মনে হয়েছিল মাথায় রাখাই ভাল এক আমার ছেলে জানত। কিন্তু সে থাকে বাইরে-বাইরে।
তাই পরদিনই একটা টিয়া সংগ্রহ করে নম্বরটা একটা সাংকেতিক চেহারা দিয়ে পাখিটিকে পড়িয়ে দিই।

এখন ও মাঝে-মাঝেই সংকেতটা বলে ওঠে, অন্য পাখি যেমন বলে...
রাধাকিষণ বা ঠাকুর ভাত দাও...
কী দেখছ ভাই? তোমার ডিটেকটিভ চোখে কিছু ধরা পড়ল নাকি?

আপনার সিন্দুকের দরজার উপর কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয়। বোধ হয় কেউ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করেছিল।
তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত?
ঝাড়পোছ করতে গিয়ে এরকম দাগ পড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ ধরনের কোনও সম্ভাবনা আছে কি? সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।
বাড়িতে লোক বলতে তো আমি, গোকুল, রাজেন, আমার ড্রাইভার মণিলাল, ঠাকুর আর মালি।
আমার ছেলে বিশ্বনাথ দিনপাঁচেক হল এসেছে। ও থাকে কলকাতায়। ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ নেই। এবার এসেছে আমার অসুখের খবর পেয়ে। গত সোমবার বাগানের বেঞ্চিটায় বসে ছিলাম। ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই।
রাজেন পলাশি থেকে বিশ্বনাথকে ফোন করে দেয়। মনে হচ্ছে, একটা ছোটখাট হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। আমার এমনিতেও আর বেশিদিন নেই। এই শেষ ক'টা দিন কি সংশয়ের মধ্যে কাটাতে হবে? আমার ঘরে ঢুকে ডাকাত আমার সিন্দুক ভাঙবে?
আমার সন্দেহ নির্ভুল নাও হতে পারে। হয়তো আগেই ঘষাটা লেগেছিল। দাগগুলো টাটকা না পুরনো, সেটা এই সোমবাড়ির আলোয় বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে আর-একবার দেখব। গোকুল বিশ্বাসী তো?

গোকুল রয়েছে তিরিশ বছর।
আর রাজেনবাবু?
রাজেনও পুরনো, বিশ্বাসী লোক। তবে আজ যে বিশ্বাসী কাল যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই।
যাই হোক গোকুলকে বলবেন একটু দৃষ্টি রাখতে। আমার মনে হয় না চিন্তার কোনও কারণ আছে।
যাক।
গোকুল তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। বিশ্বনাথ একটু বহরমপুর গিয়েছে এই ফিরল বলে। ও এলে তোমরা খাওয়াদাওয়া করে নিয়ো।
কাল সকালে যাওয়ার আগে চাও তো গাড়ি করে আশপাশে একটু ঘুরে দেখে নিয়ো। যদিও দ্রষ্টব্য বলে খুব যে একটা কিছু আছে তা নয়।
সংকেতের সমাধান করতে পারলে গ্যাবোরিওর সেটটা তোমায় দেব।

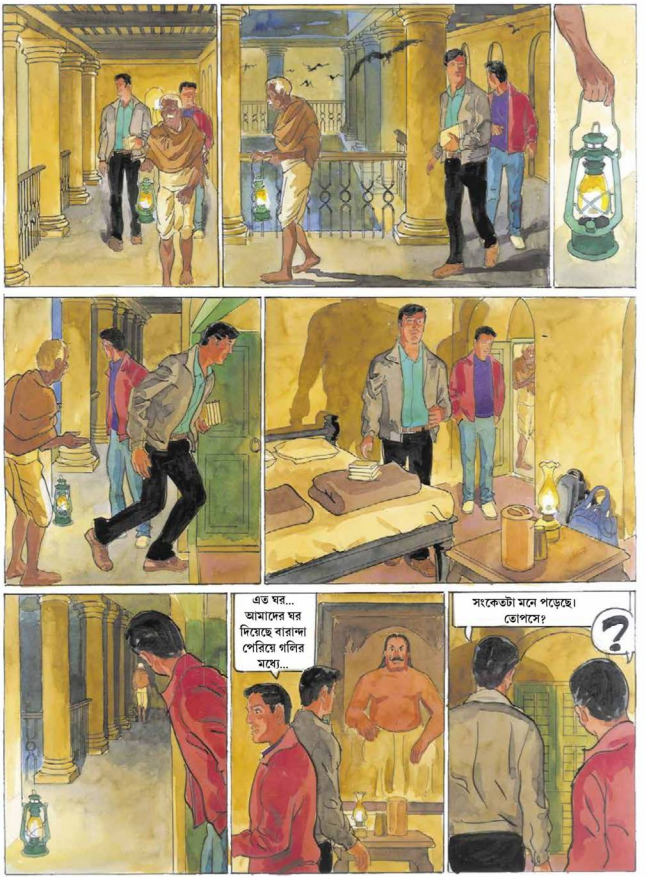
এত ঘর... আমাদের ঘর দিয়েছে বারান্দা পেরিয়ে গলির মধ্যে...
সংকেতটা মনে পড়েছে। তোপসে?
?

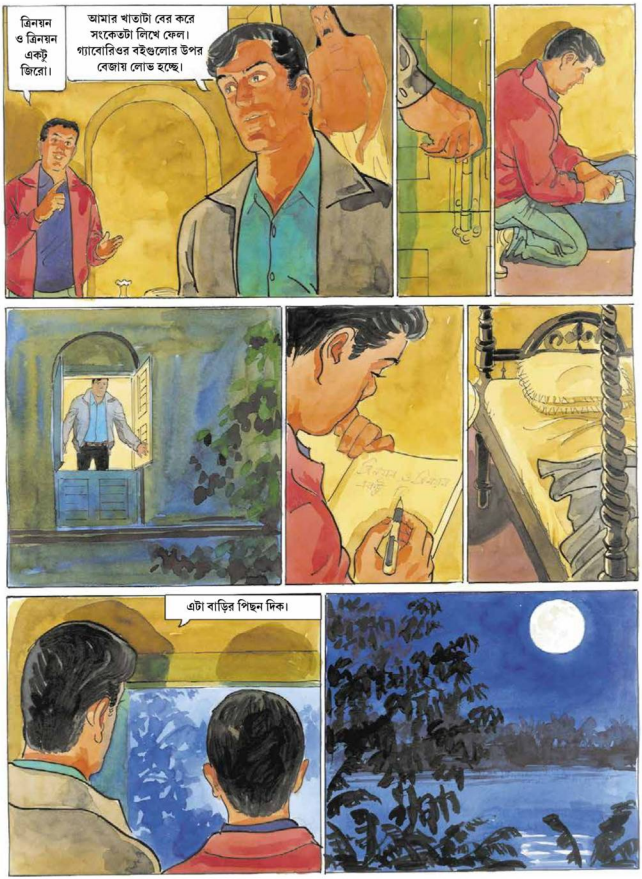
ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন একটু জিরো।
আমার খাতাটা বের করে সংকেতটা লিখে ফেল। গ্যাবোরিওর বইগুলোর উপর বেজায় লোভ হচ্ছে।
এটা বাড়ির পিছন দিক।

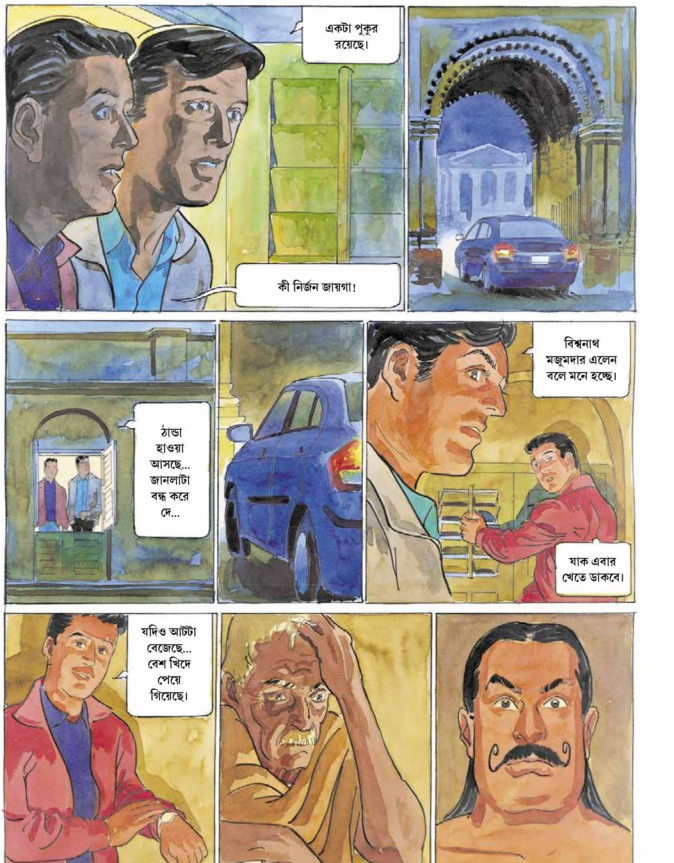
একটা পুকুর রয়েছে।
কী নির্জন জায়গা!
ঠান্ডা হাওয়া আসছে... জানলাটা বন্ধ করে দে...
বিশ্বনাথ মজুমদার এলেন বলে মনে হচ্ছে।
যাক এবার খেতে ডাকবে।
যদিও আটটা বেজেছে... বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছে।

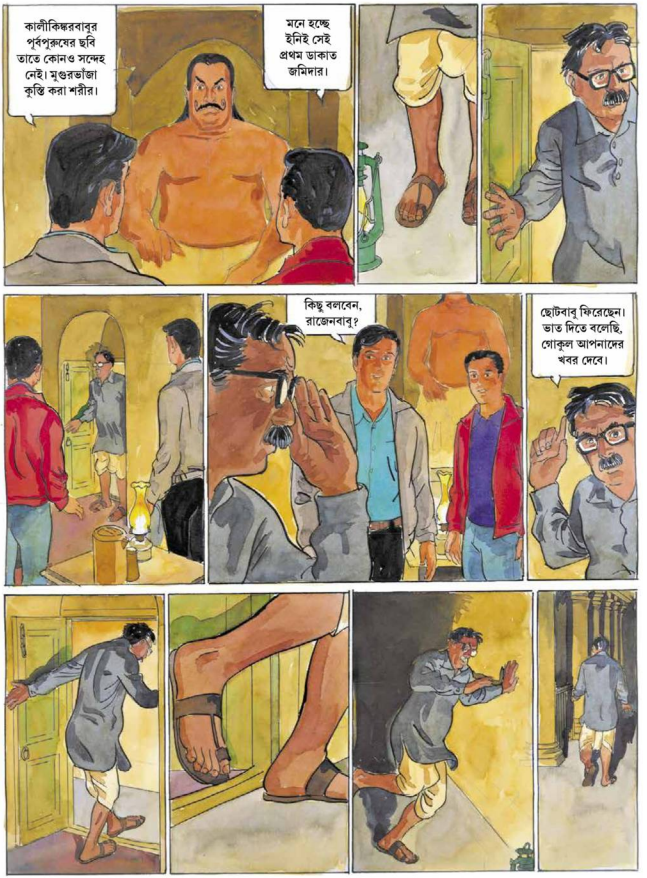
কালীকিঙ্করবাবুর পূর্বপুরুষের ছবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুগুরভাঁজা কুস্তি করা শরীর।
মনে হচ্ছে ইনিই সেই প্রথম ডাকাত জমিদার।
কিছু বলবেন, রাজেনবাবু?
ছোটবাবু ফিরেছেন। ভাত দিতে বলেছি, গোকুল আপনাদের খবর দেবে।

ন্যাপথালিনের গন্ধ...
গরম পাঞ্জাবিটা সবেমাত্র বের করেছে ট্রাঙ্ক থেকে।
তুমি না থাকলে এই পোড়ো বাড়িতে পাঁচ মিনিটও থাকার সাধ্যি হত না আমার।
?
?!

ট্রি য়া য়া
এরা এত দেরি করছে কেন বলো তো?
তা মন্দ বলিসনি। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল।
আমাদের এমন ঘর দিয়েছে কেন বলো তো যেখান থেকে কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।
আপনাদের অনেক দেরি করিয়ে দিলাম...
হ্যাঁ!
আমার নাম বিশ্বনাথ মজুমদার।

আমার আবার কী শীত, কী গ্রীষ্ম দু'বেলা চান করার অভ্যেস। তাই একটু দেরি হয়ে গেল।
বসুন।
ক্যাভেললাইট ডিনার।
বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে?
হ্যাঁ, উনি আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন।
বই উপহার নিয়ে?

হ্যাঁ, আজকের বাজারে এই বই যদি পাওয়াও যেত, তা হলে দাম পড়ত কমপক্ষে কয়েক হাজার টাকা।
আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন জেনে আমি বাবাকে বেশ একটু ধমকই দিয়েছিলাম। শহুরে লোকেদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডেকে এনে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না।
কী বলছেন মিস্টার মজুমদার! আমার তো এখানে এসে দারুণ লাভ হয়েছে। কষ্টের কোনও কথাই ওঠে না।
আমার তো এই চারদিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। বাবা যে কী করে একটানা এতদিন রয়েছেন জানি না।
বাইরে একেবারেই যান না?
শুধু তাই না। বেশির ভাগ সময়ই ওঁর অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকেন। দিনে দু'বার কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে বসেন।
এখন অবিশ্যি শরীরের জন্য সেটাও বন্ধ।
আপনি আর ক'দিন আছেন?
আমি কালই যাব। বাবার এখন ইমিডিয়েট কোনও ডেঞ্জার নেই।

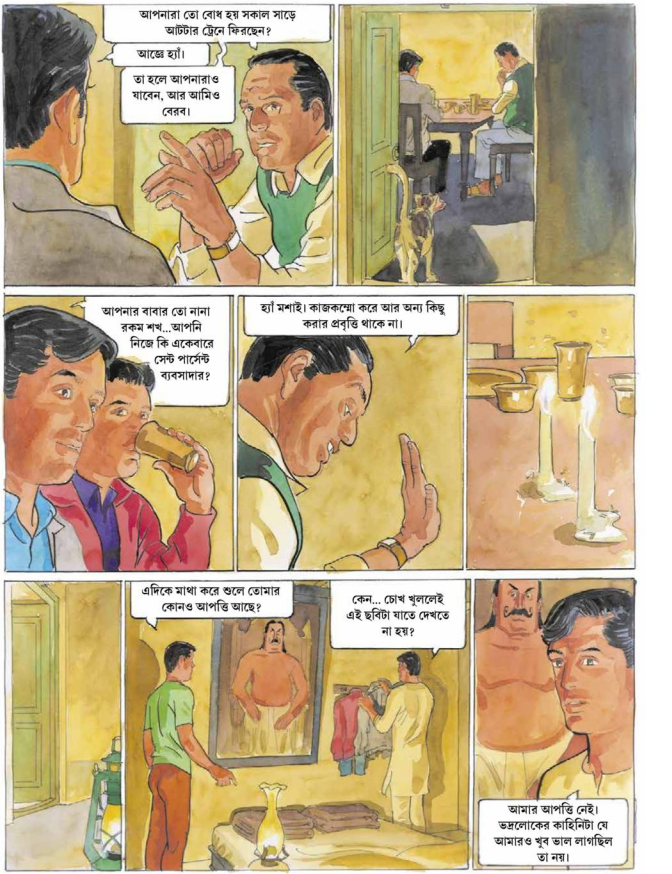
আপনারা তো বোধ হয় সকাল সাড়ে আটটার ট্রেনে ফিরছেন?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
তা হলে আপনারাও যাবেন, আর আমিও বেরব।
আপনার বাবার তো নানা রকম শখ...আপনি নিজে কি একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট ব্যবসাদার?
হ্যাঁ মশাই। কাজকম্মো করে আর অন্য কিছু করার প্রবৃত্তি থাকে না।
এদিকে মাথা করে শুলে তোমার কোনও আপত্তি আছে?
কেন... চোখ খুললেই এই ছবিটা যাতে দেখতে না হয়?
আমার আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের কাহিনিটা যে আমারও খুব ভাল লাগছিল তা নয়।

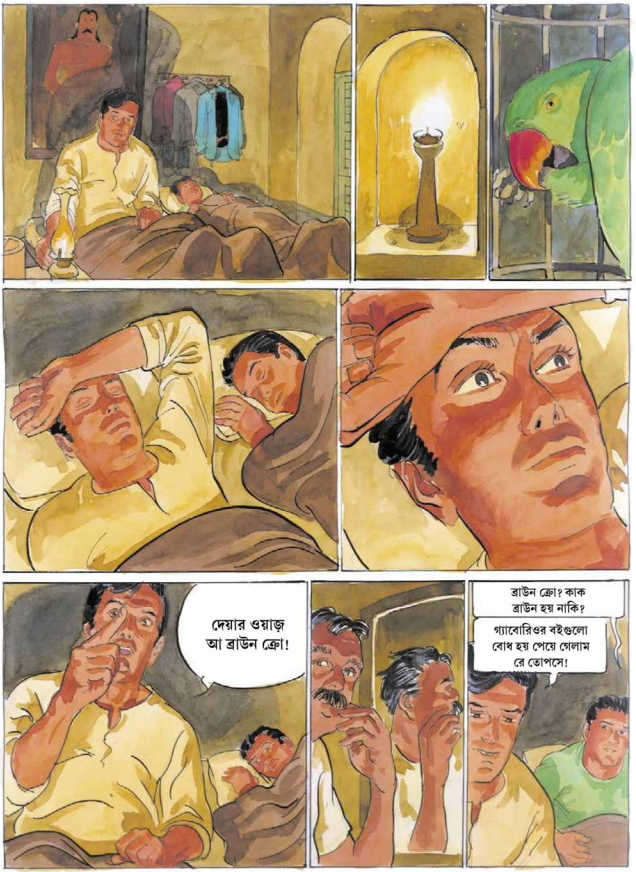
দেয়ার ওয়াজ় আ ব্রাউন ক্রো!
ব্রাউন ক্রো? কাক ব্রাউন হয় নাকি?
গ্যাবোরিওর বইগুলো বোধ হয় পেয়ে গেলাম রে তোপসে!

সে কী! সমাধান হয়ে গেল?
খুব সহজ। এদেশে এসে সাহেবরা যখন গোড়ার দিকে হিন্দি শিখত, তখন উচ্চারণের সুবিধের জন্য কতকগুলো কায়দা বের করেছিল।
দেয়ার ওয়াজ় আ ব্রাউন ক্রো-এটা আসলে সাহেব তার বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করতে বলছে, দরওয়াজা বন্দ্ করো।
দেয়ার ওয়াজ় এ ব্রাউন ক্রো।
এই ত্রিনয়নকে তিন ভেবে বার-বার হোঁচট খাচ্ছিলাম।
সেকী! ওটা তিন নয় বুঝি?
উহু। তিন নয়। ত্রিনয়নের ত্রি-টা হল তিন। আর নয়ন হল নাইন। দুইয়ে মিলে থ্রি-নাইন। ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন মানে হল থ্রি-নাইন ও থ্রি-নাইন।
ও মানে জ়িরো... একটু জ়িরো?
এইট টু জ়িরো...
পুরো সংখ্যা হল থ্রি নাইন জ়িরো থ্রি নাইন এইট টু জ়িরো। এবার ঘুমো।

কিছু বলবেন?
ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের আর কিছু দরকার লাগবে কিনা।
না-না কিচ্ছু না। সব ঠিক আছে।
কী ভাবছ?
কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রায় কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন। আর রাজেনবাবু চলে যাওয়ার প্রায় পঁচিশ মিনিট পর বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই।
তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যায়নি।
তিনটে লোকই আছে তো? নাকি একজনই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে?
তিনজনই এক লোক?
দেখি কাল সকালে কী দাঁড়ায়।

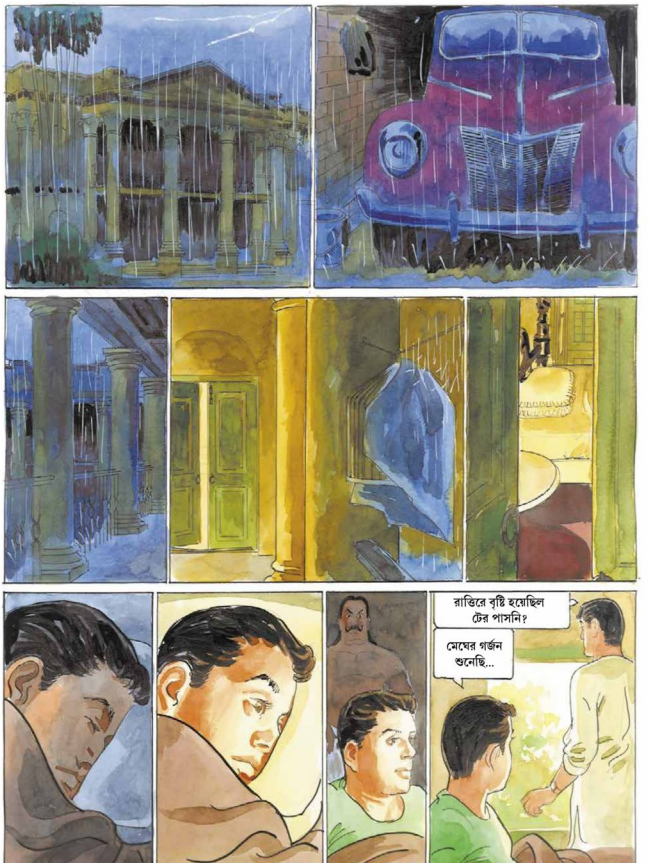
রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল টের পাসনি?
মেঘের গর্জন শুনেছি...

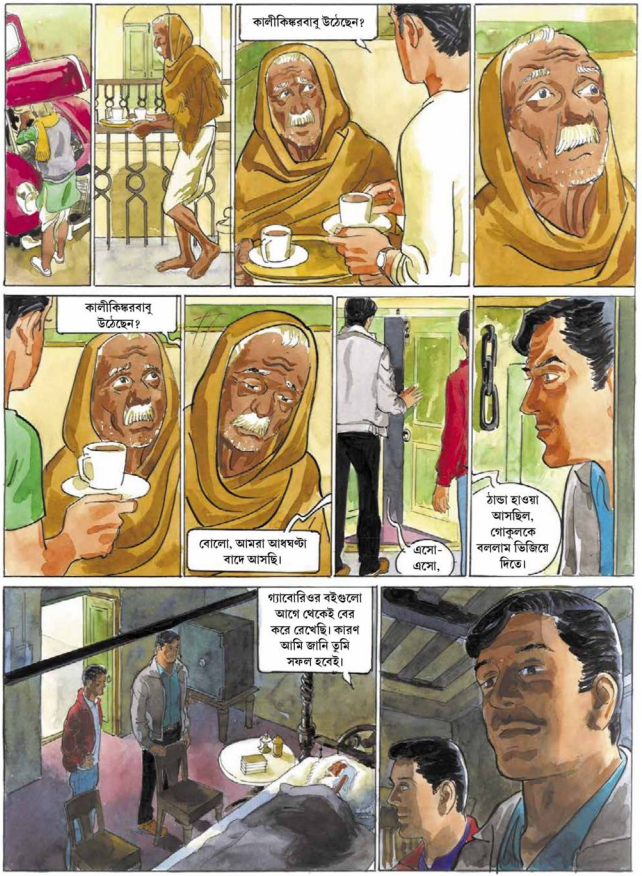
কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন?
কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন?
বোলো, আমরা আধঘণ্টা বাদে আসছি।
এসো- এসো,
ঠান্ডা হাওয়া আসছিল, গোকুলকে বললাম ভিজিয়ে দিতে।
গ্যাবোরিওর বইগুলো আগে থেকেই বের করে রেখেছি। কারণ আমি জানি তুমি সফল হবেই।

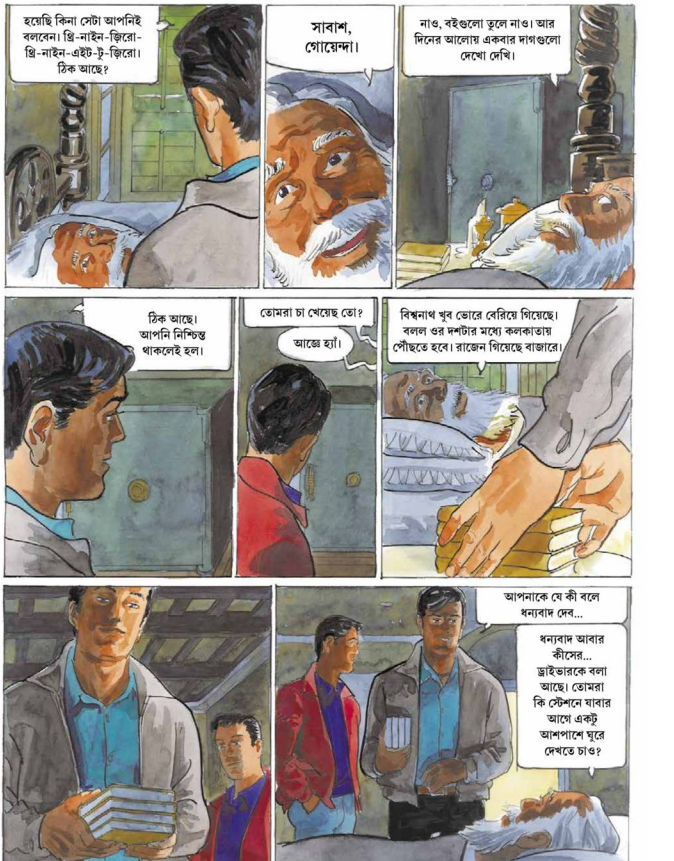
হয়েছি কিনা সেটা আপনিই বলবেন। থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো। ঠিক আছে?
সাবাশ, গোয়েন্দা।
নাও, বইগুলো তুলে নাও। আর দিনের আলোয় একবার দাগগুলো দেখো দেখি।
ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকলেই হল।
তোমরা চা খেয়েছ তো?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
বিশ্বনাথ খুব ভোরে বেরিয়ে গিয়েছে। বলল ওর দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে হবে। রাজেন গিয়েছে বাজারে।
আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব...
ধন্যবাদ আবার কীসের... ড্রাইভারকে বলা আছে। তোমরা কি স্টেশনে যাবার আগে একটু আশপাশে ঘুরে দেখতে চাও?

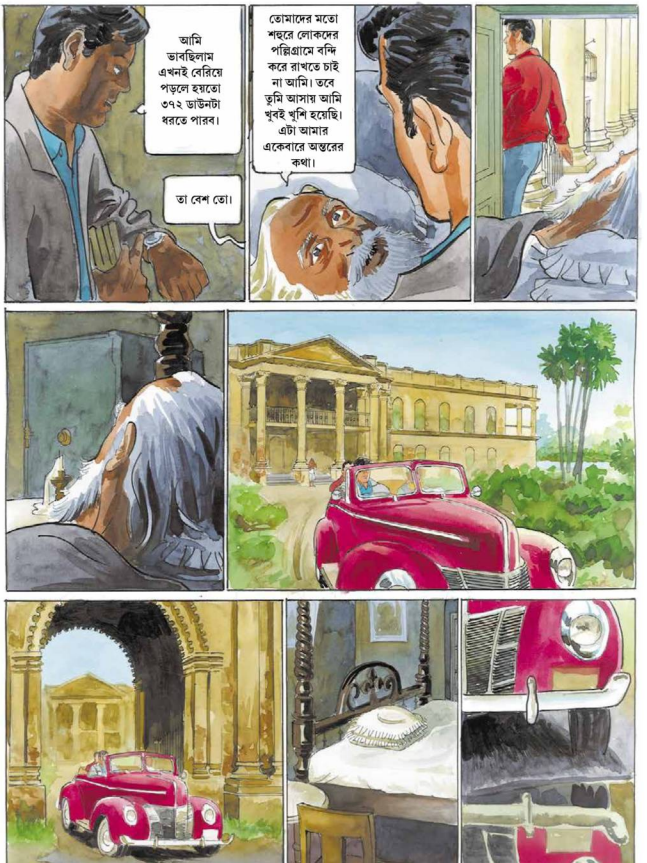
আমি ভাবছিলাম এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়তো ৩৭২ ডাউনটা ধরতে পারব।
তা বেশ তো।
তোমাদের মতো শহুরে লোকদের পল্লিগ্রামে বন্দি করে রাখতে চাই না আমি। তবে তুমি আসায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। এটা আমার একেবারে অন্তরের কথা।

স্টেশনে বা কলকাতা যাওয়ার কি এ ছাড়া আর অন্য কোনও রাস্তা আছে?
আজ্ঞে না বাবু।

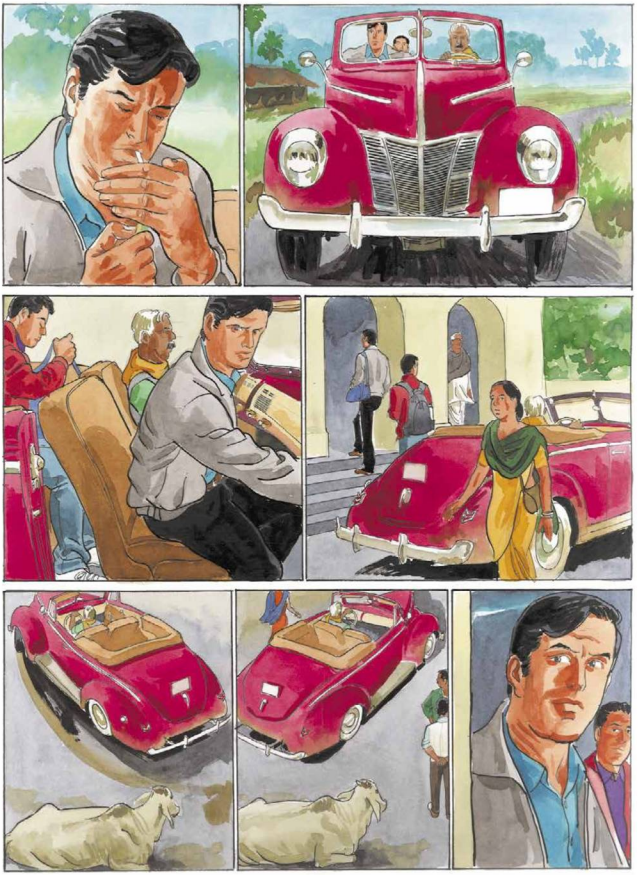

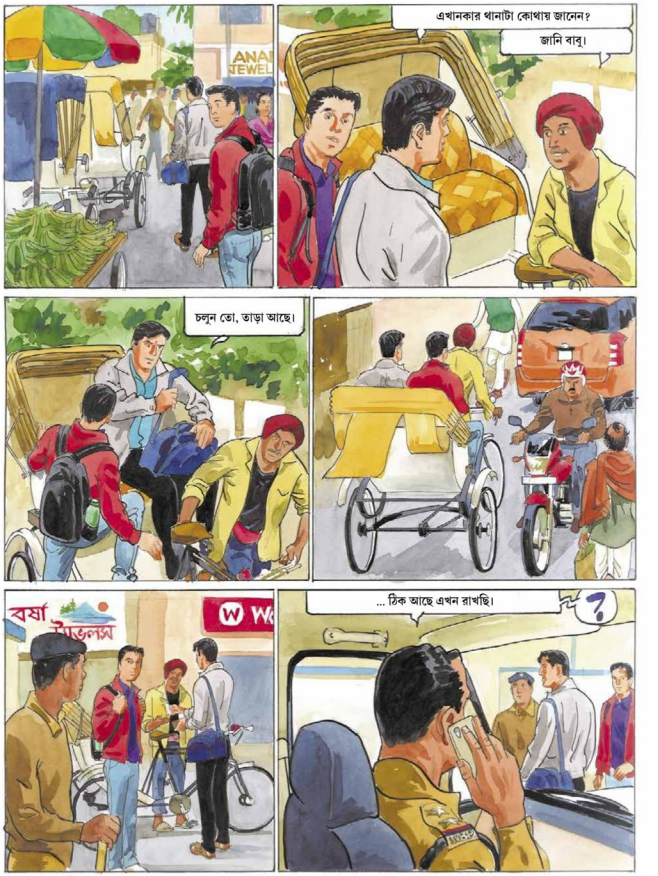
এখানকার থানাটা কোথায় জানেন?
জানি বাবু।
চলুন তো, তাড়া আছে।
... ঠিক আছে এখন রাখছি।
?

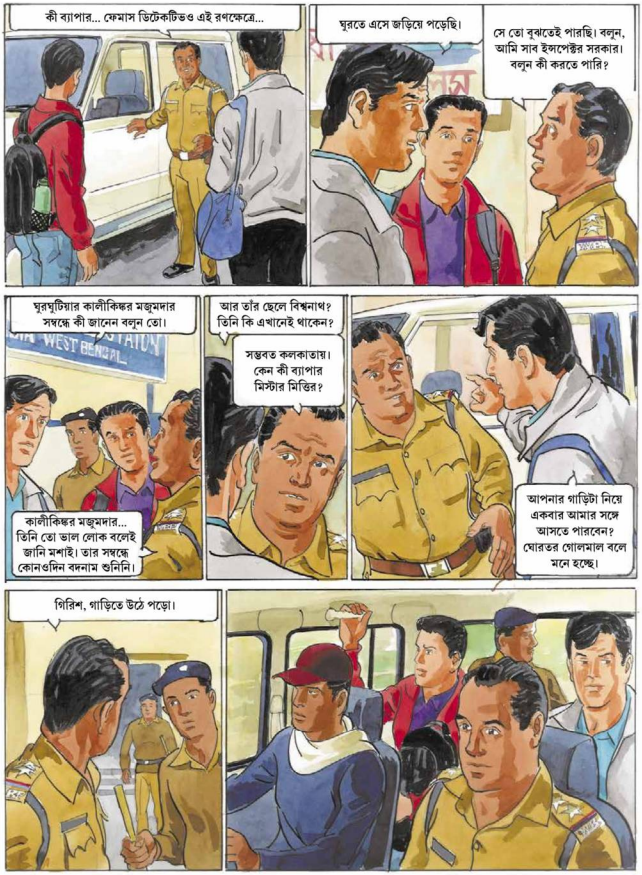
কী ব্যাপার... ফেমাস ডিটেকটিভও এই রণক্ষেত্রে...
ঘুরতে এসে জড়িয়ে পড়েছি।
সে তো বুঝতেই পারছি। বলুন, আমি সাব ইন্সপেক্টর সরকার। বলুন কী করতে পারি?
ঘুরঘুটিয়ার কালীকিঙ্কর মজুমদার সম্বন্ধে কী জানেন বলুন তো।
কালীকিঙ্কর মজুমদার... তিনি তো ভাল লোক বলেই জানি মশাই। তার সম্বন্ধে কোনওদিন বদনাম শুনিনি।
আর তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ? তিনি কি এখানেই থাকেন?
সম্ভবত কলকাতায়। কেন কী ব্যাপার মিস্টার মিত্তির?
আপনার গাড়িটা নিয়ে একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবেন? ঘোরতর গোলমাল বলে মনে হচ্ছে।
গিরিশ, গাড়িতে উঠে পড়ো।

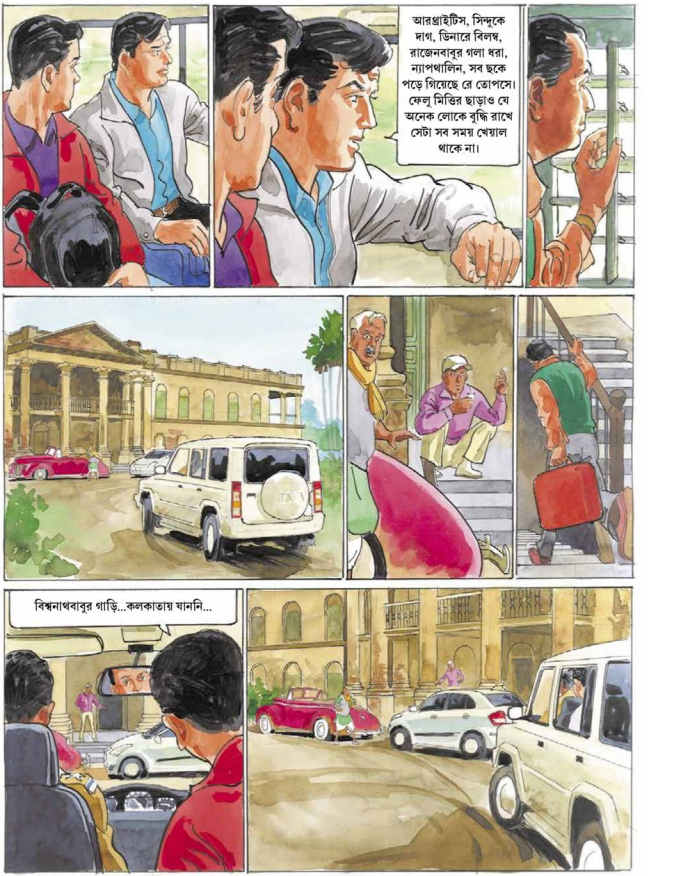
আরগ্রাইটিস, সিন্দুকে দাগ, ডিনারে বিলম্ব, রাজেনবাবুর গলা ধরা, ন্যাপথালিন, সব ছকে পড়ে গিয়েছে রে তোপসে। ফেলু মিস্ত্রির ছাড়াও যে অনেক লোকে বুদ্ধি রাখে সেটা সব সময় খেয়াল থাকে না।
বিশ্বনাথবাবুর গাড়ি...কলকাতায় যাননি...

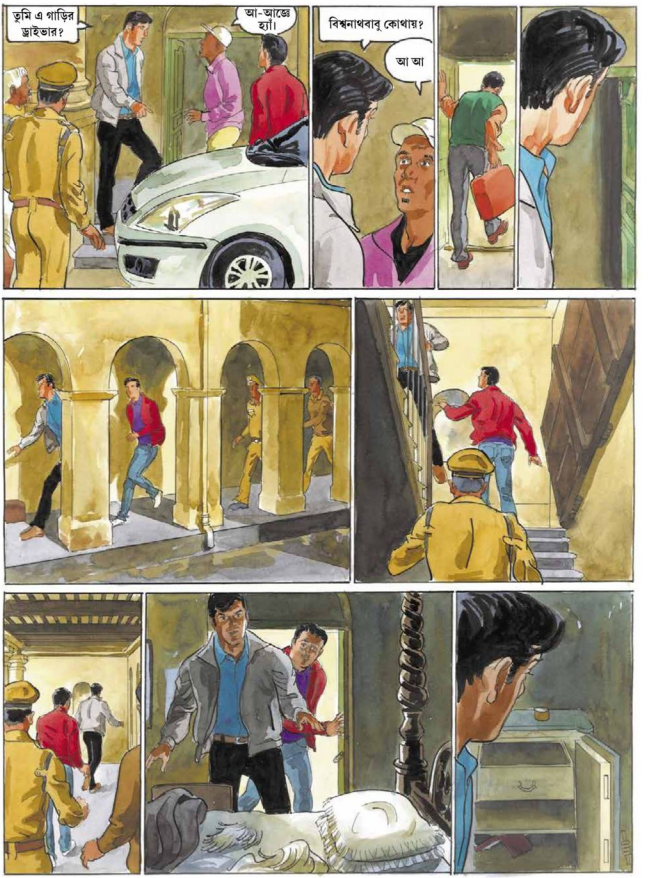
তুমি এ গাড়ির ড্রাইভার?
আ-আজ্ঞে হ্যাঁ।
বিশ্বনাথবাবু কোথায়?
আ আ

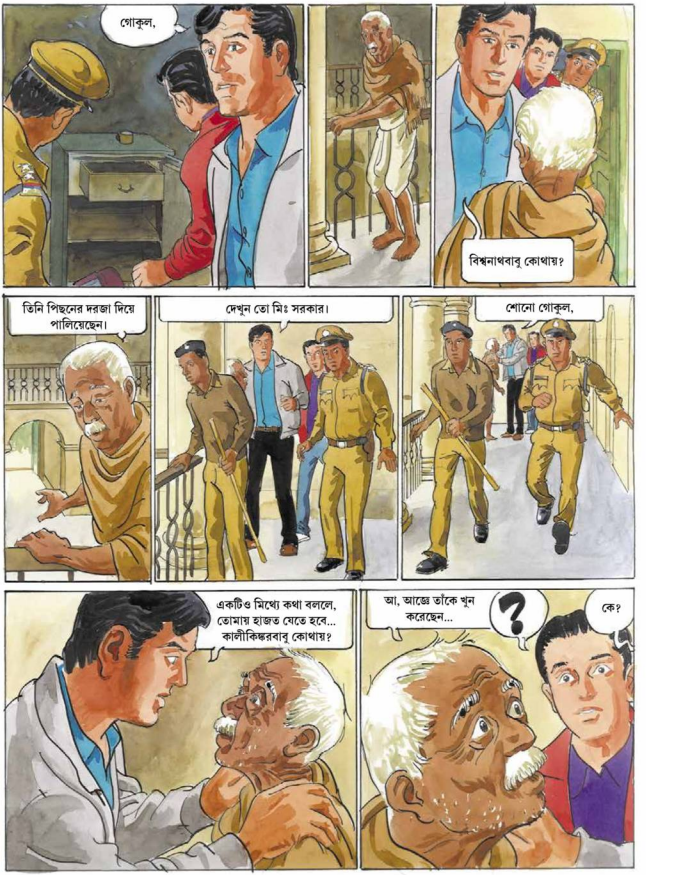
গোকুল,
বিশ্বনাথবাবু কোথায়?
তিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন।
দেখুন তো মিঃ সরকার।
শোনো গোকুল,
একটিও মিথ্যে কথা বললে, তোমায় হাজত যেতে হবে... কালীকিঙ্করবাবু কোথায়?
আ, আজ্ঞে তাঁকে খুন করেছেন...
?
কে?

ছোটবাবু।
কবে?
যেদিন ছোটবাবু এলেন সেদিনই রাত্তিরে বাপ-বেটায় কথা কাটাকাটি হল। ছোটবাবু সিন্দুকের নম্বর চাইলেন। কর্তাবাবু বললেন, আমার টিয়া জানে। তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো, আমি বলব না।
পুকুরের দিকে নিয়ে আয় গাড়িটা
তার কিছুক্ষণ পরে...ছোটবাবু আর তেনার ডেরাইভারবাবু দু'জনে মিলে...
...দু'জনে মিলে কর্তাবাবুর লাশ নিয়ে গিয়ে ফেলল ওই দিঘির জলে গলায় পাথর বেঁধে। আমার মুখ বন্ধ করেছেন প্রাণের ভয় দেখিয়ে।
বুঝেছি, আর রাজেনবাবু বলে তো কোনও লোকই নেই তাই না?
ছিলেন, তবে তিনি মারা গিয়েছেন আজ দু'বছর হয়ে গেল।

পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার মজুমদার!
অ্যাঁ হ!
আঁ আঁ,

গয়নাগাটি, টাকা নিয়ে কুড়ি-পঁচিশ লাখ টাকার ব্যাপার...এত টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন কোথায়?
ব্যবসা করলেও জুয়া, বদ অভ্যেসের ফলে ইদানীং ধারদেনায় অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।
তাই দরকার পারিবারিক সম্পত্তি আর বাবার টাকা। বাবা দিতে রাজি না হওয়ায় বাবাকে খুন।
কী? মেনে নিচ্ছেন তো?
গোকুল এসবের সাক্ষী...বলো গোকুল।
কর্তাবাবু ছোটবাবুকে অনেক...
গোকুল
থামুন...ওকে বলতে দিন।
কর্তাবাবু ছোটবাবুকে বললেন, তোমার জুয়া আর বদ অভ্যাসের জন্য টাকার জোগান দিতে পারব না আমি...তারপরেই খুনটা করে...
এবং গলায় পাথর বেঁধে লাশ ফেলা হয়েছে দিঘিতে।
কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন...

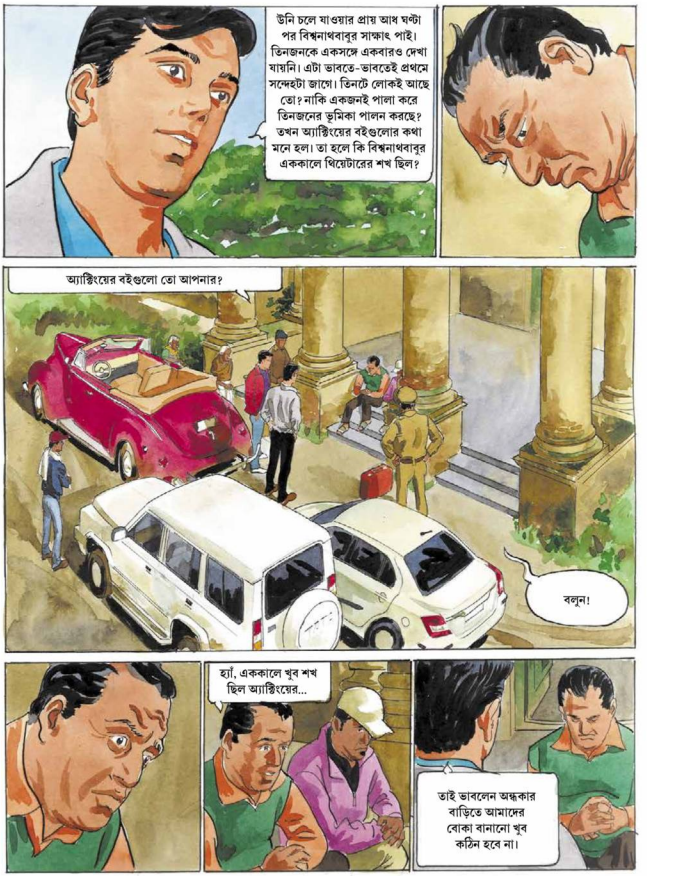
উনি চলে যাওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পর বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই। তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যায়নি। এটা ভাবতে-ভাবতেই প্রথমে সন্দেহটা জাগে। তিনটে লোকই আছে তো? নাকি একজনই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে? তখন অ্যাক্টিংয়ের বইগুলোর কথা মনে হল। তা হলে কি বিশ্বনাথবাবুর এককালে থিয়েটারের শখ ছিল?
অ্যাক্টিংয়ের বইগুলো তো আপনার?
বলুন!
হ্যাঁ, এককালে খুব শখ ছিল অ্যাক্টিংয়ের...
তাই ভাবলেন অন্ধকার বাড়িতে আমাদের বোকা বানানো খুব কঠিন হবে না।

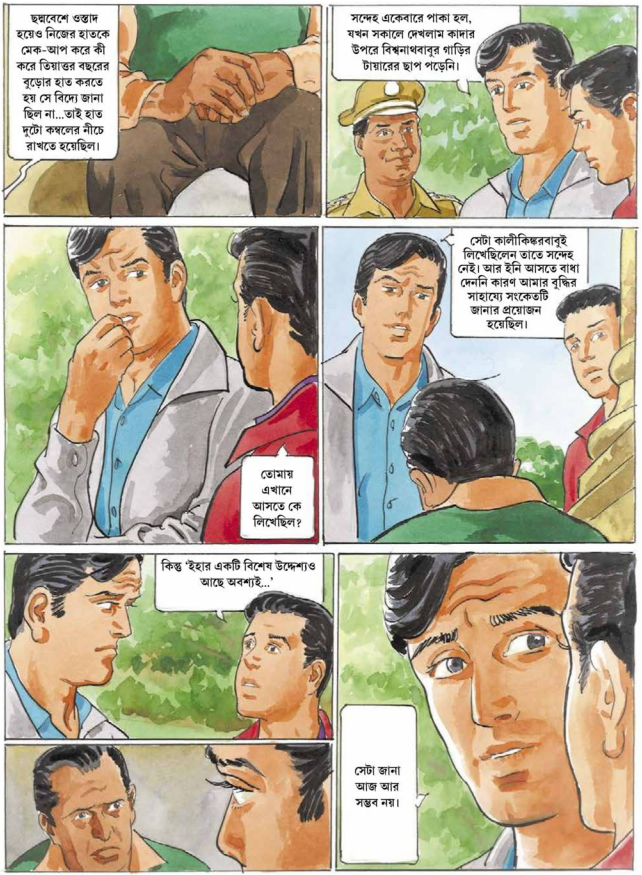
ছদ্মবেশে ওস্তাদ হয়েও নিজের হাতকে মেক-আপ করে কী করে তিয়াত্তর বছরের বুড়োর হাত করতে হয় সে বিদ্যে জানা ছিল না...তাই হাত দুটো কম্বলের নীচে রাখতে হয়েছিল।
সন্দেহ একেবারে পাকা হল, যখন সকালে দেখলাম কাদার উপরে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ির টায়ারের ছাপ পড়েনি।
তোমায় এখানে আসতে কে লিখেছিল?
সেটা কালীকিঙ্করবাবুই লিখেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আর ইনি আসতে বাধা দেননি কারণ আমার বুদ্ধির সাহায্যে সংকেতটি জানার প্রয়োজন হয়েছিল।
কিন্তু 'ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে অবশ্যই...'
সেটা জানা আজ আর সম্ভব নয়।

খুনির হাত থেকে উপহার নেওয়ার বাসনা আমার নেই। তোপসে বুকশেলফের ফাঁকগুলো ভরিয়ে দিয়ে আয় তো।
ত্রিনয়ন,
?
ও ত্রিনয়ন
একটু জিরো...
ত্রিনয়ন...

সমাপ্ত

শব্দসন্ধান

পাশাপাশি

১। কথা বলার ক্ষমতাযুক্ত। ২। সমাপন, প্রতিকার। মীমাংসা। ৫। নিচু হওয়া। ৬। ভৃগুবংশজাত। পরশুরাম। ৮। দুর্ভিক্ষ।
১১। নৌকা। ১২। বিষ। ১৪। সপ্তাহে যা সাতটি। ১৫। কষ্টে পরার অলঙ্কার। ১৬। শিঙাড়ার ভিতর থাকে, জায়গার নামেও থাকে।
১৮। খারিজ। বাতিল। ১৯। মুখ। ২০। মন। প্রবণতা।
২১। 'রক্তকরবী'র নন্দিনী যে রঙের শাড়ি পরে। ২২। ভঙ্গ। অনুকরণ।
২৪। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। ২৬। কলার ভাল নাম। ২৮। নদীর তীর বা কূল। পাশাখেলার দান। ৩০। মায়ের সহোদর। ৩১। প্রশংসার উলটো। ৩২। ওজনের একক। ৩৩। লম্বী। ৩৫। মায়া দিয়ে ঘেরা।
৩৭। প্রাচীন যজ্ঞ, যাতে মানুষ বলি দেওয়া হত।
৩৯। চোখে লাগানোর প্রসাধনী। ৪০। জল। ৪৩। পার। উতরে দেওয়া। ৪৫। বৈষয়িক কাজের দলিল। ৪৬। গোরুকে দেওয়ার খাবার।
৪৭। ঝঞ্ঝার। শব্দ করা। ৪৯। ছাদে যার মধ্যে গাছ হয়। ৫১। পুরুষ।
৫২। ঝাড়ুদার পাখি। ৫৪। সজ্জা। ৫৫। প্রার্থিত। ৫৬। গুরুমন্ত্র মনে-মনে ধ্যান করা। ৫৭। কৌশল। অঙ্কুর। ৫৯। হাতি। ৬১। তপস্যা। সাধনা। ৬৩। সেতু। ৬৫। নদী, খাল ইত্যাদির তীর। কূল-কিনারা।
৬৬। ছুঁচ-সুতো দিয়ে বুনে জামাকাপড়ের সংস্কার। ৬৭। দাঁতের উপর দাঁত উঠলে যা বলে। ৬৯। পরিচ্ছদ। পোশাক। আবার 'আচ্ছা' অর্থেও প্রযুক্ত। ৭১। বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলজ প্রাণী। ৭৩। সমাদর।
৭৫। অফিসের কাগজ-কলম ইত্যাদির পরিবেশক। বইখাতা যে বাঁধাই করে। ৭৬। পদ্মফুল। ৭৭। গভীরতা। ৭৮। কাচের বয়াম, যার মধ্যে লজেন্স, বিস্কুট থাকে। ৭৯। ব্যাধ। ৮১। যুদ্ধ। ৮৩। নক্ষত্র বিশেষ। ৮৫। ব্রহ্মা। ৮৬। রসহীন। ৮৭। উত্তর ঠিক লিখলেও এটি ভুল বলেনে নম্বর কাটা যায়। ৮৮। দু'বার হলেই তারা জ্বলে যেভাবে।
৮৯। বাংলা সাহিত্যে নিশ্চিন্দিপুরের যে বালককে সবাই চেনে।
৯১। যে ছেলের সম্পর্কে মামা বা মামী। ৯৩। বিদ্যুৎ। চঞ্চলা।
৯৪। নাকের বদলে ___। ৯৫। নতুন। ৯৭। আয়ুর্বেদ মতে বায়ু, পিত্ত আর এটিই মানবদেহকে চালিত করে। ৯৯। লবণ। ১০০। আলো।
১০১। দেবতাদের কাটা যায়। ১০২। ব্ল্যাকবোর্ডে যা লিখতে হয়।
১০৩। সূর্য। ১০৫। রথের ____। ১০৬। ভগ্নাংশের উপরের অংশ।
১০৭। দৃষ্টিশক্তিহীন। ১০৮। ক্রোড়। ১০৯। দাম। ১১০। ঘ্রাণেন্দ্রিয়।
১১৩। সকল। ১১৪। নদীর পার। কূল। ১১৬। নামানো। ১১৮। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করেন শের __। ১২০। পাখি সব করে __।
১২২। চারদিকে বলয়যুক্ত সৌরজগতের একটি গ্রহ। ১২৪। সপ্তম।
১২৫। ডিজিটাল ক্যামেরার আগের যুগে ক্যামেরায় এটি ভরেই ফোটো তুলতে হত। ১২৬। নিষিদ্ধ সমুদ্র। দ্বীপান্তর দণ্ড।
১২৮। কৃষ্ঠিয়া জেলার বিখ্যাত বটগাছ। ১৩০। হরতা। ১৩৩। নবম সংখ্যক। ১৩৪। দু'বার হলেই পরিষ্কার বোঝানোর বিশেষণ।
১৩৫। ভাত। ১৩৬। বগড়া। ১৩৮। ___বাউল বাজায় রে একতারা... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৪০। জলযুক্ত। ভেজা। ১৪২। নতুন।
১৪৪। শুদ্ধভাষায় 'নিজে'। ১৪৫। মুখ যেখানে লেগে থাকে।
১৪৬। রত্ন। ১৪৮। স্বাদ। ইলেকট্রিক পরিবাহিত হয় এর মাধ্যমে।
১৫০। পরিমিত। ১৫২। দু'বার হলে একটি রসের মিষ্টি।
১৫৩। বন্যা। ১৫৪। কৃতকার্য। ১৫৫। চোখের কোণ দিয়ে দেখা।
১৫৬। শোকের আগুন। ১৫৭। '___আমার জন্মগত অধিকার'...বাল গঙ্গাধর তিলক। **১৫৮**। ডানের উলটো। **১৫৯**। বনের লতা।
১৬০। যাকে নড়ানো যায় না।

উপর-নীচ

১। কৃষ্ণনগরের এই মিষ্টিটি জগদ্বিখ্যাত। ২। যিনি সম্পাদনা করেন। ৩। সম্মান। মর্যাদা। ৪। কেনার সময় হাতে যে টাকা দিতে হয়। ৫। পুরাণের এক দুঃখী রাজা। ৬। দায়িত্ব। ৭। বনের শুদ্ধ নাম। ৮। ভারত ও নেপালের ভিতর বয়ে চলা একটি নদী। ৯। হরণকারী। ১০। আক্রোশ। ১১। গাছে যা দিলে ফলন ভাল হয়। ১৩। কাঠের পা, যার সাহায্যে অনেক দূরত্ব দ্রুত পেরনো যায়। ১৪। বর্তিকা। ১৭। আরব্যোরজনীর পাখি।
১৯। বলশালী। ২০। কুমির। ২১। বেতের বোনা ঝুড়ি।
২৩। কুকুরের লম্বা কান এমন করে। ২৫। ভারতের মরুভূমি।
২৭। আগে 'ক' যোগ করলে সরস্বতী পুজোয় এই মিষ্টি খাওয়া আবশ্যিক। ২৯। খেয়াল, হুঁশ। ৩০। কৃষ্ণের অন্য নাম। ৩১। সৃষ্টি। ৩৪। জমিয়ে দেওয়া। ৩৬। কুঞ্জবন। বাগান।
৩৮। স্বভাব। মর্জি। ৩৯। অতি রমণীয়। সাধারণত বাড়ির বিশেষণ। ৪২। দুধের উপর ভাসে। ৪৪। ধুলো। ৪৮। দৃষ্টি।
৫০। সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।
৫১। নতুন এসেছে যে। ৫৩। ক'টি অর্থে। ৫৫। সাপ।
৫৮। উৎকণ্ঠিত। ৬০। নিয়ম। আচার। ৬২। প্রতিপত্তি।
৬৫। দক্ষিণা। পরিশ্রমের মূল্য। ৬৬। কাগজের বানডিল।
৬৮। যার অন্য নাম জীবন। ৭০। পথের দাবি, লালু, শ্রীকান্ত যাঁর লেখা। ৭২। নীলনদ, পিরামিডের দেশ। ৭৪। জিভ। আস্বাদনের ইন্দ্রিয়। ৭৬। বিন্দু। ৮০। কাপড়। ৮২। মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ৮৪। বট গাছের ফল। ৮৫। আমার খেলা যখন ছিল তোমার___... ৮৬। পুরীর অন্য নাম। ৮৭। হনুমান।
৮৯। যার সঙ্গে 'বাদ' যোগ করলে এক ভাষার লেখাকে অন্য ভাষায় রূপান্তর বোঝায়। ৯০। পুনরায় বা আবার উৎপন্ন বা জাত। ৯১। জাদুবিদ্যাকে বলা হয় এর খেল। ভোজ রাজার স্ত্রী, এক বিখ্যাত রানি। ৯২। দু'বার হলে রাগে মানুষ যেমন আওয়াজ করে। ৯৬। শ্লোষ্ঠ। আশীর্বাদ। ১০১। আহুতি। উসকে দেওয়া। ১০৪। ছাড়া। ব্যতীত। ১০৮। হত্যা করা।
১০৯। তাসের দেশের পণ্ডিত। ১১১। উচ্ছেজাতীয় সবজি।
১১২। সবচেয়ে বড় ঘাস। ১১৩। পেটে খেলে পিঠে___।
১১৫। বিজ্ঞানের একটি শাখা। ১১৭। উত্তরবঙ্গে পাহাড়ঘেরা এই জায়গাটি লেকের জন্য বিখ্যাত। ১১৮। গরিব মানুষের যা হলেই হয়ে যায়। শাক আর ভাত। ১১৯। বাতাস।
১২১। শক্তিধর। ১২৩। পেনের মুখ। ১২৭। ধর___।
গ্রেফতার। ১২৯। অজয়, দামোদর, সিন্ধু ইত্যাদিকে যা বলা হয়। ১৩১। পাহাড়ে বর্ষায় প্রায়ই যা নামে। ১৩২। গ্রীষ্মকালে জল ছাড়া আর যা বেশি করে খেতে হয়। ১৩৪। উজ্জ্বল বস্তুতে আলো পড়লে যা করে। ১৩৫। ছাগল। ১৩৭। অক্ষর।
১৩৯। লতিয়ে ওঠে যে গাছ। ১৪১। খরচের উলটো।
১৪৩। কথা, বাক্য, প্রবাদ। ১৪৪। আপনার। ১৪৫। সম্পদ।
বিত্ত। ১৪৭। ডাক। আহ্বান। ১৪৯। তাশ্বাস।
মজা। ১৫১। অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ___...।
১৫৩। শিকারি পাখি। ১৫৪। তালের প্রথম মাত্রা। ১৫৫। শেষে 'ক' যোগ করলে সামনের দিকের কুঁচো চুল।

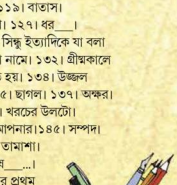

১				২	৩		৪		৫			৬		৭		৮	৯		১০
			১১				১২	১৩			১৪					১৫			
১৬	১৭		১৮			১৯				২০			২১			২২		২৩	
২৪		২৫		২৬	২৭			২৮	২৯			৩০			৩১			৩২	
		৩৩	৩৪		৩৫		৩৬		৩৭		৩৮			৩৯			৪০	৪১	
	৪২		৪৩	৪৪		৪৫					৪৬			৪৭		৪৮		৪৯	৫০
৫১							৫২	৫৩		৫৪			৫৫			৫৬			
		৫৭	৫৮		৫৯	৬০		৬১	৬২			৬৩	৬৪		৬৫			৬৬	
৬৭	৬৮		৬৯	৭০		৭১	৭২		৭৩		৭৪		৭৫				৭৬		
৭৭			৭৮				৭৯	৮০			৮১	৮২			৮৩	৮৪			
		৮৫				৮৬				৮৭					৮৮			৮৯	৯০
৯১	৯২			৯৩				৯৪				৯৫	৯৬		৯৭	৯৮		৯৯	
১০০			১০১			১০২				১০৩	১০৪		১০৫			১০৬			
		১০৭			১০৮			১০৯			১১০	১১১			১১২			১১৩	
১১৪	১১৫		১১৬	১১৭			১১৮			১১৯		১২০	১২১		১২২	১২৩			
	১২৪			১২৫			১২৬		১২৭			১২৮		১২৯		১৩০	১৩১		১৩২
১৩৩			১৩৪			১৩৫			১৩৬		১৩৭		১৩৮		১৩৯		১৪০	১৪১	
	১৪২	১৪৩			১৪৪			১৪৫			১৪৬	১৪৭			১৪৮	১৪৯		১৫০	
১৫১		১৫২					১৫৩			১৫৪				১৫৫					
১৫৬					১৫৭				১৫৮			১৫৯					১৬০		

সমাধান ২৬২ পাতায়

সুদেষ্ণা ঘোষ

সম্পূর্ণ উপন্যাস

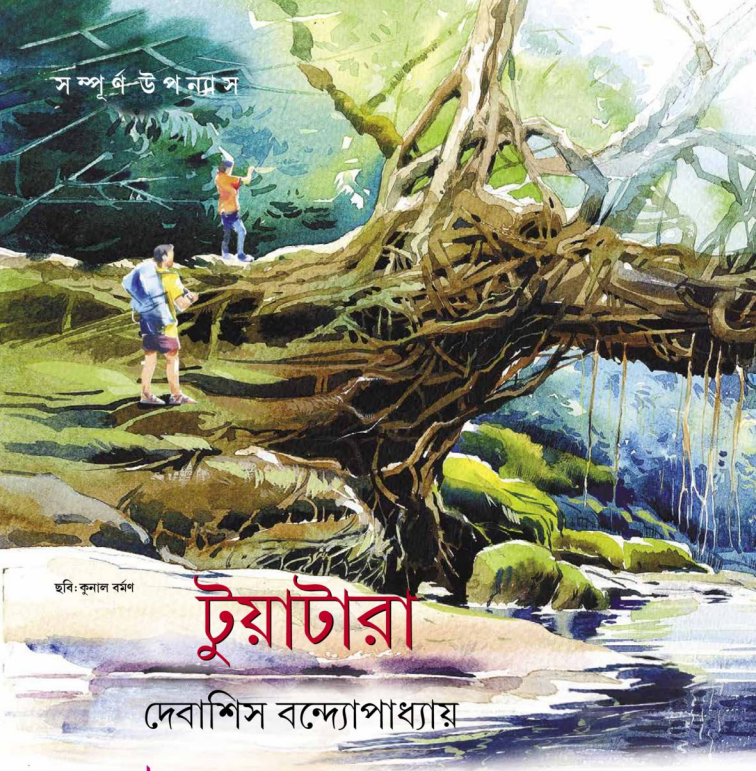

ছবি: কুনাল বর্মণ

টুয়াটারা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

থেংসু ঘাড় তুলে দেখল এমন অসময়ে কয়েকটা বাদুড় ডানায় শব্দ তুলে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল দুই পাহাড়ের মাঝে খাদের অতলে। থেংসু কিছুক্ষণ পথের পাশে, কিছুক্ষণ খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল সেদিকে। দূরের পাহাড়ের চূড়ার গায়ে কয়েকটা রহস্যময় মেঘ জমে আড়াল করে রেখেছে ওপারের দৃশ্যগুলো।

ওদিকেই কি কোথাও আছে আত্মাদের দেশ? যেখানে তার বন্ধু বরষি হারিয়ে গিয়েছে? খেংসু ভাবতে-ভাবতে কোমরে জড়ানো হাড়ের কৌটোটা হাতে নিতে চাইল। এই যাহ্! কোথায় হারাল জিনিসটা? খেংসু এদিক-ওদিক ঝোপের মধ্যে খুঁজতে-খুঁজতে এইমাত্র পিছনে ফেলে আসা পথ ধরে এগোতে লাগল। প্রোফেসরের সঙ্গে মশগুল হয়ে বকবক করতে-করতে অনেকটা পথ এদিক-ওদিক চলা হয়েছে। আর কি পাওয়া যাবে হাড়ের কৌটোটা? হায়! অনেক কষ্টে বরষির বাড়ির পিছনের বাগানে ওটাকে খুঁজে পেয়েছিল খেংসু। ওই হাড়ের কৌটোর মধ্যেই যে ছিল অমৃত, আত্মাদের দেশ খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি!

আর-একটু। প্রোফেসর প্রফুল্ল বরা একটা বিপজ্জনক লাফ দিয়ে ডান হাতে ধরে ফেললেন পাথরের খাঁজটা। এর পর অন্য হাতে ভর দিয়ে শরীরটা ছুড়ে দিলেন উপর দিকে। পিছনে গভীর খাদ। মৃত্যুর হাতছানি। কিন্তু সামনের সোনালি অর্কিডটা যে ডাকছে প্রোফেসরকে, তাঁর হাত ধরে নতুন পরিচয় পাবে বলে।

"পেয়েছি!" পাহাড়ের গায়ে সমতল পাথরটার উপর উঠতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন প্রোফেসর বরা। এসব সামান্য কঠিন পর্বত আরোহণের তোয়াক্কা করেন না তিনি। অচেনা, অজানা উদ্ভিদের খোঁজে পাহাড়, পর্বতে ঘুরে প্রাণপাত করাতেই তাঁর আনন্দ। আর এই গারো পাহাড় যেন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার! বলপকরমের জঙ্গলে রয়েছে কত রকমের আশ্চর্য ভেষজ, বাঘমারার জঙ্গলে আছে পতঙ্গভুক গাছ, পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে মেঘ আর কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে আছে

চমৎকার সব অর্কিড। অথচ ওই বিদেশি গুহাঅভিযাত্রী দু'জনের আজগুবি চিন্তাভাবনা দেখো! গারো পাহাড়ে এসেছে পৃথিবীতে লুপ্ত বা কখনও না-দেখা, শুধু উপকথার গল্পে শোনা বিটকেল জন্তুজানোয়ার আবিষ্কার করতে। এমন মনভোলানো ফুলের খবর ওরা জানে? প্রোফেসর প্রফুল্ল বরা প্রায় স্নেহে অর্কিডটার গায়ে হাত রাখলেন। মনে-মনে বললেন, 'ডেল্ফোবিউম শ্রেণিরই কোনও নিকট আত্মীয় হবে।' গারো ওকা খেংস্ঠ ঠিকই বলেছিল, সুন্দরীদেবী চাপিগাল ঝরনার রূপ ধারণ করে আছেন এই দুর্গম পাহাড়ে। তাঁর গায়ে সোনালি ফুলের অলংকার। সত্যিই অর্কিডগুলো একেবারে খাঁটি সোনা রং পেয়েছে। প্রোফেসর বরা ক্যামেরা বের করে ফোটো তুললেন। একটা ফুল ছিঁড়ে রেখে দিলেন নিজের সংগ্রহে। তারপর চোখে-মুখে ফুলের মুগ্ধতা নিয়ে ফিরে তাকালেন অন্য পাশে সুন্দর ঝরনাটির দিকে। সেটা গারো পাহাড়ের অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ এই আলোর পৃথিবীতে মুক্তি খুঁজে পাওয়ার আনন্দে সহস্রধারায় নীচে ঝরে পড়ছে। যাওয়ার পথে নিজে-নিজেই ছল্লোড় করছে চুপচাপ শুয়ে থাকা ভিজে পাথরগুলোর সঙ্গে। এর পর পাশ কাটিয়ে আরও নীচে ঝরে পড়ার সময় ধবধবে সাদা ফেনা মাখিয়ে দিচ্ছে তাদের গায়ে। প্রোফেসর বরা একবার নীচের খাদের দিকে তাকালেন। সব বিপদের আশঙ্কা ছাপিয়ে বিকেলের আলোয় এখন দু'চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছেন ঝরনার সঙ্কেত জলরাশিকেই। এবার চোখে তুলে তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন ঝরনার উপর দিকে।

"ওটা কী?" হঠাৎ তাঁর চোখ বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল ঝরনার উৎসমুখে বড় পাথরটার উপরে। জেলে ডোঙা খেয়েও জিনিসটা ওখানেই আটকে আছে আপাতত। এমন আশ্চর্য এই পৃথিবীতেই আছে? তিনি ভুল দেখছেন না তো! প্রোফেসর বরা বিস্ময়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই খাড়া পাহাড় আর জলস্রোত পার হয়ে ওটাকে হাতে পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি চটজলদি ক্যামেরা তাক করলেন সেদিকে। কিন্তু হায়! পরের বড় স্রোতটা যে ওটাকে পাথরের গা থেকে এক ঝটকায় টেনে নিয়ে নীচে ঝাঁপ দিল উল্লাসে। জলের স্রোত আর সাদা ফেনার মধ্যে কোথায় হারাল ওটা? প্রোফেসর প্রফুল্ল বরা হতাশায় কপালে হাত রাখলেন। নিজের দেখাটাকে তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। তবু এই আবিষ্কার তাঁর একারা। এই নির্জন পাহাড়ে, ঝরনার ধারে তিনি একলা দেখেছেন ওই অপার্থিব জিনিসটাকে। কল্পবিজ্ঞানের পাতা থেকে কীভাবে এই গারো পাহাড়ে এল ওটা? তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। এখানে পাহাড়ের মধ্যে কোনও অচেনা, অজানা উপত্যকায় লুকিয়ে আছে এই বিস্ময়? সন্ধান করে মানুষের সামনে নিয়ে আসবেন তিনি। সেটাই হবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। একটু আগে দেখা জিনিসটাকে নীচের নদীস্রোতে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না জেনেও প্রোফেসর বরা ঘোরের মধ্যে নামতে থাকলেন পাহাড় বেয়ে।

নদীখাত জুড়ে অন্ধকার নেমে আসছে। সিমসাং নদীর দুই তীরে ঘন জঙ্গল আর সবুজ পাহাড়। দুই অভিযাত্রী নীল ওয়াগনার আর মার্টিন মুনরো তাঁদের গাইড স্যামুয়েল সাংমার সঙ্গে সিজু গ্রামে ফিরছিলেন। নদীর স্রোত খাতের মাঝ বরাবর বয়ে চলেছে আপন গতিতে। জলের দু'পাশে চওড়া সাদা কাঁকরের চর। বালি-কাঁকরের উপর দিয়ে হাঁটছিলেন ওঁরা তিনজন। নীল আর মার্টিন আজকের অভিযানে বেশ তৃপ্ত। একটা অপরিসর গুহামুখে ঢুকতে-ঢুকতে এমন চমৎকার প্রাপ্তি হবে কে জানত! উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ে মঙ্গোলয়েড আদি মানুষরা সামান্য কিছু গুহাচিত্রের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন এমনটা শুনেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তেমনই একটি ছবি লুকিয়ে আছে ওই গুহার ভিতরে, তা আন্দাজ করতে পারেননি। ছবিটা আদিম মানুষদের না হলেও গারো উপজাতিদের কোনও পূর্বপুরুষের আঁকা। গুহাচিত্রটি সহজ, সরল। কাঁচা হাতে আঁকা কয়েকটা মানুষের মাথা আর তার কিছু দূরে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে আঁকা অনেক লম্বা-লম্বা আঁকিবুঁকি। খুব মন দিয়ে দেখলে মনে হবে যেন রোখাগুলো তিনটে চোখ আছে এমন কোনও কুমির বা গোসাপ জাতীয় সরীসৃপের শরীরের আকার নিয়েছে। কিন্তু নিজের মাথায় লাগানো মাইনিং টর্চের আলোয় একমনে দেখতে-দেখতে ঘোর লেগে গিয়েছিল নীলের। আরে এ তো কিছুটা হিন্দু পুরাণের প্রাণী মকরের মতো দেখতে! তফাত শুধু তিন নম্বর চোখটায়। সে হয়তো প্রাচীন কোনও গারো শিল্পীর হাতে একটু অন্য রূপ পেয়েছে। নীলের মনে হচ্ছিল, গুহার ভিতরে যেন আর-একটা গুহা রয়েছে আর সামনের পাথরটা যেন অতীতে কয়েকজন মানুষের ওই প্রাণীর সন্ধানে এসে সেই গোপন গুহার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখন সেইসব মৃত মানুষের আত্মা পাথর ঠেলে বদ্ধ গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

হাঁটতে-হাঁটতে নীল ভাবছিলেন, এই রকম গুহাচিত্রের মানে কী? সাধারণত শিকার করার দৃশ্য, যা চোখের সামনে ঘটেছে এমন কিছুই গুহাচিত্রে পাওয়া যায়। তা হলে কি সুদূর অতীতে একসঙ্গে কয়েকজনের কোথাও হারিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিল? তারা কি ওই অদ্ভুত প্রাণীটা শিকার করতে গুহায় ঢুকেছিল? এর সঙ্গে কি স্থানীয় গারো উপজাতিদের প্রাচীন ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক আছে?

সাদা, বালি, কাঁকর মাড়িয়ে যেতে-যেতে স্যামুয়েল বলল, "এখনও আমার বুকটা মাঝে-মাঝে ভয়ে কেঁপে উঠছে। স্থানীয় গারোরা বিশ্বাস করে, ওদিকে কোথাও প্রেতাত্মাদের গুহা আছে। বনজঙ্গলে ঢাকা সেই গুহামুখ এভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে কল্পনা করতে পারিনি। এই গুহায় ঢোকা তো দূরের কথা, ওই উপত্যকার ধারেকাছেও আসে না কেউ। আর আপনারা গুহার ভিতরে আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাইছিলেন। ভূত-প্রেতের কথা ছেড়েই দিলাম, চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, আরও কিছুটা সময় পার হয়ে গেলে কেমন সমস্যায় পড়তাম।"

নীল আর মার্টিন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থামিয়ে স্যামুয়েলের মুখের দিকে তাকালেন। স্যামুয়েল বলল, "আমরা রাস্তা থেকে এখনও অনেকটা দূরে আছি। অন্ধকার নামছে। জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র চিতা বা হাতির পালের সামনে পড়লে বিপদ হতে পারে। এখান থেকে রাস্তায় ফিরে গিয়ে গাড়ি ধরতে যা সময় লাগবে, তার চেয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে সেটা ধরে আমরা সিজু গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে যাব।"

স্যামুয়েলের উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে নীল আর মার্টিন তার দেখানো পথে হাঁটছিলেন। চারপাশে জঙ্গল ক্রমশ ঘন হচ্ছিল। তার মধ্যে দিয়ে যেতে চলার পথ খুঁজে বের করে একিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর লম্বা-লম্বা শাল গাছের বনের মধ্যে ঢুকে এলেন ওঁরা। জঙ্গলের এই অংশটুকু বাকি অঞ্চলের চেয়ে বেশ আলাদা। এমনটা রাস্তা যেন নিজেকে একটু সাজিয়ে নিয়েছে এই জায়গাটায়। দেখে মনে হয় মানুষের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে অনেকদিন ধরে। পাথরের উপর ঝরে পড়া শুকনো পাতা জমে-জমে নরম বিছানার মতো হয়ে আছে। আর-একটু এগিয়ে একটা টিপির মতো জায়গায় এসে স্যামুয়েল একটু থেমে দম নিল। নীল থমকে তার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে সামনের দিকে তাকালেন। টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জায়গাটায় অনেক বড়-বড় পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। কোনওটা আবার একটার উপর আর-একটা চাপানো। এক জায়গায় পার্কের বেঞ্চের মতো করে দুটো লম্বা পাথরের উপর একটা চওড়া আয়তকার পাথর বসানো হয়েছে। বেশির ভাগ পাথরই শ্যাওলা পড়ে সবুজ হয়ে গিয়েছে।

"ওগুলো কী?" নীল বিস্ময়টা জানতে চাইলে স্যামুয়েল বলল, "এটা আস্ত গারো সম্প্রদায়ের পবিত্র জায়গা। ওই পাথরগুলো উপজাতিদের মধ্যে কিছু বিশিষ্ট মানুষের স্মারক। যেমন, গোষ্ঠীপ্রধান (নোকমা) বা অলৌকিক শক্তি আছে এমন মানুষ (খামাল)। এখানে গ্রামের লোক বিশেষ আসে না। এই জঙ্গলে গাছ কাটা, বনপ্রাণী শিকার করা সব নিষেধ। এমনটা হলে গারোরা তাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে।"

নীল বললেন, "আমরা একবার কাছে গিয়ে দেখতে পারি? প্রাচীন গুহার ইতিহাস, ভূগোল, জৈব বৈচিত্র ও তার গল্পকথার খোঁজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপজাতিদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি আমি। মৃতদের স্মৃতির উদ্দেশে বানানো এইসব পাথরের ফলকে অনেক রহস্য লুকিয়ে থাকে।"

"না-না। কাছে যাবেন না প্লিজ। এখানে নাড়াঘাঁটা করলে উপজাতিদের বিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে।"

স্যামুয়েল আপত্তি করতে গিয়েও থেমে গেল। আজ প্রেতাত্মার গুহায় সাহস করে ঢোকা আর তার মধ্যের গুহাচিত্রটা দেখার পর থেকে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছে স্যামুয়েল। সে নিজেও গারোদের প্রাচীন ইতিহাস, লিপি ও নানা রকম মিথের পিছনে লুকিয়ে থাকা সত্যিগুলো জানতে খুব আগ্রহী। নিজের কলেজে পড়ার সুযোগ না হলেও, দক্ষিণ গারো পাহাড়ের এই বাঘমারা ডিভিশনের গারো উপজাতিদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে আসা বেশ কয়েকজনের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে সে। নীল আর মার্টিন দু'জনেরই নিউজিল্যান্ডে জন্ম। কাজ করেন আমেরিকার একটি জনপ্রিয় ম্যাগাজিনে। নীল পেশায় স্পেলিওলজিস্ট। তাঁর কাজ গুহায়-গুহায় অনুসন্ধান চালানো। গুহার ভূতত্ত্ব, উপাদান, প্রাচীনতা, গুহার ভিতরের প্রাণী, উদ্ভিদ সবই তাঁর গবেষণার মধ্যে পড়ে।

মার্টিন মূলত সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুহার অজানা জগৎ নিয়ে একটা সম্পূর্ণ প্রোজেক্ট করতে চান ওঁরা। সেই সূত্রে হিমালয়ের দুর্গম ও অচেনা গুহাগুলো দিয়ে শুরু করে মালয়েশিয়া হয়ে ভিয়েতনামের বিখ্যাত হ্যাং-সন-ডুং গুহায় অনুসন্ধান চালানোর ইচ্ছে আছে ওঁদের। আর ভারতবর্ষে অনাবিষ্কৃত গুহার জন্য মেঘালয়ের থেকে উত্তম জায়গা আর কোথায় আছে!

স্যামুয়েল মনে-মনে গারোদের বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে নিজের এই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে-চাইতে নীল আর মার্টিনকে সঙ্গে নিয়ে পাথরের স্মারকগুলোর কাছে এল। মার্টিন মাটিতে বসে হাত দিয়ে শুকনো পাতা সরিয়ে সবচেয়ে বড় চ্যাপ্টা পাথরটার ফোটো তুললেন। স্যামুয়েল বলল, "এখানে জড়িবুটি দিয়ে চিকিৎসা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন যেসব প্রাচীন ওঝা, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শহিদ হওয়া গারো যোদ্ধা, কোনও বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন এমন পুরোহিত কিংবা কোনও জাদুকর, যিনি মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন, এমন সব মানুষের স্মারক আছে।"

নীল পাতা সরিয়ে পাথরগুলোর গায়ে হাত বোলাচ্ছিলেন। মার্টিন টর্চের আলো ফেলে চোখটা কাছে নিয়ে গিয়ে খুঁজছিলেন কিছু ছবি বা লেখা। স্যামুয়েল বলল, "স্থানীয় নোকমারা কিন্তু আমাদের এইসব কীর্তি জানতে পারলে রুষ্ট হবেন।"

"এই দেখো নীল! পাথরটার গায়ে কলসির মতো কিছু ফুলের ছবি খোদাই করা আছে। এসব কিছু ফেলনা নয়। এগুলো রহস্যের চিহ্ন হতে দোষ কোথায়? এই পবিত্র জায়গাগুলোই আলাদা করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বছরের পর-বছর। পুরনো ইতিহাস খুঁজতে চাইলে এখানেই কিছু পাবে। হয়তো এখান থেকে এমন কিছু তথ্য পেলে স্যামুয়েল, যা দিয়ে গারো উপজাতির পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আমাদের ধারণাই বদলে গেল," বললেন নীল।

চারপাশে পায়চারি করতে-করতে স্যামুয়েল নীলের কথার রেশ ধরে বলল, "তবুও পাহাড়ের আড়ালে বসবাস করা এইসব উপজাতির কাছে বিশ্বাস, সংস্কার এগুলোই আগে। বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতা থেকে একজন গবেষক এসেছিলেন গারো লিপি নিয়ে কাজ করতে। আমাকে বলেছিলেন, বিশেষ-বিশেষ প্রাচীন, পবিত্র স্মারক খুঁজে দিতে। তবে শেষমেশ উপজাতি বিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে জেনে তিনি আর বেশি দূর এগোননি।"

একথা আলোচনা করতে-করতে হঠাৎ "মাই গড!" বলে আর্ত চিৎকার করে স্যামুয়েল শুকনো পাতার মধ্যে পাতাল-প্রবেশের মতো ঢুকে গেল। নীল আর মার্টিন রে রে করে ছুটে এসে স্যামুয়েলের হাত চেপে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্যামুয়েল এই আকস্মিক বিপর্যয়ে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। চোটের কষ্ট একটু সামলে নিয়ে বলল, "অল রাইট, আমি ঠিক আছি। গর্তটা খুব গভীর নয়। আমি পায়ের নীচে তল পাচ্ছি।"

নীল আর মার্টিন মিলে স্যামুয়েলকে গর্ত থেকে তুললেন। নীল বললেন, "কোথাও ফাঁয়া হচ্ছে না তো? তুমি হাড়গোড় ভেঙে বিছানা নিলে কিন্তু আমরা অনাথ হয়ে যাব। তোমার মতো হিতীয় কোনও গাইড আর পাব না এখানে!"

স্যামুয়েল হালকা হেসে বলল, "না, না, ঠিক আছি। এখানে এই বড় পাথরটার কোল ঘেঁষে এমন পাতা চাপা গর্ত থাকতে পারে আন্দাজ করতে পারিনি।"

বলতে-বলতে স্যামুয়েল পিছনে তাকাতেই দেখল, একটা ছোট ছায়ামানুষ যেন গাছের আড়ালে সরে গেল। কেউ কি আড়াল থেকে ওদের কাজকর্মের উপর নজর রাখছে? স্যামুয়েল ভয় পেয়ে বলল, "চলো, আজ ফেরা যাক। এভাবে চোরের মতো অন্ধকারে এই জায়গাটি অপবিত্র করার কথা জানাজানি হলে গ্রামের লোকেরা ছেড়ে কথা বলবে না।"

নীল আর মার্টিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা না বাড়িয়ে স্যামুয়েলের সঙ্গে রওনা দিলেন। ওঁরা দু'জন গির্জার কাছে একটা মিশনারি গেস্ট হাউজে উঠেছেন। আরও কিছুক্ষণ পা চালিয়ে ওঁদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে স্যামুয়েল বাড়ি ফিরে এল।

স্যামুয়েল একা থাকলেও নিজের বাড়িটা বেশ যত্নে সাজিয়ে রাখল। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ির দু'পাশে সুদৃশ্য ফুলের বাগান। গেট খুলে বাগানের মাঝে সরু পথ বেয়ে ঘরের দরজার কাছে আসা যায়। স্যামুয়েল তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। সবক'টা ঘরের আলো জ্বালিয়ে রান্নাঘরে গেল। আজ সে তার প্রিয় পদ মাশরুম রান্না করবে। দুপুরে মাশরুম, পেঁয়াজ, আদা, টোম্যাটো সব কেটে ছাড়িয়ে রেখে গিয়েছিল। স্যামুয়েল হাত ধুয়ে গ্যাসে ফ্রাই-প্যানে তেল গরম করল। তারপর তাতে পেঁয়াজ ছড়িয়ে ভাজতে লাগল। বেশ লাল-লাল করে ভাজার পর তাতে মশলা ও ছাড়ানো মাশরুমগুলো ঢেলে দিয়ে কষতে থাকল কিছুক্ষণ ধরে। এর পর রান্নার মাঝে লম্বা নিশ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকল পছন্দের তরকারিটার। তারপর অন্য আভেনটায় ভাত চড়িয়ে দিয়ে শোয়ার ঘরে ফিরে এল।

এবার পায়ে, কোমরে একটু ব্যথার ওষুধ স্প্রে করা দরকার। স্যামুয়েল প্যান্ট গুটিয়ে দেখল, হাঁটুর তলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বেশ কিছুটা ছড়ে গিয়েছে। বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ারে থেকে ওষুধ বের করে লাগাতে-লাগাতে আপনমনেই চমকে উঠল। পাঁচ বছর আগে সেবার কলকাতা থেকে আসা ভুবনস্যার বলেছিলেন, "জীবজন্তুর চামড়ায় গারো লিপিতে লেখা কোনও শাস্ত্র ছিল। উপকথায় আছে সে শাস্ত্র দীর্ঘ কষ্টকর যাযাবর জীবনে কোথাও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তার কিছু প্রতিলিপি টিকে থাকতে বাধ্য। কোথাও না-কোথাও সেটা খোদাই করে রাখবে মানুষ। পুরোটা পারবে না, কিছু-কিছু। খুব মনে রাখার মতো অংশগুলো।"

স্যামুয়েল বিছানার টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। গর্তের মধ্যে কিছু একটা ঠেকেছিল ওর পায়ে। বেশ অন্য রকম কিছু একটা। স্যামুয়েল উঠে দাঁড়িয়ে গায়ে সোয়েটার চড়িয়ে নিল। টুপিতে ঢেকে নিল কান পর্যন্ত। রান্না ঘরে এসে ভাতটা টিপে দেখল সিদ্ধ হয়েছে কিনা। তারপর নামিয়ে রেখে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যদি কিছু রহস্য থাকে আজ রাতেই জেনে নেওয়া ভালো। বিদেশিরা তো কিছু পরোয়া করতে চায় না। এখন আড়াল থেকে যদি সত্যিই কেউ নজর রেখে থাকে তবে কাল সকালেই এই নিয়ে গোলমাল বাধবে। তারপর ওই পবিত্র বন আবার শুদ্ধ করতে হয়তো 'সালপাং সিমা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে কয়েকটা গ্রামের নোকমারা মিলে। তার জন্য পশুবলি

থেকে শুরু করে গোটা অনুষ্ঠানের খরচ কান ধরে আদায় করা হবে স্যামুয়েলদের থেকে।

স্যামুয়েল জঙ্গলের পথে জলদি পায়ে এগিয়ে চলেছিল। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়। তার চলার শব্দে একটা বনবিড়াল ভয় পেয়ে লাফিয়ে পালাল। স্যামুয়েল তাতে চমকে গিয়ে রাস্তার দু'পাশে চোখ বুলিয়ে নিল। পিছন ফিরে তাকাল একবার। ছোটখাট একটা ছায়ামানুষ লুকিয়ে পড়ল গাছের আড়ালে। মাথার উপর একটা বাদুড় কয়েক পাক ঘুরে বনের দিকে উড়ে গেল। স্যামুয়েল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। চারপাশ দেখে নিয়ে আবার হাঁটা দিল।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলার মচমচ আওয়াজ হচ্ছে। হাওয়া উঠেছে জঙ্গলে, পাতা ঝরার শব্দ, রাতপাখিদের ডানার ঝটপটানি, অচেনা জীবজন্তু, কীটপতঙ্গের একটানা ডাক সব মিলে মুখর করে রেখেছে গারো পাহাড়ের থমথমে পরিবেশ। স্যামুয়েল পাথরগুলোর কাছে গিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে খুঁজতে লাগল সেই শ্যাওলা ধরা বড় পাথরটা। হাঁটু গেড়ে বসে পাতা সরিয়ে পাথরের পাশে গর্তটা পরিষ্কার করল। এর উপর যে পাথরটা ঢাকা দেওয়া ছিল সেটা নিশ্চয়ই আগে কেউ সরিয়েছিল। তারপর কিছু ছোট শুকনো ডাল আর পাতা দিয়ে মুখটা ঢাপা দিয়ে দিয়েছে। তাই গর্তটা শুকনো পাতার আড়ালে অমন খোলা অবস্থায় থেকে গিয়েছিল। স্যামুয়েল গর্তের মধ্যে আলো ফেলে অবাক হয়ে গেল। এই গর্তটা তো গোপন চেম্বারের মতো করে বানানো। আর ভিতরে পড়ে রয়েছে স্লেটের মতো পাতলা পাথরের ফলকটা। স্যামুয়েল উপরের পাথরের উপর দু'হাত দিয়ে দেহের ভর রেখে পাদুটো ঝুলিয়ে দিল গর্তের ভিতরে। এর পর একশ কয়েকবারের বার্থ চেষ্টার পর দু'পায়ে আটকে স্লেট পাথরের পাতলা ফলকটা তুলে নিল উপরে। টর্চের আলোয় পড়ার চেষ্টা করল ফলকে খোদাই করা লিপিগুলো। ছোট-ছোট জ্যামিতিক নকশা আর খুদে-খুদে ছবি। স্যামুয়েল বোঝার চেষ্টার করছিল, কিন্তু সেই সময় আবার তার মনে হল কেউ যেন গাছের আড়াল থেকে দেখছে। সে টর্চের আলো ফেলল চারপাশে। কেউ কি ছুটে পালিয়ে গেল? মনে হল যেন কোনও ছোট ছেলে। কিন্তু সন্ধের পর কোন ছোট ছেলে আর সাহস করে জঙ্গলে আসবে?

স্যামুয়েল ফলকটা হাতে নিয়ে প্রায় ছোটার বেগে হাঁটতে লাগল। অনেকটা পাহাড়ি রাস্তা। চলতে-চলতে দম ফুরিয়ে আসে। স্যামুয়েল প্রায় হাঁপাতে- হাঁপাতে বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই টেবিলে রাখল পাথরের ফলকটা। ঘরের সব আলো জ্বেলে দিল। কোথাও মাঝে বিন্দু আঁকা বৃত্ত, কয়েকটা পেট-কাটা আয়তক্ষেত্রের মতো জ্যামিতিক আকার, কোথাও বা চিনা চিত্রকাহিনি মতো নানা রকম খুদে-খুদে ছবি আঁকা। কত বছরের পুরনো কে জানে! কিছু-কিছু ছবি আবছা হয়ে এসেছে। তবে পাথরের উপর আঁচড়গুলো রয়ে গিয়েছে। কিছু-কিছু ছবি স্পষ্ট, যেন নতুন খোদাই করা। স্যামুয়েল দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। তবু সে বিস্ময়ের ঘোরে ঘরময় ঘোরাঘুরি করতে লাগল। এটা কি গারোদের সেই হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন লিপি? নাকি অন্য কোনও রহস্যের সংকেত? স্যামুয়েল চটজলদি নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে ছবির অ্যালবামটা বের করল। পাঁচ বছর আগে স্যার এমনই পাঁচটা চিহ্ন আর ছবি আবিষ্কার করেছিলেন গারো পাহাড়ে ঘুরে-ঘুরে। ছবি আর পাথরের স্লেটটা পাশাপাশি রেখে স্যামুয়েল মিলিয়ে দেখল। এই তো অ্যালবামের ছবির এই একটা চিহ্ন বাদে বাকি চারটে চেনা যাচ্ছে এই পাথরের স্লেটের মধ্যে। স্যামুয়েল আনন্দে মশগুল হয়ে তাড়াতাড়ি মোবাইল হাতে তুলে নিয়ে ফোন করল। মনে-মনে বলল, 'স্যারের নম্বরটা যদি বদলে না গিয়ে থাকে, তবে কথা হবে।'

"হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? আমি বাঘমারা থেকে স্যামুয়েল সাংমা বলছি। হ্যালো, ভুবনস্যার!"

শুরু করেছে। কল্পা হোটেলের তিনতলার ব্যালকনিতে বসে শিলং শহর ও আশপাশের উপত্যকাগুলো দেখছিল। সূর্য ডোবার পর হিল স্টেশনগুলোকে বেশ অন্য রকম দেখতে লাগে। দূরের পাহাড়ের গায়ে ছোট-ছোট পল্লির আলোগুলোকে দেখে মনে হয় যেন নীচে নেমে আসা অন্ধকার আকাশের ঢেউখেলানো গায়ে একদল নক্ষত্র জোট বেঁধে গল্প করছে। একটু আগে ওরা তিনজনেও এখানে বসে গল্প করছিল। এখন দিঠি আর সুনৃত বাইরে বেরিয়েছে মার্কেট থেকে মাফলার কিনতে। কারণ, তাদের মার্শাল আর্ট জানা বন্ধুটি জিনিসটা নিতে ভুলে গিয়েছে আসার সময়। দু'জনে যখন বেরিয়েছে তৃতীয় কেউ সামলাবার নেই, ইতিমধ্যেই ঠোকাঠুকি লেগে গিয়েছে নিশ্চয়ই। ভাবতে-ভাবতে কল্পার দু'জনের প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ে গেল। তখন ওরা আরও ছোট, রাজারহাটে 'অবাক পৃথিবী' আবাসনে আসেনি, কল্পা আর সুনৃত বাবার অফিস কোয়ার্টারে থাকত। দিঠি, কল্পার নতুন প্রতিবেশী হয়ে এসেছে। কয়েকদিনের আলাপ। লেখাপড়া, স্কুল এইসব নিয়ে গল্প হয়েছে অজস্রই।

সেদিন সুনৃত জুনোর চেন ধরে পইপাঁই করে ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল। হাঁটু, কনুই ছড়ে একাকার। তাই কল্পা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল মেডিকেল ইউনিটের দিকে। পথে দিঠির সঙ্গে দেখা হল। মুখোমুখি হতেই সে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

কল্পা বলেছিল এই বন্ধুটি কুকুরের সঙ্গে ছোটাছুটি করতে-করতে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছে।

"কুকুরে তাড়া করেছিল?"

এই প্রশ্নে সুনৃত কল্পার থেকে উত্তর কেড়ে নিয়ে মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, "নতুন এসেছিস এখানে? স্কুলে ভর্তি হোসনি এখনও? আমি কে, কেমন স্পোর্টসম্যান, কত জোরে ছুটতে পারি কিছুই জানিস না। আমাকে কুকুরে তাড়া করবে কী কথা? আমিই কুকুরকে তাড়া করেছিলাম। আমার কত সাহস জানিস? এলাকার সমস্ত কুকুর, বিড়াল, বাঁদর আমাকে ভয় পায়।"

সুনৃতের দাপটে না দমে দিঠি জিজ্ঞেস করেছিল, "কে বেশি জোরে ছুটতে পারে তুই, না কুকুর?"

সুনৃতের তখন নিজের দৌড়ের গতি নিয়ে খুব গর্ব ছিল। সে চটপট জানিয়ে দিল, ও সবার চেয়ে জোরে ছোটে। স্কুলে প্রাইজ পেয়েছে দৌড় প্রতিযোগিতায়। কুকুর ওর সঙ্গে ছুটে পারবে কেন?

দিঠি বলল, "তার মানে ছোটার সময় তুই আগে ছিলি, কুকুর তোর পিছনে?"

সুনৃত একজন অচেনা পুঁচকে মেয়ের এমন প্রশ্নজালে ফেঁসে গোমড়া মুখে বলেছিল, "হ্যাঁ। তো, আগু-পিছু যে যেখানে থাকুক না কেন তাকে কী হয়েছে?"

দিঠি শান্ত গলায় বলেছিল, "কিছু হয়নি। তোর আর কুকুরের মধ্যে আমি শুধু বোঝার চেষ্টা করছি যে, কে কাকে তাড়া করেছিল। আর কে বেশি জোরে ছোটে?"

কল্পা দেখেছিল সুনৃতের ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছে। মানে, পুরোপুরি ঘেঁটে আছে। কল্পাকে তাড়া দিয়ে বলেছিল, "চল।"

সুনৃত যেতে-যেতে খুব গজগজ করেছিল দিঠির উপর। বলেছিল, "এই মেয়েটা কে রে? খুব পাকা তো! পটপট করে বড্ড খটমট প্রশ্ন করে। যেন বড় হয়ে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে।"

পরে সুনৃত ঠাট্টা করে বলেছিল, "তবে এ মেয়ে ঠিক আসল ডিটেকটিভ হতে পারবে না। গল্পের গোয়েন্দা হবে দেখিস।"

আর এতক্ষণ এখানে বসে সেই সুনৃত দিঠির সঙ্গে ঝামেলা করছিল গোয়েন্দা দলের নামকরণ নিয়ে। ভুবনদাদু যেমন বলেন, "এই বিশ্বজুড়ে আছে অপার বিস্ময়। জলে, স্থলে, মহাশূন্যে কত রহস্য ছড়িয়ে আছে। শুধু দেখার চোখ থাকতে হবে, অবাক হতে জানতে হবে।"

ভুবনদাদুর সেই আইডিয়া নিয়ে সুনৃত সোশ্যাল সাইটে একটা

॥ ২ ॥

সন্ধে নামার পর থেকেই গা শিরশির করা ঠান্ডা হাওয়াটা বইতে

পেজ খুলবে রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার বিষয়ে। তাতে দুনিয়াসুদ্ধ লোকজন নিজের-নিজের রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করবে। জানাবে সমাধান না হওয়া রহস্যের খবর। সুনৃতের ধারণা, তা থেকে একটা-দুটো জমজমাট রহস্য অভিযানের রসদও জুটে যেতে পারে। বিকেল থেকে সেই পেজের কয়েকটা নাম ভেবেছিল দিঠি, 'তৃতীয় নয়ন', 'সিক্সথ সেন্স', 'মনের চোখ' ইত্যাদি। একটাও সুনৃতের পছন্দ হয়নি। অনেক ভেবেচিন্তে একটা নাম প্রস্তাব করেছিল, 'দ্বিতীয় পাগুব'। ব্যস! দিঠি শুরু করে দিল, "দ্বিতীয় পাগুব কে জানিস? অবশ্য যা ডায়েট আর ব্যায়ামে পেয়েছে তোকে, তুই একদিন ওই দ্বিতীয় পাগুবের মতো যণ্ডামার্কা হয়ে ঘাড়ে গদা নিয়ে ঘুরে বেড়াবি।"

এতে সুনৃত চটে লাল হয়ে বলেছিল, "তা হলে নাম রাখ 'তাণ্ডব গোয়েন্দা'। যে লেল তোর মতো বিটকেল মেয়ে আছে, তাদের উপযুক্ত ও মানানসই নাম হবে।"

"এই অল্প ঠাণ্ডাতেও তোর মাথার বুদ্ধি জমে গিয়েছে, কেবল ঝামেলা করিস। নতুন কিছু ভাবতে পারিস না?" তো দিঠির মুখে এই মাথায় ঠান্ডা লাগার আশঙ্কার কথা শুনে সুনৃতের মনে পড়ে গেল, সে এই মেঘালয় সফরে বেরবার সময় মাফলার নিতে ভুলে গিয়েছে। অতঃপর দিঠির সঙ্গে মাফলারের খোঁজে বাজারে।

কল্পা আলো-আঁধারির মধ্যে কবা সসে আছে টের পেয়ে ভুবনদাদু ব্যালকনিতে এলেন। তিনি একটু আগে বাইরে বেরিয়েছিলেন, কাল সকালে চোরাপুঞ্জি বেড়াতে যাওয়া নিয়ে গাড়ির সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু এইমাত্র ফিরে আসার পর এমন আবছায়ার ভিতরেও ভুবনদাদুর মুখের দিকে চেয়ে কল্পার মনে হল, তিনি কিছু বিষয় নিয়ে খুব চিন্তিত।

কল্পা তাঁর মনের খবর আন্দাজ করতে পারছে, এটা ভুবনদাদুও বোধ হয় বুঝতে পারলেন। তিনি কল্পার পাশের চেয়ারটায় বসে বললেন, "একটু আগে একটা ফোন এল। বাঘমারা থেকে স্যামুয়েল সাংমার। পাঁচ বছর আগে আমি গারো উপজাতিদের হারানো লিপি নিয়ে কাজ করতে তুরা, বাঘমারা, সিজু এই সব অঞ্চলে ঘুরেছিলাম। সেই সময় স্যামুয়েল আমায় গারো পাহাড়ের নানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে তথ্য পেতে অনেক সাহায্য করেছিল। প্রায় আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল বলতে পারিস। তো সেই স্যামুয়েল ফোন করেছিল। বলল, ও নাকি সিজু গুহার কাছে বনের মধ্যে পাথরের স্লেটের উপর চিনা চিত্রলিপির মতো কিছু লেখা একটা রহস্যজনক ফলক পেয়েছে।"

"আবার রহস্য!" কল্পা আর ভুবনদাদু দেখল পিছনে দিঠি সুনৃতকে নিয়ে হাজির হয়েছে।

ভুবনদাদু হেসে বললেন, "ওই যে টেলিপ্যাথি। তোরা যেখানে যাস, রহস্য তোদের পিছন-পিছন আসে।"

কল্পা, সুনৃত আর দিঠি হইহই করে বলল, "তা হলে রহস্যের খোঁজে অভিযানে বেরিয়ে পড়ি চলো।"

ভুবনদাদু শান্ত গলায় বললেন, "অভিযানে বেরলেই তো হল না। ভাবছি শিলং থেকে বাঘমারা অনেকটা রাস্তা, সেখান থেকে সিজু আরও খানিকটা দূরে। গাড়িতে জার্নির ধকলটা কম হবে না। তা ছাড়া আমাদের চেরাপুঞ্জি বেড়ানোটাও এ যাত্রায় ডাকে উঠবে।"

দিঠিরা আবদার করে বলল, "চেরাপুঞ্জি পরেও হবে। আজ রহস্য নিজে ডাকছে আর আমরা সাড়া দেব না? চলো না ভুবনদাদু।"

সবার জোরাজুরিতে ভুবনদাদু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, "ঠিক আছে তবে তাই হোক। অন্য রাস্তাতেই পা বাড়াই। তবে সেও এক আশ্চর্য জগৎ। বাঘমারার জঙ্গল, সিমসাং নদী, নাফাক হ্রদ, গা ছমছমে সিজু গুহা, বন্য জন্তু, পরিযায়ী পাখি, মাংসাশী গাছ আরও কত কী! গাড়িটাকে বলে দিই কাল চেরাপুঞ্জি নয়, বাঘমারা নিয়ে যেতে হবে।"

॥ ৩ ॥

সিজু গুহার এই পর্যন্ত পরিমাপ হওয়া অংশের একটা ম্যাপ নীলের কানের কাছে ঝাঁকিয়ে আওয়াজ তোলার চেষ্টা করে মাটিন বললেন, "কী ভাবছ নীল সিজু গুহার অনাবিষ্কৃত গোলকধাঁধা আর কুঠরিগুলো নিয়ে?"

নীল জানলার বাইরের অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন যেন মাটিনের কথা শুনতে পাননি। আসলে নীলের মনে হল, বানরের মতো কোনও জন্তু যেন জানলার বাইরের অন্ধকার থেকে এইমাত্র পাহাড়ের দিকে দ্রুত পালিয়ে গেল। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে মাটিন নীলের পাশেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, "ওই গুহার অসংখ্য অজানা অন্ধকার কুঠরিতে জীবনের রহস্য খুঁজতেই কিন্তু আমাদের এখানে আসা। তা তিনদিন আগে যে বাদুড়গুলোকে ধরে ডানায় মাইক্রো-ট্রান্সমিটার লাগিয়েছিল, সেগুলো তো ডিটেকশন রেঞ্জের বাইরে গিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।"

নীল খোলা জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চোখ রেখে বললেন, "কুমিরের মতো মুখে লেগে আছে একটা হাতির মতো শুঁড়, মাছের মতো লেজ, এমনই দেখতে হিন্দু বরুণ দেবতার বাহন মকর নামে প্রাণীটাকে। এর কাছাকাছি আছে গারো ওঝা খেৎসুর পুরুষানুক্রমে শোনা একটা উপকথার গল্প। একটা তিনচক্ষু সরীসৃপ, যা বাদুড় ধরে খায়। বাস, বাদুড় হারিয়ে যাওয়ার কারণ বোঝা গেল।"

"মজা করছ? তুমি ওই পাগল ওঝা খেৎসুর গল্পে বিশ্বাস করলে নাকি?"

"কথাটা বাড়িয়ে অলৌকিক গল্পের মতো করে বললেও হয়তো একেবারে মিথ্যে নয়। খেৎসু নিজে মাটিনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় ওর দেখটা অবশ্যে করা যায় না। বাইরের বাদুড়রাও গুহার মধ্যে কোথাও হারিয়ে যায়।"

"কিন্তু ও তো আমাদের বাদুড়রা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে সে জায়গা দেখাতে পারল না।"

মার্টিনের কথায় কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। তাই তো আমরা স্যামুয়েলকে নিয়ে অচেনা, অজানা গুহামুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি। তবে আজকের আবিষ্কারটা অভিনব। ভূতের ভয়ে এই গুহামুখটা এতদিন সবাই এড়িয়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়। না হলে সামনের চলার পথটা এত লতা, পাতায় ঢাকা পড়ে থাকত না। আমি শিওর, এই মুখ কোনও আন্ডারগ্রাউন্ড রিভার প্যাসেজে গিয়ে মিশেছে। আমি পাথরে কান দিয়ে জলের কলকল শব্দ শুনছি। সঙ্গে নেমে এল বলে আর এগোনো গেল না। কাল বাকিটা দেখেই ছাড়ব। মনে হয়, আমরা চমৎকার কিছু আবিষ্কারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছি।"

মার্টিন নীলের চোখে-মুখে ফুটে ওঠা রহস্যের ভাষা পড়ে নিয়ে উঠে বসলেন। নীলের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। তারপর বললেন, "মেঙ্গেলয়েড আদিমানবদের কিছু প্রাথমিক চিহ্ন আর কিছু গুহাবাসী জলজ প্রাণী ছাড়া আরও কী-কী পাবে ভাবছ মেঘালয়ের এই দুর্গম গুহাতে?"

"যদি তাই পাওয়া যায়, সেটাই বা কম কী হবে? আবার ধরো, এমনও তো হতে পারে তৃতীয় চোখ আছে এমন কোনও আশ্চর্য প্রাণী খুঁজে পেলাম! যাদের কথা কেবল উপকথা কিংবা কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিতে পাওয়া যায়। ওই গুহাচিত্র কিছু কিছু ইঙ্গিত করছে।"

নীলের কথায় মার্টিন অবাক হয়ে বললেন, "তুমি পারও বটে ছোট ছেলেদের মতো সবেতে হরষ খুঁজে পেতে। এই পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের জানতে আর কিছু বাকি আছে?"

নীল শান্ত গলায় বললেন, "গুহার ভিতরে ঢুকে আমাদের কাজই তো জানার থেকে অজানাকে বেশি বিশ্বাস করা। যাক গে, ছাড়ো। তোমার ওই রগচটা প্রোফেসরকে মনে আছে মার্টিন, গত সপ্তাহে বাঘমারার ফরেস্ট বাংলোয় দেখা হয়েছিল? উদ্ভিদবিজ্ঞানী। নানা রকম অজানা অর্কিড ও ভেষজ খুঁজতে এসেছেন গারো পাহাড়ে। গুহার ভিতরে আশ্চর্য কোনও প্রাণী থাকতে পারে শুনে আমাদের উপর রেগে গেলেন। বললেন, 'অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় বিশ্বাসী

কুসংস্কারগ্রস্ত ওঝাদের বানানো গল্পের থেকে খাসিয়া উপকথার শয়তান সাপ থলেনের গল্প অনেক প্রশ্নিল। আমরা কেন চেরাপুঞ্জির দিকে গিয়ে সেই দৈত্যাকার সাপের খোঁজ করছি না?' আমাদের ভাবনা ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের মতো আজগুবি বলে মন্তব্য করে তর্ক থেকে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন। তুমি ব্যস্ত ছিলে, নোটিস করোনি। আজ দেখলাম, তিনিও ওঝা খেংসুর সঙ্গে কোথাও চলেছেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।"

দু'জনের এই আলোচনার মধ্যে গেস্ট হাউজের কেয়ারটেকার মিঃ মারাক অনুমতি না নিয়েই হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। তাঁর চোখে, মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। ঘরে এসেই একটা চিরকুট হাতে নিয়ে রীতিমতো হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "বড় রকমের বিপদে পড়ার আগে আপনারা এখান থেকে চলে যান।"

নীল হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন কী হয়েছে?"

মিঃ মারাক চিঠিটা সামনে ধরে বললেন, "এটা একটা সাবধানবাণী। আমার অফিসে কেউ রেখে গিয়েছে। এই ছাপা প্যাড, এই হাতের লেখা আমি চিনি। এটা আসল। গারো উগ্রপন্থীরা আপনাদের অপহরণ করে সরকারকে চাপ দিতে তৈরি হচ্ছে, এমন লেখা আছে এই চিঠিতে।"

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছিল স্যামুয়েলের। আজ করাকটা চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে নিজের প্রয়োজনের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। আসলে ওই ছবি আর চিহ্ন আঁকা পাথরটা সব গোলমাল করে দিল। কেমন অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সময়টা পার হয়ে গেল। ভুবনস্যার এখন শিলংয়ে রয়েছেন, কী দারুণ যোগাযোগ। যদি তিনি এখানে আসেন তবে পাঁচ বছর আগের সেই অসমাপ্ত কাজটা আবার শুরু হবে। কী ভাল যে লাগত ভুবনস্যারের সঙ্গে ঘুরতে! যেন নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করা হত প্রতিদিন। তবে এই মুহূর্তে স্যামুয়েলের খুশিটা চাপা পড়ে যাচ্ছিল পেটের যন্ত্রণায়। স্যামুয়েল বিছানায় কাতরাল কিছুক্ষণ। চোখের দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। শরীরটা এমন হাল ছেড়ে দিচ্ছে কেন? কোনওভাবে ফুট পয়জনিং হলে? বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা ছিল, তা দিয়ে বিড়াল ঢুকে খাবারে মুখ দিলে কিনা কে জানে। বাসনপত্র সামান্য এলোমেলো মনে হল। তা ছাড়া খেয়েও তেমন তৃপ্তি হল না। ভাতটাও ঠিকঠাক সিদ্ধ হয়নি। ডিনারে বসে কী বিশ্রী খেতে লাগল প্রিয় মাশরুমের তরকারিটাও। যেন সেটা নিজের রান্নাই নয়। খাবার পর থেকেই স্যামুয়েলের হেঁচকি উঠছিল বারবার। এখন পেটের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। সারা শরীরটা কেমন যেন উথালপাথাল করছে। কী হল তাঁর? এত কষ্ট হচ্ছে কেন? স্যামুয়েল ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু চোখ বুজলেই মনে হচ্ছিল একটা রাক্ষুসে কালো অন্ধকার যেন তাকে গিলতে আসছে।

ভয় পেয়ে জেগে উঠতেই গা গুলিয়ে উঠল স্যামুয়েলের। সে পা টলমল করতে-করতে বেসিনের কাছে গিয়ে জলের কল খুললা। মাথাটা নুইয়ে এল তার। কলের জলে ভিজতে লাগল মাথার চুল। সে কোনও রকমে বিছানায় ফিরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। সমস্ত পৃথিবনা বিশ্বাস আর ভয় ঘিরে ধরল তাকে। তবে কি মৃত্যুর দেবতা নাওয়াং রেগে গিয়েছেন তার উপর? ভাবতে-ভাবতে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল স্যামুয়েলের। থরথর করে কেঁপে উঠছিল শরীরটা।

স্যামুয়েল ঝিমিয়ে পড়তে-পড়তে বিড়বিড় করে বলল, "ক্ষমা করুন হে মৃত্যুদূত। ক্ষমা করুন মিঙ্কি নাওয়াং। আমি পাপ করেছি। আমি আত্মাদের গুহায় ঢুকেছি, বিদেশীদের নিয়ে পবিত্র বন অপবিত্র করেছি। আমায় ক্ষমা করুন দেবতা নাওয়াং।"

বলতে-বলতে খুব কষ্টের মধ্যে স্যামুয়েল সাংমা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কোথায় কোন অতলে তলিয়ে গেল। যেন অসংখ্য কালো-কালো হাত স্যামুয়েলকে ধরে টেনে নিল কোনও অন্ধকার পাতালপুরীতে।

॥ ৪ ॥

শিলং থেকে বেরবার সময় আকাশ কিছুটা মেঘলা ছিল। এখন রোদ ঝলমল করছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে গাড়িটা এগিয়ে চলছিল। ভুবনদাদু ড্রাইভারের পাশে বসেছিলেন। ওরা তিনজন পাশাপাশি পিছনের সিটে। ড্রাইভার ছেলেটির নাম আকাশ। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। বেশ হাসিখুশি, মিশুকে। লম্বা সফরে কোথায়-কোথায় ব্রেক নেবে তাই নিয়ে ভুবনদাদুর সঙ্গে আলোচনা করে নিচ্ছিল। গাড়ি চলতে শুরু করার পর ভুবনদাদুর বললেন, "গারো পাহাড় আবার যে এমন করে ডেকে নিয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। পাঁচ বছর আগে যখন ফিরে যাচ্ছিলাম তখন মনে হয়েছিল আমার জীবনে আর-একটা অসমাপ্ত অনুসন্ধানের গল্প জমে গেল। কিন্তু কিছু গল্প বোধ হয় শেষ হয়েও ফুরিয়ে যায় না।"

আজ সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে বলে গতকাল রাতে সবাইকে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে হয়েছিল। তাই রহস্যের খুঁটিনাটি মন ভরে শোনা হয়নি কারওরই। কয়া প্রথমে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা দাদু, গারোদের এই হারানো লিপির গল্পটা কী?"

ভুবনদাদু বললেন, "গারো উপকথা থেকে জানা যায়, গারোরা যখন তিব্বত থেকে বিতাড়িত হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল, সেই সময় পশুদের চামড়ায় লেখা বইপত্র তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু পাহাড়-পর্বত, নদী, অরণ্য পার হয়ে কঠিন কষ্টকর পথে চলতে-চলতে ওই বইপত্রগুলো যাদের জিম্মায় ছিল, তারা খিদের জ্বালায় সব সিদ্ধ করে খেয়ে ফেলে। অনেকদিন গোপন থাকার পর যখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়, তখন আর কারও পক্ষে গারো বর্ণমালা স্মরণ করা সম্ভব হয়নি।"

দিঠি নিজের মাথায় হাত রেখে বলল, "যাহ্! এইভাবে একটা উপজাতির সব বইপত্র আর অক্ষর পেটে চলে গেল?"

ভুবনদাদু হালকা হেসে বললেন, "তাই কী? সবাই কী সব ভুলে যেতে পারে? উপকথার গল্পের মধ্যে কিছু সত্যি লুকিয়ে আছে ধরে নিয়েই আমি সে সময় অনুসন্ধান শুরু করেছিলাম। আমি আর স্যামুয়েল যেখানে যা পেয়েছি, সব খুঁজে দেখেছি। অনেক পরিশ্রমের পর পাঁচটা চিহ্ন উদ্ধার করতে পেরেছিলাম আমরা। সেগুলো কিছুটা মিশরীয় হাইরোগ্লিফের চিনা সংস্করণ বলতে পারিস। হয়তো আরও কিছু নিদর্শন পেয়ে যেতাম যদি না আসং নামে যে ওরা তাদের পবিত্র স্থানে আমাদের একটা গোপন জিনিস দেখাবে বলে রাজি হয়েছিল, সে হঠাৎ হারিয়ে যেত। সে মারা গিয়েছে এমন রটে যাওয়ায় এলাকার উপজাতি প্রধানরা বেঁকে বসলেন। বিভিন্ন প্রাচীন জায়গায় আমাদের এই খোঁজাখুঁজির জন্য গারো দেবতারা রেগে যাচ্ছেন বলে আপত্তি করে তাঁরা আমাদের নামে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলেন। আলোচনার সময় নোকমারা কেঁদেকেটে বলেছিল, আগে সব শান্ত ছিল। সুখ ছিল। শান্তি ছিল। কার অপরাধে কে জানে দুষ্ট আত্মারা জেগে উঠল বারো বছর আগে। গারো সমাজের কত গুণী মানুষ যে একে-একে হারিয়ে গেলেন। পুজো পেয়ে দেবতারা এখন সন্তুষ্ট আছেন তাই কোনও রকমে দিন চলে যাচ্ছে। তাই দেবতারা রেগে যান এমন কাজ তারা মেনে নেবে না।

"বাঘমারায় প্রশাসনিক বৈঠকে সবার সঙ্গে আলোচনার পর আমিও এদের বিশ্বাসকে সম্মান করে সেবার গারো লিপি নিয়ে গবেষণা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তবে কী জানিস, আমার এখনও মনে হয় কেউ ওই নোকমাদের আমাদের বিরুদ্ধে উসকেছিল।"

দিঠি জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু একটা জাতির হারানো লিপির সন্ধান করাতে কার কী আপত্তি থাকতে পারে?"

"আসলে সেদিন এই প্রশ্নটা আমারও মাথায় এসেছিল। কিন্তু আপত্তির কারণটা বুঝতে পারিনি। তবে গতকাল স্যামুয়েলের সঙ্গে কথা বলে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি। আপত্তিটা গারো লিপি খোঁজা নিয়ে ছিল না। ওই অঞ্চলে সিমসাং নদীর তীরে সিভুর কাছে

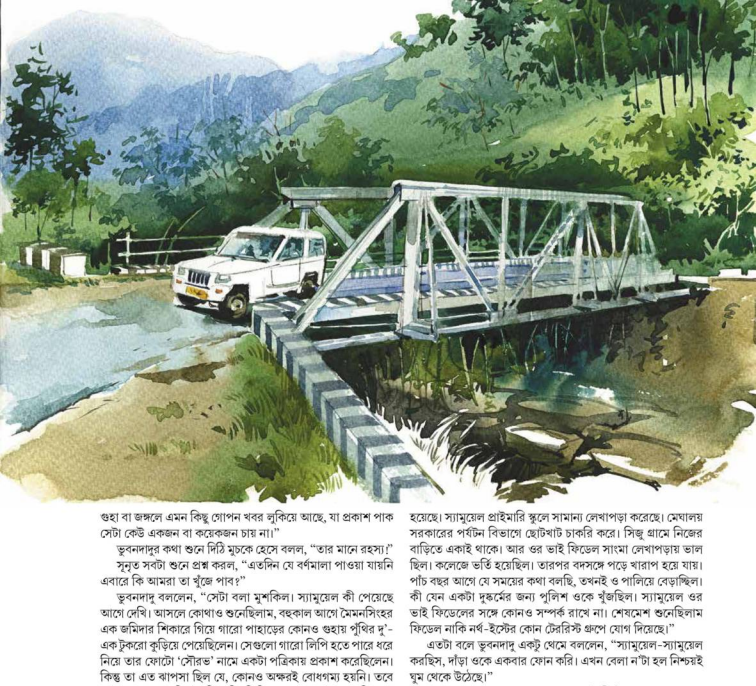

গুহা বা জঙ্গলে এমন কিছু গোপন খবর লুকিয়ে আছে, যা প্রকাশ পাক সেটা কেউ একজন বা কয়েকজন চায় না।"

ভুবনদাদুর কথা শুনে দিঠি মুচকে হেসে বলল, "তার মানে রহস্য!"

সুনৃত সবটা শুনে প্রশ্ন করল, "এতদিন যে বর্ণমালা পাওয়া যায়নি এবারে কি আমরা তা খুঁজে পাব?"

ভুবনদাদু বললেন, "সেটা বলা মুশকিল। স্যামুয়েল কী পেয়েছে আগে দেখি। আসলে কোথাও শুনেছিলাম, বহুকাল আগে মৈমনসিংহর এক জমিদার শিকারে গিয়ে গারো পাহাড়ের কোনও গুহায় পুঁথির দু'-এক টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেগুলো গারো লিপি হতে পারে ধরে নিয়ে তার ফোটো 'সৌরভ' নামে একটা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তা এত ঝাপসা ছিল যে, কোনও অক্ষরই বোধগম্য হয়নি। তবে সেই লেখাগুলো কিছুটা চিনা চিত্রলিপির মতো এমনটা শুনেছিলাম। আমরা যে পাঁচটা চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলাম, সেগুলোও চিত্রলিপি। তাই স্যামুয়েল একই রকম ছবি আর চিহ্ন আঁকা পাথর খুঁজে পেয়েছে শুনে নতুন করে এই অভিযানে উৎসাহ লাগছে।"

গাড়িটা শিলং আর আশপাশের লোকালয় পার হয়ে ফাঁকা রাস্তায় এসে উঠল। সামনে একটা সরু পাহাড়ি নদীর উপর ছোট সেতু। নদীর দু'পাশে জঙ্গলের রেখা ঘন হয়েছে। গাড়িতে স্থানীয় এফ এম চ্যানেলে হালকা করে লোকসংগীত চালিয়ে রেখেছে আকাশ। বেশ মিষ্টি এই সকালটা। দিঠি কিছুক্ষণ রহস্যের ভাবনায় ডুবে থেকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভুবনদাদু, স্যামুয়েল সাংমা তো অনেকদিন ধরে ওই এলাকায় আছে। কারা লিপি সন্ধানের বিরুদ্ধে আছে সেও কিছু জানে না?"

"নিজে মাথা ঘাটিয়ে রহস্য খোঁজার ছেলে স্যামুয়েল নয়। সে সাদাসিধা, ভোলাভালা টাইপের। কেউ নিজের গবেষণায় ওকে সঙ্গে নিলে ও তাকে মন, প্রাণ দিয়ে সাহায্য করে। আসলে স্যামুয়েলরা যমজ ভাই। শুনেছি ওর ভাইকেও হুবহু ওর মতোই দেখতে। অল্প বয়সে ওদের বাবা-মা মারা যান। দুই ভাই মিশনারি অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে। স্যামুয়েল প্রাইমারি স্কুলে সামান্য লেখাপড়া করেছে। মেঘালয় সরকারের পর্যটন বিভাগে ছোটখাট চাকরি করে। সিজু গ্রামে নিজের বাড়িতে একাই থাকে। আর ওর ভাই ফিডেল সাংমা লেখাপড়ায় ভাল ছিল। কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তারপর বদসঙ্গে পড়ে খারাপ হয়ে যায়। পাঁচ বছর আগে যে সময়ের কথা বলছি, তখনই ও পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কী যেন একটা দুষ্কর্মের জন্য পুলিশ ওকে খুঁজছিল। স্যামুয়েল ওর ভাই ফিডেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। শেষমেশ শুনেছিলাম ফিডেল নাকি নর্থ-ইস্টের কোন টেররিস্ট গ্রুপে যোগ দিয়েছে।"

এতটা বলে ভুবনদাদু একটু থেমে বললেন, "স্যামুয়েল-স্যামুয়েল করছিস, দাঁড়া ওকে একবার ফোন করি। এখন বেলা ন'টা হল নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে।"

ভুবনদাদু বেশ কয়েকবার কল করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মনে হচ্ছে ফোন সাইলেন্টে রেখে ঘুমিয়ে আছে। যাকগে, পরে ফোন করে নেওয়া যাবে। কাল দুপুরের পর সিজুতে ওর বাড়ি যাব। আজ আমরা বাঘমারায় থাকব। বাঘমারার জঙ্গলে তোদের একটা বিশেষ জিনিস দেখাব যার কথা তোরা শুধু পড়ার বইয়ে পড়েছিস।"

সুনৃত, কল্কা উৎসাহ নিয়ে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কী ভুবনদাদু?"

"মাংসাশী গাছ।"

মাংসাশী গাছের নাম শুনে সুনৃত কৌতূহলে নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করল, "কত বড় ভুবনদাদু, গল্পে যেমন পড়েছি? মানুষ খেয়ে নেয়?"

ভুবনদাদু হালকা হেসে বললেন, "আরে না-না, মানুষ খাবে কী করে? মানুষখেকো গাছ গল্পেই সম্ভব। বাঘমারার জঙ্গলে আমি তোদের কলসপত্রী দেখাব। এরা এক রকমের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। ছোট-ছোট পোকামাকড় খেতে পারে।"

ভুবনদাদুর কথা শেষ হওয়ার আগেই রাস্তা ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। রাস্তার পাশের জঙ্গলে আগুন লেগেছে। দিঠি বাইরে তাকিয়ে বলল, "কেউ বোধ হয় বনের পাতা পোড়াতে গিয়ে দাবানল লাগিয়ে

ফেলেছে।"

আকাশ ধোঁয়ার মধ্যে গাড়ির বেগ কমিয়ে দিয়ে বলল, "এখানে আগুন লাগিয়ে বনজঙ্গল পরিষ্কার করা চলছে, বোধ হয় খেত বানিয়ে জুম চাষ হবে।"

এক এম চ্যানেলে গানের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে খবর শুরু হল। খবর চলতে- চলতে ভুবনদাদু চমকে উঠে রেডিয়োর ভলিউম বাড়িয়ে দিলেন। কী বলছে খবরে? গারো ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি গ্রুপের জঙ্গি ফিডেল সাংমাকে সিজুর কাছে জঙ্গলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

॥ ৫ ॥

স্যামুয়েলের শরীর খারাপ, আজ সঙ্গে যেতে পারবে না। খবরটা সকাল-সকাল গেস্ট হাউজ়ে বসেই পেলেন নীল আর মার্টিন। একটা ছোট ছেলে এসে খবরটা দিয়ে গেল। শুনে নীল হতাশ হয়ে বললেন, "ব্যাড লাক! এখন ওই প্রেতাত্মার গুহা পর্যন্ত কে চিনিয়ে নিয়ে যাবে?"

অগত্যা অচেনা জায়গা হলেও দু'জনকেই বেরতে হবে। গতকালের সাবধানবাণী নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে গেস্ট হাউজ়ের কেয়ারটেকার মিঃ মারাকের সঙ্গে। অনেক বোঝানোর পর ভদ্রলোক কিছুটা শান্ত হয়েছেন। পুলিশে খবর দেওয়া থেকেও বিরত করা গিয়েছে।

নীলের ধারণা, কাজটা প্রোফেসর প্রফুল্ল বরার। সেদিন ফরেস্ট বাংলোয় কথা কাটাকাটি থেকে আক্রোশটা রয়ে গিয়েছে তাঁর মনে। তাই মিথ্যে চিঠি দিয়ে খামোকা ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিংবা হয়তো তাঁর পাশাপাশি অন্য কেউ এখানে অনুসন্ধান করুক এটা তিনি পছন্দ করছেন না। কোথাও কি তাঁর নিজের অনুসন্ধানের সঙ্গে নীলদের কাজের সংঘাত হচ্ছে? তাই সেদিন অতটা চড়া প্রতিক্রিয়া দেখালেন?

গেস্ট হাউজ়ের ম্যানেজার মিঃ মারাক বলছিলেন, এলাকাটা কিছুটা উপদ্রুত হয়ে উঠেছে। গত বছর একজন বি ডি ওকে টেররিস্টরা কিডন্যাপ করেছিল, পরে ছেড়ে দেয়। তাই চিঠির বক্তব্যটা ফেলনা নয়। প্যাড আর হাতের লেখাটাও তাঁর চেনা ঠেকছে কারণ, টেররিস্টরা আগে এমন চিঠি দিয়ে টাকা আদায় করত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে।

কিন্তু নীল প্রোফেসর বরাকেই সন্দেহ করছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল যে, প্রফুল্ল বরা গারো পাহাড়ের বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। তেমন লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া আর তাদের ছাপা প্যাডের পাতা টাকা দিয়ে কেনা কি তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব?

ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার জন্য নীলের এত যুক্তি ও অনুরোধেও মিঃ মারাকের মন ঠিক মানতে চাইছিল না। নীল আর মার্টিন এদেশের অতিথি। তাঁদের বিপদআপদ থেকে বাঁচানো তো তাঁর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। শেষমেশ বিদেশি জেদের কাছে হার মানলেন বটে, কিন্তু সাবধান করে দিলেন বারবার।

মার্টিন নীলকে বললেন, "রবারের ছোট রাস্টিং বোটটা নাও। চলো, যদি ঢুকতে পারি গুহার ভিতরে, জলপথে অ্যাডভেঞ্চার করে আসা যাবে।" নীল উত্তর দিলেন, "সঙ্গে দড়ি, ক্ল্যাম্প আর ছোট মইটাও নিয়ো। প্রয়োজনে গুহার ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখতে একটু-আধটু রক ক্লাইম্বিংও করতে হতে পারে।"

মার্টিন জিনিসপত্র নিতে-নিতে বলল, "পথ চিনে যেতে পারব তো? যাওয়ার পথে একবার স্যামুয়েলকে দেখে যাই চলো। কেমন আছে, খবরও নেওয়া হবে। তা ছাড়া যদি ওর চেনা অন্য কোনও গাইড জোগাড় করে দিতে পারে।"

নীল আর মার্টিন বোটিং সরঞ্জাম নিয়ে রাস্তায় নামলেন। দু'জনে স্যামুয়েলের বাড়ির দিকে কিছুটা দূর যাওয়ার পর দেখলেন, স্যামুয়েল মাথায় টুপি ও গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ওঁদের দিকেই আসছে। স্যামুয়েলের সঙ্গে আসছে একজন অদ্ভুতদর্শন গাট্টাগোট্টা বামন মানুষ। তার নাক-মুখের গঠন দেখে গারো উপজাতির লোক বলেই মনে হয়। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, কপালে সাদা ফেট্টি বাঁধা, দু'কানেই গোল-গোল তামার রিং, মহিষ বা ছাগলের শিং টুকরো-টুকরো করে কেটে গলার মালা করে পরেছে। স্যামুয়েল ভাঙা গলায় বলল, "আমার বদলে ও আপনাদের গুহা অভিযানে গাইড করবে।"

নীল ও মার্টিনকে অবাক করে দিয়ে বামন লোকটা স্পষ্ট ইংরেজিতে বলল, "আমার নাম জনিক নকরেক। প্রোফেসর প্রফুল্ল বরার মুখে আপনাদের কথা শুনলাম। আপনারা নাকি নিউজ়িল্যান্ড থেকে এসেছেন?"

নীল শান্ত গলায় বললেন, "আমাদের দেশ নিউজ়িল্যান্ড, কিন্তু আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করি।"

বামন লোকটা বলল, "আপনারা নাকি প্রেতাত্মার গুহায় গিয়েছিলেন?"

নীল আগের মতোই শান্ত স্বরে বললেন, "স্যামুয়েল গতকাল আমাদের ওই আশ্চর্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। আমরা ওখানে একটা অদ্ভুত গুহাচিত্র খুঁজে পেয়েছি। ওখানে আরও অনুসন্ধান চালানো দরকার।"

জনিক নকরেক বলল, "প্রেতাত্মার গুহায় মানুষের না ঢোকাই ভাল। তবুও আপনাদের যেমন ইচ্ছে।"

বাঘমারা ওয়াইল্ড লাইফ রিসর্টের সামনে ঘাসের লনটা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। চারপাশ ঘিরে আছে ফুলের বাগান। তারই মাঝখানে ছোট পাম গাছটার পাশে ইজ়িচেয়ারে চায়ের কাপ নিয়ে বসলেন ভুবনদাদু। দিঠির খোলা আকাশের নীচে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ভুবনদাদুর কাছে ফিরে এল।

সুনৃত সামনে-পিছনে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "বনের জন্তু জানোয়ার কি গেটের এপারে চলে আসতে পারে?"

দিঠিও সুনৃতের মতো করেই চারপাশ দেখে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ। ওদের মধ্যে যারা তোর মতো বড় করে লাফ দিতে পারে, তারা তারের বেড়া টপকে ঢুকে আসতেই পারে।"

দিঠির বক্তব্য শুনে সুনৃত গম্ভীর হয়ে বলল, "তুই কী করে জানলি? তোর সঙ্গে কি লাফাতে ওস্তাদ জন্তুদের কথা হয়েছে?"

ভুবনদাদু চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, "ভেবে কিছু কূলকিনারা পাচ্ছি নারে। মনে হচ্ছে, স্যামুয়েলের একটা ফোনের ভরসায় তোদের নিয়ে এখানে চলে এসে হঠকারিতা করলাম না তো? স্যামুয়েল নিজেই তো বিছানা নিয়েছে বলছে। অন্য সময় হলে হই হই করে নিজের বাড়িতে রেখে মেতে থাকত। মাশরুমের নানা রকম পদ রান্না করে খাওয়াত। এখন এরকম অবস্থায় ওর বাড়িতে উঠতে বেশ সংকোচ হচ্ছে।"

কল্প চিন্তিত মুখে বলল, "কাছাকাছি কোনও হোটেল নেই?"

"না, একটা গেস্ট হাউজ় আছে, তবে তা সবার জন্য নয়।"

"তা হলে কী হবে ভুবনদাদু? আমাদের গারো লিপির রহস্য খোঁজা হবে না?" ভুবনদাদুর কথা শুনে দিঠি একেবারে দমে গেল।

"কাল সকালে তোদের পতঙ্গভুক গাছ দেখিয়ে একটু বেলা করে সিজু যাওয়ার জন্য বেরব। এতটা যখন এসেই গিয়েছি, একবার অন্তত স্যামুয়েলের খুঁজে পাওয়া ফলকটা না দেখে ফিরব না।"

ভুবনদাদুর আশ্বাসে ওরা তিনজন একটু নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করছিল এমন সময় একজন অদ্ভুতদর্শন বামন লোক হাসিমুখে ওদের দিকে এগিয়ে এল। লোকটার লম্বা চুল, কান, হাত ও গলার অলঙ্কারও বেশ আজব ধরনের। সে ভুবনদাদুর কাছে গিয়ে হাতে হাত মেলাল। হেঁ হেঁ করে একগাল হেসে বলল, "ওয়েলকাম ডঃ মুখার্জি। সেবার আপনার চোখ দেখেই বুঝেছিলাম আপনার চলে যেতে ভাল লাগছে না। বলেছিলাম না, আপনাকে আবার আসতে হবে। অলমোস্ট আফটার ফাইভ ইয়ার্স নাও।"

ভুবনদাদু বললেন, "হ্যাঁ, পাঁচ বছর পর আবার এলাম। তবে

এবারে আর কোনও লিপির সন্ধানে নয়। স্যামুয়েলের সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে যাব।"

বামন লোকটা একটু বিমর্ষ মুখ করে বলল, "স্যামুয়েল খুব আপসেট আছে। এমনিতে শরীর খারাপ যাচ্ছে। তার উপর ওর ভাইটা খুন হয়ে গেল।"

ভুবনদাদু জিজ্ঞেস করলেন, "কারা খুন করল?"

"ওর সাঙ্গপাঙ্গরাই মেরেছে, আবার কে? দলের ফান্ড থেকে অনেক টাকা চুরি করে পালিয়েছিল। ওর দলের লোক ওকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মাঝখান থেকে ওর জন্য ওদের অ্যাকশন সেন্টারটা চোকপোতে আর দুমারা হিল অঞ্চল থেকে আজকাল এদিকে সরে এসেছে। বিকেলে শুনলাম, দু'জন বিদেশি পর্যটক সিজু থেকে সকালে বেরিয়ে বিকেল পর্যন্ত ফেরেননি। যদিও এখনও কোনও দল অপহরণের জন্য কিছু দাবি করেনি। তবুও ভাবুন তো, আমাদের এই শান্তির জায়গাটা দিন-দিন কেমন অশান্ত হয়ে উঠছে।"

এই বলে বামন লোকটা দিঠিদের সবার দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে তো আবার ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে।"

ভুবনদাদু প্রত্যয়ের স্বরে বললেন, "এরা আমার নাতি-নাতনি। বড় অ্যাডভেঞ্চার-পাগল। এখানে এসে পাহাড়ে, জঙ্গলে, গুহায় ঘোরা হবে না শুনে মনখারাপ করে বসে আছে।"

"কেন ঘোরা হবে না? এ তো বেড়ানোরই জায়গা। টুরিস্ট স্পট। তবে কী সময়টা এখন বড্ড খারাপ যাচ্ছে। আসলে এটাই মুশকিল, সবটা তো প্রশাসনের হাতের মধ্যে থাকে না। ওই বিদেশি দু'জন। নিউজিল্যান্ডের মানুষ। গুহা অ্যাডভেঞ্চার করবে বলে সিজু এসেছিল। আজ সকালেই আমার সঙ্গে দেখা হল। অথচ বিকেলে বাঘমারায় এসে শুনলাম ওদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।"

॥ ৬ ॥

রাতে জঙ্গলের পরিবেশ আরও বন্য হয়ে উঠল। ফরেস্ট রিসর্ট থেকে তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। ওরা তিনজন ঘরের মধ্যে বসে আলো নিভিয়ে জঙ্গলকে অনুভব করার চেষ্টা করছিল। আইডিয়াটা দিঠির। আপাতত সে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখছিল উপরের অন্ধকার আকাশের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা নীচের অসংখ্য ছায়া-ছায়া গাছপালার দলকে। সুনৃতের যে অন্ধকারে বসে থাকতে ভাল লাগছিল এমন নয়। তবে কল্কা চোখ বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করছিল বনের মধ্যে থেকে আসা নানা রকম আওয়াজের মধ্যে অনেকক্ষণ পরপর আসা একটা বিশেষ ডাককে।

সুনৃত বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দিঠিকে বলল, "ঘরের মধ্যে আজগুবি আইডিয়া দেখাচ্ছিস দেখা, সেই কেরলে যেমন আইডিয়া খাটিয়েছিলি গাইডের তেমন কিছু গোলমাল করে বসিস না। যা খতরনাক জায়গা, শুনছিস তো। এই পাহাড়ে-জঙ্গলে কেউ ধরে নিয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

"কেন তুই উদ্ধার করে আনবি না? তা হলে এত ফাইটিং শিখছিস কিসের জন্য?"

দিঠির কথায় সুনৃত দমে গিয়েছে বুঝে কল্কা বলল, "গোয়েন্দা হতে গেলে ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ভাব তো কেরলে অ্যাডভেঞ্চারটা সেবার কেমন থ্রিলিং ছিল। তুই গারো উগ্রপন্থীদের ব্যাপারটা পাশে সরিয়ে রাখ। তোর কি এখানে এসে বাকি সবকিছু ঠিকঠাক মনে হচ্ছে?"

কল্কার কথায় দিঠি নড়েচড়ে বসল, "একদম ঠিক ধরেছিস। আমার তো মনে হল ওই বামন লোকটা ইচ্ছে করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। কথা বলার সময় আমি ওর চোখের দিকে ভাল করে লক্ষ করছিলাম। বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরে ভুবনদাদুকে বলল, আপনার সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে দেখছি।"

ওকের কথার মধ্যেই ভুবনদাদু ঘরে এসে সুইচবোর্ড হাতড়ে আলো জ্বাললেন। বললেন, "ঘর অন্ধকার করে বসে আছিস কেন? রহস্য অভিযানে বাধা পড়েছে বলে মনখারাপ? আজ ঘুমিয়ে পড়, কালকের দিনটায় তোদের জন্য কিছু চমক অপেক্ষা করে আছে।"

উৎসাহ পেয়ে তিনজনে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল, "ওই বামন লোকটা কে ভুবনদাদু?"

"ওর নাম জনিক নকরেক। শুনেছি ও স্থানীয় গারো নয়, বারো-তেরো বছর আগে এই অঞ্চলে এসেছে। ও গারোদের সাংসারিক ধর্ম ছাড়াও তান্ত্রিক হিন্দু ও তিব্বতি বৌদ্ধতত্ত্বের চর্চা করে। কেউ বলে ও নাকি কামাখ্যায় তন্ত্রসাধনা করে এসেছে। আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। প্রথাগত ডিগ্রি না থাকলেও ও অনেক কিছু জানে, খোঁজখবর রাখে। ওকে সবাই খুব মানে। এমনকী, বাংলাদেশের গারোরাও ওকে সম্মান করে। বাংলাদেশে ওর আশ্রম আছে। ওর শখ অনেকটা অ্যালকেমিস্টদের মতো, যেন পরশপাথর আবিষ্কার করবে। শুনেছি প্রায়শই এটা-ওটা কেমিক্যাল মিশিয়ে নানা রকম মিক্সচার তৈরি করে নোকমা ও ওখানের চমকে দেয়। তাই ওর অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে লোকে বিশ্বাস করে। আগের বার যখন এসেছিলাম তখনও ওর সঙ্গে চলতে-ফিরতে বারবার দেখা হত। দেখা হলেই নানা রকম খবর দিত। সেবার সেই ওঝা আসংয়ের নিখোঁজ হয়ে মারা যাওয়ার সংবাদও ওর মুখেই প্রথম শুনেছিলাম।"

দিঠি প্রশ্ন করল, "এখন এখানে ফরেস্ট রিসর্টে কী করছে?"

ভুবনদাদু বলল, "ওকে খুব সন্দেহজনক ব্যক্তি বলে ধরে নিয়েছিস দেখছি। জনিক নকরেকের বোধ হয় চাল, সবজি, এই সব কৃষিপণ্যের ব্যবসা আছে। এখানে রিসর্টে সাপ্লাই দেয়।"

নিজের কথা শেষ করে ভুবনদাদু বললেন, "আজ ঘুমিয়ে পড়। কাল সকাল-সকাল পতঙ্গভুক গাছ দেখাব।"

ভুবনদাদু চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই সুনৃত গায়ে চাদর জড়িয়ে নিল। দিঠি ঘরের জানলাদুটো বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ইশারায় কল্কাকে ডাকল। ফিসফিস করে বলল, "কিছু দেখতে পাচ্ছিস?"

বাগানের ঘাসের লনের উপর বিকেলে যেখানে ভুবনদাদু বসে চা খাচ্ছিলেন, সেখানে একজন উসকোখুসকো চেহারার ভদ্রলোকের সঙ্গে জনিক নকরেকের ঝামেলা চলছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে উসকোখুসকো ভদ্রলোক স্বভাবে একটু রগচটা। কারণ, জনিক নকরেক চুপ করে গেলেও তিনি চেয়ারে বসে এক নাগাড়ে চেঁচিয়ে চলেছেন।

চেঁচাতে-চেঁচাতে নিজের কোমর থেকে একটা সাদা ছোট ছুরির মতো কিছু বের করলেন। এর পর সেই ছুরিটা সামনে ধরে উত্তেজিত হয়ে কিছু বোঝাতে চাইলেন। তাঁর ধমক খেয়ে বামন লোকটা মাথা নিচু করে রিসর্টের দিকে ফিরে এল। তারপর উসকোখুসকো চেহারার লোকটা সাদা জিনিসটাকে লনের মধ্যে ফেলে দিয়ে গটগট করে হেঁটে চলে গেলেন।

কল্কা আর দিঠি জানলায় দাঁড়িয়ে কিছু দেখছে টের পেয়ে সুনৃতও জানলায় এসে মাথা গলিয়েছিল। "কী বুঝলি?" বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে দিঠি সুনৃতকে জিজ্ঞেস করল।

সুনৃত বিছানায় ফিরে গিয়ে বলল, "সিম্পল। সবজি ব্যবসায়ী বামন লোকটা শাকসবজির বস্তার সঙ্গে ছুরিটা ফ্রি দিয়েছিল। উসকোখুসকো চেহারার লোকটা রিসর্টের রান্নাঘরে কাজ করে। সবজি কাটতে গিয়ে দেখেছে ছুরিটা ভোঁতা! তাই রেগে গিয়েছে।"

"বাঘমারার এই জায়গাটার নাম দিলসা হিল," ভুবনদাদুর সঙ্গে পায়ে চলা বনপথ মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিল ওরা। কিছুটা ডান দিকে বাঁক নিয়ে খাদের কাছ ঘেঁষা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে সবাই অবাক হয়ে গেল। কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখল গাছগুলোকে। সবুজ ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে আংটার মতো অংশ, যার ডগায় গাছের পাতাগুলো পালটে গিয়ে তেরি হয়েছে ছোট-ছোট কলসির আকারের শিকার ধরার ফাঁদ। তার মাথায় ছোট্ট টুপির মতো ঢাকনা, যাতে বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত জল ভিতরে ঢুকে পড়তে না পারে। কিছু-

কিছু কলসি হলদেটে সবুজ, কিছু একটু বাদামি রং পেয়েছে। সুনৃত কয়েকটা কলসির ভিতরটা ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, "কই ভিতরে তো কোনও পোকার মুতদেহ দেখতে পাচ্ছি না।"

কল্পা বলল, "এরা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি হজম করে।"

"ঠিক ধরেছ, এদের হজমশক্তি বেশ জোরদার। এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় যে মাংসাশী গাছটা পাওয়া গিয়েছে বোর্নিওর পাহাড়ে, তাকে এই নেপেনথেস গ্রুপের রাজা বলতে পার। তার শিকার ধরার কলসি চল্লিশ সেন্টিমিটার গভীর হয় আর ভিতরে প্রায় দু' লিটার এনজাইম থাকে হজমের জন্য।"

দিঠি, কল্পা আর সুনৃত চমকে তাকিয়ে দেখল কাল রাতের সেই উসকোখুসকো চেহারার লোকটা। তবে এখন দাড়ি কামিয়ে তাঁকে বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে। সকালের রোদে জেগে উঠেছে চারপাশের অরণ্য। কাল রাতের সেই অন্ধকার ভূতুড়ে জঙ্গলের থেকে এই উপত্যকা একেবারে অন্য রকম। ভুবনদাদুর সঙ্গে যেচে আলাপ করে ভদ্রলোক বললেন, "আমি প্রোফেসর প্রফুল্ল বরা। আগে আই আই টি গুয়াহাটিতে অধ্যাপনা করতাম। এখন কেবল মনের সুখে ঘোরাঘুরি করি। অজানা গাছপালাদের খুঁজে বেড়াই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি।"

ভুবনদাদু হেসে বললেন, "বেশ তো। তা এখানে কিসের সন্ধানে?"

"রাজার সন্ধানে। সে আমায় এক ঝলক আভাস দিয়ে হারিয়ে গেল। কোথায় যে তার রাজপ্রাসাদ, খুঁজে চলেছি। মাঝে-মাঝে এখানে প্রজাদের কাছে এসে দাঁড়াই রাজার খবর জিজ্ঞেস করতে। কোনও উত্তর পাই না," বলতে-বলতে প্রোফেসর বরা সামনের খাদের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে গেলেন।

"কী বুঝলি?" ফেরার পথে দিঠি সুনৃতকে গতকাল রাতের প্রশ্নটা আবার করল।

"কিছু বুঝলাম না। এই বনে, জঙ্গলে রাজা, রাজপ্রাসাদ কোথায় পাবেন ভদ্রলোক? মেঘালয়ে তেমন কোনও রাজবংশের কথা তো পড়িনি। তবে কাল রাতের ঘটনাটা এখন অল্প-অল্প ক্লিয়ার হচ্ছে বুঝলি। প্রোফেসর বরা বড় সহজ, সরল মানুষ। বামন লোকটা ওই সাদা ছুরিটাকে কোনও প্রাচীন রাজার অ্যান্টিক জিনিস বলে প্রোফেসর বরাকে গছিয়ে দিয়েছিল। কোথায় রাজা, কোথায় কী! জালিয়াতিটা বুঝতে পেরে প্রোফেসর বরা অত রেগে গিয়েছিলেন।"

সুনৃতের জবাব শুনে দিঠি হেসে বলল, "সত্যিই তুই দিন-দিন বোকা হয়ে যাচ্ছিস। প্রোফেসর বরা মানুষ রাজার কথা বলেননি। বলছিলেন মাংসখেকো গাছেদের রাজার কথা!"

॥ ৭ ॥

বেলা এগারোটায় বাঘমারা থেকে গাড়ি ছেড়ে সিজুর দিকে এগোতে শুরু করার কিছুক্ষণ পরে দিঠি নিজের ব্যাগ থেকে একটা জিনিস বের করল। কল্পার হাতে জিনিসটা দিয়ে বলল, "চেনা লাগছে?"

"আশ্চর্য, এটা তুই কোথা থেকে পেলি?" কল্পার কথার রেশ ধরে সুনৃত আরও অবাক স্বরে বলল, "কীভাবে পেলি?"

"যেখানে প্রোফেসর বরা ছুড়ে ফেলেছিলেন, সেখান থেকেই কুড়িয়ে এনেছি।"

"কাল রাতে?"

সুনৃতের একরাশ বিস্ময়ের বেগ সামলাতে দিঠি বলল, "হ্যাঁ। তোরা ভুবনদাদুর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লি। আমি তারপর আরও কিছুক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খুব কৌতূহল হল জিনিসটা কী সেটা দেখার। প্রোফেসর বরা বা মিঃ জনিক নকরেক কাউকেই আর ফেনে ফিরে আসতে দেখিনি। তাই জিনিসটা ওখানেই পড়ে আছে ধরে নিয়ে চুপিচুপি নীচে নেমে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। এখন দেখতে পাচ্ছিস এটা কোনও ছুরি নয়। মানুষের কোনও হাড়ের মাঝখানটা ফাঁপা করে সুন্দর সাদা কৌটো বানানো হয়েছে, যার পেটের দিকটা মোটা আর মাথার দিকটা সরু।"

সুনৃত বিষয়টায় কিছু সন্দেহ করে কৌটোটা নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে রহস্যের গন্ধ শুঁকল। তারপর বলল, "কিন্তু এর ভিতরে কী ছিল?"

ভুবনদাদু ওদের আলোচনা শুনতে গাড়ির সামনে সিট থেকে ঘুরে তাকিয়েছিলেন। জিনিসটা দেখে অবাক হয়ে বললেন, "তদ্দন্ত করে একটা কী কুড়িয়ে এনেছিস দেখি।"

এই বলে কৌটোটা সুনৃতের হাত থেকে নিলেন। চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন মন দিয়ে, "ঠিক যেন মানুষের হাড়। তবে দারুণ কাজ। কিন্তু জিনিসটা কিসের?"

ভুবনদাদু আরও কিছুক্ষণ ভাল করে দেখলেন কৌটোটা। তারপর বললেন, "ক্যালসাইট, মানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ক্রিস্টাল দিয়ে বানিয়েছে জিনিসটা। তা দিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর জিনিস বানাল কী করে?"

এটুকু বলার পর দিঠি, কল্পা আর সুনৃতের চোখের অপার কৌতূহলে ডুব দিয়ে ভুবনদাদু বললেন, "যে-কোনও ডিমের সাদা শক্ত খোসাটা কল্পনা কর। ওটা ক্যালসাইট। মুরগির শরীর ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে ক্যালসাইটে পরিণত করে একটা প্রোটিনের সাহায্যে। যা দিয়ে ডিমের শক্ত খোসা তৈরি হয়। তবেই না ডিম ডিমের মতো হয়।"

ভুবনদাদুর কথা শুনে সুনৃত বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। গম্ভীর মুখে বলল, "হায়, তা হলে যে লোকে ভেবে মরে মুরগি আগে না ডিম আগে। এখন তো বুঝছি মুরগিই আগে। মুরগি না থাকলে তো ক্যালসাইট তৈরিই হত না। মানে, ডিম ডিমের মতো হতেই পারত না।"

সুনৃতের কথায় সবাই হো হো হেসে উঠল। ভুবনদাদু হাসতে-হাসতে বললেন, "তবে ক্যালসাইটের স্বচ্ছ ক্রিস্টালও হয়। এই নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিই তোদের। স্বচ্ছ ক্যালসাইট ক্রিস্টালের মধ্যে আলো দু'বার প্রতিফলিত হয়। তো ক্যালসাইটের এই ডবল রিফ্রেকশন প্রপার্টির জন্য কম্পাস আবিষ্কারের আগে কিছু-কিছু নাবিকগোষ্ঠীর মধ্যে স্বচ্ছ ক্যালসাইট ক্রিস্টালে সূর্যের আলো ফেলে সমুদ্রে দিক নির্ণয় করার অভ্যেস ছিল। অনেক আগে ডুবে যাওয়া জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে তার নমুনা পাওয়া গিয়েছে। তবে সেই পদ্ধতির সঙ্গে অবশ্যই জটিল জ্যামিতির অঙ্ক জড়িয়ে ছিল।"

দিঠি সাদা কৌটোটা ভুবনদাদুর থেকে নিজের হাতে নিয়ে বলল, "কিন্তু আমি ভাবছি এখানে এটার ভূমিকা কী? প্রোফেসর বরা এটা নিয়ে কেন রাগারাগি করছিলেন জনিক নকরেকের সঙ্গে?"

"আবার কিছু রহস্য?" ভুবনদাদু বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন।

বাঘমারার মিষ্টি রোদ্দুরটা এই সামান্য কুড়ি কিলোমিটার পার হয়েই মিইয়ে গেল। সিজুর আকাশ মেঘলাই নয়, চারপাশে ফিকে কুয়াশার চাদরও বিছানো রয়েছে।

ভুবনদাদু বললেন, "চল, প্রথমে স্যামুয়েলের বাড়িতেই যাই। ফলকে আঁকা চিনা চিত্রলিপিগুলো দেখার জন্য আর নিজেকে অপেক্ষা করাতে পারছি না।"

স্যামুয়েলের বাড়িটা একটু বিচ্ছিন্ন জায়গায়। আশপাশের লোকালয় থেকে সামান্য দূরে। বাড়ি থেকে কয়েক পা এগোলেই শুরু হয়ে যায় গাছ-গাছালির বন। স্যামুয়েলের বাড়ির সামনে একটা হেলে পড়া গাছে বসে একমনে কাঠে ঠোঁট ঠুকছিল একটা ধূসর মাথার কাঠঠোকরা। সেটা গাড়ির শব্দে উড়ে পালাল।

ভুবনদাদু গেট খুলতেই স্যামুয়েল বেরিয়ে এল গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে। কাছে এসে হেসে বলল, "আসুন, বসুন। শরীরটা বড় ভোগাচ্ছে। আপনার সঙ্গে যে একটু কথা বলব, তার জন্য দম পাচ্ছি না।"

ভুবনদাদু স্যামুয়েলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, বললেন, "ডাক্তার দেখিয়েছ?"

"হ্যাঁ, ওষুধ খাচ্ছি তো।"

ভুবনদাদুর কথার ফাঁকে দিঠি আর কল্পা স্যামুয়েলের সাজানো গোছানো বাড়িটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। সুনুত নাক ভরে হাওয়া টেনে কিছু গন্ধ শুকল। কল্পা চারপাশে অনুসন্ধানের চোখ দিয়ে খুঁজে নিতে চাইছিল পাথরের ফলকটা।

"কিছু খুঁজছ তোমরা?" ওদের কৌতূহল স্যামুয়েলের নজরে পড়ায় সে জানতে চাইল।

দিঠি লজ্জা পেয়ে বলল, "আরে না-না। আমরা তো গোয়েন্দা, তাই এমন গভীরভাবেই সবকিছুর মধ্যে রহস্যের সূত্র খুঁজে বেড়াই।"

ওদের কথায় স্যামুয়েল হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে কাশতে লাগল। তার পর হাঁপিয়ে উঠে হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে থাকল। স্যামুয়েলের কষ্ট দেখে ভুবনদাদু বললেন, "তোমার মতো ঝলমলে যুবককে অসুস্থ দেখে খারাপ লাগছে। আর এখানে যা অবস্থা শুনছি, সঙ্গে এই ছোটদের নিয়ে ভরসা পাচ্ছি না। তবে তোমার আবিষ্কার করা চিনা চিত্রলিপি আঁকা পাথরের ফলকটা দেখার আগ্রহটাও সামলাতে পারলাম না। কোথায় সেটা? দেখি তো কেমন সে গারো বর্ণমালা?"

ফলকের কথায় স্যামুয়েল চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতের কাছের টেবিলটার ড্রয়ার টেনে ভিতরটা দেখল। তারপর দ্রুত পায়ে বিছানার কাছে গিয়ে মাথার দিকের বালিশ, তোশক তুলে দেখল। টেবিলের সব কাগজপত্র সরিয়ে নীচে ফেলল। বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার ঘটিঘাঁটি করল। এর পর ফ্যালফ্যাল করে ভুবনদাদুর মুখের দিকে তাকাল।

"ফলকটা তো এখানেই রেখেছিলাম, এই ড্রয়ারে। কোথায় গেল? আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ফলকটা কি কেউ চুরি করে পালাল?"

॥ ৮ ॥

"তোদের কচি সবুজ চোখে সত্যিটা একদম ঠিকঠাক ধরা পড়েছে। এখানে বড়সড় কিছু গণ্ডগোল চলছে। চল গেস্ট হাউজে একবার রিকোয়েস্ট করে দেখি যদি থাকতে দেয়।"

রাস্তার ধারে ছোট্ট ছিমছাম গেস্ট হাউজে ওরা চারজন ঢুকতেই কেয়ারটেকার মিঃ মারাক ওয়ে পেয়ে দৌড়ে এলেন। এসে নতুন চার অতিথি দেখে কাঠ হাসি হেসে বললেন, "আসলে আমি ভাবলাম বুঝি পুলিশ এল।"

ভুবনদাদু তাঁর হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "বাযমারার ক্যাথিড্রাল চার্চের ফাদার ফিলিপ আমার চেনা, এটা তিনিই লিখেছেন।"

চিঠিটা একঝলক পড়ে নিয়ে মিঃ মারাক গদগদ হয়ে বললেন, "চিঠির দরকার ছিল না। অতিথিদের ঘর দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের একটু রেষ্ট্রিকশন আছে, কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনি গুণী মানুষ, তা ছাড়া আগেও তো এখানে এসেছেন। তবে কিনা বিগত কয়েকদিন বেশ সমস্যা যাচ্ছে। আমি তাঁদের সাবধান করেছিলাম। কে শোনে? সাহেবদের জেদ। এখন যত ঝামেলা আমার।"

মিঃ মারাক ওদের চারজনকে নিয়ে করিডর ধরে হাঁটতে-হাঁটতে বলেই চলছিলেন, "আরে বাবা, দলের জন্য ফিডেল নিজে এসে এদিক থেকে চাঁদা তুলত। ধমক দিয়ে, কাগজে লিখে কত হুমকি দিয়েছে টাকার জন্য, তার হাতের লেখা আমি চিনব না। তা সাহেব ছোকরাদুটো কিছুতেই মানবে না। বলে কিনা কোন প্রোফেসর বরার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। তিনি রাগে পড়ে ভয় দেখিয়েছেন।"

বাঁ দিকের এগারো আর বারো নম্বর ঘরের চাবি খুলে দিয়ে মিঃ মারাক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ভুবনদাদু ঘরে ঢুকে মারাককে বললেন, "ওই দুই সাহেব অভিযাত্রী ঠিক কী উদ্দেশ্যে সিজুতে এসেছিলেন, কিছু কানে এসেছিল আপনার?"

"যেদিন এসেছিলেন সেদিন বলেছিলেন কোনও ম্যাগাজিনের সাংবাদিক। গুহা নিয়ে খোঁজখবর করতে এসেছেন। তবে পরশু থেকে বারবার বলছিলেন, একটা অ্যানিম্যাল, নাম টুয়াটারা, তিনটে চোখ আছে।"

ভুবনদাদু অবাক হয়ে বললেন, "টুয়াটারা! এখানে!"

"না, মানে ঠিক টুয়াটারা নয়। ওই কথাটা একবারই শুনেছি। শব্দটা অন্য রকম বলে মনে আছে। গুহার মধ্যে তিনচোখী কিছু আছে এই নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি। বিশেষ করে নীলসাহেব এইসব আজগুবি কথা বলতেন। মার্টিনসাহেব এই নিয়ে হাসাহাসি করতেন।"

মিঃ মারাক গড়গড় করে বকে চলেছিলেন। ভুবনদাদু ব্যাগটা মেঝেতে রেখে বললেন, "এ ঘরে আর-একটা সিঙ্গল বেড ঢোকাতে হবে।"

মারাক সেসব কাজ করার সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক প্লেট সুস্বাদু মোমোর ব্যবস্থা করলেন সবার জন্য। এর পর কাতর স্বরে ভুবনদাদুকে বললেন, "সাহেবদের কাজকর্মে বিশ্বাস নেই। হয়তো দু'জন দূরের পাহাড়ে কোথাও তাঁবু ফেলে রাত কাটাচ্ছেন। সময় হলে ফিরে আসবেন, এই আশায় আছি।"

খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের পর ভুবনদাদু গুন্তের তিনজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শহর থেকে দূরে এই পাহাড়ি গ্রাম সিজু, শান্ত ও নির্জন। বনের ভিতর দিয়ে পাথুরে রাস্তা নেমে গিয়েছে সিমসাং নদীর দিকে। উঁচু-নিচু পথে হাঁটতে-হাঁটতে ভুবনদাদু বললেন, "পাঁচ বছর পরেও সব কিছুই একই রকম রয়ে গিয়েছে, এক স্যামুয়েল ছাড়া। সেদিন ও আমার সঙ্গে ছিল। এখন তোরা আমার সঙ্গে আছিস।"

হাঁটতে-হাঁটতে সুনুত জিজ্ঞেস করল, "টুয়াটারা কী ভুবনদাদু?"

"গিরগিটি মতো দেখতে একটা প্রাণী। নিউজিল্যান্ড ও আশপাশের দ্বীপগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। এদের বিশেষত্ব হল, মাথার উপরে একটা তিন নম্বর চোখ আছে। কিন্তু দুই সাহেবের অন্বেষণের গল্পে এই তিন নম্বর চোখ এসে বিষয়টা আরও জটিল করে দিচ্ছে।"

ভুবনদাদুর কথার রেশ ধরে কল্পা বলল, "বলে বোঝাতে পারব না ভুবনদাদু, কী অদ্ভুত অন্য রকম আনন্দ লাগছে। মনে হচ্ছে, বেড়াচ্ছি, বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ করে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছি। উপকথার পাতায় লেখা একটা উপজাতির হারানো বর্ণমালা। তার যতই কাছে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, সে দূরে হারিয়ে যায়। অজানা কারণে চিনা চিত্রলিপি আঁকা সাদামাঠা পাথরের ফলক চুরি হয়ে যায়। সব ঘটনা যেন চারপাশে হালকা-হালকা কুয়াশার মতো রহস্য হয়ে ভাসছে। কুয়াশার আড়ালে থাকা অদ্ভুত কয়েকটা মানুষ। মংশোশী গাছের গল্প, তিন চোখের প্রাণীর কাহিনি। সত্যি আর গল্প সবকিছু মিলেমিশে এমন জমজমাট সফরের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। মনে হচ্ছে এই আজগুবি জটিল রহস্যের যদি সমাধান নাও হয় আমাদের সামনে, এই ভেবে আনন্দটা মনে থেকে যাবে যে, এমন একটা রোমাঞ্চকর সময় কাটিয়েছিলাম সবাই মিলে।"

ভুবনদাদু কল্পার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বললেন, "সুন্দর বলেছিস। এই গারো বর্ণমালা অনুসন্ধানের গল্পটা চিরদিন মনে থেকে যাবে। তবে রহস্য সমাধানের জন্য আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। আমি একা থাকলে অন্য কথা, কিন্তু তোদের কোনও বিপদ হলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। শুধু যাওয়ার আগে অন্তত একটা জিনিস একটু জেনে যেতে চাই। সেই উদ্দেশ্যেই চলেছি এখন।"

ওরা চারজনে বনপথ পার হয়ে, পাথরকুচি মাড়িয়ে নদীর কাছে চলে এল। নদীর পাশে ভিজে বালির উপর দাঁড়িয়ে ভুবনদাদু বললেন, "এই হল গারো পাহাড়ের সিমসাং নদী। মেঘালয়ের সিজু, বাযমারা, তুরা, বলপকরম হয়ে বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলায় ঢুকেছে। বাংলাদেশে এর নাম সোমেশ্বরী।"

"ওই দ্যাখো ভুবনদাদু!"

দিঠি হাত তুলে দেখাল জনিক নকরেককে। একটা মোটরচালিত ছোট বোটে আরও কিছু যাত্রীর সঙ্গে ওপারে যাচ্ছে।

"হয়তো কোথাও কাজে যাচ্ছে।"

ভুবনদাদু নদীর পার ধরে হাঁটতে-হাঁটতে একটা পাহাড়ের ঢাল দেখিয়ে বললেন, "এদিকে আয়। এবার উৎরাই উঠতে হবে।"

পাহাড় বেয়ে ভুবনদাদুর সঙ্গে আরও কিছুটা উঠতেই ওরা তিনজন বুঝতে পারল আরও নির্জন, আরও নিস্তব্ধ কোনও পৃথিবীতে চলেছে ওরা।

কিছুটা উপরে উঠতেই দৃশ্যপট বদলে গেল। নীচের ছোট উপত্যকায় অনেক ছোট-বড় মেষ চরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা মেষ আবার পাহাড়ের গায়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। কল্কা সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসের স্বরে বলল, "ওই দ্যাখ সুনৃত, ওখানে মেষেদের ঘরবাড়ি।"

"আর এটা হল সেই গারো! ওরা আসংয়ের বাড়ি।"

সুনৃত, কল্কা আর দিঠি দেখল খাদের দিকে কিছুটা ঝোলানো একটা লম্বা কুটির। বাঁশ আর কাঠ দিয়ে বানানো কাঠামোর মাথায় ঘাস, খড় দিয়ে ছাউনি দেওয়া। বাড়ির সামনে বসে একজন বেঁটেখাট চেহারার লোক মাথা নিচু করে বিমোচ্ছিল।

ভুবনদাদু লোকটার কাছে গিয়ে বললেন, "কেমন আছ থেংসু?"

লোকটা মুখ তুলে তাকাল। ভুবনদাদুকে দেখে বাচ্চাদের মতো সরল হাসি হেসে বলল, "আপনি? এখানে? ভাল আছেন?"

"ভাল আছি। মেঘালয়ে বেড়াতে-বেড়াতে এদিকে এসে পড়লাম। তাই মনে হল সেদিনের শেষ না হওয়া কথাটা তোমাকে বলে যাই।"

থেংসু ভুবনদাদুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিল। ভুবনদাদু কিছুক্ষণ নীরব থেকে শান্ত গলায় বললেন, "তোমায় যদি এখনও মনে হয় যে আমায় গারো বর্ষমালা খোঁজায় সাহায্য করতে এসে তোমার বাবা দেবতাদের কোপে পড়েছিলেন, তা হলে আমায় ক্ষমা কোরো।"

এই কথা শুনে থেংসু ছলছল চোখে ভুবনদাদুর হাত ধরে ফেলল, এর পর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "বাবা দেবতাদের কোপে পড়েননি স্যার। সেদিন ভুল বুঝেছিলাম। আজ বুঝতে পারছি, বাবা আত্মাদের ডাকে তাদের দেশে চলে গিয়েছেন। কিছুদিন আগে আমার বন্ধু বরম্বিকে আত্মারা ডেকে নিয়ে গিয়েছে। হাড়ের কৌটোয় অমৃত পাঠিয়ে আত্মারা ডেকে নিয়ে যায়, বাদুড়ের যেখানে আত্মাদের হাতছানিতে কাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। সেখানেই ঝাঁপ দিয়েছেন আমার বাবা, আমার বন্ধু। আজ আমি বুঝতে পারি স্যার। দশ-এগারো বছর আগে আমার বুড়ো দাদুকেও এভাবে আত্মারা ডেকে নিয়েছিল।"

থেংসুর কথায় পাহাড়ের নিস্তব্ধ পরিবেশ আরও থমথমে হয়ে গেল। ভুবনদাদুকে এত গম্ভীর হয়ে যেতে আগে কখনও দেখেনি দিঠিরা। এর পর ভুবনদাদুর সঙ্গে থেংসুর যেসব কথা হল তা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি কল্কা, দিঠি আর সুনৃত। তবে কথোপকথনের মধ্যে কয়েকটা শব্দ খুব জোর দিয়ে বলছিল থেংসু। যেমন ডোবাঞ্জল, তাতারা-রাবুগা। ভুবনদাদুও ওই রকম রহস্যময় একটা শব্দ বললেন, "হেডহাঁন্টার।"

ফেরার সময় কল্কা নীচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না। কোথাও হারিয়ে গিয়েছে সেই মেষেদের দলটা।

॥ ৯ ॥

লঙ্কা আর টোম্যাটো সস দিয়ে মাছের ফ্রাইটা ভালই বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন মিঃ মারাক। সবাই তৃপ্তিতে চুপচাপ খেয়ে চলেছিল একসঙ্গে।

"তাতারা-রাবুগা কে ভুবনদাদু?", দিঠি খাওয়া থামিয়ে প্রথম প্রশ্ন করল।

"তাতারা-রাবুগা গারোদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। গারোদের উপকথায় পৃথিবী সৃষ্টির গল্পটা জানিস তো?"

ওরা তিনজনে একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, "না!"

ভুবনদাদু একঢোক জল খেয়ে বললেন, "একসময় কোথাও কিছু ছিল না। ছিল শুধু অন্ধকার। মাটি ছিল না, গাছপালা, তেমন কোনও জীবজন্তু, মানুষ, কিছুই ছিল না। চারপাশ জলমগ্ন ছিল। বলতে পারিস সেই পৃথিবী ছিল অন্ধকারে ঢাকা একটা অতল জলের দেশ। তাতারা-রাবুগা তাঁর অনুচর নস্ত্র-নপাস্ত্রকে পৃথিবী সৃষ্টি করতে পাঠালেন জলের উপর স্থল বানানোর জন্য কয়েক মুঠো বালি দিয়ে। কিন্তু জলের মধ্যে নস্ত্র-নপাস্ত্র নিজে থাকবেন কোথায়? মাকড়সার জালে ঝুলে-ঝুলে নস্ত্র-নপাস্ত্র যতবারই জলের উপর বালি ফেলেন, ততবারই সেই বালি ভেসে যায়। শেষমেশ এক গুবরে পোকা জলের তলায় চুব দিয়ে অনেক চেষ্টা করে কিছুটা মাটি তুলে এনে লিন-নস্ত্র-নপাস্ত্রকে। সেই মাটির উপর বালি ছড়িয়ে নরম টলটলে একটুখানি পৃথিবী তৈরি হল। নস্ত্র-নপাস্ত্র তাতারা-রাবুগাকে বলল যে, একে তো শুকিয়ে শক্ত করতে হবে। তাতারা-রাবুগা সূর্য, চন্দ্র সব বানিয়ে দিলেন আকাশে। এর পর নস্ত্র-নপাস্ত্র অন্য দেবতাদের নিয়ে গাছপালা, জীবজন্তু, নদী, ঝরনা দিয়ে পৃথিবীটাকে সাজাতে শুরু করলেন। সব কিছু সাজানো হয়ে গেলে পৃথিবীতে এল মানুষ।"

সবটা শোনার পর দিঠি বলল, "আর থেংসু যে বারবার বলছিল ডোবাঞ্জল, ডোবাঞ্জল। তার মানে কী ভুবনদাদু?"

"ডোবাঞ্জল হল বাদুড়ের গুহা।"

সুনৃতের গোটা ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর জটিল লাগছিল। যেন একটা গল্প থেকে আর-একটা গল্প, সেখান থেকে আর-একটা গল্পের মধ্যে ভেসে চলেছে ওরা। কোনও গল্প থেকেই গারো বর্ষমালার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। তা হলে ভুবনদাদু কী খুঁজে চলেছেন? সুনৃতের মনে হচ্ছিল তাদের অবস্থা ওই নস্ত্র-নপাস্ত্র মতো। চারপাশে অতল জল আর অন্ধকার। তার উপর মাকড়সার জালের মতো রহস্যে জড়িয়ে ঝুলে আছে তারা। এখন তাদের জন্য গুবরে পোকা হয়ে কে একটু মাটি তুলে এনে দেবে? স্যামুয়েল, ওরা থেংসু, প্রোফেসর বরা না জনিক নকরেক? না কি অন্য কেউ?

সুনৃত অনেক চিন্তাভাবনা করে, অনেক বেশি ঘেঁটে গিয়ে বলল, "কিন্তু ভুবনদাদু, দেবতা তাতারা-রাবুগা, বাদুড়ের গুহা এ সবের সঙ্গে এই রহস্যের সম্পর্ক কোথায়?"

সুনৃতের প্রশ্নে ভুবনদাদু গালে হাত রেখে চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ভাবনায় ডুবে থেকে শান্ত গলায় বললেন, "সম্পর্ক আছে তো নিশ্চয়ই। না হলে থেংসুর বাবা আসংকে মরতে হল কেন? তিনি তো গারো বর্ষমালা নিয়ে আমাকে বিশেষ একটা জিনিসের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন। কোনও গুপ্তধনের সন্ধান দিতে তো যাননি।"

"তা হলে কি এখানকার গুহা বা জঙ্গলে কোথাও গারো উগ্রপন্থীদের গুপ্তঘাঁটি আছে? বাইরের কেউ ধাবেখণা বা খোঁজাখুঁজি করলে সেই ডেরার খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে এই ভয়েই কি যারাই কাছাকাছি চলে যায় তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়?"

কল্কার প্রশ্নের উত্তরে ভুবনদাদু বললেন, "এখানে এসে যা-যা ঘটনা শুনলাম তাতে প্রথম দিকে আমারও তাই মনে হয়েছিল। গতকাল বাঘমারা ফরেস্ট রিসর্টে অনেক রাত পর্যন্ত এই কথাটাই ভেবে গিয়েছি। আমার মতো বা ওই বিদেশি গুহা অভিযাত্রীদের মতো বাইরের লোক, যারা এই এলাকা ঠিকভাবে জানে না, চেনে না, অন্য কিছু খুঁজতে এসে তারা যদি উগ্রপন্থীদের গোপন ঘাঁটির সন্ধান পেয়ে যায়, তা হলে পুলিশ বা কমব্যাট বাহিনীর জোয়ানরা তো সহজেই তা খুঁজে বের করে ফেলবে। তাই গারো উগ্রপন্থীরা ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আড়াল থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই যুক্তিটা ঠিক পোক্ত হচ্ছে না।"

বলতে-বলতে ভুবনদাদু একটু থামলেন। তিনজনের চোখের উপর একে-একে দৃষ্টি রেখে বললেন, "অতীতে গারো, কুকি, নাগা এইসব উপজাতিদের মধ্যে একটা ভয়ানক প্রথা ছিল। হেডহান্টিং। মানে শত্রুর মাথা কেটে এনে সংগ্রহ করে রেখে দেওয়া। যে যত মাথা সংগ্রহ করতে পারত সে যোদ্ধা হিসেবে তত বেশি সম্মান পেত। পরে ইংরেজ আমলে আস্তে-আস্তে এই হেডহান্টিং ট্র্যাডিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে জ্যান্ত মাথার বদলে মরার মাথার খুলি সংগ্রহ করার সংস্কার

সম্ভবত তারপরেও এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে অল্পস্বল্প রয়ে গিয়েছিল। থেংসুর এক পূর্বপুরুষ বিখ্যাত হেডহান্টার ছিলেন। তিনি নিজেকে বলতেন সালজং বা সূর্যদেবতা। তবে থেংসু বা ওর বাবা আসং শুনেছে তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম। তিনি ঘর ছেড়ে আদিমমানুষের মতো গুহায় থাকতেন। তিনি সারা গারো পাহাড় পরিভ্রমণ করে অনেক মহান মানুষের মাথার খুলি সংগ্রহ করেছিলেন। যাতে ওইসব মহান মানুষের আত্মা তাঁর সঙ্গে রয়ে যায়। এই আত্মারা খুব আগ্রাসী ও অশান্ত। বাদুড়রা তাঁদের জন্য গারো পাহাড়ের নানান খবর বয়ে নিয়ে যায়। আর খবর শুনিয়েই ঝাঁপ দেয় মৃত্যুর অন্ধকারে। এই আত্মাদের ডাকেই থেংসুর বন্ধু, বাবা, দাদু সবাই সুইসাইড করেছে বলে থেংসুর ধারণা।"

সুনৃতের এই গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। তবু সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এই ভেবে যে, আবার একটা গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ল রহস্যটা। সুনৃতের মনের কথাটা বোধ হয় ভুবনদাদু পড়ে ফেললেন। সুনৃতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "দ্যাখ এই নির্জন মেঘপাহাড়, গোপন গুহা, বনজঙ্গল, পাহাড়ি নদী সবাই যে নানা রকম আজব গল্প বলার জন্যই আমাদের ডেকে আনে। তাই তো এত টান এদের। যার জন্য দৌড়ে চলে আসতে ইচ্ছে হয় শহর ছেড়ে। তবে সব গল্পগুলোই কোনও একটা বিন্দুতে এসে ঠিক মিলে যায়। এবারে আমরা সেই বিন্দুতে পৌঁছতে পারি কিনা সেটাই দেখার। কাল সকাল-সকাল একবার স্যামুয়েলের কাছে যেতে হবে। ও চিত্রলিপি আঁকা পাথরের স্লেটটা যেখানে পেয়েছিল সেই জায়গাটা একবার দেখা দরকার।"

দিঠি বলল, "তুমি গারো লিপির মতো যে পাঁচটা চিহ্ন পেয়েছিলে সেগুলোর ফোটো একবার দেখাবে দাদু?"

ভুবনদাদু কপাল চাপড়ে জিভ কেটে বললেন, "এই রে, তোদের আসল জিনিসটাই দেখাতে ভুলে গিয়েছি নাকি?"

এর পর তিনি মোবাইলের পিকচার গ্যালারি থেকে ফোটোগুলো একটা-একটা করে দেখাতে-দেখাতে বললেন, "ছবি থেকে ছবি তুলে মোবাইলে নেওয়া আছে, তবুও বুঝতে পারবি। এই যে দেখছিস গাছের লম্বা পাতার মতো চিহ্ন, এর মানে চোখ। এই দু'মুখো ত্রিশূল চিহ্নটা হল গাছের। এই বুড়ো আঙুলের মতো ছবিটার মানে মাছ। মুখোমুখি আঁকা দুটো পতাকা মানে বাড়ির দরজা। আর এই পাঁচ নম্বরটা ছবিটা যে কীসের চিহ্ন ঠিক উদ্ধার করতে পারিনি।"

কল্পা, দিঠি আর সুনৃত পরপর ভুবনদাদুর মোবাইলটা হাতে নিয়ে একবার করে দেখল ফোটোটা। ডিমের মতো গোলাকার রেখার পেট বরাবর আড়াআড়ি একটা দাগ। সুনৃত বলল, "এ অবশ্যই ডিমের চিহ্ন। একবারে গোটা ডিমটা মুখে না পুরে ভাগ করে দু'বারে খেতে বলেছে।"

সুনৃতের আন্দাজে ভুবনদাদু আর কল্পা হেসে ফেলল। দিঠি বলল, "মাথায় গোবর না থাকলে এমন অসাধ্য জিনিস কল্পনা করা কারও ক্ষমতায় কুলোবে না," বলতে-বলতে দিঠি থমকে গেল। বিড়বিড় করে বলল, "গোবর... গুবরে পোকা।"

ভুবনদাদু চমকে উঠে বললেন, "কী বললি? গুবরে পোকা?"

কিন্তু ভুবনদাদুর বিস্ময় জমাট বাঁধার আগেই গেস্ট হাউজের রিসেপশনে একটা গোলযোগ শোনা গেল। পুলিশ এসেছে। নীল আর মার্টিনের ঘর থেকে আর কিছু তথ্য পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে। ওরা চারজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। পুলিশের সঙ্গে মিঃ মারাকের কথাবার্তা চলছে। নীল ওয়াগনার আর মার্টিন মুনরোর এখনও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ভুবনদাদু মিঃ মারাকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সিজু পুলিশ আউটপোস্টের অফিসার বলছিলেন, "একমাত্র সিজু গুহায় কিছুটা খোঁজাখুঁজি করতে আমরা লোক নামাতে পেরেছিলাম। যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে কোথাও মিথেন গ্যাস চেম্বারে ঢুকে মারা গিয়ে থাকেন। কিন্তু সিজু গুহায় ওদের ঢোকার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রোফেশনাল অভিযাত্রী, নিজেদের নিরাপত্তা জলে দিয়ে গুহায় ঢোকার ভুল করবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। কোনও উগ্রপন্থী দল

অপহরণ করেছে এমন কোনও আভাসও পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ ও কমব্যাট বাহিনী পাহাড়ে, জঙ্গলে তল্লাশি চালাচ্ছে উগ্রপন্থীদের খোঁজে।"

মিঃ মারাক হুমকি চিঠিটা নিয়ে পুলিশকে হাটমাউ করে একটানা বলে চলেছিলেন। তিনি কতবার সাবধান করেছিলেন, ফিরে যেতে বলেছিলেন এইসব। পুলিশ অফিসার বললেন, "চিঠিটা যে ফিডেল সাংমার লেখা সন্দেহ নেই। হাতের লেখা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তবে ফান্ড চুরি করে পালানোর পর থেকে দলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল না। দলের লোকের কাছেই ও মোস্ট ওয়ান্টেড হয়ে গিয়েছিল। তবে ওকে খুন করা হয়নি।"

ভুবনদাদু পুলিশ অফিসার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ফিডেল মরল কী করে?"

"ফুড পয়জ়নিং। বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে ফেলেছিল। দলের লোকের তাড়া খেয়ে জঙ্গলে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। মনে হয়, কোন মাশরুমটা খাবার আর কোনটা বিষ চিনতে পারেনি।"

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক এটুকু তথ্য দেওয়ার পর ভুবনদাদু ও দিটিদের তিনজনকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে মিঃ মারাককে বললেন, "এই পরিস্থিতিতে এখানে টুরিস্ট না থাকাই ভাল। চিঠিটা সত্যি-মিথ্যে যাই হোক না কেন, বিদেশি মানুষদুটোকে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা কিন্তু বাস্তব ঘটনা।"

মিঃ মারাকের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ভুবনদাদু আশ্বাস দিয়ে বললেন, "সব ঠিকঠাক থাকলে আমরা আগামিকাল দুপুরেই চলে যাব।"

॥ ১০ ॥

ঘন রাত পার হয়ে বোধ হয় ভোর হতে চলল। গারো পাহাড়ের আকাশে আবখাওয়া চাঁদটা এখনও ফুটে আছে। খোলা আকাশের নীচে বসে থেংসু উদাস চোখে চাঁদের দিকে চেয়ে দেখল একবার। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। থেংসু সামনে আগুন জ্বেলে নিজেকে গরম রাখার চেষ্টা করছিল। আজ সারারাত জেগে বসে আপন মনে বিড়বিড় করে বকে চলেছে সে। এছাড়া এই নির্জনে একা-একা সে করবেই বা কী? ঘরের মধ্যে গিয়ে একটু শুলেই কারা যেন গুজগুজ, ফুসফুস করছে। ফাঁকা ঘরের ফাঁকফোকর দিয়ে হাওয়া ঢুকে বিচিত্র সব শব্দ তুলছে। থেংসুর মনে হচ্ছিল আত্মারা যেন তাকে কিছু বলতে চাইছে। সে যে এই বংশের শেষজন। বন্ধু বরঙ্গির মতো, দাদুর মতো, বাবার মতো তাকেও আত্মারা নিজেদের দেশে ডেকে নেবে। বংশের এক বিদ্বান পূর্বপুরুষ গারো পাহাড়ের সেইসব আত্মাকে নিজের দলে ডেকে নিয়েছিলেন, যারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ভগবানের চিহ্নগুলোকে চেনে। যেসব চিহ্ন দিয়ে ভগবান মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন।

থেংসু এতদিন কথাগুলো কাউকে বলেনি। বাবা বলতে বারণ করেছিল। তাই শুধু তিন চোখের জন্তুর অলৌকিক গল্প শুনিয়েছে সবাইকে। কিন্তু এখন যখন আত্মাদের ডাক সে শুনতে পাচ্ছে, তখন আর গোপনীয়তা কিসের? এই গল্পটাও তো তার সঙ্গে-সঙ্গে হারিয়ে যাবে। তার চেয়ে অন্তত বরং এই ভাল। ওই ভুবনস্যারকে গোপন গল্পগুলো বলতে পেরে নিজেকে বেশ হালকা লাগছে থেংসুর। মানুষটা এই গারো পাহাড়ে ছুটে এসেছেন শুধু বিদ্যার নেশায়। হয়তো প্রত্যেকটা জ্ঞানী মানুষই পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ভগবানের চিহ্নগুলোই খোঁজেন। কিন্তু তা কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? মহান আত্মাদের দেশের খবর কি কেউ জানতে পারে? তবে খোঁজার গল্পগুলো থেকে যায়। ভুবনস্যারও নিজের এই খোঁজার অভিজ্ঞতা যদি বইয়ে লেখেন, তাতে থেকে যাবে থেংসুদের পরিবারের কিছু আজব কথা। লোকে পড়ে অবাক হবে।

বাদুড়রা কোনও আত্মাদের জন্য খবর খুঁজে বেড়ায় গারো পাহাড়ে উড়ে-উড়ে। আত্মাদের পোষা তিন চোখের জন্তু মুখের মধ্যে ঝাঁপ দেয়। এই অলৌকিক গল্পটাও কি থেংসুর পরিবারের কেউ জন্ম দিয়েছিল? নাকি সেই গুহামানব, যে কিনা সারা গারো পাহাড় ঘুরে ভগবানের ছড়িয়ে দেওয়া চিহ্ন খুঁজেছিল?

থেংসুর আচমকা মনে হল কয়েকটা বাদুড় যেন পাশ দিয়ে উড়ে গেল খাদের দিকে। তা হলে কি আজ ভোরেই আত্মাদের দূত আসবে হাড়ের কৌটো ভরে অমৃত নিয়ে? সেবার বরঙ্গির বাগান থেকে পাওয়া কৌটোটা সে হারিয়ে ফেলেছিল। নাকি আত্মারাই সেটা সরিয়ে নিয়েছিল থেংসু নিজে ভগবানের রেখে যাওয়া একটাও চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারেনি বলে?

এতক্ষণে ভুবনস্যারের কাছে গোপন গল্প বলে ফেলার আসল কারণটা থেংসুর মাথায় গজগজ করে উঠল। যদি ভুবনস্যার ভগবানের কোনও চিহ্ন খুঁজে পেতে সাহায্য করেন। না হলে তো থেংসু নিজে মহান আত্মা হতে পারবে না। বাবাও হয়তো এই কারণেই জিনিসটা দেখাতে রাজি হয়েছিলেন ভুবনস্যারকে। কিন্তু তার আগেই বাবাকে আত্মারা ডেকে নেয়।

ভুবনস্যারকে জিনিসটা দেখাতে হবে। তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন ভগবানের চিহ্নগুলো কেমন দেখতে হয়। এছাড়া ভুবনস্যারকে একটা জরুরি কথা বলতে ভুলে গিয়েছে সে। সেটা তাঁকে জানানো দরকার।

ভোরের প্রথম আলোয় থেংসু এবার দেখতে পেল দূরের দুই পাহাড়ের ফাঁকে ঘন জঙ্গলের উপর একটা লম্বা সরু মেঘ নিজেকে বেঁকিয়ে অনেকটা চাঁদের আকার নিয়েছে। কয়েকটা বাদুড় গুহায় ফিরে যেতে-যেতে হঠাৎ নেমে সেই মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে দিটি বিছানায় আর-একটু গড়িয়ে নিল। চুপ করে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে বসে একটা কাগজের উপর ফুল আঁকল। ব্যাগ থেকে ক্যালসাইটের কৌটোটা বের করে ফুলের ছবিটার উপর রাখল। কিন্তু কৌটোটা স্বচ্ছ নয় বলে উপর থেকে কিছুই দেখা গেল না। নিজের এক্সপেরিমেন্টে ব্যর্থ হওয়ার পর দিটি কৌটোটাকে চোখের সামনে এনে ভাল করে দেখল। এর মধ্যে কিছু ক্রু লুকিয়ে আছে? এর পেটের কাছটা মোটা, মাথাটা সরু। এমন গঠন যেন চেনা-চেনা লাগছে। কোনও বিশেষ চিহ্ন? গুবরে পোকা? দিটি সূত্র খুঁজে পাওয়ার আনন্দে দৌড়ে পাশের ঘরে এসে দেখল সুনৃত হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। কল্কা চাদর চাপা দিয়ে গুটিয়ে শুয়ে আছে। ভুবনদাদু নেই। দিটি কল্কার চাদরটা ঝটকা মেরে টেনে খুলে দিতেই কল্কা চোখ কচলাতে লাগল।

"ভুবনদাদু কোথায়?"

"জানি না তো," দিঠির প্রশ্নে কল্কার হাই উঠে গেল।

দিটি চোখ পিটপিট করে বলল, "তোরা এই রকম গোয়েন্দা হয়েছিস? একজন মানুষ পাশ থেকে উঠে চলে গেল টের পেলি না?"

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে গোঁ গোঁ করে আওয়াজ তুলে সুনৃত কেঁপে উঠল। যেন কোনও ভয়ানক স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে। দিটি টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল নিয়ে সুনৃতের চোখেমুখে ছিটিয়ে দিয়ে বলল, "বোঝো একবার মার্শাল আর্টিস্টের অবস্থা! দিনের বেলায় ভূতের ভয়ে গোঁ গোঁ করছে।"

সুনৃত ঘুম চোখে বেজার মুখে বলল, "ভূতের ভয় পাচ্ছি কে বলল তোকে? আমার স্বপ্নটা কি তুই বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছিস নাকি?"

দিটি সুনৃতের পাশের জানলা খুলে দিয়ে ঘরটা আরও আলো করে দিল। তারপর জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে রইল। এর পর সুনৃতের সঙ্গে ঝামেলা ভুলে কল্কাকে বলল, "কল্কা, এদিকে আয় একবার।"

কল্কা জানলায় গিয়ে দেখল প্রোফেসর বরা একটা মরা বাদুড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে গভীরভাবে কিছু দেখছেন।

দিটি কল্কার সঙ্গে চটপট বাইরে বেরতে-বেরতে "ভয় পেয়ো না!"

বলে সুনৃতের পিঠ ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। এর পর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেস্ট হাউজের বাইরে চলে এল। প্রোফেসর বরা দিঠি আর কল্পাকে সামনে দেখে সৌজন্যের হাসি হাসলেন। বললেন, "সব ব্যাপারে তোমাদের ছোটদের এই কৌতূহল আমার খুব ভাল লাগে।"

দিঠি পালটা সৌজন্যের হাসি দিয়ে প্রশংসাটা গ্রহণ করে বলল, "কী হয়েছে বাদুড়টার?"

প্রোফেসর বরা বললেন, "তা তো জানি না। আসলে আমার রাজা, খায় বাদুড় তাজা। রাজাকে তো খুঁজে পাচ্ছি না। তাই রাজার খাবারটাকে ভাল করে দেখছিলাম।"

দিঠি আর কল্পার পিছন-পিছন সুনৃত হাজির হয়েছিল। স্বপ্নের মধ্যে ভয় পাওয়ার ধাক্কাটা সে তখনও সামলে উঠতে পারেনি। তবু সুনৃত প্রোফেসর বরার কথাটা এবারে বুঝতে ভুল করেনি প্রমাণ দিতে বলে উঠল, "তার মনে বাদুড় খায় এমন পিচার প্ল্যান্ট!"

দিঠি প্রোফেসর বরাকে পরীক্ষা করতে বলল, "আপনার একটা জিনিস আমার কাছে রয়ে গিয়েছে। নিয়ে আসব?"

"আমার জিনিস, তোমাদের কাছে?"

দিঠি জবাবের অপেক্ষা না করেই ঘরের দিকে দৌড় দিয়েছিল। সে পেটমোটা সাদা কৌটোটা এনে প্রোফেসর বরার দিকে বাড়িয়ে বলল, "এটা বাথমারার ফরেস্ট রিসর্টে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।"

প্রোফেসর বরা মুখটা গম্ভীর করে বললেন, "এটা আমার কী করে বুঝলে?"

দিঠি আসল ঘটনার কিছুটা লুকিয়ে কিছুটা প্রকাশ করে বলল, "রাত্রে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে শেষ ব্যক্তি হিসেবে আপনাকেই রিসর্টের সামনের লনে দেখেছিলাম। সকালে জিনিসটা কুড়িয়ে পাওয়ার পর মনে হল এটা আপনার হতে পারে।"

প্রোফেসর বরা কয়েক মুহূর্ত আনমনা থেকে বললেন, "এটা আমার নয়। আমিও এটা এই রকম খোলা অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সেদিন ঘরে ফেরার পথে। যেদিন ঝরনার ধারে এক পলকের জন্য রাজার দেখা পেয়েছিলাম। এটা কী জান?"

"ক্যালসাইট।"

"ইন্টেলিজেন্ট গার্ল," প্রোফেসর বরা দিঠির জবাব শুনে অবাক হয়ে বললেন, "অনেক কিছু জান তোমরা। তবে এটা ক্যালসাইট ঠিকই, কিন্তু মানুষের হাড় থেকে তৈরি করা ক্যালসাইট ক্রিস্টাল। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ম্যাজিক লিকুইড ভরে ওই সহজ সরল গারো ওঝাদের কেউ খেতে দিয়েছিল। আমার ধারণা, কাজটা ওই সেয়ানা অ্যালকেমিস্ট জনিক নকরেকের। মানুষকে গিনিপিগ মনে করার স্বভাব ওর পুরোদস্তুর আছে। আমি সরল মানুষদের মধ্যে আজোবাজে কুসংস্কার ছড়ানো একদম পছন্দ করি না। তাই খুব রেগে গিয়েছিলাম জনিক নকরেকের উপর।"

এর পর প্রোফেসর বরা জিনিসটা ফেলে দিতে উদ্যত হয়ে বললেন, "এটা আমার দরকার নেই। তোমরাও রেখো না। নোংরা হাড়গোড় দিয়ে বানানো। সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে নিও," বলতে-বলতে হঠাৎ করে প্রোফেসর বরা থেমে গেলেন। কৌটোটা ফেলে না দিয়ে হাতে ধরে কিছু ভাবলেন। তারপর সেটা সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে সিমসাং নদীর দিকে পা বাড়ালেন। চলে যেতে-যেতে একবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে ওদের হাত নেড়ে টা টা করলেন। দিঠির মনে হল, সেই বিদায়ের সঙ্গে কোথাও যেন একটা রহস্যময় হাসি মিশে রইল।

॥ ১১ ॥

সুনৃত মরা বাদুড়টার দিকে বড়-বড় চোখ করে চেয়েছিল। দিঠি সেটা লক্ষ করে বলল, "কী, রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের স্বপ্ন ছিল তো?"

"নারে," সুনৃত গেস্ট হাউজের দিকে পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "দেখলাম একটা দমবন্ধকর বাদুড়ের গুহায় আমরা হারিয়ে গিয়েছি। গুহা থেকে বেরতে পারছি না কিছুতেই। আর সেখানে থাকতে-থাকতে আমরাও বাদুড় হয়ে যাচ্ছি।"

"আর রাক্ষুসে মাংসাশী গাছ নেপেনথেস রাজা আমাদের ধরে খাচ্ছে!" কল্পার কথায় সুনৃত নিস্তেজ গলায় বলল, "না অতটা দেখিনি। তার আগেই দিঠি জানিয়ে দিল। তবে এখানে দাঁড়িয়ে ওই পরিণতিটা কল্পনা করে নেওয়াই যায়।"

দিঠি দু'জনকেই তাড়া দিয়ে বলল, "এখন কী করবি? চোখ-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিবি? ভুবনদাদু তো মনে হচ্ছে স্যামুয়েলের কাছে গিয়েছেন।"

"তা হলে চল রেডি থাকি। ভুবনদাদু ফিরলে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব।"

ওদের সেই রেডি হওয়ার সময়টুকু পার হতে না-হতেই গেস্ট হাউজের বাইরে স্যামুয়েলের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

"তোমরা আমার সঙ্গে শিগগির এসো, ভুবনস্যারের বড় বিপদ!"

স্যামুয়েলের কথায় তিনজনে একসঙ্গে আঁতকে উঠল, "কী হয়েছে ভুবনদাদুর?"

"উনি গারো বর্ণমালা খুঁজতে একটা অন্ধকার গভীর গুহার মধ্যে ঢুকেছেন। ওই দমবন্ধকর গুহায় ঢুকতে এখানে সবাই ভয় পায়। লোকে বলে ওই গুহার মধ্যে প্রেতাত্মারা থাকে। আমি অনেক করে বারণ করলাম আমার কথা কিছুতেই শুনলেন না। তাই তোমাদের কাছে ছুটে এলাম, যদি তোমাদের কথায় ফিরে আসেন।"

"কিন্তু সত্যিই কি এই গুহার মধ্যে তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব?" এই প্রশ্ন মুখে নিয়ে তিনজনে আর এক মুহূর্তও চিন্তা না করে স্যামুয়েলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। প্রায় ছোটার মতো করে হাঁটতে-হাঁটতে অল্প কিছুক্ষণ পরেই সিমসাং নদীর কাছাকাছি জঙ্গলে চলে এল ওরা। স্যামুয়েল একটু সামনে ঝুঁকে হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে হাঁটছিল। ওরা তিনজন হাত ধরাধরি করে ছুটতে গিয়ে কখনও স্যামুয়েলের পিছন-পিছন, কখনও স্যামুয়েলের সামনে চলে যাচ্ছিল।

পা চালাতে-চালাতে দিঠি জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু হঠাৎ করে ভুবনদাদু কী এমন পেল, যাতে আমাদের কাউকে কিছু না বলে একা-একা অভিযানে বেরিয়ে পড়ল? তার মানে আপনার আবিষ্কার করা সেই চিনা-চিত্রলিপি আঁকা পাথরটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে?"

দিঠির প্রশ্নের জবাবে স্যামুয়েল বলল, "আমার তো তাই মনে হয়।"

কল্পা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "মনে হয় মানে? আপনি জানেন না? ভুবনদাদু তো আপনার বাড়িতেই গিয়েছিল।"

"না, আমার বাড়িতে তো আসেননি। উনি তো বেরলেন প্রোফেসর বরার সঙ্গে। রাস্তায় দেখলাম দু'জনে আলোচনা করছেন প্রেতাত্মার গুহায় ঢুকবেন বলে। আমি কাছে গিয়ে বারণ করলাম। বললাম, ওই গুহায় কেউ কখনও ঢোকে না। প্রোফেসর বরা আমার কথা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিলেন। আমার কথা বিশ্বাস করো, ওই গুহায় জীবিত মানুষদের ঢুকতে নেই!"

সুনৃত বিভ্রান্ত হয়ে বলল, "আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। প্রোফেসর বরা কেন ভুবনদাদুকে নিয়ে গুহায় যাবেন?"

স্যামুয়েল গম্ভীর মুখে বলল, "আমার তো মনে হয় পাথরের ফলকটা প্রোফেসর প্রফুল্ল বরার কাছে আছে। প্রথম দিকে গারো পাহাড়ে এসে তিনি আমাকেই গাইড নিতেন। এখন অনেক কিছু চিনে গিয়েছেন, আমাকে আর দরকার পড়ে না। আমি অসুস্থ শুনে দেখতে এসেছিলেন। সেই সময় কখন আমার অন্যমনস্ক থাকার সুযোগ নিয়ে জিনিসটা সরিয়ে নিয়েছেন।"

স্যামুয়েলের কথায় দিঠি, কল্পা আর সুনৃত হতবাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

"প্রোফেসর বরার সব ইন্টারেস্ট তো গাছপালা নিয়ে। তিনি গারো বর্ণমালার ব্যাপারে কেন মাথা ঘামাবেন?"

কল্পের কথার রেশ ধরে দিঠি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি প্রোফেসর বরাকে বলেছিলেন যে, আপনি এই রকম কোনও লিপি খুঁজে পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। আমি ওই পাথরের স্লেটটা খুঁজে পেয়ে আনন্দে কিছু পরিচিত লোকজনকে বলে বেড়িয়েছি।"

সুনৃত বলল, "কিন্তু পাথরের উপর লেখা ছবিগুলো যে গারো উপজাতির হারানো বর্ণমালা তা তো প্রমাণিত নয়।"

"তার জন্যই তো ভুবনস্যারের মতো পুরাতাত্ত্বিকের মতামত দরকার।"

"প্রোফেসর বরা... না ভাবতে পারছি না। তাঁর ওই পাথরটা চুরি করার কোনও কারণ দেখছি না।"

"প্রোফেসর বরা চুরি করেছিলেন এটা না মানতে পারারও কোনও কারণ নেই। ঘটনা তো সেই দিকেই গড়াচ্ছে," দিঠিকে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো করে স্যামুয়েল বলল, "ওই প্রাচীন পাথরের স্লেটে বেশ কিছু পাতা, ফুলের ছবিও আঁকা ছিল। সেগুলো তাঁর চোখে খুব মূল্যবান বলে ধরা পড়েছে হয়তো। তা ছাড়া..."

দিঠি নিজের সন্দেহ থেকে বাইরে আসতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "তা ছাড়া কী?"

স্যামুয়েলের মুখ দেখে মনে হল সে এই উপর্যুপরি জেরায় বিরক্ত হয়ে ভাবছে, এই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো বড় বেশি প্রশ্ন করে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "প্রোফেসর বরার হালচাল মোটেই সহজ নয়। ভাল চাকরি ছেড়ে পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুধু গাছপালা আবিষ্কারের জন্য। এটা মানতে কষ্ট হয়। আমার তো ধারণা, উত্তর-পূর্বের কিছু জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।"

দিঠিরা স্যামুয়েলের সঙ্গে সিমসাং নদীর পাশ দিয়ে নীচের উপত্যকার দিকে হাঁটছিল। নদীর জলে অল্প কয়েকজন লোক স্নান করছে। একজন বাবা তাঁর ছোট্ট বাচ্চাটাকে পিঠে বেঁধে নদী থেকে মগে জল তুলে-তুলে আট-দশ বছরের একটা ছেলের মাথায় ঢেলে দিচ্ছেন। প্রতিবার মাথায় জল ঢালার সময় পিঠে বাঁধা বাচ্চাটা খিলখিল করে হেসে উঠছে।

কল্প সেদিকে চোখ রেখে বলল, "সবটাই কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে। ভুবনদাদুর আর প্রোফেসর বরা দু'জন সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ের ..."

কল্পকে কথা শেষ করতে না দিয়ে স্যামুয়েল রাগত স্বরে বলল, "তোমরা তান্ত্রিক জনিক নকরেকের নাম শুনেছ? বাংলায় পিশাচসিদ্ধ না কী যেন বলে, তিনি তাই। প্রেতাত্মাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। ওই গুহায় তিনি ঢুকেছেন। তিনি বলেন, ওটা পাতালের পথ। গারোরা মনে করে পাতালে অনেক ধনরত্ন আছে। তোমাদের কুবেরের মতো একজন দেবতা সেইসব ধনরত্ন পাহারা দেন। আমার মনে হয় প্রোফেসর বরা পাথরের ফলকে গুপ্তধনের সংকেত পেয়ে ভুবনস্যারকে ধরেছেন খুঁজে দেওয়ার জন্য। গারোদের হারানো বর্ণমালা শুধু ভুবনস্যারকে ভোলানোর ছল মাত্র।"

কিছুক্ষণ পরে ওরা বাঁকাচোরা পাথুরে পথ বেয়ে একটা গুহামুখের সামনে এসে হাজির হল। মাথার উপর থেকে জটার মতো অনেক লতাগুল্ম ঝুলে পড়ে গুহামুখের কিছুটা ঢেকে রেখেছে। ছোট-ছোট স্যাঁতস্যাঁতে পাথর মাড়িয়ে ওরা এগিয়ে গেল। দু'পাশে খুদে-খুদে ঘাসফুল হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। যেন মাথা নেড়ে ওদের গুহার দিকে এগিয়ে যেতে বারণ করছে।

সুনৃত গুহার মুখে এসেই চিৎকার করে ডাকল, "ভুবনদাদু! ভুবনদাদু!"

"ভুবনস্যার এতক্ষণে অনেকটা ভিতরে ঢুকে গিয়েছেন," স্যামুয়েল কঠিন গলায় বলল, "দ্যাখো, প্রোফেসর বরা যদি জেদ ধরেন তবুও আমরা ভুবনস্যারকে জোর করে ফিরিয়ে আনব। প্রেতাত্মার গুহার মানুষকে ঢুকতে নেই।"

গুহামুখটা বেশ সংকীর্ণ। মাথা নিচু করে ঢুকতে হল ওদের। স্যামুয়েলকে বেঁটেই বলা যায়। সে মাথাটা উঁচু করে যাওয়ার ভয়ে কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে পিছন-পিছন ঢুকল। গুহায় ঢুকেই ওরা টের পেল গুহার মধ্যে কত তাড়াতাড়ি আলো শেষ হয়ে অন্ধকার শুরু হয়ে যেতে পারে। স্যামুয়েল গুহার দেওয়ালে টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠল ওরা তিনজন। কী অদ্ভুত একটা গুহাচিত্র। কুমিরের নাকে হাতির শুঁড় লাগিয়ে একটা আজব জন্তু আঁকা হয়েছে। আশপাশে কিছু মানুষের মুখ আঁকা। স্যামুয়েল আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখো এগুলো প্রেতাত্মাদের মুখ। আর এই বিকট জন্তুটা পাতালের পাহারাদার।"

একথা শুনে সুনৃতের গলা শুকিয়ে গেল, "ভুবনদাদু এত ছোট গুহায় ঢুকলেন কী করে? আমার তো এর সামনে দাঁড়িয়েই দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় লাগছে।"

দিঠি আর কল্প অবাক চোখে গুহাচিত্রটার দিকে তাকিয়েছিল। মাথার উপর আর-একটা চোখ আঁকা এই প্রাণীটার। এই গুহায় সন্ধান পেয়েই কি ওই দুই বিদেশি নীল আর মার্টিন অলৌকিক একটা অভিযানের কল্পনা করেছিলেন?

কল্প ফিসফিস করে বলল, "টুয়াটারা?"

এবার স্যামুয়েল চেঁচিয়ে ডাকল, "ভুবনস্যার।"

গুহার মধ্যে গমগমে একটা প্রতিধ্বনি উঠল সেই ডাকের। গুহার ভিতরে কিছুটা পথ কাঁকর আর চটচটে কাদা। এর পর পায়ের পাতা ডোবানো জল। স্যামুয়েল বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল, "টর্চটা ধরো। আর পারছি না। শরীর দুর্বল লাগছে। মনে হচ্ছে যেন দম আটকে যাবে। আত্মাদের নিশ্বাসে চারপাশের বাতাস ভারী হয়ে আছে।"

"কিন্তু ভুবনদাদুকে তো এখান থেকে বের করে আনা দরকার।" সুনৃত আবার চিৎকার করে ডাকল, "ভুবনদাদু!"

স্যামুয়েলকে পিছনে রেখে ওরা তিনজন আরও কিছুটা সামনে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখতে পেল নদীপথটা। গুহার নীচে একটা অগভীর খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে জলের স্রোত। ওরা সামনে ঝুঁকে সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

কল্প কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ভুবনদাদু বয়স্ক মানুষ, এমন দুর্গম পথে কোথায় গেল?"

"জাহান্নমে!"

"আহ, আহ!" দিঠি, কল্প আর সুনৃতের মধ্যে দু'জন বোধ হয় একই রকম আর্তনাদ করে উঠল। গুহার ভিতরে খাদের মধ্যে নদীর জলে ঝপাং করে আওয়াজ উঠল তিনটে ভারী জিনিস পড়ার।

॥ ১২ ॥

শালগাছের ফাঁক বেয়ে সূর্যের রশ্মি আশীর্বাদের মতো ছড়িয়ে পড়েছে পবিত্র বনে বিছিয়ে থাকা শুকনো পাতা আর পাথরগুলোর উপরে। খেংসু হতাশ হয়ে পাথরের উপর বসেছিল। সকাল থেকে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত। সে ভুবনদাদুকে যে জিনিসটা দেখাবে বলে ডেকে এনেছিল, তা দেখাতে পারেনি। ভুবনদাদু পাশে বসে খুব মন দিয়ে দেখছিলেন ফুলপাতা আঁকা পাথরটা। বললেন, "আগের বার আমি এইসব জায়গাতেই সন্ধান করতে চেয়েছিলাম। এলাকার নোকমারা আপত্তি করল।"

"বাবা আত্মাদের দেশে চলে যাওয়ার আগে পাথরের স্লেটটা এরকম কোনও পবিত্র বনে রেখে গিয়েছিল। বাবা ওটা নিজের কাছে লুকিয়ে রাখত, কাউকে দেখাত না। আমি দেখেছিলাম তাকে রাতে কুয়াশার মধ্যে স্লেট নিয়ে একা-একা বেরিয়ে যেতে। আমি পিছু নেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু মা তখন অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী। তাই বেরতে পারিনি। এখানেই কোথাও গ্রামের প্রবীণ ও বিচক্ষণ আত্মাদের সামনে সেই বামন গুহামানবের আত্মা বাবাকে ভগবানের চিহ্ন খুঁজতে পরামর্শ দিয়েছিল।"

খেংসুর শেষ কথাটায় ভুবনদাদু চমকে উঠলেন। "কী বললে

খেংসু? তোমাদের বংশের সেই জ্ঞানী, গুহামানব বামন ছিলেন?"

খেংসু ভুবনদাদুর উত্তেজনায় ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, "সেই আত্মার উপস্থিতি আমি আজকাল টের পাই। ঘরের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে সে আমায় ডাকে। আমি সারারাত ঘুমতে পারি না। আমাকেও ভগবানের চিহ্ন খুঁজে আত্মাদের দেশে যেতে হবে।"

"তুমি আত্মাদের দেশ কোথায় তা জান?" ভুবনদাদুর চোখে, মুখে একঝলক আশার আলো খেলে গেল।

"হ্যাঁ। যেখানে ভোরের চাঁদ বাষ্প হয়ে নীচের পাহাড়ে নেমে আসে। তারপর মেঘ সেজে জঙ্গলের উপর দোলনার মতো ঝুলে থাকে। সেইখানে।"

"আমাকে সে জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে?"

ভুবনদাদুর কথায় খেংসু বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কী বলবে, কী করবে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না। সে বিড়বিড় করে বলল, "পাথরের শ্লেটটা যে হারিয়ে গেল। তিন-তিনটে গ্রামের পবিত্র বন আমরা খুঁজে দেখলাম। কোথাও তো পেলাম না। আমি তো জানি না ভগবানের চিহ্ন কেমন হয়। কী করে সে চিহ্ন খুঁজে বের করব?"

ভুবনদাদু মনে-মনে ভাবলেন, পাথরের শ্লেটটা নিশ্চয়ই স্যামুয়েল এখানেই কোথাও খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু সেটা স্যামুয়েলের থেকে চুরি করল কে? ভগবানের চিহ্নগুলো এই পাগল ওঝা খেংসু ছাড়া আর কারও কি দরকার আছে? হারিয়ে যাওয়া গারো বর্ণমালার অস্তিত্ব যদি আদৌ থেকে থাকে, তার সঙ্গে এই ঘটনার অবশ্যই কিছু যোগ আছে।

ভুবনদাদু উঠে দাঁড়িয়ে খেংসুকে বললেন, "ঈশ্বরের পরের চিহ্ন একটা গুবরে পোকা। এবার তা হলে তুমি আমাকে সেই জায়গাতে নিয়ে চলো।"

"গুবরে পোকা?" খেংসু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

"স্যার আপনি এখানে! আর আপনার সঙ্গী ছোট ছেলেমেয়েগুলো অ্যাডভেঞ্চার করতে গুহায় ঢুকল। বারণ করলাম শুনল না। ফুৎকারে উড়িয়ে দিল।"

হঠাৎ করে স্যামুয়েলকে সামনে দেখে আর তার বক্তব্য শুনে ভুবনদাদু থতমত খেয়ে গেলেন। ওরা ঘুমোচ্ছে দেখে খেংসুর ডাকে তিনি একা-একাই বেরিয়ে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, ছেলেমেয়েগুলো জার্নিতে ক্লান্ত। সাতসকালে জাগিয়ে দরকার নেই।

সেই সুযোগে তাঁকে কিছু না জানিয়ে ঘুম থেকে উঠেই তিন ডানপিটে মিলে গুহায় অ্যাডভেঞ্চার করতে চলে গেল! বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলল ছেলেমেয়ে তিনটে। এ তো আর টুরিস্টদের আনাগোনা করার গুহা নয়। অচেনা পাহাড়ি গুহায় ভিতরে অভিযান করতে গেলে কিছু সাবধানতা নিতে হয়। সেসব তো কিছুই জানা নেই ওদের। ভুবনদাদুর কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হল।

তিনি খেংসুকে বললেন, "গারো পাহাড় ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে বেলায় একবার বেরব খেংসু। সেই রূপকথার দেশের খোঁজে। যেখানে চাঁদ বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে যায়। আর তার গায়ে লেগে থাকা জ্যোৎস্না বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। সেই সুন্দর দেশ দেখে যারা সবচেয়ে মজা পাবে আমার সেই চঞ্চল শাগরেদগুলো, তাদেরকে আগে ধরে আনি।"

এই বলে ভুবনদাদু স্যামুয়েলের সঙ্গে হাঁটা লাগালেন, "এখানে গুহা কোথায় পেলে? সিজু?"

"সিজু গুহারই অন্য একটা খোলামুখ। সিমসাং নদীর দিকে।"

"আগের বার শুনিনি তো!"

"তখন জঙ্গলে ঢাকা ছিল স্যার। কেউ জানত না। রিসেন্টলি ওই বিদেশি অভিযাত্রী দু'জন খুঁজে বের করেছে। তারপর জানাজানি হয়। সেই খবর শুনেই ডন্স করতে গিয়েছে আপনার খুদে গোয়েন্দারা।"

"আশ্চর্য! আমি এসব কিছু জানি না। ওরা কোথায় শুনল কে জানে? নিশ্চয়ই আজ সকালে শুনেছে গেস্ট হাউজে মিঃ মারাকের কাছে। ভদ্রলোক বড্ড আবোলতাবোল বকবক করেন!"

চলতে-চলতে স্যামুয়েল একবার নিজের পকেটে হাত দিল। চারপাশে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সতর্কভাবে।

ভুবনদাদুও চমকে চাইল এদিক-ওদিক। কয়েকটা হরিণ নদীতে জল খাচ্ছিল, মানুষের এগিয়ে আসার কম্পন টের পেয়ে ছুটে জঙ্গলে পালাল। একদল পরিযায়ী হাঁস সিমসাং নদীতে একবার ঝাঁপ দিয়েই পাক খেয়ে উড়ে গেল সিজু পক্ষী-অভয়ারণ্যের দিকে। ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেলেও ওদের বোধ হয় জায়গাটা ভাল লেগে গিয়েছে। তাই হয়তো আরও কিছুদিন এখানে কাটিয়ে যাবে।

"আর কত দূর গো? ছেলেমেয়েগুলো একা-একা চলে এল এতটা রাস্তাং খুব দুঁদে গোয়েন্দা হয়েছে দেখছি সব!"

"প্রায় এসে গিয়েছি," স্যামুয়েল ভুবনদাদুকে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের উপত্যকার দিকে নামতে শুরু করল। বড়-বড় পাথর ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। রাশিরাশি ঘাসফুল ফুটে আছে চারপাশে। ভীষণ নির্জন ও নিস্তব্ধ জায়গাটা। আচমকা চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। ভুবনদাদু কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা ধেয়ে এল ঝড়ের মতো। ওদের ছুটে আসার ধপ ধপ শব্দে পরিবেশের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। ভুবনদাদু ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলেন।

কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা চারজন লোক এ কে ৪৭ রাইফেল তাক করে ঘিরে ধরল ভুবনদাদু আর স্যামুয়েলকে।

॥ ১৩ ॥

"দিঠি, কন্যা," সুনৃত অন্ধকারের মধ্যে জল ঠেলে একটা পাথর আঁকড়ে ধরল।

"আমি এদিকে আছি। তুই কোথায়?" জলের মধ্যে আওয়াজ করে দিঠি জানান দিল।

"কন্যা!"

"কন্যা!" দিঠি কাতর স্বরে ডাকল। গুহার অন্ধকার আর জলের আওয়াজ শুষে নিল ডাকটাকে।

"কন্যা সাড়া দিচ্ছে না কেন?" সুনৃত ককিয়ে উঠল, "কন্যা সাঁতার জানে না দিঠি। কী হবে ওর?" বলতে-বলতে সুনৃত হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

"প্লিজ়" বলতে গিয়ে দিঠির গলা কান্নায় ভারী হয়ে এল, "বিশ্বাস রাখ। আমরা কন্যাকে উদ্ধার করবই। আমরা এই রহস্যের জল ছিঁড়ে একসঙ্গে ফিরব। হারব না। জিতে ফিরব।"

"ওই শয়তান স্যামুয়েলটাকে আমি ছাড়ব না! ও পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাদের ফেলে দিয়েছে," সুনৃত রাগে ঘৃণায় চিৎকার করে উঠল।

"ও স্যামুয়েল নয়! ভুবনদাদু যে স্যামুয়েলের সঙ্গে কাজ করেছে সে এত খতরনাক হতে পারে না!"

"তা হলে?"

"ও স্যামুয়েলের যমজ ভাই টেররিস্ট ফিডেল সাংমা। আমরা, ভুবনদাদু সবাই ওকে চিনতে ভুল করেছি। ওই বিষাক্ত মাশরুমের মধ্যেই রহস্যটা লুকিয়ে ছিল। আমরা ধরতে পারিনি। ফিডেল স্যামুয়েলকে মেরে নিজে স্যামুয়েল সেজে বসে আছে। নিজের দলের লোকদের আর পুলিশের চোখে ধুলো দিচ্ছে। আমরা ওকে বিশ্বাস করে ঠকে গিয়েছি।"

"কিন্তু ও আমাদের ক্ষতি চাইছে কেন? আমরা তো ওর সাতপাঁচে কোথাও নেই।"

"সেটা বুঝতে পারলে তো গোটা রহস্যটাই পরিষ্কার হয়ে যেত।"

"তা হলে তো এবার ও ভুবনদাদুকে টার্গেট করবে। ভুবনদাদুর বড় বিপদ," সুনৃত বলল, "কন্যা..." ভাঙা গলায় আর-একবার চেঁচিয়ে ডাকল প্রাণপণ।

"এই আন্ডারগ্রাউন্ড রিভারটার মাঝের দিকটায় ভাল স্রোত আছে। আমাদের ধাক্কাটা জোরে দিতে পারেনি তাই সামনে এই কম

জলে এধারে পড়েছি। কল্কা বোধ হয় স্রোতে ভেসে গিয়েছে দিঠি," এই বলে সুনৃত চোখে হাত চেপে কাঁদতে লাগল।

দিঠি পাথর ধরে জল ঠেলে সুনৃতের কাছে এগিয়ে গেল। বলল, "কাঁদিস না। ভরসা রাখ। ওই দ্যাখ, ও ইদিকে কী যেন একটা আটকে আছে।"

দিঠি আর সুনৃত গুহার পাথরে ভর দিয়ে জল ঠেলে সাবধানে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখল আটকে থাকা জিনিসটা একটা ছোট রবার বোট। দিঠি বোটের কাছে মোবাইল নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল।

"এটা মনে হচ্ছে ওই দুই ফরেনার নীল আর মাটিনের। এই দ্যাখ, বোটের মধ্যে দুটো মাইনার হেলমেট। তার মানে ওঁরা দু'জন অবশ্যই এখানে গুহা অভিযানে এসেছিল।"

সুনৃত দিঠির পাশে পাথরের মূর্তির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে জমে যাওয়া গলায় বলল, "রক্তের ছাপ। বোটে।"

দিঠি হাতে জল তুলে বোটটা একটু ধুয়ে নিল। চোয়াল শক্ত করে সুনৃতের দিকে তাকিয়ে বলল, "কল্কাকে খুঁজতে এই বোটটা আমাদের কাজে লাগবে। তুই খোলা আকাশের নীচে ডিঙি নৌকা চালিয়েছিলি না? চল, এবার পাতালপুরীতে বোট চালাই।"

দিঠি পড়ে থাকা হেলমেট পরে নিয়ে রবার বোটটায় চড়ে বসল। বোটটা জলের উপর টলমল করল কয়েকবার। এর পর মাথার হেলমেটে টর্চ জ্বালিয়ে দিঠি স্পষ্ট দেখতে পেল কেমন হয় চুনাপাথরের গুহা। গুহার মধ্যে বিভার প্যাসেজটা বেশ চওড়া। নদীর মাঝের অংশে স্রোতের টান আছে। সুনৃত র‍্যাডিং বোটটাকে পাথরের খাঁজ থেকে একটু টেনে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে কোনও রকমে তাতে উঠে পড়ল। বোটটা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই স্রোতের টানে সামনে ভেসে গেল।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সুনৃত ভয়ে-ভয়ে বলল, "ঠিকমতো চালাতে পারছি না। এ তো নিজেই আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।"

"কল্কা!" দিঠি সুনৃতের কথায় কান না দিয়ে ডাক ছাড়ল আর-একবার। নিজের আশঙ্কা আর কান্নাটাকে মুখ ফিরিয়ে লুকিয়ে সামলে নিল নিজেকে। এর পর সুনৃতের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমাদের যে পারতেই হবে।"

হাওয়ায় ফোলানো রবারের বোটটা বেশ কিছু দূর স্রোতে ভেসে গিয়ে গুহার মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা পাথরের স্তম্ভে ধাক্কা খেয়ে উলটে গেল। দিঠি আর সুনৃত জলে পড়ে সাঁতরে পারে পৌঁছল শেষের দিকটায় কাদার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে।

দিঠি মাথা তুলে নিজের মাথায় লাগানো আলোয় দেখল একটা বড় হলঘরের মতো প্রাকৃতিক চেম্বারের আকার নিয়েছে গুহার এই অংশটা।

সুনৃত হাঁপাতে-হাঁপাতে দম নিয়ে বলল, "দিঠি, ওই দ্যাখ। কাদায় কারও পায়ের ছাপ পড়েছে।"

দিঠির চোখে কিছুটা আশার ঝলক খেলে গেল। কল্কার পায়ের ছাপ নয় তো? ভেসে এসে হয়তো এখানে উঠতে পেরেছে। ও হয়তো আমাদের খুঁজছে। দিঠি চিৎকার করে ডাকল, "কল্কা।"

"চল, এই পায়ের ছাপ ফলো করে এগিয়ে যাই।"

দু'জনে পাশাপাশি পায়ের ছাপে চোখ রেখে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলছিল পিছলে পড়ার ভয়ে। চারপাশে ফিরে মাথা তুলে তাকালে নিজেদের মাথায় লাগানো আলোতেই দেখা যাচ্ছিল গুহার মধ্যে চুনাপাথরের অসাধারণ সুন্দর শিলাস্তর। গুহার ছাদ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে কোনও-কোনও জায়গায়। সেখানেই গুহার ছাদ থেকে ঝুলে আছে স্ট্যালাকটাইট বা স্ট্রিপস্টোন। কোথাও-কোথাও গুহার দেওয়ালেও এমন স্ট্রিপস্টোনের সারি পাশাপাশি জমে আছে। গুহার মেঝের উপর তৈরি হয়েছে ফাঁপা গম্বুজের মতো স্ট্যালাগমাইট।

সুনৃত কিছুটা হাঁটার পর থমকে বলল, "বাপরে! যেন মনে হচ্ছে বড়-বড় দাঁতওয়ালা ডাইনোসরের মুখের মধ্যে ঢুকছি। শুধু হাঁ মুখটা বন্ধ করলেই আমাদের দফারফা!"

দিঠি চারপাশে চোখ বুলিয়ে আবার ডাকল, "কল্কা!"

পায়ের ছাপগুলো আর-একটু পর থেকে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। পায়ের তলায় আর কাদা নেই। এবার পায়ের পাতা ডোবানো স্থির জলের উপর দিয়ে ওরা দু'জনে ছপছপ করে আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেল।

"এবার কোন দিকে? পায়ের চিহ্ন তো আর দেখতে পাচ্ছি না।"

"কল্কা!" দিঠি আগের মতোই চেঁচিয়ে ডাকল আর-একবার।

"সামনের পথটা যে ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। এর পর কী করবি? ওদিকে যেতে হলে মাথা নিচু করে আর-এক অন্তহীন অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকতে হবে।"

"জানি না! যা বাধা আসবে তাই ঠেলে এগিয়ে যেতে হবে এটুকুই জানি। আমরা কল্কাকে নিয়ে তিনজনে একসঙ্গে এই গুহার অন্ধকার থেকে আবার নীল আকাশের নীচে ফিরে যাব। আবার অভিযানে বেরব। আশ্চর্য সব রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়াব। আবার!"

"আর যদি এই গুহা থেকে কোনওদিন বেরতে না পারি?" সুনৃত করুণ চোখে দিঠির দিকে তাকাল। দিঠি সুনৃতের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালাতে লাগল।

সুনৃত আগের প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে মিইয়ে আসা গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা গুহার মধ্যে আটকে থেকে গেলে কি আমাদের আর বিবর্তন হবে না?"

"মানে? মানুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে আর নতুন কী হতে চাস? শিম্পাঞ্জি?" দিঠি খুব মনোযোগ দিয়ে খুঁজছিল কোনও একটা চিহ্ন, যা কিছু সূত্র দিতে পারে। সুনৃতের কথায় বিরক্ত হয়ে জবাব দিল সে।

"না, মানে আমি বলতে চাইছিলাম গুহার মধ্যে থেকে গেলে আমরা কি আর বড় হব না? ছোটই থেকে যাব? আমি একবার একটা সিনেমায় গুহার মধ্যে বিবর্তন না হওয়া রক্তপিপাসু আদিম মানুষদের গল্প দেখেছিলাম। খুব ভয়ঙ্কর ছিল তারা।"

"তার মানে তোর ভয় করছে," দিঠি সবজান্তা দিগ্‌গজের মতো করে সুনৃতকে আশ্বস্ত করে বলল, "দ্যাখ বিবর্তন না হলে মনে হয় আমরা ছোটই থেকে যাব। কেন, ছোট থাকতে তোর ভাল লাগে না?"

দিঠির কথায় সুনৃত মাথা দুলিয়ে লাজুক মুখে বলল, "হ্যাঁ, ভালই তো লাগে। বরং এই ভেবে ভয় লাগে বড় হয়ে গেলে হয়তো আমরা লেখাপড়ার জন্য আলাদা-আলাদা জায়গায় চলে যাব। আর একসঙ্গে রহস্য খুঁজতে বেরতে পারব না।"

দিঠি একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, "তা হলে বেকার ভয় পাচ্ছিলি। এই দ্যাখ, আপাতত এখুনি ছোট ছেলেমেয়ে হওয়ার একটা সুবিধে পাব। বড় হলে পারতাম না। চল, এবার এই কঠিন গর্তের মধ্যে আমাদের ঢুকতে হবে। কারণ, এখান থেকে সামনে আর কোথাও যাওয়ার নেই।"

সুনৃত আর দিঠি মাথার হেলমেট আর আলোটা ঠিক করে নিল। তারপর মাথা নিচু করে গুহার গাঢ় অন্ধকার সংকীর্ণ গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

"আ...আও!" এবার দিঠি ভয়ে চিৎকার করে সুনৃতের জামা খামচে ধরল। ভয়ে হাত-পা শক্ত হয়ে গেল ওর। চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল দিঠি। সুনৃত একটু পিছিয়ে এসে সামনে তাকাল।

হঠাৎ আলো আর পায়ের স্পন্দন টের পেয়ে জ্বলজ্বল চোখে চেয়ে আছে বিভাস্ত জীবগুলো। সামনে যত দূর দেখা যায় গোটা গুহাপথ জুড়ে শুধু ওরাই আছে। হাজারে-হাজারে। এর পর সামনে যেতে হলে ওদের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। কয়েকটা নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে উড়ে নতুন জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। ঘিনঘিনে কালো বাদুড়ের দল।

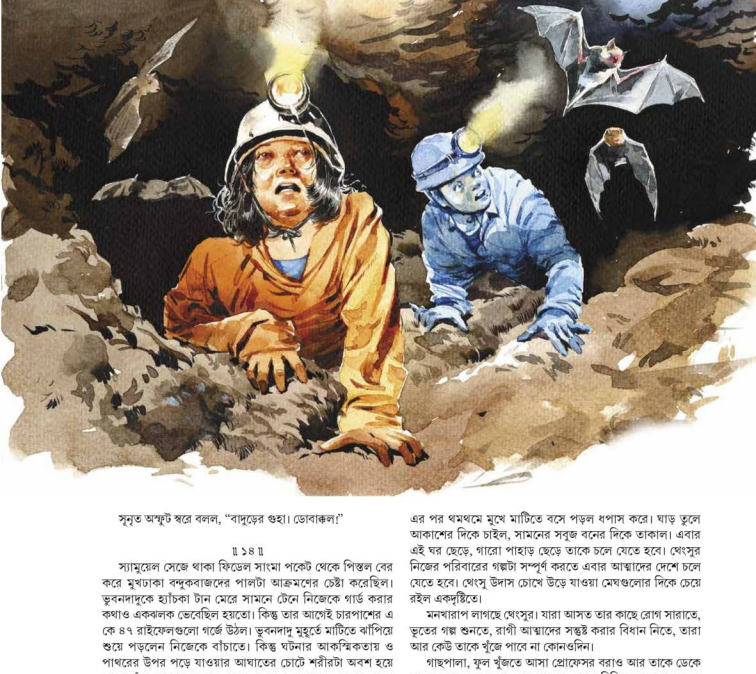

সুনুত অস্ফুট স্বরে বলল, "বাদুড়ের গুহা। ডোবাক্কল!"

॥ ১৪ ॥

স্যামুয়েল সেজে থাকা ফিডেল সাংমা পকেট থেকে পিস্তল বের করে মুখঢাকা বন্দুকবাজদের পালটা আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। ভুবনদাদুকে হ্যাঁচকা টান মেরে সামনে টেনে নিজেকে গার্ড করার কথাও একঝলক ভেবেছিল হয়তো। কিন্তু তার আগেই চারপাশের এ কে ৪৭ রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। ভুবনদাদু মুহূর্তে মাটিতে ঝাঁপিয়ে শুয়ে পড়লেন নিজেকে বাঁচাতে। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় ও পাথরের উপর পড়ে যাওয়ার আঘাতের চোটে শরীরটা অবশ হয়ে গেল তাঁর। চোখে অন্ধকার নেমে এল। তার আগে ভুবনদাদুর যেন মনে হল, লোকগুলো চিৎকার করে বলল, "বিশ্বাসঘাতক চোরটাকে খতম করো।"

তারপর উল্লাস করে উঠল নিজেদের মধ্যে। এর পর ঝিমঝিমে ঘোরের মধ্যে পালটা বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর আওয়াজ পেয়েছিলেন ভুবনদাদু। ভারী বুটের ছোটাছুটির শব্দ। জঙ্গলের মধ্যে দাপাদাপি। পালানো। পিছু নেওয়া। টেররিস্টদের পিছনে কমব্যাট বাহিনীর জওয়ানরা ধেয়ে এসেছে? তাদের কয়েকজন ভুবনদাদুর কাছেও এগিয়ে এল।

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "এই বয়স্ক মানুষটা গোলাগুলির মাঝে পড়ে গিয়েছিল। তুমি ভদ্রলোককে গাড়িতে তুলে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে চলো আগে। আমরা চারজন এখানে আছি। অ্যাম্বুলেন্স আসছে, ফিডেলের লাশটা তুলে নিয়ে যাবে।"

খেংসু বাড়ি ফিরে নিজের ঝোলা খুলে চমকে উঠল। সেই অমৃতের কৌটো! আত্মাদের বার্তা। খেংসু উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল। হাড়ের কৌটো থেকে সবটুকু গুঁড়ো মুখের মধ্যে ঢেলে খালি করে দিল। এর পর থমথমে মুখে মাটিতে বসে পড়ল ধপাস করে। ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইল, সামনের সবুজ বনের দিকে তাকাল। এবার এই ঘর ছেড়ে, গারো পাহাড় ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। খেংসুর নিজের পরিবারের গল্পটা সম্পূর্ণ করতে এবার আত্মাদের দেশে চলে যেতে হবে। খেংসু উদাস চোখে উড়ে যাওয়া মেঘগুলোর দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে।

মনখারাপ লাগছে খেংসুর। যারা আসত তার কাছে রোগ সারাতে, ভূতের গল্প শুনতে, রাগী আত্মাদের সন্তুষ্ট করার বিধান নিতে, তারা আর কেউ তাকে খুঁজে পাবে না কোনওদিন।

গাছপালা, ফুল খুঁজতে আসা প্রোফেসর বরাও আর তাকে ডেকে পাবেন না। বলতে পারবেন না বনের পথ চিনিয়ে অজানা ফুলের কাছে নিয়ে যেতে। এই উপত্যকা, চেনা মানুষজন, গাছ, ফুল, পাখি, আকাশ, মেঘ। খাদের ধারে ফুলে থাকা তার পিতৃপুরুষের কুটির। সব কিছুর উপর কেমন মায়া পড়ে গিয়েছে খেংসুর।

কিন্তু কী আর করা যাবে! ঈশ্বর তাতারা-রাবুগা খেংসুর পরিবারের জ্ঞানী মানুষটাকে নির্বাচন করেছিলেন তাঁর অনুচর আত্মাদের হয়ে মহান কাজ করবার জন্য। তিনি তাঁর কাজ করেছেন বিশিষ্ট আত্মাদের নিজের কাছে ডেকে এনে। এখন সেই আত্মারাই এলাকার বিশিষ্ট ওঝাদের ডেকে নেয় দরকার হলে। পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ঈশ্বরের চিহ্ন খুঁজে নিয়ে তাঁদের দেশে চলে আসতে বলে।

একথা এই গারো পাহাড়ের কেউ জানে না। খেংসু শুধু বলেছে ভুবনস্যারকে। তাও এই আশায় যে, ভুবনস্যার তাকে ভগবানের একটা চিহ্ন খুঁজে নিতে সাহায্য করবেন। ভুবনস্যার ভগবানের চিহ্ন চিনিয়ে দিয়েছেন। গুবরে পোকা। এই কৌটোটার আকারও তেমনই। এতদিন খেংসু খুব দুশ্চিন্তায় ছিল এই ভেবে যে, ঈশ্বরের চিহ্ন না জেনে আত্মাদের সামনে গেলে তারা রেগে যাবে কিনা! এখন সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু খেংসু তো ভুবনস্যারকে কোনও সাহায্য করতে পারল না।

বাপ-ঠাকুরদার আমলের পাথরের স্লেটটায় যা আঁকা ছিল তা দেখাতে পারল না। বাবা আত্মাদের দেশে চলে যাওয়ার আগে ওটা কোন পবিত্র বনে ফেলে দিয়ে গেল? এদিকের সব বনগুলোই সে খুঁজে দেখল।

ভুবনস্যার বলেছিলেন, তাঁর নাতি-নাতনিদের নিয়ে আবার আসবেন। এখনও তো এলেন না। তবে এর পর এলে তাদের খেংসুর সঙ্গে আর দেখা হবে না। খেংসু গভীরভাবে ভাবল। ব্যাপারটা ঠিকই আছে। তিনি খেংসুর কাছে আসুন এটা নিশ্চয়ই আত্মারাই চায়নি। কারণ, তিনিও তো আত্মাদের দেশ কোথায় দেখতে চেয়েছিলেন। সেটা খুবই গোপন খবর। খেংসুরই অন্যায় হয়েছে এইসব গুহ্য প্রকাশ করে ফেলে। খেংসু আত্মাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলের দুর্গম পথে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু শাল, সেগুন গাছ, সঙ্গে ওরলা, টিকাছাপ, খোকন, শিরীষ, কাঁঠাল, অগুরু গাছেরা ঘন বন। হিংস্র জন্তুর ভয়ে এপথে আগে কখনও আসেনি খেংসু। কিন্তু আজ সেসব ভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে সে। এই পথ তো কঠিন হবেই। খেংসুর বাবা, ঠাকুরদাও এই পথই ধরেছিল। কিন্তু পিছন-পিছন কার পায়ের আওয়াজ? খেংসু থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। না কেউ তো নেই। কোনও আত্মা কি তা হলে পিছু নিয়েছে?

ভুবনদাদু ধাতস্থ হয়ে বসছিলেন সিজু পুলিশ আউট-পোস্টে, অফিসার-ইন-চার্জের সামনের চেয়ারে। এমন ভয়ানক অভিজ্ঞতার সামনে এর আগে কখনও পড়তে হয়নি তাঁকে। সাক্ষাৎ মৃত্যু। এ ক ৪৭ হাতে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সামনে। হয়তো টার্গেট তিনি ছিলেন না, তবু এই জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে এক চুল ফারাক ছিল। সেটা একটু এদিক-ওদিক হলেই কী যে হত! ভুবনদাদুর আশ্চর্য লাগছিল এই ভেবে যে, তিনি শেষমেশ বেঁচে আছেন। এবার এখান থেকে যাওয়ার অনুমতি পেলে তিনি গেস্ট হাউজে ফিরতে পারেন। অনেক বেলা হল। তিনমুর্তি কী করছে কে জানে! কিছুতেই তো ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। বড্ড দস্যি হয়েছে। এরকম করলে এবার থেকে আর সঙ্গে নিয়ে অভিযানে যাওয়া হবে না বলে বকে দিতে হবে। গুহায় ঢুকে কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না তো? নাকি তাঁর নিজের মোবাইলেই কিছু সমস্যা হল, কে জানে! এদিকে মোবাইল নেটওয়ার্ক তো ভাল না। ভুবনদাদু মোবাইলের সেটিংস ঘাটাঘাটি করে দেখছিলেন কিছু গন্ডগোল হচ্ছে কি না।

এমন সময় গেস্ট হাউজের কেয়ারটেকার মিঃ মারাক হাউমাউ করে চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে এলেন পুলিশ স্টেশনে। ভুবনদাদুকে কাছে পেয়ে বললেন, "খবর শুনে আমি পাগলের মতো দৌড়ে আসছি। ফিডেল মারা পড়েছে। সে নাকি স্যামুয়েল সেজে বসেছিল। স্যার, সকালে আপনি বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আপনার নাম করে সে যে ছোট ছেলেমেয়ে তিনটিকে সঙ্গে নিয়ে গেল।"

"সে কী!" মারাকের কথা শুনে ভুবনদাদুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কপালে, দ্রুতে ঘাম ফুটে উঠল বিন্দু-বিন্দু। বসে থাকতে-থাকতেও ভুবনদাদুর শরীরটা একটু টলে গেল।

পুলিশ অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তাঁকে ধরে ফেললেন। "আপনি একটু রিল্যাক্স করার চেষ্টা করুন প্লিজ। ওদের কিছু হবে না। আমরা হতে দেব না। এক্ষুনি সার্চের ব্যবস্থা করছি।"

অফিসার নিজের ফোন থেকে বাঘমারার পুলিশ সুপারকে ফোন করে পুরো ঘটনা সংক্ষেপ জানালেন। এর পর ভুবনদাদুকে বললেন, "উচ্চ পর্যায়ের যে দল বিদেশি অভিযাত্রীদের হারিয়ে যাওয়ার তদন্ত করছে এস পি সাহেব এক্ষুনি তাদের এখানে পাঠাচ্ছেন।"

মিঃ মারাক টেনশনে ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। ভুবনদাদু মাথায় হাত দিয়ে ভেবে কূল পাচ্ছিলেন না। পরিশ্রান্ত গলায় বললেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ফিডেল কেন আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে? আমাদের সঙ্গে তো ওর কোনও রকম কাজের সম্পর্ক নেই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পেশাল পুলিশ ফোর্স এসে হাজির হল। ভুবনদাদু টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু আঁকছিলেন। স্পেশাল ফোর্সের সামনে পেটকাটা ডিমের মতো ছবি আঁকা কাগজটা মেলে ধরে বললেন, "শুধরে পোকা। এই গারো পাহাড়ে এমন গুবরে পোকার মতো দেখতে কোনও স্থান আছে?"

॥ ১৫ ॥

সুনৃত আতঙ্কে কথা বলতে পারছিল না। বাদুড়েরা উড়তে শুরু করে দিয়েছে ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে। গায়ে, পিঠে ঝাপট মেরে চলে যাচ্ছে। দিঠি হামাগুড়ি দিয়ে সুনৃতের পিছন-পিছন চলেছিল। এতটা ভয়ের সঙ্গে এর আগে কখনও যুদ্ধ করতে হয়নি। দিঠির মনে হচ্ছিল সুনৃতের গুহাই ঠিক, এই গুহাটুকু পার হতে-হতে ওরাও বাদুড় হয়ে যাবে। বাদুড়গুলো প্রতিটা শ্বাসপ্রশ্বাস গুনে-গুনে সেই মুহূর্তেরই অপেক্ষা করছে। তখন এই গুহার হাজার-হাজার বাদুড়ের মধ্যে একটার নাম হবে দিঠি, আর-একটা সুনৃত। আর কল্পা যদি ঠিক থাকে, দুই বন্ধুকে খুঁজতে-খুঁজতে এদিকে চলে আসে তা হলে কি ও বুঝতে পারবে যে, ওর দুই বন্ধু এখানে এই বাদুড়দের মধ্যেই আছে? তারপর একদিন আত্মাদের আদেশে যখন এই গুহা থেকে বেরিয়ে ওরা উড়ে-উড়ে গারো পাহাড়ের খবর আনতে যাবে, তখন জানতে পারবে এই গল্পের বাকিটুকুর কী হল। ভুবনদাদু ভাল আছেন কিনা।

দিঠি এইসব ভাবনার মধ্যে থাকতে-থাকতে হঠাৎ টের পেল গুহাপথ ধরে সে আর এগোচ্ছে না। পিছলে যাচ্ছে। পার্কের স্লিপ রাইডের মতো হড়কে এগিয়ে চলেছে নীচের দিকে। সামনের অন্ধকার পাতাল টেনে নিচ্ছে তাদের। দিঠির দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে ভয়ে সুনৃতের দিকে হাত বাড়াল। সুনৃত তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে পিচ্ছিল পথ বেয়ে আরও বেশি গতিতে। বাদুড়ের দলও ভয় পেয়ে ওড়াউড়ি শুরু করে দিয়েছে। দিঠি চোখ বন্ধ করে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিল।

"দিঠি, ওঠ! আমরা পাতালে কুবের দেবতার কাছে পৌঁছে গিয়েছি। এখানে রত্নভাণ্ডারের চাবি পড়ে আছে।"

গলাটা দিঠির চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু এই মুহূর্তে চোখ খোলার মতো শক্তি জোগাড় করা কঠিন মনে হচ্ছিল তার। সকাল থেকে প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি। তারপর ভুল করে শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়ে ওরা যেন মানুষের পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে কখনও না ফুরনো রাস্তা ধরে কেবল চলেই যাচ্ছে প্রেতাত্মাদের দেশে। ভিজে জামাকাপড়ে, গুহার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় শরীরের তাপমাত্রা কমে আসছে। নড়েচড়ে উঠে বসার উত্তাপটুকু খুঁজে নিতে দিঠি মুখের ভাপ দিয়ে হাতের তালু গরম করার চেষ্টা করে চলছিল ঘোরের মধ্যে।

"দিঠি ওঠ। এখানে সত্যিই ধনরত্ন খুঁজে পাওয়ার চাবি আছে।"

দিঠি চোখ খুলে দেখল সুনৃত ওকে হাত ধরে টেনে তুলতে চাইছে। দিঠি উঠে বসে দেখল সুনৃতও ঠান্ডায় কাঁপছে। এই জায়গাটায় গুহার রূপ একটু অন্য রকম। পায়ের তলায় একটা স্বচ্ছ জলের পাতা ভেজানো ধারা বয়ে চলেছে। গুহার প্রকোষ্ঠগুলো কিছুটা চৌকো-চৌকো। তাতে আতার খোসার মতো খাঁজকাটা শিলাস্তর। কিন্তু এখান থেকে পাশাপাশি কয়েকটা গুহাপথ চারপাশে ছড়িয়ে গিয়েছে গোলকধাঁধার মতো। এর পর কোথায়?

দেখতে-দেখতে মাথা ঘুরে গেল দিঠির। কিন্তু এই গোলমেলে দৃশ্য পেরিয়ে এতক্ষণ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কাটানোর অভিজ্ঞতার জোরে দিঠির মধ্যে ফের এক টুকরো উৎসাহ জেগে উঠল। যেন এক দু' ফোঁটা আলো কোথাও থেকে গুহার মধ্যে চুইয়ে পড়ছে। মনের মধ্যে এই সামান্য আলোর আভাস যে মৃতপ্রায় শরীরে এতটা বল এনে দিতে পারে, ওরা জানত না।

দিঠি বলল, "কোথায় আঙুল দেখাল গুহার দেওয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকা জিনিসটাকে। একটা ছোট্ট রিসিভার। দিঠি অবাক হয়ে সুনৃতের

মুখের দিকে তাকাল। দিঠি ছলছলে চোখে বলল, "তার মানে এখানে মানুষের পা পড়েছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে আমরা কল্কাকে খুঁজে পেতে সাহায্য চাইব।"

দিঠি আর সুনৃত ছুটে গিয়ে রিসিভারটা হাতে নিয়ে মাথার অ্যান্টেনা টেনে লম্বা করল। পাওয়ার সুইচটা কিছুক্ষণ চেপে থেকে অন করল।

"ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। তবু কিছু একটা সিগন্যাল রিসিভ হচ্ছে।"

"চল, তা হলে যতক্ষণ এর ব্যাটারি টিকে থাকে এই সিগন্যালটাকেই ফলো করি।"

ওরা দু'-তিনটে পথ পালটে অবশেষে যেদিকে সিগন্যালটা স্পষ্ট হচ্ছিল সেদিকটা চিনে চলতে লাগল।

সুনৃত বলল, "এটা বিদেশি জিনিস। ব্যাটারিতে এখনও চার্জ আছে। মানে এক সপ্তাহের বেশি পুরনো ঘটনা নয়। মনে হচ্ছে নীল আর মার্টিন কুঠুরির মধ্যে ঢুকেছিলেন। কিংবা কেউ রিসিভারটা ওঁদের থেকে নিয়ে এদিকে এসেছিল।"

"হুম। কিন্তু এটা এভাবে পড়ে ছিল কেন? ওরা কী এখানেই গুহার মধ্যে চিতাতের হারিয়ে গিয়েছে? ওঁদের বোটে রক্ত লেগে ছিল। কিছু ভয়ানক ঘটনা নিশ্চয় ঘটেছে ওঁদের সঙ্গে।"

দিঠির কথায় সুনৃতের চোখ জলে ভরে এল। বুজে আসা গলায় সে বলল, "আর কল্কা। কল্কা কি হারিয়ে গেল দিঠি?"

দিঠি সুনৃতকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে থেমে গেল। ওগুলো কী? "সুনৃত ওদিকে দ্যাখ!"

সামনে অনেক হাড়গোড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। তারই একপাশে আরও কিছু কঙ্কাল জড়ো করা আছে। পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে সুনৃত বলল, "এবার মনে হচ্ছে আত্মাদের দেশের দরজার দিকে এগোচ্ছি।"

দিঠি রিসিভারে চোখ রেখে বলল, "সিগন্যালের জোর বাড়ছে। সুনৃত আলো!"

দু'জনে সামনে আলোর রেখা দেখতে পেয়ে পাগলের মতো ছুটে গেল। ওদের ছোটার শব্দে গুহার দেওয়ালে বসে থাকা কয়েকটা বাদুড় উড়ে গেল ওদের পিছনে ফেলে। আর হারিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। দিঠি আর সুনৃত সামনে তাকিয়ে অপার বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুই পাহাড়ের ফাটল বেয়ে আলো নেমে এসেছে গুহার মধ্যে। আলোর সঙ্গে বৃষ্টির জলকেও পথ করে দিয়েছে এই ফাটল। আর সেই জল জমে ছোট্ট পুকুরের মতো জলাশয়ের আকার নিয়েছে গুহার এক দিকে। তার উপর কচুরিপানার মতো ভেসে আছে ওরা। ওদের পাতাগুলো পালটে মুড়ে এক-একটা বিরাট বড় কলসির আকার নিয়েছে। যে কলসি এতটাই বড় যে পুরো মাথাটা গলিয়ে উঁকি দেওয়া যাবে। তার মানে প্রোফেসর বরা বারবার যে বিশালাকার মাংসাশী গাছের কথা বলছিলেন এরাই সেই গাছ। কোনওভাবে এক টুকরো ভেসে গিয়ে ঝরনার জলে দেখা দিয়েছিল। দিঠি অবাক চোখে দেখল, বাদুড়গুলো কলসির মধ্যে ঢুকে আর ফিরে এল না।

বিস্ময়ে হতভম্ব সুনৃত মোবাইলে একটা ফোটো তুলে ফিসফিস করে বলল, "নেপেনথেসদের মহারাজা!"

দিঠি বলল, "নীল আর মার্টিন সাহেব বোধ হয় বাদুড়ের গায়ে মাইক্রো-ট্রান্সমিটার লাগিয়েছিল। মাংসাশী গাছেরা সেই বাদুড় হজম করে নিলেও ট্রান্সমিটারটা হজম করতে পারেনি।"

"কিন্তু তাঁরা নিজেরা কোথায় হারালেন?" বলতে-বলতে সুনৃত মোবাইলে টাওয়ার পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

দিঠি একমনে উপরের আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। আলো নেমে আসছে পাহাড়ের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক ফাটল বেয়ে। সেই ফাটলকেই কল্পনার চোখ দিয়ে দেখলে একটা আকার পাওয়া যায়। দিঠি সুনৃতের গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, "উপরে দ্যাখ, গুবরে পোকা।"

ঠিক তখনই বিশেষ একটা মিষ্টি গন্ধে চারপাশ ম ম করতে লাগল। ঝিমঝিমে অনুভূতি ঘিরে ধরল দিঠি আর সুনৃতকে। এতক্ষণের সব কষ্ট, সব ক্লান্তি যেন মুছে হয়ে চোখে নেমে আসছে। ওরা লুটিয়ে পড়ল। সুনৃত ঘুম চোখে আপন মনে বলল, "মনে হচ্ছে আরও গভীর অতলে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছি। এর পর আর কোন পাতালে আমাদের যাওয়ার আছে?"

কেউ যেন পিছন থেকে বলল, "কেন আত্মাদের দেশে!"

কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে কেউ একজন কথাটা বলল সুনৃতের কানের পাশে। ওরা এর বেশি কিছু দেখতে পেল না। ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যেতে-যেতে শুধু বুঝতে পারল দুটো পা ধরে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই দেশে, যেমন পিঁপড়েরা খাবার নিয়ে যায় নিজের গর্তে।

॥ ১৬ ॥

আত্মার দেশ যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, একটা ভাল জিনিস আছে। উত্তাপ। গুহার মধ্যে ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যেতে-যেতে এই প্রথম দিঠির মনে হল শীতটা কমেছে। সুনৃতও জমে যাচ্ছিল। শুধু মনের জোরে লড়ে গিয়েছে বন্ধুদের জন্য লড়তে হয় বলে। সুনৃতের গায়ে গরম আঁচ লাগল একটু। আত্মারা বোধ হয় গরম নিশ্বাস ছাড়ছে। সুনৃত ঘুম ঠেলে ভয়ে-ভয়ে চোখ মেলে চাইল। কিন্তু হাত-পা নাড়াতে পারল না।

"টুয়াটারা!"

শব্দটা এক ঝটকায় দিঠির ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ঘুম ভেঙে সে বুঝতে পারল তাদেরকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু সামনের চমকটা সেই কষ্ট চাপা দিয়ে দিল। এ তো হবছ ওই গুহাচিত্রটা এখানে মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে একটা বড় কুমিরের মতো হাঁ মুখ, তার নাকের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছে হাতির মতো শুঁড়। এমন মকরমূর্তি দিঠি দেখেছে দক্ষিণ ভারতের কিছু মন্দিরের ছবিতে। কিন্তু এখানে তো শুঁড়ের ঠিক উপরে তিন নম্বর চোখের অস্তিত্ব নেই, যেমনটা গুহাচিত্রে ছিল। আর গুহাচিত্রটা নীল আর মার্টিন আবিষ্কার করেছিলেন বলে নিউজিল্যান্ডের তিন চোখের প্রাণীটার নাম স্মৃতিতে জড়িয়ে গিয়েছে। এছাড়া কোনও কারণ নেই।

কিন্তু দুর্গম গুহার মধ্যে কে বানিয়েছে এটা? এই অসাধারণ শিল্পী কি প্রকৃতি নিজেই? নাকি পাথর কেটে বছরের পর-বছর ধরে কারও পরিশ্রমের ফসল এটা?

দিঠি সুনৃতের চোখের দিকে তাকাল। তারপর মকরমূর্তির দিকে। এতক্ষণে সংজ্ঞা পুরোপুরি ফিরে এসে সজাগ হয়ে উঠছে বুদ্ধিটা। তাই মকরমূর্তির মুখতা কেটে গিয়ে তার সঙ্গে মিশে থাকা ভয়ঙ্কর ছবিটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মকরের মুখটা তো পাথর কেটে বানানো। কিন্তু তার শরীরটা? ওগুলো কী দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে? দিঠি আতঙ্কে মূর্তির মতোই স্থবির হয়ে গেল। এ তো অগুনতি মানুষের মাথার খুলি! স্বচ্ছ খুলি, ক্রিস্টাল স্কাল।

"মাথার খুলি। ক্রিস্টাল স্কাল। ক্যালসাইট ক্রিস্টাল," সুনৃত ভয়ার্ত গলায় বলল।

দিঠি চোখের সামনে রহস্যের সুত্রটা খুলে যাচ্ছিল আস্তে-আস্তে। হেডহান্টার। জ্ঞানী আত্মার গুরু। অমৃত পাত্র। খেংসুর বন্ধু, বাবা, দাদুর আত্মার দেশে চলে যাওয়া। ঈশ্বরের চিহ্ন। গারো বর্ণমালা।

খেংসু এক চমৎকার ওষুধ, অমৃতের গুরু বলেছিল। সেই তরল খেলে নাকি সশরীরে আত্মাদের দেশে যাওয়া যায়। সেই অমৃত কি গুবরে পোকার মতো দেখতে কৌটোয় ভরে পাঠানো হয়? তাতে কী থাকে? হ্যালুসিনেশন তৈরি করবে এমন কিছু কেমিক্যাল? কে পাঠায় সেই অমৃত তরল? খেংসুর দাদু, খেংসুর বাবা আসং, খেংসুর বন্ধু বরম্বি ধরা আত্মহত্যা করেছিল আত্মাদের ডাকে। কোথায় ঝাঁপ দিয়েছিল তাঁরা? একটু আগে গুহার মধ্যে থেকে পাহাড়ের ফাটলটা দিঠি দেখেছে। ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথাটা ভেবে উঠতে মাথা ঘুরতে লাগল। হেডহান্টার। বাংলা গল্পের বইয়ে পড়া কাপালিকদের গল্প

একটু অন্য রকমভাবে কোথাও এসে মিলে যাচ্ছে এখানে। ভুবনদাদুর কাছে নোকমারা বলেছিল, আগে সব শান্ত ছিল, সুখ ছিল, শান্তি ছিল। কার অপরাধে কে জানে আত্মারা জেগে উঠল বারো বছর আগে। এক-একজন করে গারো ওঝাকে মৃত্যুর দেশে ডেকে নিতে শুরু করল। ঠিক বারো বছর আগে নতুন কী ঘটেছিল এই এলাকায়?

দিঠি স্থির দৃষ্টিতে ঘরে জ্বলতে থাকা একমাত্র আলোর দিকে তাকাল। ওই আলোটাই ঘরের মধ্যে আয়নার মতো কিছুতে প্রতিফলিত হয়ে ঘরের সামনের অন্ধকার দূর করে দিচ্ছে। বারো বছর আগে এখানে কী বিশেষ ব্যাপার ঘটেছিল। বাষমারার ফরেস্ট রিসর্টে অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বেলে ভুবনদাদু কথায়-কথায় খবরটা জানিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে সেটাই এই রহস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। বারো-তেরো বছর আগে এই এলাকায় জনিক নকরকে এসেছিল।

সে সময় গম্ভীর গলাটা অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে এল। "তোমরা যে দু'জনের খোঁজ করছিলে, তাদের আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি," কালো চাদরে জনিককে মুড়ে বামন মানুষটা সামনে এগিয়ে এল। তাঁর দু'হাতে দুটো মাথার খুলি।

"এর মধ্যে ডান হাতেরটা নীলসাহেব, বাঁ হাতেরটা মার্টিনসাহেব। উলটোটাও হতে পারে। আসলে মাংস পেলে রাক্ষুসে গাছগুলো এত তাড়াতাড়ি হজম করে। মানুষের আস্ত মাথা কয়েকদিনের মধ্যে ফরসা করে দেয়। কোনটা কে চেনবার উপায় থাকে না।"

বলতে-বলতে জনিক নকরের চোখদুটো হিংস্র শিকারির মতো জ্বলে উঠল, "কিছু-কিছু রহস্যকে রহস্যই থাকতে দিতে হয়। তোমরা ছেলেমানুষ, বুঝতে চাইবে না সে না হয় মানা গেল। কিন্তু এঁদের বা তোমাদের ভুবনদাদুর তো তা বোঝা উচিত। প্রেতাত্মার গুহ্য মানুষের জন্য নয়। কেউ সেখানে ঢোকে না, সেখানে অনুসন্ধান করার কী দরকার? বছরের পর-বছর ধরে যে রহস্য আড়ালে আছে, নিশ্চয়ই তার কোনও কারণ আছে। কোনও দরকার আছে তার ভিতরে আলো ফেলে দেখে নিজেদের বিপদ ডেকে আনার?"

"রহস্য?" দিঠি তীব্র দৃষ্টিতে জনিক নকরেকের চোখে চোখ রেখে বলল, "বারো বছর ধরে গোপনে মানুষ খুন করে চলেছেন। সেটাকে রহস্য বলে না, সেটা এক রকম ঘৃণ্য অপরাধ।"

দিঠির ভর্ৎসনায় জনিক নকরেক পাগলা কুকুরের মতো তেড়ে এল। তার মুখ রাগে বিকৃত হয়ে আছে, সে দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, "তারা কেউ খুন হয়নি, প্রত্যেকে ভগবানের একটি চিহ্ন হয়ে ওঠার জন্য আত্মবলি দিয়েছে। তোমাদের দাদু গারোদের হারানো বর্ণমালা খুঁজছিলেন না? সেই বর্ণমালা কখনওই পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, মৃত আত্মারা সবাই মিলে সেই বর্ণমালাকে নিজেদের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

এই বলে জনিক নকরেক খুলিদুটোকে একপাশে রেখে অট্টহাস্য করতে শুরু করল। হাসতে-হাসতে হাত জোড় করে বসে পড়ল মূর্তির দিকে মুখ করে। তার হাসির শব্দে গমগম করে উঠল গুহার এই প্রকোষ্ঠটা। এর পর হঠাৎ করে ভয় ধরানো স্তব্ধতা নেমে এল পরিবেশে। দিঠি আর সুনৃত নিজেদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সেই নিস্তব্ধতায়। জনিক নকরেক যেন ধ্যানে বসেছে এমন স্থির। সে পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়াল মন্ত্রপাঠের মতো ভঙ্গিমায়। মকর মূর্তিটার হাঁ মুখের ভিতরে হাত গলিয়ে বের করে আনল একটা চকচকে ধারালো ছুরি।

এর পর দিঠিদের দিকে চেয়ে কুটিল হেসে বলল, "বই বা পুঁথি বলে আলাদা কিছু হয় না। এই পৃথিবীটা নিজেই একটা মস্ত বড় বই। ভগবান এর মধ্যে নিজের কিছু সাক্ষ্য বা চিহ্ন ছড়িয়ে রেখে দেন সেই সব সংকেতের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে। এই চিহ্নগুলোকেই তোমরা নানা রকম নাম দাও। মহান সালজং যারা গারোদের সব পুঁথি খেয়ে ফেলেছিল, তাদের পরিবার থেকে এক-একটা করে মাথা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। নিজের সব বিদ্যা ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তাদের খুলির কপালে এক-একটা করে বর্ণ খোদাই করে লিখেছেন। সেটাই হল তৃতীয় চক্ষু। কার দ্বারা অসাধ্য ছিল গোটা কাজটা ভাবতে পারছ? কোনও বিজ্ঞানীও পারবে না," বলতে-বলতে জনিক নকরেকের চোখে আগুনের প্রতিবিম্ব জেগে উঠল যেন।

"খেংসুর পরিবার কেউ নয়। পুঁথি খেয়ে ফেলা পাপী সব। আমিই সালজংয়ের আসল উত্তরপুরুষ, বহু কষ্টে এই গুহাটাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। তারপর থেকে তার কাজটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছি আমি। এভাবে সব চিহ্নগুলো মিলে গারো বর্ণমালা সম্পূর্ণ হবে। আমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাষায় বাক্য তৈরি করতে পারব। মহান ঈশ্বর তাতারা-রাবুণা খুশি হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আমার এতকালের সাধনা সফল হবে।"

এই বলে জনিক নকরেক দিঠির হাতদুটোকে একসঙ্গে করে বেঁধে রাখা দড়িটাকে হ্যাঁচকা টান মেরে নিল। পায়েও দড়ি বাঁধা থাকায় কিছুটা মাটিতে গড়িয়ে দিঠি মকরমূর্তির কাছে এগিয়ে গেল। জনিক নকরেকের চেহারা বেঁটেখাট হলেও গায়ের জোর কম না। দিঠি তাঁর আসুরিক শক্তির নিদর্শন দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল।

জনিক নকরেক ছুরিটা নিজের হাতে ঘষতে-ঘষতে বলল, "তোমার নিজের খুলির কপালে কেমন চিহ্ন ফুটে উঠবে মরার আগে একবার দেখে নাও।"

দিঠি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কোনওক্রমে হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হল। মকরমূর্তির মাথার পিছনে মাছের মতো করে তৈরি করা শরীরে ক্রিস্টাল স্ফালগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। দিঠি চোখের সামনে যা দেখছিল তাকে ভয়ঙ্কর সুন্দর ট্রাইবাল আর্ট বলা যায়। প্রতিটা খুলির কপালের ভিতরে এক-একটা চিত্রলিপি খোদাই করে তাতে কয়লার গুঁড়োর মতো কালো কিছু দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। তারপর খুলিটাকে কীভাবে কে জানে স্বচ্ছ ক্যালসাইটে পরিণত করা হয়েছে। ক্যালসাইটে দু'বার প্রতিফলিত হয়ে চিত্রটা অদ্ভুত দেখতে লাগছে বাইরে থেকে। ঠিক যেন একটা ছবি আর তার প্রতিবিম্ব পাশাপাশি লেগে আছে। এই অকল্পনীয় দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে দিঠির মনে হচ্ছিল আজব এই মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আর ততোধিক বিস্ময়কর তাদের কার্যকলাপ। তবে এর পিছনের গল্পগুলো ভয়ানক।

দিঠি বুঝতে পারছিল বাইরের লোক হিসেবে নীল, মার্টিন, ভুবনদাদুর সঙ্গে ওরা তিনজন নিজেদের অজান্তে জনিক নকরেকের বারো বছর ধরে সাজানো এই খতরনাক মৃত্যুফাঁদের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। তাই কি ফিডেল সাংমাকে ভাড়া করে ওদের উপর এই আক্রমণ?

জনিক নকরেক দিঠির চোখে ফুটে ওঠা ভয় ও বিস্ময়ের ছবিগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে পরখ করে দেখল, "এতক্ষণে আশা করি ফিডেল সাংমা তোমাদের ভুবনদাদুকে গুহার ভিতরে ডেকে এনে গুলি করে মেরেছে। যেমন মেরেছিল এই নীল আর মার্টিন সাহেবকে। ওরা অবশ্য আমার সঙ্গে গুহায় ঢুকেছিল। বোট নিয়ে মহানন্দে কিছুক্ষণ জলেও ভেসেছিল। ফিডেল আড়াল থেকে গুলি করে। আসলে বিগত দিনগুলোতে স্যামুয়েলের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরেছি তো। হঠাৎ পালটে যাওয়া ভাইকে চিনে ফেলত। তাই ফিডেলকে শরীর খারাপের অভিনয় করতে হচ্ছিল। আমি বামন মানুষ। সহজ মানুষের সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ওষুধের ঘোরে তাদের আত্মহত্যা করার জন্য খাদের ধারে ডেকে আনতে পারি। সামনাসামনি মানুষ মারার ক্ষমতা কি আমার আছে? অথচ নীল, মার্টিন তোমাদের ভুবনদাদু সবাই আমার রহস্যের ঘরটাকে ভেঙে দিতে এগিয়ে আসছে। পুলিশকেসে ফেঁসে যাব না? কী করিন অবস্থা ভাব! এই পরিস্থিতিতে ফিডেলটাকে না পেলে যে কী হত! দলের ফান্ডের টাকাপয়সা নিয়ে ওর বাংলাদেশ পালানোর দরকার ছিল। আর আমার দরকার ছিল একজন পেশাদার মানুষ খুন করার লোক। তাই চুক্তিটা করে ফেললাম। আমি ওকে আমার বাংলাদেশের আশ্রমে লুকিয়ে ফেলব। বদলে ও গোপনে

আত্মার গুহার মধ্যেই এই ক'জনের আত্মার শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করবে।"

এই বলে জনিক নকরেক চিৎকার করে বলল, "পাঁচ বছর আগে নোকমাদের খেপিয়ে তোমাদের দাদুকে আমি তাড়িয়েছিলাম এখান থেকে। স্যামুয়েলের সামান্য একটা ফোন পেয়ে তিনি আবার তোমাদের সঙ্গে করে গ্যারো পাহাড়ে ফিরে এলেন কেন? নিজেদের মরা মাথার খুলির কপালে গারো লিপি খোদাই করার জন্য?"

দিঠি জনিক নকরেকের উপর রাগে, ঘৃণায় চোখ বন্ধ করে ফেলল। নিজের ফুরিয়ে আসা শক্তির সবটুকু জোগাড় করে পালটা চিৎকার করে বলল, "আবিষ্কারের আনন্দ কাকে বলে কিছু জান? নির্বোধ পাগল তান্ত্রিক। কুটবুদ্ধি খরচ করে একের পর-এক সরল উপজাতি মানুষকে সর্বনাশের রাস্তায় এগিয়ে দিয়েছ। আর মাথায় এইটুকু বুদ্ধি নেই যে, এভাবে ধরে নিলে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যা-যা ছড়িয়ে আছে, সেসব চিহ্নই ভগবানের। সেই সংগ্রহের কি কোনও শেষ আছে?"

জনিক নকরেক দিঠির দিকে বিস্ফোরক চোখে তাকাল। যেন তার এতদিনের সাধনার মূল ভিতটা কেউ নাড়িয়ে দিয়েছে। একটা অসম্ভব উলটো চিন্তাস্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জনিক নকরেকের মুখ বিকৃত করে হাড়হিম করা হুঙ্কার ছেড়ে নিজের হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটাল। এর পর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "খুব ভাল। তুমি নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে একটা চিহ্ন আবিষ্কার করেছ। তোমার মাথার খুলিতে আমি যার শেষ নেই, সেই অনন্তের চিহ্ন এঁকে দেব।"

জনিক নকরেক ধারালো ছুরিটাকে একটা স্লেট পাথরে ঘষে ধার দেওয়ার অভিনয় করল। এর পর স্লেট পাথরটা সুনৃতের চোখের সামনে ধরে বলল, "এটাই স্যামুয়েলের খুঁজে পাওয়া স্লেট। থেংসুর পরিবার পুরুষানুক্রমে চিহ্নগুলো খুঁজে-খুঁজে এখানে খোদাই করেছিল। থেংসুর বাবা আসং তোমাদের দাদুকে স্লেটটা দেবে ভেবেছিল পাঁচ বছর আগে। আমি সালজংয়ের আত্মা সেজে ওকে ভুল বুঝিয়ে আটকেছিলাম। তবু মরার আগে এটাকে ও লুকিয়ে ফেলেছিল। দেখো তো, এই ছবিগুলোর মধ্যে নিজের মাথার খুলিতে খোদাই করার জন্য কোন চিহ্নটা তোমার পছন্দ?"

সুনৃত দাঁতে-দাঁত চেপে শীতল কঠিন দৃষ্টিতে মেপে দেখল সামনের হিংস্র মানুষটাকে। তারপর চোখের পলকে নিজে মাটিতে শুয়ে কোমরে ভর দিয়ে দড়ি বাঁধা জোড়া পায়ে সজোরে লাথি মারল জনিক নকরেককে। সেই মারের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল জনিক নকরেক। পালটা আক্রমণের আকস্মিকতায় একটু দমে গিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিল। এর পর মুহূর্তের মধ্যে ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুনৃতের উপর। কিন্তু জনিক নকরেককে কেউ একজন যেন তার আগেই ঝাঁপ দিয়ে ধরে নিল। পরস্পরের মধ্যে বেশ কয়েক মিনিটের মল্লযুদ্ধের পর লোকটা জনিক নকরেককে শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দিল ঘরের অন্ধকার অংশে। এর পর একটা অস্ফুট আর্তচিৎকার সেই অন্ধকারেই হারিয়ে গেল।

"থেংসু?"

থেংসু ঘরের মধ্যে আয়নার মতো প্রতিফলকটাকে হাতে ঘুরিয়ে ঘরের পিছন দিকে আলো ফেলল। সে আলোটুকু পিছনের অন্ধকার শুষে নিল। কারণ, সে অন্ধকার ফুরোবার নয়। সেটা তো আর-একটা পাতালপুরীর সিংহদুয়ার। গুহার মধ্যে অন্য গুহার গভীর অন্ধকার খাদ।

থেংসুর সামনে সুনৃত আর দিঠির চোখ জুড়ে অঝোর কান্না নেমে এল।

"নীল, মার্টিনা, স্যামুয়েল কেউ বেঁচে নেই। আমরা কল্পাকে খুঁজে পাইনি। ভুবনদাদু কেমন আছেন জানি না। এই শয়তানটা সব শেষ করে দিয়েছে।"

থেংসু এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিল দিঠি আর সুনৃতের মাথায়। বলল, "কিছু শেষ হয়নি। আমি বলছি। আমি আত্মায় বিশ্বাস করা পাগল ওঝা থেংসু বলছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। চলো আগে মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষের পৃথিবীতে ফিরে যাই।"

॥ ১৭ ॥

একেই কী বলে রূপকথার দেশ! নদীর উপর দিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যে সেতু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা রামধনু। মাথার উপর এমন নীল আকাশ আর সাদা মেঘের বাহার! চোখের সামনে হাওয়ায় দুলছে সোনালি ফুল। পায়ের পাতায় চুমু খেয়ে যাচ্ছে ঝরনার জল। সবকিছুই যেন অন্য রকম। কল্পার মনে হচ্ছিল সে যেন শূন্যে সাঁতার কাটছে। একটা অন্ধকার নদী তাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে নিজে ঝরনা হয়ে ঝরে গিয়েছে।

কল্পা তো স্বপ্ন দেখছে না। খিদে, তেষ্টা, ব্যথা-বেদনা সবই টের পাচ্ছে সে। কিন্তু তার সব কষ্ট এই নীল আকাশ, সাদা মেঘ, সাতরঙা রামধনু, সোনালি অর্কিড, শীতল ঝরনা সবাই মিলে মুছে দিচ্ছে। ডেকে নিচ্ছে নিজেদের অপরূপ দেশে। এমন সব মনভোলানো রূপকথা এর আগে কখনও তো ধরা দেয়নি কল্পার চোখে। তা হলে কি দু'চোখের বাইরে অন্য কোনও চোখ দিয়ে এসব দেখছে কল্পা?

ওই যেন কল্পার কানে-কানে ব্যাঙ্গমা বলল, "কল্পা তোমার বন্ধুরা তোমায় খুঁজছে। তুমি এই অচিনপুরে একা-একা কী করছ?"

আদর জড়ানো কণ্ঠে ওই যেন ব্যাঙ্গমা বলল, "রামধনুর ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে যাও, দেখতে পাবে তোমার বন্ধুদেরও কেমন পরির মতো ডানা গজিয়েছে। ওদের নিয়ে এই সোনালি ফুলের দেশে তোমার ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করছে না?"

কল্পা জড়িয়ে আসা চোখে বলল, "কিন্তু আমি তো পাশ ফিরতেই পারছি না। উঠে দাঁড়াব কী করে?"

তখন যেন ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমা আরও কয়েকজন রূপকথার চরিত্র মিলে একসঙ্গে মানুষের মতো গলা করে বলল, "দড়িতে ঝুলে ঝরনার জলের উপর এগিয়ে চলো। ওকে খুব সাবধানে ধরতে হবে। ছেলেটা পাথরে আটকে একেবারে খাদের কিনারায় ঝুলছে।"

প্রোফেসর বরাকে জঙ্গলের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করতে দেখে ভুবনদাদু ও পুলিশ বাহিনীর লোকেরা দৌড়ে এল।

"কী হয়েছে?"

"আমার দোষে থেংসুটা মরতে বসেছে। আমি বিশাল বড় পিচার প্ল্যান্ট খুঁজে পাওয়ার নেশায় থেংসুকে ভুল বুঝিয়েছি। আমার মনে হয়েছিল ও আমাকে এই গারো পাহাড়ের একটা গোপন জায়গা চিনিয়ে দিচ্ছে না। তাই সেই কুড়িয়ে পাওয়া হাড়ের কৌটোয় জুকোঞ্জ ভরে রেখে এসেছিলাম ওর ঘরে। ও সেটা অমৃত ভেবে মেয়ে আত্মা ডাকছে ভেবে এই খাদ বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে।"

ভুবনদাদু পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘন ঝোপঝাড় ঠেলে খাদের ধারে এগিয়ে গেলেন। হয়তো কোনও অতীতকালে ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়ের মাঝে ফাটল তৈরি হয়েছিল। এই ফাটলের মাঝামাঝি গাছের শিকড় প্যাঁচ খেয়ে-খেয়ে অসংখ্য প্রাকৃতিক রুট ব্রিজ গড়ে উঠেছে। যা খাদের ভিতর অনেক গভীর পর্যন্ত মাকড়সার জালের মতো ঝুলে রয়েছে। থেংসু সম্ভবত এই শিকড়ের সেতু ধরে-ধরে অসাধারণ দক্ষতায় খাদের ভিতরে নেমে গিয়েছে।

ভুবনদাদু এই ফাটলের আকারটা কল্পনার চোখে দেখলেন। এখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির মধ্যে গুবরে পোকা, মাকড়সার ঝালে ঝুলে নক্ত-লপান্তর পৃথিবী সৃষ্টি করার মিথ বিশ্বাসের আয়নায় দিব্যি পড়ে নেওয়া যায়।

ভুবনদাদু কঠোর দৃষ্টিতে প্রোফেসর বরার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা হলে আপনি এই সরল মানুষগুলোকে আত্মার গল্পে ঠেলে দিয়ে এদের আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন? কিন্তু কেন?"

ভুবনদাদুর ধমক খেয়ে প্রোফেসর বরা হাত জোড় করে বললেন, "বিশ্বাস করুন, থেংসুর উপরই প্রথমবার এ জিনিস ব্যবহার করেছি।

আগে কখনও একাজ করিনি।"

"তা হলে?"

ভুবনদাদুর প্রশ্ন চাপা দিয়ে পুলিশের লোকেরা হই হই করে উঠল। "ওই তো খেংসুকে দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে আরও কেউ-কেউ আছে মনে হচ্ছে।"

পুলিশবাহিনীর সদস্যরা খাদের মধ্যে দড়ি ঝুলিয়ে উদ্ধারের জন্য নামতে শুরু করে দিল। নামতে-নামতে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "এই শিকড়গুলো কাটতে হবে ওদের তুলতে গেলে।"

একথা শুনে প্রোফেসর বরা চেঁচিয়ে তাদের সাবধান করতে লাগলেন, "রুট-ব্রিজগুলো ছিঁড়ে পড়লে কিন্তু ধারের আলগা পাথরগুলো ভিতরে খসে পড়বে। নীচের দিকটা বুজিয়ে দেবে।"

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। উদ্ধার কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। দড়িগুলো একটু উপর দিকে উঠে আসতেই ভুবনদাদু ভিজে চোখের উপর হাত চেপে মাটিতে বসে পড়লেন। দিঠি আর সুনৃতকে নিয়ে খেংসু ঝুলে আছে। উদ্ধারকারী পুলিশে টেনে তুলছে তাদের। তুলে আনতে গিয়ে গাছের শিকড়ের জাল কেটে ফাঁকা করে নিচ্ছে কুড়ুল দিয়ে। পাশাপাশি আটকে থাকা পাথরের ওজনের চাপে বাকি শিকড়ের জাল দুর্বল হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে একটা-একটা করে। কয়েকটা ছোট পাথর খসে পড়ে হারিয়ে গেল খাদের মধ্যে। উদ্ধারকারী ফোর্সের আরও একটা বাহিনী স্পটে চলে এসে হাত লাগিয়েছে।

"এই শেষ ধাপটুকু।"

পাথরে ভার রাখতে না পেরে একটা বড় রুট-ব্রিজ ছিঁড়ে পড়ল ফাটলের মাঝ বরাবর। কয়েকটা বড় পাথর স্থানচ্যুত হয়ে খসে গেল নিজেদের জায়গা থেকে। তাদের ধাক্কায় আরও কিছু পাথর একসঙ্গে খসে পড়ল খাদের মধ্যে। পরপর, একের পর-এক। দিঠি, সুনৃত পিছন ফিরে দেখল সেই ধ্বংসের দৃশ্য। খেংসু করুণ চোখে তাকিয়ে রইল সে দিকে। তা হলে কি চিরতরে মুছে গেল এই অলৌকিক পথ? আত্মাদের দেশের গল্প?

"আমরা কল্পাকে হারিয়ে ফেলেছি ভুবনদাদু," দিঠি, সুনৃত দৌড়ে দিয়ে ভুবনদাদুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

॥ ১৮ ॥

লোকালয়ের কাছাকাছি এসে ওরা খবর পেয়েছিল কল্পাকে সিমসাং নদীর কাছে একটা পাহাড়ি ঝরনার ধার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কল্পার কোমরের হাড় ভেঙেছে। তাই বাঘমারায় হাসপাতালে চিকিৎসার পর ডাক্তারবাবুদের মত নিয়ে কল্পাকে তুরা থেকে কপ্টারে গুয়াহাটি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আরও ভাল অর্থোপেডিকের পরামর্শের জন্য। আপাতত ওষুধের ঘোরে কল্পা ঘুমিয়ে আছে। কল্পার দু'পাশে ওর হাতদুটো দু'হাতে ধরে দিঠি আর সুনৃত বসেছিল। নীচে সবুজ রহস্যময় গারো পাহাড়ের গায়ে স্বর্ণলতার মতো জড়িয়ে আছে অসংখ্য মেঘেদের দল। একটু পরেই তারা একজোট হয়ে গোটা গারো পাহাড়কে ঢেকে নিল আস্তে-আস্তে।

আসার সময় প্রোফেসর বরা তুরা পর্যন্ত সঙ্গে এসেছিলেন বিদায় জানাতে। বলছিলেন, "তোমাদের মতো অসাধারণ খুদে অভিযাত্রীদের কথা একমাত্র গল্পের বইয়েই পড়েছি।"

সুনৃত বলেছিল, "আপনি খেংসুকে পাঠিয়ে আমাদের বাঁচিয়েছেন।"

"না, না। সে কী বলছ, ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন! আমি তো..." প্রোফেসর বরা সুনৃতের হাত ধরে সন্ধোচে জড়সড় হয়ে গিয়েছিলেন।

"আপনার জন্য একটা উপহার আছে। আপনার মোবাইলের ব্লু-টুথটা অন করুন।"

ছবিটা পাওয়ার পর প্রোফেসর বরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে সুনৃতরা হেলিপ্যাডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

"এদের কোথায় পেলে?" প্রোফেসর বরা চিৎকার করছিলেন।

দিঠি সুনৃতকে আর কিছু বলতে না দিয়ে পালটা চেঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিল, "আপনার কাছে নেপেনথেস রাজার গল্প শুনে সুনৃত ফোটোশপে বানিয়েছে।"

দিঠি মেঘে ঢাকা পড়ে যাওয়া গারো পাহাড়ের দিকে চেয়ে ভাবছিল, মানুষের খুলি থেকে অমন স্বচ্ছ ক্যালসাইট তৈরি হওয়ার পিছনে কি ওই রাক্ষুসে পিচার প্লান্টের কলসিতে জমে থাকা এনজাইম দায়ী? ভাবতে-ভাবতে দিঠি নিজেকে বোঝাল, ওই গুহা, ওই গাছ, স্বচ্ছ মাথার খুলি, গারো লিপির গ্রহ বরং রহস্যেই ঢাকা থাক। কিছু রহস্য বোধ হয় মানুষের নাগালের বাইরে থাকাই ভাল।

দিঠিকে চিন্তিত দেখে ভুবনদাদু ক্লান্ত স্বরে বললেন, "বসু সবার বাবা-মাকে নিয়ে দমদম থেকে গুয়াহাটি রওনা দিয়েছে। রহস্য সমাধানের প্রশংসা ছাপিয়ে এ যাত্রায় বিপদের ফাঁদে মাথা গলানোর জন্য বকুনি না জোটে তোদের কপালে।"

সুনৃত বলল, "আমরা তোমার আড়ালে লুকিয়ে পড়ব। তুমি সামলে নিয়ো।"

"সামলাতে আর পারলাম কোথায়? অন্ধবিশ্বাস আর অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে মানুষের ভগবান হয়ে ওঠার নেশা কত ভয়ঙ্কর রকম বিপজ্জনক হতে পারে তার আন্দাজই করতে পারিনি।"

"পুলিশও তো সন্দেহ করেনি।"

"একে তো এমন বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি এলাকা, তার উপর জনিক নকরেক খুব চালাকির সঙ্গে একটা ঘটনার সঙ্গে পরেরটার কয়েক বছরের ফাঁক রেখে ঘটাচ্ছিল। যাতে প্রতিটা আত্মহত্যা বা হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তোদের মুখে যা শুনলাম তা তো অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হয়। ভাগ্যিস খেংসু পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল। নিজের পুরনো বিশ্বাসের বদলে নিজের চোখে দেখাটাই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। না হলে কী যে হত! খেংসু এখন পুরো অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। এই গল্প অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে খেংসুর থেকে। ও বলেছে, ভয়ঙ্কর আত্মার গল্পগুলো ভুলে সে লেখাপড়া শিখে মানুষের গল্প লিখবে। স্থানীয় গারোদের এবার ওর থেকে সত্যিকারের ভাল কিছু পাওয়ার আছে।"

ওদের কথার মধ্যে কল্পা জেগে গেল। সফরসঙ্গী ডাক্তারবাবু কল্পাকে উঠে বসতে বারণ করলেন। কল্পা মিহি গলায় বলল, "রহস্যের শেষে কী পেলি আমায় বললি না তো?"

দিঠি বলল, "যা পেলাম সে গল্প একসময় বলব তোকে ছাদে বসে চাঁদের আলোয়, কোনও এক গা-ছমছমে সন্ধেবেলায়। কিন্তু তুই একা-একা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি?"

কল্পা চোখ বন্ধ করে মৃদু হেসে বলল, "সে এক রূপকথার দেশে। দেখলাম দু'চোখের বাইরে অন্য একটা চোখ দিয়ে আরও কী-কী দেখা যায়। সেখান থেকে একটা জিনিস পেলাম।"

সুনৃত উৎসাহে ঝুঁকে পড়ে বলল, "কী?"

"আমাদের দলের একটা নাম।"

এবার দিঠি কল্পার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, "কী নাম?"

"টুয়াটারা!"

সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

কাহিনি: সমরেশ বসু

চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

হাই গোগোল।
আরে বুবাই, কোথায় যাচ্ছিস তোরা?
আমরা সিমলা, কুলু, মানালি বেড়াতে যাচ্ছি। দশদিন বাদে ফিরব।
বাই।
গোগোল অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। এবার গিয়ে চান করে নাও।
আচ্ছা মা, আমরা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি না কেন?

আর বেড়াতে গিয়ে কাজ নেই। বেড়াতে গেলেই তো তুমি কোনও না-কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। তাই নিয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।
তাতে আমি কী করব মা? আমি কি ইচ্ছে করে এসব করি নাকি? সব তো নিজে থেকেই হয়ে যায়।
দূর আর ভাল লাগে না। কতদিন কোথাও বেড়াতে যাইনি।
সন্ধেবেলা।

আরে, আমরা তো জানতামই না। কতদিন পরে তোর সঙ্গে কথা হচ্ছে বল তো?
এই, পুলু ফোন করেছে। ও এখন শিলিগুড়িতে পোস্টেড। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।
বাবা! এতদিন পরে!
পুলুমামা মানে যিনি দিল্লিতে থাকতেন।
পুলু তো শিলিগুড়িতে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে। দারুণ ফরেস্ট বাংলো পেয়েছে। এত কিছু তো আমরা জানতামই না।
আরে, আমিও কি জানতাম? প্রায় বছরদুয়েক হল ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই।
ও তো যেতে বলছে ওর ওখানে, ওখানকার ওয়েদার নাকি এখন দুর্দান্ত। তুমি কি বলো?

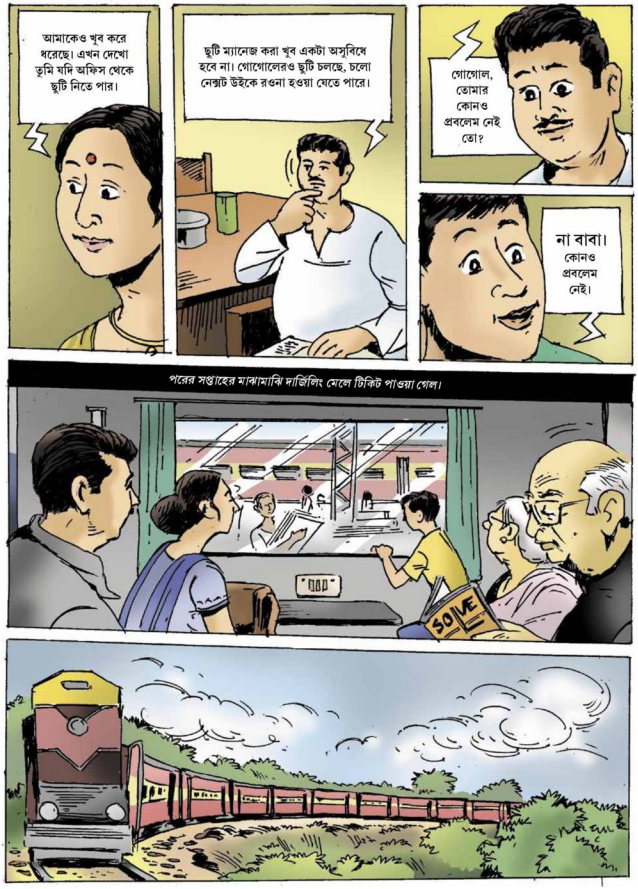
আমাকেও খুব করে ধরেছে। এখন দেখো তুমি যদি অফিস থেকে ছুটি নিতে পার।
ছুটি ম্যানেজ করা খুব একটা অসুবিধে হবে না। গোগোলেরও ছুটি চলছে, চলো নেক্সট উইকে রওনা হওয়া যেতে পারে।
গোগোল, তোমার কোনও প্রবলেম নেই তো?
না বাবা। কোনও প্রবলেম নেই।
পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি দার্জিলিং মেলে টিকিট পাওয়া গেল।
SOLVE

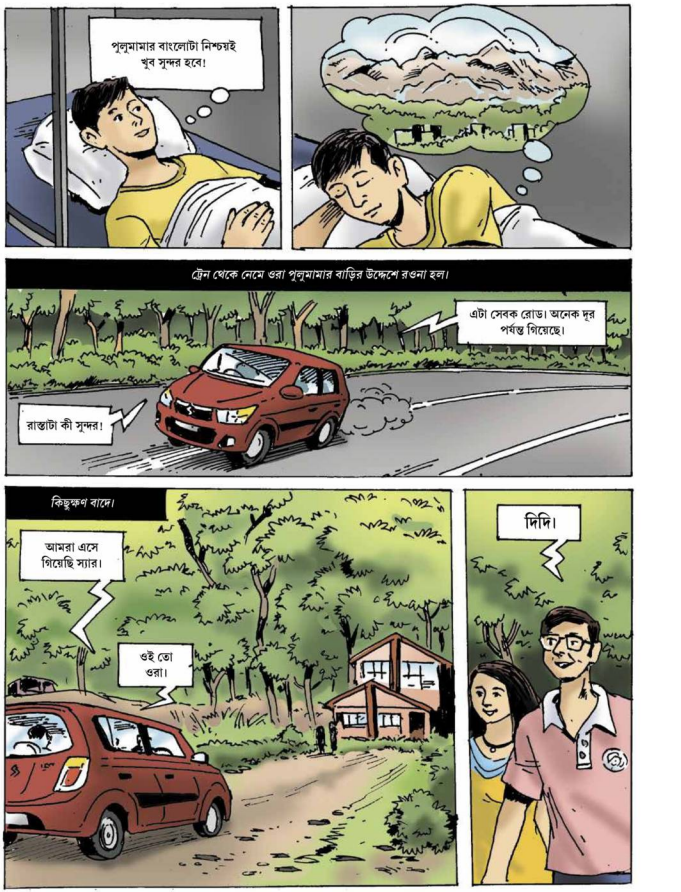
পুলুমামার বাংলোটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে!
ট্রেন থেকে নেমে ওরা পুলুমামার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল।
এটা সেবক রোড। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে।
রাস্তাটা কী সুন্দর!
কিছুক্ষণ বাদে।
আমরা এসে গিয়েছি স্যার।
ওই তো ওরা।
দিদি।

কী পুলুভায়া, কেমন আছ?
ভাল দারুণ ভাল।
ও মা ঈশানী, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!
কতদিন বাদে দেখা হল দিদি।
এই যে আমাদের আসল হিরো।
বড় হওয়ার পরে এই তোমাকে প্রথম দেখলাম।
আপনারা ভিতরে চলুন।
সন্ধেবেলা।
বাংলোটা তো জব্বর পেয়েছ হে!
ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো।
আজকের দিনটা ভাল করে রেস্ট নাও গোগোল বাবু। কাল সকালবেলা আমরা ঘুরতে বেরব। অনেক ভাল-ভাল দেখার জায়গা আছে।

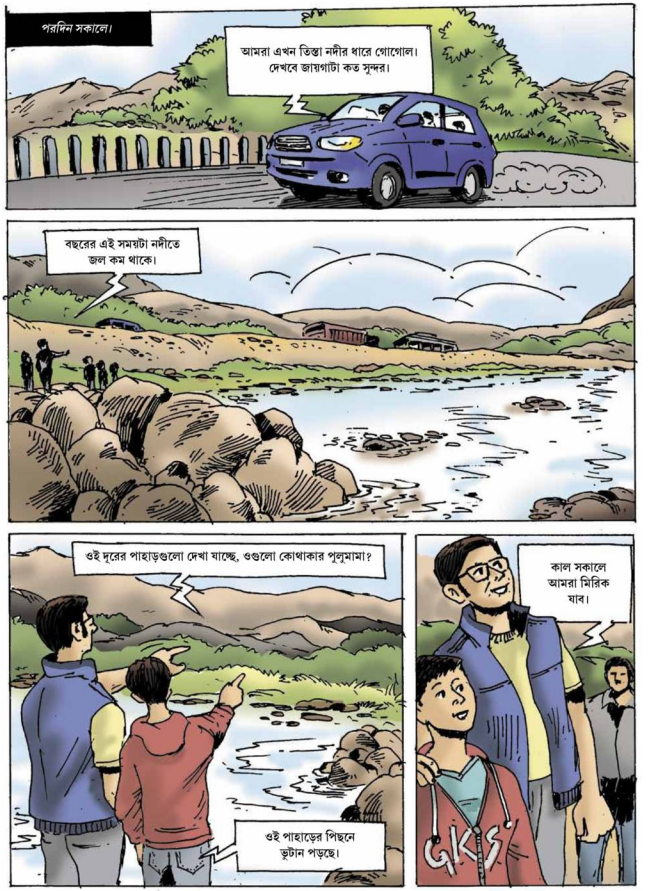
পরদিন সকালে।
আমরা এখন তিস্তা নদীর ধারে গোগোল। দেখবে জায়গাটা কত সুন্দর।
বছরের এই সময়টা নদীতে জল কম থাকে।
ওই দূরের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলো কোথাকার পুলুমামা?
ওই পাহাড়ের পিছনে ভুটান পড়ছে।
কাল সকালে আমরা মিরিক যাব।

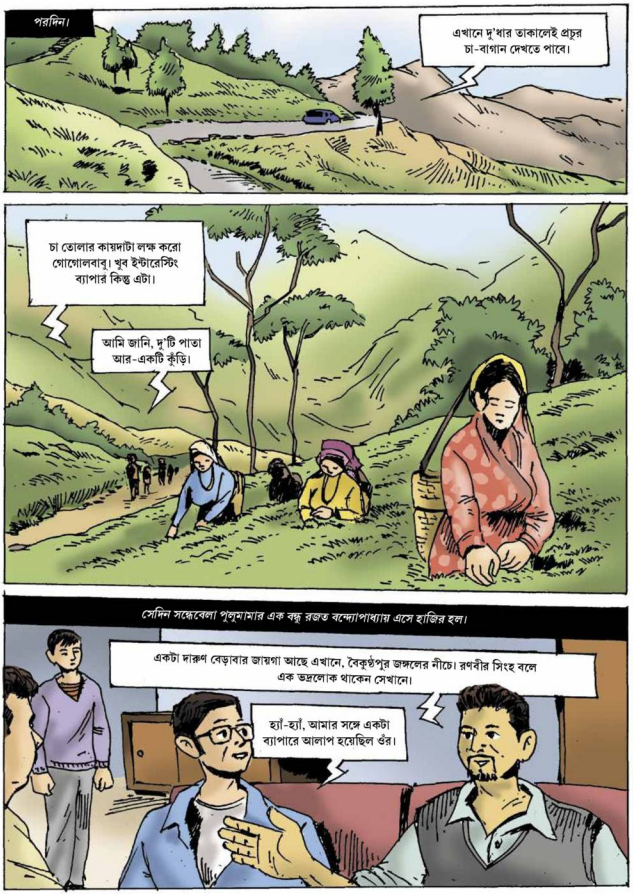
পরদিন।
এখানে দু'ধার তাকালেই প্রচুর চা-বাগান দেখতে পাবে।
চা তোলার কায়দাটা লক্ষ করো গোগোলবাবু। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কিন্তু এটা।
আমি জানি, দু'টি পাতা আর-একটি কুঁড়ি।
সেদিন সন্ধেবেলা পুলুমামার এক বন্ধু রজত বন্দ্যোপাধ্যায় এসে হাজির হল।
একটা দারুণ বেড়াবার জায়গা আছে এখানে, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের নীচে। রণবীর সিংহ বলে এক ভদ্রলোক থাকেন সেখানে।
হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল ওঁর।

অসাধারণ মানুষ এই রণবীর সিংহ। আমার সঙ্গে প্রচণ্ড খাতির ওঁর, বহুবার ওঁর বাড়িতে আমাকে যেতে বলেছেন।
বেশ তো, তা হলে বৈকুণ্ঠপুর যাওয়া যাক, কাল সকালেই রওনা হওয়া যেতে পারে। দিদিদেরও একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।
কি দিদি, তোমাদের কোনও আপত্তি নেই তো? জামাইবাবু আপনার?
না-না, আপত্তি কিসের?
দারুণ প্ল্যান।
ইয়া! জাঙ্গল সাফারি!
খালি আমাকে ফোন করে গাড়ির ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আর অফিসেও একবার জানিয়ে দিতে হবে।
গাড়ির চিন্তা করতে হবে না, কাল সকাল ছ'টায় আমরা বেরিয়ে পড়ব।

ওই একই সময়ে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে।
আর দেরি করবেন না স্যার।

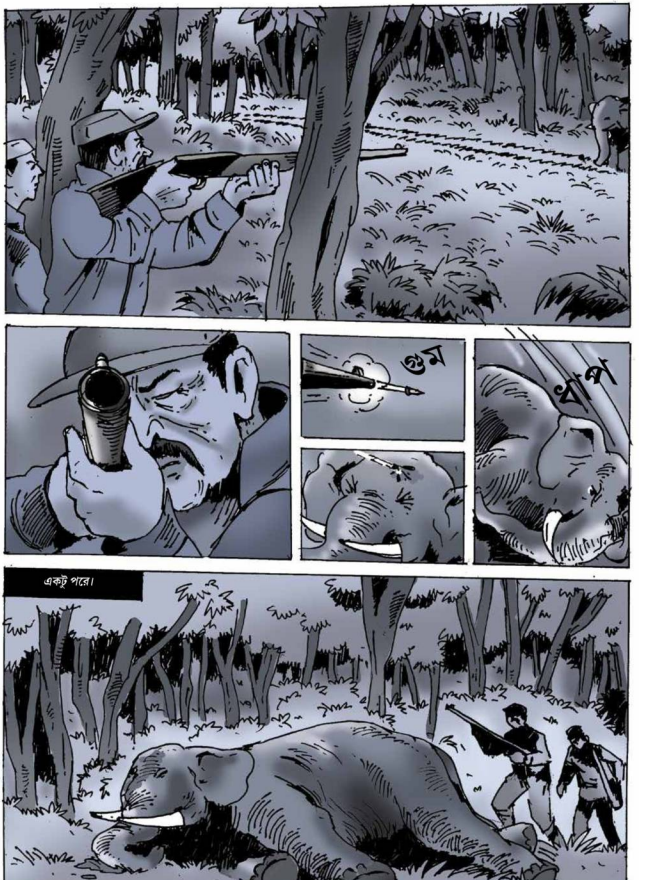
গুম
ধপ
একটু পরে।

আর দেরি কোরো না রতন।
আপনার গুলিটা ঠিক জায়গায় লেগেছে তো স্যার?
একদম।
হঠাৎ।
দুম দুম দুম
দুম দুম দুম
সর্বনাশ করেছে স্যার। এটা নিশ্চয়ই রণবীর সিংহের লোকেরা ড্রাম বাজাচ্ছে। নিশ্চয়ই গুলির শব্দ ওদের কানে গিয়েছে।
কে এই রণবীর সিংহ?
সাংঘাতিক লোক স্যার। এই জঙ্গলের পিছনেই ওর বাড়ি। আমাকে খুব ভালভাবে চেনে।
এখন আর কিছু করা যাবে না স্যার, বিপদ হয়ে যেতে পারে।
আমাদের এখুনি এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে।
দুম দুম

কী পাগলের মতো কথা বলছ তুমি রতন? আমি পার্টিকে কথা দিয়ে দিয়েছি, কাল সকালে ওদের জিনিসটা দিতে হবে।
এখন আর কিছু করা যাবে না স্যার। আপনি পার্টিকে বলে দিন। কাল দুপুরের দিকটা একবার এসে দেখব। এখন চলুন।

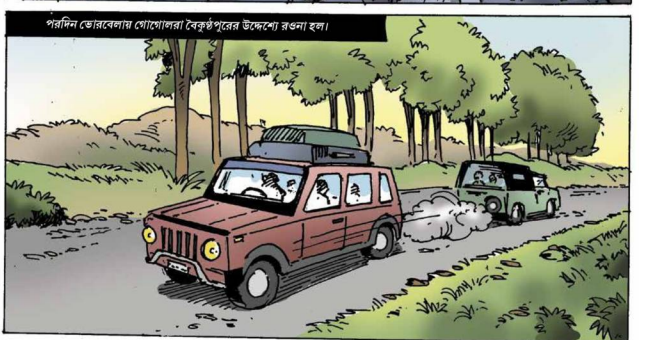
পরদিন ভোরবেলায় গোগোলরা বৈকুণ্ঠপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

এইবার আমরা জঙ্গলে ঢুকতে চলেছি গোগোলবাবু। সামনেই চেকপোস্ট, ওই দেখো দু'জন দাঁড়িয়ে আছে।

সব ঠিক আছে স্যার, আপনারা এগোন।
এখন এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে আমাদের কিছুক্ষণ যেতে হবে।
আচ্ছা রজত, এই রণবীর সিংহ ভদ্রলোক জঙ্গলে থাকেন কেন?
রণবীর সিংহ লোকটা একটু খামখেয়ালি। ওঁর একটা ব্যবসা আছে, উনি ট্রাকে করে নানা রকম অর্কিড, ফুলের বীজ, এইসব কলকাতায় সাপ্লাই দেন।
এখন অবশ্য ওঁর বয়স হয়েছে, ওঁর ছেলেরাই ব্যবসাটা দেখে। উনি আর বেশি বেরোন না।

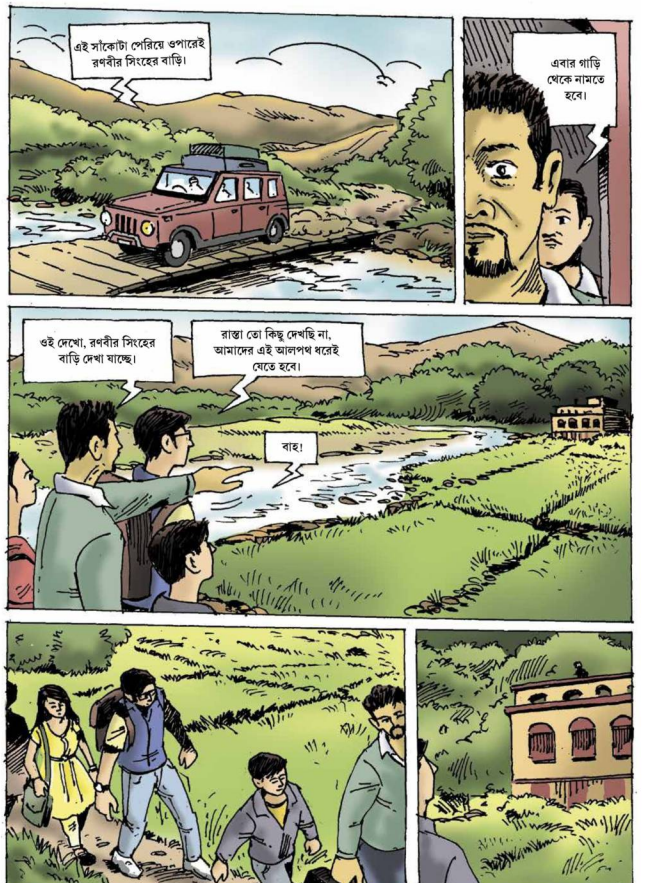
এই সাঁকোটা পেরিয়ে ওপারেই রণবীর সিংহের বাড়ি।
এবার গাড়ি থেকে নামতে হবে।
ওই দেখো, রণবীর সিংহের বাড়ি দেখা যাচ্ছে।
রাস্তা তো কিছু দেখছি না, আমাদের এই আলপথ ধরেই যেতে হবে।
বাহ!

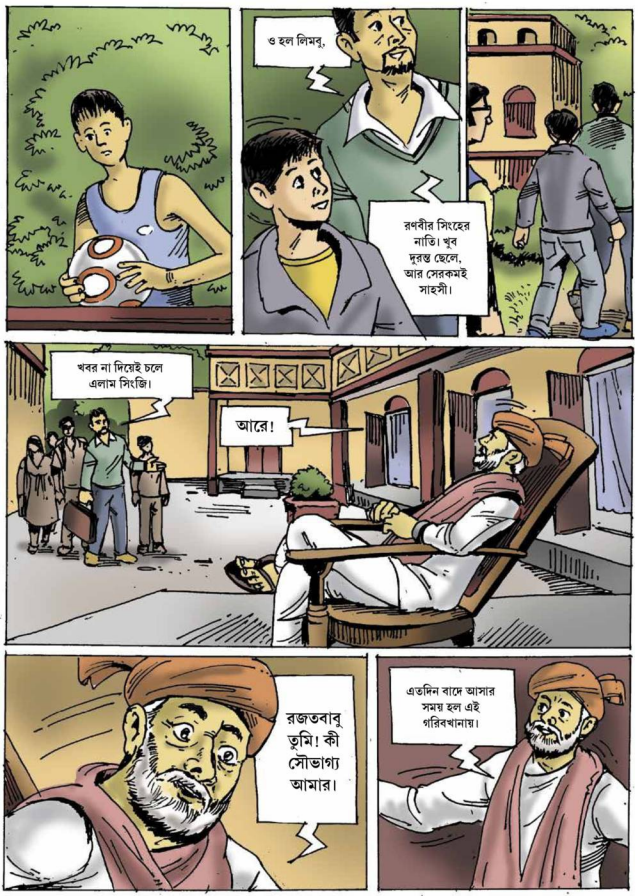
ও হল লিম্বু,
রণবীর সিংহের নাতি। খুব দুরন্ত ছেলে, আর সেরকমই সাহসী।
খবর না দিয়েই চলে এলাম সিংজি।
আরে!
রজতবাবু তুমি! কী সৌভাগ্য আমার।
এতদিন বাদে আসার সময় হল এই গরিবখানায়।

কলকাতা থেকে আমার এই বন্ধুর দিদি-জামাইবাবুরা বেড়াতে এসেছে। তাই একেবারে সবাইকে নিয়ে চলে এলাম।
খুব ভাল কাজ করেছ রজতবাবু। বহুত আচ্ছা।
আজ আপনার বাড়ি ফাঁকা-ফাঁকা দেখছি কেন সিংজি! বাড়ির লোকজন সব গেল কোথায়!
আমার ভাতিজার বিয়ে আছে ইউ পি-তে, আমাদের দেশের বাড়িতে। সবাই সেখানে গিয়েছে বাড়িতে খালি আমি আর লিমবু রয়েছি।
জলখাবার খেয়ে সকলে বাড়ির ছাদে উঠে এল।
কী অসম্ভব সুন্দর জায়গাটা গো!
সত্যি! না এলে খুব মিস করতাম।
এর পুরো কৃতিত্বটাই কিন্তু রজতের প্রাপ্য।
আরে না-না।
কিছুক্ষণের মধ্যেই লিমবুর সঙ্গে গোগোলের ভারী ভাব হয়ে গেল।

ওই জঙ্গলের পিছন দিকটা হল চুমুকডাঙ্গি।
সেটা আবার কী!
জঙ্গলের জন্তুজানোয়াররা ওখানে বিকেলের দিকে জল খেতে আসে। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে তোমাকে নিয়ে যাব।
এখান থেকে কত দূর?
খুব একটা দূর নয়।
দাদাজি, আমি গোগোলকে একবার চুমুকডাঙ্গি ঘুরিয়ে আনব?
জরুর যাও বেটা। তোমরা এখনই বেরিয়ে পড়ো, না হলে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যাবে।
না না। একা-একা জঙ্গলে যাওয়ার দরকার নেই।

আপনি চিন্তা করবেন না বহেনজি। লিমবু জঙ্গলের রাস্তা খুব ভালভাবে চেনে, ওদের কোনও বিপদ হবে না।
আমরা তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়ি দাদাজি?
যাও বেটা। সাবধানে যেয়ো।
একটু পরে।
এখন নদীতে জল খুবই কম!
বর্ষাকালে এই নদীকে চিনতে পারবে না। পুরো জলে ভরে যায়।
চলো, জঙ্গলে ঢোকা যাক।
কাল রাতে চুমুকডাঙ্গির দিক থেকে একটা গুলির শব্দ পাওয়া গিয়েছিল।
গুলির শব্দ!
কিন্তু শিকার করা এখন বেআইনি।

বেআইনি হলেও সেকথা মানছে কে?
দাদাজির কাছ থেকে শুনেছি এখানে চোরাশিকারির উপদ্রব আছে, যারা বেআইনি জন্তুজানোয়ারকে মারে। মাঝে-মাঝেই এরকম গুলির শব্দ শোনা যায়।
তা তোমরা এই ব্যাপারটা পুলিশকে জানাওনি!
জানিয়ে লাভ হয়নি।

দ্যাখো-দ্যাখো গোগোল কী সুন্দর পাখিটা!
বাহ!
আচ্ছা লিমবু...
ওই দিক থেকে কীরকম একটা শব্দ আসছে না!
তাই তো!
জঙ্গলের ওই দিকটায় একটা রাস্তা আছে। সেটা এখন আর কেউ ব্যবহার করে না। আমিও কোনওদিন ওই দিকটায় যাইনি। আওয়াজটা তো ওই দিক থেকে আসছে!
গিয়ে দেখবে নাকি একবার!

না-না গোগোল, ওদিকে গেলে আমাদের দেরি হয়ে যেতে পারে। চমুকডাঙ্গি আর যেতে পারব না তা হলে।
চলোই না একবার। কতক্ষণই বা লাগবে?
ঠিক আছে, তুমি যখন এত করে বলছ, তখন চলো।
সাবধানে এসো গোগোল।
হ্যাঁ।
আরে!

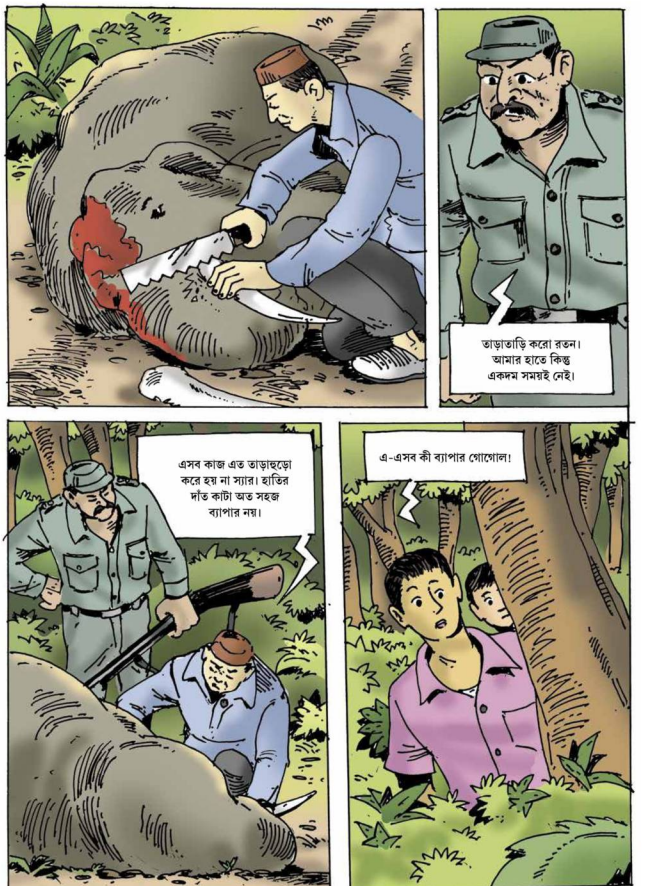
তাড়াতাড়ি করো রতন। আমার হাতে কিন্তু একদম সময়ই নেই।
এসব কাজ এত তাড়াহুড়ো করে হয় না স্যার। হাতির দাঁত কাটা অত সহজ ব্যাপার নয়।
এ-এসব কী ব্যাপার গোগোল!

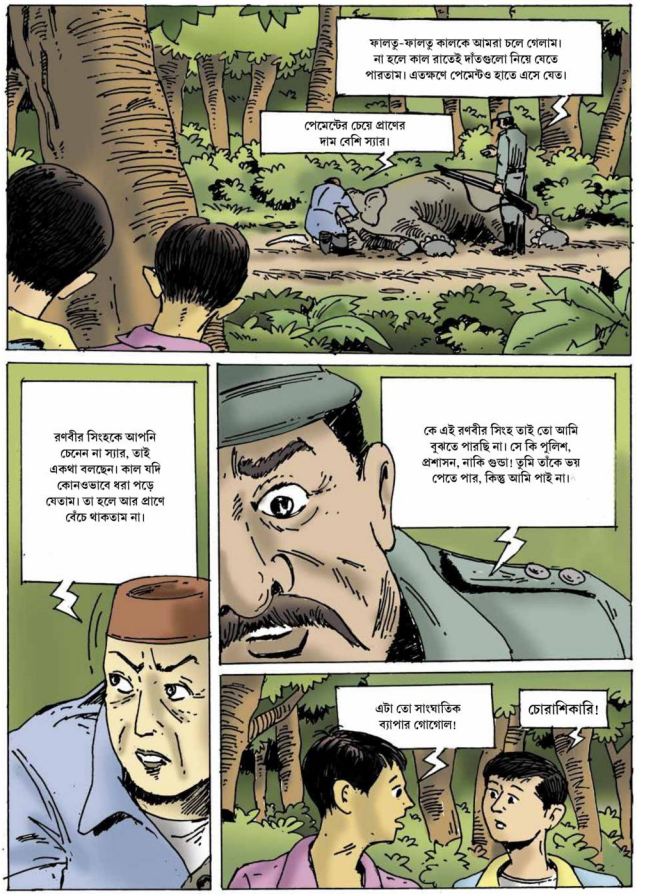
ফালতু-ফালতু কালকে আমরা চলে গেলাম। না হলে কাল রাতেই দাঁতগুলো নিয়ে যেতে পারতাম। এতক্ষণে পেমেন্টও হাতে এসে যেত।
পেমেন্টের চেয়ে প্রাণের দাম বেশি স্যার।
রণবীর সিংহকে আপনি চেনেন না স্যার, তাই একথা বলছেন। কাল যদি কোনওভাবে ধরা পড়ে যেতাম। তা হলে আর প্রাণে বেঁচে থাকতাম না।
কে এই রণবীর সিংহ তাই তো আমি বুঝতে পারছি না। সে কি পুলিশ, প্রশাসন, নাকি গুন্ডা! তুমি তাঁকে ভয় পেতে পার, কিন্তু আমি পাই না।
এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার গোগোল!
চোরাশিকারি!

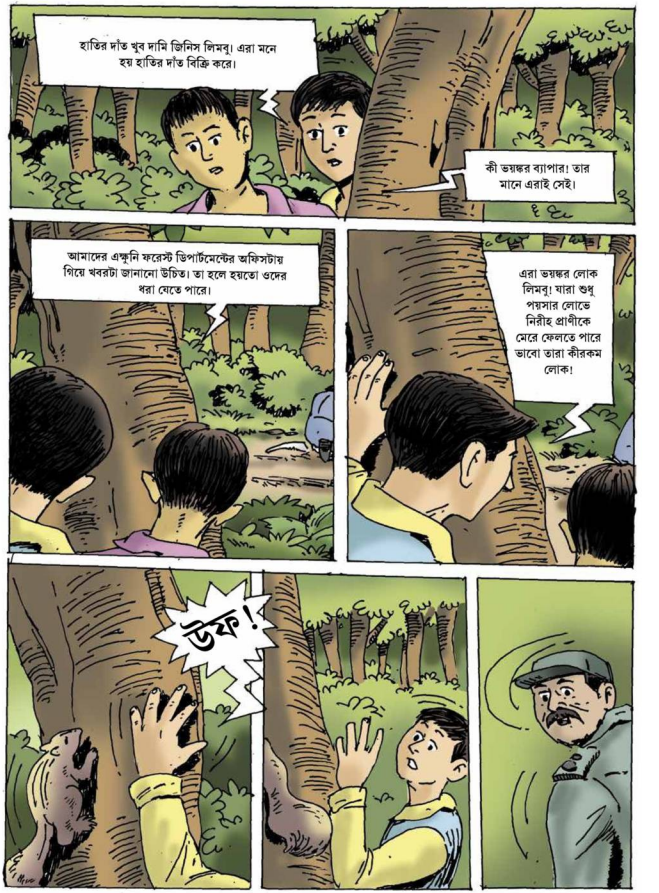
হাতির দাঁত খুব দামি জিনিস লিমবু। এরা মনে হয় হাতির দাঁত বিক্রি করে।
কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তার মানে এরাই সেই।
আমাদের এক্ষুনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসটায় গিয়ে খবরটা জানানো উচিত। তা হলে হয়তো ওদের ধরা যেতে পারে।
এরা ভয়ঙ্কর লোক লিমবু! যারা শুধু পয়সার লোভে নিরীহ প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারে ভাবো তারা কীরকম লোক!
উফ!

লিমবু!
রতন সিংহ! তুমি!
লিমবু, তুই এখানে কী করছিস?

লিমবু দাঁড়া, আমার কথা শোন।
কে এরা?
তুমি এখানে?
আর একমুহূর্ত দেরি নয় লিমবু, এক্ষুনি পালাতে হবে। নইলে...
কিন্তু রতন সিংহ, চোরাশিকারি...
লিমবু দাঁড়া, আমার কথা শোন, পালাবি না। আমি তোকে...
ওদের পালাতে দেওয়া যাবে না।

লিমবু, পালাও জলদি।
পালাবি না লিমবু।
দাঁড়া বলছি।
এটা ওদের থামাবে।

গুম
শাঁ-ও-ও-ও
ঝুপ

একটুর জন্য মিস করলাম।
লিমবু! পালাও।
ওরা গুলি চালাচ্ছে।
আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন নাকি? গুলি চালালেন কেন?
ওদের দৌড়ে ধরতে হবে।
ওদের ধরতেই হবে।

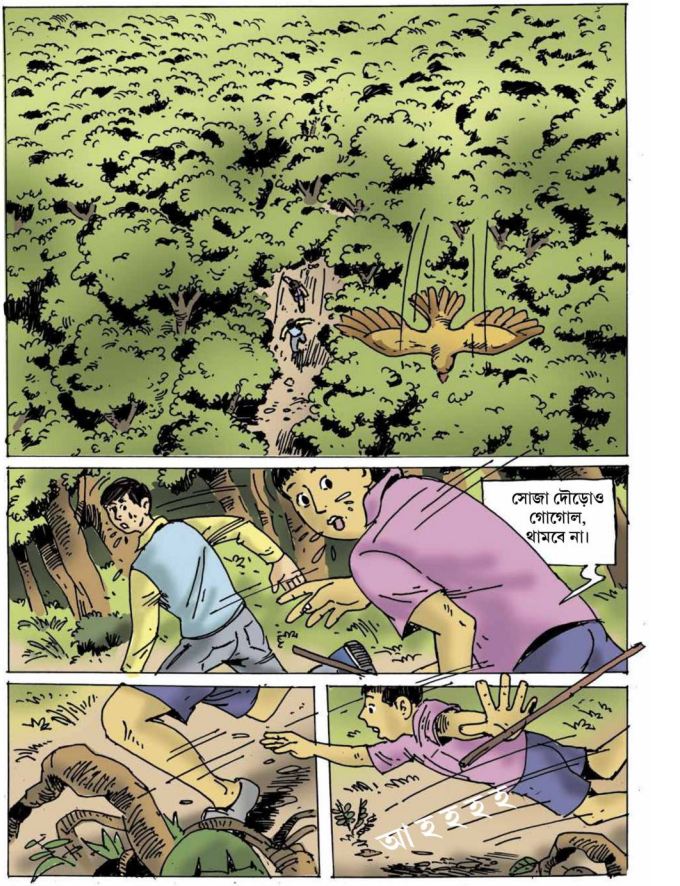
সোজা দৌড়োও গোগোল, থামবে না।
আহহহহ

লিমবু, তুমি ঠিক আছ তো?
আ-আহ
এই অবস্থায় তুমি ছুটতে পারবে না।
বাঁ পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা করছে। ওই ঝোপের পিছনটায় আমায় বসিয়ে দাও।
তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে থাক। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি এখানে বসে থাকো লিমবু। আমি ফরেস্ট অফিসে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি। ওদের ধরতেই হবে।
না গোগোল।
পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা কি তা হলে কাছাকাছি আছে?
আমার মনে হয় আমরা জঙ্গলের উলটো দিকে চলে এসেছি।
চুপ। আমার মনে হয় ওরা খুব কাছাকাছি কোথাও আছে।
এই দেখো।

টাটকা রক্ত!
ওরা ধারেকাছেই কোথাও আছে। আই অ্যাম শিওর।
ধরতে পারলে ছোঁড়াদুটোকে পিঁপড়ের মতো পিষে মারব।
কী করবে এখন?
আমার মনে হয় ওদের মধ্যে কেউ ভাল রকম জখম হয়েছে। তার মানে, ওরা ধারেকাছেই লুকিয়ে রয়েছে।
লিমবু আমার কথা ভাল করে শোনো। আমি ওদিকটা দেখে আসছি। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে নড়বে না।

আমাদের দু'জনকে দু'দিকে যেতে হবে।
আমি ওইদিকে জঙ্গলের ভিতরটা দেখছি। আপনি এই দিকটা তল্লাশি করুন। গুলি চালাবেন না কিন্তু।
উলটো দিকে চলে যাচ্ছে।
ওরা খানিকটা দূরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে।
কী ভয়ঙ্কর লোক এরা! কত নিরীহ হাতিকে প্রাণে মেরেছে এরা কে জানে?
গোগোল!

লিমবু
!!!
শয়তান ছোঁড়া। এখনও ভাল করে দুধের দাঁত পড়েনি, আমাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে! এবার মজা দ্যাখ।
আমরা কিছু জানি না। কিছু দেখিনি। আপনি লিমবুকে ছেড়ে দিন। প্লিজ়।

তোদের মতো পুঁচকে শয়তানদের ছেড়ে দেব?
প্রথমে তোর বন্ধুর ঘাড় মটকাব, তারপরে তোর!
না।
না। গুলি চালাবেন না।
আ-আ

হতচ্ছাড়া শয়তান! ছাড়
ছাড় বলছি! আ-আ-আ...
ধাপ

তবে রে শয়তান!
এবার তোকে কে বাঁচাবে?
আমি তোকে-আ
ধুম
ধুম ধুম

লিমবু বন্দুক দিয়ে লোকটার মাথায় বারবার আঘাত করতে লাগল।
পালাও লিমবু। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ফরেস্ট অফিসে গিয়ে খবরটা জানাতে হবে।
ডান দিকের রাস্তাটা ধরে চলো।
অ্যাই।

এবার মর।
না। ওকে মেরো না।
গুড়ুম
ওঁক
এ কী!

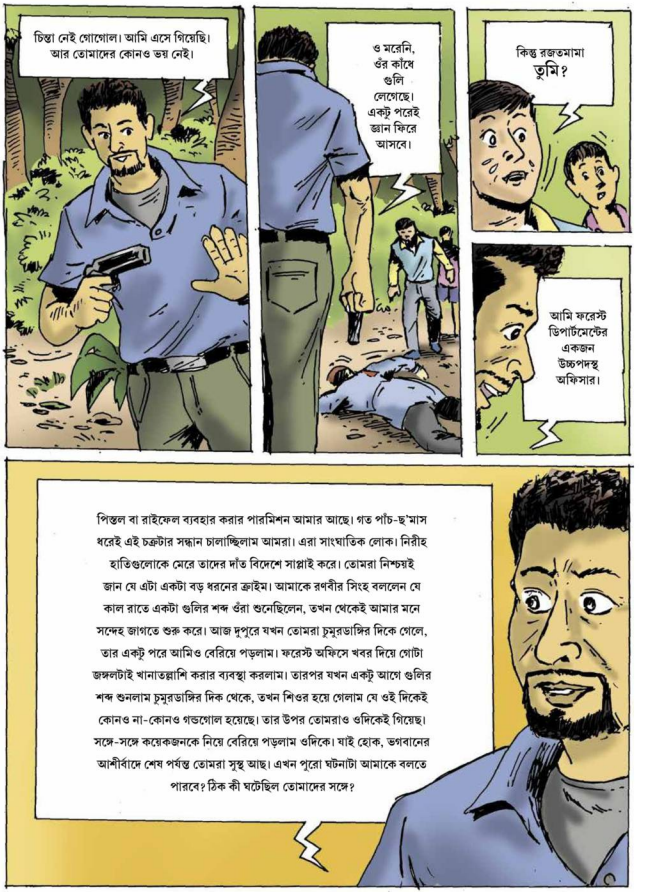
চিন্তা নেই গোগোল। আমি এসে গিয়েছি। আর তোমাদের কোনও ভয় নেই।
ও মরেনি, ওঁর কাঁধে গুলি লেগেছে। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে আসবে।
কিন্তু রজতমামা তুমি?
আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার।
পিস্তল বা রাইফেল ব্যবহার করার পারমিশন আমার আছে। গত পাঁচ-ছ'মাস ধরেই এই চক্রটার সন্ধান চালাচ্ছিলাম আমরা। এরা সাংঘাতিক লোক। নিরীহ হাতিগুলোকে মেরে তাদের দাঁত বিদেশে সাপ্লাই করে। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে এটা একটা বড় ধরনের ক্রাইম। আমাকে রণবীর সিংহ বললেন যে কাল রাতে একটা গুলির শব্দ ওঁরা শুনেছিলেন, তখন থেকেই আমার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করে। আজ দুপুরে যখন তোমরা চুমুরডাঙ্গির দিকে গেলে, তার একটু পরে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। ফরেস্ট অফিসে খবর দিয়ে গোটা জঙ্গলটাই খানাতল্লাশি করার ব্যবস্থা করলাম। তারপর যখন একটু আগে গুলির শব্দ শুনলাম চুমুরডাঙ্গির দিক থেকে, তখন শিওর হয়ে গেলাম যে ওই দিকেই কোনও না-কোনও গন্ডগোল হয়েছে। তার উপর তোমরাও ওদিকেই গিয়েছ। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওদিকে। যাই হোক, ভগবানের আশীর্বাদে শেষ পর্যন্ত তোমরা সুস্থ আছ। এখন পুরো ঘটনাটা আমাকে বলতে পারবে? ঠিক কী ঘটেছিল তোমাদের সঙ্গে?

গোগোল সবিস্তারে পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করে।
শাবাশ! তোমরা দু'জনে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ তা কল্পনাই করা যায় না।
এই তো ফোর্স এসে গিয়েছে। শুধু এই যে একজন নয়, আরও একজন আছে ওই দিকে।
আচ্ছা রজতমামা, হাতি তো মানুষের ক্ষতি করে না, তা হলে মানুষ হাতি মারে কেন?
লোভ, অর্থ লোভ। লোভ মানুষকে কতটা নীচে নামাতে পারে সেটা তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। এখন চলো, জিপে করে তোমাদের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করি। বাড়িতে সকলে নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।
সমাপ্ত

কাচের মুকুট

ঋতিকা নাথ

জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরে পিচের রাস্তাগুলো খুব শুকিয়ে যায়। গতদিনও নৈঋত এই দুপুরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে, ওদের কমপ্লেক্সে ফিরতে-ফিরতে ভাবছিল, ও যেন এক আরব বেদুইন, মরুভূমির মধ্যে জ্বলন্ত সূর্য মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছে। পিঠের স্কুলব্যাগটা আসলে জলহীন ভিস্তিটা, সত্যিই ব্যাগের ভিতরে জলের বোতলে একটা ফোঁটাও জল নেই। ভিস্তি-কাঁধে ছোট্ট বেদুইন, কিশোর যাযাবরটি মরূদ্যানের উদ্দেশে চলেছে। নৈঋতদের ফ্ল্যাটটি একটি মরূদ্যান, সেখানে আছে শান্তি-স্বস্তি...কিন্তু সে সবই গতদিনের কথা। সবই গতদিন...ঠাম্মা, ঠাম্মার জন্যই এত বড় সর্বনাশটা হল।

গতদিন বিকেলে নীল-সুকুল যখন নৈঋতদের ফ্ল্যাটে এল, তখনও নৈঋতের মা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরেননি। বাবার ফিরতে-ফিরতে সাড়ে ন'টা-দশটা। অগত্যা সুকুলদের দায়িত্ব ঠাম্মার।

নৈঋত খুব মন দিয়ে তুখড় অ্যাকসেন্টে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে লেকচার দিচ্ছিল। ঠিক তক্ষুনি ঠাম্মা লুচি-আলুর দমের প্লেট হাতে নৈঋতের ঘরে হাসি-হাসিমুখে ঢুকলেন এবং অবাক স্বরে বলতে থাকলেন, "ওব্বাবা! আমার ছোট্টমণি কত্ত বড় হয়ে গিয়েছে গো! এখন আবার ইংরেজিতে বক্তিমেও দেয়। তা হ্যাঁরে, বাড়িতে থাকতে ছেলেবেলায় যে ঠাম্মার কোলের মধ্যে রূপকথা না শুনলে ঘুমই আসত না, মনে পড়ে?"

নৈঋত এত বছর ধরে যে দুটো ধুকপুকুনি মনের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বন্ধ করে রেখেছিল, ঠিক সেই দুটোই হুড়মুড়িয়ে ঠাঠা রোদে এসে আছাড় খেয়ে

পড়ল।

নীল হো হো হাসল, "হ্যাঁরে নৈষ্কত, তোর ডাকনাম মণি? তোর মেয়েদের মতো নাম আছে, জানতাম না তো!"

সুকুল চোখ সরু করল, "বাড়ি মানে? আগে কোথায় থাকতিস?"

"না, মানে..." নৈষ্কত ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

নীল খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। ক্লাস নাইনের নৈষ্কত ঠিক কোন কথাগুলো লুকিয়ে রেখেছে? ভয়ঙ্কর কোনও সিক্রেট মনে হচ্ছে। বেশ-বেশ এইবারে মনে হয় ছেলেটার উইক পয়েন্ট পাওয়া যাবে, নইলে দিন-দিন যা অবস্থা হচ্ছে! কুইজ় কনটেস্টে কে ফার্স্ট? নৈষ্কত রায়। ফুটবল ক্যাপ্টেন কে? নৈষ্কত আছে না! ক্লাস টপার? সেখানেও নৈষ্কত। প্রতিবার দুই-এক মার্কসের জন্য নীল-সুকুলরা সেকেন্ড-থার্ড হয়। এমনকী, পাজি ছেলেটা কালচারাল প্রোগ্রামগুলোর প্রাইজও সব মেরে দিল। নাটকে-আবৃত্তিতে...নীলরা প্রতি মাসে প্রচুর টাকা দিয়ে এক নামী আবৃত্তি শিল্পীর আবৃত্তি শিখলেও বাংলার টিচার অমরস্যারের সেই এক কথা, ওদের আবৃত্তি নাকি বড় যান্ত্রিক, প্রাণহীন। স্কুলের অনুষ্ঠানের মহড়ায় রবি ঠাকুরের 'যাত্রী' আবৃত্তি করতে গিয়ে সুকুলের মুখ চুন হয়ে গিয়েছিল এবং নৈষ্কতের মুকুটে আরও একটা পান্না যোগ হয়েছিল। "আছে... আছে স্থান" বলামাত্রই অমরস্যারের ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল, "তুই তো কবিতাটাই কিচ্ছু বুঝিসনি। যা, গিয়ে বোস। নৈষ্কত, এবারে তুই বল।"

সেদিন নৈষ্কতের কণ্ঠস্বর সারা ক্লাসরুমে গমগম করে উঠেছিল, "আছে-আছে স্থান..."

নৈষ্কতের কণ্ঠে পুরো কবিতাটা নীলের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, ছোট্ট একটি লাজুক মেয়ে নীল শাড়ি পরে এক আঁটি ধান নিয়ে নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে। নৌকোয় ভীষণ ভিড়। প্রৌঢ় মাঝি মেয়েটিকে আশ্বস্ত করছেন। স্থান আছে..."কীরে বল?" সুকুলের তেতো স্বরে নীলের চমক ভাঙল।

লুচি-আলুর দম চেটেপুটে শেষ করে নীলরা যখন নৈষ্কতের ফ্ল্যাট থেকে বেরল, ততক্ষণে ওরা জেনে গিয়েছে, ওদের ভীষণ ব্রাইট বন্ধুটি আসলে এক নিম্নমধ্যবিত্ত মফস্সলি ছেলেমাত্র। বাবার পোস্টিং কলকাতায় হওয়ায় বাড়ি ছেড়ে, বাংলা মিডিয়াম স্কুল ছেড়ে মফস্সলি ছেলেটা ওদের ঝাঁ চকচকে পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছে।

আজকে টিফিনব্রেকে নৈষ্কত যখন হাত ধুয়ে ফিরল, স্বাগত আর নীলের মধ্যে তখন জোরদার তর্ক চলছে। নৈষ্কত টিফিনবক্স বের করতে-করতে শুনল, আধুনিক ইংরেজি বই নিয়ে আলোচনা চলছে।

সুকুল হাসল, "মণিসোনা, সোনামণি, তুমি বই পত্তে পালো? ইংরেজি বই! ওলে বাবালে, আমাদের থোত্ত থোকা কত বলো হয়ে গিয়েথে!"

"দূর হয়ে যাও, কথা নেই তোমার সঙ্গে," ঠাম্মা দরজা খুলতেই মণি দুমদাম পায়ে ফ্ল্যাটে ঢুকল। সারা ফ্ল্যাটে ছেঁড়া-ছেঁড়া পুজোর গন্ধ ছড়ানো। কিছুটা ধূপের গন্ধ লেগে রয়েছে ডাইনিং রুমের সোফায়। কিছুটা ফুল-বেলপাতার গন্ধ ভয়ে-ভয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিয়েই দৌড়ে পালাচ্ছে। অনেকখানি পুজোর গন্ধ চুপিচুপি জটলা বেঁধেছে ঠাম্মার ঘরে। নৈষ্কত রাগী পায়ে ঠাম্মার ঘর ছাড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে লক্ষ করল, ঠাম্মার ঘরের মধ্যে একটি খুদে ঠাকুরের আসনকে কেন্দ্র করে ছোট্ট-ছোট্ট পাথরের-কাঁসার-তামার পাত্রে কলা-পেয়ারা-ন্যাসপাতি...কত কী যে কেটে গুছিয়ে রাখা।

"মণি, কী হয়েছে তোর?"

নৈষ্কত ঠাম্মার মুখের উপরে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল, "কী হয়েছে? তুমি জান না কী হয়েছে? কে বলেছিল তখন আমাকে অত দরদ দেখাতে? স্কুলে আর মুখ দেখানোর জো নেই। আমি এত বছর ধরে যেটা সিক্রেট রাখলাম, তুমি... তুমি..." মনভাঙা ছেলেটি বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল।

"আমি তোর জন্যে সিন্নি আর চরণামৃত রেখেছিলাম। ঠিক আছে তুই না হয়..."

নৈষ্কত বন্ধ দরজার এপার থেকে শুনল, ওই পারে ঠাম্মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাপা, দুঃখী পায়ে নিজের ঘরে ফিরছেন।

সিন্নি, পুজোর চরণামৃত...আজকে পূর্ণিমা! হে ভগবান, তার মানে ঠাম্মা সকাল থেকে নির্জলা উপোসি!

নৈষ্কতদের বাড়ির চিরাচরিত নিয়ম, প্রত্যেক পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের পুজো করা হবে এবং সেই পুজোর সিন্নি-প্রসাদ বাড়ির কর্ত্রী বাড়ির সবচেয়ে ছোট সদস্যকে খাইয়ে তবে উপোস ভাঙবেন। এখন আর নৈষ্কতদের সেই কয়েক পুরুষের জমিদারিও নেই, ধনসম্পত্তি তো নেই-ই, তবুও পুরনো কিছু বনেদি সংস্কার এখনও বাড়ির প্রত্যেকের মজ্জাগত। নৈষ্কত বাড়ি ছেড়েছে বেশ কয়েক বছর হল। ওর অনুপস্থিতিতে কাকুর মেয়ে আস্তুই বরাবর প্রসাদ নিয়ে আসছে। নৈষ্কত ক্লাস ফোর পর্যন্ত বাড়ির কাছের ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে বড় শহরে এসে এখানের এক নামী ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি হয়। প্রথম-প্রথম খুব সমস্যা হত। ছোট্ট নৈষ্কত শিক্ষকদের বেশির ভাগ কথাই বুঝে উঠতে পারত না। তবে মৌমা সমস্যাটিকে বেশি বাড়তে দেননি। তিনি নিজে দক্ষ শিক্ষিকা, বাড়িতেই ধরে-ধরে ছেলেকে শিখিয়েছেন ইংরেজি আদবকায়দা। আজকে ক্লাস নাইনের যে চটপটে দক্ষ নৈষ্কত রায় বাড়িতে-স্কুলে সর্বক্ষণ একটি 'সবচেয়ে ভাল'র মুকুট পরে থাকে, তার কৃতিত্ব অনেকটাই নৈষ্কতের মা, মৌমার।

"ঠাম্মা," নৈষ্কত স্কুলের সব তেতো স্মৃতি ভুলে দরজা খুলে দৌড়ে গেল ঠাম্মার ঘরে। সুহাসিনী চোখ বুজে শান্ত, স্নিগ্ধ মুখে ধ্যান করছিলেন।

সামনের ছোট্ট, কাঠের চৌকিতে পিতলের সিংহাসনে নারায়ণশীলা ফুল-বেলপাতায় পুরো ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

"এসে গিয়েছ দাদুভাই? বোসো," খোলা জানলাটা থেকে সোনার গুঁড়োর মতো পড়ন্ত দুপুরের রোদ্দুর ঢুকছে ঘরটাতে। ঠাকুরের আসনের সামনে রাখা ধূপদানিতে দুটো জ্বলন্ত ধূপ থেকে বেরতে থাকা ধোঁয়া বাতাসে আবছায়া ছবি আঁকছে। নৈষ্কত চোখ মুছল, "এরকম করলে তুমি সারবে কী করে? এই এক মাস হল এসেছ। এর মধ্যে তো আমাকে একবারও বলোনি যে তুমি খোদ নারায়ণশীলাটাই সঙ্গে নিয়ে এসেছ! কেন? শরীর খারাপের মধ্যে অর্ধেকদিন না খেয়ে থাকলে তুমি সারবে কী করে? যদি তুমি সেই অনিয়মই করবে, তবে এখানে এসে বড় ডাক্তার দেখানোর মানে কী হল?"

সুহাসিনী হাসলেন, "নারায়ণকে বাড়ি ফেলে এলে জল-বাতাসা দেবে কে শুনি? যতদিন আমি আছি আমার দায়িত্ব। আমি না থাকলে নারায়ণশীলা তোর মায়ের কাছেই তো থাকবে।"

নৈষাত ফুঁসে উঠল, "যাচ্ছেতাই বলা বন্ধ করবে? না থাকলে মানোটা কী? আমি কোথাও যেতে দেব না তোমাকে।"

"বেশ-বেশ দাদুভাই। তুমি সারাজীবন এই বুঁড়ি ঠাম্মাকে মাথায় করে রেখো। এখন হাঁ করো দেখি।"

নৈষাতের মুখে প্রসাদ দিয়ে সুহাসিনী সিন্নি-মাখা ভেজা ডান হাতটি নিজের কপালে ছোঁয়ালেন, "ভাল রেখো ঠাকুর, যেন অনেক বড় হতে পারে।"

"কী বিড়বিড়াচ্ছ?" নৈষাত পানসা মুখে সিন্নি চিবোতে-চিবোতে জিজ্ঞেস করল, "এবারে নিজে কিছু খেয়ে নিলে ভাল হয় না?"

সুহাসিনীর মুখের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো হাসল, "হ্যাঁ, খুব ভাল হয়। মণিসোনার কথা কী ফেলা যায়? তা হ্যাঁরে, আজকে কী হয়েছিল বললি না তো।"

নৈষাত তখন আর ক্লাস নাইনের ফুটবল ক্যাপ্টেন নেই, ও হয়ে গিয়েছে সাত বছরের ছোট্ট মণি, পলিথিনের লাল বলে মারাদোনা-মাফিক কিক করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে হাঁটু ছড়ে গিয়েছে। সে কী প্রচণ্ড কান্না। তখন সুহাসিনী এসে মণিকে কোলে তুলে নিলেন। তিনি নিজের খসখসে আঙুলে-আঁচলে নাতির চোখ মোছাচ্ছেন আর মণি ফোঁপাচ্ছে, "জান ঠাম্মা, বলটা না কী দুষ্টু, আমাকে ফেলেই দিল! দ্যাখো না কত্তখানি কেটে গিয়েছে, উঃ উঃ কী ব্যথা।"

"জান ঠাম্মা, সুকুলটা কী বাজে, সারাটা ক্লাস সকলের সামনে আমাকে 'সোনামণি-মণিসোনা' বলে ভ্যাঙাচ্ছিল। এদিকে ওর নিজের ডাকনাম যে খ্যাঁদা সে খবর কেউ জানে না।"

"সোনামণি বলে ভ্যাঙাচ্ছিল যখন, তখন তুই আবার খ্যাঁদাবাবু বলে ডাকিসনি তো?"

নৈষাত মুখের পেয়ারার টুকরোটা গিলল, "না, তুমিই তো বলেছ, কেউ ভ্যাঙালে তাকে পালটা ভ্যাঙাতে নেই, তা হলে আমার আর তার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকল না।"

সুহাসিনী স্বস্তির শ্বাস ফেললেন, "বেশ।"

যাই হোক না কেন, এটা চরম সত্যি, নৈষাত আর 'মণি' নেই। শীতের ঝরাপাতার মতো এ মন থেকে ছোট্ট-ছোট্ট খুশিগুলো ঝরতে শুরু করেছে। 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'বুড়ো আংলা'য় ধুলো জমছে। নৈষাতের ঘরের দেওয়ালে এখন আর কাঁচা হাতে আঁকা ঘরবাড়ির ছুইং সেলোটেপ দিয়ে লাগানো থাকে না, পরিবর্তে জায়গা নিচ্ছে গ্রিন ডে, ফল আউট বয়দের পোস্টার, রোনাল্ডো, মেসির কাট-আউট। আগে যে ছোট্ট ছেলেটিকে শরতের প্রথম শিউলির মনভরা খুশি এনে দিতে পারত, সেই ছেলেটিই এখন ছুটিতে বাড়ি গেলে শিউলিতলার কচিফুলগুলো মাড়িয়ে আনমনে হেঁটে যায়। একবারের জন্যেও নিচু হয়ে ফুল কুড়নোর কথা নৈষাতের মনেই আসে না। সুহাসিনী সব লক্ষ করেন, সবই বোঝেন। তবুও তাঁর হাঁসের পালকের মতো মনটা এক অন্যায় যন্ত্রণায় চিনচিন করে ওঠে। যদি আর কয়েকটা দিন মণি ছোট থাকত। যদি আর কয়েকটা দিন রাস্তার ধারের নোংরামাখা নুড়ি কুড়িয়ে এনে খুশিতে উজ্জ্বল চোখে বলত, "ঠাম্মা দেখেছ, কী সুন্দর না পাথরটা? এটাকে যত্ন করে পালিশ করলে পন্নারাগমণি হতে পারে না? হিরেও তো কয়লা থেকেই হয়।"

"সাবধানে আসিস দাদুভাই।"

স্কুলের উদ্দেশে বেরনোর আগে প্রতিদিনের মতো আজকেও নৈষাত ঠাম্মাকে প্রণাম করে মাথা তুলল, "হ্যাঁ ঠাম্মা, তুমি কিন্তু ওষুধ সব ক'টা সময়মতো খাবে।"

মৌমা তাঁর স্কুলের উদ্দেশে এক ঘণ্টা আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। জুতো পরতে-পরতে ছেলের কথা শুনে অগত্যা হাসলেন, "হ্যাঁ মা, নাতির আদেশ।"

সুহাসিনীও মুচকি হাসলেন, "ওরে হ্যাঁরে, বাব্বা! ঠিক তো হয়েই এসেছি প্রায়। আর সমস্যা হলে পাশের ফ্ল্যাটের বিশ্বাসগিন্নিকে ডাকব, এই তো?" অগত্যা সম্মতিসূচক হাসলেন।

নৈষাত বাড়ি থেকে বেরল ঠিকই, তবুও কোথায়, কী যেন বাকি থেকে গেল...কী যেন হয়নি...উসখুসে অস্বস্তি... হোমওয়ার্কের কিছু বাকি রয়েছে নাকি? না, তা তো নয়...কী যে বেশ...

ক্লাসে টিচার চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়িয়ে চলেছেন, "পাই স্কোয়ার রুট।" হাতের মতো হাত অঙ্ক করে চলেছে, মাথার মতো মাথা হাবিজাবি ভাবছে। একদিন রবিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে নৈষাত হঠাৎ করে ঠাম্মার ঘরে ঢুকতে গিয়ে চমকে গিয়েছিল। ঠাম্মার ঘরের ছোট্ট ব্যালকনিটাতে প্রচুর কাক, মহানন্দে ভাত খাচ্ছে। ঠাম্মা শান্ত মুখে ব্যালকনির সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে ওদের খাওয়া দেখছেন। নৈষাত গতদিন রাস্তায় যে বিড়ালটা দেখেছিল, সেই বিড়ালটাই ঠাম্মার কোলে ধবধবে সাদা শাড়ির উপরে শুয়ে ঝিমোচ্ছে। নৈষাতের পায়ের শব্দে কাকগুলো ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেলে সুহাসিনী চমকে উঠে দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন, "কীরে দাদুভাই?"

নৈষাত চট করে কোনও উত্তর দিতে পারেনি। সুহাসিনী ম্লান হেসেছিলেন, "আসলে অন্যান্য দিন দুপুরে তোরা কেউ থাকিস না তো, একা-একা ভাত খেতে খুব খারাপ লাগে। তাই খেতে-খেতে একটু করে খাবার ওদের দিই। আর এই পুষিটা খুব ভাল। কাকদের খাওয়া হয়ে গেলে যা ভাত-কাঁটা পড়ে থাকে সব একদম চেটেপুটে সাফ করে দিয়ে যায়। গতদিন কে যেন ওর লেজ মাড়িয়ে দিয়েছে।"

"নৈষাত!" অমরস্যারের ধমকে নৈষাত চমকে উঠল, । যাহ! ম্যাথস ক্লাস শেষ হয়ে গিয়েছে? স্যার কখন ঢুকলেন?

খামোকাই একের পর-এক টিচার এসে পড়িয়ে গেলেন। নৈষাতের মাথার সাত হাত উপর দিয়ে উড়ে গেল ওর সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটির আবৃত্তি, সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষকের সুরমাখা গম্ভীর কণ্ঠে, "মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে..."

টিফিনব্রেকে সুকুল মুখ ভেংচে এগিয়ে এল, "আজকে সোনামণির কী হয়েছে? মণিসোনা কথা শোনা? মণি কথা শোনে না?"

ডাকনামটা শুনেই নৈষাত লাফিয়ে উঠল, "মানে?"

নৈষাত ব্যাগ নিয়ে ছিটকে উঠল, "ঠাম্মার হার্টের ওষুধ, বাবা কালকে এনেছিল, আমাকে দিয়ে বলেছিল 'ঠাম্মার ওষুধের বাক্সের একদম সামনে রাখবি,' আমি তখন পড়ছিলাম, ওষুধটা আমার স্টাডিটেবিলের ড্রয়ারেই রয়েছে হে ঈশ্বর!"

"কাঁদিস না, আর কেঁদে কী হবে।"

"ছেলেটা ওর ঠাম্মাকে বড্ড ভালবাসত।"

"আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। একে গরমকাল, এর পর শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার

পরেও প্রচুর কাজ। এরকম করলে বডিটা...”

বডি? ঠাম্মা এখন শুধু একটি বডি! নৈষ্কত জলভরা চোখেই ফুঁসে উঠল, “না, দেব না। কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না আমার ঠাম্মাকে। ঠাম্মার কিচ্ছু হয়নি, এক্ষুনি উঠে বসবে।”

নৈষ্কতের দুই চোখে তখন আস্ত একটি নদী, চোখ ছাপিয়ে বইছে। শতবার ডাকাডাকিতে, শত হাহাকারেও সাদা ধবধবে বিছানায় চিরঘুমে ঘুমিয়ে থাকা চোখের পাতা দুটো একটুও কাঁপল না। অগত্যা এসে ছেলেকে শক্ত হাতে ধরে রইলেন। নৈষ্কতের চোখের সামনেই অগত্যা বেরতে-বেরতে বলে গেলেন, “ওর শ্মশানে আসার দরকার নেই।”

মৌমা সজল চোখে নৈষ্কতের মাথায় হাত রাখলেন, “তুই তোর ঘরে যা।”

“সাইন থিটা ইজ় ইকুয়াল টু...”

“নেড়া হয়েছে কেন রে?”

“ছাড় তো, আলটিমেট গেঁয়ো ভূত একটা।”

“অ্যাই মণি ওঠ। অ্যাতো ঘুমোচ্ছিস কেন?”

“টুডে উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট...”

“মণি! হ্যাগো, শোনো না, ও এভাবে কেন ঘুমোয়? সেই দুপুরে স্কুল থেকে এসে না খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়েছে, রাতে খাবার সময় একে ঘুম থেকে তুলতেই পারলাম না, অ্যাই দাঁড়া...কিছু খা, আয় আমি খাইয়ে দিচ্ছি, দুই গাল ভাত খেয়ে... মণি শোন।”

“নৈষ্কত কী হয়েছে তোমার?” ডান কাঁধে একটি শক্ত উষ্ণ হাতের ছোঁয়ায় নৈষ্কত যেন কত বছরের ধোঁয়াশা কাটিয়ে রোদ্দুর খুঁজে পেল।

“কী হয়েছে? লেখাপড়ায় একদম মন নেই, চেহারা তো শুকিয়ে একেবারে...” শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রশ্নে এতদিন পরে নৈষ্কত কাঁদল। প্রাণ খুলে কেঁদে দিল। শেষ কান্না ঠাম্মাকে শেষবারের মতো দেখার দিন আর আবার এই আজকে।

টিফিনব্রেকে স্কুলের করিডরে দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে নৈষ্কত বলল, সব কথাই বলল। ঠাম্মার মৃত্যু, নিজের ছেলেবেলা, প্রিয় শিক্ষককে বিশ্বাস করে সারা টিফিনব্রেক জুড়ে নৈষ্কত বলে গেল। উত্তরে ও যা শুনল, “ও এই? তুমি তো ডিপ্রেশনে ভুগছ। আরে, এটা কোনও ব্যাপারই না। আমি এর চেয়েও কত্ত মারাত্মক কেস সারিয়েছি। হ্যাঁ, যদিও আমার সাবজেক্ট বাংলা, তবু সাইকোলজিটাও একটু-আধটু জানি।”

ধোঁয়াশাগুলো আবার চোখ ভারী করে তুলছে। নৈষ্কত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অমরস্যারের সমস্ত কথা সহ্য করল। নেই, কেউ নেই যিনি নৈষ্কতকে বোঝেন, স্নেহভরে কাছে ডেকে সব কথা, সব কষ্ট শোনেন, সমস্যা সমাধানের পথ বলে দেন। একজনই ছিলেন।

“তারপর আমার কলিগের ছেলেটা...”

টিফিনব্রেক শেষ। নৈষ্কত ধীর পায়ে ক্লাসের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। চারদিকের প্রচুর মুখোশপরা মুখ থেকে অনর্গল কিছু কথা বেরচ্ছে, নৈষ্কতের কানে টুকরো-টুকরো এসে ঢুকছে, “ওয়ার্থলেস”, “আরে আসলে কোনও যোগ্যতা নেই,” “ব্যাকডেটেড হাঁদারাম...”

জলভরা চোখে নৈষ্কত চুপচাপ হেঁটে চলল, নিজের মনে বিড়বিড়াতে লাগল, “আমি জানি আমি ওয়ার্থলেস। ছোট্ট থেকে সকলের মুখে শুনে আসছি। কোনওদিন একটা সাবজেক্টেও যদি হায়েস্টের চেয়ে দুই নম্বর কম পাই, তা হলেই আমি ওয়ার্থলেস, কবিতা মুখস্থ বলতে-বলতে শব্দ ভুলে গেলেই অপদার্থ...একজন বলত না, খালি একজন...”

“কীরে! খাতার মার্জিন ট্রায়াঙ্গুলার কবে থেকে হতে শুরু করল? তুই একটা মার্জিন টানতে পারছিস না? দে আমাকে...”

নৈষ্কতের হাত থেকে সুকুল ওর ভূগোল প্রজেক্টের খাতাটা টেনে নিল। নৈষ্কত চুপচাপ ধোঁয়াশা ভরা চোখে দেখল, সুকুল ক্ষিপ্র হাতে একের পর-এক সাদা পৃষ্ঠাগুলো বাক্সবন্দি করছে। একটু দূরে চেয়ারে বসে থাকা ভূগোলশিক্ষকও লক্ষ করলেন, একজন স্টুডেন্টের খাতা নিয়ে আর একজন কী যেন করছে। তিনি নিয়মমতো রেগে গেলেন, “রোল নম্বর ওয়ান, নৈষ্কত রায়।”

নৈষ্কত ধীরপায়ে হেঁটে গেল, শিক্ষকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সুকুল চেরা চোখে লক্ষ করল, টিচার নৈষ্কতকে বকছেন, “হাউ ক্যান ইউ বি সো ইরেসপনসিবল?” বড় উঠেছে মরু ঝড় বইছে কী? সামনে একজন চেয়ারে বসে এত চেঁচাচ্ছেন কেন?

“ইউ আর নট পেয়িং এনি অ্যাটেনশন...”-অ্যাটেনশন? অ্যা-টে-ন-শ-ন...কী যেন বানানটা ছিল...একটা শব্দ হচ্ছে...ছুটির ঘণ্টা মনে হয়। এবারে বাড়ি-না, না ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে।

“মণি।”

“হ্যাঁ ঠাম্মা,” শীতকালের দুপুর, দশ বছরের নৈষ্কত ঠাম্মার বিশাল পালঙ্কের ধবধবে বিছানায় বালাপোশ গায়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে। জানলা দিয়ে সোনারঙা রোদ ঢুকছে। ঠাম্মা রোদের দিকে পিঠ দিয়ে বিছানার একধারে বসে। কানে সোনার দুলে বসানো মুক্তোটা রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

“দাদুভাই,” হাতের রামায়ণটা বন্ধ করে সুহাসিনী নৈষ্কতের মাথায় হাত রাখলেন, “আজকে একটা গল্প বলি শোনো। এই গল্পটা সারাজীবন মনে রাখবি।”

“হ্যাঁ ঠাম্মা বলো,” ছোট্ট নৈষ্কত ঠাম্মার কোলের মধ্যে মাথা রেখে চোখ বুজল। সুহাসিনী শান্ত স্বরে বলতে শুরু করলেন, “অনেকদিন আগের কথা। এক গ্রামে একটি পথের ধারে এক বিষধর সাপ থাকত। সেই সাপের বিষের কুখ্যাতি এত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল যে, মানুষ তো দূর অস্ত, কোনও ইঁদুর-ছুঁচোও পথটির ত্রিসীমানা মাড়াত না। নতুন কোনও শিকার না পেয়ে সাপ অনাহারে ধুঁকতে ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কেন এত ভয়ঙ্কর করে গড়লেন? ভয়ে কেউ আর আমার ত্রিসীমানা মাড়ায় না। আমি না খেয়ে মরতে বসেছি।'

“ঈশ্বর উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাকে শক্তি দিয়েছি ঠিকই, ভয়ঙ্কর তুমি নিজের দোষে হয়েছ। এতদিন ধরে বিষের অপব্যবহার করে এসেছ, কত নিরীহ মানুষ মেরেছ।'

“সাপ প্রার্থনা করল, 'তবে যে বিষের জন্যে আজকে আমার এই দুরবস্থা, সেই বিষ আপনি ফিরিয়ে নিন।'

“প্রার্থনা মঞ্জুর হল। বিষধর সাপটি হয়ে গেল কেঁচোর সমান নিরীহ প্রাণী।

ধীরে-ধীরে সবাই জানতে পারল। সাপটি এখন নির্বিষ, নিরীহ। পথে লোক চলাচল শুরু হল। ইঁদুরেরা স্বচ্ছন্দে সাপটির সামনে দৌড়ে বেড়ায়। একবার একটি লোক পথ দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে লাঠির বাড়ি মেরে সাপটির মাথাই ভেঙে দিল। রক্তাক্ত যন্ত্রণায় মরো-মরো সাপ ঈশ্বরকে দুষতে লাগল, 'আপনি আমাকে ছোবল মারতে বারণ করেছিলেন, আজ আমার অবস্থা দেখুন! আমার যদি বিষ থাকত।'

"ঈশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "আমি তোমাকে অযথা ছোবল মেরে কাউকে প্রাণে মারতে বারণ করেছিলাম ঠিকই, দরকারে ফণা তুলে ফোঁস করে উঠতে বারণ করিনি।"

নৈষাত চোখ মেলল। রাত ক'টা এখন? পাশে রাখা ছোট্ট ফোনটা অন করে নৈষাত দেখল, চারটে দুই। ভোর হতে আর দেরি নেই।

"হ্যাঁরে নৈষাত, এসব কী শুনছি?" টিফিনব্রেকে স্বাগত ফার্স্ট বেঞ্চ ছেড়ে নৈষাতের দিকে এগিয়ে এল। নৈষাত ফোর্থ বেঞ্চের কর্নারে মাথা নিচু করে বসে ছিল। স্বাগতর প্রশ্নে মুখ তুলে তাকাল, "কীরে?"

স্বাগত কিছুক্ষণ চুপচাপ নৈষাতের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানাল, "সুকুল সারা স্কুলে বলে বেড়াচ্ছে, তোর প্রজেক্টের সব ড্রয়িং নাকি ও করে দিয়েছে। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। সুকুল বলল, 'কালকে জিওগ্রাফি টিচারও দেখেছেন। দরকারে স্যারকে জিজ্ঞেস করে আয়।' এটা কী সত্যি?"

নৈষাত টানটান হয়ে বসল, "তোর কি মনে হয়?"

স্বাগত ভ্রু কুঁচকোল, "দ্যাখ, এটা সবাই জানে যে সুকুল ড্রইং-আবৃত্তি ইত্যাদি শেখে। সেখানে তোকে নিয়ে আমরা অঁথৈ অন্ধকারে। কিছু মনে করিস না, বড্ড ক্যাচক্যাচ করছি। সুকুল-নীলরা তোর নামে যা রটিয়ে বেড়াচ্ছে, প্রিন্সিপ্যালের কানে উঠলে গার্ডিয়ান কল কিন্তু অবধারিত।"

ঘোঁয়াশা কাটতে শুরু করেছে। নৈষাত শক্ত হল, "আচ্ছা।"

ছুটির ঘন্টা পড়েছে। সবাই কলকলিয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছিল, সুকুলও।

নৈষাত শান্ত, শক্ত গলায় ডাকল, "সুকুল, একটু দাঁড়া।"

সুকুল পিছন ফিরেই ভেংচে উঠল, "মণিসোনার আজকে আবার কী হেল্প লাগবে? এবার কি লাইফ সায়েন্স প্রজেক্টেও আমি করে দেব?"

অনতিদূরেই টিচার্সরুম, শিক্ষকরা বেরচ্ছেন। আর একটু হলেই নৈষাত সমস্ত সংযম হারিয়ে সুকুলের নাকবরাবর একটা মোক্ষম ঘুসি মেরে দিত। নৈষাত দাঁতে দাঁত চেপে রইল। নীল, শ্বাশত আরও চার-পাঁচজন সুকুলের আশপাশে দাঁড়িয়ে। নীল হাসল, "নাকি এবারে কোলে করে বাড়ি দিয়ে আসতে হবে?"

"সোনামণি বাড়ি গিয়েই বা এখন কী করবে? ঠাম্মা তো মারা গিয়েছে।"

এবারে নৈষাতের মাথার ভিতরের নিবু-নিবু আগুনটা দাউ-দাউ জ্বলে কান-মাথা ছাড়িয়ে এত বছরের সংযম-ভদ্রতা-নম্রতা সব পুড়িয়ে ফেলল, সেই রাগের তেজ এতই মারাত্মক, নৈষাতের মনে পাথরের মতো জমে থাকা হীনম্মন্যতাগুলোও ছাই হয়ে গেল। রাগে, দুঃখে নৈষাত চিৎকার করে উঠল, "কাউকে ক্রিটিসাইজ করার আগে একবার ভাব, যাকে ক্রিটিসাইজ করছিস, তুই কি তার নখের তুল্য? কেউ অষ্টক্ষণ নিজেকে নিয়ে হামবড়ামি করে ঢাক পিটিয়ে বেড়াতে পছন্দ করে না বলেই যদি তুই ভেবে নিস সে অ্যাকচুয়ালি একটি গাধা, জন্মের পর থেকে স্রেফ ঘাস খেয়ে বড় হয়েছে, তবে সেটা পুরোপুরি তোর নীচ ভাবনা-চিন্তার দোষ। আমি তোকে আমার প্রজেক্ট শিটের মার্জিন টানতে একবারও বলিনি। তুই যেচে এসেছিলিস। কোন আক্কেলে তুই সারা ক্লাসে বলে বেড়ালি আমার প্রজেক্টের সবটা তুই নিজে করেছিস? যে ছেলে সঙ্কিতা আর সঞ্চয়িতার পার্থক্য জানে না, স্ট্র্যাটোফিয়ার উচ্চারণ করতে গেলে তোতলায়, যার মানসিকতা এতটাই জঘন্য যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পথের নিরীহ কুকুর-বিড়ালগুলোর গায়ে ঢিল ছুড়তে-ছুড়তে টর্চার করতে-করতে যায়, সে করবে হেল্প?"

নৈষাতের তোড়ের মুখে সুকুল তোতলাল, "তুই-তুই..."

"হ্যাঁ আমি। বল কী বলবি? কিছু বলার আছে? পার্সোনালিটি আছে তোর? অথেনসিটি? ভদ্রতা বানান জানিস? এইটুকুনি বোধ নেই।"

"তুই একটা গেঁয়ো ব্যাকডেটেড থার্ড ক্লাস প্যাথেটিক ফ্যামিলির ছেলে হয়ে..."

নৈষাত হাসল, "আপডেটেড ফ্যামিলির জ্বলন্ত এগজাম্পল যদি তোরা হোস, তবে ঈশ্বরকে শতকোটি ধন্যবাদ যে আমি ব্যাকডেটেড, আমার বেড়ে ওঠা ব্যাকডেটেড।"

ভারী কিছু একটা হুড়মুড়িয়ে পড়ে ঝনঝনিয়ে ভেঙে গেল নাকি? যাক। মাথাটা খুব হালকা লাগছে। অভিজ্ঞ, শ্রদ্ধেয় কারও শিক্ষণের কাছে মাথা নিচু করলেই যে মুকুট মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তেমন মুকুটের নৈষাতের আর প্রয়োজন নেই।

সুকুলরা হাঁ হয়ে দেখল, অত ভারী স্কুলব্যাগটা নিয়েও নৈষাত মাথা উঁচু করে হেঁটে চলেছে।

ফ্যানের হাওয়ায় দেওয়াল থেকে আঠা খুলে যাওয়া পোস্টারগুলো ওড়ে। অ্যাডভেঞ্চার-থ্রিলারগুলো হারিয়ে যায়। সেদিকে মন নেই নৈষাতের। এখনও সকালের মতো সকাল হয়। বার্ষিক পরীক্ষায় নিয়মমতো প্রথম হয়ে ক্লাস টেনে ওঠার পরে একদিন রোববারের দুপুরে নৈষাত দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঠাম্মার ঘর পেরিয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছিল। কাজের মাসি এসে নিয়মিত ঠাম্মির ঘরটা ঝেড়ে-মুছে ততকণ করে রাখেন। ঠাম্মার ঘর পেরিয়ে নিজের ঘরের দিতে যেতে-যেতে নৈষাত ভাবল, নাহ, ঠাম্মার মুখও তো আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। আবছায়া মনে পড়ে, সাদা সুতির শাড়ি, ধূপ-ধুনোর গন্ধ, শিরওঠা হাতে পাতলা সোনার বালাটায় জলের ফোঁটার চিকচিক...শান্ত, স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রতি ভোরের প্রার্থনা, "অসতো মা জ্যোর্তিগময়।

তমসো মা জ্যোর্তিগময়।

মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

সবাইকে ভাল রেখো।"

আনমনা পাদুটো নৈষাতকে ওর নিজের ঘরের দিকে না নিয়ে গিয়ে ঠাম্মার ঘরের দরজার সামনে এনে হাজির করল। কতদিন কেটে গিয়েছে, কারও আর ঠাম্মার কথা মনে পড়ে না। নৈষাত অবাক চোখে দেখল, এখনও প্রতি দুপুরে ঠাম্মার ফাঁকা চেয়ারটায় পুষি এসে বসে থাকে, ব্যাকনিন কাছে চারটে কাক শুকনো মুখে ওড়াউড়ি করে।

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

সম্পূর্ণ উপন্যাস

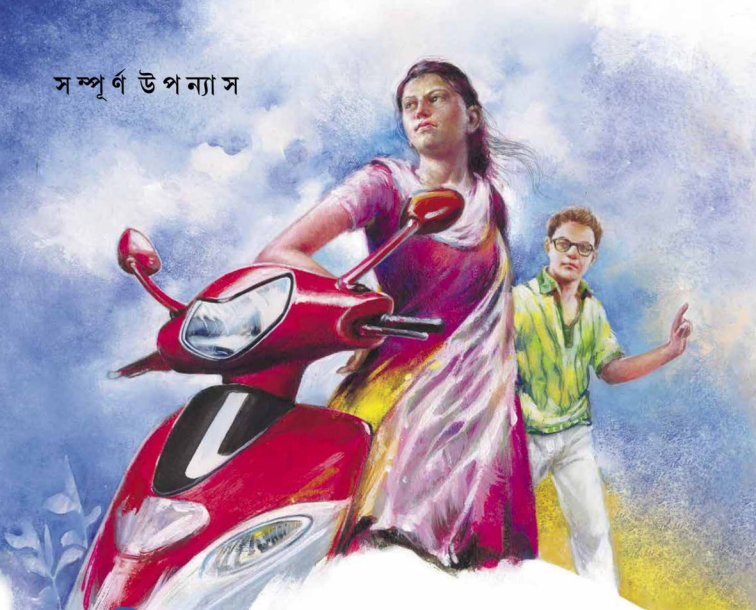

ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুরহস্য

জয়দীপ চক্রবর্তী

ছবি: *সৌমেন দাস*

ঝুলন ফোন করল যখন, তখন ঘড়িতে বাজে ঠিক তিনটে দশ। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা শেষ। বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে নোটন টিনটিন পড়ছিল মন দিয়ে। বইগুলো আগেও পড়েছে সে, কিন্তু কিছু বই থাকে যেগুলো বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। ঝুলন বলল, "ঠিক কুড়ি মিনিট সময় দিচ্ছি। তৈরি হয়ে নিতে পারবি? একজায়গায় যাব তোকে নিয়ে।"

"কোথায়?" আলসে গলায় জিজ্ঞেস করে নোটন।

"মন্দিরাদের বাড়ি, কলপুকুরের পাশ দিয়ে ঢুকে বেশ খানিকটা। সূর্য সেন নগর। খুব অদ্ভুত ব্যাপার একটা। সবটা ফোনে বলা যাবে না এখন। তোর সঙ্গে দেখা হলে বলছি। তুই দেরি করিস না। আমি আমার স্কুটি নিয়ে আসছি। দাঁড়াব না। তোর বাড়ির বাইরে পৌঁছে হর্ন দেব, তুই দৌড়ে বেরিয়ে আসবি, বুঝেছিস?"

"ঠিক আছে। আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি। তুমি এসো," বলে বইটা বন্ধ করে উঠে পড়ল নোটন। জল দিল চোখে-মুখে। তারপর প্যান্টের উপরে টি-শার্টটা গলিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। ওর মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, ব্যাপার কী? বলা নেই কওয়া নেই, এমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চললি?"

"ঝুলনদি ফোন করেছিল। বেরতে হবে এক্ষুনি," বলে চুলটুল আঁচড়ে রেডি হয়ে নিল নোটন। আর তখনি ঝুলনের স্কুটিটা এসে দাঁড়াল ওর বাড়ির সামনের রাস্তায়। ঝুলন হর্ন বাজানোর আগেই একলাফে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল নোটন, "ঝুলনদি আমি রেডি, চলো।"

"গুড," হাতের ইশারা করে ঝুলন, "চলে আয়। বসে পড় আমার পিছনে।"

কলপুকুর পেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় একটা গাছের নীচে দাঁড়াল ঝুলন। নোটনকে বলল, "নাম এখানে। ব্যাপারটা তোকে একটু ব্রিফ করে রাখি যাতে মন্দিরাদের বাড়িতে ঢোকার পরে একেবারে কেবলে না যাস।"

"কী ব্যাপার বলো তো," মুখটাকে খুব সিরিয়াস করে বলে নোটন।

ঝুলন গল্প বলার ঢঙে বলতে শুরু করে, "মন্দিরা আমার পুরনো বন্ধু। স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম। জগবন্ধু গার্লসে। ওর বাড়িতেও গিয়েছি সে সময়ে কয়েকবার। পরে অবশ্য তেমন যোগাযোগ ছিল না। ইলেভেন থেকে আমাদের ট্রিম আলাদা হয়ে যায়। কলেজও আলাদা ছিল দু'জনের। মন্দিরার বাবা ব্রতীনআঙ্কল মধুরাপুরের একটা স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন। রাশভারী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তবে খুবই স্নেহপরায়ণ। আমাকেও খুবই ভালবাসতেন। মানুষটার সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যেত ভীষণ সৎ এবং নীতিবোধসম্পন্ন ছিলেন তিনি।"

"বারবার ছিলেন-ছিলেন বলছ কেন?" ঝুলনের কথার মাঝখানেই বলে ওঠে নোটন, "তোমার বন্ধুর বাবা, আই মিন ব্রতীনআঙ্কল কি আর বেঁচে নেই?"

"না," আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে ঝুলন, "মাসখানেক আগে হঠাৎ মারা গিয়েছেন তিনি। রাতে। ঘুমের মধ্যেই। ডাক্তার বলছে ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। কিন্তু গতকাল তাঁর একটা ডায়েরি পড়তে-পড়তে মন্দিরার মনে হয়েছে ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।"

"সে কি!" অবাক গলায় বলে নোটন, "কী লেখা ছিল সেই ডায়েরিতে?"

"সেটা আমি এখনও জানি না। আমায় মন্দিরা ফোনে অত ডিটেলে কিছু বলতে চায়নি। ও চাইছিল আমি একবার ওর বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটা দেখি। খুব আপসেট হয়ে আছে মেয়েটা। বসন্তকুঞ্জে আমাদের জন্যে সেই যে নারী পাচারকারীর দলটা ধরা পড়ে গিয়েছিল, সেই ঘটনাটা তো ও-ও শুনেছে। ওর স্থির বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে, এই ব্যাপারে আমিই একমাত্র সাহায্য করতে পারি ওকে প্রকৃত সত্যিটাকে টেনে বের করে এনে।"

"ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন একমাস হতে চলল। এতদিন পরে এমন একটা অদ্ভুত কথা মাথায় এল মন্দিরাদির, আর সেই কথায় সায় দিয়ে চলে এলে তুমি? কী করে তুমি এখন সত্যি খুঁজে বের করবে? ডাক্তার নিজেই যখন সন্দেহ করেননি কিছু। তেমন হলে তিনিই তো পোস্টমর্টেম সাজেস্ট করতেন," হাত নেড়ে বলে নোটন।

"তোর কথাগুলো অস্বীকার করছি না নোটন। মানছি তোর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু মন্দিরার এখন মনের যা অবস্থা ফোনে এসব বলে তাকে বোঝানো খুবই মুশকিল ছিল রে। তাই ভাবলাম বিপদের সময় আমায় যখন ওর পাশে চাইছে, তখন চলেই আসি আপাতত। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখেটেখে ঠান্ডা মাথায় ওকে বোঝানো যাবে তখন ধীরে সুস্থে," বলতে-বলতেই গাড়িতে ওঠে ঝুলন। নোটনের দিকে তাকিয়ে বলে, "বুঝলি তো সব। এবারে চল। কাবাব মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর ঘেমে কাজ নেই। যা বিচ্ছিরি রকমের গুমট গরম পড়েছে আজ। ওদের বাড়িতে ঢুকে পাখার তলায় বসি অন্তত।"

॥ ২ ॥

বাড়িতে ঢুকে বাইরের ঘরের সোফাতেই বসেছিল ঝুলন আর নোটন। মন্দিরা বলল, "আয়, ভিতরের ঘরে গিয়ে বসি। এই ঘরের বাইরেই রাস্তা। কে কোথায় আড়ি পেতে শুনবে আমাদের কথা! জানিসই তো কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না আজকাল চট করে। তা ছাড়া দেওয়ালেরও কান থাকে। কোথা থেকে কী হয় বলা তো যায় না কিছু।"

ঝুলন মিষ্টি করে হাসল। তারপর মন্দিরার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "ধুস, কী যে বলিস! কে আমাদের কথা শুনতে যাবে লুকিয়ে-লুকিয়ে বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে?"

"জানি না", ঠোঁট উলটে বলে মন্দিরা, "কিন্তু শুনতেও পারে। আমার কেমন যেন মনে হয় কারা যেন আড়ালে কী একটা ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছে আমাকে কিছু জানতে না দিয়ে," কথাগুলো বলার সময় গলাটাকে যতটা সম্ভব নামিয়ে নিল মন্দিরা। চারদিকে চেয়ে নিল মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। স্পষ্টতই ওকে কেমন যেন নার্ভাস লাগছিল। ওরা ভিতরের ঘরে গিয়ে বসার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কাকিমা প্লেটে করে মিষ্টি আর গ্লাসে জল নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখলেন। ঝুলনের দিকে চেয়ে বললেন, "কতদিন পরে এলি রে তুই ঝুলন। কতদিন পরে তোকে দেখলাম!" তারপর নোটনের দিকে চেয়ে বললেন, "ওকে তো চিনলাম না।"

"আমার ভাই। ওর নাম নোটন। আমাদের একই পাড়ায় থাকে।"

"নোটন খুব ব্রাইট আর ব্রেভ ছেলে জান তো মা," মন্দিরা বলে উঠল। লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল নোটন। কাকিমা ওর মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে বললেন, "বেঁচে থাকো বাবা। খুব বড় হও। তুমি তো বোধ হয় ওঁকে দেখোওনি কখনও। উনি আজ বেঁচে থাকলে তোমায় দেখে ভারী খুশি হতেন। তোমার মতন সাহসী আর বুদ্ধিমান ছেলেদের খুব পছন্দ করতেন উনি।"

"কাকুর ঠিক কী হয়েছিল সেদিন?" প্লেট থেকে একটা সন্দেশ মুখে ফেলে ঝুলন জিজ্ঞেস করল মন্দিরার দিকে চেয়ে।

"সত্যি বলতে কী তেমন কিছুই হয়নি ঠিক," মন্দিরা বলতে শুরু করল, "বাবার হাই প্রেশার ছিল। রোজ ওষুধ খেতে হত দু'বেলা। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে একটু বেশিই গম্ভীর লাগছিল বাবাকে। ক'দিন ধরেই দেখছিলাম বাবা কিছু একটা ব্যাপারে বেশ টেনস্ড। স্কুলের কোনও ঝামেলা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। আমি কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করেছিলাম কয়েকবার। আমাকে বলেছিলেন, এসব প্রোফেশনাল হ্যাজার্ড সব কাজের জায়গাতেই কম-বেশি থাকে। ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। শুধু পাঁক থেকে বেরনোর রাস্তাটা যে করে হোক নিজেকেই খুঁজে বের করে নিতে হবে।"

"আর কিছু? মানে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা কেউ-কেউ, যাদের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হচ্ছিল?" ঝুলন আগ্রহ নিয়ে বলে।

"নাহ্," দু'দিকে মাথা নাড়ায় মন্দিরা, "আর কিছুই জানি না আমরা কেউ। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পরে সন্ধের খানিক বাদে বাবা আমাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন একটু বসতে। বলেছিলেন কিছু জরুরি কথা আমাকে বলে রাখা দরকার। না হলে তিনি দুম করে চোখ বুজলে আমরা সমস্যায় পড়ে যেতে পারি। শুনে খুব রাগ করি আমি। বলি, অমন কথা শুনতে চাই না আমি আর।"

"তারপর?"

বাবা হেসে বললেন, 'পাগলি মেয়ে, কিছু কথা জেনে রাখতে হয়। ফর সেফটি।' তখনই আমাদের ডোরবেলটা বাজল। দরজা বাবাই খুলেছিলেন। বাবার স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন বাবার সঙ্গে। কী নাকি জরুরি প্রয়োজন। তাঁকে দেখেই বাবা বললেন, 'তুই ও ঘরে চলে যা মানু। তোর সঙ্গে এ নিয়ে কাল কথা বলব।' তারপর বাবা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ভিতরের ঘর থেকেই একসময় মনে হল বাবা খুব উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে কীসব বলছেন ওই ভদ্রলোককে। কী বলছেন বুঝতে পারিনি অবশ্য। বেশ কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পরে তিনি চলে যান।"

"ভদ্রলোকের নাম?" ঝুলন জিজ্ঞেস করে আগ্রহ নিয়ে।

"জানি না ঠিক। তবে বাবা ওঁকে একবার মিত্তিরদা বলে ডেকেছিলেন মনে হচ্ছে।"

"ওকে। তারপর?"

"বাবাকে খুব উত্তেজিত লাগছিল। ক্লান্তও। আমার দিকে চেয়ে বললেন, বাড়িতে কোনও অ্যান্টাসিড থাকলে তাঁকে দিতে। অম্বল হয়ে তাঁর বুকটা হালকা ব্যথা করছে। আমাদের বাড়িতে কারওর কোনও ওষুধের দরকার হলে বাবুয়ানাই দিয়ে থাকে। কেননা আমাদের যার যা ওষুধ লাগে বিভিন্ন সময়ে তা বাবুয়ানিই এনে দেয় এবং ওষুধের স্টকটাও ওই মেনটেন করে। বাবুয়ানা তখনই সবে দোকান থেকে

ফিরেছে। ওই কী একটা ওষুধ এনে দিয়েছিল ঘর থেকে। কষ্টটা কমেও গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে বাবা বললেন, 'ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। আর খুব ক্লান্ত লাগছে শরীরটা।' আমায় বললেন ভিতরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যেতে। আসলে এই সময়ে মা এই ঘরে টিভিতে একটা সিরিয়াল দেখেন। সেই ওষুধটাটা ও ঘরে যাক সেদিন চাইছিলেন না বাবা। কমপ্লিটলি রেস্ট নিতে চাইছিলেন। আমি ভিতরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে আসি। রাতের খাবার আমরা বেশ দেরিতেই খাই। অন্তত এগারোটা তো বাজেই। সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়ার জন্যে বাবাকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম, বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার দরজাটা বন্ধও করেননি। বারান্দার গ্রিলের তালাটাও খোলাই ছিল।

''মা এসে বাবাকে ওভাবে ঘুমোতে দেখে বাবার মাথায়, কপালে একবার হাত বুলিয়ে দেখে বললেন, 'বেশ ঘাম হচ্ছে রে। পাখাটা বাড়িয়ে দে মানু। আর লোকটাকে ডাকিসনি। একটু ঘুমোতেই দে। এমনিতেই শরীরটা ঠিক নেই বলছিল আজ। গ্যাস, অম্বলে কষ্ট পাচ্ছিল। তার উপরে স্কুলের ওই বিচ্ছিরি টেনশন। আজ আর খেয়ে কাজ নেই। ভাল করে ঘুমোলে কাল শরীরটা অনেক ঝরঝরে হয়ে যাবেখ'ন।' আমি বললাম, 'কিন্তু বাবার রাতের প্রেসারের ওষুধ?' মা বললেন, 'থাক। একদিন না খেলে কী আর এমন হবে?'

''বাবুয়াদাও তাই বলল। আমায় হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'এখানে বেশি কথা বলিস না। কাকামণির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। কাকিমা ঠিকই বলেছে। ভাল করে ঘুমোলে দেখবি কাল কাকামণি এক্কেবারে ফিট হয়ে যাবে।' আমি তাই ঘুমোনোর গেটে তালা দিয়ে, বাইরের দরজা বন্ধটন্ধ করে, ভিতরের দিকের দরজা আবার ভেজিয়ে দিয়ে চলে এলাম। খাওয়াদাওয়া সেরে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়লাম। উঠেও পড়লাম আবার সব্বাই পরের দিন সকালে, কিন্তু বাবা আর উঠলেন না। সেই ঘুম আর ভাঙল না তাঁর। ডাক্তার ডেকে আনা হল যখন, উনি বললেন অন্তত ঘণ্টাছয়েক আগেই সব শেষ। ম্যাসিভ অ্যাটাক। ঘুমের মধ্যে।''

''বাবুয়াদা কে?'' নোটন জিজ্ঞেস করে।

''আমার দাদা। এখানে এই বাড়িতেই থাকে।''

''দাদা!'' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে ঝুলন, ''আমি তো তার কোনও দাদাকে দেখিনি কখনও এই বাড়িতে? কেমন দাদা তোর? কবে থেকে থাকে এই বাড়িতে?''

''বাবুয়াদা আমার জেঠুর ছেলে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে থাকত। মাধবপুরে। আমার জেঠিমা যখন মারা যান বাবুয়াদার বয়স তখন বারো। আর আমি ছয়। বছরচারেক আগে জেঠু মারা যাওয়ার পরে বাবা ওকে এখানে নিয়ে চলে আসেন। বাবার পরিচিত একজনকে বলে ওর একটা কাজও করে দেয় একটা ওষুধের দোকানে। সেহেতু ওষুধের দোকানে কাজ করে তাই আমাদের যা ওষুধ লাগে বাবুয়াদাই এনে দেয়। নিজের কাছেই রাখে। টুকটাক আমাদের প্রয়োজনে ওই আমাদের ওষুধ দেয়। বাবাকে সময় মতো ওষুধ দেওয়া, স্পেশালি রাতের ওষুধ দেওয়ার দায়িত্ব ওরই।''

''কোন দোকানে কাজ করে বাবুয়াদা?''

''মহামায়া ফার্মেসি। রেলগেট পেরিয়ে একটু এগিয়ে ডান দিকে।''

''এখন বাবুয়াদা তার মানে দোকানে?''

''হ্যাঁ। বাবা মারা যাওয়ার পরে খুব আপসেট হয়ে পড়েছিল ও। অসম্ভব কান্নাকাটি করেছে ক'দিন। দোকানেও যেতে পারেনি অনেকদিন। এই দিনচার-পাঁচ হল আবার বেরছে।''

''হ্যাঁ, ফোনে তুই আমাকে যে একটা ডায়েরির কথা বলছিলি...''

''দাঁড়া, নিয়ে আসছি। দেখাচ্ছি তোকে।''

''ঠিক আছে, দেখব। কিন্তু তার আগে বল, ব্রতীনআঙ্কলের এই মৃত্যুটাকে তোর অস্বাভাবিক লাগছে কেন? কী মনে হচ্ছে তোর, এটা সুইসাইড নাকি মার্ডার?''

''সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কী জন্যে কে জানে, আমার কোথায় যেন কী একটা গন্ডগোল মনে হচ্ছে। মনের ভেতরে কোনও একটা বিচ্ছিরি যড়যন্ত্রে বাবাকে কেউ বা কারা ফাঁসাতে চাইছিল। বাবারও মনে হচ্ছিল তাঁর প্রাণসংশয়ও হতে পারে।''

''অদ্ভুত তো?'' কপালের উপর ঝুলে আসা চুলের গুছি সরাতে-সরাতে বুলন বলে, ''কিন্তু সেটা তুই জানলি কী করে?''

''প্রথমত বাবা শেষের কয়েকদিন খুব গম্ভীর থাকতেন। সবসময় চিন্তা করত কীসব। আমাকে আর মাকে মারা যাওয়ার দিনতিনেক আগে ডেকে হঠাৎ বললেন, 'আমার কোথায় কী আছে, পলিসিটলিসি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডিটেলস, এ টি এম কার্ডের নম্বর এসব তোমাদের বলছি জেনে নাও। পারলে লিখে রেখো কোথাও,' বলে উঠে গিয়ে দেওয়াল আলমারির নীচের কাঠের পাল্লাটা চাবি দিয়ে খুলে একটা ডায়েরিও দেখালেন। বললেন, 'এটাও দেখে রাখো। পরে কাজে লাগতে পারে।'''

''দেখলি তোরা?''

''ধুস, মা তো এক ধমক লাগালেন বাবাকে। আমিও। আমরা একই কথা বললাম যে, অমন বাজে কথা বলার ও ভাবার কোনও কারণ নেই। শুনে বাবা বললেন, 'তোরা জানিস না কী চাপে আছি আমি। একে হাই প্রেশারের রোগী, বেশি টেনশনে হার্টফেল করে না যায়।' রাতে বাবুয়াদাও শুনে খুব হাসল। বলল অত চিন্তা না করতে। বাবাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, খুব টেনশন হচ্ছে মনে করলে বাবুয়াদাকে বলতে। ও অ্যাপি-অ্যাংক্সাইটি ট্যাবলেট এনে দেবে দোকান থেকে।''

''এনে দিয়েছিল? জানিস?''

''না বোধ হয়,'' বলে উঠে পড়ল মন্দিরা। ঝুলনের দিকে চেয়ে বলল, ''দাঁড়া, ডায়েরিটা আনি। আমার ব্যাগের মধ্যেই রেখেছি ওটা কাল থেকে। তুই ডায়েরিটা দেখ। হয়তো কিছু একটা আঁচ করতে পারবি।''

ঘরের একধারে রাখা টেবিলে বইপত্র ঠাসা। তার এক দিকে রাখা ব্যাগের মধ্যে থেকে নীল রেক্সিনে বাঁধাই করা ডায়েরিটা বের করে নিয়ে এসে ঝুলনের হাতে দেয় মন্দিরা। ঝুলন ডায়েরিটা উল্টে-পালটে দেখে খানিক। মন্দিরা বলে, ''আশ্চর্য কী জানিস, বাবা যে রাতে মারা গেলেন ঘুমের মধ্যে, সে রাতে ডায়েরিটা মাথার কাছে নিয়ে শুয়েছিলেন। সে রাতের তারিখে কাঁপা হাতে একটা সংখ্যা লেখা, ইংরেজিতে ণাটি ওয়ান ডি।''

''মানে?'' অবাক হয়ে বলে নোটন।

''জানি না,'' দু'দিকে মাথা নাড়ায় মন্দিরা, ''ওর মানে মাথায় ঢোকেনি আমার। ইংরেজি হরফে শুধু ণাটি ওয়ান তারপরে স্মল লেটারে ডি। পরের দিন বিছানা থেকে ডায়েরিটা নিয়ে আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। কয়েকদিন আগে ডায়েরিটার কথা হঠাৎ করে মনে পড়তে আমি ওটা বের করে পড়তে থাকি। আর তখনই কথাটা মনে হতে থাকে আমার। তীব্রভাবে মনে হতে থাকে এই মৃত্যুটা যেন স্বাভাবিক নয়। অন্য কাউকে বলেল তারা হাসবে বা ভাববে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট ভাবছেও। আমার মা বলেছে, বাবুয়াদা আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছে বারবার। ভাবছে বাবার শোকটা ঠিকমতো সামলাতে পারছি না বলে এইসব অবান্তর কল্পনা করছি আমি। মার আমার সন্দেহটা বাড়ি কাউকেই ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না আমি। কেউ আমার কথায় গুরুত্ব দিতে চাইছে না। বুঝলাম বাড়ির লোকেই যখন কথাটা সিরিয়াসলি নিচ্ছে না, পুলিশের কাছে গিয়েও লাভ হবে না কিছু। আমি তখনই ভাবলাম একমাত্র তোকেই এসব কথা বলা যায়। সত্যি অন্য রকম কোনও রহস্য যদি এই মৃত্যুর আড়ালে থেকে থাকে, তুই-ই তা খুঁজে বের করতে পারবি বুদ্ধি দিয়ে।''

''আমি কী আর গোয়েন্দা?'' ঝুলন হাসল, ''তবু দেখব চেষ্টা করে,'' বলে উঠে দাঁড়াল ঝুলন। ডায়েরিটা হাতে নিয়ে দু'-চার পাতা

উলটেপালটে দেখে নিয়ে নিজের ব্যাগে ঢোকাল। তারপর মন্দিরার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল, কতদিন পরে এলাম। তোদের বাড়িটা একবার ঘুরে-ঘুরে দেখে নিই আবার।"

"হ্যাঁ চল", মন্দিরা ম্লান হাসল, "কত স্মৃতি আমাদের বল এই বাড়ির আনাচেকানাচে ছড়িয়ে আছে।"

"হুঁ", ঝুলন সায় দেয়। নোটনকে ডাকে হাতের ইশারায়। তারপর মৃদু পায়ে হেঁটে বাইরের ঘরে ঢোকে, "এই ঘরেই তো কাকু থাকতেন?"

"হ্যাঁ," মন্দিরা মাথা নেড়ে সায় দেয়। ঝুলন তাকিয়ে দেখে ঘরটা। চাপা গলায় বলে, "আবা যায়, একমাস আগেও মানুষটা এই ঘরে থাকতেন," মন্দিরাও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তক্তপোষের পাশের দেওয়াল-আলমারির দিকে চেয়ে মন্দিরার দিকে তাকায় ঝুলন, "চাবি দেওয়া আছে?"

"হ্যাঁ, আনব। দেখবি খুলে?"

"আন," ঝুলন বলে। মন্দিরা চাবি এনে দেওয়াল আলমারি খুলে দেয়। ঝুলন তার মধ্যে থাকা কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখে খানিক। ব্রতীনআঙ্কলের স্কুলের একটা ম্যাগাজিন, কিছু কাগজ দেখে মন দিয়ে। তারপর তাঁর হাতে লেখা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে রেজোলিউশনের কিছু খসড়া ড্রাফট ঢুকিয়ে নেয় নিজের ব্যাগে। তারপর বলে, "চল, যে ঘরে বাবুয়ানা থাকে সেই ঘরটা দেখে আসি।"

"ওর ঘরটা দোতলায়," বলে ব্রতীনআঙ্কলের ঘরের ঠিক পাশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে ওরা। ঘরের দরজা বাইরে থেকে হুড়কো টেনে বন্ধ করা। তালা দেওয়া নেই। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ওরা। ঘরটা অগোছালো। বিছানার উপরেই জামা-প্যান্ট ছড়িয়ে রাখা। বিছানার নীচে মেঝের উপরে পুরনো খবরের কাগজে ডাঁই করে রাখা। ঝুলনকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মন্দিরা হাসল, "কাগজে অদ্ভুত খবর দেখলেই ভমিয়ে যাবে বাবুয়ানা। কিছুতেই বিক্রি করতে দেয় না।"

ঝুলন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল। ঘরের একপাশে একটা টেবিলের উপরে পেলিনিয়ের ছোট-ছোট গোটাতিনেক বাক্স। তার মধ্যে একটার উপরে কাগজের স্টিকারে লেখা 'কাকামণি'। মন্দিরা বলল, "বাবুয়ানার ওষুধের বাক্স। বলছিলাম না, আমাদের বাড়িতে কারও শরীরটির খারাপ হলে ওষুধবিষুধ বাবুয়ানাই দেয় সাধারণত। এমার্জেন্সি ওষুধের একটা স্টক সবসময়েই ওর কাছে থাকে। বাবাকেও রোজ রাতে ওষুধ দেওয়ার দায়িত্ব ছিল বাবুয়ানারই।"

ঝুলন টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। ব্রতীনআঙ্কলের ওষুধের বাক্সটা খুলে ওষুধগুলো নিয়ে দেখল মন দিয়ে। মন্দিরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "প্রেশার ছাড়া কাকুর অন্য কোনও প্রবলেম ছিল? মানে, আর কী ওষুধ খেতে হত তাঁকে নিয়মিত, জানিস কিছু?"

"বাবার অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা ছিল না। নিয়মিত ওষুধ বলতে ওই ব্লাড প্রেশারের ওষুধই," মন্দিরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে জোর দিয়ে। ঝুলন একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। কী যেন ভাবল খানিক। তারপর বলল, "চল, যাই এবারে। বাড়ি ফিরতে হবে। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে একটু দেরি করলেই মা বড্ড চিন্তা করে আজকাল।"

বাইরে বেরিয়ে ঝুলনকে জিজ্ঞেস করল নোটন, "কী মনে হল তোমার ঝুলনদি?"

"কিছুই মনে হল না," নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দেয় ঝুলন।

"মৃত্যুটায় সত্যিই কোনও রহস্য আছে বলে মনে হয় তোমার?"

"বললাম তো কিছুই মনে হয় না আমার। মনে হওয়ার মতো এক্ষুনি কিছু তো পাইনি যে মনে হবে," বলেই স্কুটিতে স্টার্ট দিল ঝুলন। নোটনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আয়, উঠে পড়।"

॥ ৩ ॥

বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করেই ঝুলনদি একেবারে বেপাত্তা। খুব অভিমান হচ্ছিল নোটনের। ওকে এর মধ্যে ডেকে পাঠানো দূরের কথা, নিজে থেকে একটা ফোন পর্যন্ত করেনি ঝুলন। মাঝে একদিন বেলার দিকে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। কাকিমা বলেছেন, "ঝুলন তো বাড়ি নেই। ফিরলে কিছু বলতে হবে রে নোটন?" কী আর বলবে নোটন! ঘাড় নেড়ে বলেছে, "না থাক। শুধু বোলো যে, আমি এসেছিলাম। আর ফোন করে ওকে পাচ্ছি না। রিং হচ্ছে, অথচ ধরছে না।"

"গাড়ি চালাচ্ছিল হয়তো দ্যাখ। ওর বাবা তো ওকে বারণ করেছে গাড়ি চালাতে-চালাতে ফোন ধরতে," কাকিমা ঝুলনদির হয়েই কথা বলেন।

"কোথায় গিয়েছে জান?"

"তুইও যেমন," কাকিমা হাসেন, "কোথায় যাচ্ছে না-যাচ্ছে আমায় বলে যায় কোনওদিন?"

চতুর্থদিনের মাথায় একদম সকাল-সকাল ঝুলনের ফোন এল। নোটন সবে মুখটুখ ধুয়ে টিফিন করে খবরের কাগজ খুলে বসেছে। ঝুলন বলল, "চলে আয়, দরকার আছে। পারলে স্নানটা সেরে আয়। ফিরতে দেরি হতে পারে।"

"কী দরকার আর আমায় তোমার ঝুলনদি," একটু অভিমানী গলায় বলে নোটন, "আমি আর তোমার কোন কাজে লাগব বলো? আমার বুদ্ধিও নেই তোমার মতো, ক্যারাটের বেল্টফেল্টও নেই। তুমি তো একাই যথেষ্ট।"

"বাজে বকিসনি তো," ঝুলন ধমকে ওঠে ওকে থামিয়ে দিয়ে, "একটা কাজ করতে হবে। এক জায়গায় যেতে হবে। তুই ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।"

"কী কাজ?"

"ওষুধের দোকানে যেতে হবে। মহামায়া ফার্মেসি।"

"কেন? আর আমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না কেন এই কাজ?"

"তুই আজকাল বড্ড প্রশ্ন করিস নোটন," ঝুলন বলে বিরক্ত হয়ে, "আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা। বেরতে পারছি না। তোকে যেতে হবে ওখানে। দরকার আছে।"

"অ্যাক্সিডেন্ট মানে? কী হয়েছে তোমার? কবে?" আঁতকে উঠে প্রশ্ন করে নোটন।"

"কাল সন্ধেবেলা। পড়ে গিয়েছি স্কুটি থেকে। বাকিটা এসেই শুনিস," বলেই ফোন কেটে দিল ঝুলন।

নোটন ঝুলনের বাড়িতে এসে পৌঁছল ঠিক বারো মিনিটের মাথায়। আক্ষরিক অর্থেই অধিকাংশ পথটা দৌড়ে এসেছে সে। ঝুলনদি স্কুটি থেকে পড়ে গিয়েছে কাল এ কথাটা শুনে পর্যন্ত মন একেবারে আনচান করছিল তার। কতখানি লাগল ওর কে জানে। এমনিতে ঝুলনদি হেলমেট ছাড়া কক্ষনও গাড়ি চালায় না। কাজেই মাথায় খুব মেজর চোট লাগার আশঙ্কা কম। কিন্তু হাত-পা কেটেকুটে যেতে পারে। বেকায়দায় পড়লে পায়েও মারাত্মক চোট লাগতে পারে। এমনকী, ভেঙেও যেতে পারে। ভয়ানক দুশ্চিন্তা হচ্ছিল নোটনের। ওদের গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকে উঠোন পেরিয়ে দরজার পাশের ডোরবেলটায় যখন ডান হাতের তর্জনী দিয়ে চাপ দিল নোটন, তখন রীতিমতো হাঁফাচ্ছে সে। কাকিমা দরজা খুলতেই একরাশ উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করল নোটন, "কেমন আছে গো ঝুলনদি? পা-ফা ভেঙে বসে নেই তো?"

নোটনের চোখমুখের অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন কাকিমা। নোটনের মাথায় হাত দিয়ে আদর করে চুল এলোমেলো করে দিয়ে তিনি বললেন, "তোর ঝুলনদিদি ঠিকই আছে। অত উতলা হোসনি নোটন। তোকে দেখে মনে হচ্ছে যে তুইই এক্ষুনি হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবি এখানে। স্কুটি নিয়ে পড়েছে কাল রাস্তায়। হাতে, পায়ে কেটে ছড়ে গিয়েছে খানিক। তবে চোট খুব মারাত্মক কিছু নয়। কালই টেটভ্যাক নিয়ে নিয়েছে একটা। ওষুধের দোকানে জিজ্ঞেস করে রাতে একটা কী পেনকিলারও খেয়েছিল বোধ হয়। এখন অনেকটাই সামলে নিয়েছে। তবে হ্যাঁ, বড়সড় বিপদ একটা কিছু হতেই পারত। ঈশ্বর রক্ষা

করেছেন বলতে পারিস।''

ঝুলন নিজের ঘরের বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে ব্রতীনআঙ্কলের ডায়েরিটা খুলে খুব মনোযোগ দিয়ে কী জানি দেখছিল। নোটন ঘরে ঢুকতে প্রথমটা খেয়ালই করেনি সে। কোনও বিষয় নিয়ে যখনই খুব গভীরভাবে চিন্তা করে কিছু, তখনই ঝুলনদি অমন হয়ে যায়। নোটন জানে। ঝুলনদির কনসেনট্রেশন মারাত্মক। যেটা নিয়ে পড়বে একেবারে মনপ্রাণ সঁপে দেবে তাতে। নোটন মাঝে-মাঝে ভাবে ঝুলনদির মতো এই একাগ্রতাটা তার নিজেরও যদি থাকত, তা হলে পরীক্ষায় তীর্থ-কৌশিকরা কিছুতেই মেরে বেরিয়ে যেতে পারত না তাকে। কিন্তু কী আর করা যাবে। সবাই তো আর ঝুলনদি হয় না। একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবল নোটন। ঝুলনদিকে এইসময় বিরক্ত করাটা কি ঠিক হবে? নিশ্চিত গভীরভাবে এখন কিছু একটা ভাবছে ও। ব্রতীনআঙ্কলের ওই ডায়েরিটায় তা হলে সত্যিই কি রহস্যজনক কিছু আছে? ঝুলনদি কি সেই রহস্যের আঁচ করতে পারছে কিছু? মনে-মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল নোটন। মাঝে বেশ খানিকটা সময় বলতে গেলে তাকে তো একেবারে অন্ধকারেই রেখে দিয়েছে ঝুলনদি। অথচ তারও তো ব্যাপারটা জানা দরকার। হাজার হোক এই কেসটা হাতে নেওয়ার সময় সে নিজেও তো সঙ্গী ছিল ওর। তা ছাড়া আজ নিজেই ও যখন ডেকে পাঠিয়েছে নোটনকে, তখন ইতস্তত করার আর মানেই হয় না কোনও। নোটন মনস্থির করে ফেলল। তারপর নিচু গলায় ডাক দিল, ''ঝুলনদি, ঝুলনদি।''

ঝুলন ঝপ করে ডায়েরিটার পাতা বন্ধ করে ফেলল। তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বলে উঠল ওর দিকে চেয়ে, ''ও এসে গিয়েছিস তুই? আয়, বোস এখানে।''

নোটন ঝুলনের পাশে বিছানারই একধারে বসে পড়ল বাধ্য ছেলের মতন। তারপর ঝুলনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''কী করে হল?''

''কী?'' ঝুলন হাসে।

''কী আবার?' ঝুলনের কনুই আর হাতের ব্যান্ডএডগুলোর দিকে চোখের ইশারা করে বলে নোটন, ''পড়লে কী করে? তুমি তো জোরে ড্রাইভ করো না। রাস্তাঘাটে অসাবধানীও হও না পারতপক্ষে। তা হলে?''

''আমি ঠিক পড়িনি বুঝলি,'' মাথার উপরে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে বলে ঝুলন, ''আমায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। লোকটার মুখ হেলমেটে এমনভাবে ঢাকা ছিল যে, তাকে চেনার উপায়ই ছিল না কোনও। বাইকটা নিয়ে ডেলিবারেটলি একেবারে যেন আমার গায়ের উপরেই চলে এল। এমনভাবে চেপে দিল না, আমায় মেরে ফেলতে চায়নি... আমি নিশ্চিত। কিন্তু আমায় সে চমকাতে চেয়েছিল। আমি যখন পড়ে গেলাম, আমাকে তোলাটোলার চেষ্টা না করে বাইকের মুখ ঘুরিয়ে হুশ করে চলে যাওয়ার আগে লোকটা ঠান্ডা খসখসে গলায় বলে গেল স্পষ্ট শুনতে পেলাম, সাহসের সীমাটা যেন আমি মাত্রার মধ্যে রাখি। না হলে আরও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে।''

''মানে?'' শিরদাঁড়া সোজা করে বসে নোটন, ''বলো কী গো? কে ফেলে দিল তোমায়? কেন ফেলল?''

''সেটা বুঝলে তো হয়েই যেত রে,'' ঝুলন হাসল, ''আমায় আর আঙষ্টক কষতে হত না এমন করে।''

''তোমার কি মনে হয় তোমার এই পড়ে যাওয়ার সঙ্গে ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যু রহস্যের কোনও সংযোগ আছে?''

''মনে হয়,'' বলে একটুক্ষণ চুপ করে রইল ঝুলন। তারপর বলল, ''ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুটা সত্যিই রহস্যজনক রে নোটন। মন্দিরার সন্দেহটা সত্যি-সত্যিই একেবারে অমূলক নয়।''

''বলো কী গো ঝুলনদি? উনি কি তা হলে খুন হয়েছেন?''

''হতেও পারেন। আবার সুইসাইডের কেসও হতে পারে। যদি সুইসাইড হয় তা হলে সেটাও বাইরে থেকে কোনও লোক বা কিছু লোকের চাপে বাধ্য হয়ে করেছেন হয়তো। ধর, তাও যদি হয় সেক্ষেত্রেও তো তাঁর মৃত্যুর জন্যে কোনও লোক বা কিছু লোকের দায়ভার থেকেই গেল। আইনের চোখে তারাও কিন্তু শাস্তির যোগ্য। তবে এত কিছু আগে থেকে ভেবে নেওয়ার জায়গায় আমি তো এখনও এসে পৌঁছইনি। আপাতত শুধু এটুকু বুঝেছি, মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।''

''কিন্তু উনি হঠাৎ কত সুইসাইডই বা করতে যাবেন কেন? ব্রতীনআঙ্কল সম্পর্কে যেটুকু বুঝেছি, খুব দুর্বল মনের মানুষ তো তিনি ছিলেন না। ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার লোকও নন তিনি। তা হলে কী এমন ঘটল যে...''

''ভাবছি। সেসব কথাই গভীরভাবে ভাবছি এখন,'' নোটনের কথার মাঝখানেই বলে ওঠে ঝুলন, ''কয়েকটা খুব ছেঁড়া-ছেঁড়া সূত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এপাশ-ওপাশে। আর কিছু আলগা অসঙ্গতি। সেগুলো মনের মধ্যে একজায়গায় এনে জোড়া লাগিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছি কিছু প্রশ্নের উত্তর জানার।''

''উত্তর পেয়েছ কিছু?''

''উঁহু।''

''তা হলে উপায়?''

''মাথা খাটিয়ে উপায় বের করতে হবে নোটনবাবু। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।''

''সে না হয় বুঝলাম। মাথা খাটিতে দিব্যি পছন্দ করো তুমি। আর পাঁচভাগের চেয়ে তোমার মাথা খাটেও ভাল। কিন্তু কথা হল, মাঝের দুটো-তিনটে দিন, আই মিন কাল, পরশু আর তার আগের দিন কোন অজ্ঞাতবাসে কাটালে বলো তো সারাদিন?''

''ঘুরছিলাম।''

''কোথায় ঘুরলে?''

''উরিব্বাস, তুই যে আমায় পুলিশের মতো জেরা করতে শুরু করলি রে,'' ঝুলন হেসে ওঠে।

''জেরা নয়,'' নোটন হাসে, ''আসলে কৌতূহল। এখন সেটা আরও বেড়ে গেল।''

''কেন?''

''ওই যে তুমি বললে, মৃত্যুটা সত্যিই স্বাভাবিক নয়। তার মানে এই কথাটা অন্তত কয়েকদিন আগেই বুঝে নিয়েছ তুমি। আর সেই রহস্যের পিছনেই তুমি ছুটে বেড়িয়েছ এই ক'দিন আমায় কিন্তু না জানিয়ে।''

ঝুলন একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে খুব গম্ভীর গলায় বলল, ''নোটন, তুই বাড়িতে একটা ফোন করে দে। বল, আজ সারাদিন আমার সঙ্গেই থাকবি। মাকে কিছু খাবার দিতে বলি দাঁড়া। মেয়ে দু'জনে বেরব।''

''বেরবে মানে? তোমার শরীরের এই অবস্থা,'' নোটন প্রতিবাদ করে বলে।

''শরীর ঠিকই আছে'', ঝুলন হাত নেড়ে বলে, ''একটুআধটু কেটে ছড়ে যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই না। এইটুকু আঘাতের জন্যেই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ব, অ্যাদ্দিনে এই চিনলি আমায়?''

''যাবেটা কোথায়?'' নোটন জিজ্ঞেস করে।

''জয়নগর।''

''জয়নগর?'' অবাক হয়ে বলে নোটন, ''সেখানে আবার কী দরকার তোমার?''

''কোথায় কোন দোকানে ভাল মোয়াটোয়া পাওয়া যায় আগাম খোঁজ নিয়ে আসব,'' ঝুলন ফাজিলের মতন হাসে নোটনের দিকে তাকিয়ে, ''জানিস তো একসময় বহুস্তুত আমার এক দূর সম্পর্কের পিসি থাকতেন। কলেজে পড়ার সময়েও ওই শীতকাল এলেই ওই পিসির বাড়িতে হানা দিতাম। এই যে শুনিস না জয়নগরের মোয়া বিখ্যাত, সেটা আসলে কিন্তু তৈরি হয় বহুদূরে। ওই গুড় আর মুড়কি ধানের খই এখানকার গড়পড়তা মিষ্টির দোকানগুলোর মোয়ায় মাখা খুঁড়ে মরে গেলেও পাবি না তুই। এমনকী, বড় দোকানেও পাবি কিনা সন্দেহ

আছে আমার। তা পিসির বাড়ি গেলেই একটা স্পেশাল দোকান থেকে আমায় মোয়া আর নতুন গুড়ের মাখা সন্দেশ এনে খাওয়াত বাদলদা। ওঃ সেই মোয়া আর সন্দেশের যা টেস্ট না, কী বলব তোকে! জিভে যেন স্বাদ লেগে আছে আমার এখনও!"

"বাদলদাটা আবার কে?" নান মুনিনি তো কখনও তোমার কাছে?" ঝুলনের কথার মাঝখানেই বলে ওঠে নোটন।

"ওই পিসির ছেলে। আসলে পিসি মারা গেল বছরতিনেক আগে। তারপর থেকে তেমন আর যাওয়াটাওয়া হয়নি। ফোনে খবরাখবর নেওয়া দেওয়া চলত অবশ্য। তা পরশু খুব মন টানল। ওইদিন ছুটির দিন ছিল না। বাদলদার অফিসে যাওয়ার ব্যাপার ছিল। আমি আবদার করলাম একদিন ছুটি নিতে। ও তো অবাক। আমি বললাম খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ওদের। আমি যাচ্ছি। গিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে একটু আশপাশে ঘুরতেটুরতে পারি। আমাদের খবর তো রাখে ও সবই। ফোনেই জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারখানা কী ঝেড়ে কাশ তো দেখি'। বললাম, 'তোমায় নিয়ে একটু মথুরাপুর যাব। জগত্তারিনী বয়েজ স্কুলে।'

নোটনের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এইবার। উত্তেজিত গলায় সে বলে উঠল, "ব্রতীনআঙ্কল ওই স্কুলেরই হেডমাস্টার ছিলেন না?"

"হুঁ," মাথা নাড়ে ঝুলন।

"এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।"

"কী বুঝলি?"

"পিসির বাড়ির জন্যে মন টানাফানা ওসব মিথ্যে। তুমি বাদলদাকে নিয়ে মন্দিরাদির বাবার স্কুলে ভেন্ড করতে গিয়েছিলে। কিন্তু তার জন্যে বাদলদা কেন? তুমি আমি দু'জনে মিলেই তো চলে যেতে পারতাম। আমায় এমন অন্ধকারে রেখে একা-একা যেতে গেলে কেন তুমি কে জানে!" অভিমানী গলায় বলে নোটন।

"তুই আর আমি মিলে যদি যেতাম তা হলে ওই স্কুলের বর্তমান টিচার ইন চার্জ আমাদের পাত্তাই দিতেন না হয়তো। দুম করে দু'জনে একটা অচেনা স্কুলে গিয়ে হাজির হয়ে পড়লে তাঁরা কখনও এন্টারটেন করত ভেবেছিস আমাদের? গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দিত না হয়তো। ভিতরে ঢুকতে পেলে তবে না এনকোয়্যারি? আসলে বাদলদা এলাকায় যথেষ্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল। মথুরাপুর তো বহু যুগে কেউ শেকি দূরে না। আমার আশা ছিল ওখানে ওর নিশ্চিত পরিচিতি থাকবে। দেখলামও তাই রে নোটন। ওই স্কুলের গেট কিপার থেকে টি আই সি সকলেই পারলে বাদলদাকে একেবারে স্যালুট ঠুকে দেয়। অতএব আমার কাজটা দিব্যি সহজ হয়ে গেল। স্কুলের টিচার ইন চার্জ বা অন্য কয়েকজন টিচার ও ক্লার্কের সঙ্গে যখন কথা বলতে চাইলাম, তাঁরা কেউই আমায় এড়িয়ে যেতে পারলেন না চট করে। অবশ্য আমার প্রশ্নের উত্তর অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা এড়িয়ে গিয়েছেন বুঝতে পেরেছি। এটা স্বাভাবিক সাইকোলজি। কে আর যেচে ঝুট ঝামেলায় জড়াতে চায় বল! তবে সকলে মিলে আমায় যদি সত্যি কো-অপারেট করত তা হলে কাজটা আরও একটু সহজ হতে পারত।"

"আজ কোথায় যাবে?"

"সঞ্জয় মিত্তিরের বাড়ি। আজও বাদলদা থাকবে। জয়নগর স্টেশনে ওয়েট করবে আমাদের জন্যে। আমরা ট্রেনে উঠে ফোন করে দেব ওকে। ও সময় মতো পৌঁছে যাবে ওখানে।"

"সঞ্জয় মিত্তির?" নোটন জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় ঝুলনের দিকে।

"জগত্তারিনী বয়েজ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। ব্রতীন আঙ্কল যে রাতে মারা যান সেদিন যিনি তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন।"

"আই সি। তাঁর সঙ্গেই না ওঁর উগুপ্ত কথাবার্তা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"উরিব্বাস। ওই লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারলেই তো আমার মনে হয় এই কেসটার অনেকখানিই জট ছেড়ে যাবে আজকে।"

"উলটোটাও হতে পারে," উদাসভাবে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বলে ঝুলন।

"মানে?" ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করে নোটন।

"জট আরও বেশি করে পাকিয়েও উঠতে পারে।"

"তোমার এমন মনে হচ্ছে কেন?"

"ওই ডায়েরিটার জন্যে।"

"ডায়েরি?"

"হুঁ। ডায়েরিটা খুব ইন্টারেস্টিং রে নোটন। প্রথমটা আমি নিজেও ধরতে পারিনি। প্রথমটা ডায়েরির বয়ান পড়ে সঞ্জয় মিত্তিরকেই প্রাইমারি সাসপেক্টের তালিকায় রেখেছিলাম আমি। এখনও রাখছি না বলছি না। কিন্তু ওই ডায়েরিতে এমন কিছু লুকনো ধাঁধা আছে যার মানে বের করা খুব জরুরি।"

"তোমার এ কথার মানেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ঝুলনদি," নোটন অবাক হয়ে বলে।

"ডায়েরিটা অদ্ভুত। ব্রতীনআঙ্কল সেখানে লিখেছেন স্কুলে কিছু আভ্যন্তরীণ সমস্যা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। এমন কথাও আছে যে, ম্যানেজিং কমিটির দু'-একজন তাঁকে গোপনে ভয় দেখাচ্ছেন। শাসাচ্ছেন। তাঁরা তাঁকে এমন কিছু কাগজে সই করতে বলছেন যেটা তাঁর মনে হচ্ছে আনএথিক্যাল। আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে সে সব কাগজে সই করলে। স্কুলে স্টাফদের একটা অংশও তাঁর বিপক্ষে ক্রমশ দল পাকাচ্ছিল। এছাড়া স্কুলের বাইরেও কিছু কথা লেখা আছে ডায়েরিতে। যে লেখাগুলো অতি সাম্প্রতিক লেখা বলেই মনে হয়। সেখানে তাঁর এল আই সি, মিউচ্যুয়াল ফান্ডে গচ্ছিত আমানতের হিসেব। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

"সেখানে কয়েকটা পাতা নেই। এখন প্রশ্ন হল কেন নেই? কী লেখা ছিল সেই পাতাগুলোয়? কেন তিনি সেই পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলেন? তিনিই কি পাতাগুলো ছিঁড়েছেন, নাকি অন্য কেউ? তিনি বা অন্য কেউ যদি পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেন তার পিছনে কী মোটিভ? তা ছাড়া যেদিন মারা গেলেন, ডায়েরিটা তাঁর পাশে ছিল কেন? সবদিন তো ডায়েরি বালিশের পাশে নিয়ে ঘুমোন না তিনি? তা হলে তিনি কি আঁচ করেছিলেন যে, সেই রাতেই কিছু একটা হয়ে যেতে পারে তাঁর? যদি পারেন, কী করে পারলেন? তা হলে তিনি কি আত্মহত্যা করেছিলেন ওই রাতে? যদি করেন, কী ভাবে করলেন? কেন ডাক্তারের পরদিন মৃতদেহ দেখে সন্দেহ হল না? আর ওই ঘাটি ওয়ান ডি... তার মানেই বা কী? আর যেটা সবচেয়ে বড় কথা ডায়েরির কিছু-কিছু লেখার ক্ষেত্রে লেখাগুলো বড় বেশি কাঁপা-কাঁপা, জড়ানো। কেন? তিনি কি মাঝে-মাঝে নার্ভের সমস্যায় ভুগতেন? লিখতে অসুবিধে হত? হাত কাঁপত? ডায়েরির অন্তত চার জায়গায় লেখা আছে 'এবার বিদায় চাই'। এক জায়গায় লেখা 'অ্যাডিউ'... সব ক্ষেত্রেই লেখাগুলো কাঁপা-কাঁপা। কেন? তিনি কি তা হলে জানতেন মৃত্যু এগিয়ে আসছে? সেই মৃত্যুকে কি এমন ভয় পেতেন যে, যাওয়ার কথা ভাবলেই হাত কেঁপে যেত তাঁর? তারপর ধর, এই আমায় হিচ্ছে করে ফেলে দেওয়া। কে আমায় অকেজো করে রাখতে চাইছে? হুমকিও তো দিয়েছে সে। কেন? কার স্বার্থে ঘা পড়ছে আমার জন্যে?"

"থাক ঝুলনদি আর না। একসঙ্গে এতটা নিতে পারব না আমি। মাথা ঝিমঝিম করছে শুনে," নোটন হাসে, "ভালই পাঙ্গল হাতে পেয়েছ। দেখি কী করে সলভ করো তুমি।"

"সলভ তো করতেই হবে রে নোটন," বলে আরও কী বলতে গিয়েও থেমে গেল ঝুলন। তারপর একটু ঝুঁকে ভিতরের ঘরের দরজার দিকে উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলল, "মায়ের লুচি ভাজা শেষ। বেগুন ভাজাও রেডি। গন্ধ আসছে না আর নাকে। কাজেই এক্ষুনি মা আমাদের খাবার নিয়ে এ ঘরে আসবে। মায়ের সামনে এখন কিন্তু স্পিকটি নট। আর শোন হাঁদারাম, ভুলেও কিন্তু মাকে বলে ফেলবি না যে, আমাকে স্কুটি থেকে কেউ ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে বা ভয়টয়

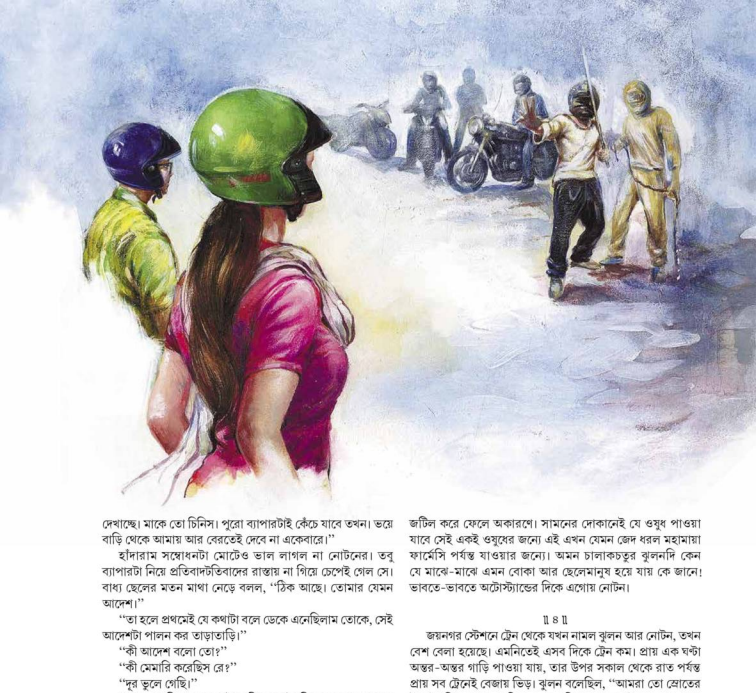

দেখাচ্ছে। মাকে তো চিনিস। পুরো ব্যাপারটাই কেঁচে যাবে তখন। ভয়ে বাড়ি থেকে আমায় আর বেরতেই দেবে না একেবারে।''

হাঁদারাম সম্বোধনটা মোটেও ভাল লাগল না নোটনের। তবু ব্যাপারটা নিয়ে প্রতিবাদটতিবাদের রাস্তায় না গিয়ে চেপেই গেল সে। বাধ্য ছেলের মতন মাথা নেড়ে বলল, ''ঠিক আছে। তোমার যেমন আদেশ।''

''তা হলে প্রথমেই যে কথাটা বলে ডেকে এনেছিলাম তোকে, সেই আদেশটা পালন কর তাড়াতাড়ি।''

''কী আদেশ বলো তো?''

''কী মেমারি করেছিস রে?''

''দূর ভুলে গেছি।''

''শোন, দেরি না করে বাইরে গিয়ে অটো নিয়ে সোজা মহামায়া ফার্মেসি যাবি। দোকানে গিয়ে খুব উদ্বেগের সঙ্গে বলবি আমার ঝুলনদির কাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। এমন লেগেছে যে বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না একদম। ডাক্তার বেডরেস্টে থাকতে বলে দিয়েছেন অন্তত সাতদিন। ওষুধ তেমন দেননি। বলেছিলেন ব্যথা বাড়লে পেনকিলার নিতে। দিদি আমায় নামটা বলে পাঠাল, কিন্তু ভুলে গেলাম। আপাতত খানচারেকের কোনও একটা পেনকিলার দিন আমায়।''

''সে তো এই সামনের দোকান থেকে নিয়ে এলেই হয়। শুধুমুধু অদ্দুরে যাওয়ার কী আছে? এই বলছ জয়নগরে যেতে হবে...''

''যা বলছি শোন। বেশি পাকামি মারিস না। আর মনে করে জোর দিয়ে বলবি আমি খুব অসুস্থ। দেরি করবি না কিন্তু একটুও। যাবি আর আসবি।''

''যো হুকুম,'' নোটন বেরিয়ে পড়ে তড়িঘড়ি করে। মাঝে-মাঝে ঝুলনদি কেমন যেন দুর্বোধ্য আর একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। সহজ কাজ জটিল করে ফেলে অকারণে। সামনের দোকানেই যে ওষুধ পাওয়া যাবে সেই একই ওষুধের জন্যে এই এখন যেমন জেদ ধরল মহামায়া ফার্মেসি পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে। অমন চালাকচতুর ঝুলনদি কেন যে মাঝে-মাঝে এমন বোকা আর ছেলেমানুষ হয়ে যায় কে জানে! ভাবতে-ভাবতে অটোস্ট্যান্ডের দিকে এগোয় নোটন।

॥ ৪ ॥

জয়নগর স্টেশনে ট্রেন থেকে যখন নামল ঝুলন আর নোটন, তখন বেশ বেলা হয়েছে। এমনিতেই এসব দিকে ট্রেন কম। প্রায় এক ঘণ্টা অন্তর-অন্তর গাড়ি পাওয়া যায়, তার উপর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় সব ট্রেনেই বেজায় ভিড়। ঝুলন বলেছিল, ''আমরা তো স্রোতের উলটো দিকে যাব। দেখিস, তেমন ভিড় হবে না ট্রেনে। বরং এখন কলকাতার দিকের ট্রেনে গা গলানোর উপায় থাকবে না।''

কিন্তু বাস্তবে ডাউন লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালেও ভিড় বড় একটা কম হল না। দক্ষিণ বারাসত স্টেশন না আসা পর্যন্ত রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হল ওদের। নোটনের চিন্তা হচ্ছিল ঝুলনদির লাগা জায়গায় আবার না লেগে যায়। বারাসত স্টেশনে ট্রেনটা ফাঁকা হয়ে গেল। ঝুলন বলল, ''নে আর বেশি বাকি নেই যদিও জয়নগর আসতে, তবু বসে নিই চল একটু। এতক্ষণ যা কুস্তি লড়তে হল।''

বাদলদা ঠিক রেলওয়ে ফুটব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন থেকে নেমে একটু পিছিয়ে আসতেই ওকে দেখতে পেল ঝুলন। নোটন বাদলদাকে তো চিনত না। ঝুলনই দূর থেকে হাত দিয়ে দেখাল তাকে, ''ওই যে দেখ, নীল টি-শার্ট আর ফেডেড জিন্‌স পরে যে দাঁড়িয়ে আছে ওটাই বাদলদা।''

বাদলদা ওদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল। ঝুলনের দিকে তাকিয়ে বলল, ''আয়। ব্রিজ পার হয়ে আমাদের বাস রাস্তার দিকে

যেতে হবে।'' তারপর নোটনের দিকে চেয়ে বলল, ''তুমিই নোটন? আমি কিন্তু তুমি কদেই বললাম। কিছু মনে কোরো না। আমি ঝুলনের দাদা। কাজেই তোমারও দাদাই হই সম্পর্কে।''

''না-না ঠিক আছে,'' লাজুক মুখে বলে নোটন।

বাদলদা সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে বলে, ''ট্রেনে ভিড় ছিল?''

''তা তো ছিলই,'' বলল বলে, ''দক্ষিণ বারাসত আসার পর ফাঁকা হল ট্রেনটা।''

''চোটের কী অবস্থা?'' বাদলদা পিছন ফিরে আবার জিজ্ঞেস করল ঝুলনকে, ''সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?''

''না চলো,'' ঝুলন হাসে। তবু নোটন বোঝে ঝুলনদির কষ্ট হচ্ছে। বাদলদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরতে-বেরতে নোটনকে জিজ্ঞেস করল, ''আগে এসেছ কখনও এদিকে?''

''নাহ,'' নোটন দু'দিকে মাথা নেড়ে বলে।

''বহুচ্ থেকে জয়নগর-মজিলপুর এই পুরো এলাকাটাই কিন্তু খুব প্রাচীন এবং বর্ধিষ্ণু। জয়নগর-মজিলপুর পুরসভা সম্ভবত তোমাদের বারুইপুর পুর এলাকার চেয়েও পুরনো। অনেক বনেদি বাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই অঞ্চলে,'' বাদলদা বেশ গর্বের সঙ্গে বলতে থাকে, ''কত বিখ্যাত মানুষ এককালে এইসব অঞ্চলে কাটিয়ে গিয়েছেন জান তো ভাই। কবি, গায়ক, সুরকার, সমাজসংস্কারক কে নন! এখন অবশ্য এলাকাটা অনেক মরা-মরা হয়ে গিয়েছে। ঠাঁট-বাঁট বেড়েছে হয়তো, কিন্তু তেমন ট্যালেন্টেড মানুষ আর এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এলেন না।''

''এত পুরনো জায়গা এটা, এখানে তেমন দেখার জিনিস কিছু নেই?'' নোটন জিজ্ঞেস করল আগ্রহভরে।

''আছেই তো,'' বাদলদা উৎসাহের সঙ্গে বলে, ''এখানে ময়দা কালীবাড়ি আছে...''

''ময়দা কালীবাড়ি, এমন অদ্ভুত নাম কেন?'' বাদলদার কথার মাঝখানেই বলে ওঠে নোটন।

''জনশ্রুতি আছে এই কালীমূর্তি নাকি ময়দানব পুজো করতেন একসময়,'' বাদলদা বলল, ''সত্যি-মিথ্যে জানি না, তবে এখানকার প্রায় সব মানুষই এ কথা বিশ্বাস করে। তা ছাড়া যে প্ল্যাটফর্মে নামলে তোমরা, ওই দিক দিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে ভ্যান বা অটো নিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়া যায়। আরও এগোলে কৈখালি। সেটা অবশ্য বেশ দূর। তবে তোফা জায়গা। দিনদুয়েকের ছুটি নিয়ে শীতকালে চলে এসো একবার দু'জনে। আমি নিজে ঘুরিয়ে দেব তোমাদের। নিমপীঠ আশ্রমের সেক্রেটারি মহারাজ খুবই স্নেহ করেন আমাকে। আমি আগে থেকে বলে রাখলে নিমপীঠ আর কৈখালি দু' জায়গাতেই থাকা এবং প্রসাদ পাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন উনি।''

''আসবে একবার ঝুলনদি?'' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে নোটন।

''দেখা যাক,'' নোটনের দিকে না তাকিয়েই রেলওয়ে ফুটব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে উত্তর দেয় ঝুলন।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে কয়েক পা এগোতেই রিকশাভ্যানের স্ট্যান্ড। ঝুলন সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''সঞ্জয়বাবুর বাড়ি কত দূরে বাদলদা? আমরা কি ভ্যানে করে যাব?''

''বেশি দূরে না,'' বাদলদা হাত নেড়ে বলে, ''মেন রাস্তায় উঠে একটুখানিই। চল, ধীরেসুস্থে হেঁটেই চলে যাই। সঞ্জয়দাকে তো বলে রেখেছি। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।''

সরু রাস্তাটার দু'পাশেই নানা রকমের দোকান। শাকসবজি, মাছ। এছাড়া বাঁধা দোকান তো আছেই। রাস্তাটা বেশ ঘিঞ্জি। সেই রাস্তাটুকু পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে বাঁদিকে বেঁকে খানিক হেঁটে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল বাদলদা। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে একটা দোতলা সুদৃশ্য বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ''এসে গেছি।''

ডোরবেল বাজাতে যে মানুষটা পাট করে পরা লুঙ্গি আর হাফহাতা পাঞ্জাবি পরে দরজা খুলে দিলেন, বাদলদা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ''ইনিই সঞ্জয়বাবু। সঞ্জয় মিত্র। মথুরাপুর জগত্তারিণী বয়েজ হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম একজন প্রতিনিধি।''

ঝুলন দু'হাত জোড় করে বলল, ''নমস্কার।'' সঞ্জয় মিত্র প্রতি নমস্কার করলেন না। ঝুলন আর নোটনের মুখের উপর দিয়ে সন্ধানী দুটো চোখ কয়েকবার বুলিয়ে নিয়ে ভারিক্কি গলায় বললেন, ''ভিতরে এসো।''

বাদলদা শুকনো হেসে জিজ্ঞেস করল, ''আছেন কেমন সঞ্জয়দা?''

''চলছে,'' বলে দায়সারা উত্তর দিয়ে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ঘরের আসবাবগুলো দামি। মেঝেতে কার্পেট পাতা। দেওয়ালে বেশ বড় স্ক্রিনের এল ই ডি টিভি। ঝুলনদের হাতের ইশারায় সোফায় বসতে বলে তিনি নিজে উলটো দিকের চেয়ারে বসলেন।

নোটনের কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। লোকটা বড্ড রুক্ষ। কঠিন ব্যক্তিত্বের ছাপ খেলা করে বেড়াচ্ছে তাঁর চোখে-মুখে। চালচলন যথেষ্ট দেমাকি। বেশ একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব চোখে-মুখে। বাদলদাও যেন সঞ্জয় মিত্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই কেমন মিইয়ে আছে। নোটনের মনে হল ঝুলনদি নিজেও বোধ হয় একটু নার্ভাস ফিল করছে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা শুরু করতে। সঞ্জয় মিত্র ঝুলনের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, ''কী জন্যে আমার কাছে আসা বলে ফেলো এবারে।''

বাদলদা দু' বার কেশে নিয়ে বলতে শুরু করল, ''সঞ্জয়দা, ওর নাম ঝুলন, আমার মামাতো বোন। ও আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবে বলে আমায় বলেছিল।''

''আমি ওর ব্যাপারটা জানি,'' কথার মাঝখানেই বাদলদাকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন সঞ্জয় মিত্র, ''ওকে আমার সঙ্গে ইন্টোডিউস করানোর দরকার নেই,'' বলেই তিনি ঝুলনের চোখের উপরে চোখ রাখলেন, ''তুমি তো স্কুলে গিয়েছিলে?''

''হ্যাঁ।''

''স্কুলে কার সঙ্গে কী কথা হয়েছে তোমার আমি সবই জানি। তোমার সম্পর্কেও ইতিমধ্যে খোঁজখবর করে নিয়েছি। আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম তুমি আসবে। কাজেই বাদলের ফোন পেয়ে আমি আশ্চর্য হইনি। ইন ফ্যাক্ট আমার কৌতূহল হচ্ছিল তোমার সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার পরে। মহিলা গোয়েন্দাদের কথা গল্পেটেল্পে পড়েছি আমি। আমার নাতি ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে এক মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রের ভক্ত ছিল খুব। তাই ভাবলাম তোমায় একবার চোখের দেখা দেখি।''

''আমি গোয়েন্দা নই।''

''সে কী হে,'' একটার ব্যঙ্গের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিলেন সঞ্জয় মিত্র, ''বসন্তকুঞ্জের কী একটা ঝামেলা তুমিই নাকি খুব সাহস দেখিয়ে সলভ করেছিলে?''

''আমি একা নই।''

''ওই হল। ওটা বলতে হয়। এই এখন যেমন তোমরা তিনজন। কিন্তু ইশকুলে তুমি তো বাপু একাই গিয়েছিলে। দিব্যি পরিণত ও পেশাদার পুলিশ কত্তা বা গোয়েন্দাদের মতো প্রশ্নটশ্ন করেছ শুনলাম। তা আমার সম্পর্কেও তো অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছ শুনলাম সেখানে অনেকের কাছে।''

''হ্যাঁ করেছি,'' খুব স্থির আর ঠান্ডা গলায় উত্তর দিল এবার ঝুলন। নোটন মনে-মনে আশ্বস্ত হল খানিক। ঝুলনদির এই কণ্ঠস্বরটা সে চেনে। তার মানে প্রাথমিক জড়তাটা ও কাটিয়ে উঠেছে এইবার। ঝুলনদি আবার বলে উঠল, ''কিন্তু মুশকিল হল আপনার সম্পর্কে এমনই সাবধানী ও সতর্ক সকলে যে, আপনার প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলো জানা আমার দরকার, সেগুলো স্কুল থেকে ঠিকঠাক জানা হয়নি।''

''যে মানুষ সম্পর্কে সকলে এত সাবধানী, সে মানুষটা যে খুব সহজ নয় নিশ্চিত তা বুঝেছ তুমি। ভয় বলো বা ভক্তি, আজকাল তো আর কেউ কাউকে এমনি-এমনি করে না।''

''আপনার এ কথাটা আমি মানি। আমি জানি এলাকায় বা

এই এলাকার বাইরেও আপনার কানেকশন যথেষ্ট। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, কাজের দায়িত্ব আমি নিয়েছি বা বলতে পারেন নিতে বাধ্য হয়েছি একপ্রকারে, সেই কাজের দায় সামলাতে আপনার সাহায্য আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমার কাজটা কী, সে খবর যে আপনি এর মধ্যেই পেয়ে গেছেন তা আপনার কথা থেকেই বুঝতে পারছি। আর আপনিও নিশ্চিত বুঝতে পারছেন যেহেতু যে রাতে আশ্চর্যজনকভাবে ব্রতীনআঙ্কল মারা যান, সেদিনই সন্ধেবেলা আপনি এসেছিলেন তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে সম্ভবত আপনার সেদিন কিছু উত্তেজিত কথাবার্তাও হয়েছিল।''

''হুঁ হয়েছিল। কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়?'' মাঝপথেই ঝুলনকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন সঞ্জয়বাবু, ''যেদিন ব্রতীনবাবু মারা যান সেদিন আমি তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম বা স্কুলের কিছু আভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতপার্থক্যজনিত কারণে কিছু তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল মানেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমি খুনি? আমিই খুন করেছি ব্রতীনবাবুকে? কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, ব্রতীনবাবু মারা গেছেন মাস পেরিয়ে যেতে বসল বোধ হয়। হঠাৎ এতদিন পরে এই প্রসঙ্গে তুমি এমন অতিতৎপর হয়ে উঠলে কেন?''

''আসলে মন্দিরা, আই মিন ব্রতীনআঙ্কলের মেয়ে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ও একটা সাইকোলজিক্যাল ট্রমার মধ্যে রয়েছে,'' ঝুলন খুব নরম গলায় বলতে শুরু করল, ''ওর ধারণা ওর বাবার এই মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।''

''এটা তো খুবই স্বাভাবিক। একটা জলজ্যান্ত মানুষ অমন বিনা নোটিসে যদি দুম করে মারা যান তা হলে তাঁর আপনজনদের এই টুমা তো হবেই। সেই বিহ্বলতা থেকে তারা যদি একটা সম্ভাবনার কথা বলেই থাকে, সেই ছেলেমানুষি এবং আবেগের কথায় নাচটা কি সত্যি-সত্যি কোনও বুদ্ধিমান মানুষের কাজ?'' সঞ্জয় মিত্র স্থির চোখে চাইলেন ঝুলনের দিকে।

''কিন্তু এই আবেগটা যদি শুধু শোকসন্তপ্ত মানুষের অবাস্তব সম্ভাবনা না হয়ে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য একটা দাবি হয়?''

''তা হলে কী বলতে চাইছ তুমি? ব্রতীনবাবুকে আমিই খুন করেছি?''

''সরাসরি এক্ষুনি ঠিক সে কথাটা বলছি না, কিন্তু এই মৃত্যুতে আপনার হাত থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।''

''আমি তোমার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি,'' সঞ্জয় মিত্র বললেন। তাঁর হাত কাঁপছে অল্প-অল্প নোটিন লক্ষ করল। সটান দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন তিনি, ''তোমার বয়স আমার মেয়ের বয়সের চেয়েও কম। অন্য কেউ হলে...'' কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, ''আমার বাড়িতে বসে আমাকেই অপমান করছ তুমি আমায় খুনি বলে? ঠিক আছে আমি খুনি। স্বীকার করে নিচ্ছি। এবারে কী করার আছে করে ফেলো তুমি। দেখি, কত বড় গোয়েন্দা হয়েছ তুমি। শোনো হে ছুকরি, আমি সঞ্জয় মিত্তির ওপেন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তোমায়, ক্ষমতা থাকলে আমার অপরাধ প্রমাণ করে দেখাও তুমি। আর-একটা কথা জেনে রাখো, এ জগতে অনুমান বলে কিছু হয় না। কোনও ফার্ম ডিসিশনের জন্যে প্রমাণ লাগে। এভিডেন্স। কংক্রিট প্রুফ।''

''আপনি মিথ্যে রাগ করছেন আমার উপরে,'' ঝুলন হাসে, ''আমি তো কই একবারও বলিনি আপনিই খুনটা করেছেন। সত্যি বলতে কী, উনি যে খুনই হয়েছেন এ কথাটাও একবারও বলিনি আমি। আমি শুধু বলেছিলাম ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। সেটা আত্মহত্যাও হতে পারত। তবে আপনি যেমন জোর দিয়ে খুনের প্রসঙ্গেই চলে এলেন সরাসরি তাতে আমার মনে হচ্ছে কেসটা খুনের সম্ভাবনাই বেশি। কেননা আপনার মতো বিচক্ষণ মানুষ যখন এত জোর দিয়ে বলছেন,'' ঝুলন ঠোঁটের কোণে হাসিটাকে ঝুলিয়ে রেখে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

এই প্রথম সঞ্জয় মিত্রকে অপ্রতিভ হতে দেখল নোটন। ওঁর মুখের উপরে মুহূর্তের মধ্যে কে যেন একপোঁচ কালি ঢেলে দিয়েছে। ঝুলন তখনও একভাবে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর মুখের দিকে। এতক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিলেন সঞ্জয় মিত্তির। দু'বার গলাখাঁকারি দিয়ে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিলেন তিনি। তারপর অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে ঝুলনকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, ''স্পষ্ট করে বলো তো, ঠিক কী জানতে তুমি আমার কাছে এসেছ?''

ঝুলন একটু সময় নিল। তার মুখের হাসিটা এখন মিলিয়ে গিয়েছে। বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে এখন ঝুলনকে। ঝুলনদির এই মুখটাকে মনে-মনে খুব সমীহ করে নোটন। কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধির ছাপ আলো হয়ে থাকে এই সময় তার মুখে। নোটন বোঝে ঝুলনদি তার তুলনায় সত্যিই অনেকখানি আলাদা। ঝুলনদিকে বুদ্ধি আর সাহসে ছুঁয়ে ফেলা তার ক্ষমতার বাইরে। সামনে টি টেবিলের উপরে রাখা একটা পেপার ওয়েট ডান হাতের আঙুলে আনমনে নাড়াচাড়া করতে-করতে ঝুলন বলে, ''আচ্ছা আপনার নিজের মনে হয় না ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুটা একটু অস্বাভাবিক?''

''না।''

''কেন?''

''ব্রতীনবাবুর হাই প্রেশার ছিল। সেক্ষেত্রে একটা ম্যাসিভ স্ট্রোকের পসিবিলিটি তো থেকেই যায়। তা ছাড়া স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাপ আজকাল এমনিতেই মারাত্মক রকম বেড়ে গেছে। তার উপরে ওঁর শরীরটাও সেই সময় খুব একটা ভাল যাচ্ছিল না গত কয়েক দিন ধরে।''

''আপনি কী করে জানলেন? আপনি তো নিয়মিত স্কুলে যেতেন না। উনি কি আপনাকে বলেছিলেন?''

''না, মানে,'' ইতস্তত করতে থাকেন সঞ্জয় মিত্র, ''স্কুলে না গেলেও স্কুল সম্পর্কে খোঁজ খবর তো নিয়মিতই রাখতাম। এখনও রাখি।''

''লাস্ট ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে কী নিয়ে বচসা হয়েছিল আপনাদের?''

''বচসা হয়েছিল এ কথা কে বলল? আলোচনা হয়েছিল। সব মিটি এই হয়। মতান্তর তো হতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মতান্তর মনান্তরের পর্যায়ে যাতে না যায় আমি এবং ব্রতীনবাবু দু'জনেই সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকতাম সবসময়। ইন ফ্যাক্ট সেদিনও সচেতন ছিলাম।''

''আপনি কিন্তু আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন,'' ঝুলন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে বলে, ''যদিও আমি নিজে ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুটা যে খুনই এমন কথা জোর দিয়ে বলিনি, আপনিই এই সম্ভাবনার কথা বারবার নিজে থেকেই উত্থাপন করেছেন, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার আমার উপায় নেই যে, আপনার ওই খুনের সম্ভাবনার কথা মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর তার থেকেও যেটা বড় কথা, আপনি ভাবনেন না আমি কোনও অনুসন্ধান ছাড়াই এই কথা বলছি।''

''মানে, কী বলতে চাইছ তুমি?'' উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন সঞ্জয় মিত্র।

''আমি আপাতত এইটুকুই বলতে চাইছি যে, ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যু রহস্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন কিছু বিষয়ের প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমার হাতে এসে গেছে যা দিয়ে আপনাকে যথেষ্টই বিড়ম্বনায় ফেলে দেওয়া যায়। এবং এই ঘটনাটা সত্যিই যদি খুন হয় তা হলে সেই খুনে আপনার লাভই যে সবচেয়ে বেশি সে কথা এখনই জোর দিয়ে বলে দেওয়ার মতো তথ্য আমার হাতে রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না, এর আগে স্কুলের মিড ডে মিলের বাজার করা নিয়ে আপনার সঙ্গে আপনার স্কুলের এইচ এমের কিছু একটা ঝামেলা হয়েছিল। কিছুদিন আগেও সম্ভবত একটা কোনও কন্ট্রাকশনের কাজে আপনি কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে জোর করে যাচ্ছিলেন

ব্রতীনবাবুকে ক্রমাগত।''

''কিন্তু...'' কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন সঞ্জয় মিত্র। ঝুলন আমলই দিল না। সে তাঁর চোখের উপরে চোখ রেখে বলতেই থাকল, ''কাজেই প্রকৃত সত্যিটা খুঁজে বের করতে আপনি যদি আমায় পূর্ণ সহযোগিতা না করেন, সেক্ষেত্রে আপনাকেই পস্তাতে হবে সবচেয়ে বেশি।''

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝুলন। সঞ্জয় মিত্রের দিকে চেয়ে বলে, ''আজ আসি। পরে আবার আপনার সঙ্গে কথা বলব আমি। প্রয়োজন হলে চলেও আসতে পারি আবার আপনার কাছে। আপনার সেল নম্বরটা আমায় দিয়ে রাখুন, ঠিক সময়ে যোগাযোগ করে নেব আমি।''

ভয় পাওয়া ফ্যাকাশে মুখে সঞ্জয় মিত্র নিজের সেল ফোনটা হাতে নিলেন। তারপর ঝুলনের দিকে চেয়ে বললেন, ''তোমার নম্বরটা বলো। আমি মিস কল দিচ্ছি।''

॥ ৫ ॥

মাঝে-মাঝে কী যে হয় ঝুলনদির, কে জানে! সেই সময় ও এমন ভাব করে যেন নোটন বলে এই বিশ্বসংসারে যে আদৌ কেউ আছে এই সামান্য কথাটা জানাই নেই ওর। এখন সেই ফেরু চলছে আবার। কোনও খবর নেই। বাড়ি গেলে পাওয়া যায় না। ফোনে কী যে কল করে রেখেছে কে জানে! ফোন করলেই একটা বিরক্তিকর যান্ত্রিক গলা একঘেয়ে স্বরে গাওনা গাইতে থাকে এই নম্বরের মোবাইল ফোনটি নাকি আইদার সুইচড অফ অর নট রিচেবল। আগে-আগে এমন হলে নোটনের খুব অভিমান হত। এখন বুঝে নিয়েছে অভিমান করে কোনও লাভ নেই। ঝুলনদি চুপচাপ রয়েছে দেখে নিজেও এবারে চুপ করে গিয়েছিল নোটন। ঝুলনদির খবরাখবর নেওয়ার জন্যে খুব একটা আগ্রহও দেখায়নি আর। এতেই সম্ভবত কাজ হল। ঝুলন নিজেই ফোন করল ওকে দিনদুই-তিন বাদে। সেদিন বাড়িতে বসে জমিয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। জমাটি লেখা। বিদেশি থ্রিলার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলেও বইটা ছেড়ে উঠতে পারছিল না সে। সেই সময়েই ঝুলনদির গলা সেলফোনে, ''কী করছিস রে? বাড়িতে আছিস নাকি বাইরে কোথাও?''

''বাড়িতেই আছি,'' খুব নিরাসক্ত গলায় উত্তর দেয় নোটন।

''বাস্ত?'' ঝুলন জিজ্ঞেস করে।

''না, তেমন নয়। একটা গল্পের বই পড়ছি আসলে। বইটা হেবি ইন্টারেস্টিং!''

''তা হলে কি আর বই ছেড়ে উঠে আসতে পারবি?'' বলেই ফিক করে হেসে ওঠে ঝুলন, ''থাকগে, তুই মন দিয়ে লেখাপড়া করছিস যখন তোকে আর খামোকা বিরক্ত করে লাভ নেই। আমি একাই বরং ঘুরে আসি মন্দিরাদের বাড়ি থেকে।''

''তা তুমি যেতেই পার,'' নোটন গলাটাকে নিষ্পৃহ করে রাখার চেষ্টা করে, ''সব জায়গায় কি আর সত্যিই তুমি নিয়ে যাও নাকি আমায়? এই তো ক'দিন ডুব মেরে দিলে। তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে বলো এই সময়ের মধ্যে ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুর কারণ জানার আশায় কোথাও ছুটোছুটি করোনি তুমি?''

''করেছি। বিস্তর ছুটোছুটি করেছি। তা ছাড়া ব্রতীনআঙ্কলের ডায়েরিটা নিয়েও খুব ব্যাযাক্বর্ডও থাকতে হয়েছিল।''

''সবে? তখন তো আমার কথা মনে পড়েনি তোমার। তা এখন হঠাৎ আমার উপর তোমার এমন কৃপা দৃষ্টি পড়ল যে?''

''ইয়ার্কি মারছিস? হেব্বি আওয়াজ দিচ্ছিস তো দেখছি আজ আমায়,'' ঝুলন লঘু গলায় বলে।

''পাগল হলে ঝুলনদি?'' নোটনও হাসে, ''আমার ঘাড়ে কি চারটে মাথা? আমি ইয়ার্কি মারব ভবিষ্যতের দুঁদে গোয়েন্দা ঝুলন চাটুজ্জের সঙ্গে? যার কথায় কিনা বলরামপুর পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে বারুইপুর থানার আই সি পর্যন্ত গুরুত্ব দেন।''

''নে, নে, অনেক হয়েছে,'' লাজুক গলায় বলে ঝুলন, ''ফালতু আমার গুণকীর্তন করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তুই রেডি হ। আমি আঘণ্টাটাক পরে আসছি। দু'জনে বেরব একটু।''

''কোথায়?''

''মন্দিরাদের বাড়ি।''

''আবার?''

''হ্যাঁ, দরকার আছে। বাবুয়াদার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা দরকার।''

''বাবুয়াদার দোকান নেই আজ?''

''না, আমি খবর নিয়েছি। বৃহস্পতিবার মহামায়া ফার্মেসি বন্ধ থাকে।''

''কিন্তু ছুটির দিন বলেই বাবুয়াদা বাড়ি থাকবে?''

''থাকবে। আমি ফোন করেছিলাম। প্রথমে গাঁইগুঁই করছিল। বলছিল দেশের বাড়ি যাবে। কী নাকি দরকার। অনেক কাজ পড়ে আছে। একটা ছুটির দিন, কাজগুলো শেষ করে না নিতে পারলে আবার পাক্কা এক সপ্তাহ ওয়েট করতে হবে।''

''তারপর?''

''আমি ভয় দেখালাম। বললাম, আমি কিন্তু এই মৃত্যুটার ব্যাপারে অনেক কিছুই এর মধ্যে জেনে ফেলেছি। আর যেটুকু বুঝেছি, এই মৃত্যুর পিছনে আপনার হাত থাকা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং আপনারই এই মৃত্যুতে লাভ সবচেয়ে বেশি। কাজেই আপনি আমাকে সময় না দিলে আপনারই বিপদ। পুলিশ যে-কোনও সময় আপনাকে অ্যারেস্ট করে ফেলতে পারে। তখন ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই আমাদের হাতের বাইরে বেরিয়ে যাবে।''

''সকলকেই তো প্রায় একই কথা বলছ তুমি দেখছি। সেদিন সঞ্জয় মিত্তিরকেও তো এমন করেই ভয় দেখালে,'' নোটন হালকা স্বরে বলে, ''সব জায়গায় একই অস্ত্র ঝুলনদি?''

ঝুলন হাসে। সেই হাসিতে রহস্যের গন্ধমাখা। তারপর বলে, ''কেসটা সত্যিই খুব সহজ নয় হে নোটনবাবু। বিভিন্ন মানুষ ভালমানুষের ভেক ধরে নানা ধান্দায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই মৃত্যু রহস্যের সঙ্গে।''

''তুমি সত্যি কেসটা সল্‌ভ করে ফেলেছ?''

''খানিকটা।''

''এই যে একটু আগে বললিলে ব্রতীনআঙ্কলের মৃত্যুতে বাবুয়াদার সবচেয়ে বেশি লাভ।''

''হুঁ।''

''কেন?''

''তোর মাথা কিন্তু দুর্দান্ত খেলছে আজকাল নোটন। যতটা গবেট বলে কাকিমা তোকে মনে করে তুই সত্যিই তা নয়। একটু চেষ্টা করলে রেজাল্টটা তোর আনডাউটেডলি আরও ভাল হতে পারত।''

''কথা ঘুরিও না ঝুলনদি। যেটা জিজ্ঞেস করছি বলো।''

''ব্রতীনআঙ্কলের একটা বড়সড় এল আই সি ছিল যার নমিনি করা ছিল বাবুয়াদাকে।''

''কত বড় এল আই সি?''

''বেশ বড়ই। পনেরো বছরের পলিসি। ম্যাচিউরিটি অ্যামাউন্ট সবকিছু ধরে প্রায় দশ-বারো লাখ। পলিসি হোল্ডারের হঠাৎ মৃত্যু হলে ওই পুরো টাকাটারই দাবিদার নমিনি, আই মিন বাবুয়াদা।''

''বলো কী গো!'' নোটন বিস্মিত হয়ে বলে, ''জানলে কী করে তুমি এসব? মন্দিরাদি বলেছে?''

''উঁহু। ওরা জানতই না।''

''তা হলে?''

''এসব জেনে নিতে হয়।''

''তার মানে সঞ্জয় মিত্তির নয়, বাবুয়াদি...''

''সে কথাই বা এক্ষুনি কী করে বলি বল। আরও দু'-একটা চরিত্র যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাদের সম্পর্কেও আর একটু

বিশদ তথ্য চাই। আরও একটু সলিড এভিডেন্স।"

"মানে?" উত্তেজিত গলায় বলে নোটন, "এদের পিছনেই ছুটে বেড়াচ্ছিলে তুমি এই ক'দিন?"

"জি জনাব," মজা করে বলে ঝুলন।

"তারা কারা?"

"তুই কথা না বাড়িয়ে রেডি হ। আমি আসছি," বলেই লাইনটা কেটে দিল ঝুলন।

এই হচ্ছে ওর একটা মহা দোষ। গাছে তুলে দিয়ে মইটা সরিয়ে ফেলবে সড়াৎ করে। আপনমনে গজগজ করতে-করতে বইটা ভাঁজ করে জায়গা মতো রেখে তৈরি হতে লাগল নোটন। মনে-মনে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল সে। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল ঝুলনদি এই রহস্যের সমাধানের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। আর তখনই ওর মনে পড়ল ব্রতীনআঙ্কলের ডায়েরির সেই রহস্যময় থার্টি ওয়ান ডি কথাটা। ওই কথাটা কি তা হলে নিছকই মামুলি? কোনওই মানে নেই ওটার? এই ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সত্যিই যোগ নেই কোনও ওই আশ্চর্য সংকেতটার?

আধঘণ্টা পরে আসবে বলেছিল, কিন্তু ঝুলনদি এল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে জবাবদিহি করার ভঙ্গিতে বলে উঠল সে, "একটু দেরি হয়ে গেল রে। আসার পথে টুকরো একটা কাজ সেরে নিলাম। তা দেরিই যখন হল এক কাপ চা খেয়ে নিই কাকিমার হাতে, কী বল?"

এ কথায় কী আর বলবে নোটন। ঝুলনদিই হাঁক ছাড়ল, "কাকিমা চা খাব কিন্তু এক কাপ। চিনি ছাড়া। লিকার। একটু কড়া করে। শিগগির দাও। তাড়া আছে। বেরতে হবে।"

নোটনের মা এসে দাঁড়ালেন সামনে। হেসে বললেন, "ক'দিন ধরে কী একটা করে বেড়াচ্ছিস বল দিকিনি দেখি সত্যি করে?"

"একটা ধাঁধার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি গো কাকিমা," ঝুলন চেয়ারের উপরেই পা তুলে দিয়ে বাবু হয়ে বসল জুত করে। তারপরে আবার বলল, "হাতে বেশি সময় নেই কিন্তু। তাড়াতাড়ি একটু চা খাওয়াও তো দেখি। আর মনে রেখো, ভুল করে যেন আমার চায়ে চিনি দিয়ে দিয়ো না।"

"যদি বা দিই, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি," নোটনের মা মুখ টিপে হাসেন, "এই তো বয়স। এর মধ্যে তোর এত বিধিনিষেধের দরকারটা কী বল দেখি। এখন কোথায় যা ইচ্ছে, যত ইচ্ছে খেয়ে নিবি, তা নয়। এটা খাব না, ওটা দিয়ো না, এতে ক্যালোরি বেড়ে যাবে, অমুকটায় হ্যান হবে, ত্যান হবে, তোদের নিয়ে আর পারি না বাপু। কী যে ঢং হয়েছে আজকাল," এমনভাবে কথাগুলো তিনি বললেন যে, ঝুলন হা হো করে হেসে উঠল। নোটনও। তারপর চেঁচিয়ে মাকে বলে উঠল, "ঝুলনদির সঙ্গে আমাকেও এক কাপ দিয়ো। আমায় অবিশ্যি দুধ, চিনি, বিস্কুট সবই দেবে। ঝুলনদির মতো আমি অত বেশি হেল্থ-কনশাস হতে চাই না এক্ষুনি।"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল নোটন, "এবার আমায় কি একটু আলো দেখাবো যাবে ঝুলনদি?"

"আলো?" ঝুলন আনমনা হয়ে জানলা দিয়ে খানিক বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর আপন মনে বলে উঠল, "আমি নিজেও যে ওই আলোটা হাতড়ে বেড়াচ্ছি রে নোটন এখনও। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে আলোয় মোড়া সেই পথটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে, পরক্ষণেই সব কেমন যেন আবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কগুলো যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ধরে ফেলেও যেন ধাঁধাটাকে ঠিকমতন মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারছি না। পাঁকাল মাছের মতো আসল কালপ্রিটি আমার যুক্তি ও ধারণার বাইরে পিছলে-পিছলে যাচ্ছে ক্রমাগত।"

"কী মনে হচ্ছে তোমার? মৃত্যুটা খুন না আত্মহত্যা?"

"খুন।"

"শিওর?"

"শিওর।"

"বলো কি গো?" শিউরে উঠে বলে নোটন, "তবে কি বাবুয়াদাই..."

"তাই ভাবছিলাম। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে বাবুয়াদা নয়। বাবুয়াদা নিজে খুন করলে..." বলে থেমে গেল ঝুলন। কী একটু ভাবল খানিক। তারপর বলল, "তবে নিজে খুন করুক বা না করুক, এই খুনে একটা কিছু ইনভল্‌ভমেন্ট আছে ওর। অন্তত কিছু একটা জানে ও। তাই খুব সচেতনভাবে খুনের প্রমাণ লোপাট করার পাশাপাশি সন্দেহটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ও।"

"কী রকম?"

"নম্বর ওয়ান, ডায়েরিটা যাতে সকলের চোখে পড়ে তার জন্যে ওই ডায়েরিটা ব্রতীনবাবুর পাশে রেখে দেয়।"

"অন্য কেউ যে নয় তা তুমি কী করে জানলে?"

"ও ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এ কাজ সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এক্ষেত্রে ওর এই কাজের স্পষ্ট মোটিভও রয়েছে।"

"কীরকম?"

"ডায়েরির কয়েকটা পাতা ছেঁড়া ছিল। তোকে আগে বলেছি বোধ হয়।"

"হুঁ।"

"ডায়েরির যে অংশটা ছেঁড়া সেখানেই বাবুয়াদাকে নমিনি রেখে যে পলিসিটা করা ছিল ব্রতীনআঙ্কলের তার ডিটেল্‌সগুলো ছিল। সেগুলো নিয়ে ইতিমধ্যে বাবুয়াদা তার ক্লেম আদায় করার জন্যে প্রেমাঙ্কুর ঘোষালের কাছে গিয়েওছিল।"

"প্রেমাঙ্কুর ঘোষাল কে?"

"এল আই সি এজেন্ট। ভালমানুষ। সিনসিয়ার। ব্রতীনআঙ্কলের ছাত্র ছিলেন একসময়। খুবই শ্রদ্ধা করতেন উনি ব্রতীনকাকুকে। নিজের ফিল্ডে বেশ নামডাক আছে ভদ্রলোকের। প্রচুর ব্যবসা করছেন। এককাঁড়ি ক্লায়েন্ট ওঁর।"

"এত ক্লায়েন্ট পাওয়া তো চাড্ডিখানি কথা নয় বলো?"

"ভাল সার্ভিস ছাড়া এটা হয় না সাধারণত।"

"এই পলিসির খবর উনিই দিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি বললে আর উনি গড়গড় করে সব বলে দিলেন?"

"দূর," ঝুলন হাসে, "এই ক্লায়েন্টদের ক্লায়েন্টদের সেভিংস সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখাই এজেন্টদের কাজ। এটা তাদের বিজনেস এথিক্‌সের মধ্যেই পড়ে।"

"তা হলে এই খবর উনি তোমায় বললেন কেন?"

"এমনি-এমনি কি বললেন ভেবেছিস নাকি? কত কী জিজ্ঞেস করলেন। আমায় নানা স্কিম বোঝাতে লাগলেন। বারবার বোঝাতে লাগলেন আমার নিজেরও ইমিডিয়েটলি একটা পলিসি করানো উচিত। পলিসি না করিয়ে কতজনকে পরে পস্তাতে হয়েছে সেইসব গল্প করলেন। আমায় কনভিন্স করালেন যে এ চত্বরে তাঁর মতো পরিষেবা আর কারও কাছে পাওয়া যাবে না। আমি সব শুনলাম মন দিয়ে। খুব ইমপ্রেসড হওয়ার ভান করে কবুল করলাম যে, ওঁর কাছে পলিসি করাব। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আরও খানিক এ কথা, সে কথার পর আমি যখন ব্রতীনকাকুর মৃত্যু নিয়ে মন্দিরার সন্দেহের কথা বললাম আর সেই সন্দেহের সত্য অসত্য খতিয়ে দেখার ব্যাপারে আমার ভূমিকার কথাটা ওঁকে বুঝিয়ে বললাম সবিস্তারে, তখন আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাকে দিব্যি গড়গড় করে বলে দিলেন এইসব খবর।"

"ওরেব্বাস। তুমি তো প্রচণ্ড কাজ করেছ এ ক'দিনে তলে-তলে।"

"শুধুই কী এই?" চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করে ঝুলন, "এর মধ্যে কাকুর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির আর-এক মেম্বার জনার্দন কয়ালের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এসেছি। বোঝার

চেষ্টা করেছি এই কেসে তাঁর জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা কতখানি।"

"হঠাৎ জনার্দন কয়াল?"

"ওই যে থার্টি ওয়ান ডি..." বলে মুখে একটা রহস্যের হাসি টেনে আনল ঝুলন।

"মাঝে-মাঝে তুমি বড্ড হেঁয়ালি করো ঝুলনদি," নোটন বিরক্ত হয়ে বলে, "জনার্দন কয়ালের সঙ্গে ডায়েরির ওই অদ্ভুত সূত্রটার কী সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক আছে নোটনবাবু।"

"কী রকম?"

"সম্পর্ক হল এই যে, সঞ্জয় মিত্রের মতো জনার্দন কয়ালও ব্রতীনআঙ্কলের স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে পি আই ই ক্যাটেগরিতে সদস্য..."

"পি আই ই-টা আবার কী?" ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করে নোটন।

"পারসন ইন্টারেস্টেড ইন এডুকেশন," থেমে-থেমে শব্দ তিনটে উচ্চারণ করে ঝুলন।

"প্লিজ় একটু খুলে বলবে ঝুলনদি ব্যাপারটা," উত্তেজিত গলায় বলে নোটন, "আমার মাথার মধ্যে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।"

"তোর কাছে কাগজ-কলম আছে তো?"

"হুঁ।"

"নিয়ে আয়, একটা ম্যাজিক দেখাই তোকে।"

নোটন পড়ার টেবিল থেকে একটা রাইটিং প্যাড আর একখানা কলম এগিয়ে দেয় ঝুলনের দিকে। ঝুলন সেটা হাতে নিয়ে নোটনকে ডাকে, "এখানে আয়। আমার পাশে এসে বোস। কী লিখি পড়।" নোটন পাশে এসে বসতেই প্যাডের একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে ব্রতীনআঙ্কলের ডায়েরির পাতায় থাকা লেখাটার হুবহু নকল হাতের লেখায় লিখল থার্টি ওয়ান তারপরে স্মল ডি। তারপর নোটনের দিকে তাকিয়ে হাসল। হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী লিখলাম বল তো?"

"ওই লেখাটাই তো।"

"ওই লেখা মানে?"

"ওই যে ডায়েরিতে যেটা ছিল, থার্টি ওয়ান ডি।"

"বেশ," ঝুলন মুচকি হেসে বলল, "এবার তুই আমার উলটো দিকে গিয়ে বোস। ওদিক থেকে দেখে বল কী লেখা আছে এই কাগজটায়।"

নোটন ঝুলনের উলটো দিকে গিয়ে বসল। তারপর আবার তাকাল ঝুলনের হাতে ধরে থাকা কাগজটার দিকে। আর তাকিয়েই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল সে "সত্যি-সত্যিই তো লেখাটা অন্য হয়ে গেল ঝুলনদি!"

"কী হল বল দেখি?"

"পি আই ই," এবার হতভম্ব গলায় বলে নোটন, "যার পুরো কথাটা একটু আগে বলছিলে তুমি..."

"ইয়েস," তার কথার মাঝখানেই বলে ওঠে ঝুলন, "তা হলে বল এবার, জনার্দন কয়ালের কাছে না গিয়ে আর উপায় আছে আমার?"

"কেসটা তো তা হলে সলভ হয়েই গেল প্রায় ঝুলনদি। ব্রতীনআঙ্কল নিজেই তো তার নামে মৃত্যুর আগে ক্লু দিয়ে গিয়েছেন কে তাঁর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। এখন হাতে থাকলেন দু'জন। সঞ্জয় মিত্র আর জনার্দন কয়াল।"

"কিন্তু ব্রতীনকাকু হঠাৎ অমন উলটো করে লেখাটা লিখতে গেলেন কেন? তিনি তো জানা আছে গুপ্তধনের সংকেত লিখে রাখছেন না যে, এমনভাবে লিখবেন যাতে চট করে লেখাটা মানুষ ধরতেই পারবে না। তিনি যদি সচেতনভাবে খুনির হদিশই দিতে চান তা হলে এমন উদ্ভট পাক্কল তৈরি করবেন কেন?"

"এমনভাবে ভাবছ না কেন ঝুলনদি, যে অবস্থায় তিনি এটা লিখেছেন তখন ডায়েরিটা সোজা আছে না উলটো আর যাচাই করার মতন সুযোগ বা শারীরিক অবস্থা তাঁর ছিল না। কোনও রকমে কাঁপা হাতে ওইটুকুই লিখতে পেরেছিলেন উনি ডায়েরিটা বের করে। তারপরেই আর কিছু লেখার বা কাউকে কিছু বলার মতো অবস্থায় আর ছিলেন না তিনি। মৃত্যু এসে গ্রাস করে তাঁকে।"

"কিন্তু শুধু তো ওই লেখাটা নয়। ডায়েরির মধ্যে কাঁপা হাতে বিভিন্ন জায়গায় লেখা অন্য যে দু'-একটা শব্দ রয়েছে সেগুলো তো ভিন্ন-ভিন্ন তারিখে লেখা। সেগুলো তা হলে কাঁপা হরফ কেন? তা ছাড়া, তা ছাড়া," কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল ঝুলন। তারপর অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, "লেখাটা সত্যি-সত্যিই ব্রতীনকাকুরই তো, নাকি অন্য কেউ... কে সে আর কেন?"

"মানে? কী বলতে চাইছ বলো তো ঝুলনদি?" নোটন মাথায় হাত দিয়ে বলে, "আজব সম্ভাবনার কথা বলছ যে এবার। নাকি ইচ্ছে করেই সব গুলিয়ে দিতে চাইছ যাতে ব্যাপারটা কিছুতেই আমি আর বুঝে উঠতে না পারি।"

হাতের কবজি ঘুরিয়ে ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ঝুলন, "আর একদম দেরি নয়। একটু পরেই সঙ্কে হয়ে যাবে। রাত্তির হয়ে যাওয়ার পরে বাইরে থাকলে মা চিন্তা করে জানিসই তো। শিগগির চল, বেরিয়ে পড়ি।"

"বাস, অমনি তাড়াহুড়ো পড়ে গেল তোমার ঝুলনদি," বেজার মুখে বলে নোটন, "তোমায় বুঝি না ভেবেছ? এতক্ষণ চেয়ারের উপরে পা তুলে গ্যাট হয়ে বসে দিব্যি ধীরেসুস্থে চা খেলে তখন দেরি হল না, আমায় খাতার পাতায় ম্যাজিক দেখালে যখন, তখনও দেরি হল না। আর যেই আমি প্রশ্নটা করলাম অমনি তোমার মনে পড়ে গেল যে প্রচণ্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বললেই পারতে যে আমায় এখন কিছু বলবে না।"

"দেরি কী আর ইচ্ছে করে করছিলাম রে", ঝুলন নোটনের মাথায় হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলে, "কেন আমার উপরে অমন শুধুমুধু রাগ করিস বল তো নোটন, আসলে বাড়ি থেকে বেরচ্ছি এমন সময় বাবুয়াদার ফোন।"

"সে কি, কী বলে সে আবার?"

"বলল মন্দিরার থেকে নম্বর চেয়ে নিয়ে আমায় ফোন করছে। একটা বিশেষ কাজে তাকে বাইরে বেরতে হচ্ছে। ফিরতে ঘন্টাখানেকের মতো লাগবে। আমরা যেন একটু পরে যাই ওদের বাড়ি।"

"ও," বলে উঠে দাঁড়ায় নোটন, "ঠিক আছে। চলো।"

ঝুলন বাইরে পা বাড়াল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কাকিমা আসি। চিন্তা কোরো না আমাদের জন্যে। একটু যদি দেরিও হয় একেবারে ভাববে না কিন্তু। তোমার ছেলের জিম্মাদার আমি রইলাম।"

॥ ৬ ॥

মন্দিরা বলল, "আয় ঝুলন। আপাতত আমার ঘরে বোস তোরা। বাবুয়াদা ফিরেছে। বাথরুমে গিয়েছে। ফ্রেশ হয়ে নিয়ে ও নিজের ঘরে ঢুকুক, তারপর তোদের নিয়ে যাচ্ছি।"

"যা বলবি। তবে আমাদের তাড়া আছে রে। বেশি দেরি করাস না প্লিজ়," ঝুলন বলে, "ক'দিন আগে আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হল না, তোকে বলেছিলাম তো ফোনে, তারপর থেকে স্কুটি নিয়ে বেরোলে, বিশেষত রাতে একটু দেরি হলেই মা বড্ড টেনসড হয়ে যায় রে।"

"না-না দেরি হবে না। তোরা বোস। একটু জলটল খা। আমি বাবুয়াদাকে বলে দিচ্ছি।"

"কিন্তু খাব না। কাকিমাকে ব্যস্ত হতে একদম বারণ করে দে," ঝুলন বলে, "জাস্ট কয়েকটা জিনিস বাবুয়াদার থেকে জেনেই আমি চলে যাব। আমার নিজেরও কিছু ইম্পর্ট্যান্ট কাজ আছে রে। সেগুলো

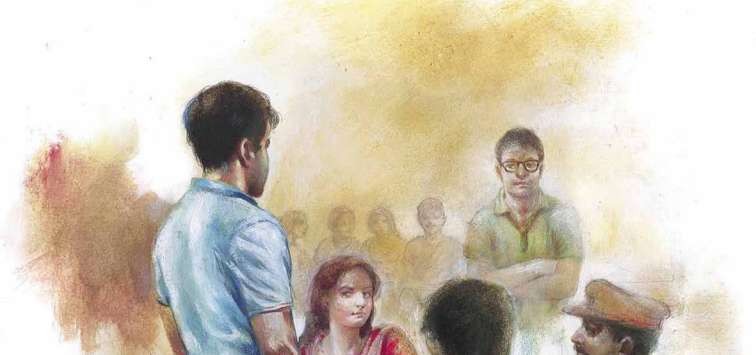

সারতে হবে আমায়। কাজগুলো আর্জেন্ট।''

''বাবার ব্যাপারে কিছু জানতে পারলি ঝুলন?'' মন্দিরার গলাটা কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেল।

''অনেকটাই পেরেছি,''ঝুলন ওর কাঁধে আশ্বাসের হাত রাখে, ''বাকিটাও খুব শিগগিরি জেনে যাব আশা করছি। আমাকে আর দু'-তিনটে দিন সময় দে, আমি সব পরিষ্কার করে বলব তোকে। চিন্তা করিস না। কাকুর মৃত্যুর জন্যে যারা দায়ী, তারা কিছুতেই রেহাই পাবে না মন্দিরা।''

''বাবার মৃত্যুটা তা হলে সত্যিই স্বাভাবিক ছিল না তাই না?''

''না, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।''

''খুন?''

''সম্ভবত হ্যাঁ।''

''সম্ভবত বলছিস কেন? তুই কি তা হলে এখনও শিওর নোস?''

ঝুলন একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চাপা অথচ দৃঢ় গলায় বলল, ''এটা খুন বলেই আমার বিশ্বাস। কে খুনি তাও কিছুটা অনুমান করতে পেরেছি আমি মন্দিরা। শুধু খুনের পদ্ধতিটা... ওইখানে এসেই আটকে গেছি আমি। ওই জটটুকু খুলতে পারলেই...''

''ঠিক বুঝেছিলাম। শেষের ক'দিন বাবা নিজেও বুঝতে পেরে গিয়েছিল। স্কুলটাকে এত ভালবাসত বাবা। অথচ ওই স্কুলই কাল হল। খুনি কে? ওই স্কুলের সঙ্গে জড়িত কেউই তো?'' মন্দিরার চোখমুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে এখন।

''এখন না। আজ জিজ্ঞেস করিস না মন্দিরা। বললাম না, আর দুটো-তিনটে দিন শুধু আমাকে দে।''

মন্দিরা কী একটা বলতে যাচ্ছিল। দরজার ওপার থেকে কাকিমা ''মানু-উ-উ,'' বলে ডেকে উঠতেই থেমে গেল। কাকিমা বললেন আবার, ''মানু ওদের উপরের ঘরে নিয়ে যা। বাবুয়া ডাকছে।''

''চল,'' বলে চোখের ইশারায় ঝুলন আর নোটনকে ডেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল মন্দিরা।

বাবুয়া ঘরের মধ্যে বিছানায় বসেছিল। পরনে রঙিন পাজামা আর টি-শার্ট। ঝুলনদের দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। মুখে হাসি টেনে এনে বলল, ''এসো। তোমাদের তুমিই বললাম কিন্তু। আমি মানুর দাদা হই যেহেতু সম্পর্কে...''

''শিওর,'' ঝুলনও হাসল।

''আমার ঘরটা বড্ড অগোছালো,'' আবার নার্ভাস গলায় বলে বাবুয়া, ''আমি আসলে এমনই। খুব গুছিয়ে কাজ করতে পারি না। মানে খুব একটা সিস্টেমেটিক নই। ছোটবেলায় মা রাগারাগি করত খুব। এখন বুঝি...''

''আমাদের বসতে বললে না বাবুয়াদা?'' ঝুলনের কথাটা শুনে নোটন নিজেই অবাক হয়ে গেল। এমনভাবে কথা শুরু করল ঝুলনদি যেন বাবুয়াদা ওর কতকালের চেনা। বাবুয়াদা নিজেও একেবারে থতমত খেয়ে গেল। তারপর কাঁপা গলায় বলল, ''হ্যাঁ বোসো। আমার ঘরে তো চেয়ার নেই। বিছানাতেও জামাকাপড়। দাঁড়াও, একটু ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি ওগুলো। তোমরা বিছানাতেই বসো। আমি ওই প্লাস্টিকের টুলটায় বসছি।''

''ঠিক আছে দাদা, আমরা তো আর বাইরের লোক কেউ নই,'' ঝুলন মিষ্টি করে হাসে, ''আমি তো নিজেকে এ বাড়িরই একজন মনে করি। ছেলেবেলা থেকে কত এসেছি এখানে। এ বাড়ির আনাচেকানাচে কত যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমাদের। তুমি তো তখন এ বাড়িতে আসোইনি,'' বলে মন্দিরার দিকে চাইল ঝুলন। মন্দিরাও মাথা নেড়ে সায় দিল সে কথায়। বাবুয়া চুপ করে রইল। ঝুলন বিছানাতেই বসল

পা ঝুলিয়ে। নোটনও। মন্দিরা দাঁড়িয়েই রইল। ঝুলন ডাক দিল তাকে, "আয় না মন্দিরা বোস এখানে এসে। জায়গা আছে তো।"

"না-না তোরা বোস," বলে একবার সিঁড়ির দিকে চাইল মন্দিরা। তারপর ঝুলনকে জিজ্ঞেস করল, "তোদের কি দেরি হবে? তা হলে নীচে যাই আমি। মাকে একটু হেল্প করি। রাতের রান্নার সবজিগুলো কেটে দিয়ে আসি বরং।"

"বোস না একটু মন্দিরা," বায়না করার ঢংয়ে বলে ঝুলন, "বেশি দেরি তো হয়নি। একটু পরেই না হয় কাটিস সবজিগুলো। আমরাও তো বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। বাইরে অন্ধকার নেমে গিয়েছে। নোটনকে নিয়ে অতটা পথ ফিরতে হবে আমাকে। বুঝিস তো," বলেই সরাসরি বাবুয়াদার দিকে চায় ঝুলন, "আচ্ছা বাবুয়াদা, কাকুর এই হঠাৎ মৃত্যুটা তোমার কখনও অস্বাভাবিক মনে হয়নি?"

বাবুয়া জানলার দিকে মুখ করে বাইরের কালচে আকাশের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "নাহ্।"

"কেন?" ঝুলন অদ্ভুত বোকার মতন মুখ করে জিজ্ঞেস করল, "মানুষটার অসুখবিসুখ ছিল না তো তেমন। একটা সুস্থ মানুষ ঘুমোলেন আর উঠলেন না!"

"এমন আকছার হয়," বাবুয়া ঝুলনের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল, "আমরা এই ওষুধের লাইনে আছি তো, কত শুনি এরকম ঘটনা। মানতে কষ্ট হয় খুব ঠিকই। আমার নিজেরই হয়েছিল। কাকামণির এই চলে যাওয়াটা আমি নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না প্রথম কয়েকদিন। তারপর নিজেই নিজেকে বোঝালাম। ডাক্তার বলেছেন ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। তাঁরা তো আমাদের চেয়ে বেশি বোঝেন। তেমন কিছু সন্দেহ করলে তিনি কি ছেড়ে দিতেন? আজকাল সবাই সেফ থাকতে চায়। ফালতু ঝুটঝামেলায় না গিয়ে সেরকম গন্ডগোলে কিছু থাকলে তিনি নিশ্চিত পোস্টমর্টেম সাজেস্ট করতেন।"

"মন্দিরা তো মানতেই চাইছে না দাদা," বলে করুণ মুখ করে ওর দিকে চাইল ঝুলন। মন্দিরা কীরকম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে রইল। ঝুলন ঠিক কী করতে চাইছে বুঝতে পারছে না ও। এই তো একটু আগেই বলে এল ও যে তার বাবার মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক নয় সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই ওর। অথচ...

"আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি জান তো, ইনফ্যাক্ট নীতাও..." বলেই চুপ করে গেল বাবুয়া। মাথাটা নিচু করে ফেলল। নোটন অবাক হয়ে গেল। বোকার মতো জিজ্ঞেস করে ফেলল সে, "নীতা কে মন্দিরাদি?"

ওর প্রশ্ন শুনে ঝুলন হেসে ফেলল। নোটনের দিকে চেয়ে বলে উঠল সে, "বাবুয়াদাকেই জিজ্ঞেস কর না ভাই।"

বাবুয়ার ফরসা মুখটা লালচে হয়ে উঠেছে। মুখে অপ্রস্তুত হাসি। নোটন বুঝতে পারল উত্তরটা। মন্দিরাদি বাবুয়াদার অবস্থা দেখে নিজেই বলতে শুরু করে দিল, "সামনের বছরে বিয়েটা হওয়ার কথা চলছিল। যদিও বাবুয়াদার চাকরিটা নিয়ে ওদের একটু আপত্তি ছিল। তবে নীতা নিজে চাকরি করে তো।"

"জানি। নীতা রায় তো? ও তো বেশ ভাল কোম্পানিতে আছে। বাজারে ওর কোম্পানির বেশ কিছু ব্র্যান্ডেড এবং চালু ওষুধ আছে। এম আর হিসেবে ও নিজেও তো বেশ সফল।"

বাবুয়াদা চমকে ঘুরে তাকাল ঝুলনের দিকে, "তুমি নীতাকে চেন?"

"চিনি না ঠিক, তবে জানি," ঝুলন হাসল।

"কিন্তু তুমি ওকে জানলে কীভাবে?" বাবুয়া বেজায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আমায় জেনে নিতে হয় অনেক কিছু। তা ছাড়া অনেক তথ্য কীভাবে যেন এসে যায় আমার কাছে," বলে ঝুলন রহস্যময় একটা হাসি টেনে নিয়ে এল ঠোঁটের ডগায়। মন্দিরাও জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে, "সত্যিই তো, তুই কী করে জানলি রে?"

"এর মধ্যে তো ম্যাজিক নেই কোনও," ঝুলন হাসে, "ফেসবুক। আজকাল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের সঙ্গে যারা জড়িয়ে রাখে নিজেদের, তাদের খুঁজে নিতে তো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আর বাকিটা একটু ঘিলু খরচ করলেই বুঝে ফেলা যায়," ঝুলন থামল। তারপর হঠাৎই প্রসঙ্গ পালটে বাবুয়াকে জিজ্ঞেস করল, "ব্রতীনকাকু কী-কী অসুখের জন্যে ওষুধ খেতেন দাদা?"

"কাকামণির তেমন অ্যালার্মিং কোনও অসুখ তো ছিল না। নিয়মিত ওষুধ বলতে দু'বেলা প্রেশারের ওষুধটা খেতে হত। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে গ্যাস, অম্বল হত ইদানীং। সেটাও মারাত্মক কিছু নয়। কাকামণি তো শুধু অতিরিক্ত টেনশন নিতে গিয়ে চলে গেলেন। ওই স্কুলটাই মানুষটাকে শেষ করে দিল একেবারে।"

"শুধু স্কুলের টেনশনেই উনি মারা গেছেন তুমি শিওর বাবুয়াদা?" ঝুলন স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে বলে।

"এ ছাড়া আর কী কারণই বা থাকতে পারে বলো?" বাবুয়াদা ইতস্তত করে বলে, "স্কুল নিয়ে একটা কী ঝামেলা চলছিল আমরা সকলেই তো জানি। তা ছাড়া ওইদিন কাকামণির স্কুলের পরিচালন সমিতির কে এক ভদ্রলোক যেন এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কাকামণির খুব তর্কাতর্কি হয়েছিল।"

"আচ্ছা, কাকুর সুগারটুগার ছিল না তো?"

"না।"

"ঠিক তো?"

"নাহ্, থাকলে আমি জানব না?"

"ঘুম ঠিকমতো হত, নাকি কোনও ওষুধটসুধ..."

"না-না।"

"যে রাতে কাকু মারা গেলেন তোমার ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল না অন্যদিনের চেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমার একটা কাজ ছিল।"

"কাজ, নাকি নীতার সঙ্গে সিনেমা?" বলে হেসে ফেলল ঝুলন। তারপর বাবুয়ার উত্তরের তোয়াক্কা না করেই বলে উঠল, "মিলন হলে তো? নাইট শো?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি..."

"ওই যে একটু আগেই বললাম আমি অনেক কিছুই জেনে ফেলি। আমাকে লুকিয়ে রাখা কিন্তু খুব কঠিন বাবুয়াদা। কথাটা মনে রেখো কিন্তু। আবারও বলছি আমি অনেক কিছু জানতে পেরে যাই। যেমন জানতে পেরে গিয়েছি ডায়েরির কয়েকটা পাতা কেন ছেঁড়া। তারপর ধরো ওই পি আই ই কথাটা ব্রতীনকাকুর না অন্য কারও হাতের লেখা।"

বাবুয়ার মুখখানা মুহূর্তে কেমন যেন কালো হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে ভয়ানক তোতলাতে লাগল সে। ঝুলন আবার হাসল। খুব লঘু গলায় বলল, "রিল্যাক্স বাবুয়াদা। এখনই অমন করলে কী করে হবে। পরশু যে এই নাটকের আরও অনেক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখতে হবে তোমায় এই বাড়িতে," বলে ঝুলন উঠে পড়ল। মন্দিরার দিকে চেয়ে বলল, "আসি রে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা ভাববে।"

"ওমা, আসি বললেই হল অমন দুম করে? খেয়ে যাবি না কিছু?" মন্দিরা বলে উঠল ঝুলনের কাঁধ খামচে ধরে।

"আজ থাক, পরশু খাব। ওইদিন বেশ কয়েকজন লোক আসবে। তাদের সকলের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু। অসুবিধে হবে না তো?"

"তবু কতজন?"

"আমি তোকে ফোনে জানিয়ে দেব। তার আগে বারুইপুর থানায় গিয়ে শুভংকরদার সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে একটু। কখন সময় হয় ওঁর।"

"শুভঙ্করদা মানে শুভঙ্কর বোস, আই সি?"

"হ্যাঁ।"

"উনিও থাকবেন নাকি?"

"না হলে আমি একা কি করে সামলাব বল?" ঝুলন দরজার দিকে পা বাড়ালো। বলল, "আয় নোটন," তারপর বাবুয়াদার দিকে চেয়ে আবার বলল, "বাবুয়াদা আসি গো। পরশু দেখা হচ্ছে তা হলে।"

॥ ৭ ॥

বারুইপুর স্টেশন রোড পেরিয়ে আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে রামগোপালপুরের দিকে এগোতেই রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল। এদিকটা এমনই। চিরকাল। সন্ধের পরে শুনশান। দু'দিকে বাগান। আম, পেয়ারা আর লিচু। আগে এদিকের বাগানগুলো আরও বিস্তৃত, আরও ঘন ছিল। সন্ধের পরে সেদিকে তাকালে গা ছমছম করে উঠত। মনে হত অন্ধকারে মোড়া কোনও দৈত্য যেন গিলে নিতে আসছে হাঁ করে। এখন বাগান অনেক হালকা হয়ে গিয়েছে। মূল বারুইপুরে বাগানগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে গত বছরদশেকের মধ্যে। বড়-বড় বাগানগুলোর জায়গায় বাড়িঘর হয়ে গিয়েছে। নতুন-নতুন পাড়া। হরেক বাহারি নাম এখন সেসব জনপদের। এদিকে তবু একটুআধটু গাছপালা আছে এখনও। ক'দিন থাকবে আর তা অবশ্য জানা নেই আর। এই বাগানগুলোর দিকে চাইলে ঝুলনের খুব মন কেমন করে। ক'দিন পরে এরাও আর নিশ্চিত আর টিকে থাকবে না। এখানে হয়তো তখন বহুতল আবাসন গড়ে উঠবে, অথবা আধুনিক কোনও শপিং মল। একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল সে স্কুটি চালাতে-চালাতেই। হঠাৎ নোটন তার কাঁধে হালকা চাপা দিল। চাপা গলায় ডাকল তাকে, "ঝুলনদি!"

এতক্ষণে ঝুলনের সংবিত ফিরল। লোকগুলোকে দেখতে পেল সে। রাস্তার পাশে বাইক তিনটে দাঁড় করিয়ে তাদের জন্যেই তা হলে অপেক্ষা করছিল ওরা? একটা গাড়ির হেডলাইটটা জ্বালিয়ে দূর থেকে ওদের দেখে নিয়েই লোকগুলো রাস্তার উপরে এসে দাঁড়াল পথ আটকে। মোট পাঁচজন। তাদের দু'জনের হাতে সাইকেলের চেন আর চকচকে লাঠি রয়েছে বলে মনে হল। প্রত্যেকের মুখই হেলমেটে ঢাকা। দূর থেকে দেখেই গাড়ির গতি কমাল ঝুলন। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল নোটনকে, "কী রে, ভয় পাচ্ছিস?"

"অত লোক ঝুলনদি!" নোটন কেঁপে যাওয়া গলায় বলে।

"দূর!" ঝুলন হাসে, "মাত্র পাঁচজন। তাও আবার তিনজন খালি হাতে। দুটো লোক চেন আর লাঠি হাতে আমার মহড়া নিতে এসেছে," বলে স্কুটিটাকে একদম আস্তে করে দিল সে। একটু নজর করল লোকদুটোর দিকে। তারপর বলল, "নাম। গাড়িটাকে এখানে সাইড করে রাখি। ওরা নিশ্চিত ভাববে ভয় পেয়ে গিয়েছি। নিজেদের গাড়ি থেকে দূরে এসে আমার সঙ্গে লড়তে হবে ওদের। যদি একটাকেও পাকড়াও করতে পারি," বলে আবার হেসে ফেলল ঝুলন, "বড্ড অ্যান্ডারএস্টিমেট করে ফেলেছে রে আমায়। কে জানে ঠিকঠাক ইনফরমেশনেরও অভাব থাকতে পারে। ভেবেছে একটা মেয়ে আর একটা পুচকে ছেলেকে টাইট দেওয়ার জন্যে এর চেয়ে বেশি কিছু লাগবে না। মায়া হচ্ছে রে লোকগুলোর জন্যে। ঝুলন চাটুজ্জেকে চিনতে পারেনি ওরা। মার্শাল আর্টে ব্ল্যাকবেল্টটা কি এমনি-এমনি করেছি রে নোটন?"

নোটনের তবুও ভয় লাগছিল। ঝুলনদি সত্যি কি পারবে অত লোকের সঙ্গে? তা ছাড়া ওদের কাছে যদি আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। সংশয়টা ঝুলনের কাছে প্রকাশও করে ফেলল সে। ঝুলন মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাতটা হেলমেট পরা মুখের সামনে দিয়ে নাড়িয়ে দিল। বলল, "পাগল হলি? একটা মেয়েকে সামলাতে অত হ্যাপায় কেউ যায়?" গলা থেকে ওড়নাটা খুলে কোমরে শক্ত করে বেঁধে নিল সে। নোটনের দিকে চেয়ে চাপা গলায় নির্দেশ দিল ঝুলন, "খবরদার, মাথা থেকে হেলমেটটা খুলবি না।"

"সাবধান ঝুলনদি," নোটন আবারও বলে।

"কিচ্ছু চিন্তা করিসনি। তুই সরে দাঁড়া। গাড়িটার কাছে থাক," বলে কয়েক কদম এগিয়ে যায় ঝুলন। লোকগুলোও নিজেদের মধ্যে কী সব শলাপরামর্শ করে নিয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল ঝুলনের দিকে। তারপর ক্রমশই চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলতে লাগল তাকে। ঝুলন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

স্ট্রিট লাইটের মৃদু আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মিলেমিশে একটা অদ্ভুত ছায়া-ছায়া অনুজ্জ্বল আলো এখন রাস্তার উপরে। সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখতে পেল নোটন ঝুলনের মুখের পেশি ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠছে। শরীরের দু'পাশে ঝোলানো দুই হাত মুঠি পাকানো। লোকগুলো ক্রমশ কাছে আরও কাছে চলে আসছে ঝুলনদির। নোটনকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না তারা। তাদের সম্মিলিত টার্গেট ঝুলনদি। একা ঝুলনদিই। তবুও বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস শব্দ টেছে নোটনের। ঝুলনদি কি পারবে? এত মানুষের সঙ্গে লড়তে গিয়ে যদি হেরে যায় সে। সে কি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারবে না ঝুলনদিকে? লোকগুলো এখন আরও কাছে চলে এসেছে ওর। একটা লোক হাতে ধরে থাকা সাইকেলের চেনটা বনবন করে ঘোরাচ্ছে এগিয়ে আসতে-আসতেই। অন্য লোকটা, যার হাতে মোটাসোটা লাঠি, সেও এগিয়ে আসছে আর-একদিক থেকে। বাকি তিনজন তাদের সামান্য পিছনে। ঝুলন দাঁড়িয়েই আছে। চুপ করে। এমনভাবে যেন পৃথিবীর কোথায় কী ঘটে যাচ্ছে তা নিয়ে কোনওই চিন্তা নেই ওর। হঠাৎই লোকগুলো আর একটু এগিয়ে আসতেই একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ আওয়াজ বের করল ঝুলন মুখ দিয়ে। আর বিদ্যুতের মতো প্রায় একইসঙ্গে তার বাঁ পা আর ডান হাত ছিটকে উঠল শূন্যে। তারপর অব্যর্থ নিশানায় আছড়ে পড়ল লক্ষ্যের উপর। ভীষণভাবে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। তারপরেই জোড়া আর্তনাদ। দুটো লোক ঠিকরে উঠে লুটিয়ে পড়ল রাস্তার উপরে। বাকি তিনজন ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গেল একেবারে। হতভম্ব হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। কী করবে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তাদের এই ক্ষণিকের বিহ্বলতাই ঝুলনের পক্ষে যথেষ্ট। চাবুকের মতো তার দুই হাত আর দুই পা উপর্যুপরি উঠল নামল তাদের উপরে। লোকগুলো নিশ্চিত এমনটা আশা করেনি। মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেলমেটের আড়াল থেকে এক মুহূর্ত দেখল তারা ঝুলনকে। ঝুলন সেই লোকটার হাত থেকে ছিটকে রাস্তায় গিয়ে পড়া লাঠিটা তুলে নিয়েছে ততক্ষণে। এগিয়ে যাচ্ছে লোকগুলোর দিকে লাঠিটাকে দু'হাতে ধরে ঘোরাতে-ঘোরাতে। লোকগুলো বুঁঝি নেওয়ার ভরসা পেল না আর। দুদ্দাড় দৌড় লাগাল তারা খানিক ফাঁকা রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা তাদের বাইকগুলোর দিকে। ঝুলন ধাওয়া করেও ধরতে পারল না তাদের। জ্বত বাইকে স্টার্ট দিল তারা। তারপর শাঁ করে গাড়িগুলো চালিয়ে দিল ছায়া-ছায়া অন্ধকার চিরে দিয়ে।

পুরো ঘটনাটাই হাঁ করে দেখছিল নোটন। ঝুলন ধীর পায়ে এগিয়ে এল তার দিকে। নোটন জিজ্ঞেস করল, "ঝুলনদি তুমি ঠিক আছো তো? লাগেনি তো কোথাও?"

"নাহ," বলে মাথা থেকে হেলমেট খুলে ওড়না দিয়ে কপাল আর মুখের ঘাম মুছল ঝুলন। তারপর নোটনের দিকে চেয়ে হাসল, "লোকগুলো নভিস। নিছকই অ্যামেচার। মারপিট করার তেমন অভ্যেসটভ্যেস আছে বলে মনে হল না। স্রেফ পাড়ার স্বঘোষিত দাদা টাইপের। ওদের একটাকেও অন্তত ধরতে পারলে ভাল হত, কিন্তু পারলাম না রে নোটন। অবশ্য মস্ত কাজ একটা হয়ে গিয়েছে। ওটাই যথেষ্ট। যে ধাঁধাটায় আটকে ছিলাম সেটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আজ। এদের মধ্যে যে লোকটা পালের গোদা সে বড্ডই কাঁচা বুদ্ধির লোক। এ লাইন ওর জন্যে নয়। তবু কেন যে মরতে এ কাজ করতে এল।"

"ব্যাপারটা কী ঝুলনদি?" কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে নোটন।

"আজ থাক। বড্ড টায়ার্ড লাগছে। একেবারে পরশুই শুনে নিস।"

"তার মানে কেস এখন পুরোপুরিই সল্‌ভড?"

"ইয়েস স্যার।"

"তা হলে কান নয় কেন? আমার যে আর তর সইছে না ঝুলনদি।"

"একটু সবুর কর বাবা। কাল দিনটা আমন্ত্রিত গেস্টদের নেমন্তন্ন করার কাজটা সারতে দে।"

"তুমি কি ভাবছ যে তুমি আসতে বললেই সকলে লক্ষ্মীছেলের মতন সুড়সুড় করে চলে আসবে মন্দিরাদির বাড়ি?"

"জানি। তাই নেমন্তন্নটা আমি করব না। ও দায়িত্বটা শুভঙ্করদার উপরেই ছেড়ে দেব ভাবছি। ওইদিন সকলেই আসলে শুভঙ্করদার গেস্ট হিসেবে আসবেন। কাজেই নেমন্তন্নটাও উনিই করবেন ওঁর মতো করে। তার আগে পুরো ব্যাপারটা শুভঙ্করদাকে জানাতে হবে আগাগোড়লা। দেখি বাড়ি যাই। বাড়ি ফিরে ফোন করি ওঁকে," বলে হেলমেটটা আবার মাথায় গলিয়ে নেয় ঝুলন। গাড়িতে চড়ে বসে নোটনের দিকে চেয়ে বলে, "কই আয়, বসে পড় চটপট।"

॥ ৮ ॥

ঘরটা চুপচাপ। শান্ত। চৈত্র বৈশাখের বিকেলের দিকে ধেয়ে আসা ঝড়ের আগের মুহূর্তের আকাশের মতো। ব্রতীনকাকুর ঘরেই বসা হয়েছে আজ। ভিতরের ঘরে নয়। ঘরটা খুব বড়সড় নয়, এত লোক একসঙ্গে বসার পক্ষে একটু ছোটই, কিন্তু ঝুলন বলল এই ঘরেই সকলের সঙ্গে বসতে চায় ও। মন্দিরাদিও বলছিল, "এখানে জায়গা তো খুব বড় নয়, চল ঝুলন আমরা ছাদে গিয়ে বসি। উপরে শেড আছে। আলোপাখারও বন্দোবস্ত আছে। নীচে ফ্লোর টাইল্‌স পাতা। দিব্যি সকলে গোল হয়ে বসে পড়া যাবে হাত-পা ছড়িয়ে," ঝুলন রাজি হল না। সে হেসে বলল, "নাটকটা এই ঘরেই তো শুরু হয়েছিল। আমি চাইছি এখানেই সেটা শেষ হোক," অগত্যা।

বাবুয়া, মন্দিরা, মন্দিরার মা আর নীতা বিছানার উপরে বসেছিল। নীতার পাশে আর একজন লোক। ঝুলন কানে-কানে বলল নোটনকে, "নীতার দাদা। রবিন সেনগুপ্ত।"

ঘর থেকে বারান্দা টপকে একেবারে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার দরজার কাছে চেয়ারে বসেছিলেন শুভঙ্করদা। তাঁর পিছনে বারান্দায় আরও কয়েকজন পুলিশের লোক। তাঁর ঠিক পাশেই একটা ছোট্ট সোফা। তাতে ঝুলন আর নোটন। ঘরের উলটো দিকে পাশাপাশি চেয়ারে সঞ্জয় মিত্র, জনার্দন কয়াল, ব্রতীনআঙ্কলের স্কুলের টি আই সি মুরারি মণ্ডল এবং স্কুল কমিটির আর এক সদস্য রঞ্জন দাস। মন্দিরা সকলকেই একপ্রস্থ চা দিয়ে গিয়েছিল কাগজের কাপে করে। চা শেষ করে একটু কেশে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে আই সি শুভঙ্কর বোস কথা শুরু করলেন, "ব্রতীনবাবু মাসখানেক আগে মারা গিয়েছিলেন। ডাক্তারের দেওয়া সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর কারণ ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। এই মৃত্যুর ব্যাপারে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে এমন সন্দেহ তখন কেউ প্রকাশ করেননি, অন্তত থানায় এমন কোনও নথি আমাদের কাছে নেই। রাইট?" বলে ঝুলনের দিকে চাইলেন তিনি।

ঝুলন মাথা নেড়ে সায় দিল তাঁর কথাতে। তিনি চোখ ফেরালেন মন্দিরা ও তার মায়ের দিকে। ওরাও নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল তাঁর কথায়। শুভঙ্কর বোস পেশাদারি চাউনিতে সকলের মুখের উপর দিয়ে নীরবে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "কিছুদিন আগে মন্দিরা, আই মিন প্রয়াত ব্রতীনবাবুর মেয়েই প্রথম এই মৃত্যুটার পিছনে একটা রহস্যময় সম্ভাবনার কথা ভাবে এবং ঝুলনকে ব্যাপারটা জানায়। ঝুলন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিষয়টি হ্যান্ডল করে আমাকে ব্যাপারটা জানায়। আমি তার অবজারভেশন এবং রিজনিং এর উপরে আস্থা রাখি কেননা ইতিমধ্যেই বসুকুঞ্জে একটা দারুণ রহস্যের সমাধান করে ও সকলকে চমকে দিয়েছিল আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।"

ঝুলন মাথা নিচু করে চেয়ে লজ্জায়। নোটনের খুব আনন্দ হচ্ছিল শুভঙ্কর বোসের কথা শুনে। শুভঙ্কর বলতে লাগলেন, "এই কেসটা খুব সহজ ছিল না। সন্দেহের তালিকা এবং মোটিভ দুটোই ছিল দীর্ঘ। তার উপরে আরও একটা বিষয় নিয়ে আমরা যথেষ্ট ঘামাতে হচ্ছিল ঝুলনকে। সেটা হল ব্রতীনবাবুর ড্রায়েরির কিছু পাঞ্জল। অদ্ভুত ব্যাপার, পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলাতে পেরেছে ঝুলন। আমি তাকে অন্তর থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।"

মন্দিরার মা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এতক্ষণে মুখ তুললেন তিনি। শুভঙ্করের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি মৃদু ও আহত স্বরে, "উনি তা হলে এমনি-এমনি মারা যাননি? সত্যিই তা হলে খুন হয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ," শুভঙ্কর বললেন।

"কিন্তু কে এমন কাজ করল, আর কেনই বা করল?" এই ক'দিনে প্রথমবারের জন্যে মন্দিরাদির মায়ের চোখে টলটলে জল দেখতে পেল নোটন। বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা এসে চেপে বসল নোটনের।

শুভঙ্কর বললেন, "আমি চাই ঝুলন নিজেই বাকি ঘটনাটা ব্রিফ করুক সকলের সামনে।"

"না-না, আপনিই বলুন না," লজ্জা পাওয়া গলায় বলে ঝুলন, "আপনি তো পুরো ঘটনাটাই জানেন। এর পরের কাজটুকুও ইনফ্যাক্ট আপনারই।"

"জানি," ঝুলনের কথার মাঝখানেই কথা বলে ওঠেন শুভঙ্কর বোস, "চাইলে এক্ষুনি মেন কালপ্রিটকে অ্যারেস্ট করে তুলেই নিয়ে যেতে পারি আমি। সাক্ষ্যপ্রমাণেরও অভাব নেই। তবু সকলের বিষয়টা জানা উচিত। আর আমার মনে হয় এই কাজটা করার অধিকার একমাত্র তোমারই।"

"বেশ," বলে উঠে দাঁড়াল ঝুলন। সকলের মুখের দিকে আলতো নজর বুলিয়ে নিল একবার। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলতে শুরু করল, "মন্দিরার কাছে প্রথম যখন ওর সন্দেহের কথাটা শুনি আমি খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। মনে হয়েছিল এটা ওর মেন্টাল ট্রমা থেকে মনে হচ্ছে। কিন্তু কাকুর ড্রায়েরিটা দেখতে-দেখতে আমি সিদ্ধান্ত পালটাই দুটো কারণে। এক, ওই অদ্ভুত রিড্‌লের মতন লেখাটা," বলে ড্রায়েরির নির্দিষ্ট পাতাটা খুলে সকলের সামনে মেলে ধরে ঝুলন যেখানে ড্রায়েরির পাতায় কাঁপা হাতে ঘাটি ওয়ান ডি লেখা।

"আর দুই, যখন আমাকে হালকা হুমকি দিয়ে রাস্তায় স্কুটি থেকে ফেলে দেওয়া হল," ঝুলন বলতে শুরু করল আবার, "প্রথমেই আমার সন্দেহ হয় সঞ্জয়বাবুকে। কারণ, মৃত্যুর দিনে ওঁর উপস্থিতি এবং ব্রতীনআঙ্কলের সঙ্গে তাঁর উত্তেজিত কথা কাটাকাটির খবর। সন্দেহ জোরদার হয় যখন স্কুলে ঘুরে আসার পরেই আমি হুমকিটা পেলাম। এমনকী, প্রথম যেদিন ওঁর বাড়ি গেলাম, সেদিনও আমি এই ধারণা নিয়েই ফিরি যে, এই মৃত্যুতে ওঁর নিশ্চিত একটা ভূমিকা আছে। কেননা কথার মাঝে উনি নিজেই খুন শব্দটা একাধিকবার উচ্চারণ করেন এবং ওঁর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনাও চোখে পড়ছিল আমার। সঙ্গে ক্ষমতার দম্ভ।"

"প্রথমবার গিয়েছিলাম বলছ, মানে পরে তুমি আবার ওঁর বাড়ি গিয়েছিলে নাকি ঝুলনদি?" নোটন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ গিয়েছিলাম। একাধিকবার। ইনফ্যাক্ট ওঁর সাহায্য ছাড়া ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি সমাধান করা সম্ভবই হত না।"

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ উনি নির্দোষ?" বাবুয়া উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, যদিও ভদ্রলোককে দোষী প্রমাণ করার জন্যে তোমার চেষ্টার কোনও ত্রুটিই ছিল না। কিন্তু ওই অতি চালাকিটাই তোমাকে এক্কেবারে ডুবিয়ে দিল বাবুয়ান।," ঝুলনের গলাটা হঠাৎ পালটে গেল। নোটন পরিবর্তনটা দিব্যি বুঝতে পারল।

"তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?" বাবুয়া চিৎকার করে উঠল, "ইয়ার্কি মারছ নাকি? কাকামণিকে আমি খুন করেছি বলবে নাকি এর

পর?"

"সরাসরি সে কথাটা এক্ষুনি বলছি না বাবুয়ান," ঝুলন স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, "তবে খুনে তোমার একটা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সে কথা তো সত্যের খাতিরে আমাকে বললতেই হবে।"

"শুধুমুধু একটা নিরীহ বাবা-মা মরা ছেলেকে কেন ফাঁসাতে চাইছ তোমরা বলো দেখি?" মন্দিরার পাশ থেকে নিতু বলে ওঠে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে, "ওকে অপরাধী বানিয়ে লাভ কী তোমাদের?"

"ঝুলনকে ওর কথা শেষ করতে দাও নিতুদি। কথাটা মাঝখানে প্লিজ় ওকে বাধা দেবার চেষ্টা কোরো না," স্থির গম্ভীর গলায় বলে ওঠে মন্দিরা।

ঝুলন কথা শুরু করে আবার, "সঞ্জয় মিত্রের উপর থেকে দুটো কারণে সন্দেহটা ফিকে হয়ে এল যখন দেখলাম ডায়েরির কয়েকটা পাতা ছেঁড়া, আর জানলাম যে সেই ছেঁড়া পাতায় এমন কিছু তথ্য ছিল যা দিয়ে লাভবান হতে পারে একমাত্র বাবুয়ান। খোঁজ নিয়ে জানলাম বাবুয়ান সেই লাভ ঘরে দ্রুত ঘরে তোলার চেষ্টায় ত্রুটিও রাখেনি কিছু। ব্রতীনআঙ্কল ওকে নমিনি করে যে বড় অঙ্কের পলিসিটা করে রেখেছিলেন, তার ক্লেম পেতে প্রেমাঙ্কুর ঘোষালের বাড়ি দিবি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়িয়েছে বাবুয়ান তার দোকানের অনুপস্থিতির দিনগুলোতে। তা ছাড়া ওই যে রিড়লটা ওটার মানে বুঝতে পেরে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল," বলেই ডায়েরিটা উলটে করে সকলের চোখের সামনে মেলে ধরল ঝুলন, "কী লেখা দেখছেন?"

"পি আই ই," সঞ্জয় মিত্র আর জনার্দন কয়ালই লেখাটা পড়লেন উত্তেজিত স্বরে, থেমে-থেমে, স্পষ্ট উচ্চারণে।

"রাইট," ঝুলন হাসে, "লেখাটা দেখেই বোঝা যায় ওই হাতের লেখা ব্রতীনকাকুর না। বাবুয়ানের ঘরে ঢুকে ওষুধের সাদা খামে ওর লেখা ওষুধের নাম পড়েছি আমি। যতই হাত কাঁপিয়ে লিখুক, লেখাটা কার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। একটা জিনিস বাবুয়ানার মাথাতেই আসেনি। ভেবেছিল হাত কাঁপিয়ে কয়েক জায়গায় মারা যাওয়ার ক্ষীণ আভাস দিলে আর সন্দেহটা সঞ্জয়বাবুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মুশকিল হল, একটা অঙ্কে ওর বিচ্ছিরি রকমের গোলমাল হয়ে গেল। অপেশাদার হলে যা হয় আর কী। বিভিন্ন লোকের লেখার স্টাইল বিভিন্ন। কিছু অক্ষর তাদেরকে অন্যের থেকে সহজেই আলাদা করে দিতে পারে স্বকীয়তায়। এই যেমন বাবুয়ানার ইংরেজি 'ই' অক্ষরটা লেখার ধরন। কাকুর লেখা 'ই' ওই ডায়েরি এবং রেজোলিউশনের কপিতে আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। এই লেখার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। কিন্তু বাবুয়ানার ওষুধের বাক্সে লেখা দুটো ওষুধের খামের উপরে তার নিজের হাতে লেখা 'ই' অক্ষরটা চোখে পড়ে গিয়ে কাজটা জলের মতন হয়ে গেল হঠাৎ করেই। আর ওই যে বললাম অহেতুক তাড়াহুড়ো করে করা কাজ, সন্দেহটা সঞ্জয়বাবুর দিকে ঘোরাতে কথাটা লিখল যখন খেয়ালই করল না ডায়েরিটা উলটে আছে। যেমন পাতাগুলো ছেঁড়ার সময় পরিপাটি করে ছিঁড়লে কিছু পাতার খানিকটা করে রয়ে যেত না ডায়েরির মধ্যে। ওই ছেঁড়া রয়ে যাওয়া অংশগুলো না থাকলে চট করে আমার খেয়ালই হত না হয়তো যে ডায়েরির কিছু পাতা ছেঁড়া রয়েছে। এই সমস্ত দোষই ঢেকে গিয়েছিল যখন ডাক্তার বিনা সন্দেহে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন এবং কাকুর দাহকার্য দিব্যি নির্বিঘ্নে মিটে গেল। কিন্তু কপাল যাবে কোথায়? প্রায় মাসখানেক পরে মন্দিরার সন্দেহ হল মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।"

"আমি খুন করিনি," ভয় পাওয়া গলায় ঝুলনের কথা শেষ হওয়ার আগেই দু'হাত বুকের কাছে তুলে ধরে চিৎকার করে উঠল বাবুয়া। তারপর বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল ঘরের মেঝেতে ঝুলনের মুখোমুখি।

"জানি," ঝুলন কড়া গলায় বলে, "কিন্তু খুনে সাহায্য করেছ।"

"এ কথা ঠিক নয় কাকিমা। মানু বিশ্বাস কর ও ঠিক বলছে না," বাবুয়া মিনতি করতে থাকে, "হ্যাঁ ঠিক, আমি যখন রাতে ঘরে এসে দেখলাম কাকামণি বেঁচে নেই তখন ডায়েরিটা পেড়ে পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। আমার টাকাটা সত্যিই দরকার ছিল। আমি জানতাম কাকামণি এইভাবে সত্যিই চলে যেত না যদি এই লোকটা অমন উত্তেজিত ভঙ্গিতে সেদিন কাকামণিকে শাসিয়ে না যেত। স্কুলে এরা কী চাপে যে রেখেছিল লোকটাকে আমি তার কিছুটা জানি। আমি তাই চেয়েছিলাম আজ না হোক কাল এই সুত্র ধরে ওই বদমাশ লোকটা শাস্তি পাক," বলে আবার সঞ্জয় মিত্রের দিকে অন্যদের নজর ঘোরানোর মরিয়া চেষ্টা চালাতে চাইল বাবুয়া।

"মিথ্যে কথা," প্রায় গর্জন করে উঠল ঝুলন, "সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ব্রতীনকাকুর কোনও বিরোধ ছিল না। কাকুকে ঘেঁটুকু বিব্রত করার, অন্যায় চাপ সৃষ্টি করার, করেছিলেন রঞ্জন দাস।"

"আমি!" যেন আকাশ থেকে পড়লেন রঞ্জন, "আমি আবার এর মধ্যে কী করে ঢুকলাম?"

"আপনি যে আগাগোড়া ঘটনার মধ্যে ঢুকেই আছেন রঞ্জনবাবু। যেদিন থেকে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের বিপুল অঙ্কের টাকাটা স্কুলের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে সেদিন থেকেই তো আপনার খেলাটা শুরু করে দিয়েছিলেন আপনি তাই না?"

"কী বলতে চাইছ হে তুমি?" ঝুলনকে প্রায় ধমকে উঠলেন রঞ্জন দাস।

"স্কুলের নতুন যে বিল্ডিংয়ের প্ল্যানটা সম্প্রতি পাশ হয়েছে তার পুরো টেন্ডারটাই তো আপনি আপনার শ্যালকবাবুকে দেওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন কাকুর উপরে। নানা প্রভাব খাটিয়ে আর কাউকে টেন্ডার সাবমিট করতে পর্যন্ত দেননি স্কুলের কাজটার জন্যে। শ্যালকের কাছ থেকেই নামে বেনামে তিনটে টেন্ডার জমা করে লাস্ট ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে আপনি হইচই করেননি বিল্ডিংয়ের কাজটা দ্রুত শুরু করে দেওয়ার জন্যে?"

রঞ্জন দাস তোতলাতে শুরু করলেন। ঝুলন বলে চলল, "ব্রতীনকাকু এই অন্যায় আবদার মানতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু ক্রমাগত তাঁর উপরে এমনই চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন আপনি এবং আপনার অনুগামী কয়েকজন যে, ব্রতীনকাকু প্রায় মাথা নুইয়েই ফেলছিলেন লাস্ট মিটিংয়ে। এ নিয়ে তাঁর মনে মারাত্মক ঝড় বইছিল কিছুদিন ধরেই। নিজের বিবেকের কাছে হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা কুরে-কুরে খাচ্ছিল তাঁকে প্রতি নিয়ত। এই ভয়ঙ্কর ক্রাইসিসের সময় তাঁর শেষ ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে হঠাৎ করেই এই ব্যাপারে তিনি পাশে পেয়ে যান সঞ্জয়বাবুকে।"

"ঠিক," এতক্ষণ চুপ করে বসে সকলের কথা শুনছিলেন সঞ্জয়বাবু। ঝুলনের কথার সূত্র ধরে এইবার কথা বলে উঠলেন তিনি, "যেদিন ব্রতীনবাবু মারা যান সেদিন যে কথাটুকু আমরা জোরে বলছিলাম তা এই নিয়েই। আমাদের মধ্যে বিরোধ ছিল না, বরং সেদিন আমরা জোর গলায় এটাই বলছিলাম যে, এই অন্যায় মেনে নেওয়া ঠিক হবে না কিছুতেই। আমি বলেছিলাম এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করলে আমি আপনার বিরুদ্ধে দরকার হলে কোর্টে যাব। এতে যে আমি এমন রিঅ্যাকশন হবে, তাঁর হার্ট বিকল হয়ে যাবে সত্যিই ভাবিনি। খবরটা শুনে থেকে খুব নার্ভাস লাগছিল। কষ্টও পাচ্ছিলাম। ঝুলন যেদিন প্রথম আমার কাছে গেল সেই চাপা টেনশন একটা অদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতা এনে দিয়েছিল আমার মনে। ভেবেছিলাম আমি বুঝি সত্যিই জড়িয়ে গেলাম ঘটনাটায় বিনা দোষে!"

"কিন্তু অপরাধীদের ছোট্ট-ছোট্ট ভুলগুলো কেমন অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দিল আপনাকে," ঝুলন হাসল মিষ্টি করে, "চিরকাল এমনই হয়। আসল সত্যি কোনও না-কোনওভাবে ঠিক মানুষের সামনে চলে আসে একসময়। শুধু সেই সত্যিটাকে খুঁজে নেওয়ার জন্যে আমাদের সামান্য সজাগ থাকতে হয়।"

"তারপর কী হল ঝুলন বল," মন্দিরা অধৈর্য হয়ে উঠছে এবার।

"সুতরাং ব্রতীনকাকু রঞ্জনবাবু এবং তাঁর শ্যালকবাবু বাবুজানের কাছেই হয়ে উঠলেন একটা মস্ত বাধা। ওঁরা ছাড়াও আর-একজনের কাছেও কাকুর বেঁচে থাকাটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।"

"তিনি কে?" সঞ্জয় মিত্র জিজ্ঞেস করলেন।

"বাবুয়াদা," ঝুলন তাকিয়ে নেয় একবার বাবুয়ার দিকে, "বাবুয়াকে নমিনি করে যে পলিসিটা কাকু করেছিলেন সেটার কথা বাবুয়ানার জানা ছিল। তার টাকার দরকারও ছিল খুব। তা নইলে স্বপ্ন পূরণ ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছিল। টাকা জোগাড়ের অন্য কোনও উপায় সে বের করতে পারেনি। গ্রামে গিয়ে নিজেদের জমি বিক্রি করতে গিয়েও শরিকি বিবাদে কিছু করতে পারেনি সে। কাজেই ব্রতীনকাকুর মারা যাওয়াটা তার কাছেও খুব দরকার ছিল।"

"বাবুয়ার এত টাকা কী জন্যে দরকার ছিল রে ঝুলন? আমাদের তো কখনও এমন কোনও দরকারের কথা ও বলেনি!" মন্দিরার মা বলে উঠলেন ক্ষীণ আহত কণ্ঠে।

"বাবুয়ানা নিজে একটা ওষুধের দোকান করে স্বাধীন ব্যবসা করতে চাইছিল। কেননা এ বিষয়ে নিতুদি এবং রবিনবাবুর দিক থেকে চাপ ছিল তার উপরে। চাপটা মূলত আসছিল রবিনবাবুর দিক থেকেই। তিনিই নিতুদি এবং বাবুয়ানাকে বারবার বোঝাতে চেয়েছেন তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে এটা কতটা প্রয়োজনীয়," ঝুলন ম্লান হাসে, "ব্রতীনকাকুকে মারার মাস্টারপ্ল্যানটা মূলত রঞ্জনবাবু আর রবিনবাবুর মাথা থেকেই বেরয়। কেননা এই মৃত্যুতে তাঁদের দু'দিক থেকে লাভ ছিল।"

"কীরকম?" মন্দিরা বলে কৌতূহলী গলায়।

"ব্রতীনকাকুকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে পারলে রঞ্জনবাবুর শালার কাজটা পাওয়ার পথে বাধা থাকে না আর। সেক্ষেত্রে অত লক্ষ টাকার কাজ থেকে তাঁর নিজেরও কিছু প্রাপ্য এসে যাবে, আর দ্বিতীয়ত ব্রতীনবাবুর মৃত্যু হলে তাঁর শ্যালিকার ভবিষ্যৎজীবনও পাকা হয়ে যায়। কেননা বাবুয়ানার হাতে টাকাটা চলে আসার সুযোগ এসে যায় অতি সহজেই।"

"মানে?" বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে মন্দিরা।

"মানেটা এখনও বুঝিসনি? আরে এই রবিনবাবুই তো রঞ্জনবাবুর শালা। আমি প্রথমদিন স্কুলে যেতেই খবর পাওয়ামাত্র রবিনবাবুকে সাবধান করেন উনি ফোনে। রবিনবাবু লোক লাগিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টাও করেন আমায়। কাজ হয়নি অবশ্য। এর মধ্যে আমি অবশ্য কায়দা করে নোটন মারফত বাবুয়ানার কাছে খবর পাঠিয়ে দিই যে, আমি একেবারে শ্যয়াশায়ী। বাবুয়ানার দিকে সে খবর পেয়ে রবিনবাবু আর রঞ্জনবাবুও কিছুটা নিশ্চিন্তবোধ করে স্বস্তিতে দিন কাটাতে থাকেন আর আমি নিরুপদ্রবে আমার অনুসন্ধানের কাজগুলো গোপনে সেরে ফেলতে লাগি ঝটপট করে। এর মাঝখানেই সঞ্জয়বাবুর কাছে একটি অদ্ভুত তথ্য পাই। মূলত এই তথ্যটাই আমাকে এই রহস্যের জট ছাড়াতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। কেননা একটা জায়গায় গিয়ে আমি সত্যিই আটকে যাচ্ছিলাম বারবার।"

"কোথায়? এটা তো আমায় বলোনি তুমি ঝুলন?" শুভঙ্কর বসু বললেন অবাক হয়ে।

"আমি বাবুয়ানার ওষুধের বাক্সে দুটো ওষুধ দেখে খুব অবাক হই। এক ঘুমের ওষুধ যার পুরো স্ট্র্যাপে মাত্র একটা খরচ হয়েছে, আর দুই গ্লিক্সাজাইড গ্রুপের ব্লাড সুগারের ওষুধ। এই গ্রুপের ওষুধ খুব দ্রুত সুগার লেভেল নামিয়ে দেয়। সুস্থ লোক এই ওষুধ খেলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে যাতে মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অদ্ভুত ব্যাপার হল এই ওষুদের স্ট্র্যাপটি থেকেও দেখলাম কয়েকটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল প্রথমদিনেই। এ বাড়িতে কারও ঘুমের সমস্যা নেই। ওষুধ খাওয়ারও প্রশ্ন নেই। সুগারও নেই কারও। তা হলে? পরে বুঝতে পারি, মাথার যন্ত্রণা কমাতে বাবুয়াদা গ্যাসের ওষুধ নয়, কাকুকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল। কিন্তু তারপরের অংশটা কিছুতেই আর বুঝতে পারছিলাম না। মৃত্যুটা তা হলে কীভাবে হল? ঘুমের ওষুধের সঙ্গে বাবুয়ানা কি তা হলে কাকুকে সুগারের ওষুধও খাইয়ে দিয়েছিল? কিন্তু এক সঙ্গে এতগুলো ওষুধ খাওয়ার সময় ওঁর সন্দেহ হল না কেন? সেইসময়েই সঞ্জয়বাবুর কাছে এই দারুণ তথ্যটা আমি পাই। সঞ্জয়বাবু বলুন না কী হয়েছিল সেদিন?" বলে সঞ্জয় মিত্রের দিকে চাইল ঝুলন।

"আমি সেদিন স্যারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বারুইপুর স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াই লক্ষ্মীকান্তপুর ট্রেন ধরব বলে," দু' বার কেশে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে থাকেন সঞ্জয় মিত্র, "ট্রেন আসার অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে সবে, এমন সময় মনে পড়ল আমার ফোনটা ব্রতীনবাবুর বাড়িতেই ফেলে এসেছি। ওঁর সঙ্গে কথা বলার সময় ফোনটা পাশের টেবিলে খবরের কাগজের উপরে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম মনের ভুলে যাই। কাজেই আবার অতটা পথ পেরিয়ে ওঁর বাড়িতে ফিরে আসি আমি। সবে গলি দিয়ে ঢুকছি একটা লোক বাইকে চেপে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর যাওয়ার সময়ে হাত বাড়িয়ে পাশের ড্রেনে কী একটা ছুড়ে ফেলে দিল। লোকটার মাথায় হেলমেট থাকায় তার মুখটা আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস আমি খেয়াল করি। লোকটার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের পাশে একটা বাড়তি আঙুল।"

"তাতে কী প্রমাণ হয়?" হঠাৎ মরাঘরে রেগে গিয়ে ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠেন রবিন সেনগুপ্ত আর নোটন অবাক হয়ে দেখে ভদ্রলোকের বুড়ো আঙুলের পাশে আরও একটা বাড়তি সরু আঙুল বেখাপ্পাভাবে ঝুলে রয়েছে।

"আপনি থামুন," এক ধমকে তাঁকে বসিয়ে দেন শুভঙ্কর বোস, "তারপর মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে কী দেখলেন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি সঞ্জয় মিত্রকে।

"গলি দিয়ে সোজা এগিয়ে এই একটাই বাড়ি," সঞ্জয়বাবু আবার বলা শুরু করলেন। নোটন অবাক হয়ে দেখছিল আজ এতক্ষণে ভদ্রলোক একটাও সিগারেট খাননি। লোকটাকে এতদিন মনে-মনে অপছন্দ করে এসেছে বলে তার খুব খারাপ লাগছিল। মনে-মনেই ওঁর কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল সে, "দরজা খোলাই ছিল। আমি দরজা দিয়ে ঢুকে দেখলাম ব্রতীনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। গভীর ঘুম। আমি দু'বার ডেকেও সাড়া না পেয়ে ঘরের মধ্যে থেকে আমার ফোনটা নিয়ে বেরিয়ে আসি আবার। আর ফোনটা নেওয়ার সময় দেখি আমার ফোনের পাশে এইটা রাখা," বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, "এটার কথা ঝুলনকে বলেছি আমি। কী মনে করে সেদিন তোষকের তলায় আনমনে ঢুকিয়ে রেখে চলে গিয়েছিলাম। ঝুলনকে বলেছিলাম দেখতে। ও বলল দেখে আবার ওখানেই রেখে দিয়েছে। প্রয়োজনে বের করতে হবে। আমার মনে হয় আজকের দিনটারই ইঙ্গিত দিয়েছিল ও সেদিন। কাজেই ওটা বের করে দেখাচ্ছি আমি", বলে মন্দিরাকে বললেন তিনি, "দেখি মা, একটু সরে বসো তো।"

মন্দিরা সরে যেতেই তোষকের নীচে হাত গলিয়ে একটা সরু এবং লম্বা রবারের নল বের করে আনলেন তিনি। বলের ভিতর দিকটা অস্বচ্ছ, ঘোলাটে।

সঞ্জয়বাবু থামতেই ঝুলন হাত বাড়িয়ে রবারের টিউবটা তুলে নিয়ে সকলকে দেখালে। তারপর খুব আর্দ্র কণ্ঠে বলতে লাগল, "এইটের আড়ালেই সেদিন আসলে মৃত্যু লেখা ছিল ব্রতীনআঙ্কলের।"

"কী এটা?" মুরারিবাবু এই প্রথম কথা বলে উঠলেন।

"স্নাইলস টিউব," ছোট্ট করে উত্তর দিল ঝুলন।

"এইটা মৃত্যুর কারণ কী করে হবে ঝুলন?"

"এই চিন্তাটাই বেজায় সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে," বলতে শুরু করল ঝুলন, "প্রথমটা ভেবে-ভেবে কোনও কূল কিনারা করতে

পারছিলাম না আমি। তারপর হঠাৎই ওই কাঁচা লিচুর কথাটা মনে পড়তেই মাথার মধ্যে জমে থাকা অন্ধকারটা একেবারে ফিকে হয়ে গেল।"

"কী হেঁয়ালি করছিস বল তো ঝুলন?" মন্দিরা বলে উঠল।

"হেঁয়ালিই বটে," মৃদু হাসে ঝুলন, "আসলে শুধু গ্লিক্লাজাইডের উপর ভরসা রাখতে পারেনি বাবুয়াদা। ওর সন্দেহ ছিল শুধু ওরাল মেডিসিনে যদি মৃত্যু আসতে দেরি হয়, বা না আসে আদৌ। তা ছাড়া ঘুমন্ত লোককে ট্যাবলেট খাওয়ানোটাও যথেষ্ট কঠিন। তখনই এই কাঁচা লিচুর রসের আইডিয়াটা মাথায় আসে ওর..."

"কাঁচা লিচুর রস?" অবাক হয়ে বলে ওঠেন মুরারিবাবু।

"হ্যাঁ, কাঁচা লিচুর রস," থেমে-থেমে বলে ঝুলন, "গত বছর ঘটনাটা নিউজ হয়েছিল। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল বড় করে। বিহারের মুজফ্ফরপুরে বেশ কিছু শিশু-কিশোর রহস্যজনকভাবে মারা পড়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল খালি পেটে কাঁচা লিচু খেয়েই..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে," মুরারিবাবু উপর নীচ মাথা দোলালেন, "না পাকা পর্যন্ত লিচু বাগানে ঢোকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল ছোটদের জন্য। কাঁচা লিচু পাড়াও বন্ধ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল পরিমাণমতো এইরস খালি পেটে গেলে এমনকী বড়দেরও অস্বাভাবিক হারে সুগার লেভেল কমতে থাকে। ফলে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই..."

"রবিনবাবুর নিজেরই মস্ত লিচুবাগান রয়েছে," ঝুলন বলে, "কাজেই যে সময় ব্রতীনআঙ্কল খুন হন, কাঁচা লিচুর অভাব ছিল না তাঁদের কাছে। তবুও অতিসাবধানী রবিনবাবু কাঁচা লিচুর রসের সঙ্গে গ্লিক্লাজাইড ট্যাবলেটও গুলে দিয়েছিলেন কয়েকটা। আর কিছু মিশিয়েছিলেন কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই। তারপরে বাবুয়াদা ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার পরে ব্রতীনআঙ্কলের নাক দিয়ে রাইলস টিউব ঢুকিয়ে দিয়ে বড় সিরিঞ্জে করে সলিউশনটা ঠিকঠাক পুশ করে দেন রবিনবাবু। প্রোমোটারির ব্যবসায় নামার আগে বেশ কিছুদিন শঙ্করপুরে এক ডাক্তারের চেম্বারে কম্পাউন্ডারি করেছিলেন। কাজেই এসব কাজে ওঁর কাছে জলভাত। কাজ সেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইকে চেপে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময়ে সিরিঞ্জটা ড্রেনের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছিলেন প্রমাণ লোপাটের তাগিদে। লিচুর ডালটালগুলোও ঘর থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন মনে করে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে বলে একটা প্রবাদ আছে জানেন তো। পড়বি তো পড় ফেরার সময় ঠিক চোখে পড়ে গেলেন সঞ্জয়বাবুর আর রাইলস টিউবটাও ফেলে রাখলেন ঘরের মধ্যে...কী বলেন রবিনবাবু?" তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে ঝুলন।

"কিন্তু এত কিছু করার কী দরকার ছিল?" জিজ্ঞেস করলেন শুভঙ্কর, "সরাসরি ইনসুলিনই তো পুশ করতে পারতেন উনি। আই ভি দিলে মৃত্যু তো অনিবার্যই ছিল।"

"তা ছিল," ঝুলন বলে, "কিন্তু রবিনবাবুরা ভয় পেয়েছিলেন নিডলের সূক্ষ্ম দাগও যদি ডাক্তারবাবু বা অন্য কারও চোখে পড়ে যায়..."

"পৃথিবীতে একমাত্র আমারই কি ডান হাতে ছ'টা আঙুল? আততায়ী কি অন্য কেউ হতে পারে না?" মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন রবিনবাবু।

"তা হয়তো পারে", ঝুলন হাসল তার দিকে চেয়ে। একরাশ ব্যঙ্গ সেই হাসিতে, "কিন্তু পরশু রাতে বাবুয়াদার থেকে খবর নিয়ে আমার সঙ্গে যারা লড়তে এসেছিল আমাকে একেবারে সরিয়ে দেওয়ার মতলব নিয়ে, তাদের মধ্যে অপটু হাতে যে সাইকেলের চেন ঘোরাচ্ছিল মাথার উপরে তুলে তার হাতেও যে ছ'টা আঙুল ছিল রবিনবাবু। আপনি বলবেন সে লোকও আপনি নন। কিন্তু আমি যে শনাক্তকরণের সুবিধের জন্যে চিহ্ন রেখে দিয়েছি। জামার কলারটা দয়া করে একটু সরাবেন? আমি কিন্তু বাঁ হাতের লম্বা নখগুলো দিয়ে ও জায়গাটায় নিশান রেখে দিয়েছি রবিনবাবু। খুব সচেতনভাবে। আজকের কাজের সুবিধের কথা ভেবে। তা ছাড়া সেদিন যে বডি স্প্রেটা মেখেছিলেন আজও সম্ভবত সেটাই মেখে এসেছেন এখানে? জিনিসটা দামি সন্দেহ নেই। কতক্ষণ গন্ধটা স্পষ্ট থাকে। ভাগ্যিস থাকে, সেইজন্যেই না আজ আমার প্রথম থেকেই আপনাকে চিনতে কেমন সুবিধে হয়ে গেল। কই, এবারে জামা সরিয়ে জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিন সবাইকে।"

রবিন সেনগুপ্ত জামার কলার সরানোর বদলে আরও চেপে ধরলেন জামাটাকে শরীরের সঙ্গে! দু'হাত দিয়ে।

শুভঙ্করকে কিছু বলতে হল না। বাইরের বারান্দা থেকে নিজের লোকজনকে ডেকে নিলেন তিনি। ঝুলনের কাজ শেষ। এবারের বাকি কাজটা তাঁর। তিনি জানেন। মন্দিরার মা শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে ছিলেন বাইরের আকাশের দিকে। মুখে একটাও শব্দ উচ্চারণ করলেন না তিনি। কারও দিকে ফিরেও তাকালেন না। নিতুকে স্পষ্টতই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। বাবুয়া, রবিন, রঞ্জনকেও। সঞ্জয় মিত্র, জনার্দন কয়াল এবং মুরারিবাবু উঠে পড়লেন। ঝুলনও উঠে দাঁড়াল। নোটনকে বলল, "চল।"

মন্দিরা চুপ করে বসেছিল। এবারে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে হাত ধরল ঝুলনের। তারপর ধরা-ধরা গলায় বলল, "যাস না ঝুলন। দাঁড়া। তোর কথামতো সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি আজ এখানে। সকলকে বল প্লিজ তাঁরা যেন খেয়ে যান। তারপর সে গিয়ে দাঁড়াল বাবুয়ার সামনে। বাবুয়ার মাথা নিচু হয়ে বুকে চিবুক ঠেকে গিয়েছিল। সে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সেই চিবুক ধরে উঁচু করল। তারপর তার চোখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, "বাবুয়াদা, তুমি তো জান, যদি কখনও বাড়ি থেকে না খেয়ে কাজে বেরিয়ে যেতে বাবা সেদিন ভাত খেতেন না। বলতেন ছেলে না খেলে বাবা কি শান্তি মনে খেতে পারে পেট পুরে? এ বাড়িতে আর কখনও তোমার খাওয়া হবে কিনা তা তো জানি না, কিন্তু আজ অন্তত না খেয়ে যেয়ো না। তুমি না খেয়ে বেরিয়ে গেলে বাবা কষ্ট পাবে, খুব-খুব কষ্ট পাবে। জান তো বাবা কষ্ট পেলে একদম সহ্য করতে পারি না আমি," মন্দিরার চোখ থেকে জল গড়াচ্ছিল। তার ভিজে-ভিজে মুখে রাগ, দুঃখ, হতাশা, বিষাদ এমনি আরও কত জানা-অজানা অনুভূতি মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

নোটনের খুব কষ্ট হচ্ছিল বুকের মধ্যে মন্দিরাদিকে দেখে। সে জানে ঝুলনদিও কষ্ট পাচ্ছে মনে-মনে। উপরে যতই ডাকাবুকো হোক, ভিতরে-ভিতরে অসম্ভব নরম ও। ধরার মধ্যে এত মানুষ, অথচ শব্দ নেই কোনও। চাপ-চাপ বিষণ্ণতা মেঘের মতন উড়ে-উড়ে যেন ঘিরে ফেলছে সবাইকে। নোটন সেই নীরবতার মধ্যে ডুবে যেতে-যেতে ডান হাত দিয়ে ঝুলনের বাঁ হাতটা চেপে ধরল শক্ত করে।

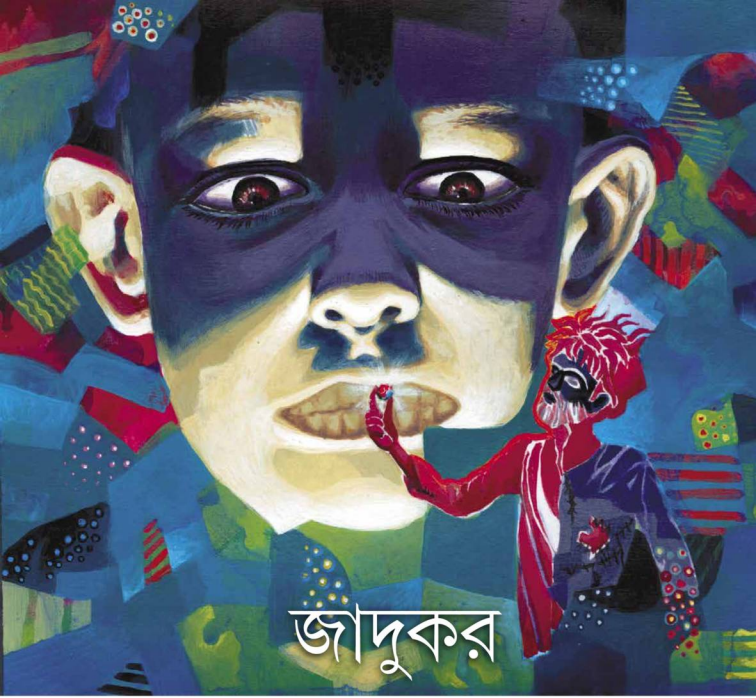

জাদুকর

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

স্যারের বেত নাচানো দেখে হারুপাগলার কথাটা মনে পড়ে গেল তোজোর। "বিপদ, বিপদ, খুব বিপদ! দেখ আজ তোর কী হয়!"

সত্যি আজ দিনটাই খারাপ! সকালে মায়ের কাছে বকুনি খেল। তারপর আবার এখন এই সব। কিন্তু পয়সা না থাকলে ও কী করবে?

আজ সকালে পাউরুটি কিনে বাড়ি যাওয়ার সময় হারু পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল তোজোর।

পাগলা হারুকে এই বকুলপুরের সবাই বেশ ভয় পায়। কখন যে কী করবে তার ঠিক নেই। ওকে দেখলে তাই সবাই এদিক-ওদিক পালায়!

তোজোও পালাত, কিন্তু সামনে তখনই এমন করে একটা টোটো চলে এল যে, আর রাস্তা টপকাতে পারেনি ও।

হারু এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "টাকা দে... দে টাকা। শিঙারা খাব। দে টাকা, তা হলে তোকেও একটা জিনিস দেব!"

জিনিসের কোনও দরকার নেই বাবা তোজোর। ও জানে হারু ওকে কী দেবে। হারু একবার ওর বন্ধু রাজুকেও অমন বলেছিল। রাজু পাঁচ টাকা দিয়েছিল হারুপাগলাকে। আর তার পরিবর্তে রাজুকে একটা পাথর দিয়েছিল হারু। বলেছিল, ওটা নাকি পরশপাথর। লোহায় ঠেকালেই সোনা হয়ে যায়।

আর শুধু রাজুকেই নয়, এই বকুলপুরের কতজনকে যে হারুপাগলা পরশপাথর দিয়েছে তার ঠিক নেই। কেউ কিছু দিলেই

বিনিময়ে পাথর দিয়ে বলে, "এই নে পরশপাথর! আজ থেকে তুই বড়লোক হয়ে গেলি!'

ছাই হয়েছে বড়লোক!

তা ছাড়া টাকা কোথায় পাবে তোজো? ওকে মা হাতে টাকা দেন নাকি? পাঁউরুটি কেনার জন্যও গুনে টাকা দিয়েছিলেন মা!

মা খুব রাগী। গত ছ'মাস আগে বাবা মারা গিয়েছেন তোজোর। তারপর ওরা কলকাতা থেকে চলে এসেছে এই বকুলপুরে। এখানে তোজোর টেলিস্কোপ দিয়ে দেখার মতো দূরসম্পর্কের এক মামার বাড়ি। সেই বাড়ির নিচে একটা ঘরে ভাড়া থাকে তোজো আর ওর মা। মা সেলাই করেন আর ছাত্র পড়িয়ে সংসার চালান। ওদের টাকা-পয়সার টানাটানি আছে সেটা তোজো বোঝে।

হারকে পাশ কাটিয়ে কিছুতেই যেতে পারছিল না তোজো। হারু এসে একদম গায়ের উপর উঠে পড়েছিল যেন!

শেষে এক রকম ধাক্কা দিয়েই ওকে সরিয়ে তোজো নিজের পথ করে নিয়েছিল! আর তখনই হারু চিৎকার করে বলেছিল, "বিপদ, বিপদ, খুব বিপদ। দ্যাখ আজ তোর কী হয়।"

বিপদ কী তোজোর একটা!

ক্লাস সিক্সে পড়ে ও। লোকে ওকে ছোট ভাবলেও ও সব বুঝতে পারে। আজ সকালেই তো শুনছিল যে, মায়ের মামাটি উপর থেকে এসে মায়ের উপর খুব চোটপাট করছিল। কী না, দু'মাসের ভাড়া আর ইলেকট্রিকের বিল বাকি পড়েছে। মা বলেছিলেন, দিয়ে দেবেন। কিন্তু তাও মামা এমন খারাপ কথা বলছিল!

মায়ের মন খারাপ দেখে তোজো ভেবেছিল মায়ের মন একটু ভাল করা দরকার। ও টুকটাক হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক দেখাতে পারে। একটা গুলি নিয়ে মাকে বলেছিল, 'মা, একটা ম্যাজিক দেখবে?"

মা এমনিতেই বিব্রত ছিলেন। ওই কথা শুনে যা বকেছিলেন! তখনই বুঝেছিল হারুর অভিশাপ কাজ শুরু করেছে! তারপর এখন আবার এই!

"কীরে কেন টুকছিলি বল?" স্যার আবার বেত নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

বারিনবাবু ওদের অঙ্কের টিচার। আজ ক্লাস টেস্ট নিচ্ছেন! অঙ্কে তোজো ভালই। আজও ভালই প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু এমন করে বিপদে পড়বে বুঝতে পারেনি!

কুড়ি নম্বরের টেস্ট। লুজ় শিটে পরীক্ষা হচ্ছিল। হঠাৎ পাশের বেঞ্চে বসা প্রতীক ফিসফিস করে বলল, "তোজো তোর পায়ের কাছে আমার শিটটা পড়ে গিয়েছে দে তো!"

তোজোর সাদা মনে কাদা নেই। শিটটা তুলে দিতে গিয়েছে প্রতীককে অমনি পিছনে বসে অয়ন চেঁচিয়ে স্যারকে বলল, "দেখুন স্যার, তোজো প্রতীকের খাতা নিয়ে টুকছে!"

"আরে! আমি কোথায় টুকলাম!" তোজো প্রতিবাদ করলেও স্যার শুনছেন না!

স্যার জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছেন, "কীরে কেন টুকছিলি বল?"

"আমি টুকিনি স্যার," তোজো কাঁচুমাচু গলায় বলল, "আপনি প্রতীককে জিজ্ঞেস করুন। ওর খাতাটা পড়ে গিয়েছিল তাই তুলে দিচ্ছিলাম!"

"কীরে প্রতীক? তাই?" স্যার এবার ঘুরলেন প্রতীকের দিকে!

প্রতীক উঠে দাঁড়াল, "তোজো বলল, ওর কিছু পড়া হয়নি। তাই আমি যদি একটু দেখাই, মানে... আমি না করেছিলাম, কিন্তু স্যার ও শোনেনি। জোর করে..."

তোজোর মুখ হাঁ হয়ে গেল। প্রতীক কী বলছে এটা?

স্যার ফিরলেন তোজোর দিকে, "তবে রে... মিথ্যে কথা বলা? আজ তোর হচ্ছে!"

স্যারের বেতটা ওঠার সময় তোজো দেখল প্রতীক, অয়ন নিজেদের মধ্যে মুখ টিপে হাসছে!

সত্যি হারুপাগলা ঠিক বলেছে, আজ ওর চারিদিকে বিপদ!

॥ ২॥

দুপুরের দিকে এই সাহেবপাড়ার রাস্তাটা নির্জন হয়ে যায়। পাশেই গঙ্গা, মাঝে-মাঝে সেখান থেকে জাহাজের ভোঁ আসে! এই বকুলপুরে আগে পর্তুগিজদের কুঠি ছিল। এই রাস্তাটার সামনেই মাইতিদের বড় বাড়িটার পাশে এখনও সারেঙ বাড়ি আছে একটা। দেখলেই বোঝা যায় কয়েকশো বছরের পুরনো। সারা গায়ে গাছপালা দিয়ে মোড়া। ভিতরে কেউ যায় না।

আজ স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে তাড়াতাড়ি। পাশের বিনোদবিহারী হাই স্কুলের সঙ্গে ম্যাচ আছে ওদের স্কুলের। সবাই সেই দিকেই গিয়েছে!

তোজোর মন ভাল নেই। বাড়িতে সকালে অমন ঝামেলা হল। আবার ক্লাসে স্যার মিছিমিছি ওকে মারলেন। প্রতীক আর অয়নটা এমন শয়তান। ওদের জন্য স্যার তোজোর পরীক্ষার খাতা থেকে পাঁচ নম্বর মাইনাস করে দিয়েছেন! মা যদি জানতে পারেন তবে রক্ষে থাকবে না। মা খুব কড়া এসব ব্যাপারে!

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে মাইতিদের বাড়িটা তোজো ছাড়িয়েছে এমন সময় "এই পেয়েছি" বলে প্রতীক আর অয়ন দু'দিক থেকে ওকে চেপে ধরল।

বেশ ভয়ই পেয়ে গেল তোজো। এরা আবার কী চায়?

প্রতীক বলল, "এই তো তোকেই খুঁজছি আমরা!"

"কেন?"

অয়ন বলল, "যা তো মাইতি বাড়িতে যা। আমাদের হয়ে গোপালকে একটা চিঠি দিয়ে আয় জলদি!"

"কেন? ওই বাড়িতে তো কাউকে ঢুকতে দেয় না," তোজো অসহায় গলায় বলল।

"সেই জন্যই তো তোকে বলছি। আমাদের ঢুকতে দেবে না। প্লাস আমরা গাছ বাইতে পারি না ভাল। তুই পারিস। গাছ বেয়ে টুপ করে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়। গোপালের ঘরটা একতলায়। ওকে এই চিঠি দিয়ে আয়। একটা জিনিস ওকে জানানো খুব দরকার!"

গোপালও ওদের ক্লাসে পড়ে। ভীষণ বখাটে ছেলে। প্রতীকদের খুব বন্ধু। ওকে নিশ্চয়ই কিছু জানাতে চায়!

তোজো বলল, "ও আমি পারব না! ধরা পড়ে গেলে। মাইতিবাবু খুব রাগী!"

"তোকেই করতে হবে!" অয়ন চোখটা সরু করে বলল, "না হলে তোর মায়ের কাছে বলে দেব তুই টুকলি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিস!"

"কিন্তু আমি তো করিনি!"

"স্যার তোর নম্বর কেটেছেন। স্যার জানেন। কাকিমা কাকে বিশ্বাস করবেন? তোকে না স্যারকে?"

তোজো মাথা নামিয়ে নিল। সত্যি মা যদি স্কুলে খবর নেন, তা হলেই হয়েছে! আচ্ছা, প্রতীকরা কি ওকে ইচ্ছে করে ফাঁসিয়েছে এমন কিছু করাবে বলে? ও অনিশ্চুক গলায় বলল, "ঠিক আছে দে।"

॥৩॥

নিঝুম দুপুর। স্কুলের ব্যাগ পিঠে নিয়ে গাছ বেয়ে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকতে কোনও অসুবিধেই হল না তোজোর। আগে একবার এই বাড়িতে ঢুকেছিল ও। তাই জানে গোপালের ঘর কোনটা।

বাড়ির মালিক মাইতিবাবু গোপালের ঠাকুরদা। খুব কড়া লোক। তোজো জানে

ধরা পড়লে খুব বিপদে পড়বে। সত্যি হারু পাগলা ঠিকই বলেছে!

পাঁচিলের থেকে নেমে চারিদিকটা দেখল তোজো। সামনে ফাঁকা লন। এক পাশে একটা নিচু পাঁচিল ঘেরা কুয়ো। আর বাগান।

লন পেরিয়ে সামনে মূল বাড়ি। যার নীচের বাঁ দিকে গোপালের ঘর।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে গেল তোজো। আর ঠিক তখনই 'ঘেউ ঘেউ'টা শুনতে পেল। একটা পাগ দৌড়ে আসছে প্রজাপতির পিছন-পিছন! বাচ্চা কুকুর খেলা করছে! তোজো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই সেরেছে, কুকুরটা বামেলা করবে নাকি?

কিন্তু কুকুরটা খেয়ালই করল না কিছু। প্রজাপতির পিছন-পিছন লাফাতে লাফাতে গেল লনের এক কোণায়, কুয়োর দিকে। তোজো দেখল, কুয়োর চার দিকে কুকুরটা ঘুরলো খানিক। তারপর আচমকা লাফিয়ে প্রজাপতিটাকে ধরতে গেল, পারল না। উলটে টুপ করে গাছের পাতার মতো খসে পড়ল কুয়োর ভিতরে!

থমকে গেল তোজো। কুকুরটা তো পড়ে গেল কুয়োয়। ওটাকে তো বের করতে হবে! না হলে তো বিপদ। তোজো এদিক-ওদিক তাকাল। কেউ নেই চারিদিকে। ও কী করবে? গোপালের কাছে চুপচাপ চিঠি দিয়ে বেরিয়ে আসবে নাকি চিৎকার করে লোক ডাকবে!

নিমেষে ঘেমে গেল তোজো। ও নিজের পিঠ বাঁচাবে নাকি যেটা ঠিক সেটা করবে? মা বলেন, যেটা ঠিক সেটাই কর্তব্য!

হলুদ ছোট প্রজাপতিটা উড়ছে! কাগজ ফুলের মতো উড়ছে!

তোজো চোয়াল শক্ত করে নিল। তারপর চিৎকার করে বলল, "ও কাকু, ও দাদু, পড়ে গিয়েছে, কুকুরটা কুয়োয় পড়ে গিয়েছে!"

॥৪॥

দরোয়ানটা ঘাড় ধরে ওকে প্রায় ছুড়ে ফেলে দিল ঘরটার মধ্যে। ভাঙা ইটকাঠের আবর্জনার মধ্যে পড়ে গেল তোজো। খুব লেগেছে পায়ে। বোধ হয় কেটেও গিয়েছে! কী জ্বালা করছে!

দরোয়ানটা বলল, "থাক এখানে বদ্ধ। মালিক বলেছে বাইরে আমায় পাহারা দিতে। পাঁচিল টপকে আমাদের বাড়ি ঢোকা! গোপালবাবাকে ভাল ছেলে পেয়ে তাকে দুষ্টুমির দলে টানা। থাক এখানে সন্ধে পর্যন্ত বন্দি!"

তোজো আর কী বলবে? কুকুরটাকে বাঁচাতে গিয়ে বাড়ির লোক জড়ো করল। কুকুরটাও বাঁচল। কিন্তু ওর হল বিপদ। ওর হাতের চিঠি ধরা পড়ে গিয়েছে মাইতিবাবুর কাছে। তারপর ও যে পাঁচিল টপকে সেটাও ওরা বুঝে গিয়েছে!

মাইতিবাবু ওদের বিশাল চেহারার দরোয়ানটাকে বলেছে, "রামু যা তো, এই চোরটাকে সারেঙ বাড়িতে আটকে রাখ। দেখবি, যেন সন্ধের আগে ছাড়া না পায়!"

তোজো আবছায়ায় এদিক-ওদিক তাকাল। চোখ সয়ে গিয়েছে কিছুটা। তাই মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে। ওর ভয় লাগল। সাপটাপ নেই তো!

বাড়ির সামনের দিকে মূর্তিমান যমরাজের মতো দরোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে দিয়ে তো পালানো যাবে না। সন্ধে হয়ে গেলে মা চিন্তা করবেন। আর খুঁজতে যদি বের হন তা হলে কপালে দুঃখ আছে তোজোর। ভয়ে পেটের ভিতরটা গুলিয়ে উঠল! মা যে বলেন, কখনও খারাপ কাজ করতে নেই। সবাইকে সাহায্য করতে হয়। তা হলে ভগবান মুখ তুলে চান। সব কি মিছে কথা! ও তো নিজের বিপদের কথা চিন্তা না করে ছোট্ট কুকুরটাকে বাঁচাল। তা হলে? ভগবান তো নিজের কাজেই ডুবে রইলেন। ওর দিকে তো মুখ তুলে চাইলেন না।

"দেখলি তো আমায় শিঙারা খাওয়ার পয়সা না দিলে কী হয়?"

আবছা অন্ধকারের ভিতর থেকে হারুপাগলা বেরিয়ে এল আচমকা! তোজো ভয়ের চোটে আঁক করে চিৎকার করে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হারুই ধরল ওকে। বলল, "দে, খাবার দে!"

তোজো কোনও মতে সামলাল নিজেকে। জটাচুলের নোংরা জামা পরা একটা লোক এমন আবছায়া দাঁড়িয়ে থাকলে কে না ভয় পাবে!

"কী হল দে, সারাদিন খাওয়া হয়নি।"

হারুর গলাটা কেমন যেন শোনাল। কষ্ট হল তোজোর। মনে পড়ে গেল, মা বলেন, "কে খারাপ করল, না ভাল করল দেখতে নেই। নিজেকে সব সময় ঠিক কাজটা করতে হয়!"

তোজো পিঠের ব্যাগের থেকে টিফিন বাক্সটা বের করে দিল। আজ খায়নি ও। বলল, "নাও খাও।"

হারু প্রায় কেড়ে নিল টিফিনটা তারপর ঢাকনা খুলে গোগ্রাসে খেতে লাগল। সামান্য রুটি আলুভাজা। তোজোর ইচ্ছেও করে না খেতে। কিন্তু ওর দেখে মনে হল হারু যেন অমৃত খাচ্ছে!

খাওয়া শেষ করে হারু ফেরত দিল বাক্সটা। তারপর বলল, "আয় আমার সঙ্গে।"

"কেন?" তোজো ভয় পেল।

"তো থাক এখানে বসে," হারু কথা না বলে সামনের একটা গাছের ঝুরি নেমে প্রায় ঢেকে আসা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তোজো দেখল হারু নিশ্চয়ই এখানে থাকে। দেখাই যাক না। ও এগিয়ে গেল হারুর পিছন-পিছন।

হারু ওকে নিয়ে আবছায়ার মধ্যে নানান গাছপালা ঘুরে দরজা পেরিয়ে আলোর মধ্যে এনে দাঁড় করাল। বলল, "যা, পালা। সামনে নদীর বাঁধ। পালিয়ে যা!"

তোজো দেখল সত্যি তাই। তা হলে এমন গোপন দরজাও আছে সারেঙ বাড়িতে।

তাজো সময় নষ্ট না করে দৌড়তে গেল। কিন্তু হারু পিছন থেকে ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, "বলেছিলাম একটা জিনিস দেব। এই নে পরশপাথর!"

আবার সেই পাথর! তোজো বলল, "আমার দরকার নেই ওসব।"

হারু বলল, "আমি তো খ্যাপা। সারা জীবন এটাই খুঁজে ফিরেছি! এই পাথর লোহাকে সোনা করে দেয়! নিয়ে পালা।"

তোজো পাথরটা পকেটে ঢুকিয়ে আর কথা বাড়াল না। দরোয়ানটা এদিকে চলে এলেই বিপদ! সন্ধের আগে ওকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে।

॥৫॥

হাতের পাথরটা তুলে জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় আর-একবার দেখল তোজো। অদ্ভুত লাল আর নীল রং মিশে আছে পাথরে। তোজো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পাশের বিছানায় মা ঘুমোচ্ছেন অঘোরে।

হাসি পেল তোজোর। পরশপাথর বলে কিছু হয় নাকি? ওটা তো সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা। গল্পটা রাজশেখর বসুর লেখা। মা বলেছেন।

কিন্তু সত্যি যদি হয়? তোজো ভাবল একটু। তারপর পা টিপে-টিপে উঠে মায়ের সেলাইয়ের জায়গা থেকে বড়, ভারী লোহার কাঁচিটা নিয়ে আবার বিছানায় ফিরে এল। কাঁচিটা পুরনো। এক কোনায় মায়ের নাম খোদাই করা আছে।

তোজো দম ধরে বসে রইল একটু। জানলার বাইরে স্টেশন মোড়ের বাবুদার দোকানের পিছনে পিৎঙ্গার মতো গোল চাঁদ উঠেছে! তার আলোয় তোজো পাথরটা

দেখল আর-একবার। বুকের ভিতরে যেন লক্ষ হরিণ ঢুকে পড়েছে!

ও এবার বাঁ হাতে কাঁচিটা তুলে পাথরটা কাঁচির গায়ে ঠেকাল আস্তে করে। কই কিছু হল না তো! তোজো আবার পাথরটা ঠেকাল, আবার ঠেকাল। বারবার ঠেকাল। কিন্তু কিচ্ছু হল না। লোহার কাঁচি লোহারই রয়ে গেল। বুকের হরিণেরাও নিমেষে মিলিয়ে গেল কোথাও।

তোজোর আচমকা হাসি পেল। ও নিজেই তো পাগল। না হলে কী আর-একটা পাগলের কথায় বিশ্বাস করে!

বালিশের পাশে কাঁচি আর পাথরটা রেখে শুয়ে পড়ল তোজো। তারপর রাতের পাখির ডাক শুনতে-শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল আর মনে নেই!

ঘুম ভাঙল একটা ধাক্কায়। কী হয়েছে? ঘুম জড়ানো চোখে কোনও মতে তাকাল তোজো। মাথাটা কট করে উঠল। মা কী বলছেন? মায়ের মুখে এত রাগ কেন?

তোজো ভাল করে তাকাল এবার। জানলা দিয়ে আসা আলো দেখল বুঝল সবে ভোর হয়েছে। নরম হাওয়া আসছে সকালের। ঝিরঝিরে রোদ উঠি-উঠি করছে। এমন সকালে মা রেগে আছেন কেন?

মা বলছেন, "কী করেছিস তুই? কী করেছিস বল? এটা কী? এমন কাঁচি তুই কোথা থেকে এনেছিস? কার এটা?"

তোজো দেখল মায়ের হাতে ধরা একটা বড় কাঁচি। সোনার!

মা রাগ আর ভয় মিশ্রিত গলায় বললেন, "কী সর্বনাশ করেছিস তুই? এই বয়সেই এমন করলি? এটা কার থেকে এনেছিস?"

তোজো দেখল বালিশের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে সেই হারুপাগলার পাথর! আর সকালের ঝিকিমিকি রোদের ঝিলিক দিচ্ছে কাঁচি! যার কোণে মায়ের নাম লেখা!

মা আরও কী যেন বলছেন! ভয় পাচ্ছেন!

তোজো আচমকা হাত তুলে মাকে থামাল। তারপর পাথরটা তুলে নিয়ে মায়ের আঁচলে বাঁধা লোহার চাবির গোছাটা ধরে বলল, "একটা ম্যাজিক দেখবে মা?"

ছবি: দীপঙ্কর ভৌমিক

স	বা	ক		স	মা	ধা	ন		ন	ত		ভা	র্গ	ব		ম	হা	মা	রি
র			সা	ম্পা	ন		গ	র	ল		বা	র		না		হা	র		ষ
পু	র		র	দ		ব	দ	ন		ম	তি		ধা	নী		ন	ক	ল	
রি	ক্	থ		ক	দ	লী		পা	ট	ক		মা	মা		নি	ন্দা		ট	ন
য়া		র	মা		মা	য়া	বী		ন	র	মে	ধ		সু	র্মা		অ	প	
	স		ত	র		ন	থি		ক		জা	ব		র	ণ	ন		ট	ব
ন	র			জ			কা	ক		সা	জ		কা	ম্য		জ	প		ন
বা		ক	ল		ক	রী		ত	প			সাঁ	কো		পা	র		রি	ফু
গ	জ		বে	শ		তি	মি		সা	দ	র		দ	প্ত	রি		ক	ম	ল
ত	ল		জা	র			শ	ব	র		স	ম	র		শ্র	ব	ণা		
		স	ন	ৎ		নী	র	স		বা	না	ন			মি	ট		অ	পু
ভা	গ	নে		চ	প	লা		ন	রু	ন		ন	ব		ক	ফ		নূ	ন
নূ	র		ই	ন্দ্র		চ	ক			র	বি		র	শি		ল	ব		র্ভ
ম		অ	দ্ধ		কো	ল		দ	র		না	ক			বাঁ			স	ব
তী	র		ন	মি	ত		শা	হ		অ		র	ব		শ	নি		য়	
	সা	ত		রি	ল		কা	লা	পা	নি		লা	ল	ন		ব	ধ		ফ
ন	য়		ঝ	ক		অ	য়		ক	ল	হ		বা	দ	ল		স	জ	ল
	ন	ব	ল		নি	জ		ধ	ড়		র	ত	ন		তা	র		মা	পা
না		চ	ম		জ		বা	ন		স	ফ	ল		অ	পা	ঙ্গ			কু
শো	কা	ন	ল		স্ব	রা	জ		বা	ম		ব	ন	ল	তা		অ	ন	ড়

সম্পূর্ণ উপন্যাস

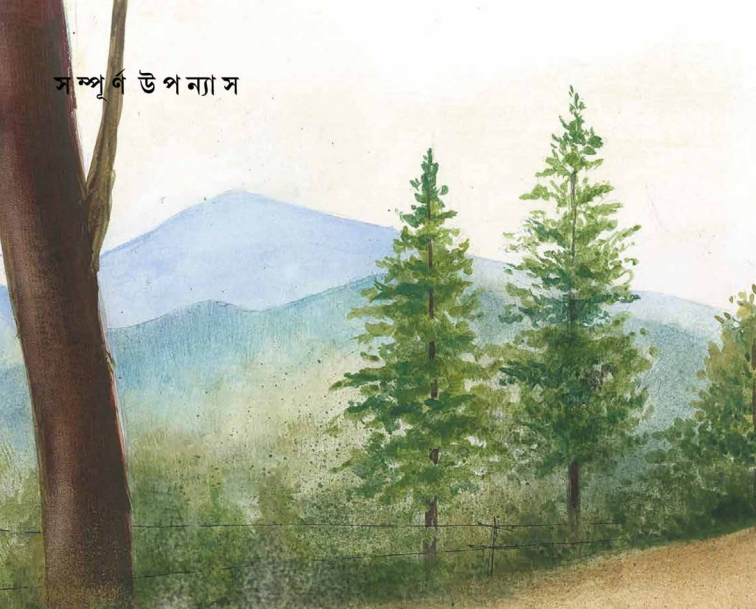

কুমায়ুন রহস্য

অনীশ মুখোপাধ্যায়

ছবি: রৌদ্র মিত্র

বাপ্পার সল্টলেকের দাদা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল যখন ওকে ফোনে জানালেন যে, ওঁর স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক চন্দ্রমোহন পাঠক জরুরি দরকারে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ খুঁজছেন, তখন ব্যাপারটা কী পরিমাণ ঘোরালো জানা ছিল না। সেটা বোঝা গেল খানিক আগে তিনি চলে যাওয়ার পরে। সামন্তদের কেসটা যে সায়নদার সাহায্য ছাড়া সমাধান হত না, একথা বাপ্পার মুখে বেশ কয়েকবার আমি শুনেছি।

সেই তিনিই যখন বাপ্পাকে নিজে থেকে ফোন করে মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন, তখন তার গুরুত্ব যে বাপ্পার কাছে আলাদা হবে সেটা বলাই বাহুল্য। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ি দমদমে। আজ ফেব্রুয়ারির বারো তারিখ। কলকাতায় এখনও একটা ঠান্ডা ভাব আছে। হয়তো সেজন্যই ধুতি-পাঞ্জাবির উপরে ভদ্রলোক একটা বোতামওয়ালা হাতকাটা সোয়েটার চাপিয়েছেন। বয়স আন্দাজ ষাটের কাছাকাছি। মোটা ফ্রেমের চশমা পরা ভদ্রলোকের দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। কাঁচাপাকা চুল পেতে আঁচড়েছেন। চোখ-মুখ দেখে বিশেষ চিন্তিত মনে হল। সমস্যাটা কী জানতে চাওয়ায় বললেন, "আমার একমাত্র ছেলে ললিত কুয়ালা লামপুরে থাকে। হোটেলে চাকরি করে। বছরের এই সময় সে দু' বা তিন সপ্তাহের জন্য দেশে আসে। এবারেও এসেছে। কিন্তু আমাকে আসার আগে বলেছিল, দেশে এসে সে টেকিংয়ে যাবে। চারদিনের টেকিং। তার মধ্যে যাওয়া-আসা তিনদিন। মানে, এক সপ্তাহের ব্যাপার। বাকি সময় আমার কাছেই থাকবে। সেভাবেই সে সব প্ল্যান করেছিল। যেদিন এল তারপরের দিনই বেরিয়ে গেল। সেটা ছিল শনিবার। পরের শুক্রবার তার ফেরার কথা। আজ মঙ্গলবার হতে চলল, এখনও ফেরেনি। মোবাইলটা প্রথমে বলছিল নট রিচেবল। এখন বন্ধই হয়ে গিয়েছে। আমি মশাই দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। ওর মা বিছানা নিয়েছেন। খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম সব মাথায় উঠেছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করব। সায়নভাই আমার অবস্থা দেখে কী হয়েছে জানতে চায়। তাকে সব বলায় সে আপনার কাছে আসার পরামর্শ দেয়।এখন আপনি কি কোনওভাবে কিছু জানতে পারবেন?"

বাপ্পা এতক্ষণ সবটাই মন দিয়ে শুনে আরও খানিক ভেবে তারপরে

বলল, ''সেটাতে পরে আসছি। তার আগে আমার কিছু তথ্য জানা দরকার।''

অনন্ত চা এনেছে। সঙ্গে কিছু বিস্কুট। আমরা তিনজনেই চায়ের কাপ তুলে নিলাম।

চন্দ্রমোহন বললেন, ''আমার যা জানা আছে আমি সব বলব। বলুন, কী জানতে চান?''

''ললিতবাবুর একটা ফোটো থাকলে দেখতাম।''

''এনেছি। ইয়ে, মানে একটু দাঁড়ান।''

ভদ্রলোক ওঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ হাতড়ে খানিক বাদে একটা খাম বের করে তার মধ্যে থেকে একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো বাপ্পার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ''আপনার কাছে এটা রাখুন।''

আমি যেহেতু বাপ্পার পাশেই বসেছিলাম তাই ফোটোটা দেখতে পাচ্ছিলাম। কালাভ ফোটো। পাহাড়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে জিন্স আর জ্যাকেট গায়ে। চোখে সানগ্লাস, পিঠে ব্যাগসমেত কোথাও যাওয়ার জন্য বোধ হয় প্রস্তুতি নিচ্ছে। বেশ লম্বা, ফোটো দেখে ফরসা বলেই মনে হল। রোগাটে গড়ন, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, বয়স তিরিশের কম হওয়াই স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ ফোটোটা দেখে সেন্টার টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বাপ্পা জিজ্ঞেস করল, ''উনি কি আগেও ট্রেকিংয়ে গিয়েছেন?''

''পাহাড়ে বেড়ানো আমার ছেলের নেশা। দেশ ছেড়েছে চার বছর। কিন্তু তার আগে প্রতিবছরই তো কোথাও না-কোথাও যেত।''

বাপ্পা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,''ললিতবাবু এবারে কোথায় ট্রেকিংয়ে গিয়েছেন?''

''আমায় তো বলল কুমায়ুন যাচ্ছে।''

''বেশ। কিন্তু সে তো একটা বিরাট রেঞ্জ। একটুখানি জায়গা নয়। কুমায়ুনের কোথায় বলেননি?''

''সেটাই তো সমস্যা হয়েছে। এর বেশি কিছু আমিও জানতে চাইনি, আমাকেও বলেওনি।''

বাপ্পা বলে উঠল, ''কুমায়ুনে লোক দু'ভাবে যায়। হয় তারা কাঠগোদাম দিয়ে ঢোকে। অথবা লখনউ এসে মিটার গেজের প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে টনকপুর দিয়ে আসে। সেটাও কুমায়ুনে আসার আর-একটা গেট বলতে পারেন। এর মধ্যে কোনটা দিয়ে...''

বাপ্পার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চন্দ্রমোহন বললেন, ''আজ্ঞে, আপনার ওই পরের রুটটা।''

তারপর চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, ''উপাসনা না কী একটা ট্রেন আছে, তাতে গিয়েছে। তা আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেটায় গিয়ে কোথায় নামবে? আমার ভাই কৃষ্ণমোহন থাকে লখনউতে। লান্টু, মানে আমার ছেলে বলল, ওখানে গিয়েই উঠবে।''

''তার মানে সেখানে যাওয়ার পরে তার সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?''

''হয়েছে তো। রবিবারও কথা হয়েছে। সেদিনটা ও ওখানেই ছিল। সোমবারে ফোন করেছিল। বলল, ওইদিন রাতে কুমায়ুনের ট্রেন ধরবে। তা ট্রেনে উঠে ফোনও করেছিল। পরের দিন থেকে আর কথা হয়নি। আমায় বলেছিল ফোন না করলে চিন্তা করতে হবে না। কারণ পাহাড়ি রাস্তায় মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যায় না। আর ট্রেকিং রুটে তো নয়ই। জানিয়েছিল, লখনউতে ফিরে এসে ফোন করবে। শুক্রবার সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় ফেরার কথা, ফেরেনি। ভাইকে ফোন করলাম। সে জানাল তার ওখানেও ফেরেনি। তারাও উদ্বিগ্ন। ফোনে পাচ্ছে না। শনি, রবি, সোম তিনদিন দেখে আজ আপনার কাছে এসেছি। আমার খালি কী মনে হচ্ছে জানেন, ও কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি তো? ওদিকটায় এখন বেশ ভাল ঠান্ডা। আবহাওয়া কেমন তাই বা কে জানে! আজকাল কাগজেপত্রে যা সব পড়ি, বরফের মধ্যে আটকে গেলে তো...ওর মাকে ফিরে গিয়ে যে কী বলব!''

ভদ্রলোকের গলাটা বোধ হয় আবেগে বুজে এল। বাপ্পা এসব কথায় একেবারেই বিচলিত হয় না। বরং মক্কেলকে ধাতস্থ হতে সময় দেয়। এখানেও দিল। এখন কিছু জানতে চেয়ে লাভ নেই। চন্দ্রমোহনবাবু রুমাল বের করে চশমা এবং চোখের কোণ দুটোই মুছলেন।

মিনিটখানেক বাদে খানিকটা স্বাভাবিক হতে বাপ্পা জানতে চাইল, ''আচ্ছা, ললিতবাবু কি একাই গিয়েছেন? সঙ্গে বন্ধুবান্ধব কেউ নেই? ট্রেকিং যারা করে তাদের একটা টিম থাকে শুনেছি।''

চন্দ্রমোহনবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, ''জানি না, আমার মাথাতেও আসেনি ব্যাপারটা।''

''আশ্চর্য! আপনার মাথাতেই আসেনি?'' বাপ্পা অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল।

''কী জানেন, ছেলে এখন বড় হয়েছে। বিদেশে চাকরি করে। ভাল রোজগার করে। দু'দিন বাদে তার বিয়ে দেব। এখন কি আর সেই আগের মতো অত পাই-টু-পাই খবর নেওয়া যায়? না তার কোনও দরকার আছে? আমি নিজে কাম অনেক সময় এই বইপত্তর নিয়ে থাকি। দুটো ম্যাগাজিন দেখাশোনা করি। একটু পুজোপাঠও করি। অত মাথায় থাকে না। আর ছেলেও আমার সঙ্গে যে ক'টা কথা বলে তার চেয়ে বেশি তার মাকে জানায়। কিন্তু তাঁকেও এবার কিছু বলে যায়নি। একা গিয়েছে না সঙ্গে কোন দলবল আছে, কিছুই জানি না।''

''আপনার ভাই এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারলেন না?''

''জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে-ও কিছু জানে না বলেছে। ওকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিল। ব্যস, এই পর্যন্ত।''

''পুলিশ মারফত কোনও খবরাখবর নেওয়া হয়নি? আপনি নিজে পুলিশে খবর দেননি কেন?''

''দেখুন, সেটা এখান থেকে করা সম্ভব নয়। কারণ আমার ছেলে তো আর কলকাতা থেকে নিখোঁজ হয়নি। যেদিকে হয়েছে বলে মনে হয় সেদিকে খবর নেওয়ার জন্য আমার ভাইকে বলেছি। সে ওদিকে থানা-পুলিশ করেছে। কিন্তু এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি।''

বাপ্পা মিনিটদুয়েক একমনে কিছু ভাবল। তারপর বলল,''ঠিক আছে, আমি দেখব। কিন্তু ধরুন, আমি যদি ট্রেনে যাই তবে যেতে তো একদিন সময় লাগবে। আর যদি ফ্লাই করি তা হলে এখন আমার ধারণা তার ভাড়াও অনেক হবে। আপনি...''

''প্লেন ভাড়া নিয়ে ভাববেন না। আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু ছেলেকে ফেরত চাই।''

''বেশ। তা হলে আমি পারলে আজ রাতেই আপনাকে জানাচ্ছি কবে কী করতে পারি। ও হ্যাঁ, আপনার ভাইয়ের ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা আমাকে মেসেজ করে দেবেন প্লিজ। আর বলে দেবেন আমি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব।''

''আমি এখনই দিচ্ছি। আপনি যে এক-কথায় রাজি হয়ে যাবেন, সেটা ভাবিনি।''

ভদ্রলোক সঙ্গের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ছোট নোটবইয়ের মতো দেখতে ডায়েরি বের করেছেন। কয়েকটা পাতা উলটে এক জায়গায় এসে একটা পাতা খুলে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ''কিছু মনে করবেন না, আমি ওই মেসেজ না কী বললেন, ওটা পারি না। দয়া করে এই ঠিকানাটা যদি লিখে নেন।''

বাপ্পা দ্রুত তার মোবাইলেই ঠিকানা, ফোন নম্বর টাইপ করে ডায়েরিটা ফেরত দিয়ে বলল, ''আপনার ভাইকে বলুন পুলিশ লাইনে খবরাখবর পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে। কারণ, আমি লখনউ পৌঁছে তারপর কুমায়ুন গিয়ে উঠতে-উঠতে কিন্তু আরও দিনকতক লাগবে।''

মিঃ পাঠক বলে উঠলেন, ''সে তো বটেই। বলব, নিশ্চয়ই বলব।''

তারপরে ব্যাগ থেকে চেক বই বের করে বললেন,''আপনার নামের বানানটা একটু বাঁধ বলেন।''

বাপ্পার কাছে শুনে নিয়ে নাম এবং টাকার অঙ্কের পরিমাণ লিখে সই করে চেকটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, ''এটা আপাতত রাখুন। আপনার এখন তো কিছু খরচ আছে।''

"ধ্যাংক ইউ," বাপ্পা হাত বাড়িয়ে চেকটা নিয়ে পকেটস্থ করল।

"আচ্ছা, এই কথাই রইল। আমি এখন তবে আসি।"

বাপ্পা যাতে দ্রুত কুমায়ুনে গিয়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টা করতে ভদ্রলোক বারেবারে অনুরোধ করে গেলেন। মিঃ পাঠক চলে যেতে বাপ্পাকে বললাম, "কালকেই ট্র্যাভেল করতে পারবি?"

ঘাড় নেড়ে সে বলল, "চেষ্টা তো একটা করতেই হবে। ওঁকে যে পরিমাণ উদ্বিগ্ন দেখলাম তাতে..."

এটা বাপ্পার একটা বদভ্যাস। মাথায় অন্য চিন্তা থাকলে কথা শেষ না করে সে চিন্তায় ডুবে যায়।

"কী ভাবছিস?" জানতে চাইলাম।

মোবাইলে সময় দেখে বলল,"আটটা বাজে। আমি আধঘন্টা একটু টিকিটের খোঁজখবর করি।"

যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য এখানে বলা থাক যে, আমি আর বাপ্পা বেলতলা রোডে বাপ্পার বাবা মামা, অন্নানকাকুর ফ্ল্যাটে থাকি। কাকু নিজে পুলিশে চাকরি করেন। আগে কলকাতায় ছিলেন। এখন ইলাহাবাদে থাকেন। বাপ্পা গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়। ওর সঙ্গে থেকে সাহায্য করি। যদিও আমায় অন্যান্য গল্প-উপন্যাস লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতে হলে সবসময় তা সম্ভব হয় না। কোথাও যাওয়ার থাকলে আমরা বরাবর জেট মানে, আমাদের ট্র্যাভেল ফ্রেন্ড জয়দীপকে বলে থাকি। জেট মানে হল জয়দীপ ইকোনমি ট্র্যাভেলস-এর সংক্ষেপ। যার মালিক জয়দীপ নিজেই। বাপ্পা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবে না। আর ডেবিট কার্ডে সে এসব কাজ করে না। আমি ভিতরের ঘরে ঢুকে আমাদের দুটো স্লিপিং ব্যাগ খাটের নীচ থেকে টেনে বের করলাম। কুমায়ুনে কোথায় যেতে হবে জানি না। কিন্তু ওদিকে এখন ভাল ঠান্ডা হওয়া উচিত। জেটা মুচিতাভাবে এক সপ্তাহের জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র প্যাক করে ঘন্টাখানেক বাদে ড্রয়িংরুমে ফিরে শুনলাম, বাপ্পা কাউকে বলছে, "যা লাগে লাগবে তুমি বুক করে দাও। আর আমার নম্বর দিয়ে দিয়ো।"

কথা শেষ করে সে বলল, "কাল সকাল দশটায় ফ্লাইট। জেট টিকিট কেটে পাঠাচ্ছে।"

"ফ্লাইট ফেয়ার?"

"সে আনেক। পাঠকমশাইয়ের ভালই খসবে।"

"যাক, তা হলে অনেকটা সময় বাঁচল। কাল দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাব।"

"সে যাব। কিন্তু সমস্যা অন্য।"

"আবার কী হল?"

"টনকপুর যাওয়ার ট্রেনটা কাল রাতে লখনউ থেকে ধরা যেত। কিন্তু তাতে টিকিট নেই। জেট পাবে বলে তো মনে হয় না।"

"ওহ! তা হলে তো মুশকিল।"

এর পরের ঘন্টাখানেক বাপ্পার তুমুল ব্যস্ততায় কাটল। নিজের প্যাকিং, চেকটা অনন্তকে দিয়ে কাল ব্যাঙ্কে জমা করানোর জন্য ওর পরিচিত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ফোন, জেটের সঙ্গে দু'বার কথা বলে কনফার্মড হওয়া যে, কাল ট্রেনের টিকিট হচ্ছে না। চন্দ্রমোহনবাবুকে আশ্বস্ত করা যে, আগামিকাল আমরা দুপুরের মধ্যে লখনউ পৌঁছে যাচ্ছি আর সবশেষে আমাদের সুপরিচিত পুলিশ অফিসার অনুরূপ বকসিকে ব্যাপারটা জানিয়ে লখনউ শহরের পুলিশ দফতরে যিনি দায়িত্বে আছেন, তিনি যাতে আমাদের সাহায্য করেন তার ব্যবস্থা করা।

বাপ্পা বলল, "দশটায় ফ্লাইট মানে সাড়ে-আটটার মধ্যে এয়ারপোর্টে ঢুকতেই হবে। কাল সকাল সাতটায় জেটের গাড়ি নিয়ে বিপুল আমাদের বেলতলা রোডের আস্তানায় এসে নক করবে।"

॥ ২ ॥

আজকাল অনেক সকালেই বাইপাসে জ্যাম শুরু হয়ে যায়। তাই এয়ারপোর্ট যাওয়ার জন্য হাতে ঘন্টাদেড়েক সময় রেখে যে কিছু ভুল হয়নি, সেটা আটটা-কুড়ি নাগাদ ডিপারচার গেটের সামনে পৌঁছে বোঝা গেল। লখনউ ফ্লাইটে উঠে দেখলাম, যে রো-তে আমাদের সিট পড়েছে তার উইন্ডো সিটে ছাইরঙের সুট পরিহিত একজন বয়স্ক ভদ্রলোক একটা ইংরেজি খবরের কাগজ খুলে পড়ছেন। আমাদের একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে আবার কাগজে মন দিলেন। এক ঝলক দেখে যা বুঝলাম তাতে এঁর বয়স অনেকটা চন্দ্রমোহনবাবুর মতোই হবে। তবে অভিজাত চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা। গায়ের রং বেশ ফরসাই। পাশে বসতে-বসতে চোখে পড়ল দু'হাতে গোটাচারেক দামি পাথর বসানো আংটি। গা থেকে পারফিউমের হালকা গন্ধ ভেসে আসছে।

মাঝের সিটটায় আমি আর আইল সিটে বাপ্পা বসার পরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম,"টনকপুরের ট্রেনের টিকিট আজ না হোক কাল হয়তো জেট বুক করে দেবে, কিন্তু তারপর?"

বাপ্পা বলল, "জানি না বুঝলি। আগে লখনউতে নামি। আজকের দিনটা তো থাকছি। একবার চন্দ্রমোহনবাবুর ভাই কৃষ্ণমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলা দরকার।"

একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছিল। ফ্লাইট টেক-অফ করার পরে বাপ্পাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ললিতবাবু যে উপাসনা এক্সপ্রেসই ধরেছেন, তার কোনও গ্যারান্টি আছে কি?"

"গুড কোয়েশ্চেন। না, নেই। তবে তাতে কী আসে যায়? আমরা তো কৃষ্ণমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলেই সোজা জেনে নিতে পারি। তবে কোনও জানাই, কাল রাতে বকসির সঙ্গে যখন কথা হল, তখন তাঁকে প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করার কথা বলে দিয়েছি। জাস্ট একটা রুটিন কাজ। আজ জানাবেন বলেছেন।"

ফ্লাইট পুরো ভর্তি। এত লোক লখনউ যাচ্ছে দেখে অবাক লাগছিল। এয়ার হোস্টেস খাবার ও পানীয় নিয়ে ঘুরছেন। আমরা দু'জনে দুটো ফ্রুট জুসের ক্যান নিয়েছি। গাড়িতে আসতে-আসতে অনন্তর বানিয়ে দেওয়া স্যান্ডউইচ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছিলাম। আমার পাশে বসা ভদ্রলোক কাগজ পড়া শেষ করে এবার কফির কাপে চুমুক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে লখনউতে নেমে কোথায় থাকব, কতদিনের প্রোগ্রাম, নেহাতই বেড়াতে যাচ্ছি না কাজে ইত্যাকার কিছু প্রশ্ন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন। এসব ক্ষেত্রে বাপ্পা নিজের পেশার কথা একেবারে বাধ্য না হলে অপরিচিত কাউকে প্রথম আলাপে জানায় না। তাই আমরা বেড়াতেই যাচ্ছি ওঁকে বলতে হল।

ভদ্রলোক নিজের কোটের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন,"মাই নেম ইজ় জগৎ ভার্মা। লখনউতে কোথায় পুট আপ করছেন?"

বাপ্পা কার্ডটা নিয়ে ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেটা খানিকক্ষণ দেখে জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল। চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম ইনি একজন হোটেল মালিক। লখনউতে হোটেল আছে। আরও কয়েকটা জায়গাতেও আছে। সেসব জায়গার নাম আমার জানা নেই। তবে জয়দীপ এবারে বাপ্পাকে কয়েকটি হোটেল ডিটেল্স হোয়াটস্অ্যাপ করে পাঠিয়েছে। বাপ্পা ওঁকে জানাল কোথায় উঠবে সেটা এখনও ঠিক করেনি।

মিঃ ভার্মা বললেন, "ঠিক আছে। আপনারা চাইলে আমার ওখানেও চলে আসতে পারেন। আমার হোটেল আমিনাবাদে। একেবারে হার্ট অফ দ্য সিটিতে। সব রকম ফেসিলিটি পাবেন। আর যদি কুমায়ুন রেঞ্জে যাবেন বলেন তা হলেও আমি সাহায্য করতে পারি।"

বাপ্পা স্মিত হেসে বলল, "সেটা আপনার কার্ড থেকে বুঝেছি। পিথোরাগড়, লোহ্যাঘাট আর চম্পায়তে আপনার হোটেল আছে জেনে ভাল হল।"

"কী জানেন, ওই দিকটায় এখন গেলে সবকটা রেঞ্জ খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পাবেন। আমার একজন বিজনেস পার্টনার আছে। পরমদেব কউল। পরম ওই হিল্সের ব্যাপারটা আমার চেয়েও ভাল জানে। আমি

বলে দেব। ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। আর এমনিতেও যেখানেই উঠুন, একবার আমার ওখানে আজ আসুন না। আমি আপনাদের ইনভাইট করছি। বেস্ট অফ লখনউই খাবা খাবেন আমার ওখানে। আমিনাবাদ আবার শপিংয়ের একটা বিরাট মার্কেট প্লেস। চান তো সেটাও ঘুরিয়ে দেব।"

"সো নাইস অফ ইউ মিঃ ভার্মা। আজ পারব কিনা জানি না, তবে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগল। আসব নিশ্চয়ই। বাই দ্য ওয়ে, আপনি কলকাতায় কোথায় এসেছিলেন?"

"আমার এক রিলেটিভের ম্যারেজ পার্টি ছিল। দিনপাঁচেক আপনাদের শহরে কাটিয়ে গেলাম।"

বাকি রাস্তা আর কিছু টুকটাক কথা হল। তবে সেসবই ওঁর ব্যবসা আর পাহাড়ের সৌন্দর্য নিয়ে। লাগেজ সংগ্রহ করার জন্য কনভেয়ার বেল্টের সামনে যখন দাঁড়িয়েছি, বাপ্পা দুটো নতুন তথ্য দিল। প্রথমটা, এক অদ্ভুত সমাপতন। জেট যে তিনটে হোটেলের নাম দিয়েছে তার মধ্যে একটা হল ভার্মাস গোল্ডেন রিট্রিট। বাপ্পা একটু হেসে বলল, "কোনও হোটেল সম্পর্কেই তো তেমন কিছু জানি না। এঁর ওখানে উঠব ভাবছি। কী বলিস?"

বললাম, "বাহ! তাই নাকি? দারুণ ব্যাপার। এঁকে দেখে তো বেশ বড়লোক বলেই মনে হচ্ছে। হোটেল খারাপ হওয়া উচিত নয়। তবে একবার রুম টারিফ দেখে নিলে হত না?"

"এই তো মোবাইল থেকে দেখে নিলাম। ইট্‌স ওকে। চল, একদিনের তো ব্যাপার। ভদ্রলোক খুশিই হবেন। ওই দেখ, লাগেজ নেবেন বলে সামনে দাঁড়িয়েছেন।"

বললাম, "কী অদ্ভুত সব ব্যাপার হয় না মাঝে-মাঝে!"

বাপ্পা একটু এগিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল। আধমিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক বিস্ময়বিষ্ট হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে হাত নেড়ে একগাল হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে গেলে যেন নতুন করে পরিচয় হচ্ছে এমনভাবে আবার করমর্দন করলেন, "আমি ভাই ভারী আনন্দিত হয়েছি। চলুন তবে। আমার গাড়ি এসেছে। আর আলাদা করে আপনাদের যেতে হবে না।"

সেইমতো সব ঠিক হল। আমরা ওঁর গাড়িতে উঠতে-উঠতে বুঝলাম, রোদ উঠলেও এখানে কলকাতার চেয়ে ঢের বেশি ঠান্ডা। দ্বিতীয় খবরটা খানিক চিন্তার। আর সেটা হল, ললিতবাবু উপাসনা কেন লখনউগামী কোনও ট্রেনেই সেদিন ট্যাভেল করেননি। এটা অনুরূপ বকসি বাপ্পাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানিয়েছেন। বাপ্পা ফ্লাইট থেকে নেমে সেটা দেখেছে। উনি জানিয়েছেন, হোটেলে ঢুকে বাপ্পা একবার যেন ওঁকে ফোন করে। উনি অন্যান্য লাইন মারফত জানার চেষ্টা করছেন ললিতবাবু কোন পথে গিয়েছিলেন।

লখনউ ভারতের বহুপ্রাচীন এক ঐতিহাসিক শহর। এখানে নাকি ইতিহাস আজও কথা বলে। শহরের মাঝখান দিয়ে গঙ্গার শাখা গোমতী নদী বয়ে যাচ্ছে। সরযূও এসে গোমতীতে মিলেছে। যারা শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা করেন তাঁদের জন্য একটা আলাদা ঘরানা আছে, যার নাম লখনউ ঘরানা। শহর জুড়ে প্রচুর সাইকেল, রিকশা আর টাঙ্গা চলে। টাঙ্গায় করে দিব্যি শহর ঘুরে নেওয়া যায়। এমনিতেও রাস্তায় প্রচুর গাড়ি চোখে পড়বে। ছেলেবেলা থেকে ভুলভুলাইয়ার কথা শুনে আসছি। শহরের পশ্চিম দিকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে নবাবের দুর্গের পাশে আছে বড়া ইমামবাড়া। দুশো বছরের বেশি প্রাচীন এই প্রাসাদপুরীর চার তলায় নির্মিত হয়েছে এক আশ্চর্য গোলকধাঁধা। সেটাই হচ্ছে ভুলভুলাইয়া। এর কিছু দূরে আছে হজরতগঞ্জে রানা প্রতাপ মার্গে অবস্থিত ছোটা ইমামবাড়া। কিন্তু আমাদের এ যাত্রা সেসব দেখার সময় হবে কিনা বলা শক্ত। আর যেটার আকর্ষণে মানুষ এখানে বেড়াতে আসে তা হল, এখানকার বিরিয়ানি, কাবাবের মতো জিভে জল আনা খাবার। নামী, অনামী প্রচুর দোকান আছে এখানে। আর সেসব বিক্রিও হয় দারুণ।

সিগন্যালে আটকে বিরাট যানজট ছাড়িয়ে হোটেলে আসতে-আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেল। ভার্মার লেগেছিল রিট্রিটে ঢুকে প্রথম যেটা চোখে পড়বে সেটা হল, ঝকঝকে রিসেপশন। মালিক অফিসে ঢুকলে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। তবে এখানে সেই বাড়াবাড়ি নেই। আমাদের ঘর পছন্দ করতে দিয়ে সঙ্গে ওঁর অল্পবয়সি ছেলের সঙ্গে ভার্মা আলাপ করিয়ে দিলেন। এই ছেলেটিই আমাদের চারতলা হোটেলের দুই আর তিনতলার কয়েকটি ঘর দেখাবে। ছেলেটির নাম মঙ্গল। বাপের চেয়ে দেখতে অনেকটাই উজ্জ্বল আর বেশ লম্বা। কথাবার্তায় যাকে বলে বেশ স্মার্ট।

ভার্মা একটু কেতাবি কায়দায় বললেন, "ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি জাস্ট একটু ফ্রেশ হয়ে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। ততক্ষণ মঙ্গল আপনাদের সঙ্গে থাকছে। একসঙ্গে লাঞ্চ করব কিন্তু।"

"শিওর, আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন। আমরাও আসছি।"

ভদ্রলোক সোজা করিডর ধরে এগিয়ে গেলেন। তিনতলায় গোটাদুয়েক ঘর দেখে তার একটা আমাদের পছন্দ হল। বেশ বড় ঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। আজকাল যেমন একটু ভাল হোটেলে হয় আর কী! আমরা সকালেই স্নান সেরে বেরিয়েছিলাম। তাই একটু মুখহাত ধোয়া ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। মঙ্গলকে এক বোতল জল চাই জানাতে সে বলল, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছে। তার পিতাজি এলেই লাঞ্চে যাওয়ার জন্য ডেকে নেবে বলে গেল।

বাপ্পা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে প্রথমেই মিঃ বকসিকে ডায়াল করেছে। দু'বার নম্বর বিঞ্চি পেয়ে ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি বললাম, "একটা ব্যাপার মাথায় এসেছে রে।"

ব্যাগ খুলতে-খুলতে সে বলল, "বলে ফেল।"

"হোটেলের খাতায় নামধাম লিখতে গেলে সেখানে পেশার ব্যাপারটা উল্লেখ করতে হবে তো।"

"জানি, মাথায় আছে। আমি সার্ভিস করি। তুই একজন লেখক। এতেই চলে যাবে।"

"ব্যস?"

"ব্যস।"

বকসি ফোন করেছেন। মিনিটপাঁচেক কথা বলে যেটা জানা গেল তা হচ্ছে, ললিতবাবু লখনউ রুটে ফ্লাইও করেননি। বাপ্পা ওঁকে বলে দিল দিল্লি আর কানপুর রুটটাও ট্র্যাক করতে। লখনউ আসার অনেক রাস্তার মধ্যে এ দুটো বেশ সহজেই ধরা যায়। এই ফোনটা রাখতে না-রাখতে আরও দুটো ফোন এল। প্রথমে চন্দ্রমোহনবাবু। আমরা এসে পৌঁছলাম কিনা সেটা জানার জন্য। ওঁর ভাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক। আমরা চাইলে এখানেই আসতে পারেন। বাপ্পা চাইল না। সে চায় বাইরে মিটিংটা হোক। তাই ওঁকে সেই কথাই বলে দিল। এর মিনিটকতক বাদেই মঙ্গল আমাদের লাঞ্চে ডাকতে এসেছে। বেরতে যাব এমন সময় আবার ফোন। এবারে কৃষ্ণমোহনবাবু। বাপ্পা আমাকে ইশারায় মঙ্গলের সঙ্গে এগোতে বলে কথা বলতে ব্যস্ত হল। আমি দোতলার ডাইনিং হলে গিয়ে দেখলাম, মিঃ ভার্মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁকে বলতে হল যে, বাপ্পা আসছে। খানিক বাদেই বাপ্পা চলে এল। কী কথা হল সেটা অবশ্য পরে শুনে নিতে হবে।

আমাদের সঙ্গে কথা বলেই মিঃ ভার্মা খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন। এবারে সেটা আসার আগে বললেন, "লাঞ্চ করে আপনারা একটু রেস্ট করে নিন। বিকেলে একবার না হয় শহরটা ঘুরে আসবেন। তবে ভুলভুলাইয়াতে গেলে আগেই বেরনো ভাল। এখন তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়। রেসিডেন্সিও তাই।"

বাপ্পা বলল, "আজ শহরে এমনিই একটু ঘোরাফেরা করি। সাইটসিয়িং না হয় কাল সকালে করব। এখানে যা-যা দেখার আছে সেসব তো একেবেলাতেই হয়ে যাবে, তাই না?"

ভার্মা বললেন, "দ্যাট ডিপেন্ডস সো আপনি কতটা টাইম কোথায়

দেবেন তার উপরে। তবে যদি দশটা নাগাদ বেরবেন ভাবেন, তবে আড়াইটে-তিনটের মধ্যে মেন স্পট সব দেখা হয়ে যাবে।''

''আমরা ভাবছি আজ একটু পায়ে হেঁটেই শহরটা দেখব। কাছাকাছির মধ্যেই।''

''ওকে। আর লখনউ থাকছেন কতদিন? এখান থেকে কি আর কোথাও যাবেন?''

বাপ্পা জবাব দেওয়ার আগে খাবার এসে গিয়েছে। তন্দুরি রুটি, মালাই কাবাব আর মটিন লাবাবদার।

ওয়েটার খাবার সার্ভ করার পরে বাপ্পা বলল, ''টানকপুর গিয়ে সেখান থেকে কুমায়ুন ঢোকার ইচ্ছে আছে। তারপর দেখা যাক।''

''দেখা যাক বললে হবে না। এখন টনকপুর যাওয়ার টিকিটের খুব ডিম্যান্ড। আপনি চাইলেও এমনিতে পাবেন না। যদি বলেন তবে আমার ট্র্যাভেল এজেন্টকে বলে আমি বুক করাবার একটা চেষ্টা করতে পারি।''

বাপ্পা বলল, ''আমার যে ছেলেটি কলকাতায় এসব করে তাকে বলেছি আগামিকালের জন্য দেখতে। বলেছে হয়ে যাবে। না হলে তখন আপনি তো আছেনই।''

''ওকে। দ্যাটস ফাইন। তা হলে আপনার ওদিককার রুটটাও কী হবে সেটা নিশ্চয় ভেবেছেন?''

''নাহ। আছি তো আজ। কথা হবে। আপনার শেফকে বলবেন রান্নাগুলোর কোনও জবাব নেই। অসাধারণ।''

মিষ্টি হেসে উনি বললেন,''অবশ্যই বলব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।''

ঘরে ফিরে এসে বাপ্পাকে চন্দ্রমোহনবাবুর ভাইয়ের সঙ্গে কী কথা হল জিজ্ঞেস করলাম। সে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, ''আজ বিকেলে সাড়ে চারটে নাগাদ হজরতগঞ্জের সাহারা মলের সামনে উনি আমাদের মিট করবেন। সেখানেই একটা কফি শপে বসে কথা হবে।''

''আর টনকপুর গিয়ে তারপর?''

''সেটাই ভাবছি। টেকিং রুট তো আর একটা নয়। ললিতবাবু যদি এদিক দিয়েই গিয়ে থাকেন তবে আশা করা যায় চম্পায়ত, লোহাঘাট বা পিথোরাগড় এসব রাস্তা দিয়েই গিয়েছেন। আমি যত দূর জানি তাতে অ্যাবট মাউন্ট দিয়ে একটা টেকিংয়ের রাস্তা আছে। কিন্তু সে যদি থেকেও থাকে একজন সেদিকে কত দূর গিয়ে থাকতে পারে?''

আমি বললাম, ''আর-একটা কথা বাপ্পা, অনেক ক'টা দিন চলে গিয়েছে। ভদ্রলোক আদপে জীবিত আছেন তো?''

বাপ্পা বলল, ''এ ব্যাপারটা আরও বেশি করে আমায় ভাবাচ্ছে। এখন যেটা দরকার সেটা হল, কিছু তথ্য। কিন্তু সেটা কে দিতে পারবে?''

''কৃষ্ণমোহনবাবু?''

''তিনি খুব কিছু জানেন বলে তো আমার মনে হয় না। দেখা যাক।''

॥ ৩ ॥

আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে হজরতগঞ্জ খুব দূরে নয়। একটা অটোতে করে সময়মতো সাহারা মলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ফোনে যোগাযোগ করে নেওয়ায় পারস্পরিক খোঁজাখুঁজিতে দেরি হয়নি। কৃষ্ণমোহনবাবুর সঙ্গে ওঁর ভাইয়ের মুখের মিল ভালই। তবে ইনি একটু মোটাসোটা গড়নের। ওঁকে অনুসরণ করে আমরা একটা কফিশপে ঢুকলাম। ভদ্রলোক কফির অর্ডার দেওয়ার পরে বাপ্পা জানতে চাইল, ''আচ্ছা ললিতবাবু সেদিন কখন আপনার বাড়ি এসে উঠেছিলেন মনে পড়ে?''

একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, ''বেলার দিকে। তা ধরুন প্রায় একটার কাছে। কেন বলুন তো?''

''এইজন্য বলছি কারণ, উনি যে ট্রেনে আসবেন বলে ওঁর বাবাকে বলে এসেছিলেন সে ট্রেন সকালে সাড়ে-সাতটার মধ্যে লখনউতে ইন করে যাওয়ার কথা। তা হলে এত দেরি হবে কেন?''

''ওহ্ এই ব্যাপার! শীতকালে সব ট্রেন কুয়াশার জন্য চার-পাঁচ ঘণ্টা লেট থাকে। সেদিন ওর ট্রেনটাও তাই-ই ছিল। ও এসে তাই আমাকে বলল। সে তো আমি দাদাকে বলে দিয়েছিলাম।''

''কিন্তু আমি খবর পেয়েছি সেদিন ওই ট্রেনে উনি আসলে ওঠেননি। পুলিশ আমায় ভেরিফাই করে জানিয়েছে।''

''সে কি! এটা তো মাথায় আসেনি। এরকম ব্যাপার কেন?''

''সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন মিঃ পাঠক। এর চেয়েও বড় প্রশ্ন, তিনি কোন দিক দিয়ে লখনউ এলেন? বাড়িতে এই মিথ্যেটা বলার দরকার পড়ল কেন? গোলমাল কিছু আছে নিশ্চয়ই।''

কৃষ্ণমোহনবাবুর মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে ভেবে কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। আপাত স্বাভাবিক ব্যাপার আর সবার মতো তিনিও বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন।

বাপ্পা বলল, ''আচ্ছা এই যে এখান থেকে উনি ট্রেকিংয়ে গেলেন, সঙ্গে কেউ যাবে কিনা বলেছিলেন?''

''নাহ। আমি জানতে চেয়েছিলাম। ও বলল, এখান থেকে একাই যাবে। এক বন্ধু আছে যে নাকি টনকপুর স্টেশনে ওকে মিট করবে।''

''আর কিছু বলেননি? কোন দিকে যাবেন বা কীভাবে যাবেন, এসব?''

''আরে এ ছেলেকে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করাই মুশকিল। হুটহাট খেপে যায়। তাও আমি জোর করে ট্রেনে তুলে দিতে স্টেশনে গিয়েছিলাম। বলল, সকালে ট্রেন থেকে নেমে ফোন করবে। তা করেওছিল বুঝলেন। বলল, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। একটা গাড়ি ঠিক করে খানিক বাদে বেরবে। আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম থাকবি কোথায়? হোটেলে বুকিং আছে কিছু? আমায় বলল, সেদিনটা পিথোরাগড় বা লোহাঘাটের মধ্যে কোথাও থেকে যাবে। পরেরদিন সকাল-সকাল বেরবে।''

বাপ্পার চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ পড়েছে। কফি দিয়ে গিয়েছে। খানিকক্ষণ ধরে তিনজনেই তাতে চুমুক দিলাম। মিনিট দু'-তিন বাদে সে ওঁকে বলল, ''আপনি এখানে কত বছর আছেন?''

উনি উত্তর দিলেন, ''আমি বরাবর এখানেই থাকি।''

''রিয়েলি? তা হলে আপনার দাদা আর আপনি আলাদা বড় হয়েছেন?''

''একেবারেই না। দাদাও এখানকার মানুষ। কিন্তু লাল্টু মানে, ললিত, একটু বড় হওয়ার পরে দাদা কলকাতায় চলে যায়। লাল্টু তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে।''

''আচ্ছা! এটা তো নতুন খবর।''

''দাদা বলেননি আপনাকে?''

''নাহ। কিন্তু হঠাৎ এই শিফটিং কেন?''

''সে ভারী স্যাড কেস। এখানে তো দাদার রোজগারপাতি খুব বেশি ছিল না। একটা স্কুলে পড়াতেন। আর ওঁর ওই পুজোপাঠ আর সংস্কৃতচর্চা এই নিয়ে থাকতেন। কিন্তু কেন জানি না দাদার চাকরিটা হঠাৎ চলে যায়। নেহাত আমরা পৈতৃক বাড়িতে থাকতাম তাই থাকার অসুবিধে ছিল না। আমি তখন ব্যবসা শুরু করেছি।''

''কিসের ব্যবসা আপনার?''

''তখন ছিল গারমেন্টের ব্যবসা। এখন তার সঙ্গে একটা ছোটখাট ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলেছি।''

''আচ্ছা। কাকার সাহায্য ছাড়াই ভাইপো অন্য হোটেলে গিয়ে থাকবে এটা নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগেনি?''

কৃষ্ণমোহনবাবু একটু হেসে বললেন, ''নিশ্চয়ই নয়। আমি তার থাকার ব্যবস্থা করতেই পারতাম।''

বাপ্পা বলল, ''আপনার দাদার কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারটা কীভাবে ঠিক হল?''

''বউদির বাপের বাড়ির দিকের এক রিলেটিভ একদিন একটা খবর দিলেন যে, বাগুইআটির কাছে নাকি একটা স্কুল আছে যেখানে সংস্কৃত

পড়ানোর লোক নেওয়া হবে। দাদা যদি চেষ্টা করেন তবে চাকরিটা হয়ে যেতে পারে। সেইমতো দাদা সেখানে দরখাস্ত করেন। সেই রিলেটিভের কোনও ভূমিকা ছিল কিনা জানি না। তবে দাদা চাকরিটা পেয়ে যান।"

কৃষ্ণমোহনবাবু থেমেছেন। খানিক সময় নিয়ে বাপ্পা জিজ্ঞেস করল, "এই যে ললিতবাবু কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, তারপরে এখানে কতবার এসেছেন? ওঁর পরিচিত বন্ধু কেউ নিশ্চয়ই এদিকে আছেন?"

উনি বললেন, "এসেছে কয়েকবার। কিন্তু বন্ধুদের কথাটা আমার ভাল জানা নেই। ছেলেবেলায় তো যখন এখানে থাকতেন, তখন দু'-একজনকে দেখেছি। মাঝে-মাঝে আসত। কিন্তু এখন তারা কে কোথায়, কী করছে আর তাদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে কী নেই, সে আমার পক্ষে বলা মুশকিল।"

"কারও নাম মনে আছে?"

এবারে কৃষ্ণমোহনবাবু ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় নিলেন। তারপর বললেন, "একটি ছেলে আসত। তাকে লাল্টু অ্যান্ডি নামে ডাকত। কিন্তু তার ভাল নাম আমার জানা নেই। কোথায় থাকত তাও জানি না।"

"আপনি পুলিশে যোগাযোগ করেছিলেন শুনলাম। আপনার দাদা বললেন।"

"করেছিলাম আমার এক চেনা লোকের মাধ্যমে। কিন্তু টনকপুর, চম্পায়ত আর লোহাঘাট এই তিন জায়গার কেউই আমাকে এখনও পর্যন্ত কোনও খবর দিতে পারেনি। তবে একটা কথা আপনাকে বলতে পারি।"

"কী কথা?"

"ও পথে যদি আপনি যান তা হলে আগে একটু টেকিং রুট কী আছে সে খবর নিয়ে যাবেন। না হলে কিন্তু খুঁজতে-খুঁজতে হন্যে হয়ে যাবেন। আমার কোন হেল্প লাগলে বলবেন। হোটেল, গাড়ি, রেলের টিকিট যা লাগে।"

"নিশ্চয়ই বলব। আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জানা গেল। আজ উঠি।"

বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বাপ্পা জিজ্ঞেস করল, "এখন ওদিকে কেমন ঠান্ডা হবে, বরফ পাব?"

"ব্যাপক হারে ঠান্ডা পাবেন। কালকেই শুনেছি মুন্সিয়ারিতে তিন ডিগ্রি টেম্পারেচার নেমেছে। আর ফ্রেক্সারিতে কি তেমন ট্রেক হয়? এসব তো শুনেছি লোকে মে-জুন বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে করে। এ ছেলের মাথায় কী যে ঢুকল!"

"উনি তো হোটেলে চাকরি করেন শুনলাম। টাকাপয়সা নিশ্চয়ই ভালই পান?"

কৃষ্ণমোহনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, "ইয়ে মানে, আসলে দাদা ওর ব্যাপারে একটু আপসেট। কলকাতা থেকে প্রাইভেটে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাস করে। তারপর কী জানি কোন সোর্সে একদিন শুনলাম কুয়ালা লামপুর যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, বোধ হয় ভাল কিছু পেয়েছে। পরে জানলাম একটা থ্রি-স্টার হোটেলে রিসেপশনিস্টের কাজ করছে। তাতে দাদা একটু দুঃখ পেয়েছিলেন। মাইনেপত্র তখন বেশি ছিল না। তারপর ও অন্য আর-একটা হোটেলে যায়। সেখানেও একই কাজ। তবে মাইনে বেশি। এবারে তো শুনলাম ও নাকি ম্যানেজারিয়াল রোলে ঢুকবে। সঠিক জানি না।"

বাপ্পা বলল, "রিসেপনিস্ট থেকে একেবারে ম্যানেজার? ইন্টারেস্টিং! আজ তা হলে এগোই।"

ফিরতি পথের অটোতে উঠে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার তো বেশ জটিল রে!"

বাপ্পা বলল, "তথ্য বড় কম নীল। ফিরে গিয়ে একটু নেট ঘাঁটতে বসতে হবে। তুই একবার জেটকে ফোন করে জেনে নিস তো কালকের টিকিটের কী ব্যবস্থা হল।"

কফিশপের ভিতরে থাকায় ঠিক বুঝিনি বাইরেটা কেমন। অটোতে আসতে-আসতে বেশ ভাল ঠান্ডা লাগছিল। হোটেলে ঢুকে সোজা আমরা ঘরে চলে এলাম। বাপ্পার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, সে যথেষ্ট চিন্তিত। আমি আর সময় নষ্ট না করে জেটকে ফোনের জন্য নম্বর ডায়াল করলাম। আজ অবশ্য সে বলল, "ভাববেন না দাদা। এখন ওয়েটিং চলছে। কিন্তু কাল এটা কনফার্ম হয়ে যাবে।"

কোথায় উঠেছি সে জিজ্ঞেস করায় তাকে এখানকার কথা জানিয়ে আর "থ্যাঙ্ক ইউ" বলে ফোন রেখে দেখলাম আমার বন্ধুটির ফোন বাজছে। অনুরূপ বকসি। এক দিকের কথা শুনলাম আর সেটাই লিখছি।

"বলুন, কানপুর? সেদিনই? আচ্ছা, তা হলে বাকিটা? ইয়েস, ইয়েস। থ্যাঙ্কস আ লট।"

ফোন ছেড়ে বাপ্পা বলল, "বেকার এটা নিয়ে এত ভাবছিলাম রে।"

"কেন? কী বললেন উনি?"

"আমার ধারণা চন্দ্রমোহনবাবু অনন্যা আর উপাসনার মধ্যে গুলিয়েছেন। ললিতবাবু সম্ভবত সেদিন শিয়ালদা থেকে অনন্যা এক্সপ্রেসে ওঠেন। বেলা একটা নাগাদ সে ট্রেন ছাড়ে। পরের দিন সকাল সাতটায় কানপুরে আসার কথা। আর কানপুর টু লখনউ অজস্র ট্রেন আছে। একঘণ্টার জার্নি। আমার ধারণা, কুয়াশার জন্য এখন যেহেতু সব ট্রেনই দেরি করে যাচ্ছে, তাই হয়তো ওঁর দেরি হয়ে থাকবে।"

"কিন্তু ভাই একটা প্রশ্ন যে থেকেই যায়। আর সেটা হল ওঁর কাকাকেও উনি একই ট্রেনের নাম বলেছেন। অনন্যার কথা বলেননি কিন্তু। এই কয়েকঘণ্টার ফারাকটা সেইজন্যই আরও রহস্যময় হয়ে উঠছে।"

"রাইট নীল। এটা ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথায় আসেনি। ইন ফ্যাক্ট, কানপুর টু লখনউ উনি বাই রোডও আসতে পারেন। সেটা করেছিলেন কিনা তাই বা কে জানে! এটা ভাবার দরকার আছে।"

দরজায় কেউ নক করছে। উঠে গিয়ে দেখি মিঃ ভার্মা দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আর-একজন ব্যক্তি।

ভিতরে এসে বসার জন্য অনুরোধ করলাম। ভদ্রলোক এসে একটা চেয়ারে বেস পাশের আর-একটিতে তাঁর সঙ্গীকে বসতে বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার বিক্সনেস পার্টনার পরমের কথা বলছিলাম, এই সেই পরম।"

আমরা দু'জনেই হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে 'হাউ ডু ইউ ডু' দিয়ে পরিচিত হলাম। ভদ্রলোকের বয়স মধ্যচল্লিশ হবে। ভীষণ স্মার্ট চেহারা। আন্দাজ প্রায় ফুটছয়েক লম্বা। কিন্তু মেদহীন শরীর। ফরসা চেহারায় একটা গোঁফ বেশ মানিয়েছে। তুঁতে রঙের সুট পরে এসেছেন।

মিঃ ভার্মা বললেন, "পরম আসলে চম্পায়ত আর পিথোরাগড়ের মধ্যে শাট্‌ল করে। কালই আবার যাচ্ছে। তা আমি ভাবলাম আপনারা যদি ওদিকে যাবেন বলেন, তবে পরম আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাতে পারে।"

পরমদেও বললেন, "এমন সব স্পট আছে বেশির ভাগ লোকে যেসবের নাম জানে না। নেচারের বিউটি আপনাদের মাতিয়ে দেবে। এক সে বড়কর এক স্পট। আমি নিজে আপনাদের নিয়ে যাব।"

বাপ্পা বলল, "খুব ভাল। কিন্তু কবে কোথায় যাব বা কী করব সেসব নিয়ে আমাদের এখনও প্ল্যানিটা হয়নি।"

"প্ল্যান করে নিন না," ভার্মা বললেন, "সেজন্যই তো ওকে..."

একটা ফোন এল, ওঁরই।

"এক্সকিউজ মি," বলে ফোনটা ধরে একমনে কিছু শুনে গেলেন। তারপর ওপারে কাউকে বললেন, "ঠিক হ্যায়। তুম তালাশ চালাতে রহো।"

ফোনটা কেটে দিয়ে যখন আমাদের দিকে তাকালেন, তখন একটু আগের মেজাজে লোকটিকে আর দেখলাম না। তার বদলে খানিক

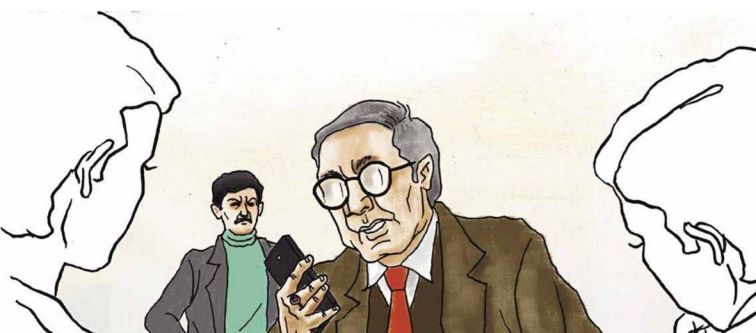

চিন্তিত এক বয়স্ক লোকের ছবি দেখছি মনে হল। আমরা সকলেই চুপ। একটু বাদে উনি নিজেই আবার বললেন, ''হ্যাঁ তো কী বলছিলাম যেন!''

বাপ্পা সে কথার ধারপাশ না মাড়িয়ে বলল, ''এনিথিং রং মিঃ ভার্মা? এনি প্রবলেম?''

উনি একটু চিন্তা করে বললেন, ''ইয়েস। আ বিগ প্রবলেম। বাট আপনারা সেসব শুনে কী করবেন?''

''কী হয়েছে জানতে পারি কি?'' বাপ্পা মনে হল রহস্যের গন্ধ পেয়েছে।

''মাই ম্যানেজার হ্যাজ বিন মিসিং ফর সে অ্যাবাউট আ উইক। সে আমার তিন হোটেলের কাজকাম দেখত। ইন-ফ্যাক্ট পরম পিথোরাগড়ে বেশি টাইম দিত। আর আনন্দ মানে আমার সেই ম্যানেজার, ওর সঙ্গে লিয়ার্জ করত আর সেইসঙ্গে লোহাঘাট আর চম্পায়তের ফুল চার্জ সামলাত।''

বাপ্পার দিকে একবার তাকালাম। সে কিছু তথ্য চাইছিল। এই তথ্য দিয়ে কি তার কাজ হবে?

সে জানতে চাইল, ''মিসিং কবে থেকে আর কীভাবে?''

''ওই তো এক সপ্তাহ হয়ে গেল। তার আগে ছুটি নিয়েছিল। ওর কোন রিলেটিভের বিয়ে আছে বলে দিল্লি গেল। তারপর ওর কী কাজ আছে বলে আরও দু'দিন সেটা বাড়াল। লাস্ট মানডে চম্পায়তে ফেরার কথা। ফিরেওছিল শুনলাম। আমার সঙ্গে কথা হয়নি। তারপরের দিন থেকে সে লা পাত্তা।''

বাপ্পা একমনে কী যেন ভেবে চলেছে। আর সেটা যে কী, আমি বোধ হয় বুঝতে পারছি। কিন্তু সে কি এবার নিজের পরিচয়টা দেবে? দিয়ে বলবে যে কেন আমরা এখানে এসেছি? মিনিটখানেক সবাই চুপচাপ বসে আছি। আমি আসলে অপেক্ষা করছি এই বুঝি সে ললিতবাবুর ব্যাপারটা বলে দেয়। দেবে কি?

দিল না। উলটে জানতে চাইল, ''পুলিশে খবর দিয়েছেন?''

''দিয়েছি। তারা কোনও ফিড-ব্যাক দিতে পারেনি,'' বললেন মিঃ ভার্মা।

''ভদ্রলোকের পুরো নামটা কী?''

''আনন্দ ত্রিবেদী।''

''এখানকারই লোক, না বাইরে থেকে এসেছিলেন?''

''না-না। এখানকার ছেলে। লোক কী বলছেন, ওর বয়স তিরিশও হয়নি। অসম্ভব ডায়নামিক। প্রখর বুদ্ধি ধরে। পরিশ্রমী আর ভীষণ সৎ। আপনি বললে, আপনার জন্য চব্বিশ ঘণ্টাও হাসিমুখে ডিউটি দিয়ে দেবে। আর কী জানেন, আমাদের ব্যবসাতে ওর উপর সব ব্যাপারে আমরা এত ডিপেন্ড করতাম যে, এই ক'দিনে চোখে অন্ধকার দেখছি। পরম আর একা কত দিক সামাল দেবে?''

বাপ্পা গম্ভীর মুখে বলল, ''বেশ জটিল পরিস্থিতি।''

''আসলে আনন্দ থাকলে আমি বলতাম আপনারা চম্পায়ত চলে যান। ওই সব ব্যবস্থা করে দেবে। এখন যেহেতু সেটা হচ্ছে না। তাই পরমের কথা মাথায় এল।''

''চা চলবে? একটু চা বলি সবার জন্য?'' এটা এবার আমিই বললাম।

''চলতে পারে। আমি বলে দিচ্ছি,'' পরমদেও উঠে গিয়ে ঘরের ইন্টারকম থেকে অর্ডার দিলেন।

বাপ্পা বলল, ''আমাদের কাল রাতের নৈনিতাল এক্সপ্রেসে টিকিট হয়ে যাবে। পরের দিন সকালে টনকপুর নেমে তা হলে আগে আপনাদের চম্পায়তের হোটেলেই চলে যাব। তারপর ওখানে বসে বাকিটা ঠিক করা যাবে।''

চা আসার পরে সেটা খেয়ে ভার্মা আর পরম বিদায় নিলেন। আমরা

জানালাম সাড়ে ন'টা নাগাদ ডিনারে যাব। তখন আবার দেখা হবে। ওরা চলে যাওয়ার পরে আমি সবে ওকে জিজ্ঞেস করতে যাব যে, দুটো মিসিং লিঙ্ক কোথাও মিলছে কিনা, কিন্তু তার আগেই দেখলাম সে মোবাইল তুলে দ্রুত কৃষ্ণমোহনবাবুকে ফোনে ধরল। এবারে স্পিকার অন করা আছে।

সে জানতে চাইল, "আচ্ছা ললিতবাবু যে স্কুলে এখানে থাকার সময়ে পড়তেন, সেখানে কাল একবার যাওয়া যায়?"

উনি বললেন, "তা যায়। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো?"

"সে কথায় আসছি। তার আগে বলুন স্কুল খোলে কখন?"

"তা ধরুন দশটা নাগাদ। আপনি যাবেন?"

"যাব। আপনি বলুন কোথায় মিট করা যায়?"

একটু ভেবে উনি বললেন, "আপনি বরং আবার ওই সাহারা মলের সামনেই চলে আসুন। আমি গাড়ি নিয়ে ওয়েট করব। সাড়ে ন'টা নাগাদ এলেই হবে। গাড়িতে মিনিটকুড়ির পথ। ইয়ে, মানে কী কারণে যাবেন সেটা যদি বলতেন?"

"মিঃ পাঠক, ললিতবাবুর এক বন্ধুর কথা আপনি বলছিলেন না আজ? আমি তার ব্যাপারে একটু খবর নিতে চাই। আমার জানা দরকার আনন্দ ত্রিবেদী নামে কেউ ওঁর সঙ্গে পড়তেন কিনা।"

"আনন্দ ত্রিবেদী?"

"হ্যাঁ, নামটা শুনেছেন কোনওদিন?"

"না স্যার, মনে পড়ছে না। দাদা হয়তো জানতে পারে। যদি বলেন তো কথা বলতে পারি।"

"দরকার নেই। আমিই ওঁকে ফোন করব। কাল সকালে দেখা হচ্ছে। গুড নাইট।"

"গুড নাইট।"

ফোন রাখার পরে তার মুখ দেখে মনে হল যেন সে সামান্য উত্তেজিত। একটু অস্থির হয়ে উঠলে ঘরে তাকে আগেও পায়চারি করতে দেখেছি, এখনও দেখলাম। আর এবার জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, "তোর কি ধারণা আনন্দ ত্রিবেদীই ললিতবাবুর সেই বন্ধু?"

চাপা স্বরে সে বলে উঠল, "হতে পারে, আবার নাও পারে। জাস্ট একটা কৌতূহল।"

খেতে বসে বাপ্পা পরমদেওকে জিজ্ঞেস করল, "কাল কখন বেরচ্ছেন?"

পরম বললেন, "আমি সকালে বাই রোড স্টার্ট করছি। এখান থেকে দশটায় বেরতে পারলে সন্ধ্যা নাগাদ চম্পায়ত তে যেতে পারব। রাতটা ওখানে থেকে সকালে পিথোরাগড়ের দিকে রওনা হতে পারি। আনন্দ না থাকায় এখন তো চম্পায়তেও সময় দিতে হচ্ছে।"

"সে তো বটেই।"

"আপনাদের কী প্ল্যান?"

বাপ্পা রুটির সঙ্গে এসেলা তরকা নিয়েছে। খানিক রুটি চিবিয়ে বলল, "আমরাও আগে চম্পায়ত যাব। তারপর দেখি, দু'-একদিন থাকব।"

"মায়াবতী যাবেন কিন্তু। আর লোহাঘাটে এসে অ্যাবট মাউন্টটা মিস করবেন না। যদি মনে করেন পিথোরাগড় আসবেন, তা হলে বলবেন। ওখান থেকে ধরচুলা কাছে হবে। বেরিনাগ যেতে পারেন। আরও এগোলে মুন্সিয়ারি পাবেন। একটা কথা বলে রাখি মিঃ ভচ্চারিয়া। এদিকে সিনিক বিউটি যা পাবেন তা কুমায়ুনের অন্য দিকে গেলে পাবেন না। এ আমি হলফ করে বলে দিতে পারি।"

বাপ্পা বলল, "ওদিকটায় গেলে আপনাকে তো নিশ্চয়ই বলব।"

তারপর মিঃ ভার্মার দিকে তাকিয়ে বলল, "আনন্দ ত্রিবেদী এখানে কত বছর কাজ করতেন?"

ভার্মা একটু ভেবে বললেন, "তা ধরুন, বছর পাঁচ-ছয় হবে।"

"এই হোটেলে কাজ করেননি?"

"করেছে। এখানেই তো প্রথমে ছিল। তারপরে ওর এফিশিয়েন্সি দেখে আমি ওকে চম্পায়তে পাঠাই। সেখানে তখন নতুন হোটেল খুলেছি। দেখাশোনা করার লোক দরকার। তাকে যখন সেটা জানাই সে কিন্তু এককথায় রাজি হয়ে চলে গেল। আর কী দারুণ ও টেক-ওভার করল আপনি ভাবতে পারবেন না। বলতে পারেন ওর উৎসাহেই আমি এক-একে লোহাঘাটে আর পিথোরাগড়ে আরও দুটো হোটেল বছরদুয়েক আগে খুলি।"

"আপনি খুব মুশকিলে পড়ে গিয়েছেন বুঝতে পারছি।"

"মুশকিল মানে মুশকিল। টাকাপয়সার হিসেব থেকে কিচেন সবই তো ও দেখত। আমায় কিছু ভাবতেই দেয়নি। আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে, হঠাৎ করে ওর কী হল? নির্ঘাত কোন দুর্ঘটনায় পড়েটড়ে..."

"আপনি পুলিশে খবর দেননি?"

"দিয়েছি তো। কিন্তু তারা ওই অঞ্চলে এতই অকর্মণ্য যে আজ পর্যন্ত কোনও খবরই দিতে পারেনি।"

আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ত্রিবেদী সম্পর্কে আরও কিছু সাধারণ কথাবার্তা শুনে ঘরে ফিরে এলাম। যে ফ্লোরে আছি সেই ফ্লোরেই মিঃ ভার্মাও একটা ঘরে থাকেন করিডরের শেষপ্রান্তে। আমাদের ঘর যে রো-তে, ওঁরটা তার উলটো দিকে কোনাকুনি। আমরা একই সঙ্গে খেয়ে এসে যে যার ঘরে ঢুকে গিয়েছি। অনেক সকালে আজ ঘুম থেকে উঠেছি। অনেকক্ষণ ধরে ঘুম পাচ্ছিল। তাই ঘরে ফিরে এসে এগারোটা নাগাদ শোয়ার তোড়জোড় করে ফেলার উদ্যোগ নিলাম। বাপ্পার ঘুমোবার কোনও লক্ষণ নেই। সে কুমায়ুনের একটা গাইডবই খুলে বিছানায় গা হেলিয়ে দিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কতক্ষণ জানি না। কিন্তু একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। দরজা খোলার শব্দ। নাইট ল্যাম্পটা জ্বলছে। পাশের খাটে বাপ্পা নেই। কেমন একটা খটকা লাগল। সে গেল কোথায়? দরজা খুলে বাপ্পই যে বাইরে গিয়েছে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

এক ঝটকায় উঠে বাইরের করিডরে বেরিয়ে এসে দেখি সে নিঃশব্দে মিঃ ভার্মার দরজায় আড়ি পেতেছে। আমার পায়ের শব্দ হয়তো পেয়ে থাকবে। এক লহমায় ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখে হাতের ইশারায় ডেকে নিল। আমি ডাইনে-বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে নিমেষে তার ঘাড়ের কাছে পৌঁছে গেলাম। প্রায়ান্ধকার করিডরে আমরা ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু কী জন্য এখানে আমার বন্ধুটি দাঁড়িয়ে আছে? ভিতরে একটা উত্তপ্ত গলার স্বর। হিন্দি-ইংরেজি মেশানো। ভার্মা কাউকে বলছেন, "আই ডোন্ট বিলিভ হোয়াট ইউ আর সেয়িং। তুম হাদ সে বহুত আগে বাড় চুকে হো।"

অপরপক্ষ কিছু বলছে। সেটা ফোনে হবে। তাই সাময়িক বিরতি।

"নো, নো। এক প্যায়সা নেহি দুঙ্গা। যো জি মে চাহে করলে না।"

আবার বিরতি।

"আই হ্যাভ বিন হিয়ার ফর লাস্ট টু ডিকেড্‌স। আই নো হাউ টু প্রোটেক্ট মাইসেফ আউট হাউ টু সেভ মাই মানি। আই ওয়ার্ন ইউ কী ফিরসে মেরে পিছে মত পড়হো।"

কথা শেষ? সম্ভবত। কারণ, আধ মিনিট সব চুপচাপ। কেউ কিছু বলছে না তো! বাপ্পা আমার হাত ধরে টান দিয়েছে। দ্রুত ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঘুম ছুটে কোথায় পালিয়েছে। ঘরে ঢুকে এসেছি। জানতে চাইলাম, "কী ব্যাপার বল তো? তুই হঠাৎ বাইরে গিয়েছিলি কেন?"

বাপ্পা নাইট সুটে সজ্জিত। সে বলল, "তুই ঘুমোচ্ছিস, আমার ঘুম আসছে না। ভিতরে সব বন্ধ। ভাবলাম করিডরে বেরিয়ে একটু পায়চারি করি। উঠে বাইরেই যেতাম। দরজার কাছে যেতে-যেতে শুনলাম একটা লোক খটখট শব্দে হেঁটে যেতে-যেতে উত্তপ্ত গলায় কাউকে কিছু বলতে-বলতে যাচ্ছে। মনে হল, ভার্মাই হবেন। একটা কথা কানে এল, 'কেয়া করোগে তুম? মার ডালোগে মুঝে?'

"দ্রুত কথাটা দূরে চলে গেল। আমার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠল। খানিক সময় এই দরজায় কান পেতে অপেক্ষা করলাম। উদ্দেশ্য

কোথাও দরজা বন্ধের শব্দ পাওয়া যায় কিনা সেটা শোনা। শোনা গেল। এবার পা টিপে-টিপে আন্দাজে ভর করে ভার্মার ঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। যত এগোই তত সেখান থেকেই কথা ভেসে আসে। আর সন্দেহ রইল না যে তিনিই কথা বলছেন। বাকিটা তো শুনলি।''

''লোকটা কে? আর সে কোথায়?''

''প্রথমটা জানি না। দ্বিতীয়টা সম্ভবত ঘরে নয়। উত্তপ্ত সংলাপ মোবাইলে হলে অবাক হব না।''

''এটা ভাল বলেছিস। হতেই পারে।''

ঘড়ি বলছে রাত প্রায় একটা বাজে। আমি বাপ্পাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''কিন্তু কী নিয়ে কথা হচ্ছে সেটার কোনও হদিশ পাওয়া গেল?''

বাপ্পা জানাল, ''না, এটা বোঝা গেল কেউ ওঁকে থ্রেট করছে। আর উনি তাতে পাত্তা দিচ্ছেন না। কিন্তু খুব স্বস্তিতেও নেই। ভাবছি যেটা...''

সে থেমে গিয়েছে। তার মুখে চিন্তার ছাপ। এ আমার চেনা লক্ষণ। একটু বাদে বললাম, ''শেষ কর।''

''হ্যাঁ, ভাবছি এর সঙ্গে আনন্দ ত্রিবেদীর নিখোঁজ হওয়ার কোনও কারণ নেই তো?''

''ভেবেছিস ভাল। কিন্তু তার তো কোনও কারণ থাকবে। আর সেটা হলে কিন্তু ব্ল্যাকমেলের গন্ধ আছে ভাই!''

''আমিও ঠিক এটাই ভাবছি। তবে কাল সকালের আগে আর এ নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই মীল। এই কেসে বড় দ্রুত সব ঘটে চলেছে। এবার মাথা একটু বিশ্রাম চাইছে। কয়েক ঘণ্টা ঘুম লাগবে। নে, এবার শুয়ে পড়।''

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ঘুমটা আসতে চাইছিল না। কিন্তু শরীর ক্লান্ত বলেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছি একসময়।

॥ ৪ ॥

সকালে ডোরবেলের শব্দে ঘুম ভাঙল। মোবাইল বলছে সাড়ে সাতটা। এক লাফে উঠে পড়ে দরজা খুলে দেখি বেয়ারা 'গুড মর্নিং' করে চামসেত ভিতরে এসে ঢুকল। বাপ্পা ব্রাশ সেরে মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে এসে ঢুকেছে। দু'জনে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্ট করার সময় নেই। মিঃ ভার্মাকে ''আমরা বেরিচ্ছি, দুপুরে লাঞ্চ করলে জানিয়ে দেব,'' ইন্টারকমে বলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ দেখি মঙ্গল কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে। কোথাও যাচ্ছে হয়তো।

আমাদের দেখে বলল, ''কাহাঁ জানা হ্যায় সাব? আইয়ে ম্যায় ছোড় দেতা হু। মেরে পাস কার হ্যায়।''

বাপ্পা একটু ইতস্তত করে বলল, ''নো থ্যাংকস। তুম চলো।''

''আইয়ে না,'' হেসে সে নীচের পোর্টিকোর সামনে এসে আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকল।

এর পরে রিফিউজ করাটা অসভ্যতা। কিন্তু আমি জানি বাপ্পা তাকে জানাতে চায় না আমরা কোথায় যাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে আর অন্যথা হওয়া মুশকিল। সামনের সবুজ গাড়িতে উঠে বসলাম। মঙ্গল আমাদের এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে একটা লালচে বাদামি গামছার মতন কাপড় দিয়ে উইন্ডস্ক্রিন আর স্টিয়ারিংয়ের আশপাশ ভাল করে মুছে নিয়ে উঠে বসে স্টার্ট দিল।

বাপ্পা জানিয়ে দিল, ''আমরা সাহারা মলে যাব।''

ছেলেটি শুনে অবাক হয়ে বলল, ''এত সকালে? সবে তো দোকানগুলো খুলছে!''

বাপ্পা বলল, ''আমাদের এক বন্ধুকে ব্রেকফাস্টে ইনভাইট করতে যাচ্ছি।''

''ওকে স্যারজি। আমি তো কিনা কী ভাবছিলাম।''

''তুমি কোথায় যাচ্ছ?''

''আমি ব্যাঙ্কে। ফাস্ট আওয়ারে ঢুকে কাজ সেরে নিতে হবে। না হলে হেভি রাশ পড়ে যাবে। আর প্রাইভেট ব্যাঙ্ক সাড়ে ন'টায় খোলে। তাই জলদি-জলদি যাচ্ছি।''

ঘড়ি বলছে সোয়া ন'টা। এখানে এখন বেশির ভাগ দোকান খোলেইনি। তার একটা কারণ ঠান্ডা হতে পারে। আমরা দু'জনেই জিন্স আর ভারী প্যাডওয়ালা জ্যাকেট পরে আছি। কিন্তু তাতে আরাম লাগছে। রাস্তা খালি থাকায় এখন দশ মিনিটেই চলে এলাম। মঙ্গলকে আর-একবার ধন্যবাদ দিয়ে নেমে পড়লাম। হাতে সময় আছে দেখে বাপ্পা কাউকে ফোনে ধরার চেষ্টা করল। কে তাহলে পারে ভাবছিলাম। কিন্তু আমার চিন্তা না বাড়িয়ে সে কথা শুরু করল, ''চন্দ্রমোহনবাবু, আমার একটা প্রশ্ন জানার ছিল।''

ওদিকে উনি কী বললেন জানি না।

''বলছি, আনন্দ ত্রিবেদী নামে আপনার ছেলের কোনও বন্ধুর নাম মনে পড়ে? এখানে থাকার সময়কার ক্লাসমেট?''

খানিক সময় বাদে আবার কথা।

''আচ্ছা অ্যান্তি নামে আপনাদের বাড়ি কেউ সে সময় এসেছে? একটু ভেবে বলুন।''

আবার বিরতি।

বাপ্পা আবার বলে উঠল, ''দয়া করে আপনার স্ত্রীকে একটু জিজ্ঞেস করবেন? উনি যদি...''

এবার এক মিনিট মতো বিরতি। ইতিমধ্যে ওঁর ভাই এসে গিয়েছেন। তাঁকে বাপ্পা হাত দেখিয়ে ইশারায় একটু অপেক্ষা করতে বলল।

''হ্যাঁ, বলুন। শিওর তো? আচ্ছা। যোগাযোগের কথা কিছু বলতে পারবেন? আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। না, একটা দরকারে এই তথ্যটা জানার ছিল। আমি পরে সব আপনাকে জানাব। এখন রাখছি।''

কথা শেষ। বাপ্পার মুখে চিন্তার ছাপ বাড়ছে কি? বোঝা মুশকিল। সে কৃষ্ণমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, ''চলুন।''

গাড়িতে ওঠার পরে কোন দিকে যেতে হবে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে উনি আমাদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ''একটু ডিটেলটা শেয়ার করবেন প্লিজ?''

বাপ্পা বলল, ''আনন্দ ত্রিবেদীর কথা আপনার দাদা বা বউদির জানা নেই। কিন্তু অ্যান্তি নামে তাঁদের ছেলের এক বন্ধু যে কয়েকবার এসেছিল সে কথা আপনার দাদা ভুলে গেলেও বউদির মনে আছে। এও তিনি বলেছেন যে, ললিতবাবু বিদেশে চলে গেলেও দু'জনের যোগাযোগ ছিল। একথা ললিতবাবুই ওঁর মাকে একবার বলেছিলেন। এবার কথা হল এরা দু'জন কি দুই আলাদা ব্যক্তি? না একই লোক?''

''কিছু মনে করবেন না। একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না। এই ব্যাপারটার সঙ্গে লাল্টুর মিসিং হওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে কি?''

''থাকতে পারে মিঃ পাঠক।''

বাপ্পা এইটুকু বলার পর আনন্দ ত্রিবেদীর ব্যাপারে আমরা যা-যা জানি তার সবটাই ওঁকে বলে দিল। পুরোটা শুনে ওঁর চক্ষু চড়কগাছ। মনে হল এতক্ষণে আমাদের ললিতবাবুর স্কুলে যাওয়ার গুরুত্বটা তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। গোমতী নগরের আওয়াধ সরস্বতী মহাবিদ্যালয়ে এসে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভল্লবলাক সোজা হেডস্যারের ঘরে ঢুকে গেলেন। বিরাট না হলেও স্কুলটি ছোটও নয়। মাধ্যমিক স্কুল। হেডস্যারের নাম প্রমোদ খুরানা। যেটা এতক্ষণ উনি বলেননি আর এবারে বুঝলাম সেটা হল, মিঃ খুরানা ওঁর পূর্ব-পরিচিত। আর আমরা যে আসব একথা আগেই বলে রাখা আছে। কোনও ভনিতা না করে কৃষ্ণমোহনবাবু আমাদের পরিচয় দিয়ে এখানে আসার আসল কারণ ব্যক্ত করলেন।

খুরানাস্যার বিচক্ষণ মানুষ। সব শুনে বললেন, ''আমার তো মনে নেই, তবে স্টুডেন্ট রেজিস্টার দেখে বলা যাবে। সালটা বলুন।''

এটা আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু চন্দ্রমোহনবাবুর ভাই কাজের লোক। তাই এবারেও সময় নষ্ট না করে ওঁকে সেটা জানিয়ে দিলেন।

মিঃ খুরানা একজন নন-টিচিং স্টাফকে বেল বাজিয়ে ডেকে পাঠালেন। মিনিটখানেকের ভিতরে যে এল তাকে কামাত নামে সম্বোধন করে বললেন, "আজ থেকে ষোলো বছর আগে ক্লাস সেভেনের রেজিস্টারটা নিয়ে আসুন। আর ক্যান্টিনে চায়ের অর্ডার দিয়ে দিন।"

কামাত জানাল সময় লাগবে। কারণ, এতদিন আগেকার খাতা খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। মিঃ খুরানা আরও একজন নন-টিচিং স্টাফের সাহায্য নিতে বলে দিলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বললেন, "আমার ধারণা আজকের দিনটা আমায় এর পিছনে দিতে হবে। আপনি বরং অন্য কাজটাজ থাকলে সেরে আসুন। বা না এলেও হবে। আমি ফোনে জানিয়ে দিতে পারি।"

বাপ্পা বলল, "বেশ, তাই হোক। আপনি ফোনে জানালেও হবে। সেক্ষেত্রে আমার একটা বাড়তি খবর লাগবে।"

"বলুন, কী জানতে চান?"

"যদি আনন্দ ত্রিবেদীর হদিশ পান, তবে তার কোনও ঠিকানা থাকলে সেটাও একটু জানালে খুব উপকার হবে।"

"শিওর। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট।"

"থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ।"

এর পরে আর কোনও কথা ছিল না। আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম।

একটা ফোন এসেছে। জেট। এক মিনিট কথা বলে বাপ্পা জানাল, রাতের টিকিট কনফার্ম হয়ে গিয়েছে। এটা নিয়ে আর ভাবার কিছু নেই।

গাড়িতে উঠে বাপ্পা কৃষ্ণমোহনবাবুকে বলল, "আমরা আজ রাতের ট্রেনে টনকপুরে যাব। আগাম্বিকালটাও এখানে থাকা সম্ভব হলে ভাল হত। কিন্তু আর আমার দেরি করা চলে না। তাই আপনার একটু হেল্প লাগবে।"

"বলুন না। আমি হেল্প করলে যদি আপনার কাজ দ্রুত এগোয়, তবে নিশ্চয়ই যা পারি করব।"

"আনন্দ ত্রিবেদীর ঠিকানা যদি পাওয়া যায় তবে সেখানে গিয়ে পুলিশ যাতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সে ব্যবস্থা করে যাব। কিন্তু তার জন্য এখানকার পুলিশ হতে কোয়ার্টারে আমাকে নিয়ে চলুন।"

উনি বললেন, "বাটলার কলোনি?"

"হ্যাঁ, মিঃ হাবিব আহমেদের সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। নাম শুনেছেন আশা করি।"

ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি নিয়ে বললেন, "সে শুনেছি। কিন্তু তিনি তো অনেক উঁচু পোস্টে। উঁচু ভাই পি লোক। আমি ছাপোষা মানুষ।"

বাপ্পা বলল, "মিঃ আহমেদ ডি সি পি। আর কলকাতা থেকে আমার এক পরিচিত পুলিশ অফিসার কথা বলে রেখেছেন। আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি কারণ, এটা আপনাদের ফ্যামিলির ব্যাপার। কথাবার্তায় আপনার থাকা দরকার। নিন, এবারে চলুন।"

ভদ্রলোক এবারে একটু স্বচ্ছন্দ হয়ে বললেন, "ও, তা হলে তো ঠিক আছে। রামশরণ বাটলার কলোনি যানা হ্যায়। গাড়ি ঘুমাও।"

বলা বাহুল্য শেষের কথাগুলো ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলা।

ইতিপূর্বে বলেছিলাম, এখানে এসে এই কেসের ব্যাপারে যাতে পুলিশি সাহায্য পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা বাপ্পা কলকাতা ছাড়ার আগে অনুরূপ বকসিকে বলে করে এসেছিল। আজ ডি সি পি সাহেবের ঘরে আধঘন্টার বৈঠকে সেই রেফারেন্স শুধু কাজে লাগল না, তার সঙ্গে আমার বন্ধু এটাও নিশ্চিত করে নিল যাতে পাহাড়ে উঠেও পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে তাকে চিন্তা করতে না হয়। আনন্দ ত্রিবেদীর ব্যাপার যে মিঃ আহমেদ জানতেন না বলেই দিলেন। কেউ আসেওনি এ ব্যাপারে কিছু কথা বলতে। তবে লখনউ শহরে থেকে যেটুকু যা খোঁজখবর করা যায় তা উনি করেন। আর কৃষ্ণমোহনবাবুকেও এ ব্যাপারে সঙ্গে থাকার কথা ওঁর সামনেই বাপ্পা বলে দিল। এটা আমি বুঝলাম, মিঃ বকসি আগাম বলে না রাখলে এত দ্রুত ও এত সহজে এ ব্যবস্থা হত না। আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে ওঠার আগে বাপ্পা তাই ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আপাতত আপডেটের একটা সামারি দিয়ে দিল।

কথায়-কথায় খেয়াল করিনি, বেলা প্রায় বারোটা বাজে। এখন খেয়াল হল কারণ জব্বর খিদে পেয়েছে। আর তারও একটাই কারণ। আজ ব্রেকফাস্ট হয়নি। অতএব কিছু খাওয়া দরকার। বাপ্পাকে সেটা বলাতে সে আপত্তি করল না। আমরা হোটেলে পিক আর্লি লাঞ্চের কথা বলায় কৃষ্ণমোহনবাবু বললেন, "আজ লাঞ্চটা আমার ব্যবস্থাপনায় করুন। লখনউতে এসে খাঁটি লখনউ-ই খাবার খাবেন না, একি হয় নাকি? চলুন আমার সঙ্গে। আজ রয়্যাল ক্যাফেতে আপনাদের নিয়ে যাব। এখানে কোয়ালিটি গালৌটি কাবাব আর হান্ডি বিরিয়ানি না খেলে আপনাদের লখনউ আসা বৃথা।"

আমাদের আপত্তি নেই। আর গালৌটি কাবাবের নামটা আমি আগেই শুনেছিলাম। আমাদের এক বন্ধু কিংশুক একবার এখানে এসে এসব সুখাদ্যের স্বাদ নিয়ে ফিরে আমাদের জানিয়েছিল এর কথা। রয়্যাল যে নামেই ক্যাফে সেটা ভিতরে ঢুকে বুঝলাম। প্রথমে ঢুকে মনে হবে ইম্প্রপুরীতে এসেছি। ফাইভ স্টার হোটেলের মতো ঝাঁ-চকচকে। আমরা এক কোণে গিয়ে বসলাম। কাবাব খেয়ে মনে হল, এটা আমার খাওয়া সেরা কাবাব। মুখে দিতে যেন মিলিয়ে গেল। আর তেমনি বিরিয়ানি। কলকাতায় বিরিয়ানি তো আর কম খাইনি, কিন্তু এই বিরিয়ানি স্বাদে, গন্ধে, গুণে, মানে অনেক আলাদা।

খেয়েদেয়ে উঠে বাপ্পা বলল, "একবার রেসিডেন্সিটা ঘুরে যাই। ভুলভুলাইয়া ঘুরতে সময় লাগবে। সুতরাং সেটা আপাতত তোলা থাক। কেসটা মিটলে যদি এপথেই ফিরি তখন না হয় ভাবা যাবে।"

ভদ্রলোক আজ অনেকটা সময় আমাদের সঙ্গে থেকেছেন। কিন্তু কিছু জরুরি কাজ পড়ে যাওয়াতে রেসিডেন্সির গেটের সামনে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমরা অনেকবার বারণ করা সত্ত্বেও জানালেন, সন্ধেবেলা সাড়ে-সাতটা নাগাদ আসবেন আর আমাদের লখনউ সিটি স্টেশনে নামিয়ে দেবেন।

নবাব মহম্মদ আলি শাহ অযোধ্যার রাজসভার ইংরেজ দূতদের বসবাসের জন্য বহুকুড়ি ধরে গোমতীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আঠারোশো থ্রিস্টাব্দে 'দ্য রেসিডেন্সি' গড়ে তোলেন। বাপ্পা বলছিল, সিপাই বিদ্রোহের সময় নাকি স্যার হেনরি লরেন্সের নেতৃত্বে প্রায় হাজারতিনেক ব্রিটিশ নাগরিক এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। ব্রিটিশদের আচরণে সাধারণ মানুষ এতটাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে, তারা প্রায় মাসতিনেক রেসিডেন্সি অবরোধ করে রাখে। বিদ্রোহীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে রেসিডেন্সিতে যুদ্ধ শুরু করে। খাবার, ওষুধ ইত্যাদির অভাবে প্রচুর ইংরেজের জীবনহানি ঘটে। লরেন্স নিজে কামানের গোলাতে মারা গিয়েছিলেন।

ভিতরে ঢুকে ঘুরতে-ঘুরতে প্রথম দুটো ব্যাপার চোখকে আকর্ষণ করল। এক, সবুজ ঘাসের লন আর দুই, প্রায় একশো ষাট বছর আগে যুদ্ধে ব্যবহৃত দু'টি কামান। এর বাইরে আছে মডেল রুম এবং মিউজিয়াম। মডেল রুমের দেওয়ালে অবশ্য কামানের গোলার দাগ এখনও চোখে পড়ে। এক-এক জায়গায় এক-একটা বাড়ি। কোথাও টেক্সারি, কোথাও ব্যাঙ্কোয়েট, কোথাও সিমেট্রি। কিন্তু বাড়িগুলো ভঙ্গুর হয়ে এসেছে। সেগুলো আছেও অনেকটা জায়গা জুড়ে এবং বেশ কিছুটা সবুজ লন খালি রেখে। কিন্তু ইতিহাস যে এখানে এখনও সত্যিই কথা বলে, তা ঘুরতে-ঘুরতেই বুঝেছি। টুরিস্টের ভিড়টাও চোখে পড়ার মতো। এখানকার আহাওয়া বেড়াবার পক্ষে এখনও বেশ ভাল।

রেসিডেন্সি দেখে হোটেলে ফিরতে-ফিরতে তিনটে বেজে গেল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এবারেও মঙ্গল আমাদের লিফ্ট দিল। মিঃ ভার্মার দু'জন ক্লোজ় গেস্টকে সি-অফ করতে ওঁর হয়ে মঙ্গল স্টেশনে গিয়েছিল। তারপর আরও দু'-একটা কাজ সেরে সে এই পথ দিয়েই ফিরছিল। এমন সময় আমাদের গেটের বাইরে অটোর জন্য হাত বাড়াতে দ্যাখে। আমরা ফাঁকা রানিং অটো খুঁজছিলাম।

"সাবজি, সাবজি!"

চেনা গলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে দু'জনেই খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। গাড়িতে ওঠার পরে সে এত কিছু আমাদের জানাল। তারপরে বলল, "এখান থেকে ফাঁকা অটো পাওয়া মুশকিল। আপনাদের অনেকটা সময় ওয়েট করতে হত।"

মিনিটকুড়িক ভিতরে হোটেলে চলে এলাম। গাড়ি থেকে নেমে ঘরের দিকে এগোচ্ছিলাম। সে বলল, তার পিতাজি আমরা ফিরে এলে একবার দেখা করতে চেয়েছেন। আমরাও যেতে পারি, তিনিও আসতে পারেন। বাপ্পা আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "তা হলে দেখা করেই ঘরে যাওয়া যাক। সেটাই ভাল হবে।"

"বেশ। উনি নিশ্চয়ই কিছু বলতে চান।"

মঙ্গল আমাদের মিঃ ভার্মার অফিসরুমে নিয়ে এল। আমাদের দেখে হাস্যোজ্জ্বল মুখে উনি স্বাগত জানালেন। তারপর জানতে চাইলেন সারাদিন কী-কী করলাম আর রাতে কখন বেরব। এখানে এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার আতিথ্যেই ছিলাম, এটা জানিয়ে এক কথায় বাপ্পা এ প্রসঙ্গে ইতি টেনে বলে দিল, "রাতে আমরা নিজেরাই চলে যাব। কাল সকালে টনকপুর নেমে চম্পায়তে ভার্মার হোটেলেই উঠব। তারপর কোথায় যাব, কী করব সেসব ওখানে গিয়ে ভাবা যাবে।"

ফিরে এসে চাবি খুলে ঘরে ঢুকে এবার আধঘন্টা গড়িয়ে নেওয়া যায় কিনা সবে ভাবছি, বাপ্পা ওর ক্লোল ব্যাগটা খুলে বোধ হয় জামাকাপড় গোছাবার কাজে হাত দিয়েছে। আর তখনি তার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত কথা শোনা গেল, "পিছনে ফেউ লেগে গিয়েছে নীল।"

"মানে? আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম।"

বাপ্পা ব্যাগটা খুলে ডালাটা মেলে ধরে আমার দিকে তাকাল। আমি কিন্তু ঠিক ধরতে পারছিলাম না। জামাকাপড়, যা ওর নিত্য দরকারি এমন কিছু জিনিসের বাইরে কিছু নেই। আর সেগুলো ঠিক ততটাই অগোছালো, একটা জায়গায় কেউ দু'দিন থাকলে সেটা যতটা হতে পারে। আমি বাপ্পার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

সে বলল,"বুঝতে পারলি না তো?"

আমায় এবারে "না" বলতেই হল।

"জায়গার জিনিস জায়গায় নেই। সকালে জামাকাপড় যেভাবে ভাঁজ করা ছিল সেভাবেই আছে, শুধু উপরের ফুল শার্টের হাতার ভাঁজটা ঘুরে গিয়ে উলটো দিক করে রাখা আছে। টর্চটাও সামান্য সরে মুখ ঘুরিয়েছে। আর ভিতরের দিকের বাড়তি চেনটা আধখোলা। এটা সকালে পুরো বন্ধ ছিল।"

"কিন্তু এর মানে কী? কে ঢুকতে পারে? আর কেন?"

"এর মানে হল এই যে, রিসেপশনে ঘরের চাবি দেওয়া ছিল। রুম ক্লিনিংয়ের জন্য কেউ তালা খুলে ঢুকতে পারে। অন্য কেউও হতে পারে। আমার যেটা ভুল হয়েছে তা হল, ব্যাগে তালা দিয়ে যাইনি। দরকার মনে হয়নি। কিন্তু এর থেকেও বড় মানে হচ্ছে আমাদের কেউ সন্দেহ করছে। হয়তো সে আজ সারাদিন ফলো করেছে। কিন্তু কী দেখতে এসেছিল তাই ভাবছি।"

আমার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে এল, "বন্ধুবেশী শত্রু কেউ কি?"

"হতে পারে। এখনই সেটা বলা মুশকিল।"

ঘর ছাড়ার আগে আমার ব্যাগে তালা দেওয়াই থাকে। তাই আমার সে চিন্তা নেই। বললাম, "একটা সম্ভাবনা হল আমাদের আসল পরিচয় জানার প্রয়োজনে সে লোক এসেছিল। এটাও হতে পারে গত রাতে তোকে আর আমাকে কেউ দেখে ফেলেছিল। আমরা আড়ি পেতে কিছু শুনছি দেখে তার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু অতঃ কিম?"

"একবার ভার্মাকে জানানো দরকার। চল।"

বাপ্পা উঠে পড়েছে। দরজায় তালা দিয়ে আমরা নীচে নেমে এসে আবার ওঁর অফিসে ঢুকলাম। বাপ্পা কোনও রাখঢাক না করেই বলল, "আপনার হোটেলে বোর্ডাররা না থাকাকালীন তাদের জিনিসপত্র ঘাঁটার চল আছে নাকি?"

ভার্মা প্রচণ্ড অবাক হয়ে বললেন, "তার মানে? কী বলতে চাইছেন?"

বাপ্পা পুরো ঘটনাটা ওঁকে জানিয়ে বলল, "আপনি একটু খবর নেবেন কি? ব্যাপারটার একটা ইন্টারন্যাল ইনভেস্টিগেশন হওয়া দরকার। আমি জানতে চাই যে, ঠিক কোন তথ্য আমার থেকে বের করার জন্য ঘরে লোক ঢুকেছিল?"

"আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে, আপনার ঘরে সত্যিই কেউ ঢুকেছিল?"এবার বেশ রাগতস্বরে ভার্মা বলে উঠলেন। মনে হল ভদ্রতা আর ফর্মালিটির বোধ হয় একটা আলগা মুখোশ ছিল যেটা এবারে খুলে এসেছে।

বাপ্পা পালটা উত্তর দিল, "যদি ঘরে সি সি টিভি থাকত তবে আপনি নিজেই সেটা দেখতে পেতেন। কিন্তু সেটা যখন নেই, তখন আমার মুখের কথা ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণ এখন নেই। কিন্তু প্রশ্ন আছে। সন্দেহ আছে। আর আছে অনুমানক্ষমতা।"

"বেশ, কী প্রশ্ন আছে আপনার শুনি?"

"আনন্দ ত্রিবেদীর বায়োডেটার কপি নিশ্চয়ই আপনার কাছে রাখা আছে। সেটা একবার দেখতে চাই।"

"মানে? তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? আর আপনাকে সেসব দেখাতে যাব কেন? আপনিই বা কোন এক্তিয়ারে এটা দেখতে চাইতে পারেন? বেড়াতে এসেছেন, বেড়িয়ে চলে যান। আমারই ভুল হয়েছে। আমি এসব পার্সোন্যাল ব্যাপার যে কেন বলতে গেলাম!"

বাপ্পা মুচকি হাসল। তারপর বলল, "আপনি আমায় নাও বলতে পারেন। নাও দেখাতে পারেন। কিন্তু ডি সি পি হাবিব আহমেদ এলে তাঁকে দেখাবেন নিশ্চয়ই?"

"তিনি চাইলে দেখাব, কিন্তু বাধ্য হয়ে। আর ব্যাপার কী বলুন তো? একেবারে ডি সি পি-র রেফারেন্সে কথা বলছেন? কে আপনি? পুলিশে কাজ করেন নাকি?"

বাপ্পা এবার বিনাবাক্যব্যয়ে নিজের পরিচয়পত্র বের করে দিল। আর আমাকে দেখিয়ে বলল, "এ আমার বন্ধু। আমায় তদন্তের কাজে সাহায্য করে থাকে।"

মুহূর্তের মধ্যে ভার্মার চোখমুখের চেহারা বদলে গিয়েছে। কঠিন স্বর নেমে এসেছে বন্ধুত্বপূর্ণ স্তরে। ক্ষমা চাওয়ার গলায় বলে উঠলেন, "সো স্যরি আই অ্যাম। কাকে কী বলে ফেলেছি। প্লিঞ্জ কিছু মাইন্ড করবেন না। আমি এখনি আনন্দের বায়োডেটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। বসুন, চা বলি একটু?"

বাপ্পা বলল, "দরকার নেই। আপনি খবর নিন আমাদের ঘরে কে ঢুকেছিল।"

উনি কাগজটা বের করলেন ড্রয়ার থেকে। তারপর সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি মঙ্গলকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

বাপ্পা উঠে যাওয়ার জন্য ঘুরতে ভদ্রলোক বললেন, "আপনারা কি এখানে কোনও কেসের ব্যাপারে এসেছেন? মানে, তার সঙ্গে আনন্দের মিসিং হওয়ার কোনও লিঙ্ক আছে?"

"সেটাই জানার চেষ্টা করছি মিঃ ভার্মা। আর সেজন্য আপনার কো-অপারেশন চাই।"

"করব, আমি সব করব। আপনি প্লিঞ্জ ওকে খুঁজে বের করুন। ও আমার আর-এক ছেলে। আমার ব্যবসার ডান হাত। আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব দিলাম। আপনি টাকা নিয়ে ভাববেন না। আমি আপনাকে হ্যান্ডসাম ফি দেব। কিন্তু..."

"ডোন্ট সেট সেন্টিমেন্টাল মিঃ ভার্মা। আমি চেষ্টা করব।"

ঘরে এসে প্রথমে বন্ধুটি এক পাতার বায়োডেটা নিয়ে বসল। কিন্তু যেটা দেখার জন্য সে উন্মুখ ছিল, সেটা সেখানে নেই। আনন্দ ত্রিবেদীর বায়োডেটা থেকে সে কবে কী পাশ করেছে আর কত নম্বর

পেয়ে করেছে এটাই আছে। কোথাও তার স্কুল বা কলেজের নাম নেই। সে কমার্স গ্র্যাজুয়েট। তারপর হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা করেছে। সেটা অবশ্য কানপুরের কোনও এক ইনস্টিটিউট থেকে। আর যেটা আছে সেটা আমিনাবাদের এক ঠিকানা। কিন্তু সে ভাড়া বাড়ি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। একটা সুবিধে অবশ্য হল, বায়োডেটাতে একটা ফোটো থাকায় সেটা থেকে ওঁকে চিনে রাখা গেল। যদিও অস্পষ্ট ফোটো। কিন্তু তাও মুখটা বোঝা যাচ্ছে। বাক্সা চট করে সেই ফোটোটাই মোবাইলে তুলে নিল। তার মুখ দেখে সে যা খানিক দমেছে এটা বুঝেছি। ঘর চা দিয়েছিল। সেটা খেয়ে উঠে কাগজটা সে পকেটস্থ করল।

বললাম, ''আচ্ছা এই ফোটোটা কৃষ্ণমোহনবাবুকে দেখালে হয় না? তিনি হয়তো চিনতেও পারেন।''

আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নেড়ে বন্ধুটি বলল, ''ভেবেছিস ভাল। কিন্তু চিনতে পারার কথা নয়। এটা কয়েক বছর আগের ফোটো। আর তিনি তার অনেকদিন আগে ওকে দেখে থাকবেন। অবশ্য এত কথা উঠবে যদি দু'জনে একই শহরে হয় তবেই।''

বাক্সা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার ফোন বেজে উঠেছে। অচেনা নম্বর। কার হতে পারে?

বাক্সা কথা বলতে উদ্যত হল। পরের পাঁচ মিনিটের এক দিকের কথা দিলে লাভ নেই। সামারিটা বলি। ফোনটা ছিল মিঃ আহমেদের। আজ বিকেলে খানিক আগে তাঁর কাছে একটা খবর এসে পৌঁছেছে, লোহাঘাট থেকে আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে দেবীধুরা নামে একটা জায়গায় বারাহি মন্দির নামে এক বিখ্যাত মন্দির আছে। তার পাশে নাকি মাটি খুঁড়ে বহু প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি আর কিছু মুদ্রা পাওয়া যায়। সেসব মন্দিরেরই এক সিন্দুকে দিনদশেক আগে রাখা হয়েছিল। পুরোহিতজমাই কাল আবিষ্কার করেছেন সেসব কিছু নিখুঁত। সিন্দুক যদিও বহুই ছিল। এর সঙ্গে আমাদের কেসের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু হাবিবসাহেবের মনে হয়েছে বাক্সাকে এটা জানিয়ে রাখা দরকার।

বাক্সার কথা শেষ। আমি জানি না সে এখন ঠিক কী ভাবছে। কিন্তু আমার মনে হুট আরও বেশি পেকে গিয়েছে। যদিও কোথাও কোনও উল্লেখ নেই, কিন্তু বাক্সার কাছে এখন এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন হওয়া উচিত যে, ললিতবাবু ও তাঁর বন্ধুর নিখোঁজ হওয়ার আসল কারণ এমন কিছু নয় তো?

সেটা জানার জন্য কাল চম্পায়ত বা লোহাঘাট, যেখানেই হোক আগে গিয়ে ওঠা দরকার। তারপর আমার বন্ধু বাক্সাদিত্য ভট্টাচার্যকে নতুন করে তদন্ত শুরু করতে হবে। আমি নিজে থেকে তাকে যখন আমার এই ধারণার কথা জানালাম, সে স্মিত হেসে মাথা নেড়ে বলল, ''ঠিকই ভেবেছিস।''

॥ ৫ ॥

এইমাত্র লোহাঘাটে এসে ভার্মার গেস্ট হাউজে উঠেছি। গেস্ট হাউজই। তাকেই ওঁরা হোটেল বলে থাকেন। লোহাঘাট পিথোরাগড় জেলার সদর শহর। এখান থেকে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম মাত্র ন' কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে বহুদিন ছিলেন। শুনেছি, মায়াবতীতে দু'দিন না থাকলে তার নিস্তব্ধ সৌন্দর্য উপভোগ করা অসম্ভব। টনকপুর থেকে এখানে গাড়িতে আসতে ঘন্টাদুয়েক লাগল। কৃষ্ণমোহনবাবু ট্রেন ছাড়ার আগে বলে দিয়েছেন আপডেট থাকলে তাঁকে জানাতে। নিজের একটা কার্ড দিয়ে বলে দিলেন, এখানে এসে গাড়ি লাগলে আমরা যেন ওঁকে বলি। বাক্সা রাজি হয়ে তাঁকে বলল, ''চালাকচতুর, অঙ্গবয়সি, ডায়নামিক কোনও ছাইভার থাকলে তাকে স্টেশন থেকে আমাদের সঙ্গে দিই জুড়ে দেন! তদন্তের কাজে দরকার হতে পারে।''

কৃষ্ণমোহনবাবু সে ব্যবস্থা করে বাক্সাকে ফোনে জানিয়েছেন যে, আজ লোহাঘাটে দুটো নাগাদ তেমন একজন লোক এসে রিপোর্ট করবে। নাম নিহাল সিংহ। তার আগে স্টেশন থেকে শুধু অন্য একজন ড্রাইভার পৌঁছে দেবে। আমরা হোটেল ছাড়ার আগে ভার্মা নিজে বাক্সার হাত ধরে আর-একবার মাফ চেয়ে বলেছিলেন, যেভাবেই হোক আনন্দ ত্রিবেদীকে খুঁজে বের করার জন্য সে যেন তদন্ত চালিয়ে যায়। আনন্দের খবর না পাওয়া পর্যন্ত ওর ইচ্ছে চম্পায়তে মঙ্গল কয়েকদিন কাজ করুক। তাতে ওর গড়বিধে হলেও উনি চালিয়ে নেবেন।

ঠান্ডা যতটা পেতে পারি ভেবে এখানে এসেছিলাম এখন ততটা না লাগলেও বিকেল গড়ালেই সেটা যে বেড়ে যাবে, তা বেশ বুঝতে পারছি। এখন প্রায় একটা বাজে। আমরা এসে স্নান করে, ব্রেকফাস্ট সেরে কফির কাপ নিয়ে ঘরসংলগ্ন ব্যালকনিতে এসে বসেছি। দূরে বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমরা লোহাঘাটে এসে উঠেছি তার একটা কারণ, এই জায়গাটা অন্য অনেক জায়গার প্রায় কেন্দ্রবিন্দু। পাহাড়ের মাঝে সবুজে ছাওয়া শান্ত ছোট্ট শহর।

বাক্সা বলল, ''লোহাঘাট নামটা নাকি এখানে লোহাওতি নদী থেকে এসেছে। যার আসল নামে রক্ত নদীর ঘাট। লোহা মানে রক্তকে বলে লহু, অর্থাৎ রক্ত। লোকে নাকি একে 'ভ্যালি অফ ব্লাড' বলেও জেনে এসেছে। লোহাঘাট থেকে চম্পায়ত আর অ্যাবট মাউন্ট কাছাকাছি।

বাক্সা আসতে-আসতে আমায় বলল, আজই একবার চম্পায়তে ভার্মার হোটেলে যাবে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমোহনবাবু ফোন করেছেন। মিনিটকয়েক খবর এলে বাক্সা ফোন রেখে বলল, আনন্দ ত্রিবেদী নামে একজনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তবে সেই ক্লাসে ললিতমোহন পাঁরক নামে কেউ পড়তেন না। এটাতে খটকা লাগায় মিঃ খুরানাকে কৃষ্ণমোহনবাবু ললিতবাবুর নাম দিয়ে খোঁজ লাগাতে বলেছিলেন। ভাগ্যিস বলেছিলেন। তাই একচোটে বাকি রেজিস্টারগুলো থেকে সেটা উদ্ধার হয়েছে। ললিতবাবু আনন্দ ত্রিবেদীর থেকে এক ক্লাস নীচে পড়তেন। আর তার একমাত্র কারণ তিনি তার আগে এক বছর ফেল করেন। অর্থাৎ এঁরা ক্লাসমেট। ত্রিবেদীর ঠিকানা নিয়ে কৃষ্ণমোহনবাবু এবার যোগাযোগ শুরু করবেন। তবে তাঁর ধারণা, ইনি আর যাঁকে অ্যান্ডি ভাবা হচ্ছে দু'জন একই ব্যক্তি। কারণ, স্কুলের থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ললিতবাবু এবং ত্রিবেদীর তখনকার যা ঠিকানা, তাঁদের মধ্যে দূরত্ব খুব কম।

আমি বললাম, ''তার মানে একটা সম্ভাবনা হল, দু'জনে হয়তো একই দিকে, একই কারণে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়েছেন।''

বাক্সা এটা শুনে হাবিবসাহেবকে ফোনে ধরার চেষ্টা করল। তিনবারের চেষ্টায় যখন লাইন পাওয়া গেল, তখন সে চম্পায়ত আর লোহাঘাটের ও সির নাম-ধাম চেয়ে রাখল। হাবিব বলেছেন, খানিকবাদেই পাঠিয়ে দেবেন।

বাক্সা ঘড়ি দেখে বলল, ''রেডি হয়ে নে। বেরতে হবে। নিহাল সিংহ এল বলে।''

বেরবার জন্য তৈরি হয়ে নিয়ে ঘরে তালা দিচ্ছি, এমন সময় দরজায় নক করার আওয়াজ। খুলে দেখি আমাদের চেনা লোক বাইরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের ''গুড আফটারনুন'' বলছেন। পরমদেও কউল। আজ স্টাইপ্ড ব্লু রঙের জিন্‌স আর ক্রিম রঙের জ্যাকেটে আরও ঝকঝকে আর স্মার্ট দেখাচ্ছে। বললেন, ''আপনারা কোথাও যাচ্ছেন?''

বাক্সা বলল, ''আপনাদেরই হোটেলে, চম্পায়ত। কিন্তু আপনি এখন এখানে? পিথোরাগড় যাননি?''

''নাহ! যাওয়া আর হল কই? চম্পায়তে এসে উঠেছিলাম, রাতটা থেকে বেরিয়ে যাব ঠিক ছিল। মিঃ ভার্মা ফোন করে আপনাদের কথা বললেন। আপনার আসল পরিচয় জানালেন। আপনাকে আনন্দর ব্যাপারে কাজ করতে বলেছেন শুনলাম। উনি এও বললেন, আপনাদের সঙ্গে থাকতে। যদি তদন্তে কোন হেল্‌প লাগে তবে সেটা যাতে আমি করি। খুব ভাল হয়েছে যে, কেসটায় আপনি তদন্ত করছেন। এখানকার পুলিশদের দিয়ে কিস্যু হবে না। চলুন, আমিও যাই। আমি

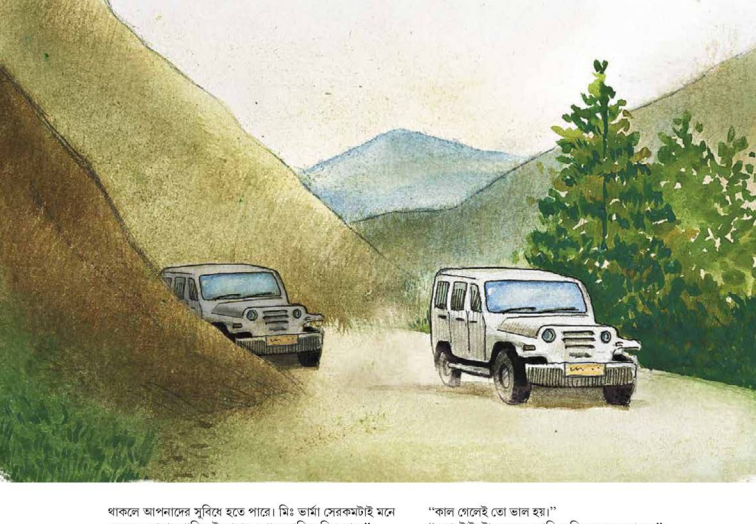

থাকলে আপনাদের সুবিধে হতে পারে। মিঃ ভার্মা সেরকমটাই মনে করছেন। আমার গাড়িতেই আবার এখানে নামিয়ে দিয়ে যাব।"

বাপ্পা বলল, "হ্যাঁ, মানে কী জানেন, আমরা একটা গাড়িকে আসতে বলেছি। আপনি আসবেন জানা থাকলে তাকে না বললেও চলত। এখন আর সেটা হয় না। সে এই এল বলে।"

"ওহ রিয়েলি, দেন ফাইন। আপনি আমার গাড়িতে আসুন। আপনাদের ড্রাইভারকে বলুন আমায় ফলো করুক।"

নীচে নেমে এসে দেখলাম লম্বা মতো একটি অম্বরসিং ফরসা ছেলে ছাই রঙা একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, "সাব ম্যায় নিহাল সিংহ।"

বাপ্পা তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার পরে আমরা পরমদেওয়ের দুধসাদা গাড়িতে বসলাম। চলেছি এখান থেকে চোদ্দো কিলোমিটার দূরে অতীতের চাঁদ রাজাদের রাজধানী চম্পায়তে। পাহাড়ি রাস্তা যেমন এঁকেবেঁকে চলে এ রাস্তাও তেমনি। রাস্তার দু'ধারে পাইন আর ওকের সারি। তার ফাঁক দিয়ে নীচে তাকালে অতল খাদ। আর বেশ কিছু দূরে লোহাওতি নদী বয়ে চলেছে। পাহাড়ের এক-একটা শৃঙ্গতে সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করছে। ভারী চমৎকার দৃশ্য। বাপ্পা সেসব দেখছে বলে মনে হয় না। সে পরমদেওয়ের সঙ্গে কথা বলছিল।

"পিথোরাগড়ের কাজ এখন কে দেখাশোনা করছে?"

"চন্দ্রভান নামে একটি ছেলে আছে। তাকে সব বলা আছে। আমাকে তো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয়। তখন ওকেই সব বলে বেরই।"

"ওকে। আর দেবীধুরা যেতে এখান থেকে কত সময় লাগে?"

"নহ, আপনি ওখানকার কেসটা শুনেছেন? যাবেন নাকি সেখানে?"

"সেটাই ভাবছি।"

"তা ধরুন গাড়িতে ঘণ্টাদেড়েক লাগবে। কবে যেতে চান?"

"কাল গেলেই তো ভাল হয়।"

"বেশ, টাইমটা বলবেন। আমি রেডি হয়ে চলে আসব।"

"আপনাকে আর কষ্ট দেব না। ও আমরাই চলে যেতে পারব।"

"আরে, কষ্টের কী আছে? আপনি আমাদের জন্য কাজ করছেন। আমাদের তো উচিত আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করা। অচেনা জায়গায় আমি থাকলে দেখবেন সুবিধেই হবে।"

বাপ্পা একটু হেসে বলল, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

আমরা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চম্পায়ত এসে গিয়েছি। এটা একটা ছোট হিল স্টেশন। গোল্ডেন রিট্রিট নামটা এখানেও ভার্মাদের হোটেলে ঢোকার মুখে চোখে পড়ল। এটা বাইরে থেকে দেখে অবশ্য লখনউয়ের চেয়ে অনেক ছোট হোটেল মনে হচ্ছে। রিসেপশনে যে ছেলেটি বসেছিল তাকে পরমদেও রমন নামে ডাকলেন। আমাদের নিয়ে গিয়ে অফিস রুমে বসালেন। এটিও বেশ ছোট ঘর। তবে সাজানো-গোছানো। আমরা বসার পরে চায়ের অর্ডার দিয়ে পরম জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন কী জানতে চান আর কার সঙ্গে কথা বলবেন?"

বাপ্পা বলল, "এখানেই মিঃ ত্রিবেদী থাকতেন তো?"

"হ্যাঁ, দোতলায় ওঁর জন্য একটা ঘর আছে। আপনি চাইলে সেটা দেখতে পারেন।"

"সে দেখব নিশ্চয়ই। কিন্তু আগে দুটো ব্যাপার জানা দরকার। এক, তিনি শেষ কবে এখানে কাজ করে গিয়েছেন? দুই, তাঁর কোনও কারেন্ট ফোটো। এর বাইরে যাঁদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত কাজ করতেন তাঁদের সঙ্গে একবার কথা বলা গেলে ভাল হত।"

"আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

পরমদেও বেল বাজাতে রমন নামে ছেলেটিই ঢুকল। তাকে বাপ্পার কথামতো পরম ব্রিফ করে দিতে সে ঘাড় নেড়ে চলে গেল। খানিক বাদে ফিরেও এল। এর পরের কথাবার্তার ডিটেল্‌স আর লিখছি না।

বাপ্পা একে-একে দু'জন কিচেনের লোক, দু'জন ওয়েটার আর রমনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলল। আর-একবার আনন্দ ত্রিবেদীর ঘরে গেল। এইসব কিছু থেকে যেটুকু জানা গেল তা হচ্ছে, যেদিন থেকে তিনি নিখোঁজ তার আগের দিন ছুটি কাটিয়ে আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।এর পরের দিন মুন্সিয়ারি যাবেন বলে একাই বেরন। সঙ্গে একটা ছোট ব্যাগ ছাড়া কিছু ছিল না। একদিন বাদে ফেরার কথা। যদিও এ খবর পরমদেও বা ভার্মা কেউই জানতেন না। ঘরে গিয়ে অবশ্য নতুন কিছু জানা গেল না। কিছু জামাকাপড়, নিত্য ব্যবহার্য টুকিটাকি ইত্যাদি। এর বাইরে ওঁর বড় স্টোলি ব্যাগ থেকে পাওয়া গেল কাপড়ের একটি ঠিকানা, কুমায়ুনের দুটো ম্যাপ আর একটা ট্যাব। তবে ম্যাপদুটো ছোট মাপের আর তাও ট্রেকিং রুটের। ব্যাপার হল, একটা ম্যাপের গায়েও হচ্ছে মুন্সিয়ারির দিকে কালামুনি নামে এক জায়গায়। আর অপরটি দিয়ে যাওয়া যাবে লোহাঘাট, মায়াবতী, হাতিয়া নৌলা, চম্পায়ত। বাপ্পা ট্যাব এবং এই দুটো ম্যাপই সঙ্গে রেখে দিল। ফিরে এসে সে একবার রেজিস্টার দেখল। তার উদ্দেশ্য ছিল ললিতবাবুর নাম তাতে পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখা। নাম নেই। বাপ্পা এবার ললিতবাবুর ফোটোটা তার জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে এদের প্রত্যেককে দেখাল। প্রত্যেকেই এঁকে চেনে না বললেও শুধু একজন ওয়েটার বলল, লোকটিকে দেখেছে। ইনি ত্রিবেদী মুন্সিয়ারি যাওয়ার জন্য বেরন সেদিন। এই ওয়েটোর ছেলেটি যখন কাজে যোগ দিতে হোটেলে ঢোকে, তখন বাইরে রাস্তার উপর ফোটোর এই লোকটি অপেক্ষা করছিল। ঠিক সেইসময় ত্রিবেদী বেরিয়ে আসেন। এর সঙ্গে মিট করে দু'জনে বাসস্ট্যান্ডের দিকে চলে যান।

"যাক, একটা হিসেব মিলেছে," বাপ্পা এবার রিসেপশনে গিয়ে রমনকে ধরে অ্যাকাউন্টসের হিসেব দেখতে চাইল। এই কেসে এসব দরকার হবে কেন বুঝলাম না। কিন্তু অতি মনোযোগ সহকারে সে প্রায় মিনিটপ্রিচশ ধরে হিসেবনিকেশ দেখে উঠে আসার আগে রমনের মোবাইল থেকে আনন্দের এখনকার ফোটো পেয়ে গেল। তাকে নিজের নম্বর দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে বলে দিল।

পরমদেও এবার একটু উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "এনিথিং রং?"

"নাথিং স্পেশাল, চলুন।"

আপাতত আর কিছু দেখার ছিল না। পরমদেওকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

"এবার?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে বাপ্পা বলল, "থানায় যাব। দেবীধুরার ব্যাপারটা জানা দরকার।"

এখন নিহাল সিংহর গাড়িতেই উঠেছি। থানা বেশি দূর নয়। গাড়িতে সাত-আট মিনিট। আসলে চম্পায়ত জায়গাটাও খুব ছোট। থানায় ঢুকে নিজের কার্ড আর হাবিবসাহেবের রেফারেন্স দিয়ে ও সি মিঃ দেশমুখের ঘরে ঢুকলাম। বাপ্পা সরাসরি কাজের কথায় চলে এল। যা কথা হল তুলে দিলাম,

বাপ্পা: আপনি একটু বলবেন, দেবীধুরায় ঠিক কী হয়েছিল?

দেশমুখ: ওখানে একটা টেম্পল আছে, বারাহি নাম। তার কাছে এক জায়গায় নাকি লোকাল কিছু লোক একদিন মাটি খোঁড়া দেখতে পায়। খুঁড়তে দেখেনি। ওই জায়গাটায় জঙ্গল আছে। খুব একটা কেউ যায় না ওদিকে। সে নিয়ে নাকি কৌতূহলী হয়ে উঠে মানুষ কয়েকদিন ঘোরাফেরা করে। রাতে পাহারা দেয়। কাউকে আর দেখা যায়নি। তারপর ওই গ্রামেই একজন মুখিয়া টাইপ লোকের কথায় আরও অনেকে মিলে আবার খোঁড়া শুরু করে। অনেকটা খুঁড়ে ফেলার পরে নাকি প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি বের হয়। অশিক্ষিত মানুষ ধরে নেয় এসব ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সেদিন এসব করতে-করতে সন্ধে হয়ে যায়। তখন ওরা ঠিক করে, সে রাতে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তখনকার মতো জিনিসগুলো রাখবে। পরের দিন পুলিশকে জানিয়ে তাদের হাতে এসব তুলে দেবে। কিন্তু যেদিন রাখা হয় সেদিন রাতেই চুরিটা হয়।

বাপ্পা: মন্দিরে জিনিসগুলো কীভাবে রাখা ছিল?

দেশমুখ: ওখানে একটা সিন্দুক আছে। তার চাবি থাকে পুরোহিতের কাছে। কিন্তু সিন্দুকের তালা ভাঙা হয়েছে।

বাপ্পা: চোর ধরার জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

দেশমুখ: ব্যবস্থা কী নেব বলুন তো? একটা রুটিন ইনভেস্টিগেশন হয়েছে। ব্যস, তবে একটা কথা আপনাকে জানাতে পারি, এটা ওখানে গিয়ে জেনেছি। সেটা হল, দু'জন বাইরের লোক নাকি চুরির আগে ওখানে দিনদুয়েক ঘোরাফেরা করেছিল। কিন্তু তা দিয়ে কী হবে? আমার কাছে তো তাদের ফোটো নেই।

বাপ্পা : কিন্তু আপনি এটা জানেন তো যে, এখানে ভার্মার হোটেলের ম্যানেজার মিসিং। এই লোক আর সেই লোক দু'জন এক নয় তো?

দেশমুখ: হতে পারে। কিন্তু তাকে আইডেন্টিফাই কী করে করবেন?

বাপ্পা: কেন, হোটেলে গিয়ে তার ফোটো সংগ্রহ করে নিয়ে দেখতে পারতেন।

দেশমুখ: সেসব এখানে নেই মিঃ ভটচারিয়া। আমি ট্রাই করে দেখেছি। আপনি দেখুন।

বাপ্পা: আমাকে তো দেখতেই হবে। কারণ, আমি তার কেস নিয়েছি। আমি কাল যাব। আপনি যেতে পারবেন?

দেশমুখ: আমি দু'বার গিয়ে ঘুরে এসেছি। আপনি চাইলে আপনাকে থানা থেকে লোক দিয়ে দেব।

বাপ্পা: দরকার হবে না, ধ্যান্কস।

॥ ৬ ॥

আমরা দেবীধুরায় এসে পৌঁছেছি এই মিনিটদশেক হল। পরমদেও আমাদের সঙ্গেই এসেছেন। কাল রাতে ফোন করেছিলেন আজ কখন বেরব জানার জন্য। বাপ্পা বলার চেষ্টা করল যে, ওঁর আসার দরকার নেই। তবুও পরম নাছোড়। বলেছেন, "আমি আপনাদের গাড়িতেই না হয় যাব।"

বাপ্পা আর আপত্তি করেনি। এটা সে বুঝেছে যে, পরম তার হোটেলের কর্মচারীর স্বার্থেই আমাদের সঙ্গে থাকছে আর আমাদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেটাও সে দেখছে।

মন্দিরের থেকে এক কিলোমিটার দূরে যে জায়গাটায় খোঁড়া হয়েছিল, সেখানে গিয়ে দেখা গেল সেখানকার গর্ত ভরাট করা হয়েছে। তবে মাটি আর ঘাসের চাপড়া আশপাশে ছড়ানো। একটু এগোলে জঙ্গল। কিন্তু খুব গভীর নয়। বাপ্পা চারপাশটা একবার ঘুরে দেখে এল। তবে এতদিন বাদে তার কিছু চোখে পড়ার কথা নয়। পরের গন্তব্য মন্দিরের পুরোহিতমশাই। প্রথমে তিনি কথা বলতে রাজি হচ্ছিলেন না। জানালেন, ক'বার তো কথা বলেছেন। আবার কী দরকার?

পরম এবারে স্থানীয় ভাষায় ওঁকে কিছু বোঝালেন। হয়তো আশ্বস্ত করলেন যে, আমাদের কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই। তারপর বাপ্পার দিকে তাকিয়ে ইশারায় কথা শুরু করতে বললেন। বাপ্পা বলল, "সামান্য দু'-চারটে প্রশ্ন ছিল। যদি একটু সাহায্য করেন।"

ভদ্রলোক নিমরাজি হওয়াতে বাপ্পা জানতে চাইল, সিন্দুকে উনি কী-কী রেখেছিলেন?

তাতে পুরোহিতমশাই বললেন, চারটে ছোট মূর্তি। প্রতিটিই অনেক পুরনো। তবে দামি পাথর দিয়ে গড়া। আর গোটাপঞ্চাশ মুদ্রা। তিরিশটা সোনার, কুড়িটা রুপোর।

"চুরি হিয়েছে বুঝলেন কীভাবে?" বাপ্পা প্রশ্ন করল।

"যে রাতে সেগুলো ওখানে রেখেছিলাম তারপরের দিন সকালে মন্দিরে রোজকার মতো পুজো করতে আসি। সদর দরজার তালা খুলে ভিতরে গিয়ে ডান দিকের ঘরে যাই। এখানে পুজোর কিছু উপকরণ

রাখা থাকে। আর সিন্দুকটাও এখানেই। ঢুকে দেখি, সেটার ডালা খোলা। ছুটে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। কিছু নেই।"

"একবার এখন ভিতরে যাওয়া যায়?"

"মন্দির খোলাই আছে। যান, দেখে আসুন।"

"আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে।"

ভিতরে দেবতার দর্শন সেরে সিন্দুকের সামনেটা ঘুরে বাইরে বেরনোর জন্য ঘুরতে গিয়ে দেখি, বাঁ হাতে আর-একটি দরজা। বাপ্পা সেদিকে তাকিয়ে বলল, "এটা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়?"

ভদ্রলোক বিস্ময়ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "যায়।"

"সেদিন সকালে এসে এটা খোলা দেখেছিলেন?"

আবারও তিনি সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর জানালেন, "এটা পিছনের দরজা। এটা ভাঙা হয়েছিল। চোর এই পথেই এসেছিল। চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে এই পথেই।"

বাপ্পা একবার দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে বাইরেটা দেখে এল। তারপর তার মোবাইল থেকে আনন্দ ত্রিবেদী আর শার্টের পকেট থেকে ললিতবাবুর ফোটো বের করে জানতে চাইল, "দেখুন তো, এদের চেনেন কিনা?"

পুরোহিতমশাই এক ঝলক দেখে নিয়ে বেজার মুখে বললেন, "এরা আবার কারা?"

বাপ্পা বলল, "এরা যারাই হোক, শুনলাম চুরির আগে এদিকে দু'জন লোককে নাকি দেখা গিয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। এরা কেউ নয় তো?"

এবারে পুরোহিতমশাই খেপে গেলেন। বেশ স্বর চড়িয়ে বললেন, "আমি মন্দিরের ভিতরে পুজো করি। বাইরে কে কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে সে আমি কেমনভাবে দেখব বলুন দেখি? আপনি বাইরে কাউকে জিজ্ঞেস করুন।"

বাপ্পা আমাদের দিকে তাকিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। মুখিয়ার খোঁজ পাওয়া গেল না। সে নাকি কোনও কাজে ভাওয়ালি গিয়েছে। কবে ফিরবে কেউ বলতে পারল না। সামনের দোকানে এক গ্লাস চা খেতে গিয়ে দোকানের মালিককে ফোটোদুটো দেখিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করা হল। ভাঙা- ভাঙা হিন্দিতে লোকটি জানাল, অনেকেই তার দোকানে আসে। সবাইকে মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আনন্দর ফোটো দেখিয়ে বলল, একে মনে আছে। কারণ, যে রাতে চুরি হয় সেদিন সন্ধেবেলা সে প্রায় একঘণ্টা এখানে বসেছিল। দু'বার বড় গ্লাসে চা নিয়ে অনেক সময় ধরে ফোনে কথা বলছিল।

"আর কিছু জানা আছে?"

এবারে সে যেটা বলল তা অবশ্য খানিক অদ্ভুত। মন্দির বন্ধ হয় রাত আটটায়। লোকটা তখন মন্দির থেকে বেরচ্ছিল। পুরোহিতমশাই দরজা বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। লোকটা একই দিকে তার পিছু-পিছু চলে যায়।

আমি বললাম, "এবারে কি আমরা চোর ধরে দিলে কেস মিটে যাবে?"

বাপ্পা চা শেষ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি খুব জোরে ঠং করে একটা আওয়াজ শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমাদের গাড়ির পিছনের কাচের একটা অংশ মাকড়সার জালের মতো হয়ে গিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, কোনও কিছু এসে জোরালোভাবে কাচের উপর পড়েছে।

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে "পরমজি হঠ যাইয়ে, নীল তুইও," বলে বাপ্পা দু'দিক থেকে দু'জনকে মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজে গাড়ির আড়ালে নিচু হয়ে যেতে-যেতে কানে এল গুলির আওয়াজ। এবারেও গাড়ির পিছনেই কোথাও কাচে লাগার শব্দ। আমার বুকটা ঢেঁনাশনে ধুকপুক করছে। আমি মাটিতে উলটে পড়েছি। এক মিনিট সব চুপ। আমার ডান পাশে বাপ্পা আর সামনে এ কী! পরমদেও উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

বাপ্পা পরমকে উলটে শুয়ে দিয়ে বলল, "বোধ হয় তেমন কিছু নয়। একটু দেখ তো, আসছি আমি।"

পরমের দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখ বোজা, কিন্তু শ্বাস পড়ছে। নিহাল সিংহ কোথা থেকে এক গেলাস জল নিয়ে ছুটে এল। ভদ্রলোক বোধ হয় সাময়িক জ্ঞান হারিয়েছিলেন। কয়েকবার জলের ছিটে দিতে চোখ খুলে তাকালেন। আস্তে-আস্তে ওঁকে ধরে বসানো হল। মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ। আর বাঁ হাতে ব্যথা লেগেছে। বোঝা গেল, ছড়ে গিয়েছে বা কিছুতে ঘষা খেয়েছেন। সামান্য রক্ত বেরচ্ছে।

বাপ্পা ইতিমধ্যে ছুটতে-ছুটতে ফিরে এসেছে। পরমের হাতটা একবার দেখে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে, ফার্স্ট এড দিলে ঠিক হয়ে যাবে। তবে অনেক বেশি কিছু হতে পারত।"

আমি বললাম, "কিছু বোঝা গেল?"

প্যান্টের পকেট থেকে একটা ইটের টুকরো বের করে সে বলল, "প্রথমে বোধ হয় এটাই ছোড়া হয়েছিল। গাড়ির পিছনে পেলাম।"

"কিন্তু লোকটা কে হতে পারে বাপ্পা?"

"সেটাই ভাবার চেষ্টা করছি। এমন কেউ আড়ালে আছে যে আমাদের সবকিছু নিঃশব্দে ওয়াচ করছে।"

"তুই কি গুলি চলার আগে কিছু দেখতে পেয়েছিলি?"

"মনে হল দূরে ওই গাছটার আড়াল থেকে একটা বন্দুকের নল বেরিয়ে আছে। শিওর নই অবশ্য।"

আশপাশে ভিড় জমে গিয়েছে। স্থানীয় মানুষজন রাস্তায় এসে জড়ো হয়েছে। দু'-একজন কথা বলতেও এগিয়ে এল। পরমদেও তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চিন্তার কিছু নেই। পুলিশের তরফ থেকে আমরা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিলাম। এখন চলে যাব।"

দেবীধুরাতেই ওঁর ফার্স্ট এড আর একটা টিটেনাস ইঞ্জেকশন নেওয়ার কাজ সেরে ফিরতি পথে একটা ধাবায় গাড়ি পার্ক করে আমরা লাঞ্চ সেরে নিলাম। গাড়ি ছাড়ার আগে নিহাল সিংহ হঠাৎ বাপ্পাকে বলল, "সাব উস আদমিকো আপনে দেখা?"

বাপ্পা বলল, "দেখা, মগর বহুত দূর সে। কিউ?"

"ম্যায় নে দেখা। উঁচ হাইট। আপ বোলতে তো হাম বন্দুক লে কর উসকা পিছা কর সাকতে থে।"

বাপ্পা বলল, "বন্দুক চালানা ভি আতা হ্যায় তুমহে?"

"জি সাব।"

বাপ্পা হেসে বলল, "ঠিক হ্যায়। ফির মওকা মিলে তো দেখেঙ্গে। অব ওয়াপস চলো।"

নিহাল সিংহ স্টার্ট দিতে-দিতে বলল "সিসা টুট চুকা সাব। ওয়াপস জানে কে বাদ লাগানা পড়েগা ফিরসে।"

"নো প্রবলেম। টাইম মিলেগা তুমহে। পহচতেহি লাগা লেনা।"

আমাদের ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। এখনি বেশ ঠান্ডা লাগছে। আমরা ঘরে এসে বসার পর পরম কিচেনে তিন কাপ কফির অর্ডার দিয়ে এলেন। বাপ্পা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আনন্দ ত্রিবেদী আগে কোনওদিন এই রকম টেকিংয়ে গিয়েছেন?"

পরম একটুও না ভেবে বললেন, "গিয়েছেন, তিনবার। কিন্তু সেগুলো দু'দিনের ট্রেক। একবার অ্যাবট মাউন্ট গেল। আর-একবার মায়াবতী গিয়েছিল। সেখান থেকে একটা কী রুটে যেন যায়, মনে পড়ছে না। আর-একবার বড় ট্রেক ছিল। মিলাম গ্লেশিয়ারের দিকে। খারাপ ওয়েদারের জন্য মাঝপথে ফিরে আসে। আপনার কি মনে হচ্ছে বলুন তো? চুরিটা আর ওঁর নিখোঁজ হওয়া, দুটো একই লিঙ্কে পড়ে যাচ্ছে?"

বাপ্পা বলল, "এখন তো তাই মনে হচ্ছে। চুরির তদন্ত যাতে না করতে পারি তার জন্য প্রাণে মারার চেষ্টা। আর..."

"আর?"

"আর হল, আমার অনুমান। চুরির সময় আর ত্রিবেদীর নিখোঁজ

হওয়ার সময়টা মিলে যাচ্ছে। তাই ভাবছি।''

''আর কিছু ভাবছিস কি তুই?''এটা আমার প্রশ্ন।

''ভাবছি তো অনেক কিছুই নীল। কিন্তু তার পিছনে তো তথ্য আর যুক্তি চাই।''

''যেমন?''

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে আবার পরমকে জিজ্ঞেস করল, ''এখান থেকে নেপাল আর তিব্বতের বর্ডার বেশ কাছে হবে, রাইট?''

''ঠিকই বলেছেন। কিন্তু একথা কেন জানতে চাইছেন?''

''ভাবছি, যদি ত্রিবেদীই কাজটা করে থাকেন তবে তাঁর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বর্ডার দিয়ে সেটা পাচার করে দেওয়া আর কাঁচা টাকা নিয়ে ফিরে আসা। সে জিনিস আর এদিকে আনার তো কোনও কারণ দেখি না। কিন্তু একটা কথা আছে, দেবীধুরা থেকে তাঁকে আগে মেন ট্র্যাকে ফিরতে হবে তো। তারপর না হয় তিনি এসব ভাববেন।''

কফি এসে গিয়েছিল। বাপ্পা তাতে চুমুক দিয়ে বলল, ''এখান থেকে আপনার কর্মস্থল তো আর দূর নয়?''

''পিথোরাগড়? সে বড়জোড় দেড় থেকে দু-ঘণ্টা। কাল যাবেন নাকি?''

''সেরকমই ইচ্ছে।''

''মোস্ট ওয়েলকাম। তা হলে আমরা ক'টায় বেরচ্ছি?''

''আজকের মতোই, আটটা।''

''ওকে। আমি তা হলে এখন উঠি।''

''ঠিক আছে, কাল দেখা হচ্ছে।''

পরম উঠে যেতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে আমি জানতে চাইলাম,''আরে এ লোকটা তো সঙ্গ ছাড়ে না দেখি। মহা মুশকিল হল।''

বাপ্পা একটু হেসে বলল, ''আমার খারাপ লাগছে না। হেল্পফুল। থাকলে অনেক সুবিধে।''

''কাল ওঁর ওখানে গিয়ে কী করবি?''

''আমি জানি না, তথ্য চাই নীল। তথ্য ছাড়া এগোনো মুশকিল। আমার সামনে অনেকখানি রহস্যই রয়ে গিয়েছে। শুধু এইটা...''

ফোন এসেছে বাপ্পার মোবাইলে। কৃষ্ণমোহনবাবু। মিনিটতিনেক কথা। সেটা সেরে বাপ্পা বলল, ''আনন্দ ত্রিবেদীর কানপুরে একটা থাকার জায়গা আছে। দিনপনেরো আগে সেখানে গিয়েছিলেন। থাকার মধ্যে এক কাকা। বাবা-মা কেউ জীবিত নেই। আসার আগে কাকাকে বলেছিলেন, অনেক দূর যাচ্ছেন। আবার কবে আসবেন জানা নেই। আর সবচেয়ে জরুরি তথ্য ওঁর ডাকনাম অ্যান্ডি, যেটা এই কাকাই দিয়েছিলেন।''

''আর-একটা কথা, পুরোহিতমশাই কি সব ঠিক বললেন?''

''মনে হয় না। অন্তত চায়ের দোকানের লোকটির কথা শুনে ভরসা পাইনি।''

''কিন্তু মিথ্যে বলে লাভ কী?''

একটু ভেবে বাপ্পা বলল, ''লোকাল কেউ হেল্প না করলে চুরি করা খুব রিস্কি।''

''লোকাল কেউ বলতে, মুখিয়া না পুরোহিত?''

''যে-কোনও একজন হতে পারে। দু'জনও।''

''হেল্প মানে?''

''হেল্প মানে শেয়ার হতে পারে।''

''কিন্তু বাপ্পা, তোর জানার কথা যে, এসব পাহাড়ি জায়গার পুরোহিতরা খুব অনেস্ট হন। তাঁদেরকে পারচেজ করা কিন্তু সোজা নয়।''

''গুড পয়েন্ট। কিন্তু তারও বিকল্প আছে।''

''সেটা কী?''

''যদি চোর প্রাণভয়, হুমকি এসব দিয়ে থাকে তবে?''

''তোর মতে এটাই তা হলে গেটওয়ে?''

''আমি তা বলছি না। কিন্তু এটা একটা পসিবিলিটি হতেই পারে।''

''আর তখন 'শুধু এইটা' বলে কী বলতে গেলি?''

এতক্ষণে বাপ্পা তার ব্যাগ থেকে আনন্দ ত্রিবেদীর ট্যাবটা বের করে এনে বলল, ''এটার কথা বলছিলাম।''

''এটা দিয়ে কী হবে?'' জানতে চাই।

''খুলে দেখি। লোকটা গণ্ডগোলের মনে হচ্ছে। কিছু তথ্য থাকতে পারে তো।''

প্লাগ অন করে দিয়ে বাপ্পা ট্যাবটা খুলে ফেলল। একটা সমস্যা হতে পারে এই যে, এতে ইন্টারনেট নেই। আমার বন্ধু অবশ্য আগে মাই ডকুমেন্ট ফোল্ডারটা খুলে ফেলল। কিছু বিল, ভাউচারের কপি, কয়েকটা এক্সেল শিটে হিসেবনিকেশ বেরল। বোঝা যায় হোটেলের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য। ডাউনলোড করা কয়েকটি ম্যাপ, ভদ্রলোকের নিজের আর পাহাড়ের কিছু ফোটোও পাওয়া গেল। এর বাইরে কিছু নেই। মানে, সন্দেহ করা যায় এমন তথ্য পাওয়া গেল না।

বাপ্পা দ্রুত আনন্দর বায়োডেটার কাগজটা খুলে ফেলে বলল, ''আমার হ্যান্ডব্যাগে দেখ, একটা ডেটা কার্ড আছে। নিয়ে আয় দেখি।''

সেন্টার টেবিলের উপর থেকে হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে তার ভিতরে হাত চালিয়ে সহজেই পেয়ে গেলাম। বললাম, ''নেট চালানো যায় কিনা দেখবি?''

ঘাড় হেলিয়ে সে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ল।

''কিন্তু তাতে কী লাভ, তুই তো আর ওর মেল বক্সে ঢুকতে পারছিস না।''

আমার কথা কেড়ে নিয়ে বন্ধুটি বলল, ''একটা চান্স নিতে চাই। মেল আইডি তো বায়োডেটা থেকেই পেয়ে যাচ্ছি।''

''পাসওয়ার্ড?''

''সেটাই দেখছি। জীবনে কোনও-কোনও সুযোগ একবারই আসে নীল।''

''মানে? তুই কি হ্যাক করবি নাকি?''

সে কথার উত্তর না দিয়ে বাপ্পা ডেটাকার্ডটা ইনস্টল করে ফেলেছে। নেট খুলে গিয়েছে।

''এবার? এবার কী করবি?''

''দেখতে থাক,'' বাপ্পা দ্রুত মেল পেজটা খুলে ফেলল। আর পরমুহূর্তেই যেন সোনার খনি পেয়ে গিয়েছে এমনভাবে চাপা উল্লাসে বলে উঠল, ''ইয়েসসসস! গট ইট।''

''মানে? কী পেয়ে গেলি?''

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম আনন্দ ত্রিবেদীর মেল বক্স খুলছে।

''ব্যাপারটা কী? এটা হল কেমন করে?'' আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

''ভেরি ইজি। আনন্দের পাসওয়ার্ডটা এখানে অটোসেভড ছিল। এসব ক্ষেত্রে সাইন-ইন করার সময় আর প্রতিবার লিখতে হয় না। ইউজার আই ডি দিয়ে দিলেই বাকিটা হয়ে যায়। পার্সোনাল মেশিনে অনেকে এরকম করে রাখে। আমি সেই চান্সটাই নিয়েছি।''

''বাট, বাপ্পা এটা আনএথিক্যাল, অন্যায় কাজ।''

''কিছু করার নেই নীল। আমার খবর চাই। সেটা যদি এভাবে হয়, হোক। তুই এদিকে এসে বোস।''

আমি ঘুরে গিয়ে দেখলাম মিঃ ভার্মার কয়েকটা মেল আছে, কিছু কোম্পানির মেল এসেছে, বোধ হয় বুকিং সংক্রান্ত মেলও থাকবে। বাপ্পা সেসব দেখতে-দেখতে এক জায়গায় এসে থেমে গিয়েছে। কারণ, সামনে এমন একজনের নামে মেল দেখছি, যিনি এই কেসে জড়িত। ললিত পাঠক। ঠিক যেভাবে যা লেখা আছে সেটাকে বাংলায় তর্জমা করে দিলাম।

"অ্যান্ডি,

তোর উপর ভরসা করে আমি আসছি। আমার অবস্থার কথা তো তোকে সবই জানিয়েছি। একুল ওকুল দু-কুলই যাতে না যায় সেটা দেখিস। তোর সঙ্গে দেখা করতে আমার আরও দিনতিনেক সময় লাগবে। আশা করি তার মধ্যে তুই সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবি। আগে যা-যা বলেছিলি সেসব নিশ্চয়ই তোর মনে আছে। আমায় ডোবাস না যেন। বাকি কথা গিয়ে হবে।

লান্টু।"

এর উত্তরে অ্যান্ডি লিখেছে,

"লান্টু,

ভাবিস না। চলে আয়। আমি তো আছি।

তোর অ্যান্ডি।"

বাপ্পাকে বললাম, "সাবাশ পার্টনার। ব্রাভো! কেস তো তা হলে এবার পরিষ্কার। দুই মক্কেল একসঙ্গে য়্যানামাফিক পাপ করেছে।"

"রাইট, আর আমার ধারণা..."

ধারণাটা আর জানা হল না। কারণ, আবার ফোন। এবার মিঃ হাবিব।

এবারে বাপ্পার চোখ, মুখ কথা শুনতে-শুনতে গম্ভীরতর হতে থাকল। মিনিটকয়েক সে সব শুনে কেবল ওঁকে বলল, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ হাবিব। আমি কাল সকালেই মুভ করব।"

কী ব্যাপার তার কাছে জানতে চাওয়ার আগেই সে বলল, "একজন লোক সিরিয়াসলি উদ্ভেজ হয়ে আজ দিনপাঁচেক মুন্সিয়ারির এক হাসপাতালে ভর্তি আছেন। নামগোত্রহীন। আজ বিকেলে তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। কোথা থেকে আসছেন জিজ্ঞেস করায় তিনি অনেক কষ্টে যেটা বলেছেন তা হল, চম্পায়ক। হাবিবের ধারণা, ললিতবাবু বা ত্রিবেদীর মধ্যে কেউ হবেন। আর আমরা যেহেতু তাঁদের খোঁজই করছি সুতরাং আমাদের দ্রুত সেখানে যাওয়া দরকার।"

"বলিস কী রে!" আমার মুখ থেকে আপনা হতেই কথাটা বেরিয়ে এল।

"ব্যাগ গুছিয়ে নে ভাই। কাল পারলে আরও আগে বেরব। এখান থেকে মুন্সিয়ারি প্রায় দুশো কিলোমিটার। যেতে সারাদিন লেগে যাবে।"

"কিন্তু আমরা যাঁদের ভাবছি, লোকটা যদি তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ হয়?"

"সেটা ওখানে না গেলে তো বোঝার উপায় নেই।"

আমরা দ্রুত ডিনার সেরে শুতে চলে গেলাম। সকাল-সকাল উঠতে হবে। আমি ভেবেছিলাম ও পরমদেওকে আমাদের নতুন প্ল্যানের কথা বলে রাখবে। কিন্তু ও বলল, সকালেই যা বলার বলবে।

সত্যি বলতে কী, ঠিক এই মুহূর্তে কেসটায় নতুন করে উৎসাহ পাচ্ছি। অনেক ব্যাপার জানতে হবে। চুরি কে বা কে-কে করেছে নয় বোঝা গেল। কিন্তু কেন করেছে আর সে বা তারা এখন কোথায়? তাদের কেউ কি আমাদের আক্রমণ করেছিল? নাকি অন্য কেউ? এর মধ্যে আবার কেউ ফাউল গেম খেলছে না তো? বাপ্পা কি এই ব্যাপারগুলো ভেবেছে? কী হবে যদি কাল মুন্সিয়ারিতে গিয়ে দেখি, সেই লোকটা অন্য কেউ? এসব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে সাড়ে ছ'টায় বাপ্পার ডাকে উঠে পড়ে চটপট প্রস্তুত হয়ে নিয়ে একেবারে আটটার সময় নেমে দেখলাম, পরমদেও এসে গিয়েছেন। আমরা গাড়িতে ওঠার পরে বাপ্পা তাঁকে সমস্ত কিছু বলল। আজ তিনি আমাদের গাড়িতে। ওঁর গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার পিছু-পিছু আসছে।

সব শুনে বললেন, "তা হলে পিথোরাগড় থেমে চা-ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে পারেন। চন্দ্রভানকে বলে রাখি।"

"আমার কাছে এখন প্রতিটি মিনিট জরুরি। আপনি চাইলে যাওয়ার পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি। আপনি গিয়ে কাজ করতে পারেন।"

বাপ্পার গলায় একটা কেমন আদেশের সুর ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পরমদেও সেটাতে যেন গা করলেন না। উলটে বললেন, "নেমে যাব? কী বলছেন? এটা শোনার পরে আমার অন্য কিছু ভাবার জায়গা আছে নাকি? আচ্ছা, আপনি ভার্মাজিকে এই খবরটা দিয়েছেন?"

"এখনও তার দরকার দেখছি না। আগে গিয়ে দেখি।"

"বাট আই কান্ট ওয়েট টিল দেন," ভদ্রলোক ভার্মার নম্বরই মনে হয় ডায়াল করেছেন।

একটুক্ষণ বাদে অপর দিকের সাড়া পেয়ে হিন্দিতে পুরো আপডেট দিয়ে দিলেন। হয়তো ভার্মাও কিছু বলে থাকবেন। সেটা শুনে নিয়ে ফোনটা কেটে বললেন, "ওখানে পৌঁছে আপনাকে একবার ফোন করতে বললেন।"

বাপ্পা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে বাইরে তাকাল।

লোহাঘাট থেকে মুন্সিয়ারি দু'ভাবে যাওয়া যায়। গঙ্গোলিহাট, পাতাল ভুবনেশ্বর, বেরিনাগ হয়ে নাচানি দিয়ে অথবা এন এইচ-নয় হয়ে পিথোরাগড়, জহুলজীবী, সিলিং দিয়ে ঢুকে। পরমদেও বললেন, "পরের রুটে সময় কম লাগবে আর রাস্তাও ভাল পাওয়া যাবে। একশো আশি কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা যেতে ঘণ্টাপাঁচেক লাগা উচিত।"

বাপ্পা গাড়িতে ওঠার পর থেকে সেই যে নিহাল সিংহর পাশে বসে মুখে কুলুপ এঁটেছে, তো এঁটেইছে। আমরা আলমোরা, চম্পায়ত রোড দিয়ে শুরু করে এন এইচ নয়-এ এসে সোজা ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে পিথোরাগড় পৌঁছে গেলাম। আর পরমের অনুরোধে বাপ্পাকে এবার আধঘণ্টার জন্য তাঁদের হোটেলে নামতেও হল। আমাদের যে ছেলেটি আপ্যায়ন করে ভিতরের ডাইনিং হলে নিয়ে গেল সে-ই চন্দ্রভানন। শক্তসমর্থ চেহারা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোনও সময় হয়তো কুস্তিগির ছিল। চাপা গায়ের রং, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। দাড়ি নেই কিন্তু ঝোলানো গোঁফ আছে। বয়স পঁচিশের বেশি নয়। দেখে যদিও যতটা সমীহ উদ্রেককারী মনে হয়েছিল কথাবার্তা শুনে তেমন মনে হল না। হালকা গলার স্বর। আমাদের তিনজনকেই "স্যার, স্যার" করে গেল। খাবার বলতে আলু পরোটা, রায়তা আর সঙ্গে দুধ, চিনি দিয়ে ঘন করে বানানো চা। খেয়ে বুঝলাম এলাচ দেওয়া। অপূর্ব স্বাদ। তবে চা না বলে হট ডেজার্ট বলাটাই ভাল হবে। খাওয়ার পরে পরম একবার ভিতরে কোনও দরকারে গেলেন। বাপ্পা ইতাবসরে চন্দ্রভানের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। আমি কথোপকথন নীচে দিয়ে দিলাম,

বাপ্পা: মিঃ ত্রিবেদী কেমন লোক? কথা তো হয়েছে অনেক।

চন্দ্রভান: আচ্ছা আদমি।

বাপ্পা: তুমি জান, উনি আজ কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ?

চন্দ্রভান: জি সাব।

বাপ্পা: কোথায় যেতে পারেন কোনও ধারণা আছে?

চন্দ্রভান: ট্রেকিং করতেন তো। হিল্‌সের ইধার সে উধার ঘুরতেন। কোথায় আছেন কী করে বলি?

বাপ্পা: আমরা অনুমান করছি দেবীধুরায় চুরির ব্যাপারে তিনি যুক্ত থাকতে পারেন।

চন্দ্রভান: সেটা হলে আমি অবাক হব। উনি সাচ্চা আদমি আছেন।

বাপ্পা: আর তোমার এখানকার মালিক?

চন্দ্রভান: (একটু হেসে) বহোত আচ্ছে লোগ হ্যায়।

বাপ্পা: তুমি এখানে কতদিন কাজ করছ?

চন্দ্রভান: আজ দু'বছর হল।

বাপ্পা: এই হোটেলে গেস্টের ভিড় কেমন হয়?

চন্দ্রভান: সিজ়ন মে ভিড় হয়। এমনিতে উতনা নেহি।

বাপ্পা: থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি এখন আসতে পার।

একটা ছোট্ট অসুবিধের কথা শোনা গেল। আমরা পিথোরাগড় থেকে যে রাস্তা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম, সেদিকে এখন কাজ হচ্ছে। এটা চন্দ্রভানই জানাল। বিকল্প হচ্ছে থল নামে একটি জায়গা দিয়ে যাওয়া। সেটা এখান থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। শুধু এদিকটায় কুয়াশা বেশি থাকায় গাড়ি চালাতে একটু সমস্যা হতে পারে। কিন্তু আমরা সে পথেই চলা শুরু করলাম। পাহাড়ি আবহাওয়া বোঝা মুশকিল। আধঘণ্টা চলার পরে দেখলাম, দিব্যি কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠে গিয়েছে। আর দূরে পর্বতশৃঙ্গ যেন বরফের মুকুট পরে বসে আছে। পথের দু'ধারে সারি দিয়ে পাইন, ওক আর দেওদার গাছ। এর আগে আসার সময় রামগঙ্গা নদী চোখে পড়েছিল। মুন্সিয়ারিতে সেটাই গৌরীগঙ্গা হয়ে যাবে কিনা অবশ্য জানি না। তবে অত উপর থেকে নীচে সরু ফিতের মতো সে নদী নাকি সেখান থেকে দেখা যায়।

আপাতত কয়েকটি মাঝারি আকারের ঝরনা ছাড়া আর কিছু দেখিনি। এখান থেকে যত সামনে এগোচ্ছি গাছপালা কম, রাস্তা আরও খাড়া। মাঝে বিরলি ফল্‌স নামে একটি বিখ্যাত ঝরনা আর কালামুনি গেটওয়ে পেরিয়ে আমরা মুন্সিয়ারিতে যখন ঢুকলাম, সূর্য তখন মধ্যগগনে। জায়গাটা একটা ভ্যালির মতো। একটু যেন শেষের দিকে নামতে হল। এখানকার স্থানীয় হাসপাতালেই বাপ্পা আগে যাবে বলেছিল। সেটার দিক নির্দেশ নিয়ে যেতে-যেতে আরও মিনিটদশেক। মিঃ হাবিবের কথা অনুযায়ী সেখানে দু'জন পুলিশের লোক ডিউটিতে ছিল। ঢোকার মুখে পরিচয় দিতে সুপারের ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। বাপ্পা সরাসরি আত্মপরিচয় দিয়ে আসার কারণ বলে পেশেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চায় এটা জানিয়ে দিল। ভদ্রলোকের নাম ডাঃ সিদ্ধান্ত।

বাপ্পাকে বললেন, ''খুব ভাল হয়েছে আপনারা এখানে এসেছেন। আসুন আমার সঙ্গে। এসব পেশেন্টকে সকলের সঙ্গে রাখাও মুশকিল। কাল পুলিশের লোক এসে বলাতে আমরা আলাদা কেবিনে ওঁকে শিফট্ করেছি।''

ওঁর সঙ্গে আমরা তিনজনেই করিডর দিয়ে হাঁটছি। ছোট হাসপাতাল। কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। করিডোরের শেষপ্রান্তে এসে রাস্তা ঘুরেছে ডান দিকে। আর সেদিকে প্রথম ঘরটিতেই সুপার আমাদের নিয়ে ঢুকলেন। আমার কেন যেন খুব উত্তেজিত লাগছিল কাকে দেখব এটা ভেবে। ব্রিবেদী, ললিতবাবু না অন্য কেউ। উলটো দিকে মুখ করে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। বাপ্পা ডাকতে না করে নিজেই সেদিকে গেল। সঙ্গে আমরাও।

''ও গড! হু ইজ হিঃ'' পরম ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন।

বলার কারণ আছে। আমি আর বাপ্পা মুখ দেখে চিনে গিয়েছি, ললিতবাবু। কিন্তু পরমের এটা জানার কথা নয়।

''হি ইজ নট আনন্দ, মিঃ ভটচারিয়া। হোয়্যার ইজ আনন্দ? হু ইজ দিস ম্যান?''

''আই নো হু হি ইজ। কাম আউটসাইড।''

বাপ্পা বাইরে বেরিয়ে এল। আমরাও। এটা ভেবে নিশ্চিন্ত লাগছে যে, বাপ্পার অন্তত ফিরে গিয়ে চন্দ্রমোহনবাবুকে কিছু বলার থাকবে। প্রথমেই সে পরপর চারটে ফোন করল। ললিতবাবুর বাবা, কাকা, মিঃ হাবিব আর অনুপম বকরটা। আসল খবরটা সবাইকে বলে দিয়ে স্বস্তি দেওয়া। এবার ডাঃ সিদ্ধান্তকে সে বলল, ''চলুন আপনার ঘরে বসা যাক। আপনিও চলুন মিঃ কউল।''

আমরা ডাক্তারবাবুর ঘরে এসে বসার পর বাপ্পা ঘটনাটা কী হয়েছে জানতে চায়। ডাঃ সিদ্ধান্ত জানালেন, ''দিনসাতেক আগে স্থানীয় কিছু লোকজন একটি গাড়িতে করে এঁকে এনে ভর্তি করে দিয়ে যায়। লোকটি তখন অজ্ঞান। পায়ে গুলি আর কাঁধে মারাত্মক চোট লেগেছে। সারা গায়ের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতচিহ্ন। তার উপরে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। খুবই খারাপ অবস্থা। এখানকার এই সামান্য ব্যবস্থায় তাঁকে বাঁচানো যাবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। সবচেয়ে সমস্যা হল, জ্ঞান থাকছিল না। একটা বিরাট ঝড় বয়ে গিয়েছে সারা শরীরে। যারা নিয়ে এসেছিল তারা এখান থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরের এক গ্রামের বাসিন্দা। খাদের ধারে একে পড়ে থাকতে দেখে, সঙ্গে কোনও আইডি প্রুফ নেই। টাকাপয়সা নেই। জামাকাপড়ের হালও খুব খারাপ। তো যাই হোক, আমাদের এখানকার ডাক্তারদের চেষ্টা আর খানিক কপালজোরে গতকাল সকাল থেকে একটু বেটার আছেন। কিন্তু বারবার ঘুমিয়ে পড়ছেন। জেগে থাকলে বলছেন, বাড়িতে খবর দিতে। বাড়ি নাকি কলকাতায়। কিন্তু কোনও নম্বর তাঁর মনে পড়ছে না। শুধু চম্পায়ত এসে দু'দিন ছিলেন এটাই তিনি জানেন।''

বাপ্পা এবার মিঃ ভার্মাকে আপডেট দিয়ে পরমকে আমাদের লখনউ আসার আসল কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে বলল, ''এঁর কাছ থেকেই আনন্দ ব্রিবেদীর খবর পেতে হবে। আপাতত কিছু খাওয়া দরকার।''

পরম বললেন, ''সে আমি আপনাদের খাওয়াতে দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। কাছেই পাশে লজ আছে। সেখানে বেশ ভাল খাবার পাবেন। কিন্তু এটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকছে। এর মানে হল, আপনি একেবারে অন্য কেসে এসেছিলেন আর সেটাই আপনার আসল উদ্দেশ্য ছিল, যেটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা ভেবেছিলাম, আনন্দর জন্যই আপনি এখানে আসছেন।''

বাপ্পা একটু হেসে বলল, ''আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন। আমি জানি আমি এখানে কেন এসেছি।''

পরের আধঘণ্টায় পাশে লজ থেকে লাঞ্চ সেরে আমরা ফিরে এলাম হাসপাতালে। ডাঃ সিদ্ধান্ত জানালেন, পেশেন্টকে ওষুধ আর ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য ডাকতে হয়েছে। তিনি এখন জেগে আছেন। আমরা গেলে অসুবিধে নেই। বাপ্পা আর দেরি না করে ভিতরে ঢুকে এল। পিছনে আমরা দু'জন।

নিজের কার্ড দেখিয়ে অতি নরম স্বরে সে তার এবং আমাদের পরিচয় দিয়ে এখানে আসার কারণ জানিয়ে ললিতবাবুকে আশ্বস্ত করল যে, তিনি পুরো সুস্থ হলেই আমরা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ভদ্রলোক পরম বিশ্বাসে বাপ্পার হাত চেপে ধরে দু'চোখ খানিক সময় বন্ধ করে বললেন, ''জানেন আমি যে বেঁচে আছি, এটাই ভেবে অবাক লাগছে।''

বাপ্পা বলল, ''কেন বলুন তো? কী হয়েছিল আপনার? আমাদের একটু খুলে বলবেন?''

উনি মুখ খোলার আগেই যিনি আর এম ও তিনি, আর-একজন নার্স এসে একবার দেখে বললেন, ''ভাল আছেন এখন। কিন্তু প্লিজ ওঁর যেন কোনও স্ট্রেস না হয় সেটা দেখবেন। যেটুকু উনি নিজে বলতে পারেন সেটাই জানবেন অনেক।''

বাপ্পা বলল, ''অবশ্যই আমরা সেটা খেয়াল রাখব।''

ললিতবাবু বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সে অতি ধীরে, কষ্ট করে থেমে-থেমে, ভেবে-ভেবে বলা।

''লোভ আমার এই হাল করে ছাড়ল। আমার চাকরি চলে গিয়েছে। কারণ, যে হোটেলে কাজ করতাম সেটা লসে রান করায় মালিক তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। কী করব, কোথায় যাব ভাবতে-ভাবতে অ্যান্ডির কথা মনে পড়ল। আমার স্কুলের বন্ধু। আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। সে বলল কিছুদিনের জন্য এখানে চলে আসতে। ভাল কাজ আছে। আমি ভাবলাম, তার হোটেলেই কোথাও আমার জায়গা হবে। কিন্তু আমি জানতাম না তার মাথায় অন্য প্ল্যান ঘুরছে। আমায় বলল, বাড়িতে টেকিংয়ে যাচ্ছি বলে আসতে। এক সপ্তাহের ব্যাপার, আমি বুঝিনি। তার কথামতো কানপুর স্টেশনে মিট করলাম। সে আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে বলল, চম্পায়ত যাওয়ার পথে টনকপুর স্টেশনে একজন আমাকে ফোন করে মিট করবে। তাকে দিয়ে দিলেই হবে। আমি তখনও বুঝিনি জানেন। ভদ্রলোক কথামতো

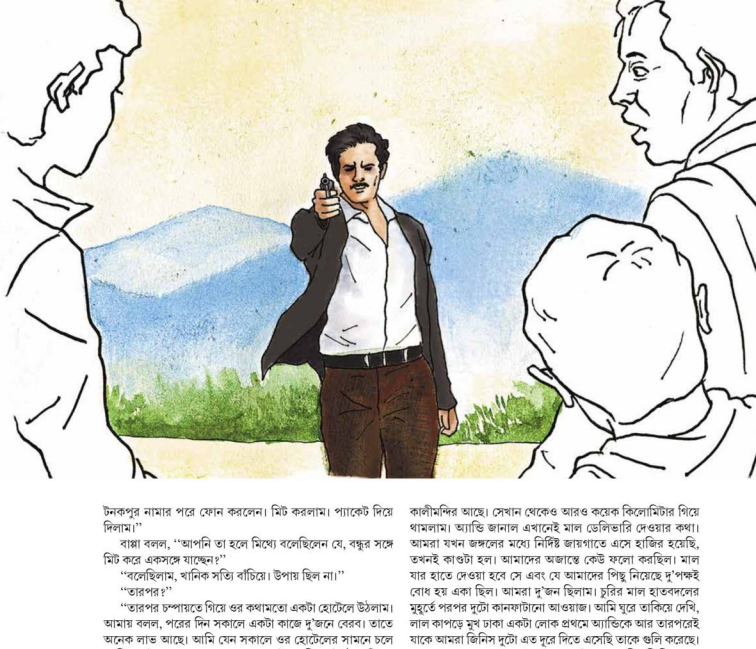

টনকপুর নামার পরে ফোন করলেন। মিট করলাম। প্যাকেট দিয়ে দিলাম।''

বাপ্পা বলল, ''আপনি তা হলে মিথ্যে বলেছিলেন যে, বন্ধুর সঙ্গে মিট করে একসঙ্গে যাচ্ছেন?''

''বলেছিলাম, খানিক সত্যি বাঁচিয়ে। উপায় ছিল না।''

''তারপর?''

''তারপর চম্পায়তে গিয়ে ওর কথামতো একটা হোটেলে উঠলাম। আমায় বলল, পরের দিন সকালে একটা কাজে দু'জনে বেরব। তাতে অনেক লাভ আছে। আমি যেন সকালে ওর হোটেলের সামনে চলে আসি। সেইমতো গেলাম। তারপর একটা গাড়িতে উঠে দেবীধুরা নামের এক জায়গাতে গিয়ে এক হোমস্টেতে গিয়ে উঠলাম। আমাকে ঘরে থাকতে বলে সারাদিন কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়াল। রাতে ফিরে এসে এবারও আমাকে প্ল্যানটা বলল। জানাল বারাহি মন্দিরের কাছে অনেক প্রাচীন এবং অনেক দামি জিনিস মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। সেটা চুরি করতে হবে। আমি আঁতকে উঠলাম। কিছুতেই এতে রাজি হতে চাইনি। কিন্তু সে বলল, প্রচুর টাকার ব্যাপার আছে। শুধু চুরি করে একজনের হাতে ডেলিভারি দিতে হবে। আর চুরিও আমাকে করতে হবে না। অ্যান্ডিই করবে। আমায় শুধু ঠিক সময়ে মন্দিরের পিছনে থাকতে হবে। রাজি হতেই হল। এই প্রবল ঠান্ডায় রাত দুটোর সময় তার বলা জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিক বাদেই সে কাজ সেরে ফিরে এল। তারপর আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গেলাম বাসস্ট্যান্ডে। ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়ে। লোকাল বাস। আমি এদিকের কিছু চিনি না। সারাদিন চলার পরে সে আমাকে নিয়ে নামল বেরিনাগ নামে এক জায়গায়। সেখানে সেদিন রাত কাটিয়ে পরের দিন থেকে শুরু হল পায়ে হাঁটা। কোথায় না-কোথায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দু'দিন হেঁটেছি। রাতে কোনও গ্রামে থাকতে হয়েছে। তারপরের দিন সকালে আমরা এসে হাজির হলাম কালামুনি টপ নামে এক জায়গায়। সেখানে একটা কালীমন্দির আছে। সেখান থেকেও আরও কয়েক কিলোমিটার গিয়ে থামলাম। অ্যান্ডি জানাল এখানেই মাল ডেলিভারি দেওয়ার কথা। আমরা যখন জঙ্গলের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গাতে এসে হাজির হয়েছি, তখনই কাণ্ডটা হল। আমাদের অজান্তে কেউ ফলো করছিল। মাল যার হাতে দেওয়া হবে সে এবং যে আমাদের পিছু নিয়েছে দু'পক্ষই বোধ হয় একা ছিল। আমরা দু'জন ছিলাম। চুরির মাল হাতবদলের মুহূর্তে পরপর দুটো কানফাটানো আওয়াজ। আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি, লাল কাপড়ে মুখ ঢাকা একটা লোক প্রথমে অ্যান্ডিকে আর তারপরেই যাকে আমরা জিনিস দুটো এত দূরে দিতে এসেছি তাকে গুলি করেছে। একেবারে ক্লোজ রেঞ্জে। দু'জনে ওখানেই শেষ। চুরির জিনিস আর তার বিনিময়ে আমরা যে টাকা পেতাম সেই ব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে এবার সে আমার দিকে ঠান্ডা চোখে তাকাল। মনে হল আমি এবার গভীর বিপদে পড়ব। প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করলাম।

''পাগলের মতো ছুটে চলেছি। কিন্তু সে লোকও আমায় তাড়া করেছে। ক্রমশ দূরত্ব কমে আসছে। আর বোধ হয় কিছু করার নেই। নাহ, আমি আর পারলাম না। মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। কারণ, পায়ে গুলি লেগেছে আর-একটা বোধ হয় কাঁধে লেগে বেরিয়ে গিয়েছে। কোনওমতে উঠে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে গিয়ে নিজেকে আড়াল করলাম। চোখে অন্ধকার দেখছি। লোকটা আমাকে খুঁজছে দেখতে পাচ্ছি। অনেকটা সময় চারপাশ খুঁজে সে হতোদ্যম হয়ে টাকা আর চোরাই জিনিস নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার তখন আর চলার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ওইখানে ওভাবে থাকলে কেউ খুঁজেও পাবে না। অতি কষ্টে তাই চলতে শুরু করলাম। একেবারে অন্ধের মতো। বনে-বাদাড়ে, কাঁটা-ঝোপ মাড়িয়ে ঠেলে সরিয়ে এভাবে কতক্ষণ কোন দিকে চলেছি জানি না। এক সময় মনে হল, মাথার উপরে আকাশ হয়তো এবার দেখতে পাব। পেলামও। মনে হল জঙ্গল থেকে বেরতে পেরেছি, কিন্তু আর আমার কিছু মনে নেই। তারপর যখন জ্ঞান এল দেখলাম, আমি

এখানে। কী করে এসেছি, কারা নিয়ে এসেছে, কিছুই জানা নেই। তবে আমার বন্ধু যে পাপের পথে পা বাড়িয়েছিল, এ আমি অনেক দেরিতে বুঝেছি।"

বাপ্পা সব শুনে একবার পরম আর-একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কে আপনার বন্ধুকে গুলি করেছিল মনে আছে? আবার দেখলে চিনতে পারবেন?"

খানিকক্ষণ ভেবে ললিতবাবু বললেন, "মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। তবু হয়তো পারতেও পারি।"

॥ ৭ ॥

আমি আর বাপ্পা এই মুহূর্তে কে এম ভি এন-এর রেস্ট হাউজে উঠেছি। পরমদেও এখানে তাঁর কোনও দেশওয়ালি ভাইয়ের হোম স্টেতে থাকবে। এখন সন্ধে সাতটা বাজে। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমাদের ঘরে রুম হিটার চলছে। গরম কফি নিয়ে দু'জনে বসেছি।

আমি বললাম, "কেসটা তো এবার অন্য দিকে ঘুরে গেল রে!"

চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বাপ্পা কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, "তাই দেখছি।"

"মিঃ ত্রিবেদীকে কে খুন করতে পারে?"

"বলা মুশকিল। এটা ঘটনা, কেউ তাঁকে অনেক আগে থেকে লক্ষ করে যাচ্ছিল। আর আমার বিশ্বাস সে আমাদেরও লক্ষ করছে। তাই দেবীধুরায় আক্রমণ। সে চায় না যে আমরা বেশি মাথা ঘামাই। সব নতুন করে ভাবতে হবে নীল।"

কফি শেষ করে এবারে বাপ্পা মিঃ হাবিবকে মোবাইলে সব কিছু জানিয়ে বলল, কাল সকালে সে একবার অকৃস্থলে যেতে চায়। লোকাল পুলিশ ছাড়া তা সম্ভব নয়। আর ত্রিবেদী এবং আর-একটি লোকের লাশ উদ্ধার হওয়া দরকার। তার অসম্ভব গম্ভীর মুখ দেখে যেটা বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে সে সবিশেষ চিন্তিত।

আজ খুব ভোরে উঠে পঞ্চচুল্লিতে দিনের প্রথম আলো দেখে মন ভরে উঠল। সাদা বরফের উপর প্রথমে একটা হালকা কমলা আলো আর সেটাই ধীরে-ধীরে বাড়তে-বাড়তে একটা লালচে আভায় পরিবর্তিত হয়ে পাহাড়ের মাথা ঝকঝক করতে লাগল। অদ্ভুত সুন্দর। মহাভারতে নাকি কথিত আছে, স্বর্গে প্রস্থানের সময় দ্রৌপদী তাঁর পাঁচ স্বামীর জন্য এই পঞ্চচুল্লিতে রান্না করেছিলেন। পঞ্চচুল্লির পাঁচ শৃঙ্গের নামকরণও করেছিলেন পাঁচ স্বামীর নামে। এখান থেকে একটু দূরেই নন্দাদেবীর মন্দির। শুনেছি সেখান থেকে নাকি সূর্যাস্তের দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর লাগে।

একবার ললিতবাবুকে দেখে আমরা বেরলাম। এখানকার থানা থেকে একটি পুলিশের জিপ এসেছে। আর সঙ্গে আছে আমাদের গাড়ি। পরমদেও চলে এসেছেন। যেটুকু জানা গেল, তাতে জায়গাটা গাড়িতে যেতে মিনিটচল্লিশ লাগবে। ডাঃ সিদ্ধান্তের কাছে শিবরাম নামে একজনের নম্বর ছিল, যে কিনা আরও কয়েকজনের সাহায্যে আনন্দকে উদ্ধার করে আনে। বাপ্পা কাল রাতে তাঁকে ফোন করে বলায় তিনি জানান, এই লোকটি থাকলে রাস্তা চিনতে সুবিধে হবে। অন্যথায় মুশকিল হতে পারে।

আমাদের গাড়িতে যেতে-যেতে বাপ্পা পরমকে বলল, "আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল।"

"বলুন না।"

"আনন্দ ত্রিবেদীর টাকার অভাব আছে এমন কিছু শুনেছিলেন? বা অর্থকরী ব্যাপারে তাঁর খারাপ উদ্দেশ্য থাকতে পারে এ জাতীয় কোনও খবর জানতেন?"

একটু ইতস্তত করে পরম বললেন, "সে রকম নয়। তবে আমার কাছে কাকার অসুখের জন্য লাগবে বলে একবার তিরিশ হাজার টাকা চেয়েছিল। আমি দিয়েওছিলাম। তারপরে অবশ্য মাসে এক হাজার করে সে দিত। কিন্তু তাও এখনও হাজার পনেরো পাই।"

"মিঃ ভার্মা এটা জানেন?"

"নাহ, আমি বলিনি। এই ধারের কথাটা আনন্দ ওঁকে বলেনি। আমাকে বেশি কাছের লোক মনে করেছে।"

"এমন কী হতে পারে, যে কারণে তাঁর প্রাণ গেল, এই জাতীয় কাজ সে আগেও করেছে?"

"হতে পারে। এখন তাই মনেও হচ্ছে।"

"খুনটা কে করে থাকতে পারে বলে মনে হয়?"

"নো আইডিয়া। এদিকে বর্ডার কাছে। টেকিংয়ের নাম করে বা অন্য ছুতোয় স্মাগলিংয়ে হাত পাকানো খুব কঠিন কিছু নয়। তার কাজে তো আর কেউ রোজ নজরদারি করছে না।"

"সেটা ঠিক। আমি শুনেছি যে, নেপালের উৎসাহেই আপনাদের লোহাঘাট আর পিথোরাগড়ের ব্রাঞ্চ খোলা হয়। কিন্তু আপনাদের আয় কেমন হয়? লাভের মুখ দেখেন?"

"ইয়েস! আমাদের এদিকে ইদানীং প্রচুর টুরিস্ট আসছে। প্রফিটও বাড়ছে।"

বাপ্পা বলল, "রিয়েলি! বাড়লে তো ভালই। আমি ভাবছি অন্য কথা।"

"কী কথা?"

"মিঃ ভার্মা এই তিন হিল স্টেশনের ডিটেল খবর কতটা রাখেন? উনি তো লখনউতে আছেন।"

"রাখতে হয় মিঃ ভটচারিয়া। নিজে না পারলে মঙ্গলকে দিয়ে খবর নেন। সে খুব এফিশিয়েন্ট। এই তো এখন সে চম্পায়ত এসেছে। এর পরে উনি নিজে এসে দিনকতক থাকবেন। সব দেখবেন। মঙ্গলকে তখন পিথোরাগড়ে পাঠাবেন। কিছু বাড়তি গেস্ট আসছে ইস্তানবুল থেকে। চন্দ্রভানের সাপোর্টে মঙ্গল থাকবে।"

"আনন্দ লখনউতে শেষ কবে গিয়েছিলেন?"

একটু ভেবে উনি বললেন, "ওই যে ও ছুটি নিয়েছিল, তার আগে।"

"লখনউতে ওর আসল বাড়ি। সেখানে যেতেন না?"

"জানি না। শুনেছি ওর কাকা কানপুরে থাকেন।"

"আমি শুনেছি আনন্দ খুব কাজের ছেলে ছিলেন। আপনার কী মত?"

"আমিও তাই বলব।"

"ইন্টারেস্টিং।"

"ইনডিড। উই আর লাইক আ বিগ ফ্যামিলি। ত্রিবেদী তার একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট ছিল। আমরা তার এই পরিণতির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তাই আপনি মাইন্ড করছেন বুঝেও আপনার সঙ্গে তদন্তে থাকতে হচ্ছে। এটা জেনেও যে, ত্রিবেদী আপনার ক্লায়েন্ট ছিল না।"

"আমাকে খুঁচিয়ে লাভ নেই। আমি অত সহজে চটি না। আর এখন কোথায় কেন আর কার জন্য যাচ্ছি সেও আপনি জানেন।"

গাড়ি থেমেছে। শিবরাম আমাদের দেখে এগিয়ে এসে তাকে অনুসরণ করতে বলল। সামনে ঘন জঙ্গল। এ পথে বেশি ভিতরে যাওয়া যাবে না। ডান দিকে গভীর খাদ। মিনিটদুয়েক তার পিছু-পিছু গিয়ে এক জায়গাতে থেমে গেলাম। সে জানাল, এখানেই ললিতকে পেয়েছিল। জায়গাটার তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। খানিক পাহাড়ি গাছপালা আর ঘাসের সমাহার।

"তোরা এখানেই থাক। আমি একটু ঘুরে দেখে আসি।"

কথাটা বলে বাপ্পা শিবরাম আর দু'জন পুলিশকে নিয়ে ঢুকে গেল। আমরা ফিরে এসে খানিক দূর এগিয়ে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। আমার মনে হল বাপ্পাকে ভুল বুঝছেন পরম। তাঁর মনের অন্ধকার দূর করা দরকার। তাই তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, দুটো ব্যাপার একই সূত্রে গাঁথা। মনে হল, তিনি এবারে বুঝলেন। ত্রিবেদীর খুন হওয়ার ব্যাপারে যে ভার্মা এখন চোখে অন্ধকার দেখছেন সেটা বললেন। আজ সকালে বাপ্পার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি যে-কোনও মূল্যে খুনিকে পাকড়াও করতে চান।

বাপ্পা হাজির হল ঘণ্টাদুয়েক বাদে। ঢুকেছিল টিপটপ পোশাকে। ফিরল ঝোড়ো কাক হয়ে। বলল, তেমন কিছু চোখে পড়েনি। আর বোঝারও উপায় নেই যে, ঠিক কোথায় গুলি চলেছে। কাঁটাঝোপ এড়িয়ে একটা জায়গাতে এসে নরম মাটিতে কিছু পায়ের ছাপ আছে। কিন্তু তা থেকে কাউকে চেনা মুশকিল। বাপ্পার অনুমান, খুনি ললিতবাবুকে ধরতে না পেরে ঘটনাস্থলে ফিরে গিয়েছিল। আর তখন লাশ গায়েবও করে থাকতে পারে অথবা নীচে ফেলে দিয়ে থাকতে পারে। সেটা জানতে আরও তদন্ত জরুরি।

রেস্ট হাউজে ঢুকতে-ঢুকতে প্রায় একটা বেজে গেল। আমরা সরাসরি দুপুরের খাওয়ার জন্য ডাইনিং হলে গিয়ে বসলাম। আজ খেতে ঠিক পনেরো মিনিট লাগল। তার একমাত্র কারণ আমি, পরম আর বাপ্পা কেউই বিশেষ কথা বলিনি। ঘরে আসার পরে খাটের উপরে বসে সে জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট একটা মোড়ানো কাগজ বের করল।

"কী আছে এতে?" আমি কৌতূহলী হলাম।

কাগজটা খুলতে ভিতর থেকে দুটো জিনিস বেরল। একটা বুলেট আর একটা লাল কাপড়ের টুকরো।

"কোথায় পেলি এগুলো?"

"অকুস্থল বলে যদি কিছু থাকে, তবে সেখানে। বা তার কাছে কোথাও।"

"বুলেটটা কার মনে হয়?"

"যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আনন্দের কাছে রিভলভার ছিল না তবে বাকি থাকে খুনি।"

"আর কাপড়ের টুকরোটা?"

"আগে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায়?"

খানিক ভেবে কারওরই মাথায় এল না। বললাম, "বুলেটের সোর্সটা কীভাবে বেরবে?"

"এখানে থেকে হবে না। এজন্য বড় শহর চাই। ভাবছি কাল যদি পিথোরাগড় বা চম্পায়ত চলে যাই কেমন হবে?"

"হঠাৎ?"

"আজ একবার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জানতে চাইব যে, ললিতবাবুকে এখন মুভ করানো যাবে কিনা।"

"তাতে লাভ? রিস্ক হয়ে যাবে বাপ্পা।"

"সে জানি। আমি ওঁর কথার বাইরে গিয়ে কিছু করব না। আসলে ললিতবাবু একজন আই ইউটনেস। তাই তাঁকে আগে প্রোটেক্ট করতে হবে।"

"আর-একটু খুলে বলবি? প্রোটেকশনের কথা আসছে কেন?"

"এইজন্য যে খুনি যেই হোক সে জানে ললিতবাবু জীবিত। তাই তিনি মুখ খুললে খুনির বিপদ বাড়বে।"

"সে লোক কে হতে পারে?"

"সেটাই তো কোটি টাকার প্রশ্ন।"

বাপ্পা বিকেলে ললিতবাবুকে দেখতে গেল। সেইসঙ্গে ডাঃ সিদ্ধান্তর সঙ্গেও কথা বলবে। আমি আর যাইনি। তার পিছনে কারণ দুটো। এক, খানিক বিশ্রাম আর দুই, সূর্যাস্ত দেখা। কাল যদি ফিরে যাই তবে এটা মিস হবে। আজ আকাশ পরিষ্কার আছে। তাই এ সুযোগ ছাড়া যায় না। বিকেলে বারান্দার ব্যালকনিতে কফি নিয়ে বসে দু'চোখ ভরে এই অবিস্মরণীয় দৃশ্য উপভোগ করলাম।

বাপ্পা ফিরে এল সাড়ে ছ'টা নাগাদ। লক্ষ করলাম, এবেলা তার চোখে-মুখে স্বস্তির ছাপ। চায়ের অর্ডার দিয়ে এসে সে পোশাক বদলে খাটে উঠে বসল।

ললিতবাবু আজ অনেকটাই সুস্থ। বাপ্পা ওর মোবাইল থেকে ওঁর বাবা আর কাকার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছে। দু'জনেই তাতে খুশি। কিন্তু বাপ্পার কাছে অন্য খবর আছে। ললিতবাবুর ধারণা, আনন্দ ত্রিবেদী এমন কাজ আগেও করেছেন এবং সেটাও কারও হয়ে। তিনি যে-ক'দিন আনন্দর সঙ্গে ছিলেন, তার মধ্যে কেউ ওঁকে কয়েকবার ফোন করেছে। আনন্দর ফোনে খুব সজাগ দেখেছেন, 'বি জে কলিং'। তিনি এটা মনে করতে পারলেন। বি জে কে তা তিনি জানেন না। কিন্তু যে ক'বার ফোন এসেছে, সে উঠে বাইরে গিয়ে কথা বলেছে। তাতেই তার ধারণা হয়েছে আনন্দ আসলে এজেন্ট। আর ডাঃ সিদ্ধান্ত বলেছেন, ললিতবাবুকে কাল পর্যন্ত এখানেই রাখা ভাল। কাল বিকেলে একবার উনি চেক-আপ করে যদি মনে করেন যে, সমস্যা নেই তবে পরশু তিনি ছাড়া পেতে পারেন। বাপ্পা তাতে রাজি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এর পরে তোর প্ল্যানটা কী?"

"কাল সারাদিন আমরা থাকছি না। কিন্তু কী করব, কোথায় যাব সেসব এখন বলা যাবে না। সকাল সাতটায় বেরতে হবে। ফিরতে সন্ধে।"

"বেশ কথা।"

পরমদেও ফোন করেছিলেন। কাল আমাদের প্রোগ্রাম জানার জন্য। বাপ্পা অম্লানবদনে একটা মিথ্যে দিয়ে শুরু করল, "আমরা এখান থেকে চকৌরি যাচ্ছি, বিকেলে ফিরব। আর পরশু ললিতবাবুকে নিয়ে নেমে যাব। ব্যাক টু লখনউ। সেখান থেকে কলকাতা। যে কাজে আসা সেটা তো হয়ে গিয়েছে।"

ত্রিবেদীর কেসটার কী হবে জানতে চেয়েছেন পরম। বাপ্পা জবাবে বলেছে, আনন্দ ত্রিবেদীর লাশ এবং সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য না পাওয়া গেলে তার পক্ষে খুনিকে ধরা সম্ভব নয়। পুলিশ যদি কিছু করতে পারে তো ভাল। সে থেমে-থেমে নামবে। কারণ, ললিতবাবুর পক্ষে একটানা বেশি জানি কারা মুশকিল।

ফোনটা রাখার পরে বললাম, "ইয়ে, মানে, এটা ঠিক বাপ্পাদিত্য সুলভ উত্তর হল কি?"

স্মিত হেসে সে বলল, "তদন্তের খাতিরে সব চলে নীল। তোর সেটা জানার কথা।"

॥ ৮ ॥

আমরা এই খানিক আগে মুন্সিয়ারির রেস্ট হাউজে ফিরে এলাম। কয়েকটা জরুরি কথা বলে রাখি। ললিতবাবু আজ বাপ্পার কাছে নিজের ব্যাগপত্তর, মোবাইল, টাকাপয়সা কোথায় আছে জানতে চেয়েছিলেন। ওঁর মনে আছে গুলি খেয়ে যখন প্রাণভয়ে ছুটছিলেন, তখন সঙ্গে ব্যাগ ছিল না। জঙ্গলে মোবাইলের টাওয়ার কাজ করে না বলে সেটাও ব্যাগে রেখে দিয়েছিলেন। শুধু পার্সটা থাকার কথা। আর আনন্দর ব্যাগটাও তাঁর সঙ্গে ছিল। তার কী হল?

ওঁর জানার কথা নয় সারাদিন আমরা কী করেছি। বাপ্পার কথায় পুলিশ আজ আরও লোকজনসমেত গভীর জঙ্গলে প্রায় চিরুনি তল্লাশি করেছে। কিন্তু কারও ব্যাগ পাওয়া যায়নি। এর মানে, হয় সেসব নীচে গভীর খাদে ফেলে দেওয়া হয়েছে অথবা খুনি নিজেই সেগুলি নিয়ে চলে গিয়েছে। তবে মাটিতে কোনও কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মিলেছে। অকুস্থলে লোকটা হয়তো ফিরে এসেছিল। ওইভাবে দু'জন লোককে টেনে নিয়ে গিয়ে নীচে কোথাও ফেলে দিয়েছে। সেটা কোথায় হতে পারে এ নিয়ে পুলিশ আরও তদন্ত করবে। আর তেমন পক্ষে কিছু খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। বাপ্পা ললিতবাবুকে সেই কাপড়ের টুকরোটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, তিনি সেটা চেনেন কিনা। চিনলেন, আর বলেই দিলেন লোকটার নাক পর্যন্ত ঢাকা ছিল এই কাপড়েই। চেহারার বর্ণনা চাওয়া হলে বললেন, অত তাঁর মনে নেই। তবে সে লম্বা ছিল। আবার দেখলে হয়তো চিনতে পারবেন। কাল সকালে বেরবার কথা ওঁকে বলে চলে আসছিলাম। বাপ্পা আমাকে দাঁড়াতে বলে ডাঃ সিদ্ধান্তর ঘরে ঢুকল। মিনিটপাঁচেক বাদে সে যখন ফিরে এল তখন তাকে জিজ্ঞেস করায় বলল, "কাল ললিতবাবু আমাদের সঙ্গে ফিরবেন। তার আগে এখানকার বিল, ওষুধ, একটা প্রেসক্রিপশন এসব চেয়ে রাখলাম। পরে ওঁর দরকার হতে পারে। আর বিলটা

এখন তো আমাকেই দিতে হবে। যেহেতু তিনি কপর্দকশূন্য। আজও হাসপাতালে পুলিশ থাকবে। সেটা রাখা জরুরি।''

আমার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছে। এবার সেটাই জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

''বাপ্পা বি জে কে? লাল কাপড় কার কাছে ছিল? আর বুলেট কার রিভলবারের? এগুলি ভেবেছিস?''

কিছু ভেবে সে বলল, ''প্রথমটা বুঝেছি। বাকি দুটো নিয়ে আমার একটা অনুমান আছে। দেখা যাক। পরে বলব।''

''তোর কাছে পুরো কেসটা ক্লিয়ার?''

''নাহ। তবে অনেকটাই।''

''খুনদুটো কে করল?''

''যে দেবীধুরায় আমাদের মারতে চেয়েছিল।''

''সেটা কথা নয়। লোকটা কে? আমাদের পরিচিত কেউ?''

''হতে পারে।''

''তা হলে রিভলবার তার?''

''হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।''

''কিন্তু খুনের মোটিভ কী?''

''খুব সোজা। তোমায় কাল খেতে দেব না। ধরে নে ত্রিবেদী যে এই পাপকাজে যাবে সেটা আর-একজন দৈবাৎ জেনে ফেলেছিল। তার টাকার দরকার। ত্রিবেদী চেয়েছিল বর্ডার পেরিয়ে ওপারে চোরাই মাল চালান করে দিতে। আর খুনি ঠিক সেই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল। তার সবটাই চাই। চোরাই মাল আবার নগদ টাকাও। আর আর-এক পাপীকে মারাও চাই। সেটাই হয়েছে।''

ঠিক হয়েছে কাল সকালে ঠিক সাড়ে-সাতটা নাগাদ আমরা হাসপাতালে চলে যাব। ললিতবাবুকে রিলিজ় করিয়ে আমাদের এখানে নিয়ে এসে খানিক বিশ্রাম ও ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে-দশটা থেকে এগারোটা নাগাদ বেরনো যাবে। খুব পরিশ্রান্ত লাগছিল। আর দেরি না করে দু'জনেই তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না। আর তার একটাই কারণ। এই কেসে এখনও পর্যন্ত অপরাধীর দেখা নেই। আমরা এসেছিলাম চন্দ্রমোহনবাবুর ছেলেকে খোঁজবার জন্যে। সেটা মিটেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও বড় অপরাধ ঘটে গিয়েছে। তার কিনারা কে করবে? বাপ্পাকে এবার সেটাই জিজ্ঞেস করলাম। ঘুম তারও আসেনি।

''বাপ্পা আনন্দ ত্রিবেদীর খুনির কী হবে? তাকে কে ধরবে?''

মিনিটদুয়েক বাদে সে বলল, ''পারলে পুলিশ ধরুক।''

''তুই নিশ্চয়ই জানিস যে, এর পিছনে কার হাত থাকতে পারে?''

''অনুমান করছি।''

''তা হলে কাল যে আমরা ফিরছি সেটা কি এই ব্যাপারটা না মিটিয়েই?''

''বলা মুশকিল নীল। আমি তো কাউকে গিয়ে ঘাড় ধরে বলতে পারছি না যে চলুন মশাই থানায় যাবেন। কারণ পাপ কাজ আপনিই করেছেন। এটা একটু অন্য টাইপের কেস। কেসের এই অংশে আমার মক্কেল সেভাবে কেউ নয়। আবার কেউ তো বটেই। মিঃ ভার্মার কথা বলছি। তিনি আনন্দকে খুঁজে দিতে বলেছেন। সেটা সম্ভব নয়। কেন তুই জানিস। এবার বাকিটা আমি তদন্ত করে যা বোঝার বুঝেছি। কিন্তু এখানে আমার কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কম, অনুমান বা সিক্সথ সেন্স বেশি। আইন তো প্রমাণ চাইবে ভাই।''

''তা হলে?''

''তা হলে আপাতত ঘুম। সকালে উঠে কাজ সেরে মুন্সিয়ারিকে টাটা করে এই প্রথম তদন্ত অসমাপ্ত রেখে ফিরে যাওয়া।''

''কিন্তু সেটা তো এক রকম হার?''

''বলতে পারিস কিছুটা তো বটেই। আমি যদি খুনিকে বুঝেও তাকে না ধরতে পারি, তবে সেটা হার বইকী! কিন্তু আর কথা নয়। এবারে ভাই ঘুম আসছে। বাকি যা রইল সে কাল আলোচনা হবে।''

ঘুম এবারে আমারও পাচ্ছে। কিন্তু আমার বন্ধুর হার, এই ব্যাপারটা একটা অস্বস্তি ডেকে আনল। আগে কখনও এমন হয়নি। বাপ্পাকে মাথা নিচু করে কাজ অর্ধেক সেরে ফিরে আসতে আগে দেখেছি কি? মনে পড়ল না।

সকালে উঠে প্রথমে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে, আকাশে মেঘ আর ঘন কুয়াশা। পঞ্চচুল্লির চিহ্ন কোথাও নেই। কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। তবে পাহাড়ি জায়গার মজা হল দু'ঘণ্টা বাদেই হয়তো কুয়াশা কেটে গিয়ে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনটা একটু খারাপ লাগছে। কেসটা না মিটিয়ে ফিরতে হচ্ছে বলেই হয়তো। আমরা ঠক প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আজ এই কাজে নিহাল সিংহ যাচ্ছে না। কারণ, ডাঃ সিদ্ধান্ত নিজেই গাড়ি পাঠাবেন বলেছেন। উনি সত্যিই খুব ভাল মানুষ। এখান থেকে হাসপাতাল তিন কিলোমিটার পথ। আমরা গিয়ে দেখলাম ললিতবাবু প্রস্তুত হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। সব একেবারে রেডি ছিল। বাপ্পা একে-একে বিল পেমেন্ট থেকে শুরু করে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট নেওয়া, সবকিছু নিখুঁতভাবে সেরে ফেলল। এই ভূমিকাতে তাকে আগে দেখিনি। কিন্তু একাজে তার পারদর্শিতা আমায় মুগ্ধ করেছে।

ডাঃ সিদ্ধান্তকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর অসামান্য সহযোগিতার প্রশংসা করে সে ললিতবাবুকে বলল, ''ইনি ছিলেন বলে আজ আপনি ফিরতে পারছেন।''

ললিতবাবুও খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে ওঁর সঙ্গে বারেবারে করমর্দন করলেন। আলাদাভাবে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে তারপর তিনি আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলেন। আমরা ফিরে চললাম। রাস্তা কুয়াশায় ঢাকা বলে আস্তে-আস্তে গাড়ি চলেছে। দু'পাশে সামান্য ঝোপজঙ্গল। এঁকেবেঁকে রাস্তা গিয়েছে রেস্ট হাউজ়ের দিকে। আন্দাজ আধআধি যাওয়ার পরে ড্রাইভার হঠাৎ গাড়িটা দাঁড় করাল। সামনে একটা ছাইরঙা গাড়ি আসলে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকবার হর্ন দিতেও যখন সে নড়ল না, তখন বাপ্পা বলল, ''এক মিনিট। আমি দেখছি।''

সে সামনে বসে ছিল। পিছনে আমরা দু'জন। গাড়ি থেকে নেমে সে ভ্যানটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গিয়ে ভিতরে তাকিয়েছে। বোঝা গেল তার মধ্যে ড্রাইভার নেই। নির্ঘাৎ গাড়ি রেখে বনে-জঙ্গলে প্রাকৃতিক কাজে-কম্মে...

''আহ্, আহ্, আহ্, নীল!''

আমার ডান দিকে ললিতবাবু বসেছিলেন। তিনি অস্ফুটে আমাকে ডাকছেন। কিন্তু কেন?

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে মুহূর্তে চোখ কপালে উঠে গিয়েছে। একটা লম্বা মতন লোক, মুখে লাল কাপড় বাঁধা ললিতবাবুর কপালে রিভলবার ধরে আর-এক হাতে দরজাটা খুলে ফেলেছে।

''বাহার মাত আও!''

ড্রাইভার বেচারা ঘাবড়ে গিয়েছে। কারণ, লম্বা লোকটা তাকেই শাসিয়েছে।

সর্বনাশ!

বাপ্পা ভ্যান গাড়িটার সামনের দরজা ধরে খোলার চেষ্টা করছে। সে দেখতেই পাচ্ছে না যে, আমার বাঁ পাশে আর-একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতেও রিভলভার। কী সাংঘাতিক! আমি এখন কোন দিকে যাব?

''ডোন্ট মুভ আউটসাইড,'' লোকটা আমার দিকে তাকিয়েই বলছে।

এবারে উলটো দিকে হাঁচকা টানে দরজা খুলে ললিতবাবুকে লম্বা লোকটা টেনে বের করেছে।

বাপ্পা কি দেখছে? আরে, গাড়িতে কেউ নেই এটা বুঝতে ওর এত দেরি হচ্ছে কেন? আমি এবারে বেপরোয়া হয়ে আমার বাঁ দিকের দরজাটা সজোরে ঠেলে খুলে ফেলতে গেলাম। প্রথমে খুলছিল না।

কিন্তু দু' সেকেন্ড বাদে খুলে গেল। কারণ পরপর দুটো ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনেছি। কারণটা বোঝা গেল। ছাইরাঙা গাড়ির ভিতর থেকে মুখ ঘোরাতে এদিককার অবস্থা বাপ্পার চোখে পড়েছে। আর তার জ্যাকেট থেকে রিভলবার বের করে দু'দিকে দুটো গুলি ছুড়তে ওইটুকু সময়ই লেগেছে। একটা গুলি আমার পাশের লোকটার পায়ে বিঁধল। আর-একটা উলটো দিকের লোকটার হাতের রিভলভার ফেলে দিয়েছে। এপাশের লোকটা মাটিতে ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় দাপাচ্ছে। আমি কালবিলম্ব না করে ললিতবাবুকে উদ্ধার করতে ছুটে এলাম। বাপ্পার রিভলভার লম্বা লোকটার দিকে তাক করা। দু'পা এগিয়ে এসে লম্বা লোকটার মুখের কাপড় একটানে নামিয়ে দিয়ে বলল, ''অনেক হয়েছে। এবার তোমার খেলা শেষ।''

সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিঃ ভার্মার ছেলে মঙ্গল। আমার সামনের লোকটিকে অবশ্য চিনি না। কিন্তু সে গুলি খেয়ে সেই যে কেতরে পড়ে আছে, তার আর ওঠার ক্ষমতা নেই। ললিতবাবু মনে হল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বাপ্পা দ্রুত স্থানীয় থানায় আর হাসপাতালে ফোন করে পুলিশকে আসতে আর ডাং সিদ্ধান্তকে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলল। ততক্ষণ মঙ্গল ও তার সঙ্গীকে রিভলবার তাক করে গাড়িতে বসিয়ে রাখা হল। আধঘণ্টার মধ্যে পুলিশ আর ডাক্তার চলে এলে এই দুই মহাত্মাকে তাদের কেয়ারে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা রেস্ট হাউজে ফিরে চললাম। মারুতি ভ্যানের ড্রাইভারই ছিল মঙ্গলের সঙ্গী।

সকালে উঠে কুয়াশা থাকায় আজ সূর্যোদয় দেখা হয়নি। এখন প্রায় সকাল দশটা বাজে। আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে কফি নিয়ে বসেছি। এতক্ষণে কুয়াশা কেটে রোদ ওঠায় পঞ্চচূল্লির মাথা ঝকঝক করছে। অপূর্ব দৃশ্য। কফি খেতে-খেতে তারিয়ে-তারিয়ে তা উপভোগ করলাম। পরমদেও চলে এলেন ঠিক সাড়ে-দশটায়। তাঁকে খানিক আগের আপডেট দেওয়াতে তিনি খুবই আপসেট হয়ে পড়েছেন। বলে উঠলেন ভার্মাজির সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বাপ্পা তাঁকে বলেছে মিঃ ভার্মাকে সে সময়মতো সব জানাবে।

কিন্তু ললিতবাবু আজকের দিনটা বিশ্রাম নিতে চাইছেন। একটা ঝক্কি গেল তো। বাপ্পা খুব একটা আপত্তি করল না। পরমকে ব্যাপারটা বলাতে তিনি জানালেন যে, আগামিকাল সকালে কখন বেরব বলে দিলে তিনি সেইমতো চলে আসবেন।

এখানে নন্দাদেবীর মন্দির ছাড়া আর-একটা ভিউ পয়েন্ট আছে। বিকেলে আমরা তিনজনে হেঁটে-হেঁটে মন্দির দেখে এলাম। তার সঙ্গে সূর্যাস্তও। অপরূপা মুন্সিয়ারি। আজ বোধ হয় পাহাড়ের মাথায় সবচেয়ে বেশি রঙের খেলা চোখে পড়ল। আরও একটু দূরে একটা পাহাড়ি গ্রামের কথা শুনলাম। নিহাল সিংহর সেখানেও যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু ললিতবাবু ক্লান্ত বোধ করছিলেন। বিকেল থেকে ঠান্ডাও বাড়ছে। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ডিনার সেরে যে যার মতো শুয়ে পড়লাম।

বাপ্পা বলেছিল, আজ সকাল দশটায় প্রস্তুত হয়ে বেরবে। এক হিসেবে কাল না ফিরে ভালই হয়েছে। আর-একটা দিন আমরা বিশ্রাম পেয়েছি। পরম এলেন সাড়ে ন'টায়। তাঁর ইচ্ছে, যাওয়ার পথে সেই ভিউ পয়েন্টটা দেখাবেন। আমাদের অসুবিধে নেই। সেভাবেই তিনি আমাদের গাইড করে দশ মিনিটের পথে সেখানে নিয়ে এলেন। এই জায়গাটা একেবারে ফাঁকা। আশপাশে কোনও লোকালয় নেই। সামনে উদ্মুক্ত নীল আকাশ, যার প্রান্তরেখায় পরপর পাঁচটা শৃঙ্গ সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম জায়গাটা কত নিস্তব্ধ। একটা ঠান্ডা হাওয়া বইছে। নীচে এতটাই গভীর খাদ যে, তার তল পাওয়া মুশকিল। এখানে এসে চমৎকার একটা অনুভূতি হল।

''কেমন জায়গা বলুন?'' পরম জানতে চান।

''অসাধারণ। সিম্পলি আউটস্ট্যান্ডিং,'' বলে উঠলাম।

''দিল খুশ। তাই তো?''

''সে আর বলতে।''

''ললিতজি আপনি কিছু বললেন না?''

ললিতবাবু সামান্য হেসে বললেন, ''সত্যি ভীষণ সুন্দর। ভাগ্যিস আপনি নিয়ে এলেন।''

''গ্রেট। আমি কিন্তু খুশ নই জানেন।''

''কেন বলুন তো?''

''এই মঙ্গলের কেসটার জন্য।''

''সে আর কী করা যাবে! ও তো আর নিজে করেনি। ও হচ্ছে যাকে বলে আজ্ঞাবহ। রিমোট তো অন্য কারও হাতে,'' বাপ্পা বলল।

''রিয়েলি! ভাল বলেছেন। কিন্তু কে সে লোক?''

''আপনি বুঝতে পারছেন না?''

''নাহ! আপনি পেরেছেন?''

''পেরেছি।''

''তার মানে সে লোকই আনন্দকে খুন করেছে?''

''না, সে করিয়েছে। নিজে তার ত্রিসীমানায় হাজির না থেকে।''

''তার মানে দেবীধুরাতে সেই লোকই শুট করেছিল? ইউ মিন মঙ্গল?''

''রাইট ইউ আর।''

''কিন্তু ও আমাকে মারল কেন? আমি ওর কি ক্ষতি করেছিলাম?''

''ওকে সেরকমই অর্ডার দেওয়া হয়েছিল যে।''

''আর ইউ শিওর? আমাকে মারার অর্ডার ওকে কে দিয়েছিল?''

''আপনি নিজে!''

''হোয়াট?''

''পরম আর কতক্ষণ উপকারী বন্ধুর নাটকটা চালাবেন? ঠিক কোথায় বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?''

''কী বলতে চাইছেন? আমি ওকে বলেছি আনন্দকে খুন করতে? ললিতকে শুট করতে? আমাকে টার্গেট করে ফায়ার করতে? দিমাগ উড়ে গিয়েছে নাকি আমার?''

নিশ্চুপ উপত্যকায় পরমের উঁচু গলা যেন পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আমি ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছি। আর নতুন করে একটা টেনশন ছুট করে ভিতরে পাকিয়ে উঠেছে। লোকটা দেখছি সুবিধের নয়! ভিউ পয়েন্ট দেখাবার নাম করে অন্য মতলবে এখানে এনে হাজির করেছে।

বাপ্পা জিন্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখে বলল, ''দিমাগ আপনার খুব বেশি রকম ঠিক আছে।''

''আছে তো আছে। আমি যদি খুন করিয়ে থাকি তো বেশ। আমি সাচমুচ খুন করি। মঙ্গল এই লোকটাকে ক্লিন্দা ছেড়েই ভুল করেছে।''

চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলো বলে পরম চোখের নিমেষে রিভলভার বের করে ললিতবাবুকে লক্ষ করে টিগার টিপে দিয়েছে। আমার বাঁ দিকে তিনি আর ডান দিকে বাপ্পা। মুহূর্তের মধ্যে বাপ্পা সজোরে আমাকে ধাক্কা মারল। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ললিতবাবুর ঘাড়ে। আর গুলিটা মনে হল আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। বাপ্পা এত দ্রুত ধাক্কাটা না মারলে এতক্ষণে ললিতবাবু খুন হয়ে যেতেন। কিন্তু এবারে মুশকিল। আমার কাছে কিছু নেই। আর পাশে ললিতবাবু। আর বাপ্পাও আমাদের সামনেই পড়েছে।

''আর বেচাল চালবেন কী আপনাদের এখানেই খতম করে দেব,'' চিৎকার করে বলছে পরম।

''মিঃ ভটচারিয়া আপনার বন্দুক নীচে রেখে হাত উঁচা করুন। আপনারাও।''

এটা আমাদের জন্য হুমকি। ললিতবাবু অসহায় চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছি। উত্তেজনায় মনে হচ্ছে মাথায় কেউ হাতুড়ি পিটছে। বাপ্পার দিকে তাকালাম। তার মুখের রেখা শক্ত। ভাবলেশহীন। উঠে সেও দাঁড়িয়েছে। ঘাড় হেলিয়ে

সে এক-পা এগিয়ে বন্দুক নামিয়ে রাখবার জন্য নিচু হল। এক লহমায় ডান দিকে তাকিয়ে কিছু দেখল কি?

পরের মুহূর্তে আশ্চর্য ঘটনা। দু'সেকেন্ডে পরপর দুটো গুলির আওয়াজ। বাক্সা বন্দুক রাখতে গিয়ে নিচু হয়েছিল। উঠবার আগে ওই অবস্থাতেই ট্রিগার টিপেছে। আর তাতে পরমের সামনেটা ধুলোয় আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আর-একবার ফায়ার কি করল? জানি না। কিন্তু দেখতে পেলাম পরম যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে মাটিতে পড়ে গেল।

তারপরেই ওই ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে বাক্সা ছুটে গিয়ে পরমের কাছে পৌঁছে এক ঝটকায় তাকে পিছনে হেলিয়ে দিয়ে মাটিতে না ফেলা রিভলভার তার কানের কাছে ধরে বলে উঠেছে, ''এনাফ ইজ় এনাফ পরম। ইট্স মাই টার্ন নাউ।''

পরম এবারে হাল ছেড়ে দিল। তার সামনে পড়ে আছে একটা ক্রিকেট বলের সাইজের পাথর। যেটা তার হাত থেকে রিভলভার ছিটকে দিয়েছে। কিন্তু পাথরটা কে ছুড়ে মারল? আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম আর-একটা পাথর নিয়ে যে তারই দিকে টার্গেট করে রয়েছে সে, আমাদের ড্রাইভার নিহাল সিংহ। অর্থাৎ তার ছোড়া পাথরের ফলেই হাতে চাপ পড়ে পরমের রিভলভার থেকে আর-একবার শূন্যে গুলি ছুটে গিয়েছে।

বাক্সা পরমের কানে রিভলভার ঠেকিয়ে তার গাড়িতে তাকে তুলে নিজে পাশে বসে ড্রাইভারকে বলল, ''থানায় চলো।''

আর তারপর নিহালের দিকে তাকিয়ে বলল, ''সাবাশ নিহাল সিংহ, বহুত শুক্রিয়া।''

আমি শুধু বললাম, ''কেসটা তা হলে হারছি না, কেমন?''

বাক্সা একবার হেসে বলল, ''এখনও অনেক কাজ বাকি। ললিতবাবুকে গাড়িতে নিয়ে পিছন-পিছন আয়। একে আগে পুলিশের হাতে হ্যান্ডওভার করি। তারপর ফেরার জন্য রওনা হব।''

॥ ৯ ॥

আমরা আগে সোজা পিথোরাগড় আসছি। বাক্সার সঙ্গে মুন্সিয়ারির ও সি-র কথা হয়েছে। পরম সেখানে যাই করে থাক, তার কেস পিথোরাগড়ে যাবে। তাই আমাদের পিছনে-পিছনে আলাদা পুলিশের গাড়ি তাকে আর মঙ্গলকে পিথোরাগড় থানায় নিয়ে আসছে। এখান থেকে যাব চম্পায়ত। মিঃ ভার্মা একটু আগে বাক্সাকে ফোন করেছিলেন। আজ সকালে সামারিটা দিয়ে বাক্সা ওঁকে জানাল উনি চাইলে লোহাঘাটে চলে আসতে পারেন। না হলে আমরাই ওঁর চম্পায়তের হোটেলে যেতে পারি। ভার্মা সেটা শুনে আমাদেরই চলে যেতে বললেন।

জানতে চাইলাম, ''নিহাল সিংহর পাথর ছোড়ার ব্যাপারটা কীভাবে হল?''

''ফায়ার করার আগে একবার ডান দিকে তাকিয়েছিলাম। তুই হয়তো খেয়াল করে থাকবি। ওটাই ইশারা।''

''কিন্তু তুই পরমের গায়ে গুলি করিসনি?''

''টার্গেট করেছিলাম ঠিক ওর পায়ের সামনে। ওই ধুলোর আস্তরণটাই ছিল ললিতবাবুকে বাঁচাবার একমাত্র সুযোগ।''

আমি বললাম, ''কিন্তু পরম এই ভুলটা করল কেন? ওকে এটা ছাড়া ধরা মুশকিল হত কিন্তু।''

বাক্সা বলল, ''একে চিন্তায় ফেলল কাল সকালের ঘটনাটা।''

ললিতবাবু বললেন, ''আমাকে একটু খুলে বললেন প্লিজ়। সবটা বুঝে উঠতে পারছি না।''

বাক্সা বলল, ''আমি যেটা বুঝেছি সেটা অনেকটা এরকম, আনন্দ ত্রিবেদীর মতলব পরম কোনওভাবে জেনে যায়। এই কোনওভাবেটা আমি পরে বলছি। পরমের টাকার দরকার ছিল। এটারও একটা ব্যাখ্যা আছে। আসব তাতে। আপাতত বলি, পরম জানার পরে ঠিক করে এটা কাজ ত্রিবেদীকে করতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু সে সরাসরি এতে ঢুকবেও না। তার পক্ষে সহজ ছিল চন্দ্রভানকে দলে টানা। সে বললে চন্দ্রভান রাজি হত কিনা জানি না। কিন্তু চন্দ্রভান ধরা পড়লে তার নিজের বিপদ বেশি। যেহেতু তার অধীনেই সে কাজ করে। তাই চড়ব পরম সে রাস্তায় না গিয়ে মঙ্গলকে দলে টানেন। এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। মঙ্গলকে ডাকার সুবিধে হচ্ছে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। সে নিজে পিথোরাগড়েই বসে রইল। মঙ্গলকে লেলিয়ে দিল ত্রিবেদীর পিছনে। এটা এমন সময় যখন ভার্মা লখনউতে নেই। আর সেখানকার কাজ নিয়ে তিনি খুব চিন্তায় ছিলেন না। মঙ্গল পিছু নিয়ে ফেলল ওদের। এর পরের ব্যাপারটা জানা। কিন্তু মুশকিল হল ললিতবাবু বেঁচে গেলেন। তা হলে তিনি কি মঙ্গলকে চিনে ফেলবেন? যদি তাই হয় তখন সে কি পরমের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে? যদি খোলে তখন কী হবে? পরম পরশু রাতেই মঙ্গলকে দায়িত্ব দেয় যাতে ললিতবাবুকে সে গতকাল সকালে খতম করতে পারে। কারণ সুযোগ একমাত্র তখনই ছিল। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয়, তখন পরম আজ সকালের গল্প ফাঁদে। বাকিটা তো আপনারা দেখলেন।''

আমরা পিথোরাগড়ে এসে সোজা থানায় গেলাম। বাক্সা তার কাছে রাখা বুলেটটি থানায় জমা দিয়ে পরম আর মঙ্গলের গ্রেফতারের কারণটা বিস্তারিত বলে দিল। অবশ্য এর মধ্যে গাড়িতে আসতে-আসতে সে হাবিবসাহেবকেও সবটাই বলে রেখেছে। পরম এখানকার লোক। কাজেই তার হোটেলে পুলিশ তদন্ত করতে যাবে। খানিক এগিয়ে শহরের মধ্যেই একটা খাবারের দোকান থেকে লাঞ্চ সেরে আমরা আবার রওনা হলাম। তার আগে অবশ্য বাক্সা ইন্সপেক্টর দেশমুখ আর হাবিবসাহেবের সঙ্গে একটা ছোট্ট কনফারেন্স কল সেরে নিল। কী নিয়ে কথা জানতে চাওয়ায় বলল, চম্পায়ত গিয়ে সব খুলে বলবে। ললিতবাবু আর আমি পিছনে বসেছি। বাক্সা বসেছে সামনে, নিহাল সিংহ পাশে। এখান থেকে ঘণ্টাচারেক লাগার কথা। কিন্তু নিহাল সিংহ তার আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে দিল। আমরা যখন ভার্মার হোটেলে এসে উঠলাম, তখন বিকেলে সাড়ে চারটে বাজে। আমাদের আপ্যায়ন করে ভার্মা দোতলায় ওঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। খাতিরদারির কোনও কমতি হয়নি। চা, জলখাবার ইত্যাদি এল। ললিতবাবু ক্লান্ত বোধ করছেন। শুতে চান। ওঁকে পাশের ঘরে যত্ন করে বিছানা করে দেওয়া হল। ওষুধপত্র খাওয়ার ব্যাপার ছিল। ভার্মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একজন লোক দিয়ে তারও তদারক করলেন। তারপর পাশের ঘরে এসে বসলেন। মুখোমুখি আমরা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, ''আমি পুরো লুটে গেলাম মিঃ ভট্টাচারিয়া। আনন্দ চলে গেল। পরম বিট্রে করল। আর আমার নিজের ছেলে, সে কিনা শেষে ছি, ছি। আমি কোথায় মুখ দেখাব বলতে পারেন?''

বাক্সা চুপ। আমিও। ভীষণ অসহায় লাগছে ওঁকে।

বললেন, ''আমার এত বড় ব্যবসা, এত টাকার কারবার সব এবার বন্ধ হয়ে যাবে। আই অ্যাম রুইন্ড। আনন্দর যে এত খারাপ মতলব ছিল আমি ভাবতেই পারিনি। হাউ ডেয়ারলি আই ওয়াটেড হিম ব্যাক সে আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন। হি নিউ অলমোস্ট এভরিথিং ইন মাই বিঝ়নেস। আমি বুড়ো হয়েছি। একা কত দিক দেখব ভাবুন তো?''

বাক্সা চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার সামনে গিয়ে বাইরে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে হেঁটে এসে আমাদের সামনে রাখা একটা টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ''সবই ঠিক মিঃ ভার্মা। কিন্তু সব তো আর প্ল্যানমাফিক হয় না। আর সবকিছু বিনা কারণেও হয় না। সবের পিছনেই কিছু কারণ থাকে। এই যে পরম আপনাকে বিট্রে করল এর পিছনে তার লোভ ষোলো আনা, সেটা মানছি। কিন্তু আমার একটা অন্য প্রশ্ন আছে।''

''বলুন?'' ভার্মা অবাক চোখে তাকালেন।

''পরমের লোভ হল বেন বলুন তো? সে আপনার এই বিঝ়নেসে আধাআধি পার্টনার। আপনার যদি অভাব না থাকে তারও থাকার কথা নয়। যদিও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোভের জন্ম দেয়। পরমের সেটা ছিল। কিন্তু

শুধু কি সেজন্যই?"

"আর কী কারণ থাকতে পারে মনে করছেন আপনি? সে আমার ট্রাস্টেড পার্টনার। আমি তাকে অফার দিয়েছিলাম আমার সঙ্গে বিজ়নেসে জয়েন করতে। তার আগে সে কিস্যু করত না। এখানে আসার পরে সে কিছু কাজ কামিয়েছে? কিন্তু দেখুন, শেষে সে আমাকে চিট করল।"

"নাহ, সে কম কামায়নি। কিন্তু ওই যে বললেন, ট্রাস্টেড। আমার প্রশ্ন এখানেই। ট্রাস্ট, মিসট্রাস্টে কনভার্ট করেনি তো? অন্তত তার দিক থেকে?"

ভার্মা বললেন, "একটু খুলে বলুন না।"

"খুলে আর কী বলি বলুন! যে রাতে আমি এখানে ছিলাম সে রাতে দৈবাৎ আপনার সঙ্গে কারও উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চলে। সে লোক পরম নয় তো? আর তার কারণ টাকাপয়সার ভাগ-বাটোয়ারা হতে পারে কি? এমন নয়তো, যে তার প্রাপ্য সে ঠিক সময়ে পাচ্ছিল না? ডিপ্রাইভড হচ্ছিল?"

ভার্মার মুখের রেখা বদলাচ্ছে। আর তাও খুব দ্রুত। রাগত স্বরে বললেন, "আপনি কী বলতে চান?"

"দেখুন কিছু ব্যাপারে প্রমাণ থাকে না। ইন্সটিংক্টকে বিশ্বাস করতে হয়। সিক্সথ সেন্স বলতে পারেন। তা সেই ইন্সটিংক্ট বা সিক্সথ সেন্স আমায় কি বোঝাচ্ছে জানেন?"

"কোনও ইম্যাজিনেটিভ স্টোরি?"

"আপনার কাছে হয়তো তাই। কিন্তু বস্তুত সেটা নাও হতে পারে। আমার দুটো থিয়োরি আছে মিঃ ভার্মা। এক, সে রাতে পরম আপনার কাছে টাকার ভাগ চায়। আপনি দিচ্ছি-দেব করে দেননি। আর এটা নতুন নয়, চলছিল। দুই, আনন্দ ত্রিবেদী যে এই অপকর্মোটি করতে যাবে এটা পরম শুনে ফেলেছিল। কিন্তু কী করে শুনল? কারণ, আনন্দর সঙ্গে কারও কথা হচ্ছিল। সেটা ফোনে হতে পারে, অথবা বন্ধ ঘরে হতে পারে। পরম আর দেরি করেনি। টাকার লোভ দেখিয়ে মঙ্গলকে হাত করা তার বাঁ হাতের খেল। টাকা কার না দরকার! সে মঙ্গলকে বোঝায় যে, চুরির ভাল খবরা সেও পাবে। শুধু তাকে পরমের কথামতো চলতে হবে। এদিকে আপনি গিয়েছেন বাইরে। আর যেহেতু আনন্দ তখন ছুটিতে, তার জায়গাতে মঙ্গল এখানকার কাজ সামলাচ্ছে। আনন্দ ফেরার পরে মঙ্গলের লখনউ ফিরে যাওয়ার কথা। সে কিন্তু যায়নি। কারণ তার আগে প্ল্যান হয়ে গিয়েছে। খবর চলে এসেছে যে, আনন্দ এরকম কিছু করতে যাবে। কোথা থেকে খবর এল? না লখনউ থেকে। আনন্দ ছুটিতে যাওয়ার আগে লখনউতে এসেছিল। কথা তখনই হয়ে থাকবে। কিন্তু আনন্দ এ খবর কী করে পেল? কারণ, সেও কারও নির্দেশে চলে। প্রশ্ন হল কার?"

ভার্মা গমখমে মুখে জানতে চান, "কার?"

"এমন কেউ, যে বাইরে থাকার সময় ঘনঘন তাকে ফোন করে। তার নাম বি জে। এই বি জে কে হতে পারে?"

"আই হ্যাভ নো ক্লু স্যার," শ্লেষাত্মক কণ্ঠে উনি বললেন।

আমি বলি, "তবে?"

"আপনিই তো বলছেন!"

"রাইট। এই বি জে নামটা আনন্দর মোবাইলে ফুটে উঠতে ললিতবাবু দেখেছেন। বিন ফ্যাক্ট তিনি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি না দিলে আমার এদিকটা ভাবাই হত না। যাই হোক, বি জে এমন কেউ যে ফোন করলে আনন্দকে বাইরে গিয়ে কথা বলতে হয়। বেশ বুদ্ধি করে সে নামটা সেভ করেছিল। আমার স্থির বিশ্বাস বি জে মানে বি জে নয়। আসলে ওটা হবে জে বি। জে ফর জগৎ আর বি ফর ভার্মা। কারণ, এখানে ভার্মা বানান BHARMA।

"আপনি তাই লেখেন। আপনার কার্ডেও তাই দেখেছি। এই হোটেলেও তাই। লখনউতেও তাই। আপনি আনন্দকে নিয়ে এত চিন্তায় ছিলেন একটাই কারণে। সে চুরি করে জিনিসগুলো পাচার করে টাকাটা আনতে পারল কিনা। এটাই আসল কথা।"

আমি এতক্ষণ একটা কথাও বলিনি। বলার অবস্থাতেই ছিলাম না। এ তদন্তের যে এমন মোড় ঘুরে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আর অবাক হয়েছি বললে কিছুই বলা হয় না। মিঃ ভার্মাও এতে জড়িত!

"ইয়ে সব ঝুট হ্যায়! লাই, লাই, ড্যাম লাই। নাথিং বাট লাই," রাগে কাঁপতে-কাঁপতে ভার্মা বললেন।

"পসিবলি নট। আপনার ব্যবসা বড়। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো এত টুরিস্ট আসে সব হোটেলে? আসে না। লোকে কুমায়ুনের এই দিকটায় খুব কম আসে। তা হলে আপনার এত ইনকাম কীভাবে হয়?"

ভার্মা চুপ।

"আপনার এই হোটেলের হিসেবপত্তর আমি লোহাঘাট যাওয়ার আগে একবার দেখেছিলাম। সব ঠিক মনে হয়নি। সে নাই হতে পারে। কিন্তু আয়ের উৎসটা তো বুঝতে হবে। সেটা হল, এই বাঁকাপথ। চোরাগলি। সামনে তিব্বত আর নেপাল বর্ডার। স্মাগলিংয়ের অবাধ সুযোগ। সেটা কে করবে? আনন্দ ত্রিবেদী। আর কাউকে লখনউতে বসে ইনষ্ট্রাক্ট কে করবে? কেন জগৎ ভার্মা! আর সেজন্যই বারোবার আনন্দর খোঁজ। আনন্দ জীবিত আছে কী নেই সেটার থেকেও ইম্পর্ট্যান্ট হল আনন্দ কী পরিমাণ টাকা এখানে রাখল। আর তাই এত হা-হুতাশ। তাই ব্যবসা লাটে ওঠার বিলাপ। ব্যবসা তো চলছেই না মিঃ ভার্মা। লোহাঘাটে কেউ যায় না। পিথোরাগড় নিয়ে চন্দ্রভান কতকটা তাই বলেছে। এমন ভাল কিছু দেখে আসিনি। কিছু লোক হয়তো এখানে এসে থাকে। কিন্তু সারা বছরে ক'দিন? বাকি সময় তো গড়ের মাঠ। তাতে তিন-তিনটে হোটেল চালানো যায়? আর আপনি প্রমাণের কথা বলছিলেন না? একটা জিনিস অনেক কিছু প্রমাণ করে দেবে।"

বাপ্পা এবার তার জিন্‌সের পকেট থেকে একটা মাঝারি সাইজের সরু মোবাইল ফোন বের করল। আমাকে দেখিয়ে বলল, "সরি, নীল। এটা তোকে আগে আমার দেখানো উচিত ছিল। এটা আনন্দর মোবাইল। যেটা আমি প্রথমদিন জঙ্গলে ঢুকে পেয়েছি। পেয়েছিও হুট করে। গাছপালার নীচে পাশ পড়েছিল। সুইচড অফ অবস্থায়। থানায় গিয়ে চার্জের ব্যবস্থা করলাম। মোবাইল অন হওয়ার পরে ভিতরে অনেক ফোন নম্বর, মেসেজ আর হোয়াট্‌সঅ্যাপ পাওয়া গেল। আর তাতে বি জে-র এন্ট্রি অনেক। বি জে-র নম্বরের সঙ্গে আপনার নম্বর মিলে যাচ্ছে মিঃ ভার্মা। আর কিছু বলবেন? আপনার লখনউয়ের হোটেলে মিঃ হাবিব যদি রেড করেন? ইনফ্যাক্ট করবেনই। আমার ধারণা, আপনার ঘর থেকেই অনেক কিছু উদ্ধার হবে। নো, নো, মিঃ ভার্মা, ওই ভুলটা করবেন না।"

বাপ্পা তার জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলভারটা নিমেষে বের করে ভার্মার দিকে তাক করে বলল, "এটা চালাতে আপনি জানলে আমিও জানি। আর তাতে কোনও লাভ নেই। কারণ, আপনি জানেন না যে আমি এখানে আসার আগে এখানকার থানাতেও ফোন করা বলে রেখেছি যাতে তারা হোটেলে পুলিশ পাঠায়। তাদের এতক্ষণে এসে যাওয়ার কথা। আপনি স্লিজ় আপনার হাতটা বাইরে বের করে আনুন।"

এবারে ভার্মা পুরোপুরি মাথা কুঁকিয়ে চেয়ারে কুঁজো হয়ে বসে পড়লেন। আর আমি এতক্ষণে সেই কনফারেন্স কলটা করার কারণ বুঝতে পারলাম।

আমরা চম্পায়তে আজ থেকে গিয়েছি। চোরাই জিনিসের কী হল সেটা বাপ্পাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে জানাল, "মঙ্গলকে জেরা করলেই বেরিয়ে যাবে সে কোথায় রেখেছে। কারণ, বিক্রি সে করেনি বলেই আমার ধারণা। পিথোরাগড়ের হোটেলে পেয়ে যাওয়া উচিত।"

"আর-একটা প্রশ্ন আছে। ভার্মা কি দীর্ঘদিন ধরে এই দু-নম্বরি কারবার চালিয়ে যাচ্ছে?"

"তাই তো মনে হয়। কারণ, মনে আছে তিনি বলেছিলেন আনন্দর আগ্রহেই তিনি বাকিদুটো বাড়তি রাঞ্চ খোলেন। সেটা কেন? এই লেনদেন, যাতায়াত এসবে আরও সুবিধে হবে। কিছু বাড়তি আয় তো হবেই। তাই..."

"কিন্তু পরমকে এর মধ্যে উনি নিলেন না কেন? পরম ওঁর হয়ে এই কাজটাই আরও এফিশিয়েন্টলি করতে পারত। মানে বলতে চাইছি, পরম আর আনন্দ দু'জনে মিলে এই স্মাগলিং চালিয়ে গেলে ওভারঅল বেনিফিট বেশি হত না?"

"হত। কিন্তু সেটা উনি চাননি। পরমকে আনা মানে সেখানেও শেয়ার। এমনিতে আনন্দ টাকা পাচ্ছে। তিনভাগ হলে ওঁর নিজের ভাগ আরও কমত। প্ল্যানটা ভার্মা দারুণ বানিয়েছিলেন। বোঝার কোনও উপায় নেই। বোঝা যেতও না, ললিতবাবুকে যদি এর মধ্যে আনন্দ না ডাকত। তিনি নিখোঁজ হওয়াতেই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত শুরু করতে হল।"

"আর আমাদের অবর্তমানে ঘরে কে ঢুকেছিল?"

"মঙ্গল। পরম ওকে লাগিয়েছিল। তার হয়তো সন্দেহ হয়ে থাকবে। পরম একটা অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। নিজে সবসময় আমাদের সঙ্গে থেকেছে। এমন ভান করেছে যেন সে কো-অপারেট করে চলেছে। আসলে সে বুঝতে চেয়েছে আমরা কী ভাবছি, কী করছি, প্ল্যান অথ অ্যাকশন কী, এইসব। আর মঙ্গলকে রেখেছে পিছনে। আমাদের আড়ালে তাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছে। যেমন দেবীধুরায় হামলা। সেটাও আর-এক চাতুরি। ওর চোট পাওয়াটাও প্ল্যান। আমাদের উপর যেন হামলা হল এমন ভাব দেখা গেল। কিন্তু চোট লাগল পরমের। এর মানে তাকে সন্দেহ করার জায়গা নেই। কারণ, সে নিজেই উভেড। যদিও আমি দেখে বুঝেছিলাম ওটা মাইনর ইনজুরি।"

"তোর পরমকে সন্দেহ হল কখন?"

"মুন্সিয়ারিতে যেদিন প্রথম ললিতবাবুকে আমরা দেখি। পরম চমকে উঠেছিল। আমার চোখ এড়ায়নি। তাতে প্রথম খটকা। তারপরে দ্বিতীয়বার আমাদের প্রতিদিনের প্ল্যান নিয়ে এত কৌতূহল। এমনকী, ফিরে আসার পরেও কী দেখলাম, কোথায় ঘুরলাম সেসব নিয়ে তার অত প্রশ্ন মনে হয়েছে। সে কোনও না-কোনও কারণে আমাদের মাপছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার তদন্তের সবিস্তার খবর সবচেয়ে বেশি সে রেখেছে। তাই ললিতবাবু খুনিকে চিনে ফেলতে পারেন এটা শোনার পরে সে ডেসপারেট হয়ে ওঠে।"

"আর মঙ্গলকে সন্দেহ করার কারণ?"

"প্রথম কারণ, ললিতবাবুর মুখে শোনা কালো কাপড়। যেটা জঙ্গল থেকে পেয়ে মনে করতে পারছিলাম না কোথায় দেখেছি। শেষে মনে পড়ল লখনউতে এমন এক কাপড় দিয়ে সে সেদিন সকালে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন মুছে দিচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, তার হাইট। এই কেসে তার চেয়ে লম্বা লোক কাউকে দেখিনি, ললিতবাবুর বর্ণনা। তৃতীয়ত, লখনউতে একই দিনে দু'বার লিফট। সাধারণ ব্যাপার। কোইন্সিডেন্স হতে পারে। আমার ফিরে এসে ঘরে ঢোকার ব্যাপারটা দেখে মনে হয়েছে সে আমাদের সারাদিন ফলো করেনি তো? এমনিতে কোনও কারণ নেই। জাস্ট একটা খটকা। চতুর্থত, তার হঠাৎ চম্পায়ত আসা। একবার পাহাড়ে চলে এলে আর সঙ্গে গাড়ি থাকলে সব জায়গাতে যাওয়া যায়। দেবীধুরাতে যে গুলি চালিয়েছিল, তার পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে অনেক দূরে তাকে একবার দেখতে পেয়েছিলাম। সেই লোকটাও এমনই লম্বা ছিল। পরমের দেশওয়ালি ভাইয়ের বাড়ি বলে কিছু নেই। তার কথায় পরম এখানে একটা হোম স্টে-তে গিয়ে একসঙ্গে এ ক'দিন ছিল। পরমের কথায় সে আমাদের পিছু নিয়ে মুন্সিয়ারি এসে হাজির হয়। কিন্তু ভাবেনি যে, আমি চম্পায়তে ফোন করে সেখানে সে আছে কিনা এই খবরটাও নিয়ে নেব। নিয়েছিলাম এবং যে ধরেছিল সে জানায় ও সেখানে তখন নেই।"

বাপ্পা চুপ করেছে। এর পরে বাকি থাকে চারটে খবর।

এক, সমস্ত চোরাই জিনিস পিথোরাগড়ের হোটেল থেকেই পুলিশ উদ্ধার করেছে। উদ্ধার হয়েছে ললিতবাবুর পার্স, মোবাইল আর ব্যাগ। দুই, আজ খবর পাওয়া গিয়েছে যে মুন্সিয়ারি থেকে সাত হাজার মিটার নীচে দু'জনের টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া বডি মিলেছে, যা শনাক্ত করা একপ্রকার অসম্ভব। তবে পুলিশের কাছে যা তথ্য দেওয়া ছিল তা থেকে তাদের অনুমান, এর মধ্যে একজন আনন্দ ত্রিবেদী হবেন। তিন, বাপ্পার কথায় শেষ পর্যন্ত দেবীধুরার মন্দিরের পুরোহিতকে পুলিশ আবারও জেরা করে। এবারে তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে চুরির রাতে সিন্দুকের চাবি কেড়ে নেয় সেই লোক। মানে, আনন্দ ত্রিবেদী। কিন্তু শেয়ারের প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর গলায় ছোরা ঠেকিয়ে চাবি আদায় করে সে। চার, কলকাতা থেকে সন্ত্রীক চন্দ্রমোহনবাবু চলে এসেছেন। বাপ্পার কাছে ফোনে খবর পেয়ে আর অপেক্ষা করেননি। আমাদের সঙ্গে এবারে দেখা হল ওঁর ভাইয়ের বাড়িতে। ছেলেকে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। খানিক সামলে প্রথমে বাপ্পাকে বললেন,"আপনাদের জন্যই ওকে ফিরে পেলাম। আমি আজীবন আপনাদের কাছে ঋণী থাকব। আগে যা দিয়েছি সে নিশ্চয়ই এতদিনে খরচ হয়ে গিয়েছে। তার বাইরে আরও যা লাগল এবং আপনার ফি, সব মিলিয়ে অঙ্কটা বলবেন।"

তারপর ছেলের দিকে ফিরে বললেন,"ল্যাপ্টুর চাকরি নেই সেটা আমাকে নয় নাই বা বলতে পারলি, কিন্তু তোর মাকে তো বলতে পারতিস? আমরা কি তোকে ফেলে দিতাম?"

ললিতবাবু বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপরে বললেন, "ভুল হয়ে গিয়েছে বাবা। আমি তো জানতাম চাকরির খোঁজেই যাচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করো,আমি কিন্তু কোনও অন্যায় করিনি। আমি চুরি করিনি।"

এবারে চন্দ্রমোহন ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমি জানতাম বাবা। তুই সৎপথেই থাকবি। আশীর্বাদ করি সারাজীবন তুই যেন এই পথটাই সবসময়ে চিনে নিতে পারিস।"

রাঙ্কা ও ব্যাঙ্কা সোনার হরিণ

কাহিনি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় **ছবি:** সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজত দাস ও পৃথা ঘোষ

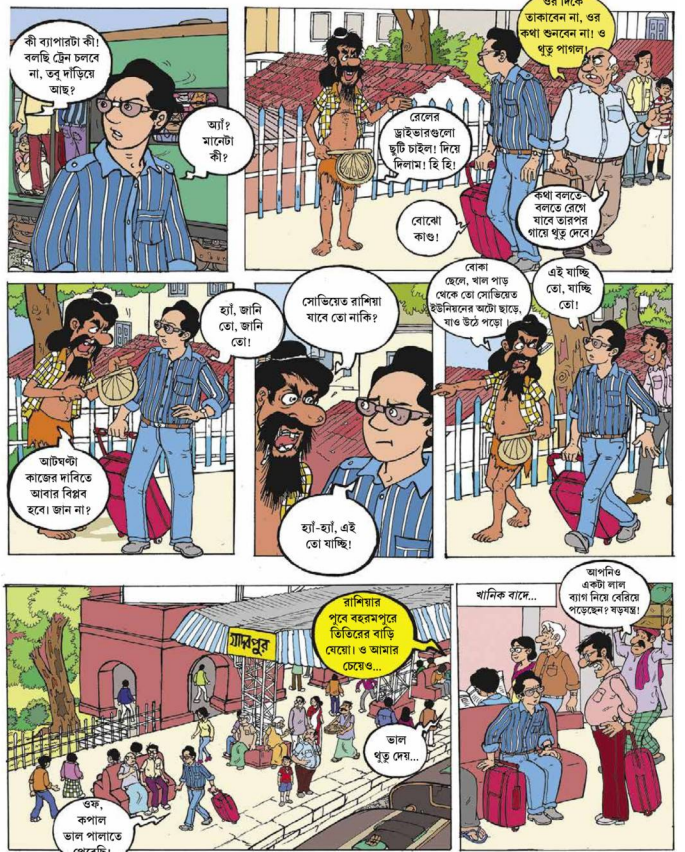
কী ব্যাপারটা কী! বলছি ট্রেন চলবে না, তবু দাঁড়িয়ে আছ?
অ্যাঁ? মানেটা কী?
ওর দিকে তাকাবেন না, ওর কথা শুনবেন না! ও থুতু পাগল!
রেলের ড্রাইভারগুলো ছুটি চাইল! দিয়ে দিলাম! হি হি!
কথা বলতে বলতে রেগে যাবে তারপর গায়ে থুতু দেবে!
বোঝো কাণ্ড!
হ্যাঁ, জানি তো, জানি তো!
আটঘণ্টা কাজের দাবিতে আবার বিপ্লব হবে। জান না?
সোভিয়েত রাশিয়া যাবে তো নাকি?
হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি!
বোকা ছেলে, খাল পাড় থেকে তো সোভিয়েত ইউনিয়নের অটো ছাড়ে, যাও উঠে পড়ো
এই যাচ্ছি তো, যাচ্ছি তো!
ওফ, কপাল ভাল পালাতে পেরেছি!
রাশিয়ার পুবে বহরমপুরে তিতিরের বাড়ি যেয়ো। ও আমার চেয়েও...
ভাল থুতু দেয়...
খানিক বাদে...
আপনিও একটা লাল ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন? মড়মন্ত্র!

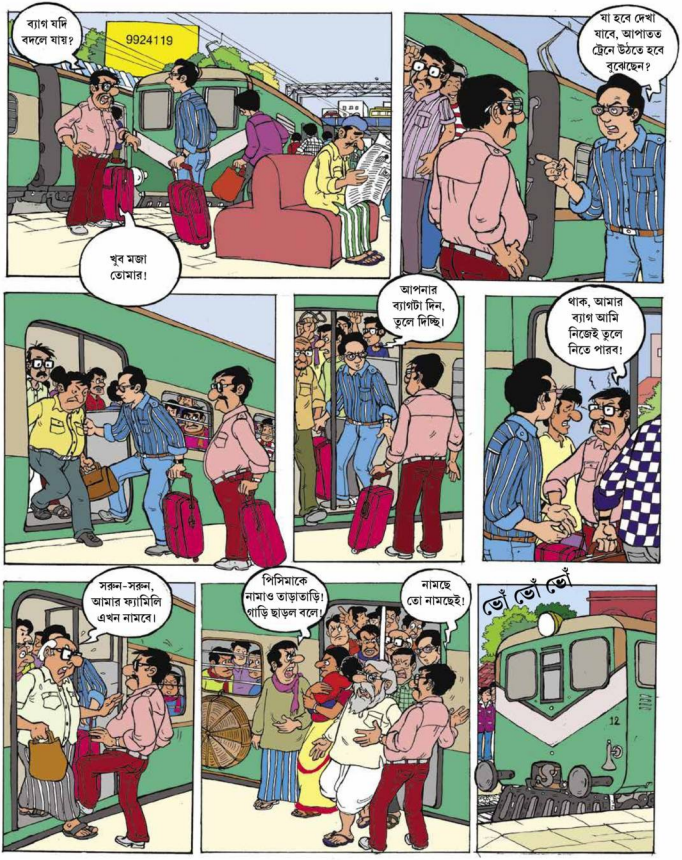
ব্যাগ যদি বদলে যায়?
9924119
খুব মজা তোমার!
যা হবে দেখা যাবে, আপাতত ট্রেনে উঠতে হবে বুঝেছেন?
আপনার ব্যাগটা দিন, তুলে দিচ্ছি।
থাক, আমার ব্যাগ আমি নিজেই তুলে নিতে পারব!
সরুন-সরুন, আমার ফ্যামিলি এখন নামবে।
পিসিমাকে নামাও তাড়াতাড়ি! গাড়ি ছাড়ল বলে!
নামছে তো নামছেই!
ভোঁ ভোঁ ভোঁ

পিসিমার জুতো কোথায়?
?
!
ধ্যাৎতেরিকা! ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে তো! আমায় উঠতে হবে।
আপনি কী বোকা, পাশের কামরায় উঠছেন না কেন?
আপনি একটা হনুমান!
এই রে!
আরে-আরে, আচ্ছা আপদ! আমার ব্যাগ!
ব্যাগটা নামিয়ে দিই! উনি আর উঠতে পারবেন না!
আরে করছেনটা কী?
ধ্যাপাস
ওঁক!
উজবুক কোথাকার!
আপনি আমার ব্যাগটা ফেলে দিলেন!

এদিকের ব্যাগটা তোমার নয়? আমি ভাবলাম...
ওফ! ওঁর ব্যাগটা যাতে পড়ে না যায় সে জন্যে ওটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম।
পুরো গুলিয়ে দিলেন!
বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম একসঙ্গে চা খাব...
বন্ধুর বাড়ি চা খেতে যাচ্ছে এত বড় ব্যাগ নিয়ে?
আজ্ঞে না, ওখান থেকে বেড়াতে যাব!
!
টিং টুং, টিং টুং
হতচ্ছাড়া উজবুক!
ব্যাগ থেকে তোমার নম্বরটা পেলাম। শিয়ালদায় অপেক্ষা করো!
হ্যাঁ, ঠিক আছে শিয়ালদায় অপেক্ষা করব।
স্টেশনে আসছে আপ সোনারপুর লোকাল।

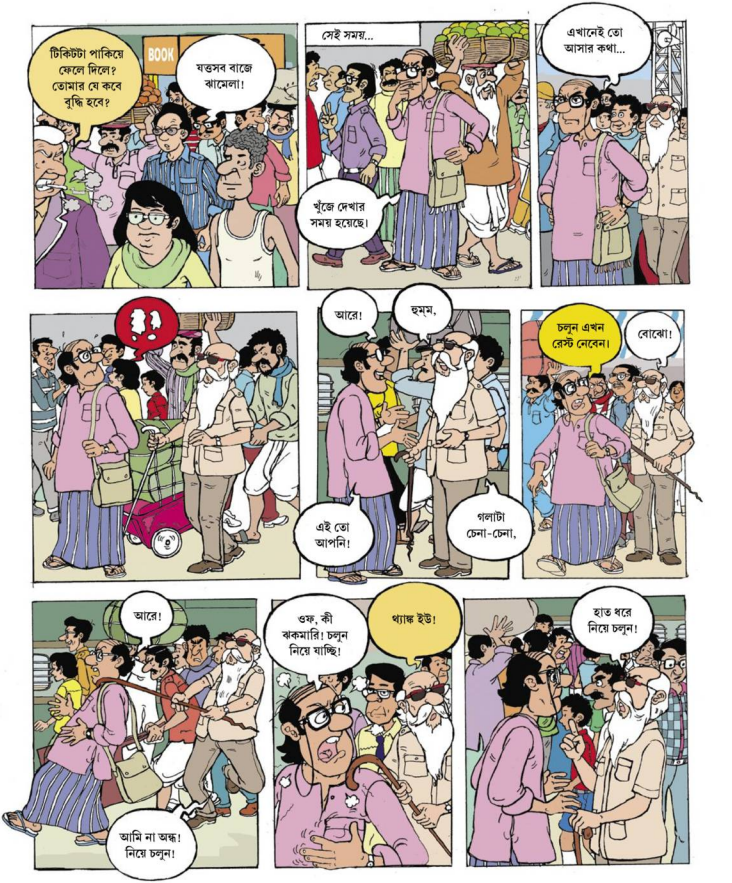
টিকিটটা পাকিয়ে ফেলে দিলে? তোমার যে কবে বুদ্ধি হবে?
BOOK
যত্তসব বাজে ঝামেলা!
সেই সময়...
খুঁজে দেখার সময় হয়েছে।
এখানেই তো আসার কথা...
আরে!
হুমম,
এই তো আপনি!
গলাটা চেনা-চেনা,
চলুন এখন রেস্ট নেবেন।
বোঝো!
আরে!
আমি না অন্ধ! নিয়ে চলুন!
ওফ, কী ঝকমারি! চলুন নিয়ে যাচ্ছি!
থ্যাঙ্ক ইউ!
হাত ধরে নিয়ে চলুন!

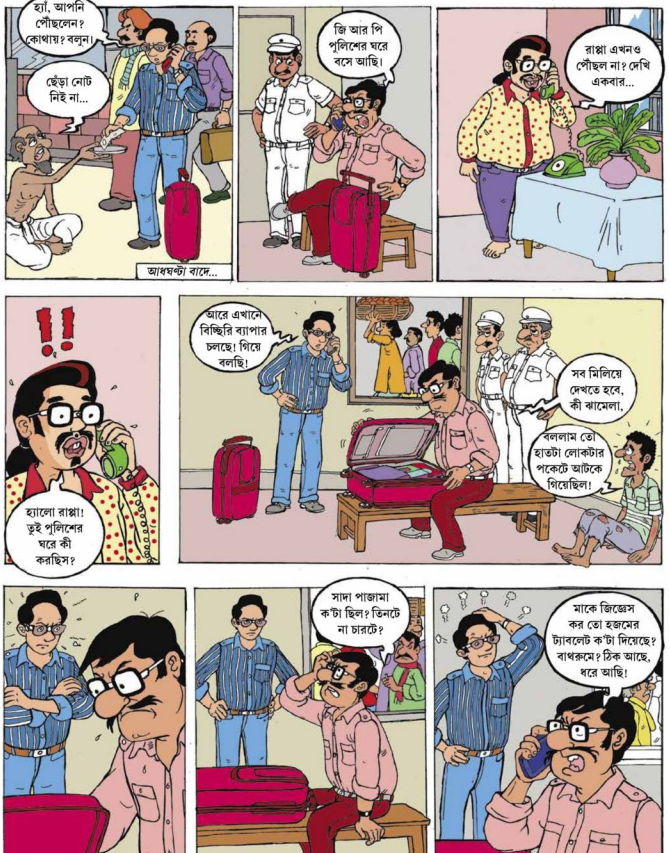
হ্যাঁ, আপনি পৌঁছলেন? কোথায়? বলুন।
ছেঁড়া নোট নিই না...
আধঘণ্টা বাদে...
জি আর পি পুলিশের ঘরে বসে আছি।
রাপ্পা এখনও পৌঁছল না? দেখি একবার...
!!
হ্যালো রাপ্পা! তুই পুলিশের ঘরে কী করছিস?
আরে এখানে বিচ্ছিরি ব্যাপার চলছে! গিয়ে বলছি!
সব মিলিয়ে দেখতে হবে, কী ঝামেলা।
বললাম তো হাতটা লোকটার পকেটে আটকে গিয়েছিল!
সাদা পাজামা ক'টা ছিল? তিনটে না চারটে?
মাকে জিজ্ঞেস কর তো হজমের ট্যাবলেট ক'টা দিয়েছে? বাথরুমে? ঠিক আছে, ধরে আছি!

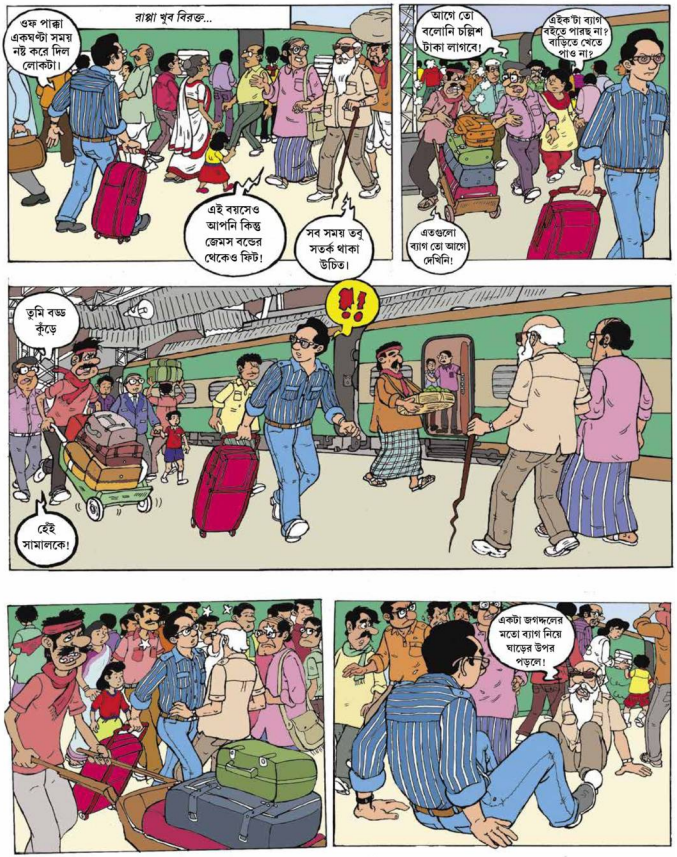
রাপ্পা খুব বিরক্ত...
ওফ পাক্কা একঘণ্টা সময় নষ্ট করে দিল লোকটা।
এই বয়সেও আপনি কিন্তু জেমস বন্ডের থেকেও ফিট!
সব সময় তবু সতর্ক থাকা উচিত।
আগে তো বলোনি চল্লিশ টাকা লাগবে!
এইক'টা ব্যাগ বইতে পারছ না? বাড়িতে খেতে পাও না?
এতগুলো ব্যাগ তো আগে দেখিনি!
তুমি বড্ড কুঁড়ে
হেই সামালকে!
একটা জগদ্দলের মতো ব্যাগ নিয়ে ঘাড়ের উপর পড়লে!

সরি! কিন্তু আপনি বুঝলেন কী করে সঙ্গে আমার ব্যাগও আছে?
তার মানে? উনি কি অন্ধ সেজে আছেন নাকি?
ছিঃ অসভ্য!
সত্যি আজকালকার প্রজন্ম! ভদ্রতা-সভ্যতা বলে কিস্যু নেই!
ধরে দু'-চার ঘা দিন না!
অভিশাপ দিচ্ছি, তুমিও একদিন অন্ধ হয়ে যাবে!
আবার তর্ক করছ? মানে তোমার গোড়ায় গডগোল!
হ্যাঁ, খারাপ বংশ! এই নিন আপনার লাঠি!
কিন্তু ব্যাগটা তো আপনার গায়ে লাগেনি! আপনি...
বড়লোকের বখাটে ছেলে!
দেখেই বোঝা যায় অত্যন্ত ডেঁপো!
ওফ দিনটাই খারাপ, প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!
শোভাবাজার যাব! তাড়া আছে!
টনি আমি আসছি রে!

টনি তোমার সঙ্গে যাচ্ছে,
তাই কোনও চিন্তা নেই।
ও বলল ফোটো তুলতে নর্থ বেঙ্গল যাবে আমিও রাজি হয়ে গেলাম।
ডিসগাস্টিং! মা এমন করে যেন, আমি কচি খোকা।
যাকগে তাড়াতাড়ি চ'।
দার্জিলিং মেল উইল ডিপার্ট অন টেন থার্টি পি এম...
DH22
NHL23

এর পরেরটাই আমাদের কামরা!
প্রতি স্টেশনে আধঘণ্টা করে ট্রেন থামিয়ে রাখা উচিত।
অ্যাঁ, কেন?
ট্রেনের জানলা দিয়ে আলো পড়ে প্ল্যাটফর্মে অদ্ভুত সব ফোটো-সিচুয়েশন তৈরি হয়। সেগুলো তা হলে তোলা যাবে।
চমৎকার! তোর কী বুদ্ধি। ওই জন্য তোর মা এত চিন্তা করেন তোকে নিয়ে।
রেল স্টেশন নিয়ে একটা ফোটোগ্রাফির সিরিজ় করব!
সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ল?
নাহ, কাউকে দেখছি না। ভাই একটু সরুন।
অন্ধ মানুষ যাচ্ছে ভাই।
সরুন-সরুন বলে হর্ন দিলে হবে? যাব কোথায়?

দাদুরা, অন্ধ বুড়োহাবড়া নিয়ে বেরনোর আর সময় পাননি!
লাঠিটা একটু হাতবদল করব, বুঝলে?
যে দেশে এত লোক সে দেশের কিস্যু হবে না।
হতচ্ছাড়া পাজির পাঝাড়া!
কিছুর একটা শব্দ হল মনে হল!
একজন আছাড় খেল হাঁটতে গিয়ে!
আহা বেচারা!
এই তো আমাদের কামরা! ব্যস!

খবর আছে আজ সোনার হরিণ দার্জিলিং মেলে উঠছে!
চুপ করে আছ যে! কিছু দেখতে পেলে?
বিকেলের সেই ডেঁপো ছেলেটা ধাক্কা মারল!
স্টেশন চত্বরে নজর রাখো!
BOOK
BOOK
একদম চিন্তা করবেন না, আমার লোক চারিদিকে রয়েছে!
ওফ, এখন আবার কে?
তোর বাবা নাকি দ্যাখ?
চিং চুং
কী ব্যাপার কী? অ্যাঁ, ফোটো তুলতে নর্থ বেঙ্গল...বন্ধুর সঙ্গে?
হ্যাঁ, হঠাৎই ঠিক হল ব্যাপারটা!
নিশ্চয়ই সেই হতচ্ছাড়া সম্পাদকটা! ভীষণ ঘ্যানঘ্যানে!
কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরব!
অসাধারণ!
কী বলছিস?
একদম নড়বি না! অসাধারণ ফ্রেম!

কামরায় উঠবার সময় কী হচ্ছেটা কী এখানে?
ওসব আপনি বুঝবেন না!
এক মিনিট! দাদা!
ফোটো তোলার আর সময় পেলেন না?
এখানে কী সব বাঁদরামি হচ্ছে?
একী তুমি! আবার কী চাই?
আমি তো এই ট্রেনেই এন জে পি যাচ্ছি!
ওফ! কী আপদ! ভগবান এটা কী করল!
আপনি অত্যন্ত ঘ্যানঘ্যানে!
তুম এস সেভেন কামরায় যাবে!

বলুন!
সোনার হরিণকে দার্জিলিং মেল থেকে নামিয়ে নিতে হবে!
খুব শক্ত কাজ!
পারব তো? মানে সোনার হরিণ বলে কথা!
!!
এত ভয় যখন স্টেশনে ভিক্ষে করলেই পারতে! এসব লাইনে এলে কেন?
তোমাকে হেল্প করার জন্য আরও লোক আছে! চিন্তা নেই!
এস সেভেন কামরা!
ঠিক আছে আমরা অন্য দিকে নজর রাখছি!
ওই তো!
এক্ষুনি ট্রেন ছাড়বে!
রেডি ফর অপারেশন সোনার হরিণ।

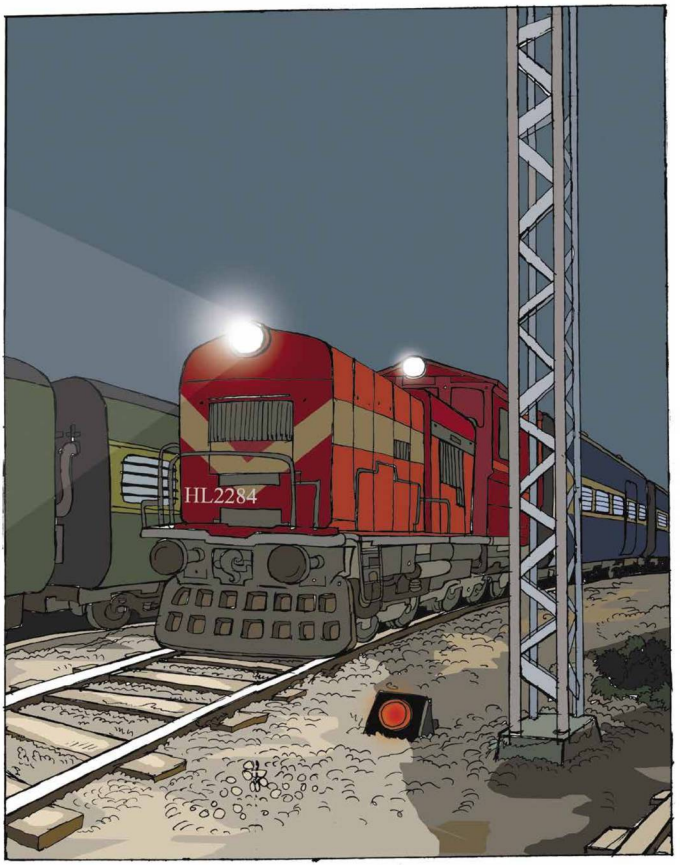
HL2284

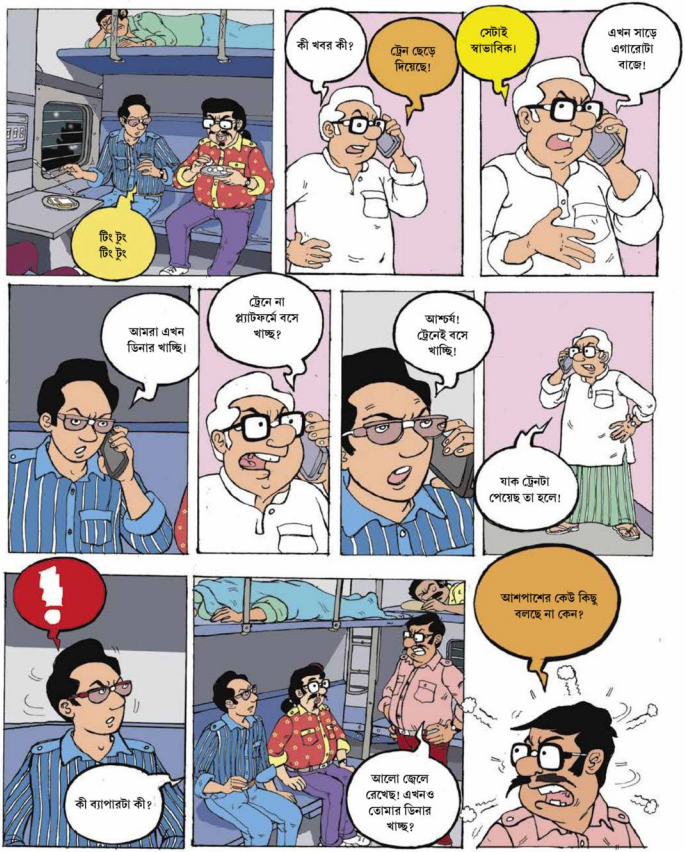
টিং টুং
টিং টুং
কী খবর কী?
ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে!
সেটাই স্বাভাবিক।
এখন সাড়ে এগারোটা বাজে!
আমরা এখন ডিনার খাচ্ছি।
ট্রেনে না প্ল্যাটফর্মে বসে খাচ্ছ?
আশ্চর্য! ট্রেনেই বসে খাচ্ছি!
যাক ট্রেনটা পেয়েছ তা হলে!
!
কী ব্যাপারটা কী?
আলো জ্বেলে রেখেছ! এখনও তোমার ডিনার খাচ্ছ?
আশপাশের কেউ কিছু বলছে না কেন?

আর আমার কপালটা মন্দ, তাই তোমার সঙ্গে বারবার দেখা হচ্ছে।
আর আমার কপালটা একদম পোড়া! তাই আপনার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে!
গাধাগুলো কাজটা করতে পারবে তো?
কী হে কাজ এগোল?
ধ্যাৎতেরিকা, এই তো খানিক আগে ট্রেন ছাড়ল!
সব ব্যাপারে হড়বড় করবেন না তো!
ঘণ্টাদু'য়েক পরে করব! বুঝলেন?
বাথরুমে যাওয়ার সময়টা কাজে লাগাবে!
একী! এই বুড়োটাও এই ট্রেনে?

অন্ধ বুড়োটাকে একলা ছেড়ে দিয়েছে, সঙ্গে যাই!
ওই তো আসছে,
বাহ, একটা গ্যাস ক্যাপসুলেই কাজ হয়েছে।
এ কী, ব্যাপারটা কী!
এই মরেচে! পিছনে আবার ওর শাকরেদও আছে!
কে জানে, ওদিকে আবার কী হচ্ছে?

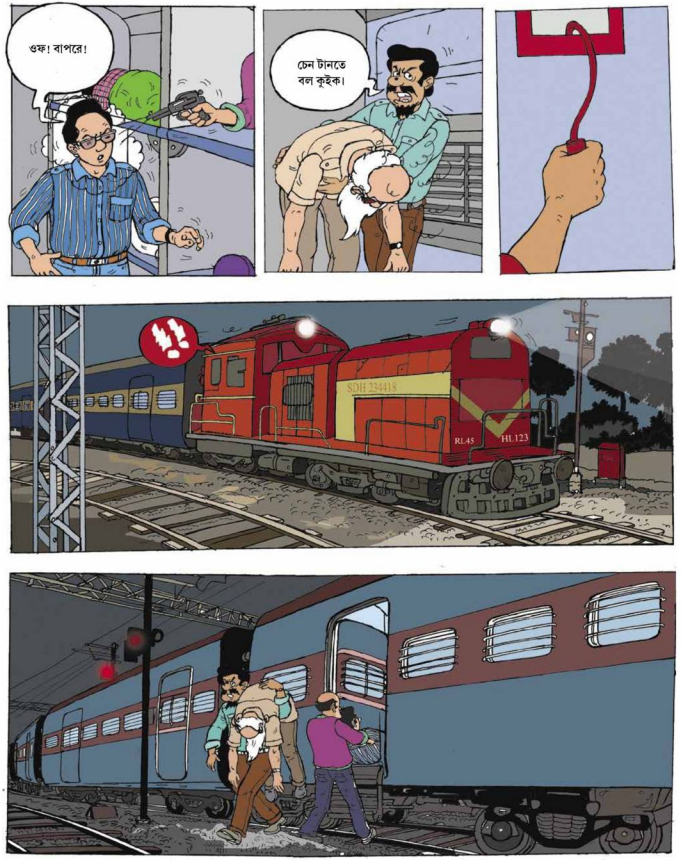
ওফ! বাপরে!
চেন টানতে বল কুইক।
!!
SDH 234418
RL45
HL123

আমাদের বাকি লোকেরা তো ট্রেন থেকে নামল না?
ওফ! কী ভারী এভাবে যাওয়া যায়?
তা এখন রাতদুপুরে কুলি ডাকবে নাকি এদের বইবার জন্য?
কোন হতচ্ছাড়া চেন টানল রে বাবা?
ওরে এই লাইনে মালগাড়ি আসছে!

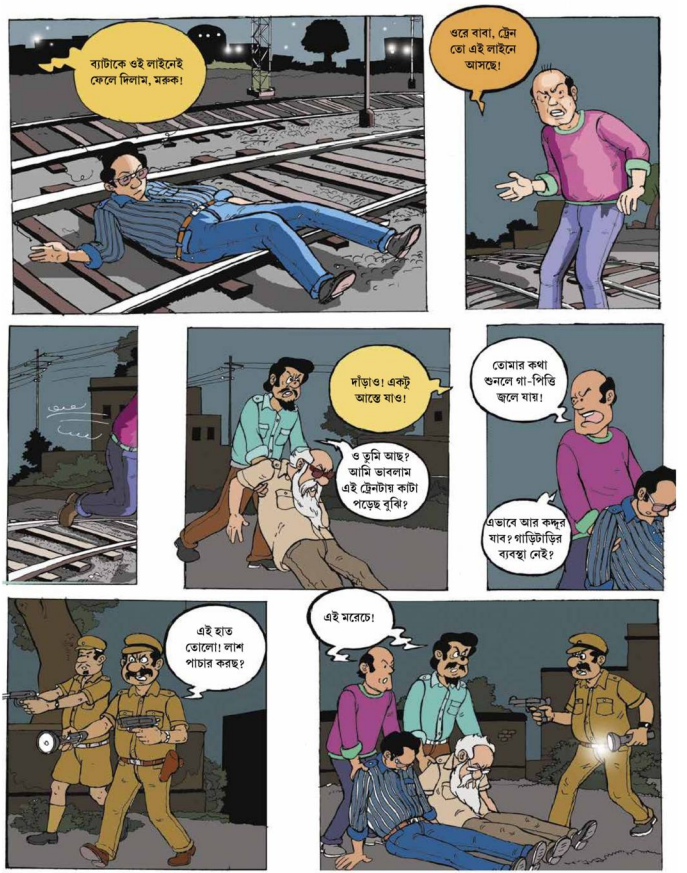
ব্যাটাকে ওই লাইনেই ফেলে দিলাম, মরুক!
ওরে বাবা, ট্রেন তো এই লাইনে আসছে!
দাঁড়াও! একটু আস্তে যাও!
ও তুমি আছ? আমি ভাবলাম এই ট্রেনটায় কাটা পড়েছ বুঝি?
তোমার কথা শুনলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়!
এভাবে আর কদ্দূর যাব? গাড়িটাড়ির ব্যবস্থা নেই?
এই হাত তোলো! লাশ পাচার করছ?
এই মরেচে!

কী ব্যাপার কী! মাঝরাত্তিরে এভাবে উৎপাত করছেন!
আপনাদের ডিসটার্ব করতে আমার বয়ে গিয়েছে!
কয়েকজন প্যাসেঞ্জার মিসিং! ট্রেন থামিয়েছে চেন টেনে...
আমার বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছি না।
!
তোমার বন্ধু মানে তো ওই বাঁদর ছেলেটা!
!!
দেখলেই বোঝা যায় বদের ধাড়ি! আমার ব্যাগ ঝেড়ে দেওয়ার তালে ছিল!
এটা ওরই বন্ধু, এটাকে জেরা করুন। এ ব্যাটা নিশ্চয়ই সব জানে!
হুম, আপনি তা হলে সব জানেন?
একদম আমার বন্ধুর নামে আজেবাজে কথা বলবেন না! ও খুব ভাল ছেলে।

টিং টুং
টিং টুং
দাঁড়ান ওকে ফোন করি।
ওকে তো ফোনে পাব না! ফোন তো ফেলে গিয়েছে!
ফোনটাও দেখুন হয়তো ওর নিজের না, কোত্থেকে ঝেড়ে এনেছে!
ওদিকে...
আমি একটু টয়লেটে যাব,
যাও তবে পালানোর চেষ্টা কোরো না...লাভ হবে না...
আর এই লাশ দুটোকে আপাতত মর্গে ঢুকিয়ে দাও।
তা এখন আমি করবটা কী?
সামনের স্টেশনে নেমে আমাদের সঙ্গে যাবেন!
হোয়াটসঅ্যাপ করে দিই!
কালিয়াচক থানার পুলিশ আমাদের ধরেছে!

এত রাত্তিরে কে আবার জ্বালাতে ফোন করেছে?
ওফ, রঘুরা মেসেজ করেছে ওরা কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে বন্দি।
কী করবে জিজ্ঞেস করছ? গাধা! সোনার হরিণকে উদ্ধার করে নিয়ে এসো।
সব ক'টা গাধা। এদের দিয়ে কিস্যু হবে না।
কী দেখছ কী?
দেখছি। ধুকপুক শোনা যাচ্ছে কিনা।
স্যার, মনে হচ্ছে লোক দুটো বেঁচে আছ।
চুপ! একদম চুপ! এক্ষুনি ওদের তা হলে আবার হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।
তার চেয়ে মর্গে ঢুকিয়ে দাও।
ঠান্ডায় এমনিই পটল তুলবে।
গাধাগুলো সোনার হরিণকে ধরে নিয়ে গেল! জানে না যে এর ফল কী হবে!

ব্যস! মর্গে ঢুকিয়ে দাও। তারপর কাল দেখা যাবে।
এসে গিয়েছি।
সামনেই কালিয়াচক থানা।
ঝাঁঝরা করে দেব! চুপচাপ যা বলছি তাই করো!
কোনও চালাকি নয়!
আগে বল যে দুষ্টুলোককে ধরেছিস তাদের সঙ্গে কী-কী ছিল?
দুটো লাশ! সত্যি বলছি মর্গে ঢোকানো হয়েছে এইমাত্র!
সোনার হরিণকে রঘু কি মেরে ফেলল? এরা বলছে লাশ!
গ্যাসের জন্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে! পুলিশগুলো ভুল বলছে!

তাড়াতাড়ি করো, পিছনের সিটে...
এ হে! সমস্ত কুলেন্ট পড়ে গিয়েছে! এ গাড়ি আর যাবে না!
এই হতচ্ছাড়া তোদের একটা যা হোক গাড়ি দে! কুইক!
এটাকে ডিকিতে আর ওটাকে পিছনের সিটের তলায়!
তাড়াতাড়ি।
ভোর হয়ে আসছে! জোরে চালাও!
ভাবুন কাণ্ড! রাতদুপুরে থানা থেকে গাড়ি ছিনতাই, লাশ ছিনতাই!

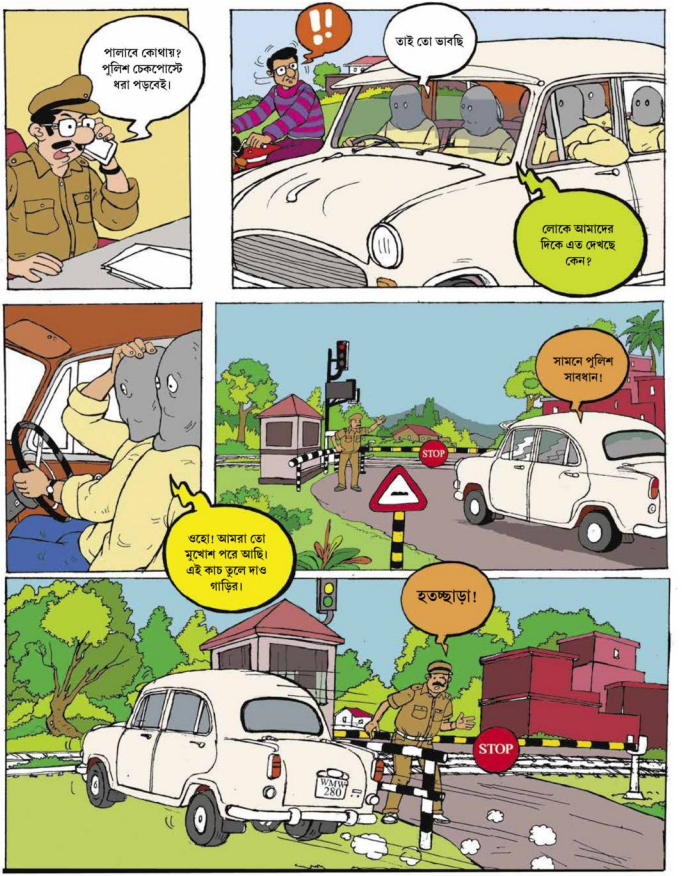
পালাবে কোথায়? পুলিশ চেকপোস্টে ধরা পড়বেই।
!!
তাই তো ভাবছি
লোকে আমাদের দিকে এত দেখছে কেন?
ওহো! আমরা তো মুখোশ পরে আছি। এই কাচ তুলে দাও গাড়ির।
STOP
সামনে পুলিশ সাবধান!
হতচ্ছাড়া!
STOP
WMM 280

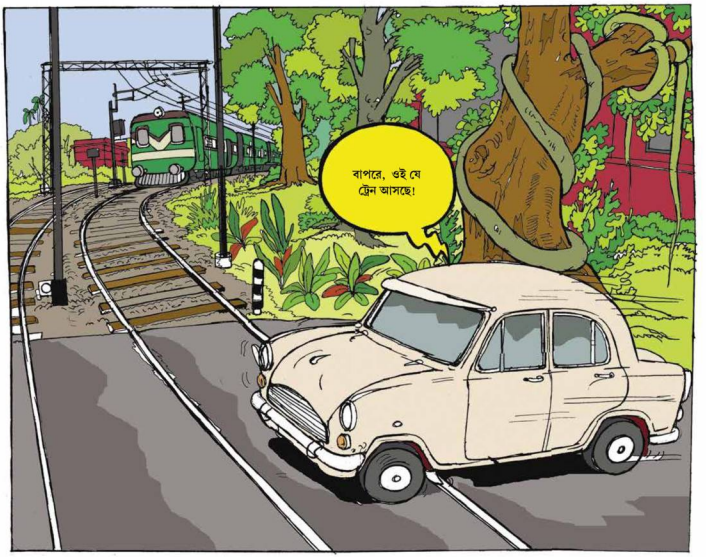
বাপরে, ওই যে ট্রেন আসছে!

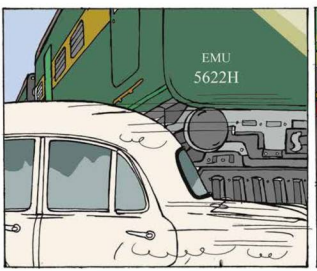
EMU
5622H

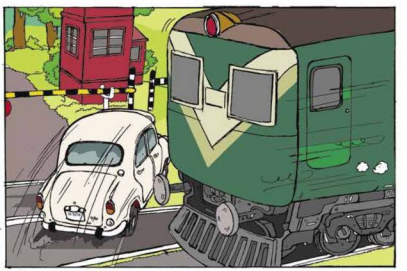

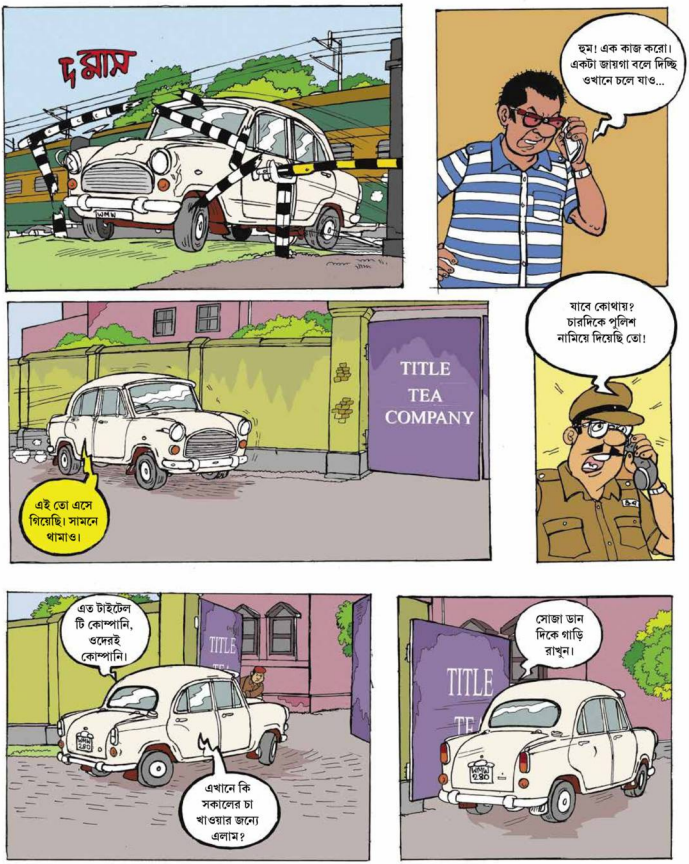
দ্রাস
হুম! এক কাজ করো। একটা জায়গা বলে দিচ্ছি ওখানে চলে যাও...
যাবে কোথায়? চারদিকে পুলিশ নামিয়ে দিয়েছি তো!
TITLE TEA COMPANY
এই তো এসে গিয়েছি। সামনে থামাও।
এত টাইটেল টি কোম্পানি, ওদেরই কোম্পানি।
এখানে কি সকালের চা খাওয়ার জন্যে এলাম?
সোজা ডান দিকে গাড়ি রাখুন।

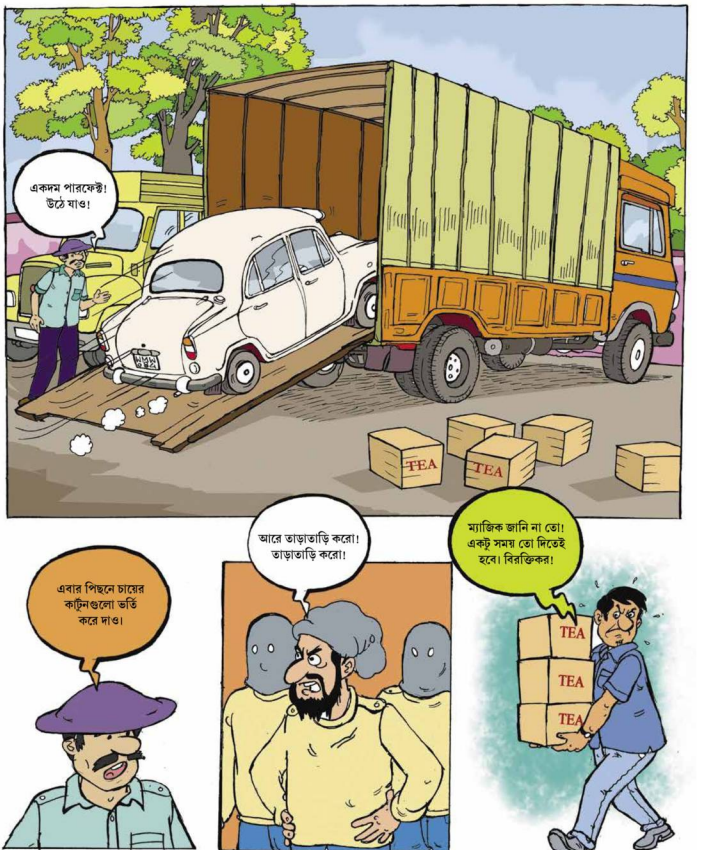
একদম পারফেক্ট! উঠে যাও!
TEA
TEA
এবার পিছনে চায়ের কাটলগুলো ভর্তি করে দাও।
আরে তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!
ম্যাজিক জানি না তো! একটু সময় তো দিতেই হবে। বিরক্তিকর!
TEA
TEA
TEA

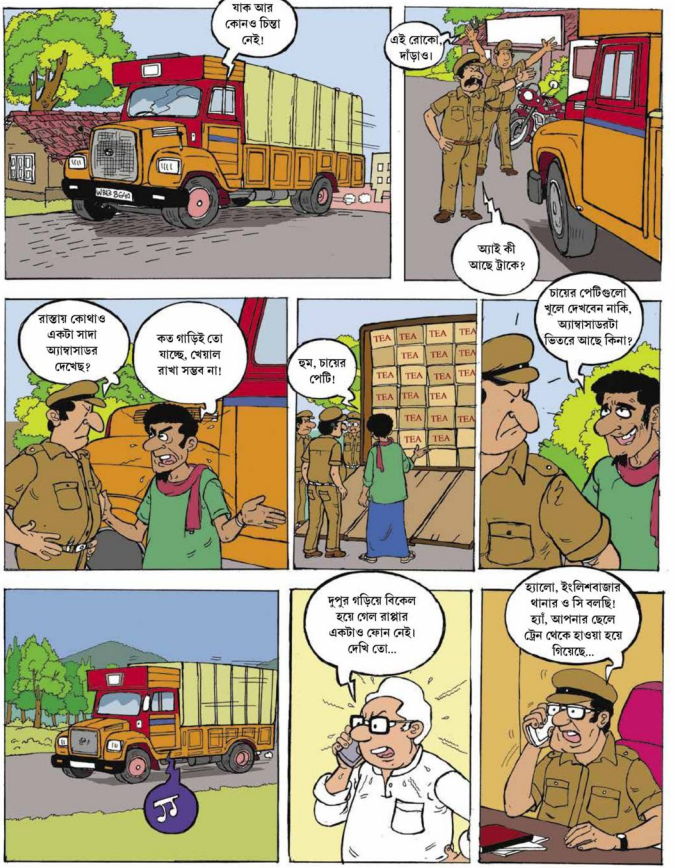
যাক আর কোনও চিন্তা নেই!
এই রোকো, দাঁড়াও।
অ্যাই কী আছে ট্রাকে?
রাস্তায় কোথাও একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর দেখেছ?
কত গাড়িই তো যাচ্ছে, খেয়াল রাখা সম্ভব না!
হুম, চায়ের পেটি!
চায়ের পেটিগুলো খুলে দেখবেন নাকি, অ্যাম্বাসাডরটা ভিতরে আছে কিনা?
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল রাপ্পার একটাও ফোন নেই। দেখি তো...
হ্যালো, ইংলিশবাজার থানার ও সি বলছি! হ্যাঁ, আপনার ছেলে ট্রেন থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে...

আর ও যে হনুমানটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিল সেটা কোথায়?
!!
অ্যা? কী বলছেন কী? এমন খবর তো জানি না...
উনি হনুমান নিয়ে ট্রেনে উঠেছিলেন?
উনি বোধ হয় আমার কথা বলছেন...
মেসোমশাই, মালদায় আপনাদের কোনও আত্মীয় থাকেন?
মাঝরাত্তিরে চেন টেনে কেউ আত্মীয়র বাড়ি যায় না।
ওঁর ছেলে ট্রেন থেকে নেমে গেল, গাল খেলাম আমি!
আমি কোথায়?
অনেক ঘণ্টা বাদে...
হুম, ট্রেনে অজ্ঞান করে দিয়েছিল আমাকে।
দেখি ওর কাকাকে একটা ফোন করি।

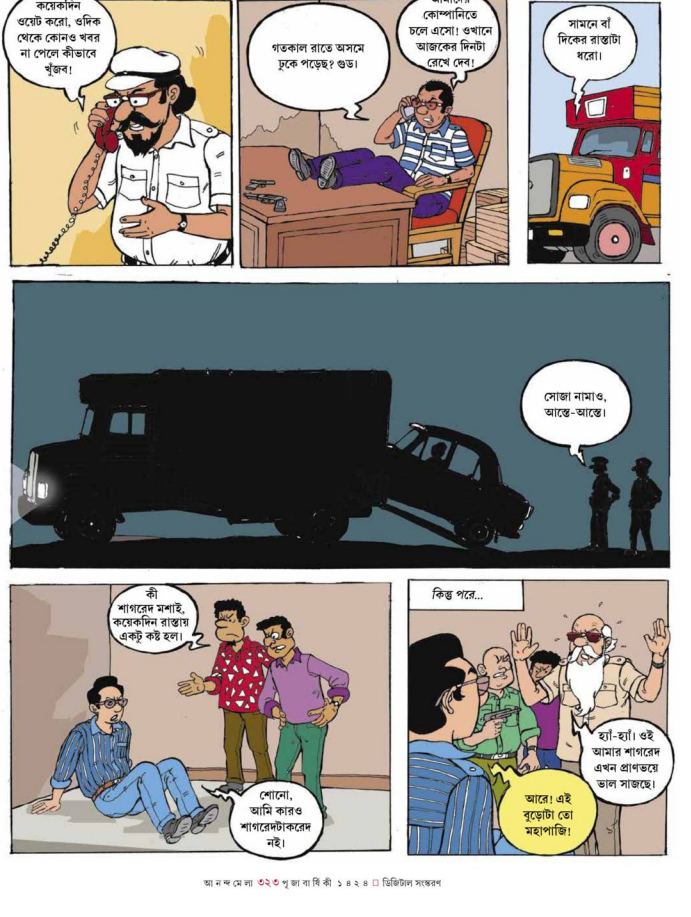
কয়েকদিন ওয়েট করো, ওদিক থেকে কোনও খবর না পেলে কীভাবে খুঁজব!
গতকাল রাতে অসমে ঢুকে পড়েছ? গুড।
আমাদের কোম্পানিতে চলে এসো! ওখানে আজকের দিনটা রেখে দেব!
সামনে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরো।
সোজা নামাও, আস্তে-আস্তে।
কী শাগরেদ মশাই, কয়েকদিন রাস্তায় একটু কষ্ট হল।
শোনো, আমি কারও শাগরেদটাকরেদ নই।
কিন্তু পরে...
আরে! এই বুড়োটা তো মহাপাজি!
হ্যাঁ-হ্যাঁ! ওই আমার শাগরেদ এখন প্রাণভয়ে ভাল সাজছে।

গভারের শিং বেচা টাকাটা কোথায়?
না বললে কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে মেরে বাঘকে দিয়ে খাওয়াব...
আমি তো মোটেই আপনার শাগরেদ নই। ফালতু বাজে কথা বলছেন কেন?
কারণ অনেক কিছু জেনে ফেলার পর তো তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না।
ওঁকে কে বাঁচায় তার ঠিক নেই, উনি আবার আমায় মারবেন...
আপনি তো একটা চোরাশিকারি, আর...
!
এই চুপ...
তোদের তর্কাতর্কি বন্ধ কর! রাত্তির বেলা ঘুমোতে দে...
না হলে গুলি করে মারব।
এ তো আচ্ছা পাজি!
দড়াম
পরে...
Z Z Z Z
বাবা, রাত এখন দুটো...

এই বুড়োটা যে কোন দেশি মাফিয়া বুঝতে পারছি না। প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে ধরা পড়েছে...
ভররর ভোঁস্‌স
এদিকে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে...এদিকে চোখে দেখতে পায় না...বিরক্তিকর!
লুকনো ফোনটা এবার কাজে লাগবে!
টনিটাকে একটা ফোন করি!
অচেনা নম্বর... রাতদুপুরে...
রাপ্পা! তোর কী আক্কেল! তুই তো আচ্ছা...
ষাঁড়ের মতো চেঁচাস না!
আমি নিউ জলপাইগুড়িতে একটা হোটেলে কয়েকদিন রয়েছি।
কী করব বুঝতে পারছি না! তোর বাবা আমায় গালমন্দ করছেন!
কেউ আসছে! পরে কল করছি। রাখ এখন।
ধ্রীতাম্ম ফট্
ফোনটা দে হতভাগা! এ ঘরে ক্যামেরা, রেকর্ডার সব আছে! কুইক!

তুই যাকে ফোন করছিস তাকেও ধরে আনব আমরা।
ওরে আমরা বড়-বড় হাতি, গন্ডার মেরে পাচার করি!
তোদের মতো চামচিকে মারা কোনও কাজই নয়!
!!
দড়াম
কীসের শব্দ হল?
আমার আর আপনার কবর খোঁড়া হচ্ছে তারই শব্দ।
রাপ্পার নম্বর থেকে এস এম এস করেছে।
এই নম্বরে আর ফোন করিস না। তুই এক কাজ কর। অনলাইনে বাগডোগরা থেকে জোড়হাট টিকিট কেটে কাল সকালে ফ্লাইটে চলে আয়। এসে এই নম্বরে একটা মিস্‌ড কল দিবি। একটা লাল রঙের গাড়ি তোকে আনতে যাবে!
পৌঁছেছি! এবার ওই নম্বরে একটা মিস্‌ড কল দিয়ে দিই।

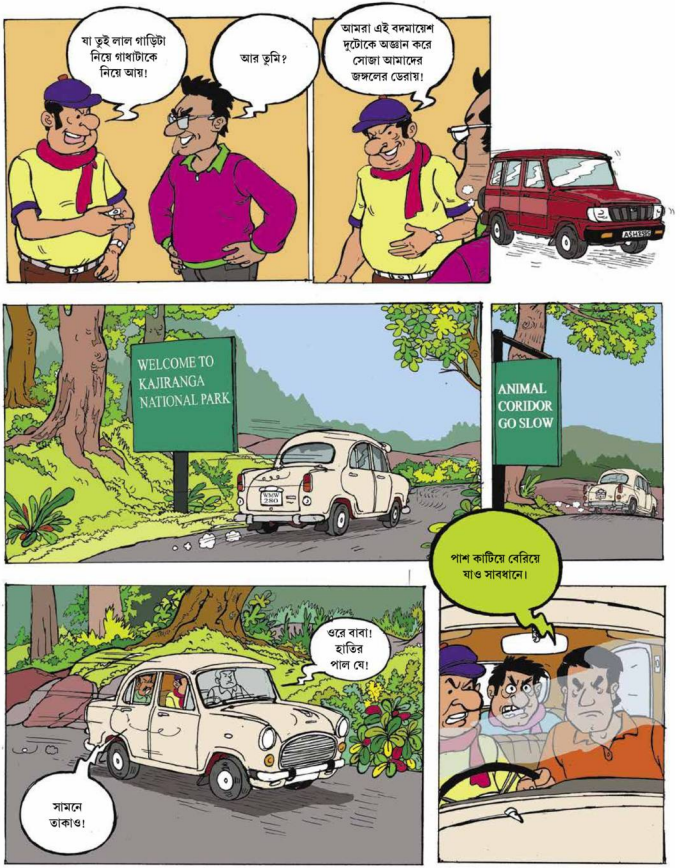
যা তুই লাল গাড়িটা নিয়ে গাধাটাকে নিয়ে আয়!
আর তুমি?
আমরা এই বদমায়েশ দুটোকে অজ্ঞান করে সোজা আমাদের জঙ্গলের ডেরায়!
WELCOME TO KAJIRANGA NATIONAL PARK
ANIMAL CORIDOR GO SLOW
পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাও সাবধানে।
ওরে বাবা! হাতির পাল যে!
সামনে তাকাও!

রাপ্পাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে চোরাশিকারিরা...

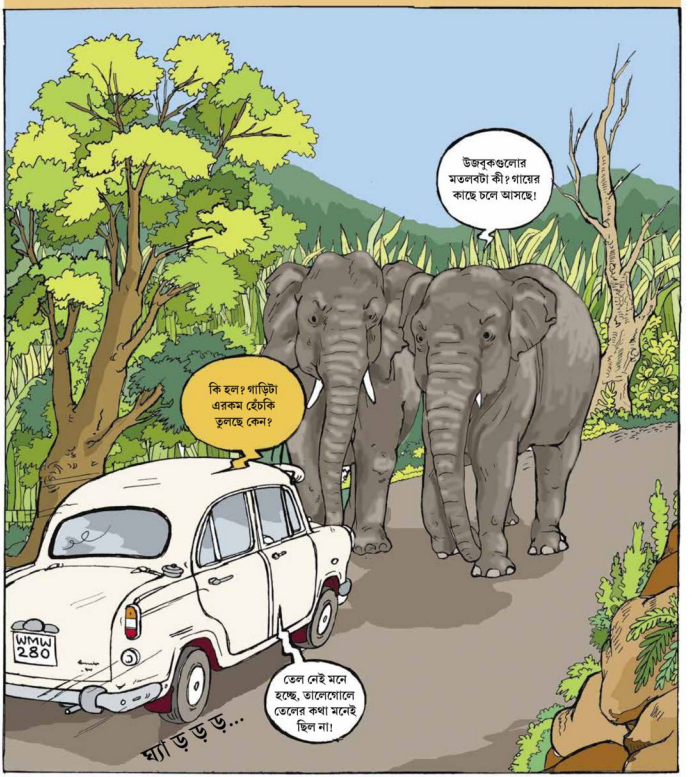

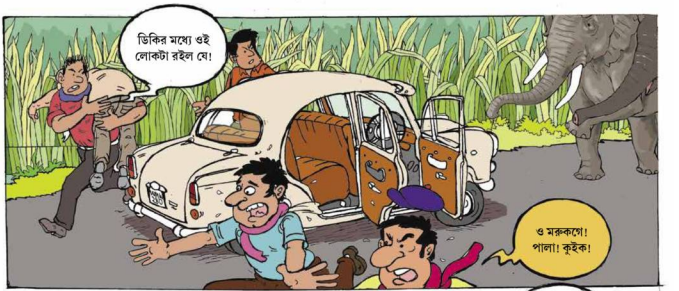
ডিকির মধ্যে ওই লোকটা রইল যে!
ও মরুকগে! পালা! কুইক!

ওফ আমি?... ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?

ওরে বাবা, এত হাতিদের মধ্যে ফুটবলম্যাচ চলছে।

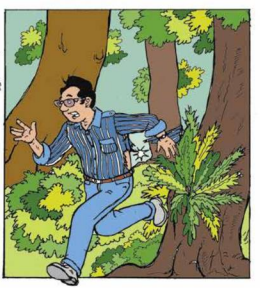

আহ!
উহ! আমি কোথায়!
পরে...
কেন আমার এখানে, টাইটেল টি কোম্পানিতে! তুমি তো সবই জান!
এবার বলো তো চাঁদু, গতবারের হাতির দাঁতদুটো কোথায় পাচার করলে?
বলব, সব বলব কিন্তু...
ওরে বাবা...
আমার ভীষণ দুর্বল লাগছে! বড্ড খিদে ...
ওমা এ যে নেতিয়ে পড়ল... এ ক'দিন খেতে দাওনি একে?

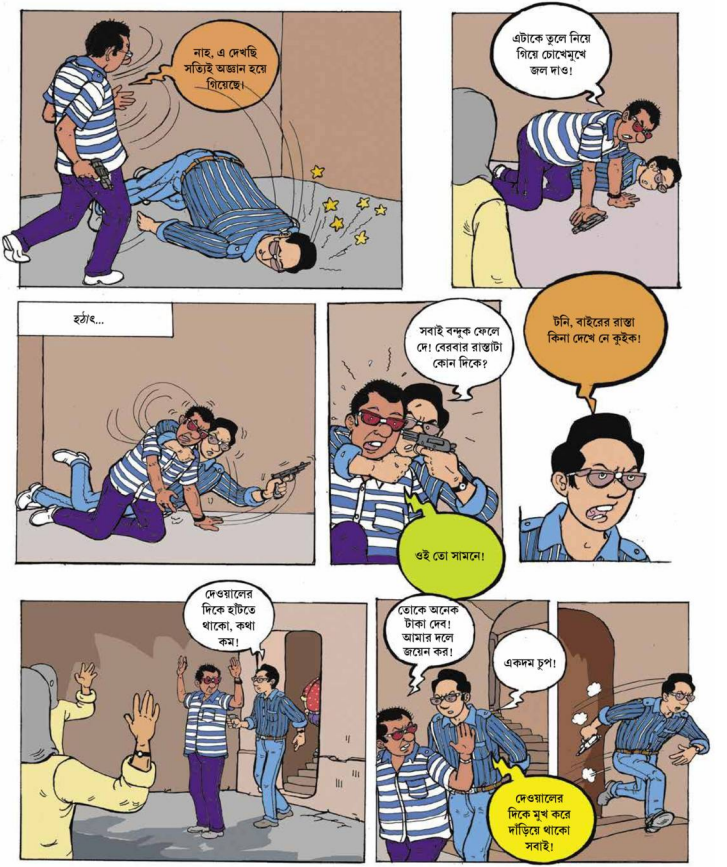
নাহ, এ দেখছি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।
এটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে চোখেমুখে জল দাও!
হঠাৎ...
সবাই বন্দুক ফেলে দে! বেরবার রাস্তাটা কোন দিকে?
টনি, বাইরের রাস্তা কিনা দেখে নে কুইক!
ওই তো সামনে!
দেওয়ালের দিকে হাঁটতে থাকো, কথা কম!
তোকে অনেক টাকা দেব! আমার দলে জয়েন কর!
একদম চুপ!
দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকো সবাই!

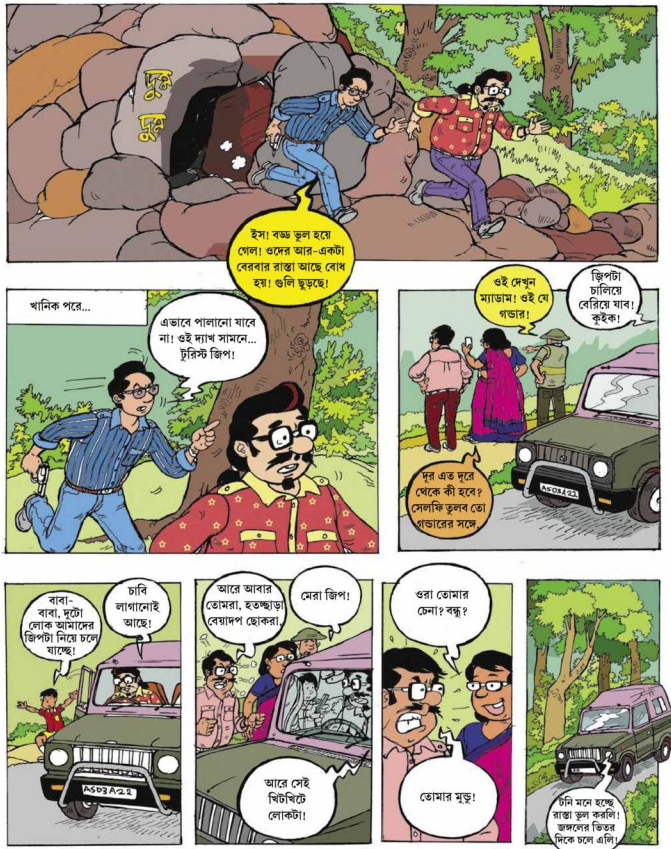
দুম্ দুম্
ইস! বড্ড ভুল হয়ে গেল! ওদের আর-একটা বেরবার রাস্তা আছে বোধ হয়! গুলি ছুড়ছে!
খানিক পরে...
এভাবে পালানো যাবে না! ওই দ্যাখ সামনে... টুরিস্ট জিপ!
ওই দেখুন ম্যাডাম! ওই যে গভার!
জিপটা চালিয়ে বেরিয়ে যাব! কুইক!
দূর এত দূরে থেকে কী হবে? সেলফি তুলব তো গভারের সঙ্গে!
বাবা-বাবা, দুটো লোক আমাদের জিপটা নিয়ে চলে যাচ্ছে!
চাবি লাগানোই আছে!
আরে আবার তোমরা, হতচ্ছাড়া বেয়াদপ ছোকরা!
মেরা জিপ!
আরে সেই খিটখিটে লোকটা!
ওরা তোমার চেনা? বন্ধু?
তোমার মুন্ডু!
চিনি মনে হচ্ছে রাস্তা ভুল করলি! জঙ্গলের ভিতর দিকে চলে এলি!

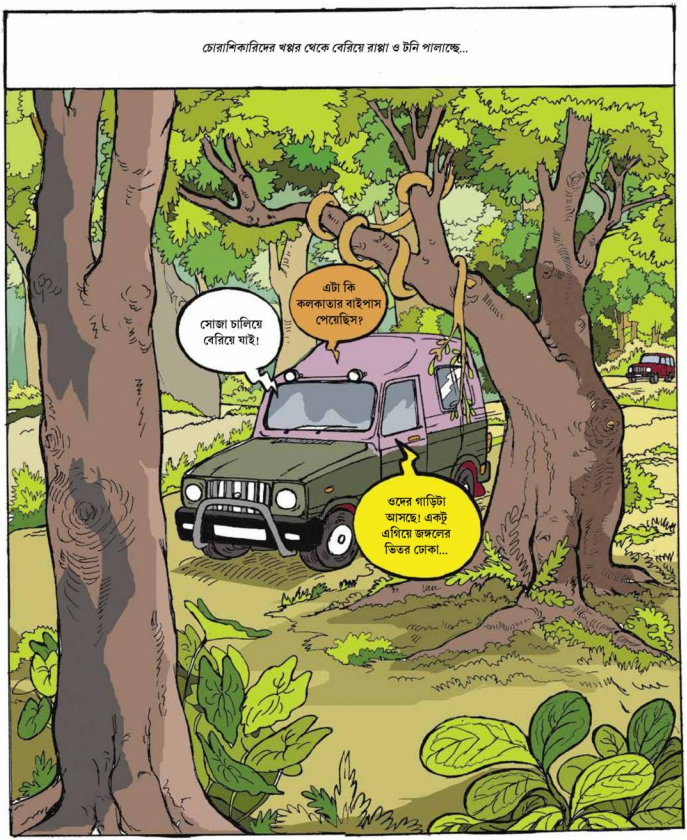
চোরাশিকারিদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে রাপ্পা ও টনি পালাচ্ছে...
সোজা চালিয়ে বেরিয়ে যাই!
এটা কি কলকাতার বাইপাস পেয়েছিস?
ওদের গাড়িটা আসছে! একটু এগিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢোকা...

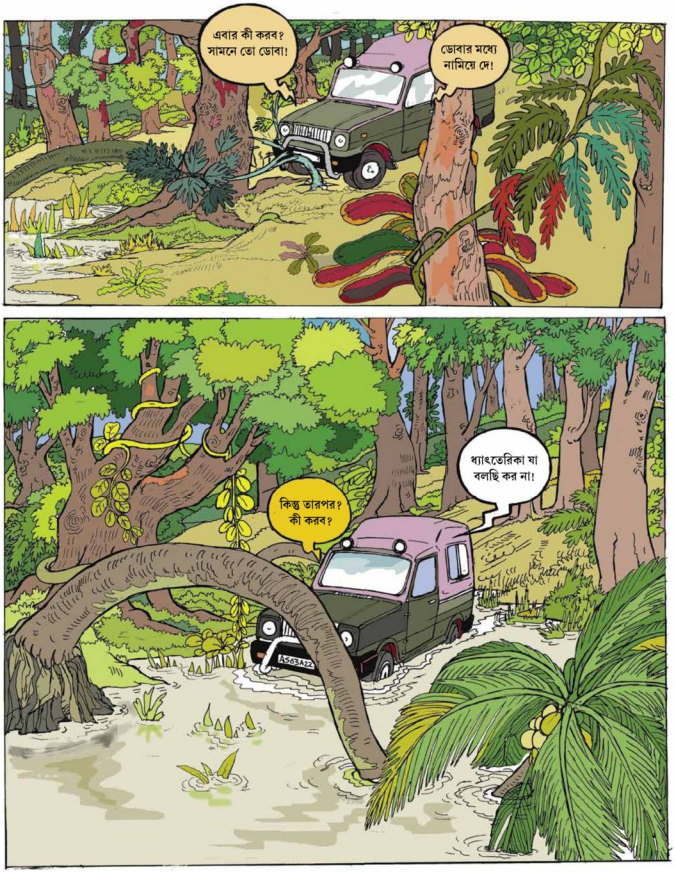
এবার কী করব? সামনে তো ডোবা!
ডোবার মধ্যে নামিয়ে দে!
কিন্তু তারপর? কী করব?
ধ্যাৎতেরিকা যা বলছি কর না!

কী যে চাইছিস বুঝতে পারছি না।
এবার গাড়িটা ব্যাক কর!
ব্যাটাদের ধরে ফেলব।
তাড়াতাড়ি কর, কুইক!
করছি তো!
GYPSY
এবার? আবার রাস্তায় ফিরে যাব?
রাপ্পা ও টনি ভয়ানক বিপদের মধ্যে...
এবার আবার ডোবার মধ্যে গাড়ি ঢোকা।
তোর মাথাটা মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে গিয়েছে!

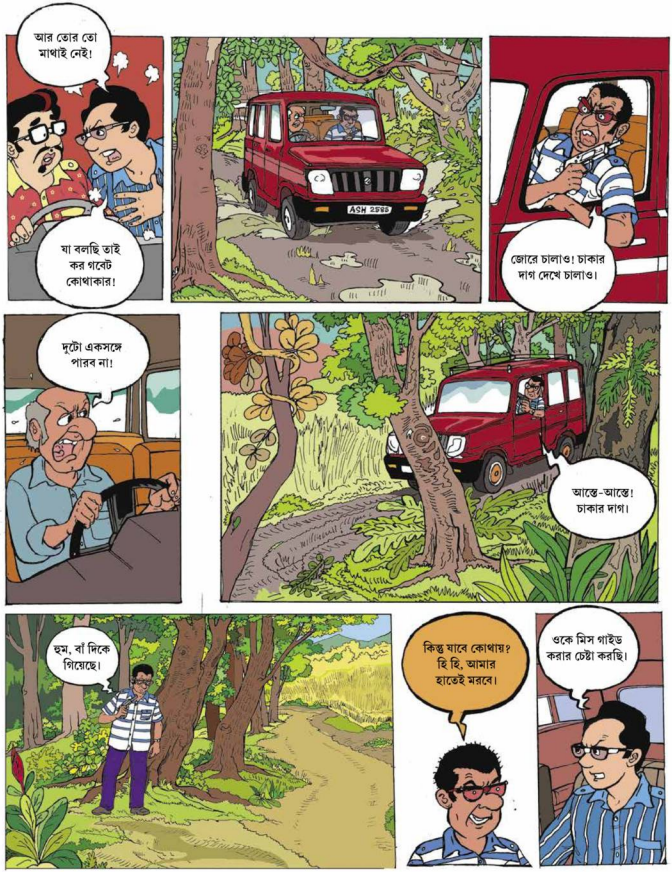
আর তোর তো মাথাই নেই!
যা বলছি তাই কর গবেট কোথাকার!
AGM 2545
জোরে চালাও! চাকার দাগ দেখে চালাও।
দুটো একসঙ্গে পারব না!
আস্তে-আস্তে! চাকার দাগ।
হুম, বাঁ দিকে গিয়েছে।
কিন্তু যাবে কোথায়? হি হি, আমার হাতেই মরবে।
ওকে মিস গাইড করার চেষ্টা করছি।

গাড়িটা গেল কোথায়...এখান থেকে ঘুরিয়েছে?
চুপ করে বসে থাকতে হবে এখন!

ওদিকে...
একেবারে খাঁটি হিরে! আমার দলে যোগ দাও! আরও পাবে!
আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের কোনও লাভ নেই!

তোমাদের মাথামোটা লিডার যে আমাকে মারতে চায়, তা জানতাম। তাই নিজে থেকে এসেই প্রায় ধরা দিয়েছি!

ডোবার সামনে এসে গাড়িটা ঘুরেছে!
আমরা আসার আগেই বেরিয়ে গিয়েছে?
আরে!
ঠক
ঠকাস
দুমাস
ওহো! এখন আবার এরা বাঁদরামি শুরু করল!
আমি মরছি আমার জ্বালায় আর এখানে অসভ্যতা হচ্ছে?

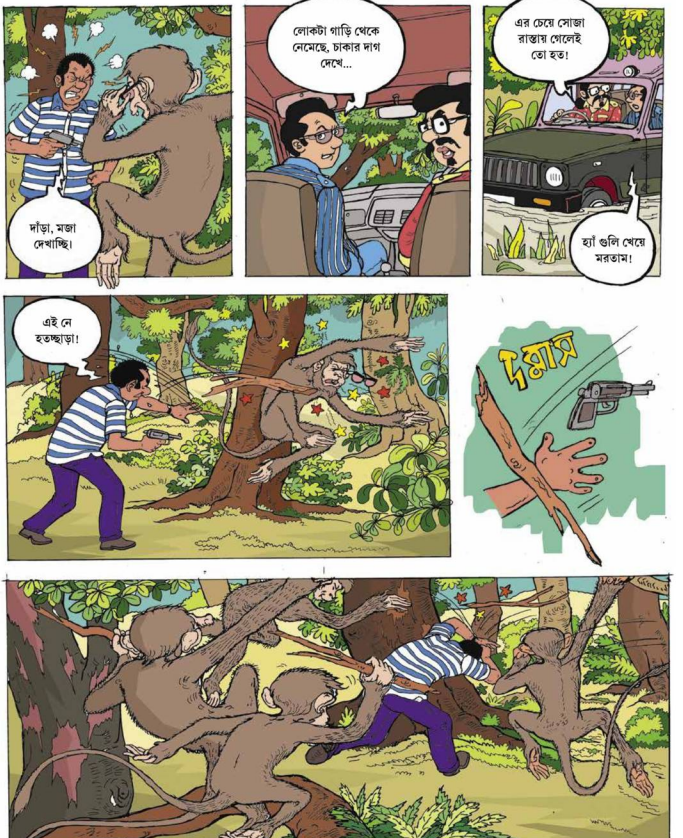
দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।
লোকটা গাড়ি থেকে নেমেছে, চাকার দাগ দেখে...
এর চেয়ে সোজা রাস্তায় গেলেই তো হত!
হ্যাঁ গুলি খেয়ে মরতাম!
এই নে হতচ্ছাড়া!
দুম্মাস

কী সব শব্দ হচ্ছে!
বুঝতে পারছি না, তবে...
মনে হচ্ছে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ পেলাম!
!!
আরে! অসাধারণ একটা গাছের গুড়ি!
মোবাইলে অন্তত একটা ফোটো তোলা দরকার।
তুই একটা ফোটোগ্রাফারের প্যাশান বুঝবি না!
অতএব একদম চুপ!
ওসব বাদ দে! চ'-চ' তাড়াতাড়ি পালাতে হবে।
গুঁড়িটা ওরকম চকচক করছে কেন?
ওই জন্যেই তো ফোটো তুলব রে গাধা!
আরে কীরে! দাঁড়া-দাঁড়া গাড়ি থেকে নামিস না!

দরজা বন্ধ কর! কুইক!
দ্যাখ, তোর গাছের গুঁড়ি তোর সঙ্গে দেখা করবে বলে কাচে টোকা মারছে!

গাড়ি স্টার্ট কর গাধা!
হাত কাঁপছে পারছি না!
এমন চেহারা তোর! গাড়ির মধ্যে সিট বদল করব তাও সম্ভব না!
স্টার্ট হচ্ছে না! ইঞ্জিনে জল ঢুকে গিয়েছে।
না, ধরতে পারিনি ব্যাটাদের।
টিটেনাস কিনে আনো, বাঁদরে আঁচড়ে দিয়েছে!
এখনও খেল দেখাবার সময় আসেনি!
স্টার্ট হয়েছে, ওফ বাঁচলাম!

জলের মধ্যে দিয়ে চালাস না!
কেন বেশ মনে হচ্ছে জাহাজ চালাচ্ছি!
GYPSY
ওফ!
অপদার্থ!
হুম গাড়িটা চালিয়ে পালানো যেত!
খানিক বাদে...
ফট
ফট
মাঠের শুয়ে পড়। গুলি ছুড়ছে!
ঘণ্টাদেড়েক বাদে
টনিটা কোন চুলোয় লুকোল কে জানে!
হাত তুলে এদিকে এসো চাঁদু!

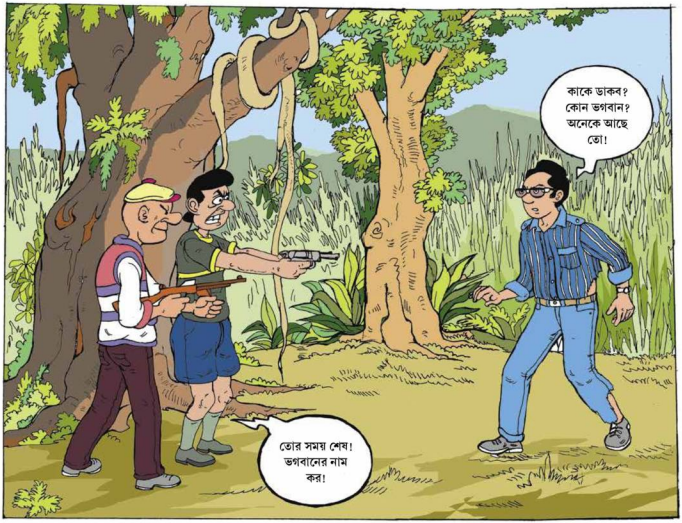
কাকে ডাকব? কোন ভগবান? অনেকে আছে তো!
তোর সময় শেষ! ভগবানের নাম কর!

যাকে খুশি ডাক! উজবুক!
কেউ তোকে বাঁচাতে আসবে না! এক...দুই...

দুটোই ঘাড় মটকে মরে গিয়েছে!
বাবারে! আমার কোমর গিয়েছে রে!
তোকে মরতে দেখে ভয়ে হাত ফস্কে পড়ে গেলাম।
বেশ করেছিস, কিন্তু...
কেউ আসছে...
নিকুচি করেছে এক্স-রের, আগে বাঁচলে তো!
আমার কোমরের একটা এক্স-রে করতে হবে...

মনে হচ্ছে স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেল...
সপাটে একটা লাথি মারব! সব ঠিক হয়ে যাবে!
আমাদের লোককে মেরে দিয়েছে

আমার হাঁচি পাচ্ছে! হ্যাঁ..
!?
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
খানিক বাদে!
আরও পরে...
ওঠার চেষ্টা কর! রাতটা কাটাতে হবে!
জঙ্গলের মধ্যে গেস্ট হাউজ় নেই কোথাও?

এভাবে গিরগিটির মতো সারারাত থাকতে হবে।
তার চেয়ে বেরবার রাস্তা খুঁজলে হত না?
হাঁদার মতো গাড়ি চালিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে নিয়ে এলে।
ভোস ভরর্‌র...
আমার দুটো লোককে মেরে দিয়েছে।
জঙ্গলে বাঁদর। আর দলেও গাদাখানেক বাঁদর পুষছি!
কেউ কোনও কাজের নয়!
কাল সকালের মধ্যে খুঁজে বের করবে!

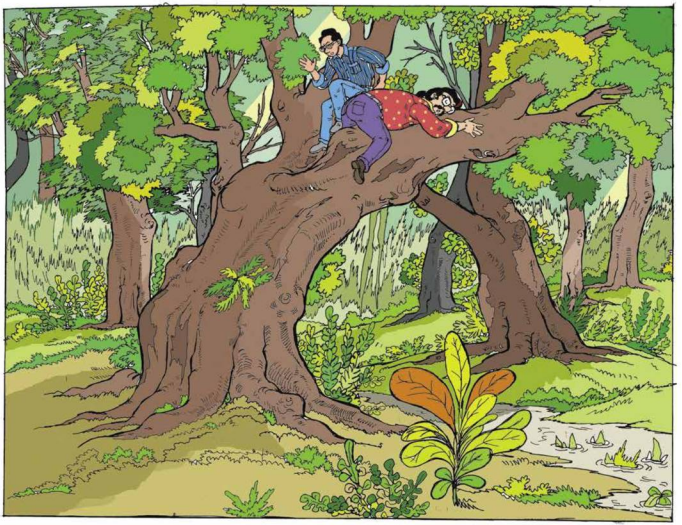

ওরে ওঠ রে হতচ্ছাড়া! সকাল হয়ে গিয়েছে!
কাদের গলা শুনতে পাচ্ছি।
ওদিক থেকে আসছে...

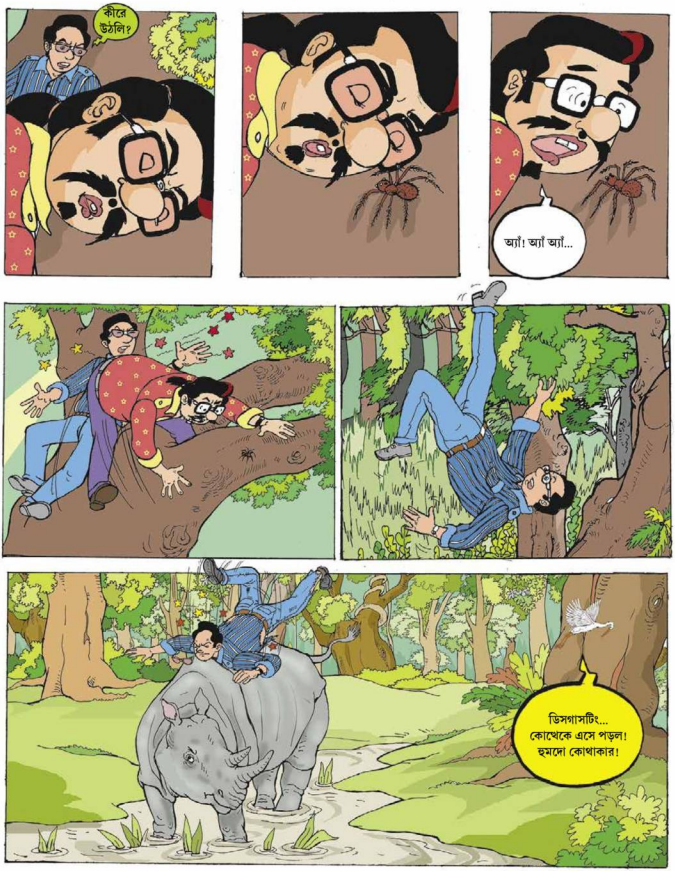
কীরে উঠলি?
অ্যাঁ! অ্যাঁ অ্যাঁ...
ডিসগাসটিং... কোত্থেকে এসে পড়ল! হুমদো কোথাকার!

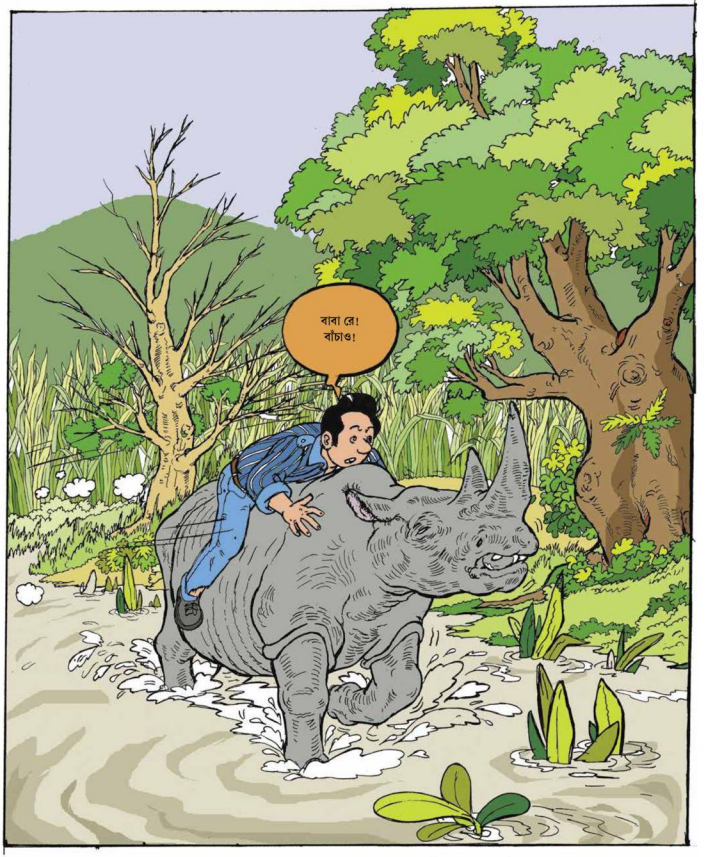
বাবা রে!
বাঁচাও!

ওরে ভাই রে, থাম!
ওফ, সত্যিই গিয়েছি!
রাপ্পা, ভাইটি আমার... গন্ডারের পিঠ চড়ে কোথায় গেলি...
নাম হতচ্ছাড়া, তোকেও চড়াব...
তোর বন্ধু সরে গেছে, তুই নেমে আয়!
কোনও চালাকি নয়,
নামছি তো!
গুলি কোরো না! গুলিরও তো দাম আছে ভাই!

কেউ গুলি করছে!
গন্ডারটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।
কী ইয়ার্কি হচ্ছে এটা?
হ্যাল্লো, আমি তো তোদের বস!
বস ছিলে, এখন আর নেই। ওদের আমি কিনে নিয়েছি!
কাকে ধরেছিস জানিস? আমার তোলা ফোটো ম্যাগাজিনে বেরয়।
ও জোড়া খুনের জন্য আমার ফোটোও বেরিয়েছিল কাগজে!

হ্যালো ইয়ং ম্যান! তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমাকে ধরা অত সোজা নয়! আমার নাম সোনার হরিণ!
কিন্তু তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না!
ভ্যাঁ...আ...আ... কাউকে বলব না!
তোমরা এত কিছু জেনে ফেলেছ যে, তাতে চাপ হয়ে যাবে।

আমি অনেকদিন আগেই এই লোকগুলোকে দলে নিয়েছি!
ওদের বস সেকথা জানত না!
বলছি তো কাউকে বলব না!
তোদের দেখিয়ে-দেখিয়ে খাব, তারপর মারব।
তোর পাকামির জন্যই মরলাম।
শোন, তোতে আর গভারটাতে না কোনও তফাত নেই!
বাঁচতে হবে! দেখি উপরে কোনও অস্ত্র পাই কিনা।
ওরে গাধা ওখানে অস্ত্র থাকলে ওরা কেউ না-কেউ থাকত!
কী রে মোট্টু? দাঁড়া মইটা সরিয়ে নিই!

আমায় নামতে দাও!
তোর বন্ধুকে চুপ করতে বল। শান্তিতে খেতে দে!
মরার আগে কিছু অন্তত খেতে দাও!
দড়াম
ধড়াম
উঁ আউঁ!
ওকৎ!

সবক'টা ডেডলি উনডেড কুইক!
আমার কোমরে যন্ত্রণা উফ!
কাকাকে একটা ফোন করি!
হ্যাঁ, তুমি অসমের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফোর্স পাঠাও।
একটা অ্যাম্বুলেন্সও বল!
জায়গাটা কহলার কাছে, আর এই মোবাইলের টাওয়ার ফলো করতে বলো।
আমি অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছি।
এক্ষুনি না ট্রিটমেন্ট করলে বিপদ হবে যে!
কীরে আমার কথা বললি?
আর একটা কথা বললে আমি নিজে তোকে গুলি করে মারব...
পরে...
যা বলেছ!
বন্দুক মিলিটারি না এনে চাড্ডি স্ট্রেচার আনলে কাজ দিত!

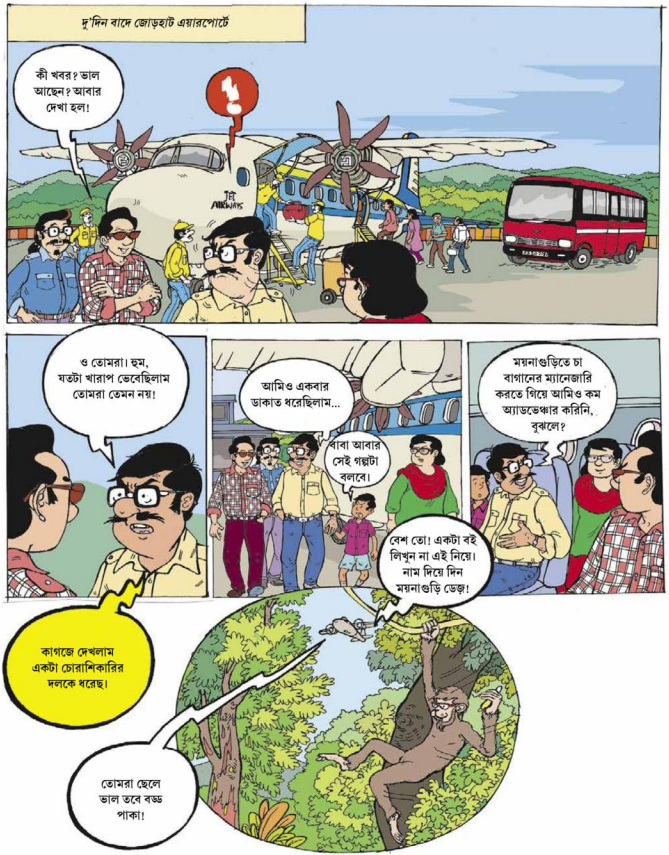
দু'দিন বাদে জোড়হাট এয়ারপোর্টে
কী খবর? ভাল আছেন? আবার দেখা হল!
ও তোমরা। হুম, যতটা খারাপ ভেবেছিলাম তোমরা তেমন নয়!
আমিও একবার ডাকাত ধরেছিলাম...
বাবা আবার সেই গল্পটা বলবে।
ময়নাগুড়িতে চা বাগানের ম্যানেজারি করতে গিয়ে আমিও কম অ্যাডভেঞ্চার করিনি, বুঝলে?
বেশ তো! একটা বই লিখুন না এই নিয়ে। নাম দিয়ে দিন ময়নাগুড়ি ডেঞ্জ!
কাগজে দেখলাম একটা চোরাশিকারির দলকে ধরেছ।
তোমরা ছেলে ভাল তবে বড্ড পাকা!

স মা প্ত

মৌমাছির জন্যই বেঁচে আছি আমরা

মৌমাছি না থাকলে

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নাকি ভীষণভাবে জরুরি মৌমাছিরাও। কিন্তু কেন?

অচ্যুত দাস

মৌমাছি, মৌমাছি,/কোথা যাও
নাচি নাচি/ দাঁড়াও
না একবার ভাই।
ওই ফুল ফুটে বনে,/ যাই মধু আহরণে,/
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর লেখা 'কাজের লোক' কবিতার এই লাইনগুলো ছেলেবেলায় পড়েনি, এমন বাঙালি ছেলেমেয়ে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছেলেবেলা থেকে তাই সকলের জানা, মৌমাছির কাজ হল বিভিন্ন গাছের ফুল থেকে নেকটার নামের এক পদার্থ সংগ্রহ করা। সেই নেকটার থেকে মধু বানিয়ে মৌমাছি তা জমিয়ে রাখে নিজেদের বাড়িতে, অর্থাৎ মৌচাকে। মানুষের, অন্তত আজ পর্যন্ত, সাধ্যি হয়নি মৌমাছির মতো অমক খাসা স্বাদের মধু তৈরি করার। সে তাই চুরি-ডাকাতি করে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে আনে। সেই মধু আমরা খাই। খেতে দিব্যি তো লাগেই, উপরন্তু মধু কক্ষনও নষ্ট হয় না। অনেক কিছুর সঙ্গেই সামান্য মধু মিশিয়ে নিলে সেই খাবারের স্বাদ এক লাফে দশ-কুড়িগুণ বেড়ে যায়! তায় আবার মধু খেলে নাকি এই এত-এত উপকার হয় শরীরের। মধু তাই ভারী ভাল জিনিস।

এবার যদি কোনওদিন হঠাৎ পৃথিবী থেকে সব মৌমাছি হারিয়ে যায় কিংবা ধরো মারা যায়, তা হলে বড় জোর কী হবে? সুস্বাদু ও উপকারী মধু তৈরি করার জন্য আর কেউ থাকবে না, এই তো? তা সে হলেই বা! মানুষ গবেষণাগারের চার দেওয়ালের ভিতর কৃত্রিম উপায়ে কত কী তৈরি করে ফেলল, আর সামান্য মধু তৈরি করে নিতে পারবে না? হয়তো পেরেই যাবে। কিন্তু যদি বলি, মৌমাছিরা অমনভাবে একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে তার কিছুদিন পর হারিয়ে যাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষও, তা হলে? নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ, তা-ও আবার হয় নাকি? সামান্য মৌমাছি, ফুলে-ফুলে উড়ে বেড়ানো আর মৌচাকে মধু তৈরিই যার কাজ, সে যদি বিলুপ্তও হয়ে যায়, তার সঙ্গে মানবজাতির অবলুপ্তির কী সম্পর্ক? বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলছে না তো কেউ? ঠিক কোন-কোন উপাদান দিয়ে মধু তৈরি করে মৌমাছিরা, সেকথা জেনে ফেললেই তো মুশকিল আসান রে বাবা! কিন্তু আসল মজাটা ওখানেই। সমস্যাটা তো আদৌ মধু নিয়ে নয়ই। মধু না খেয়েও দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকতে পারে মানুষ। কিন্তু খাবার ছাড়া থাকতে পারবে কি? দুম করে যদি একদিন খাবারের জোগান বন্ধ হয়ে যায় এই পৃথিবীতে, স্রেফ ঘটি-ঘটি জল খেয়ে কতদিন বেঁচে

থাকা সম্ভব?

বোঝা যাচ্ছে না তো? ভাবছ, মৌমাছির সঙ্গে আমাদের খাবারের জোগানের কী সম্পর্ক? আছে-আছে। ওই যে মধু তৈরি করবে বলে মৌমাছিরা ফুলে-ফুলে উড়ে বেড়ায়? সেইসময়ই ফুলের রেণু লেগে যায় তাদের হাতে-পায়ে-গায়ে। এক ফুলের রেণু এইভাবে মৌমাছিদের দ্বারা তাদের অজান্তেই, গিয়ে পৌঁছয় অন্য ফুলের কাছে। পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুলের রেণুর এভাবে মিলন সম্পন্ন হলে তবেই ফুল থেকে ফল তৈরি হয়। আমরা হয় সেই ফল খাই, কিংবা সেই ফলের বীজ থেকে আরও যে গাছ হয়, তা খাই। কিংবা সেই গাছগুলো খায় যে তৃণভোজী প্রাণীরা, তাদের ধরে খাই। এই প্রসঙ্গে আরও কথা বলার আগে বলি, খাদ্যশৃঙ্খলের কথা জান তো নিশ্চয়ই? গাছপালারা মাটি থেকে খনিজ পদার্থ আহরণ করে, মাটিতে মিশে থাকা জল আর বাতাসের অক্সিজেন ছেঁকে নিয়ে তৈরি করছে খাবার। নিজেরা খাবার তৈরি করতে পারে না বলে তৃণভোজী প্রাণীরা সেই গাছকে খাচ্ছে। সেই প্রাণীদের খাচ্ছে অন্য মাংসাশী প্রাণীরা। অবশেষে সমস্ত রকম গাছপালা, তৃণভোজী প্রাণী, মাংসাশী, সকলেই মারা যায়। তখন মাটি থেকে প্রাথমিক যে উপাদানগুলো সংগ্রহ করে তৈরি হয়েছিল ওই উদ্ভিদ ও প্রাণীরা, সেগুলো আবার ফিরে যায় মাটিতে। এইভাবে খাবারের যে একটা

মৌমাছি প্রতিপালন করে মধু আহরণ করেন অনেকেই

মধুসংগ্রহে ব্যস্ত মৌমাছি

চক্রাকার আবর্তন চলতে থাকে, তাকেই খাদ্যশৃঙ্খল বলে। এই খাদ্যশৃঙ্খলের ব্যাপারটা থাকার জন্য প্রকৃতিতে খাদ্য ও খাদকের একটা ভারসাম্য রক্ষা হয়। আর সেটা হয় বলেই হাজার-হাজার, কোটি-কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে হেসে-খেলে বেড়াতে পারে প্রাণ। এখন ওই যে খাদ্যশৃঙ্খল, তাতে সরাসরি কোথাও মৌমাছির উপস্থিতি নেই ঠিক। কিন্তু এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে মৌমাছি না থাকলে গাছপালাদের বংশবিস্তারটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এদিকে পৃথিবীতে ১০০ রকম খাদ্যশস্য থাকলে তার মধ্যে ৭০টিই পরাগমিলন হয় মৌমাছির মারফত। যে কারণে এই পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ খাবারের জন্য মৌমাছিদের উপর নির্ভরশীল মৌমাছি হারিয়ে গেলে তাই ভেঙে পড়বে আস্ত খাদ্যশৃঙ্খল। মানুষ নিজে কোনও রকমে মধু তৈরি করে নিতে শিখে গেলেও খাবার তৈরি তো শেখেনি এখনও! তার জন্য তো প্রাথমিকভাবে গাছপালার উপরই নির্ভর করতে হয় তাকে। মৌমাছির অভাবে সেই গাছপালারা মারা গেলে অতএব আমরাই বা খাব কী!

খাদ্য জাল

এ পর্যন্ত পড়ে মনে হতেই পারে, হঠাৎ এত দুশ্চিন্তার কারণটা কী? মৌমাছিরা কি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নাকি? খুবই দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই প্রশ্নের উত্তরটা 'হ্যাঁ' হওয়াতেই বেধেছে যত গোলমাল। নির্বিচারে গাছপালা কেটে সাফ করার ফলে মৌমাছিদের বাড়িঘর যাচ্ছে ভেঙে। এমনিতে তো বেচারাদের থেকে সোনামুখ করে মধু চুরি করিই, তার সঙ্গে আছে বনজঙ্গল ধ্বংস করা। তার সঙ্গে আবার যোগ করো মাঠেঘাটে যথেচ্ছ কীটনাশকের ব্যবহার। ক্ষতিকারক এইসব কীটনাশকের বাড়াবাড়ি ব্যবহারে বেঘোরে মারা যাচ্ছে মৌমাছিকুল। সেইসঙ্গে দূষণের অত্যাচারে পৃথিবীর আবহাওয়ার ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলেও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সমস্যা হচ্ছে ছোট্ট এই বন্ধু-প্রাণীটির।

চুরি-ডাকাতি করে মধু খাওয়া পর্যন্ত তবু ঠিক আছে। পৃথিবীর অনেক জায়গাতে, এমনকী আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও বহু জায়গায় মৌমাছি প্রতিপালন করা হয় ঠিকই। কিন্তু নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা না থামালে, ক্ষতিকারক কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ না করলে, পরিবেশের দূষণ কমাতে না পারলে নিরীহ মৌমাছিরা বেশিদিন বাঁচবে না। আর তারা না বাঁচলে আমরাও অচিরেই...

সম্পূর্ণ উপন্যাস

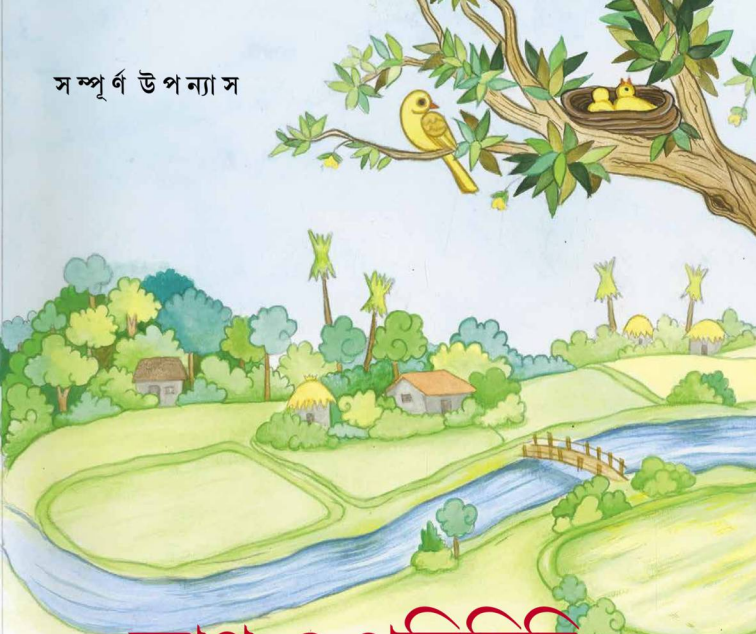

আপ্পু ও পরিদিদি

রঞ্জন দাশগুপ্ত

ছবি: বৈশালী সরকার

পরিরা যে আছে তা আপ্পুর জানতে বাকি নেই। যদিও আর কেউ তা স্বীকার করতে চায় না। পুরুলিয়ার যে গ্রামে আপ্পুদের বাড়ি, তার থেকে কিছু দূর হেঁটে খুব বড় একটা পুকুর। লোকে ওটাকে বলে ঝরনা পুকুর। কারণ, ওটার নীচে নাকি ঝরনা আছে। তাই কখনও ওটার জল শুকিয়ে যায় না। ওটার পাশেই ঘোর বাঁশবন। তার ওদিকে বিশাল একটা মাঠ। জ্যোৎস্নারাতে তার যা শোভা হয় যে দেখেছে সেই জানে একমাত্র!

অনেকদিন আগে এক রাতে আঞ্জু তার বাবার হাত ধরে খেতের আলের ধার ধরে হেঁটে আসছিল। মনে হয় ওরা কোথা থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিল। ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির পথ ধরেছিল। একটা ঘোঁয়াটে নীল রঙের জ্যোৎস্না ছিল চারদিকে। মাঠটা পেরিয়ে ঝুপসি বাঁশবনটার কাছে আসতেই বাবার খুব ছোট বাইরে পেয়ে গেল। বাবার অমনি যেখানে-সেখানে ছোট বাইরে পেয়ে যায় বলে বকাও খায় মায়ের কাছে। যাই হোক, তখন আঞ্জু বাবার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হতে পিছনে ফিরে দেখে অনেক দূরে চাঁদের আলোর নিচে মাঠটাতে সাদা পোশাক পরে দুটো পরি যেন মনের আনন্দে নাচ করছে।

আঞ্জুদের ঘরের উত্তর দিকে একটা খেজুর গাছ আছে। শীতকালে ঠিক তার উপরে ধ্রুবতারাকে দেখা যায়। শীতের রাতে যখন শেয়াল হুক্কা হুয়া করে, তখন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে কীসের যেন শব্দ শোনা যায়। মনে পড়ে যায় সেই ছড়াটা

'ফুটফুটে জোছনায়
জেগে শুনি বিছানায়
বনে কারা গান গায়
ঝমঝুম ঝুমঝুম
চাও কেন পিটিপিটি
উঠে পড়ো লক্ষ্মীটি
চাঁদ চায় মিটিমিটি
বনভূমি নিঃঝুম'

পরে তার বাবাকে বলাতে উনি বললেন, ওগুলো নাকি শালিগ্রাম রামানির মেয়েদুটো খেলছিল। বোঝো!

আসলে আপু এমন অনেককিছু দেখতে পায়, যেগুলো আর কেউ পায় না। এই তো আগের বছর বর্ষা ঢোকার আগে ঘরের উঠোনটাতে লাট্টু নিয়ে খেলছিল আপু। এই মেঘ, এই রোদের সকাল ছিল তখন। হঠাৎ আপু দেখল আকাশ থেকে সোনালি রঙের একটা বুদবুদ নেমে আসছে তো আসছেই। তার ভিতরে রাজার পায়ের মতো একটা পা ভরা আছে হাঁটু পর্যন্ত। লাল টুকটুকে নাগরা পরা। ঠিক মেঝের কাছে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

মাকে বলাতে উনি বললেন, "চোখের কোণে জল জমলে ওরকম মনে হয়। নাও..."

আজ ওর স্কুলের ছুটি ছিল। ছাদের এককোণে দাঁড়িয়ে মনখারাপ করা বিকেলবেলায় ও লাট্টুর লেত্তি গুটোচ্ছিল আর মাঝে-মাঝে সিঁড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। মা লাট্টু একেবারে পছন্দ করেন না। নীচে পেরেকের মতো থাকে। কখন হাতে পায়ে ফুটবে তার ঠিক নেই। তা ছাড়া সিমেন্টের মেঝের চটা উঠে যায়। তবে ভাগ্য ভাল যে, মা এখন ঘরে নেই, বিনিপিসিরে বাড়ি গিয়েছেন গল্প করতে। বাবারও আজ ছুটি। উনি গিয়েছেন ওঁর প্রাণের বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে। ওঁরা খেলাধুলো করেন না। বুড়োদের মতো এক জায়গায় বসে গল্প করেন খালি। আর দাদু তো বিছানায় শুয়ে আছেন। তাই আপু একাই বলা যায়।

গ্রামের বাইরের মাঠটাতে জোরদার ফুটবল খেলা চলছে এখন। কিন্তু আপুর ওখানে যেতে ভাল লাগে না। বড় দাদারা ওদের ঠিক করে খেলায় নেয় না। খালি-খালি বাইরে গেলে বল কুড়িয়ে আনতে বলে। সেখানেও বিস্তর প্রতিদ্বন্দ্বী। মুকুল, সোনাই, ছোট্টু, ভোলা সবাই উবু হয়ে আছে। বলটা একবার বাইরে এলে হয়। সবাই মিলে দৌড় লাগায় কে আগে ধরতে পারবে।

নাহ। লাট্টু ঘোরাতেও ভাল লাগছিল না আজ। ও তাই ছাদের কারনিসের উপর কনুই রেখে দাঁড়াল। বড় মনকেমন করে এই সময়টা। কে জানে কেন! অনেক দূরে সূর্য্যি ডুবে যাচ্ছে। বিশাল বড় একটা লাল রঙের বলের মতো দেখাচ্ছে তাকে। তার লাল, কমলা, হলুদ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশেও। দূরের গাছপালাগুলোকে কালো-কালো ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। বাতাসে ঠান্ডাভাব একটা।

নবীনজেঠুদের বদমায়েশ গোরুটা নীচের রাস্তা ধরে মাথা নাড়াতে-নাড়াতে চলেছে। অবিকল দুষ্টু ছেলেদের মতো হাবভাব। একমুখ ঘাসপাতা। নিশ্চয়ই চণ্ডীজেঠুদের বাগানের বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুখ ঢুকিয়েছিল। এই সময় গ্রামের বাকি সব গোরু ঘর ফিরে গিয়েছে। এইটা ছাড়া। কারও কথা শোনে না। নিজের মর্জিমাফিক চলে। এমনকী নবীনজেঠুদের বাগাল গণেশকাকার কথাও নয়। শিং নাড়িয়ে তেড়ে আসে। গণেশকাকা একবার মারতে গিয়েছিলেন বলে গুঁতিয়ে তাঁর গেঞ্জি ফুটো করে দিয়েছিল। তাই সে আর গোরুটার আশপাশে যায় না। মারাত্মক ব্যাদড়া গোরু।

ছাদের এককোণে অনেক ঢিল স্তূপ করে রাখা ছিল। আপুই রেখেছে। সময় অসময়ে এদিক-ওদিক ছোড়া যায়। তারই কয়েকটা তুলে গোরুটার দিকে ছুড়ল আপু। ওর হাতের টিপ সাংঘাতিক। এই আবছা আলোতেও কয়েকটা গোরুটার গায়ে লাগিয়ে ফেলল। ওটা উপর দিকে মুখ করে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'অঁ অ অ অ!'

ঠিক তক্ষুনি মিষ্টি রিনরিনে একটা গলা কানে এল আপুর।

"তুমি তো সাংঘাতিক দুষ্টু ছেলে দেখছি!"

মাথা ঘুরিয়ে দেখে ধ হয়ে গেল আপু। কখন যেন ছাদের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে ছিপছিপে সুন্দর একটা পরি। এই আবছা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে পরিটার ফরসা টকটকে রং, কাটাকাটা মুখ-চোখ।

টানা-টানা নীল রঙের চোখগুলো রাগে তিরতির করে কাঁপছে। গোলাপি রঙের পোশাক পরিটার গায়ে। ঠিক তখনই সিঁড়িতে ধুপধাপ আওয়াজ করে হাঁফাতে-হাঁফাতে উঠে এলেন মা। এই ওঁর স্বভাব। সারাদিন নানা কাজ করেন, তবু ক্লান্ত হন না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করলেই হাঁফাতে থাকেন।

"বিষ্টুটা কী করছিল গো?"

পরিটা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "নীচে কাকে যেন ঢিল ছুড়ছিল।"

"দেখেছ!" মা তাঁর বড়-বড় চোখগুলো আরও বড় করে বললেন "তোমাকে আগেই বলেছি ও ভয়ানক দুষ্টু ছেলে। হাড় জ্বালিয়ে দেয় একেবারে। হয় গাছে চড়ছে, নয় ঢিল ছুড়ছে, বাগান থেকে ফল চুরি করছে, কিছু না পেলে কুকুরের লেজে পটকা বেঁধে দেয়।"

আপুর মনে এত আঘাত লাগল যে, লাট্টুটা লুকোতেও ভুলে গেল। আর যায় কোথায়! মা সবসময় ঠিক দোষ খুঁজে পেয়ে যান। ওর, বাবার, ছোট্টুরা। দাদু খালি ছাড় পান। এখন লাট্টুটাও তাঁর নজর এড়াল না।

"ওই দ্যাখো! এই আর-এক হয়েছে লাট্টু! কতবার বারণ করেছি। কোনওদিন কার চোখে লাগবে, পায়ে ফুটবে, তখন বাবুর শান্তি হবে। এই বাঁদর, এদিকে আয়।"

মায়ের অভ্যাসই হল বাইরের লোকের সামনে সবসময় প্রেসিজ পাংচার করে দেওয়া। আপুকে কান ধরে নীচে নিয়ে গেলেন। পিছন-পিছন নীল চোখের দিদিটা। সে নাকি আসানসোলে থাকে। এই গ্রামের স্কুলে চাকরি পেয়ে এসেছে। এখন উঠেছে জয়ন্তকাকুদের বাড়ি। ওদের কে যেন হয়। তবে বেশিদিন থাকবে না। ট্রান্সফার পেলে চলে যাবে। গেলে বাঁচা যায়!

ধৃত! আপুর ভাল লাগে না। ও একেবারে চমকে গিয়েছিল প্রথমে। ঠিক যখন পরির কথা ভাবছে, তখনই চোখের সামনে জলজ্যান্ত একটা পরি দেখে ধ হয়ে গিয়েছিল। সে কিনা শেষমেশ দাঁড়াল স্কুলের দিদিমণি! তার উপর মা বললেন, এখন থেকে দিদিটা ওকে সপ্তাহে তিনদিন করে পড়াবে। বাবাও আড্ডা ছেড়ে এসে পড়লেন। একে তো উনি ওঁর বন্ধুদের ছেড়ে আসতে চান না, তার উপর ঘরে থাকলে ওঁর মুখ সবসময় গোমড়া থাকে। আজ কিন্তু ভারী হাসি-হাসি মুখ।

দু'-একটা রসিকতা পর্যন্ত করে ফেললেন। মেয়েটা নাকি ওদের কীরকম দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। জয়ন্তকাকুরাও ওদের আত্মীয় হন কিনা।

পিছন দিকের বাগানের মুখোমুখি আপুর পড়ার ঘর। একটা পুরনো আলমারি আছে। নড়বড়ে একটা কাঠের টেবিল, দুটো চেয়ার। একটা তক্তপোষ। তার তলায় আবার পিসবোর্ড দিয়ে সমান করা। ঘরটায় আগে জীবনদাদু থাকতেন। কোথায় যেন চলে গিয়েছেন। আপু একবার মামাবাড়ি গিয়েছিল। অনেকদিন পরে ফিরে আর দেখতে পায়নি জীবনদাদুকে। কেউ কিছু বলে না। কিন্তু আপুর এখনও মাঝে-মাঝে মনখারাপ হয়। খুব সুন্দর গল্প বলতেন তিনি।

কেউ জানে না ওই তক্তপোষটার নীচে প্রচুর সম্পত্তি আছে আপুর। বড় কাচের বয়ামের এক বয়াম মার্বেলগুলি, বাঁশের তির-ধনুক, বিভিন্ন সাইজের গুলতি, এক থলে নানা রকমের পাথর, একগোছা পোকেমন কার্ড। আপু ওগুলোর সামনে কতগুলো ভাঙা কাঠের টুকরো রেখে দিয়েছে যাতে কেউ দেখতে না পায়।

দিদিটা মোটেও সুবিধের নয়। মা আর বাবার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলার পরই ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "যাও তো তোমার অঙ্ক বই আর খাতাটা নিয়ে এসো। দেখি কী রকম লেখাপড়া করছ তুমি।"

আপু আকাশপাতাল খুঁজেও অঙ্ক বইটা আর পায় না। ইতিহাস বইটা সাতবার, বাংলা বইটা ন'বার আর প্রকৃতিবিজ্ঞান বইটা গুনে-গুনে পনেরোবার দেখতে পেল যদিও। অঙ্ক খাতার পাতায় দেখা গেল ডোরেমন আর তার বুনু ডোরেমির ছবি এঁকে রং করা। বাবা খুব আস্তে আপুর কানটা পেঁচিয়ে খুব জোরে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "বেয়াদব ছেলে কোথাকার। ইচ্ছে হয় আগাপাশতলা ইয়ে করে দিই!"

আপ্পু অবশ্য মোটেই অখুশি হল না তাতে। কারণ, বাবা কান ধরাতে মা আর নিলেশও কিছু বললেন না। ওঁর মারের হাত সাংঘাতিক।

কেন কে জানে, মাস্টারমশাই আর দিদিমণিরা কক্ষনও ভাল লোক হন না। দস্তুরমতো রাগী লোকদেরই এসব কাজে নিয়োগ করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল কেন কে জানে আপ্পুকে একেবারে দেখতে পারেন না। তাই আপ্পুও ওঁদের পছন্দ করে না।

দিদিকে মা নলেনগুড়ের রসগোল্লা খাওয়ালেন আর ডিমভাজা। বাবাও চা নিয়ে সঙ্গে বসলেন। মা ওকে কিন্তু ডিমভাজা দিলেন না। থাক গে, মরুক গে! পেটব্যথা হয়ে যাবে এখন।

অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল বলে বাবা সবাড় হবে এখন।

ওরা আপ্পুকে ছেড়ে দিই। নতুন জায়গা।"

যাওয়ার আগে দিদিটা তার আশ্চর্য নীল চোখদুটো আপ্পুর দিকে মেলে বলল, "এই যে দুষ্টু ছেলে, তৈরি হও। কাল থেকে কিন্তু আমি তোমাকে পড়াতে আসব। আর আমার নাম পরি। তুমি আমাকে পরিদিদি বলে ডাকবে!"

॥ ২ ॥

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছিল তখন। আলো মরে আসার একটু আগেই ফুটবল খেলা শেষ করে গোল হয়ে বসল আপ্পুরা। সবার মাঝখানে বলটা। পিছন দিকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছাতিম গাছ আর ময়না গাছটা। বড় দাদারা সবাই ছিল। সারা গায়ে ধুলো, মাটি আর ঘাস। শীত পড়ব-পড়ব করছে, তবুও এতক্ষণের ছোটাছুটিতে গা দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরচ্ছিল সবার।

নিমাই প্রতিদিন খেলার সময় আসে। কিন্তু খেলে না। আগে খেলত। ওই যেবার ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হল, তখন ওর ডান পা-টা বাদ চলে গিয়েছিল। তাই আর খেলতে পারে না। এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাপ্পাদা নিজের ঝোলা থেকে জলের বোতলটা বের করে বলল, "তোরা এখন কেউ জল খাস না। এইমাত্র এত দৌড়াদৌড়ি করেছিস, এক্ষুনি জল খেলে মারাত্মক ঠান্ডা লাগবে," এই বলে নিজে অনেকটা জল খেয়ে নিয়ে ছিপি বন্ধ করে বোতলটা আবার থলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। পাশ থেকে সোমনাথদা হাত বাড়াচ্ছিল। তার দিকে না তাকিয়েই বলল, "তোরা জানিস কাল কী হয়েছে?"

আপ্পু, সোনু, ছোট্ট, ভোলা, সবাই হাঁ করে শুনছিল। আজ খুব ছোটাছুটি হয়েছে। বড় দাদাদের সবাই আসেনি বলে ওরাও চান্স পেয়েছিল। দু'দলে ভাগ হয়ে দারুণ ম্যাচ হল আজ। ভোলা বলল, "কী হয়েছে বাপ্পাদা?"

হাত দুটো পিছনে ভর দিয়ে পা দুটো টানটান করে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাঁটুটা নাচাতে-নাচাতে বাপ্পাদা বলল, "কাল রাতে সাধনকাকু ট্রেন থেকে নেমে ঘরে ফিরছিলেন। তারপর এক কাণ্ড।"

নিমাই বলল, "কী হয়েছে?"

বাপ্পাদা ঠ্যাঙ নাচাতে-নাচাতেই বলল, "বড় মাঠটার আগে যে ঝুপসি বট গাছটা আছে, সেখানে পৌঁছতেই দুটো ছায়া-ছায়া ভূত বেরিয়ে এসে একটা সাধনকাকুর হাতদুটো পিঠমোড়া করেছে, আর-একটা জঘন্য নোংরা রুমাল চেপে ধরেছে ওঁর মুখে। তার এমন বদ গন্ধ যে সাধনকাকু তক্ষুনি ইয়াক বলে মুচ্ছো গেলেন। জ্ঞান ফিরতে দেখেন, একা বটতলাতে শুয়ে আছেন। হাতের থলোটা নেই। স্টেশনবাজার থেকে আনা মুলো, বেগুন, পালং এসব ছিল। তারপর এই রাজা, বল না..."

রাজাদা গলা খাঁকরে বলল, "রাতে সাধনকাকা ঘরে ফেরেননি দেখে সে তো এক তুলকালাম কাণ্ড। এদিকে মোবাইলে ফোন করলেও লাগছে না। ঘরের লোক চিন্তায় অস্থির। খুব চেচামেচি হল। তারপর আমাদের পাড়া থেকে অনেক লোক টর্চ, লাঠিসোটা নিয়ে খুঁজতে বেরল। আমি আর বাপ্পাও ছিলাম সে দলে। অনেক খোঁজার পর পৌঁছলাম বট গাছটার কাছে। মাঠটার কাছে গিয়ে আমি যেই চিৎকার করেছি, 'সাধন কা-কা,' তখন দেখি উলটো দিক থেকেও কে যেন নাকি গলায় ভয়ানক চেচামেচি করছে। সবার তো ভয়ে তখন হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। আমি তখন সাহস দিয়ে ..."

পাশ থেকে বাপ্পাদা বলল, "আর আমি?"

রাজাদা না থেমে বলে চলল, "তখন আমি আর বাপ্পা সবাইকে সাহস দিয়ে বললাম, 'ভয়ের কী আছে পুরুষমানুষের?' তারপর সবাইকে নিয়ে গিয়ে দেখি সাধনকাকা গামছা পরে শুয়ে-শুয়ে ভয়ানক চিৎকার লাগিয়েছেন।"

বাপ্পাদা সোজা হয়ে বসে বলল, "তোরা ছোট্টা সব। বেশি বলতে সাহস হয় না যদি ভয় পাস! তবে রাতবিরেতে একা বাইরে না বেরনোই ভাল। কখন ছায়া-ছায়া সব ভূত এসে ধরে। আমার বুকে সিংহর মতো সাহস। তবু আমিও রাতে একা বাথরুমে যাই না।"

দিনের আলো বলতে কিছুই আর বাকি ছিল না। ছোটরা সব টপাটপ উঠে পড়ে ঘরের পথ ধরল। খালি ছোট্ট বসে রইল। ওর বেজায় সাহস। তা ছাড়া ও হল সোমনাথদার কাকার ছেলে। যদি কোনওদিন ও আগে ঘরে ফিরে গিয়েছে কিন্তু সোমনাথদা যায়নি, তা হলে সোমনাথদার মা, মানে আপ্পুর গোলাপিপিসি, সোমনাথদাকে প্রচুর মারেন। তাই সোমনাথদা চকোলেট ঘুষ দিয়ে ছোট্টকে বসিয়ে রাখে।

ঘরে ফেরার সময় আপ্পু আর ভোলা সবসময় একসঙ্গে শেষ রাস্তাটা পার করে। দু'জনের ঘর একই পাড়াতে। তাই বাকিদের রাস্তা একটু আগে কেটে যায়। একই গ্রামের বা পাড়ার তো আর নয় সব।

আজ ফেরার সময় চারপাশের ঝুপসি গাছগুলোকে খুব অপরিচিত লাগছিল। কী যেন লুকিয়ে আছে আড়ালে। ওদের দেখছে।

বড় বাঁধটার পাশে এসে আপ্পু ভোলার হাত ধরে ভাঙা গলায় বলল, "চ' ভাই, আজ ওই বড় রাস্তাটা ধরি।"

ভোলা ঢোক গিলে বলল, "ওখানে চারদিকে জঙ্গল। অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। কেউ থাকে না।"

"ভয় কী, চল না!"

"না ভাই, ম্যাপা শেয়াল দেখা গিয়েছে শুনেছি!"

অগত্যা বড় বাঁধের পাশ দিয়ে যেতে হল। বিশাল বড় পুকুর। পুকুর বললেও আসলে দিঘি বললেও কম বলা হয়। এপার-ওপার দেখা যায় না প্রায়। চারপাশে বড়-বড় গাছ আর ঝোপজঙ্গল। মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা রাস্তা। বিকেলে আলো থাকতে-থাকতে দু'-একজন লোক আসে। গা ধুয়ে চলে যায়। তা ছাড়া সাধারণত কেউ আসে না। গ্রামের একেবারে বাইরে যে। তবে মালদলাকু বাঁধের মাঝে-মাঝেই। খুব মাছ ধরার নেশা ওঁর। ছিপ দিয়ে মাছ ধরে। পাশে ফেলা থাকে কুড়োজালি।

যারা কুড়োজালি কাকে বলে জানে না, তাদের বলছি। এটা আসলে খুব প্রাচীন একটা যন্ত্র। কতদিন আগে তৈরি হয়েছে কে জানে! তবে এখনও ব্যবহার হয়। এটাতে দুটো লাঠিকে ইংরেজি 'এক্স' অক্ষরের মতো করে মাঝখানে বাঁধতে হয়। বেরিয়ে থাকা লাঠিগুলোর চারকোণে একটা কাপড়ের চারটে খুঁট বাঁধা থাকে। আর 'এক্স' টার মাঝখানে লম্বা একটা দড়ি। কাপড়টার মধ্যে একটু আটা আর ঢিল (যাতে ওটা জলে ডুবে যায়) দিয়ে পুকুরে ফেলে দিতে হয়। আটার গন্ধে কুচো চিংড়ি আর ছোট-ছোট সব মাছ আসে। পরে দড়ি ধরে তাদের তুলে নিতে হয়। জল ছেঁকে পড়ে যায়। চিংড়ি আর ছোট মাছ কাপড়টাতে পড়ে থাকে।

যেতে-যেতে দু'জন মাঝে-মাঝেই থমকে দাঁড়াচ্ছিল। আবছায়া গাছের উপর কী যেন নড়ছে। শুকনো পাতার উপর দিয়ে সরসর করে চলে গেল কোনও একটা জিনিস। ওদের মাথার উপর দিয়ে বিকট চিৎকার করে কোনও পাখি বা খেচর প্রাণী উড়ে যেতে চমকে উঠল দু'জনে। ভোলা দু'হাত মুখের দু'দিকে করে চিৎকার করে ডেকে উঠল "মা-দ-ল কা-কু!"

এরকম ডাকতে হয় না। মাছধরার সময় চেঁচালে মালদলাকু খুব রেগে যায়। কিন্তু আজ তার সাড়াই পাওয়া গেল না। দু'জনে তাকিয়ে দেখল বড় বাঁধটার পাশে অন্ধকারে মালদলাকুকে দেখা যাচ্ছে না।

আর উপায় ছিল না। ঘোর অন্ধকারে জঙ্গলটা যেন ওদের খেতে আসছিল। তাই হাত ধরাধরি করে দু'জনে প্রাণপণে দৌড়ল। আম গাছটার কাছে পায়ে কী লেগে হোঁচট খেয়ে আঙ্গু প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। তারপর নীচ থেকে কী যেন একটা তুলে পকেটে পুরল ও। ভোলা দেখতে পায়নি। আঙ্গুও অবশ্য বুঝতে পারেনি ওটা কী জিনিস। আলোতে গিয়ে দেখা যাবে। অবশ্য যদি আজ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে।

গাছগাছড়ার জন্য উলটো দিকের আলো দেখা যায় না। বাঁক ঘুরে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছল ওরা। সামনে ধানখেত। খোঁচা-খোঁচা জমির ওপারে হলুদ বাল্‌বগুলো জ্বলতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দু'জন।

ঘরে ঢুকে দেখে পরিদিদি এসে মায়ের সঙ্গে গল্প করছে। ওর দিকে তাকিয়ে বলল "এতক্ষণে সময় হল আসার? যাও, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে পড়তে বসো।"

দুধমুড়ি খেয়ে পড়তে বসে আজ আঙ্গুর খুব ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। তা ছাড়া জিনিসটাও দেখা হয়নি।

"হাই তুলছ যে! ঘুম পাচ্ছে? কই খেলার সময় তো ঘুম পায় না?" নীল রঙের চোখগুলো পাকিয়ে বলল পরিদিদি।

আঙ্গু আর থাকতে পারল না। বলে ফেলল, "জান পরিদিদি। কাল রাতে না সাধনকাকুকে দুটো ভূত ওই পরিদের মাঠটাতে ধরেছিল?"

ভুরুগুলো কুঁচকে গেল পরিদিদির। বলল, "কে এসব আজগুবি কথা বলেছে তোমায়? আর পরিদের মাঠটাই বা কী জিনিস?"

"স্টেশন আর গ্রামের মাঝে যে মস্ত বড় মাঠটা আছে, সেটা গো। সেখানে রাত্তিরে পরিরা নাচ করে। আমি দেখেছি। বাবাও দেখেছেন। কিন্তু বলতে চান না। সেখানে কাল রাত্তিরে মুশকো ভূত বট গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চেপে ধরেছে সাধনকাকুকে। তিনি তো সঙ্গে-সঙ্গে ভয়েই অজ্ঞান!"

সুন্দর ভুরুজোড়া কুঁচকে রেখেই পরিদিদি বলল, "আমিও শুনেছি ওটা। কিন্তু তোমার মতো আজগুবি কথা বলি না। কাল রাতে সাধনকাকু হাঁটতে-হাঁটতে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হুঁহ, ভূত না হাতি! আর পরি, জিন এসবও হয় না। কে তোমার মাথাটা এসব বলে খাচ্ছে বল তো?"

তারপর আঙ্গু চেয়ে আছে দেখে গলায় জোর এনে আবার বলল, "কই, এই রবিবার সকালে চলো তো দেখি, কোথায় তোমার ভূত আর পরি!"

মনে-মনে মস্ত বড় করে জিভ ভ্যাংচাল আঙ্গু। একেই বলে বড়দের বুদ্ধি! সকালে ঝকঝকে রোদের মধ্যে কি ভূত দেখা যায় নাকি?

পরিদিদি বোধ হয় আঁচ করতে পারল আঙ্গুর মনের কথা। আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "সন্ধেবেলায় অন্ধকারের মধ্যে জঙ্গলে যেতে হয় না।"

॥ ৩ ॥

মাঠটা এখনও খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে। তারই একটাতে পা লেগে পরিদিদি পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। কোনও মতে আঙ্গুকে ধরে টাল সামলাল।

"আর কত দূর! হাঁটতে-হাঁটতে মরে গেলাম।"

সুন্দর রোদ উঠেছে। নরম হাওয়া বইছে চারদিকে। তারই মধ্যে আঙ্গু তাকিয়ে দেখল পরিদিদির ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। মেয়েরা বেশি হাঁটতে পারে না। মাও পারেন না। দুর্গাপুজোর সময় একবার মা আর বাবার সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিল আঙ্গু। আসানসোলে, গাড়ি করে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল। জি টি রোডে বিশাল ভিড়। একটু এগোতে কমলা রঙের জামা পরে একটা কাকু এসে বললেন, গাড়ি আর যাবে না। রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে হাঁটতে হবে। তাই শুনে ওরা হাঁটতে লাগল। তারপরে তো ওরা হেঁটে-হেঁটে পাগল। মা শেষে আর পারলেন না। একটা চিকেন রোলের স্টলের সামনে বাঁধানো গাছতলাতে বসে বললেন "আমি বাপু আর পারছি না। এখানে বসে থাকলাম। তোমরা ঘুরে এসো বরং!"

বাবা খুব রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলছিলেন। ক'টা কথা আঙ্গু স্পষ্ট শুনে ফেলেছিল। বাবা বলছিলেন "তা কেন পারবে! শাড়ি কেনার সময় দশটা দোকান ঘুরতে ভাল লাগে? অত দোকান ঘুরে একটাও শাড়ি না কিনে অন্য দোকানে নাচতে-নাচতে চলে যাও। দুনিয়ার শাড়ি নামিয়ে একটাও না কিনে আবার অন্য দোকানে যাও। ছি, ছি, লজ্জাও করে না। মাথাটা কাটা যায় আমার।"

কী ভাগ্যি যে মা শুনতে পাননি। মা প্রথমে প্রচুর রেগে যান, তারপর কান্না শুরু করেন আস্তে-আস্তে। আঙ্গুর মতো বিকট চেঁচামেচি করেন না। বাবা তখন মুখটা কী রকমের করে মায়ের সঙ্গে ভাব করেন আর ঘনঘন ক্ষমা চান। আঙ্গু বেশ কয়েকবার দেখেছে।

"আর একটু পরিদিদি। ওই ঝোপগুলো পেরিয়ে জায়গাটা দেখা যাবে।"

সামনে কতগুলো ছোট-বড় মাঝারি গাছ। গাছগুলোকে চেনে না আঙ্গু। তবে ঘেঁটু আর ভ্যারেন্ডা গাছ চেনে। বট আর অশ্বত্থ গাছও চেনে ও। মাঝখানে একটা হরিতকী গাছ আছে। বাবা চিনিয়ে দিয়েছিলেন একবার। ভ্যারেন্ডা গাছের বীজ থেকে নাকি গাড়ি চালানোর তেল হতে পারে! কোন মাস্টারমশাই যেন একবার বলেছিলেন।

ঝোপগুলোর আগে বাঁশবন। হাওয়াতে মটমট আওয়াজ করছে। নীচে স্তূপ হয়ে রাশি-রাশি শুকনো পাতা। সাদা জমির উপর বাঁশ গাছের কালো আর খয়েরি ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে। তার ওদিকে বিরাট বড় একটা মাঠ। এখানে আবার কতগুলো ছোট-ছোট ঝোপ আর সামান্য ঘাস ছাড়া আর কোনও গাছ নেই। বড় গাছ ত নেই-ই। তবে পিছনে অনেক দূরে বড়-বড় সব গাছ ঘন জঙ্গলের মতো করে আছে। যদিও যত ঘন বলে মনে হচ্ছে, মোটেই ততটা নয়।

মাঠটা একেবারে একটা মরুভূমির মতো। শুকনো, শক্ত আর খয়েরি রঙের। এখানে বৃষ্টি পড়লেও জল দাঁড়ায় না। কেবল পাশে এক দিকে যেখানে সামান্য ঘাস আছে, সেখানে অল্প কাদা প্যাচপ্যাচ করে। বাকি মাঠটা পড়ে থাকে কুমিরের পিঠের মতো।

হালকা রোদের মধ্যে, নরম হাওয়ার মধ্যে, আঙ্গুর হাত ধরে মাঠের উপর হাঁটতে-হাঁটতে পরিদিদি খুশির গলায় বলল, "ভারী সুন্দর তোদের গ্রামটা আঙ্গু। কত গাছ বল তো? আর কী সুন্দর রোদ। এত বড় একটা মাঠও আছে।"

কাঁকুরে মাঠটার মাঝে মস্ত বড় একটা ফাটল। তার পাশে একা, দুঃখী একটা গিরগিটি। ওদের দেখে তার রংটা প্রথমে বাদামি থেকে রক্তলাল করল। তারপর বেগুনি। তারপর চোখ পালটাল। পরিদিদি বলল "এটাকে বলে বহুরূপী। আজকাল দেখাই যায় না! অথচ তোদের এখানে এটাও আছে।"

"এখানে খরগোশও আছে পরিদিদি। পাটকিলে রঙের। রাতের বেলা টর্চ মারলে চোখগুলো চকচক করে। আর শেয়ালও আছে। শীতকালের রাত্তিরে খুব কাঁদে হুক্কা হুয়া করে। 'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, ছিলাপিলা বাঁগাই শুয়া', সুযোগ পেলেই নাকি ঘরের ছোট বাচ্চাদের টেনে নিয়ে যাবে!"

"আমাদের ওখানে এসব কিচ্ছু নেই জানিস," পরিদিদির মুখটা কী রকমের যেন হয়ে গেল, "খালি বাড়ি আর কংক্রিটের ড্রেন আর একের পর-এক গাড়ি। রাস্তা দিয়ে ভাল করে হাঁটাও যায় না। গাছও দেখা যায় না।"

"তোমার ওখানে ভাল লাগে পরিদিদি?" রাস্তায় পড়ে থাকা একটা বড় পাথরকে লাফিয়ে পেরিয়ে গেল আঙ্গু।

"একটুও না, আমার গাছপালা না থাকলে একটুও ভাল লাগে না। দু'বছর আগে পুজোর আগে আমরা মাণ্ডালাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে কানহা রিজার্ভ ফরেস্টে। দারুণ লেগেছিল। কী সুন্দর জায়গাটা!"

"ওটা কোথায়?"

"এম পি, মানে মধ্যপ্রদেশে। যাসনি কখনও?"

মাথা নাড়ল আঞ্জু। ওর বাবা সাধারণত কোথাও যান না। অনেকদিন আগে একবার পুরী গিয়েছিল। ভাল করে মনেও পড়ে না। আর-একবার দেওঘর গিয়েছিল। সেটা একটু-একটু মনে আছে। আসলে ঘরে দাদু আছেন। উনি খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। নিজে কিছু করতেও পারেন না। দাদুকে সকালবেলা মুখ ধুইয়ে দিতে হয়, স্নান করিয়ে দিতে হয়। সব কাজ মা আর বাবা নিজের হাতে করেন। তাই বাবা কোথাও রাত কাটান না।

মাঠটার দক্ষিণ দিকে অনেক দূরে একটা মাটির বাড়ি। ওদের গ্রামের অন্য বাড়ির মতো নয়। ছাদটা গোল মতো আর দু'দিকে ঢালু করা। অনেক নীচে। তাতে নাকি শীত কম লাগে। ওটা শালিগ্রাম চাচার বাড়ি। রেল স্টেশনে ছাতুর সরবত, ছোলা, বাদাম ভাজা এইসব বিক্রি করে। একবার ওদের ঘরে গিয়েছিল আঞ্জু। পিছন দিকটায় বাঁশ দিয়ে আড়াল করে বাগানের মতো করা আছে। সেখানে বেগুন, মুলো, শিম এসবের চাষ করে ছোট করে। একটা সজনে গাছও আছে। চাচারা সজনে ফুল খায়। ডাঁটাও খায় যখন একেবারে শক্ত আর মোটা হয়ে যায়। সেই বাড়িটা এখান থেকে একেবারে পুতুলের ঘরের মতো ছোট্ট লাগছে।

"এখানেই পরি দেখেছিলাম পরিদিদি!"

"আবার! কতবার বলেছি না যে ওসব কিছু হয় না? ভূতও হয় না।"

বড়দের সঙ্গে কথা বলার এই হচ্ছে মুশকিল। কিছুতেই কিছু বিশ্বাস হয় না ওঁদের! মাঠটা পার করে ওরা যখন বড় গাছগুলোর ছায়ায় গেল, কী যে শান্তি হচ্ছিল! ভীষণ ঠান্ডা জায়গাটা। এতক্ষণ রোদে থাকার পর একেবারে অন্য রকম লাগছিল। প্রথমে তো চোখগুলোও কী রকম করছিল। পরিদিদি বলল, "এখানেই সাধনকাকু মাথা ঘুরে শুয়েছিলেন।"

"আর বাক্সাদারা যে ভূতটার কথা বলেছিল?"

"সব বাজে কথা। ওদের সঙ্গে বেশি মিশবি না। এবার চল ওদিকটাতে কী আছে দেখা যাক।"

"ওদিকটাতে জঙ্গল আছে পরিদিদি।"

"তারপর?"

"তারপর একটা পুকুর আছে। তার পরে একটা নদী আর স্টেশন যাওয়ার রাস্তা।"

"কী নদী রে?" পরিদিদিকে ঠিক ছোট্ট একটা বাচ্চার মতো ছটফটে আর খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। আঞ্জুকে পড়াবার সময় যেরকম গম্ভীর থাকে মোটেই সেরকম নয়।

"নদীটার নাম জানি না পরিদিদি। বাবা বলেছেন ওটা আসলে একটা নালা। পশ্চিম দিক থেকে আসছে।"

মস্ত একটা গাছের গায়ে আলতো করে হাত রেখে পরিদিদি বলল, "তুই গাছে চড়তে পারিস আঞ্জু?"

আঞ্জু অবহেলার একটা হাসি হাসল। বলে কী পরিদিদি! আঞ্জুকে যে ওর মা বাঁদর বলেন সে কী আর এমনি-এমনি? তার উপর আবার এই গাছটা! মস্ত গাছটার নীচ থেকে উপর পর্যন্ত গুচ্ছের ডালপালা। ওঠা কোনও ব্যাপারই না। হাফহাতা শার্টটার হাতাটা আর-একটু গুটিয়ে নিল ও। প্যান্টের পকেটের ঢিবিগুলো একটু সমান করে নিল। তারপরে চটি খুলে দেখতে না-দেখতে এক্কেবারে উপরের একটা চওড়া ডালে গিয়ে বসল, "তুমিও উপরে উঠে এসো পরিদিদি। উপরে

ভারী আরাম আর গ্রামটা একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।"

তা পরিদিদিও কম নয় দেখা গেল! ওড়নাটা কোমরে বেঁধে, ছোট্ট চটিগুলো নীচে খুলে রেখে, পরিদিদির গাগুলোও আঞ্জুর মতো ছোট-ছোট, আঞ্জুর মতো অতটা তাড়াতাড়ি না হলেও শেষ পর্যন্ত উঠে এল উপরে। শেষ দিকটাতে আঞ্জু যে মোটা ডালটাতে বসে আছে সেটাতে উঠতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। আঞ্জু তখন একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। এই প্রথম ওর কোনও দিদিমণিকে ভাল লাগতে শুরু করেছে। যখন পরিদিদি ওর মুখোমুখি হল মতো দু'দিকে পা করে একটা মোটা ডালে পিঠটা হেলান দিয়ে বসল, আঞ্জু খেয়াল করে দেখল পরিদিদি অল্প-অল্প হাঁফাচ্ছে আর মুখটা একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে। তার ঠিক কাঁধের পাশ দিয়ে একটা কাঠবেড়ালি একবার উঁকি দিয়ে নিজের ধূসরের উপর সাদা দাগ টানা পিঠ দেখিয়ে অন্য ডালে দৌড়ে চলে গেল। পরিদিদি মুখটা উঁচু করে উপরের ঘন পাতার দিকে চিবুকটা করে বলল, "কী অদ্ভুত সুন্দর!"

সত্যি, কী যে সুন্দর তা বলে বোঝানো যাবে না। সামনে লম্বা মাঠ। ওপারে নীলচে রঙের বাঁশবন। আর তার ওদিকে গ্রামের ঘরগুলোকে ছবির মতো লাগছিল। পিছনে বড়-বড় গাছের সারি। দূরে অল্প জল চিকচিক করছে। মাথার উপর ঘন সবুজ পাতার ছাউনি। এত ঘন যে, আকাশ দেখা যাচ্ছে না। এই গাছটার নাম জানে না আঞ্জু। কিন্তু কত যে ডালপালা আর পাতা। বিশাল গুঁড়ি গাছটার।

"নে সাবধানে বোস। ভাল করে ধরে থাকবি ডালটা। এই কাজটা মোটেই ভাল হল না।"

"কোন কাজটা?" আঞ্জু অবাক হল।

"এই যে তোকে নিয়ে গাছটার উপর উঠলাম! ভারী বিপজ্জনক। পড়ে গেলেই গেল। মাথা ফাটবে, পা-হাত ভাঙবে, ছোট বাচ্চাকে গাছে চাপানো ঠিক না।"

কী যে বলে পরিদিদি তার ঠিক নেই। আঞ্জু নাকি বাচ্চা! আর ও যেন কোনওদিন গাছে চাপেনি! ও আর কী-কী করতে পারে, কোন-কোন গাছে চেপেছে সেসব জানলে পরিদিদি এক্ষুনি ভিরমি খাবে।

আঞ্জুর পকেটে সবসময় কিছু না-কিছু খাবার জিনিস থাকে। এখন যেমন পাওয়া গেল নরম হয়ে যাওয়া এক ঠোঙা ছোলা, বাদাম, মটরের মিক্সচার। কাল বিকেলে কিনেছিল। পেঁয়াজের গন্ধ বেরচ্ছে, বেরক গে! মা দেখতে পেলে ঠ্যাঙাতেন। এখন খুব খিদে পেয়েছে। তাই আঞ্জু আর অপেক্ষা করল না। একমুঠো মুখে পুরে দিল।

"কী খাচ্ছিস রে?" পরিদিদি ঢোক গিলে প্রশ্ন করল।

"মিক্সচার!" ভরা গলায় উত্তর দিল আঞ্জু।

"আমাকে না দিয়ে বড় যে একা-একা খাচ্ছিস!" ভুরু কুঁচকে বলল পরিদিদি। গলাতে জিয়াংসা। আঞ্জু কিছু বলল না। ঠোঙাটা বাড়িয়ে দিল। খাক গে। পরে পেট খারাপ হবে। পরিদিদির অবশ্য ভুক্ষেপ নেই। কচরমচর করে চিবোচ্ছে। জানলে পরে আর দেখতে হবে না।

হঠাৎ দমকা হাওয়াতে স্যেয়াল হল কখন জানি আকাশের মুখ ভার হয়ে গিয়েছে। রোদের হাসি-হাসি ভাবটা আর নেই। আলো মরে এসেছে।

"বৃষ্টি নামবে বলে মনে হচ্ছে!" পরিদিদি চিন্তিতমুখে বলল, "চ', এবার ফিরে যাই। না হলে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে।"

আর ঘরে ফেরা! দোনোমনো করতে-করতেই বৃষ্টি নেমে এল প্রবলবেগে। প্রথমবার দমকা হাওয়াতে শুকনো পাতা, ধুলোবালি সব উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপরে নামল বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি।

"আঞ্জু, এদিকে চলে আয়। নইলে ভিজে যাবি বৃষ্টিতে," অনেকটা চেঁচিয়ে বলতে হল পরিদিদিকে। বাতাসে কথা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আঞ্জুর অবশ্য বেশ মজাই লাগছিল। পরিদিদি এর মধ্যে বাঁহাতি উলটো দিকে একটা মোটা ডালের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। যদিও দরকার ছিল না।

আঞ্জু পরিদিদির পিছনে একটা ডালের উপর পা দিয়ে দাঁড়াতেই ও ওড়নাটা দিয়ে আঞ্জুর মাথাটা ঢেকে দিল যাতে ওর মাথাটা ভিজে না যায়। একেবারে মায়ের মতো স্বভাব। আসলে সব মেয়ের মধ্যেই একটা করে মা লুকিয়ে থাকে! এর মধ্যেই অবশ্য আঞ্জুর ডান দিকের জামাটা ভিজে গিয়েছিল।

কী অদ্ভুত না! কালকেই এই সময়ে ও স্কুলে কান ধরে দাঁড়িয়েছিল। আর আজ! বৃষ্টির মধ্যে এই বিশাল গাছটার উপর দাঁড়িয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে মোটা-মোটা বৃষ্টির ফোঁটা মাঠটার উপরে পড়তেই প্রতিটি ফোঁটা শুষে নিচ্ছে। আর একটুও ধুলো উড়ছে না। সব জলে ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে আসলে।

মাথার উপর ঘন পাতার ছাউনি থাকায় উপর থেকে বৃষ্টির ছাট আসছিল না। কিন্তু এলোমেলো হাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা মুখে আর চোখে এসে লাগছিল। কখন থামবে তাও জানা নেই।

"খুব ভুল হল আজ তোর সঙ্গে এখানে আসাটা। কখন ঘরে ফিরব কে জানে!" চিন্তিতমুখে বলল পরিদিদি। তারপর বলল "এখানে দাঁড়ালে ভিজে একেবারে একশ হয়ে যাব। নীচে নামাটাও সোজা নয়। জলে ভিজে পিছল হয়ে আছে।"

আঞ্জু তাকিয়ে দেখল মোটা গুঁড়িটা বেয়ে ঝরনার মতো জল গড়িয়ে পড়ছে নীচে। কেমন ভাল লাগছে। কাঠবিড়ালিগুলোও কোথায় গিয়ে সব লুকিয়ে পড়েছে। তখনি উপর দিকে তাকাতে গাছের গায়ের খোঁদলটা নজরে এল ওর।

"পরিদিদি ওদিকে দেখো।"

"কী রে?"

"গাছের গায়ে মস্ত গর্ত। ওর ভিতরে ঢুকলে গায়ে একটুও বৃষ্টি লাগবে না।"

বাস্তবিক গাছের কোটরটা বিশাল। গাছটা যেমন মস্ত, তেমনই। দুটো রোগা-পাতলা ছেলে অনায়াসে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে সেখানে। এতক্ষণ দেখেনি, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক তার উপরে।

"ভিতরে যদি সাপখোপ থাকে! না বাবা! এমনিতেই তোর সঙ্গে এখানে আসাটা ভাল হয়নি, তার উপর আবার গাছে চড়লাম। কী ভাগ্যি যে বাজটাজ পড়েনি। এখানেই চুপটি করে দাঁড়া।"

"কিচ্ছু হবে না, চলো না পরিদিদি," আঞ্জু ব্যস্ত হচ্ছিল,"দেখে আসি পরিদিদি?"

"না-না। কোত্থাও যেতে হবে না তোকে। এখানেই দাঁড়া।"

আঞ্জু কি আর কথা শোনার পাত্র! তরতর করে উপরে চড়ে গেল। এখন তো আর পড়ার ক্লাস নয়। পরিদিদি হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। ও পাত্তাই দিল না। এসব গাছে চড়া কিছুই নয় ওর কাছে। বিস্তর ডালপালা। দুটো ডালে পা রেখে নিমেষে পৌঁছে গেল কোটরটার কাছে। উঁকি মেরে দেখল যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বড় জায়গা ভিতরটাতে। ওরা দু'জন অনায়াসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাবে। বৃষ্টিও লাগবে না গায়ে। তা ছাড়া কোটরটার ভিতরে অনেক প্যাঁচালো-প্যাঁচালো শিরার মতো আছে। যার গায়ে পা রেখে দাঁড়ানো যেতে পারে। আর সাপ না হাতি আছে এখানে!

"চলে এসো পরিদিদি। অনেক জায়গা। ওই ডাল দুটোতে পা দিয়ে চলে এসো, খুব সহজ," ডাকল আঞ্জু। তারপর আর পরিদিদি করবে কী। সত্যি ভিতরটা গরম আর একটুও বৃষ্টি গায়ে লাগছিল না।

॥ ৪ ॥

বাসি ছোলা, মটর সব খেয়ে পেটটা বেশ গরম হয়ে গিয়েছিল। হাওয়াটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে একেবারে। তবে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছিল। পরিদিদি বলল, "এই সময়ে কেউ খিচে গোটাকতক গরম-গরম চপ আর শশা, পেঁয়াজ, তেল দেওয়া মুড়ি দিয়ে যেত! আহা, কী ভালই না হত!"

আঞ্জুর এমনিতেই বেশ খিদে-খিদে পাচ্ছিল। তার মধ্যে আবার এসব কথা! গাছটাও এমন বিটকেল গাছ যে, ফলটল কিছু ধরে না।

খালি ডাল আর পাতা। কী গাছ কে জানে।

ঠিক সে সময়েই নীচ থেকে গলা ভেসে এল, "এই বাঁদর, নীচে নেমে আয়।" তাকিয়ে দেখে ছোটকু ছাতা নিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভুরুগুলো দপদপ করছে। বৃষ্টি দেখে খুঁজতে এসেছে নিশ্চয়ই। কোন দিক থেকে এল কে জানে। আগু একটু নীচে মাথাটা ঝোঁকাতেই সে কী রাগ! "বাঁদরের মতো গাছে চাপা হয়েছে! ঠ্যাং ভাঙলে কী হবে শুনি! আয় একবার নীচে, তারপর দেখছি!"

আগু তাকিয়ে দেখল পরিদিদির মুখটা কী রকম যেন হয়ে গিয়েছে। ও তো আর জানে না আগুর ঘরের লোকগুলো কেমন। কিছু বলার জন্য মুখটা হাঁ করেই আবার বন্ধ করল।

গাছ বেয়ে নীচে নেমে আসতেই খপ করে আগুর কান ধরল ছোটকু। টেনে নামাল। কী যে মুশকিল। এটা পরে আড়ালেও করা যেত।

"যদি জলে ভিজে সর্দি হয়? উপর থেকে পড়ে যদি ঠ্যাং ভাঙতিস? যদি মাথা ফাটত? উজবুক কোথাকার! চল ঘরে, আজ তোর ব্যবস্থা হবে," দাঁত কিড়িমিড় করে বলল ছোটকু। তারপর মুখটা সবুজ মতো করে পরিদিদির দিকে তাকিয়ে বলল, "আর তুমি? তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই? যদি পড়ে যেতে? বাচ্চাটাই যদি পড়ত? যদি গাছে বাজ পড়ত? ধাড়ি মেয়ে কোথাকার!"

সারা রাস্তা এক হাতে আগুর কান ধরে আর অন্য হাতে ছাতার বাঁট ধরে বকতে-বকতে এল ছোটকু। অপমানের একশেষ। পরিদিদি মাঝে দু'-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিল, "ওর দোষ নেই। আমিই ওকে নিয়ে এসেছি। কানটা ছেড়ে দাও," ইত্যাদি। তাতে আরও রেগে গিয়ে ছোটকু যা-তা বলতে লাগল। আগু একটা কান আটকানো অবস্থাতেই ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখল, পরিদিদি মুখে ওড়না চাপা দিয়ে আছে। আর সারা শরীর কাঁপছে। কাঁদছে মনে হয়। আহা বেচারি!

রাতের বেলা মন খারাপ করে বিছানায় শুয়েছিল আগু। মুডটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওর আজকে। এই ছোটকুই আগে কত ভাল ছিল। চকোলেট, খেলনা সব এনে দিত। আগের বছরই টেরাশেখের গাজন মেলাতে আগুকে নিয়ে কত ঘুরেছে। গুণ কী কম ছিল ছোটকুর? মাটি দিয়ে রং করে একেবারে আসলের মতো কুমড়ো, বেগুন, টমেটো বানাতে পারে। গাটার দিয়ে লমওয়ালা কার্ডবোর্ডের গাড়ি, আঠা আর কাগজ দিয়ে কতবার আগুকে ঘুড়ি বানিয়ে দিয়েছে। ভাল ফুটবল খেলত। আর তেমনই চমৎকার শিসের গলা। যে-কোনও গান একবার শুনে নিলে শিস দিয়ে গাইতে পারত।

এখন একেবারে অন্য রকমের হয়ে গিয়েছে। খুব বেশি লেখাপড়া করলে আসলে মানুষ বদলে যায়। অঙ্কটঙ্ক সব ঢুকে মাথার ঘিলুগুলো জট পাকিয়ে যায় কিনা। চাকরি পাওয়ার পর তো আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। ছোটকু কলেজে পড়ায়। আর যাঁরা মাস্টারমশাই, তাঁরা কোনওদিন ভাল লোক হন না। কী যে খাওয়ানো হয় ওঁদের!

আগু রাতে মায়ের কাছে শোয়। তার আগে পড়ার ঘরের খাটটাতে কিছুক্ষণ শুয়ে ছিল। শুয়ে-শুয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে বাইরে থমথম করছে রাত। কলমের আম গাছের নীচে খড়মড় করছে কী একটা। রাংচিতার বেড়ার গায়ে মুঠো-মুঠো জোনাকি। ভেজা মাটি থেকে যেন নীলচে রঙের একটা কুয়াশার মতো উঠছে তো উঠছেই।

এমনিতেই ক'দিন পরে পুরোদস্তুর শীত পড়ে যাবে। তার উপর আজ আবার বৃষ্টি পড়েছে। তাই কনকনে হাওয়া ঢুকছিল জানলা দিয়ে। এদিকে শীতটা একটু বেশি পড়ে। আগু ছাড়া কারও ঘরের দরজা খোলা নেই। রান্নাঘরের পাশের কলতলা থেকে বাসনের ঠুঠোং আওয়াজ আসছিল। আর এই ঘরের টিনটা ঠান্ডায় মটমট করছিল। এছাড়া আর কোনও শব্দ আসছিল না কোনও দিক থেকে।

লাইটটা নিভিয়ে জানলার ঠান্ডা গরাদগুলোয় গাল ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল আগু। শীত-শীত করছিল। মায়ের কাছ হলেই ও মায়ের কাছে শুয়ে পড়বে। বাবা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে টিভিতে প্রচণ্ড রাগারাগির সিনেমা দেখেন।

হঠাৎ মনে হল বাগানের পিছন দিকের গেটটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকটাতে ক'টা বড়-বড় গাছ আর তারপর গোলকদাদুর বাড়ির পিছন দিক। মাঝে সরু একটা রাস্তা। ছাইটাই ফেলা থাকে। তাই দিনেও কেউ আসে না। এ তো রাতের বেলা। চোর নাকি? উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল আগু।

সে সময়েই দেখতে পেল আগোগোড়া কালো রঙের চাদর মুড়ি দিয়ে কে যেন পা টিপে-টিপে বাগানের বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকল। হাতে নীল রঙের একটা আলো। শ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল আগু। নিশ্চয়ই ওরে ঢুকেছে। ওর ঠোঁটটা শুকনো-শুকনো, গলাটা এত কাঠ যে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতেও পারছে না।

ঠিক সেই সময় লোকটা নীল আলোটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চাপা স্বরে বলল, "হ্যালো!"

ছোটকু! মোবাইলে কাকে যেন চাপা গলায় ধমকাধমকি করছে। চাপা গলায় একবার বলল, "চুপ! দাদা, বউদি জেগে আছে।" তারপর ওদিক থেকে কিছুক্ষণ কী সব শুনে আবার বলল, "জিনিসটা খুঁজতে হবে।"

আস্তে-আস্তে জানলাটা বন্ধ করে দিল আগু। কী ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎই ওর মনে পড়ল খাটের তলায় লুকিয়ে রাখা সেই জিনিসটার কথা। সারাদিনের নানা ঝামেলায় ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিল ও। তখনই মায়ের ডাক শুনতে পেল ও। মা ডাকছেন "আগু!"

॥ ৫ ॥

আজ সকাল থেকে আবহাওয়া খুব খারাপ। মানে পৃথিবীর কথা হচ্ছে না! আগুদের ঘরের পরিস্থিতির কথা বলা হচ্ছে।

ছোটকুর খুব সুন্দর একটা গন্ধওয়ালা নরম ইরেজার বড় টেবিলটার উপরে রাখা ছিল। এত সুন্দর গন্ধ যে বলা যায় না! আগু ভুল করে আনমনা হয়ে ওটার চারটে কোণ দাঁতে করে একটু কেটে ফেলেছিল। তার আগে অবশ্য অনেকক্ষণ গন্ধ শুঁকেছিল। যাই হোক, এখন ছোটকুর সেদিকে নজর গিয়েছে। তারপর থেকে তুলকালাম চলছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে স্কুলটাও ছুটি আজ। না হলে এসব কিছু শুনতে হত না। কিন্তু আগুর কপালদোষে স্কুলের কোনও পুরনো এক ছাত্র কোথায় কী যেন একটা প্রাইজটাইজ পেয়ে গিয়েছে বলে স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে। আজ ভোলার সঙ্গে শর্মাদাদুদের ভাইপো যাওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে এইসব কাণ্ড ঘটে গেল। কাঁচা অড়হর চিবোতে যা মিষ্টি লাগে আর কী বলব!

আগুর প্রথমেই যখন ছোটকুর গলার আওয়াজ পেয়েছিল, তখনই ব্যাপারটা আঁচ করতে শুরু করেছিল। এতদিনের অভ্যেস বলে কথা। তাই ও এখন লুকিয়ে আছে দাদুর ঘরের খাটটার তলায়। কী বিকট গন্ধ আর জঘন্য নোংরা সেখানে ভাবা যায় না। মিনুপিসি খুবই ফাঁকিবাজ তা দেখা যাচ্ছে। খাটের তলা ভাল করে ঝাঁটও দেয় না, ন্যাতা তো দূর অস্ত। বিকট সব ঝুল জমে আছে।

মা আর ছোটকু বকর বকর করতে-করতে ওদিকে গেল। ছোটকুকে একবার বলতে শুনল, "আজ তোমার ইঁদুরদাঁতি ছেলের দুটো দাঁত আমি ভাঙবই।"

মা খিলখিল করে হেসে বললেন, "সত্যি! ছেলেটার মাথায় কী যে ঘোরে সবসময়।"

খাটের তলা থেকেই বড় করে জিভ ভ্যাংচাল আগু। তখনই খাটের তলা থেকে কী যেন নোনতা মতো পড়ল ওর মুখে। মা গো! ছি ছি!

হামা দিয়ে বেরিয়ে এল আগু। হাঁফিয়াট ঝেড়ে নিল ভাল করে। তারপর পা টিপে-টিপে হলঘরটা পার করে পিছনের বাগান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বাগানের গেটটা খুললে আবার ক্যাচরম্যাচর আওয়াজ হয়, তাই সে বিপজ্জনক চেষ্টাটা আর করল না। বেড়াটার

এককোণে একটা ফাঁক আছে। মাঝে-মাঝে ভুলো কুকুরের ছানারা ঢুকে আসে। সেখান দিয়ে হ্যাঁচোড়পাঁচোড় করে বেরিয়ে এল কোনও মতো। হাঁটুটা ছড়ে গেল একটু। তা যাক, পিঠটা তো বাঁচল!

সরু রাস্তা ধরে গোলকাদুদের বাড়ির পিছন দিক দিয়ে এগিয়ে চলল আঞ্জু। মাথার উপর ঝিমঝিম করছেন সূর্যি ঠাকুর। হালকা হাওয়াতে বেশ একটা খিদে-খিদে ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। সোমনাথদাদের বাগানে সারা বছর পেয়ারা হয়। বড়-বড়। তার একটা ডাল আবার বাইরে ঝোলে। সোমনাথদার মা গোলাপিপিসিমা দাওয়াতে চাল শুকোতে-শুকোতে কাকে যেন শাপশাপান্ত করছিলেন। পিসিমা নামী ঝগড়াটি। যদিও বড়রে সম্পর্কে ওরকম ভাবা নিষেধ। যাই হোক, পিসি একটু পিছন ঘুরতেই দুটো পেয়ারা হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিল আঞ্জু। ওতে পাপ হয় না। খাবার জিনিস, তা ছাড়া চাইলে মোটেও দেবেন না। আর একটু সময় পেলে আরও ক'টা ছিঁড়ে নেওয়া যেত। তবে আপাতত এতেই কাজ চলে যাবে।

যেতে-যেতে রাস্তায় জোড়া শিবের মন্দির। একটা শিবলিঙ্গ আছে আর একটি শিবঠাকুরের সাদা পাথরের মূর্তিও আছে। তাই ওই নাম। মন্দিরের ভাঙা দাওয়ায় রোজকার মতো বুড়ো ভটচাজমশাই উবু হয়ে বসে আছেন। পাশে পরানকাকা। পরানকাকার মাথায় একটু ছিট আছে বলে শোনা যায়। তাই নাকি দু'-দুটো চাকরি (একটা ইউভীয়, আর-একটা গোলদারি দোকানে) ছেড়ে গিয়েছে। একটা বিড়ি নিয়ে ভটচাজমশাইয়ের মুখোমুখি বসে গা চুলকাচ্ছেন পরানকাকা। শীত বা গ্রীষ্ম, সবসময়েই পরানকাকার গায়ে চুলকানি। ছোটকু বলে ওর নাকি ঘামাচির ডিলারশিপ নেওয়া আছে। পরানকাকা আর ভটচাজমশাইয়ের মাঝখানে একটা পিতলের ধূপদানি। সেখান থেকে নীলরঙের ধোঁয়া পাকিয়ে উপরে উঠছে। উপরে উঠে হালকা হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে। একটা রেকাবিতে কলা, শশা আর বাতাসা রাখা আছে। ভিতরের অন্ধকার থেকে শিবঠাকুর সেদিকেই চেয়ে আছেন। আর পিছনের ঝোপ থেকে ভবা ষাঁড় ওদিকেই গুটিগুটি পায়ে এগচ্ছে। ভয়ানক নোংরা ভবা ষাঁড়। পিঠে নীল রঙের ধুমসো দুটো মাছি। মন্দিরের লাগোয়া অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলো আটকে করছে। বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব চারদিকে। পরানকাকা ডেকে বললেন "আঞ্জু আয়। প্রসাদ খাবি?"

আঞ্জু আবার খায় না কী! মাছ, দুধ, রুটি, ভাত, শাক, তরকারি ছাড়া সবই খায়। মাছভাজাটা অবশ্য মাঝে-মাঝে ভাল লাগে। তা ছাড়া বাতাসটা হাতছানি দিয়ে ডাকছিলও ওকে। কখন আবার এদের মতো পরিবর্তন হয়ে যায় তার ঠিক নেই। তাই আঞ্জু তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে এগিয়ে চলে। বাতাসা আর কলার টুকরোগুলো মুখে দিতেই দেখে ভবা ষাঁড় সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাগে ফোঁসফোঁস করছে।

আঞ্জু পাত্তাই দিল না। অত ভাবলে কী আর ওর চলে! বাতাসটা চুষতে বেশ লাগছিল। মুখের মধ্যে আস্তে-আস্তে ছোট হতে-হতে পাতলা হয়ে আসছে। ভটচাজমশাই যথারীতি মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। খুব ভোরে ওঠেন কী না। হাতদুটো পিছন দিকে ভর দিয়ে রাখা। অল্প-অল্প দুলছেন। একটা অন্য মাছি একবার ওঁর মুখের ভিতরে ঢুকছে, আবার কী ভেবে বেরিয়ে আসছে। নাকের ফুটোতে যদি একবার ঢুকে যায় তা হলে মুশকিল আছে। পরানকাকা হঠাৎ নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন "তা কোথায় যাবি আঞ্জু?"

"এই তো! একটু ওদিকে যাব পরানকাকা।"

"হুম!" দুলতে-দুলতে বললেন পরানকাকা, "কাকা এসেছে নাকি?"

"হ্যাঁ," ঢোক গিলে বলল আঞ্জু। এই খবরটা আবার ছোটকুর কাছে না পৌঁছয়!

"তুমি যাচ্ছ উত্তর দিকে। সেখানে দুটো মেয়েকে দেখতে পাবে," পরানকাকা চোখ বুজে বলে চললেন। অবিকল গত মেলায় কেনা খ্যাপা পুতুলটার মতো দেখাচ্ছে পরানকাকাকে। খাড়া-খাড়া চুল, নোংরা কাপড়, বড়-বড় গোঁফ আর দাড়ি। হঠাৎ চোখ খুলে চাপা গলায় বললেন,"খুব বিপদ!"

"কার বিপদ পরানকাকা?" বাতাসার শেষ টুকরোটা ছোট্ট হয়ে আলজিব দিয়ে গলে গেল আঞ্জুর। বুকটা ঢিবঢিব করছিল।

" স্ স্ স্ স্!" সামনে ঝুঁকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন পরানকাকা। মুখ থেকে খুব দুর্গন্ধ আসছিল। মুখও ঘোয়া না নিশ্চয়ই। তারপর চারদিকে চেয়ে নিয়ে আরও চাপা গলায় বললেন, "মেয়ে দুটোর নাম উমনো আর ঝুমনো। ওরা চারদিকে ওদের বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!" তারপর সুর করে বলতে থাকলেন,

"উমনো বলে বাবাকে বুঝি বাঘেতে খেয়েছে,
ঝুমনো বলে পিতা মোদের ত্যাগ করে গেছে।
পিঠে খেয়েছিনু মোরা সেই ক্রোধ বশে
নিষ্ঠুর পিতা মোদের দিল বনবাসে।
প্রভাত হইল নিশি, হইল সকাল
পিঠে খেয়ে দু'জনের এতেক জঞ্জাল।
কোন দিকে যাবে তারা লাগিল ভাবিতে।
ঘন ঘন চারিদিকে লাগিল দেখিতে।"

আঞ্জু ছাই হতে পারে, বোকা নয়। পরানকাকার মাঝে-মাঝে এই রকম পাগলামির ঝোঁক চাপে সেটা ও জানে। তাই পরানকাকা যখন আবার ঢুলছেন, তখন আঞ্জু উঠে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। ভবা ষাঁড় ওর দিকে তাকিয়ে আবার ফোঁসফোঁস করছিল। তাই দৌড়, দৌড়!

যখন সংবিত ফিরল, দেখে বড় বাঁধটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে বুনো ঝোপ, জঙ্গল। দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে বড় বাঁধের জল ঝকমক করছে। আকাশটা ঘোলাটে লাগছিল। হাওয়াতে কীরকম যেন ঝাঁঝালো গন্ধ আর থমথমে ভাব। এই দিনেরবেলাতেও ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছিল। তার সঙ্গে কাঠঠোকরা পাখির আওয়াজ।

পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল আঞ্জু। এতক্ষণ দৌড়ে এসে হঠাৎ থমকে যাওয়ায় কপালে ঘাম আর বুকটা ঢিবঢিব। দু'দিকের রাস্তা জুড়ে সরু-সরু ঝোপ আর ডালপালা পথ আটকে দেয়। একবার তো জামায় কুল গাছের কাঁটা আটকে গেল। যত্ন করে ছাড়াতে হল। শিয়াকুলের একটা গাছে সময়ের আগেই কালো-কালো ছোট্ট কুল ধরে রয়েছে। ক'টা ছাড়িয়ে মুখে পূরল আঞ্জু। বিচ্ছিসেতই খাওয়া যায়।

পিছনের জঙ্গলে বড়, কালো মতো কী একটা সড়াৎ করে সরে গেল। পায়ে কীসের ঘষা লেগে ভীষণ চুলকোচ্ছে। কোনও রকমে পুকুরটার পাশে এসে হাঁফ ছাড়ল আঞ্জু। এখানে বড় বাঁধের পাশ দিয়ে পাথুরে উঁচুনিচু একটা রাস্তা আছে। হাঁটতে অসুবিধে হয় না।

ঢালু পথ বেয়ে পুকুরের পাড়ে নেমে এল ও। কালো জল টলটল করছে। এপার-ওপার প্রায় দেখা যায় না। হাত, পা-টা ভাল করে ধুয়ে নিল আঞ্জু। ঘাড়ে জল দিল। তারপর ওকে চমকে দিয়ে পুকুরটার মাঝে কী যেন ঝপাৎ করে উঠল। ভীষণ বড় সব মাছ আছে এই পুকুরটাতে। আর-একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে ঘাড়টা ঘোরাতেই বুকটা যেন প্রথমে থেমে গেল। তারপর দ্বিগুণবেগে চলতে শুরু করল। পাশে একটু দূরেই জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে দু'টি মেয়ে।

এরাই কি সেই উমনো আর ঝুমনো? পরানকাকা বলেছিলেন বিরাট বিপদ। আঞ্জু কি পালিয়ে যাবে?

মেয়েদু'টির পরনে নোংরা ফ্রক। নাকে সর্দির শুকনো দাগ। মাথার চুলে জটা। তাতে উকুনের রাজত্ব থাকা বিচিত্র নয়। ওকে দেখতে পেয়েই একটা মেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল। পুরুষমানুষের আবার ভয় করতে আছে নাকি! নিজেকে সাহস দিল আঞ্জু। তারপর কোনও রকমে এগিয়ে গেল।

"এটা নিবি তুই?" নাকি গলায় বলল মেয়েটা। আঞ্জু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল মেয়েটার হাতে চকচক করছে সোনালি রঙের একটা কাঠি। ডগাটার কাছে চ্যাপ্টা আর খাঁজকাটা। ওর কাছে যা বাক্সটা আছে এটা কি তারই চাবি? মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাত বাড়াল ও।

"তোর কাছে খাবার আছে? পয়সা?" আর-একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল এবার। আপ্পু ঘাড় নেড়ে পকেট থেকে পেয়ারাদুটো বের করতেই সাগ্রহে হাত বাড়াল সে। অনাজনও।

আপ্পু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের খাওয়া দেখছিল। এবার বলল "তোমরাই কি সেই উমনো আর ঝুমনো?"

মেয়ে দু'টি প্রথমে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর বড় মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে সেই রকম নাকি গলায় বলল, "উমনো আর ঝুমনো কী রে? আমরা হলাম জলপরি।"

॥ ৬ ॥

অনেকদিন আগে দাদু যখন সুস্থ ছিলেন, আপ্পুকে অনেক গল্প বলতেন তিনি। বিজ্ঞানের গল্প, ভূতের গল্প, ডাকাতের গল্প, ইতিহাসের গল্প, রূপকথার গল্প। তখন একবার কথায়-কথায় আপ্পুকে তিনি বলেছিলেন দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ, পরি, গন্ধর্ব সবই আসলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের গুণ বা পেশার উপর ভিত্তি করে তাদের পরিচয় গড়ে উঠেছিল। যেমন যক্ষরা ছিল খুব ধনী। আবার গন্ধর্বরা ছিল নাচ-গানে খুব পারদর্শী। সেকালে তো আর খবরের কাগজ ছিল না। টিভি, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট কিচ্ছু ছিল না। মানুষ অত উন্নতও ছিল না। তাই সে আমলের লেখকেরা সংকেতে তাদের পরিচয় দিতেন। তার বেশির ভাগটা আবার হত মুখে-মুখে। তাই অজ্ঞান মানুষেরা সেগুলো থেকে মনে-মনে অনেক কিছু বানিয়ে নিত। রহস্য সৃষ্টি হত।

দুপুরবেলা। মিষ্টি রোদে ভরে আছে চারিদিক। দূরে একটা ফেরিওয়ালা কী বিক্রি করার জন্য হেঁকে গেল।

আপ্পু আর ভোলা বসে ছিল তেঁতুল গাছের নীচে। অবাক হয়ে সামনে তাকিয়ে ছিল দু'জনে।

সোনালি কাঠিটা বাক্সের ফুটোতে ঢুকিয়ে একটু ঘোরাতেই খট করে বাক্সের ডালাটা সরে গেল। তারপর মিষ্টি একটা টুংটাং আওয়াজ।

বাক্সটার একেবারে নীচের মেঝেতে সমুদ্রের ছোঁয়া দেওয়া নীলচে কাচের আয়তাকার স্ফটিক। তার উপরে নেচে চলেছে সোনালি রঙেরই ছোট্ট একটা পরি। নাচের তালে-তালে কেঁপে উঠছে তার স্বচ্ছ গোলাপি ডানাদু'টি।

"এটা কী হতে পারে রে ভোলা?" একটা ঢোক গিলে প্রশ্ন করল আপ্পু।

ভোলা নির্নিমেষ চোখে পরিটার দিকে চেয়ে ছিল। এবার মুখটা তুলল। ঘাড়টা চুলকে বলল, "একটা পুতুল বলে মনে হচ্ছে তো!"

"ধুস!" বিরক্ত হল আপ্পু, "দেখছিস না, কীরকম বাজনা বাজছে। আমার তো মনে হয় এটার গোপন কোনও রহস্য আছে। কোনও সংকেত এটা। কোথাও পৌঁছনোর। সেখানে হয়তো গুপ্তধন আছে।"

"হতেও পারে, কে জানে!" চিন্তিত মুখে ঘাড় ঝাঁকাল ভোলা। "আমি শুনেছি কার ঘরে খুব পুরনো একটা প্রদীপ রাখা ছিল। এক দুপুরে সে বাড়ির এক ছেলে প্রদীপটা ঘষছিল। বিশাল ধোঁয়া হয়ে গেল প্রথমটা। তারপর একটা বিরাট বড় সবুজ রঙের দৈত্য দেখা গেল।"

"তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ না, এটা পাওয়া গেল সন্ধেবেলা জঙ্গলের মধ্যে। তারপর একদিন নিঝুম দুপুরে এর চাবিটা দিল উমনো-ঝুমনো না, দুটো জলপরি। ওটা দিয়ে ঘোরাতেই খুলে গেল বাক্সটা। আবার ছোটকু রাতে কাকে যেন ফোন করছিল কী একটা জিনিস তার চাই-ই চাই। সেটা এই জিনিসটাই নয়তো? কোথাও পৌঁছনোর এটা হয়তো একটা ধাপ। আরও অনেক রহস্য হয়তো বাকি আছে?"

"তুই কিন্তু ভাই আগে আমাকে কিচ্ছুটি বলিসনি! নেহাত আমি

এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই উঁকি মেরে দেখতে পেলাম,'' অভিমানভরে বলল ভোলা।

আপ্পু অস্বস্তি বোধ করল একটু। ভোলা ওর খুব প্রিয় বন্ধু ঠিকই, কিন্তু ও সত্যিই ব্যাপারটা ভোলার কাছে প্রথমে লুকোতে চেয়েছিল। তার জন্য আপ্পুকে বিশেষ দোষও দেওয়া চলে না অবশ্য। আসলে ক'দিন আগে সাতটা পেয়ারা তাক বুঝে গোলাপিপিসিদের বাগানে ঢুকে পেড়েছিল আপ্পু। অগুন্তি পেয়ারা ওদের, অথচ চাইলে দেবে না। তাই বাধ্য হয়েই আর কী! ভোলার সঙ্গে দেখা হওয়াতে ওকে ধরতে দিয়ে খেজুর গাছের তলাতে একটু ছোট বাইরে সারতে গিয়েছিল। তার জন্য ভোলা ওর কাছে তিনটে পেয়ারা আদায় করেছিল। আবার আপ্পুর ভাগ্যে পড়ল কিনা তিনটে। আপ্পু প্রতিবাদ করে বলেছিল ও তো সাতটা পেয়ারা ধরতে দিয়ে গিয়েছিল। তাতে ভোলা চোখ, মুখ পাকিয়ে, গলায় জোর দিয়ে বারবার বলল, ওকে নাকি আপ্পু ছ'টাই দিয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই স্বীকার করল না, এত বড় মিথ্যুক।

আপাতত যাই হোক, খুতনিটা একটু চুলকে নিয়ে আপ্পু আমতা-আমতা করে বলল, ''আসলে তারপর থেকে তো আর তোর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ছোটকুর সঙ্গেও কাণ্ড ঘটে গেল একটা। আজ তো তোর সঙ্গে আমিই দেখা করব ভেবেছিলাম।''

এসব শুনেটুনে ভোলা মনে হয় একটু ঠান্ডা হল। মনোযোগ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাক্সটার দিকে চেয়ে থেকে তারপর ডালাটা একটু নাড়াচাড়া করে বলল, ''তোর কথাটা ঠিকও হতে পারে। হয়তো সত্যিই রহস্য আছে কোনও। আরও ভাবতে হবে এই বিষয়ে। তবে তুই কিন্তু ভাই আমার পরামর্শ ছাড়া একলা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাস না। বিপদে পড়লে আমি ছাড়া তোর আর কে আছে বল!''

আজ বিকেলে আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা। এখন রোজ বিকেলে ফুটবল খেলতে যেতে হয় আপ্পুকে। পরিদিদি তো বলেছেই, বিশেষ করে ছোটকু কড়া নির্দেশ দিয়েছে ফুটবল খেললে বুকে দম আসে (কচু আসে, হাঁপিয়ে সারা হতে হয়), গায়ে জোর বাড়ে (যেটা এমনিতেই আপ্পুর আছে), শরীরে রক্ত সঞ্চালন হয় (বাবা খেলেন না বলে যেন তাঁর গায়ে রক্ত সঞ্চালন হয় না), মাথার বদমায়েশি পোকাগুলো কম নড়েচড়ে। তাই রোজ দেড়ঘণ্টা খেলাধুলা করতেই হবে।

অন্যদিন বলের পিছনে ছুটতে-ছুটতেই জীবন যায় আপ্পুদের। বড়রা ওদের বল তো দেয়ই না, বরং খাঁটিয়ে মারে। নিজেদের মধ্যেই বল পাস দেওয়াদেওয়ি করে বাপ্পাদারা। বল মাঠের বাইরে গেলে যথারীতি আপ্পুদের ডাক পড়ে। যদি কোনও গতিকে বল পেয়েও যায় ওরা, তা হলেও ''পাস দে পাস দে'' করে চিল চিৎকার শুরু করে দেয়।

আজ ঠিক সেরকমটি হল না। পার্টি করে খেলা চলছিল। বল নিয়ে যেতে-যেতে আপ্পুর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পিছনেই দৌড়ছিল আপ্পু। ওবলটা ধরে কয়েক পা দৌড়েই সামনে গোলকিপার শম্ভুর পাশ দিয়ে, (বড়রা কেউ গোলকিপার হতে চায় না বলে আপ্পুদের থেকে একটু বড় শম্ভু আর প্রতাপকে গোলকিপার সাজানো হয়) দুম করে মারতেই গোল। খুব নাচানাচি হল। মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ছোটকু। তারও মুখ খুব হাসি-হাসি দেখা গেল।

রোজ বাপ্পাদার টিম হারে। বাপ্পাদা পাকামো করে কাউকে বল পাস দেয় না। একা-একাই যেতে চায় আর পায়ে পা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। আজ কিন্তু ওই আপ্পুর করা গোলটাতেই জিতে গেল ওরা। খেলার পর ছোটকুও খুব প্রশংসা করল ওর। বলল, ''রোজ প্র্যাকটিস করবি। তোর ভিতরেও খেলা আছে দেখছি। স্বাভাবিক ব্যাপার। আমিও তো... যাই হোক, তোকে আমি এবার একটা ফুটবল কিনে দেব। পায়ে করে বল নাচানোটা শিখতে হবে। ওতে বলের উপর কন্ট্রোল আসে। আর বাঁ পা-টা ব্যবহার করতে হবে।''

এর পর সোমনাথদাদের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুকচুক করে বলল, ''তোরা বুদ্ধুই রয়ে গেলি। কিস্যু হবে না তোদের। আর বাপ্পা! তুই কি নিজেকে নেইমার ভাবছিস নাকি? একটা পকেটমার হওয়ার যোগ্যতাও নেই তোর,'' ইত্যাদি।

আপ্পুকে ছোটকু বলল, ''নে, এবার বাড়ি চলে যা। পরি পড়াতে চলে এসেছে।''

সোমনাথদা, বাপ্পাদা এদের মুখগুলো তখন দেখবার মতো হয়েছিল। ভুরভুর করে হাসি বেরিয়ে আসছিল আপ্পুদের পেট থেকে। কোনও রকমে সামলে নিয়ে আপ্পু ভোলাকে বলল, ''বাড়ি যাবি তো?''

মাঠটা ছাড়িয়ে এসে বট গাছটার কাছে পৌঁছতেই ভোলা শুকনো মুখে আপ্পুকে বলল, ''আজ আবার বড় বাঁধটার পাশ দিয়ে যাবি নাকি?''

আপ্পু তাকিয়ে দেখল ভোলার গলার নিচের গুটলিটা ওঠানামা করছে। মুখটা কাগজের মতো সাদা। বাঁ হাতটা পকেটের ভিতরে মুঠো করা। ও বলল, ''তোর কি ভয় করছে নাকি রে?''

''ভয়ের কী আছে!'' বলতে গিয়ে ভোলার গলাটা কেঁপে গেল। পরিষ্কার বোঝা যায় মুখভোলায়রি করছে। মুখ্য কোথাকার। আগের পরীক্ষাটাতেই ইংরেজিতে আপ্পু পেয়েছিল কুড়ির মধ্যে সাত আর ভোলা দুই। পুরো পাঁচ নম্বর কম। ভয় পেয়ে গিয়েছে পুরো।

''আসলে সাপখোপ আছে তো। যদি কামড়ে দেয়?''

''সাপ না হাতি। কিচ্ছু হবে না। চল,'' ভোলার হাত ধরে টানল আপ্পু। ভোলার হাতটা চ্যাচ্যাটে মতো হয়ে আছে। ঘামছে।

বিড়বিড় করে কীসব বলতে-বলতে ভোলা ওর সঙ্গে চলল। কাঁপছে ও। দু'জনের গায়েই হাফহাতা সোয়েটার। নিশ্চয়ই শীতে কাঁপছে না। কারণ ওর হাতের তালুটা আপ্পুর হাতের মধ্যে দিপদিপ করছিল। অত ঠান্ডাও পড়েনি এখন।

কিছু হল না অবশ্য। বড় বাঁধটার কাছে এসে ''মাদলকা-কা'' বলে ডাকতেই নীচ থেকে সাড়া এল, ''কে রে? আপ্পু নাকি?''

''হ্যাঁগো, আমি আর ভোলা। ঘরে চললাম।''

''তোরা যা, আমি আছি।''

''মাছ লাগেনি তোমার?'' চেঁচিয়ে বলল আপ্পু।

''না রে, বাবরার টোপ গিলে চলে যায় বুঝলি? কথা বলিস না এখন। পালিয়ে যাবে।''

আর-একটু এগোতেই পাশ দিয়ে কালো মতো কী একটা চলে যেতে আঁতকে উঠেছিল ওরা। আসলে কিছু নয়। একটা কুকুর। ভোলা এত জোরে চমকে উঠেছিল। দিনের বেলা হলে হেসেই ফেলত আপ্পু। কিন্তু এখন ওর নিজের গা-টাই কাঁপন হয়ে যাচ্ছিল। ওই উমনো, ঝুমনো না কারা যেন! তারা কি এখনও আছে?

একেবারে পাড়ার মোড়টাতে এসে আপ্পুর হাতটা ছাড়ল ভোলা। তখন চারদিকের আলোগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। ভোলা ঠোঁটটা দু'বার চেটে নিয়ে বলল, ''কাল থেকে আর হয়তো খেলতে যেতে পারব না!''

''কেন রে?'' অবাক হয়ে বলল আপ্পু।

''না ভাই, লেখাপড়া হচ্ছে না!''

আসলে ভয়! ভীষণ ভিতু ভোলাটা। ভাবতে-ভাবতে ঘরের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল আপ্পু। সজলকাকুদের চায়ের দোকানে আজ লাইট জ্বলছে না। কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। হয়তো উপরের তারটা আজ আবার কেটে গিয়েছে। সেইজন্য আজ পাড়াটা বেশি অন্ধকার লাগছিল। আপ্পু তাকিয়ে দেখল দুটো লম্বা, সিড়িঙ্গে, কালোমতো লোক ঠিক ওদের ঘরের সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। আর ওদের ঘরের দরজাটাও হাট করে খোলা। আপ্পু পৌঁছতেই কোথায় যেন সরে পড়ল তারা। মনে হল, লোকদুটোর যেন ছায়া পড়ছিল না। হাঁটাটাও কেমন-কেমন। দাঁতগুলো অন্ধকারেও ঝিলিক মারছিল। দৌড়ে ঘরে ঢুকল আপ্পু। ঘর অন্ধকার কেন? মায়েরা কই? ভাবতে-ভাবতে ভিতর ঘরে আলো জ্বলছে দেখে কোনও মতে ঢুকে দেখে মা

আর পরিদিদি। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ওর।

"দুটো লোককে দেখলে মা?"

মা চোখ বড় করে বললেন, "হয়েছে। যাও, হাত-পা ধুয়ে খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। পরি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।"

গোল করার উত্তেজনায় ভাল করে দুধ-মুড়িটা খেতেই পারল না আশু। একটু খেয়েই গিয়ে পড়তে বসল। পরিদিদির সঙ্গে মা তখন গল্প করছিলেন। আশু যেতে উঠে দাঁড়ালেন।

"তুমি পড়িয়ে নাও, পরে এসে গল্প করব।"

পরিদিদি অল্প হাসল। আশু মাথা নিচু করে অঙ্ক করছিল। পরিদিদি বলেছে, স্কুলের আগেই সব অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে। এখন বলল, "শুনলাম তুমি নাকি আজ মেলার মাঠে গোল করেছ?"

আশু অবাক হয়ে গেল। এই খবরটা এত দূর পৌঁছে গিয়েছে?

"খুব ভাল খবর। তবে ভাল করে পড়তেও হবে কিন্তু। খেলাধুলো তো করতেই হবে। তার সঙ্গে লেখাপড়াও।"

ঘাড় নাড়ল আশু। সত্যি, আজ অঙ্কগুলো সব হলও বটে। একটাও আটকে গেল না। যেমনটা আগে হত। সব জলের মতো লাগছে। পরিদিদি খুব লাকি এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই!

বাবাও খোশমেজাজে কোথা থেকে পান খেয়ে ঢুকেছেন। সেই নিয়ে মায়ের সঙ্গে হল একচোট। মা আবার পান খাওয়া দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত বাবা ড্রেনে থু থু করে এসে কুলকুচি করে এলেন। আশুর ঘর থেকে সব কথা শোনা যাচ্ছিল। পরিদিদি মুখ টিপে খুব হাসছিল।

বাবা আশুর ঘরে এসে পরিদিদিকে বললেন, "দেখেছ তো কাণ্ড! কিচ্ছু করার উপায় নেই। যাই হোক, চলো তোমাকে জয়ন্তদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। আর ক'দিনই বা!"

পরিদিদি মাথা নিচু করে মুখ ঢাকা দিয়ে হাসছিল। হাসলে ভারী সুন্দর দেখায় পরিদিদিকে। আস্তে-আস্তে বইটই সব ভাঁজ করে উঠে দাঁড়াল পরিদিদি। বলল, "আসছি আশু!"

তারপর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ আবার ঘুরে তাকিয়ে আশুকে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ আশু!"

আশু তো অবাক। এদের সব হল কী! কথাবার্তা কিচ্ছু বোঝা যায় না। মেজাজমর্জিও বেয়াক্কা দায়।

রাতে শুতে যাওয়ার সময় হঠাৎই ওর খেয়াল পড়ল, আরে ওরও তো উচিত সোনালি পরিকে থ্যাঙ্ক ইউ বলার! ওটার জন্যই না অঙ্কটঙ্ক জল হয়ে যাচ্ছে সব! স্কুলে বকাও খেতে হচ্ছে না আজকাল।

কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না কোথায় রেখেছে ওটাকে। আলমারি, বইয়ের তাক, খাটের তলা, সব জায়গা খুঁজেও পাওয়া গেল না বাক্সটা। আশ্চর্য! বুকটা খুব জোরে ঢিবঢিব করতে লাগল ওর। কী হবে এখন!

বাগানের বাইরে কুকুরের ডাক শুনে কীরকম যেন সন্দেহ হল ওর। ঘরের লাইট অফ করে, জানলাটা একটু ফাঁক করে উঁকি মারতে দেখতে পেল সব শুনশান। কিন্তু কে যেন নড়াচড়া করছে ওখানে। তাই কি কুকুরগুলো ডাকছিল?

সেই সময়েই হঠাৎ ছোটকুর গলা শোনা গেল। কান খাড়া করল আশু। ছোটকু মোবাইলে কথা বলছে। সে খুব খুশি-খুশি গলায় বলছে, "পেয়েছ জিনিসটা? নিশ্চিন্ত হলাম এবার। বাঁচা গেল!"

সবই ভীষণ সন্দেহজনক। ছোটকু কি কোনও গোপন গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত? কী খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই গ্যাং?

॥ ৭ ॥

বাবা বলেন, এখানে, মানে আশুদের গ্রামে, নাকি জমির একেবারে দাম নেই। কিছুই তো নেই এখানে।

জমির দাম কী জিনিস সেটা আশু বোঝে না। তবে এটা সত্যি, ওদের গ্রামে, বড় বাজার, হাসপাতাল, সিনেমা হল এসব কিছু নেই। বাসও চলে না গ্রামের ভিতর দিয়ে। কোথাও যাওয়ার জন্য ট্রেনই একমাত্র ভরসা। তাও সারাদিনে চারটে মাত্র ট্রেন চলে। আর স্টেশন পর্যন্ত যেতে হলে হয় পায়ে হেঁটে যেতে হবে। না হলে সাইকেল বা মোটর সাইকেলে। কারও যদি শরীর খারাপ হয়েছে, তা হলেই হল আর কী!

তবে কিছু জিনিস আছেও আবার যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এত সুন্দর জঙ্গল, ফাঁকা মাঠ, ঘাস জমি, তেঁতুলতলা, খেজুর আর তাল গাছের সারি, বটতলা, জটাবাবার মন্দির, পরিষ্কার আকাশ, নানা রকমের পাখি এসব আছে আর কোথাও? তা ছাড়াও শিয়াল আছে, খরগোশ আছে।

ওদের স্কুলটাও খুব সুন্দর। গ্রামের শেষপ্রান্তে একটা লাল মাটির টিলার মতো। তার পাশে সাদা আর লাল রঙের স্কুলটা। আশপাশ যেমন, স্কুলের ভিতরেও তেমনই বড়-বড় গাছ। আর যে লাল মাটির টিলাটার কথা বললাম, সেটার গায়ে-গায়ে বৃষ্টির তোড়ে কত রকমের যে ডিজাইন হয়েছে কী বলব! কোথাও মনে হবে পাথরে কোঁদা লাল রঙের মন্দির। কোথাও মনে হবে একটা বিশাল মূর্তি হয়ে আছে। শরৎকালে তার উপরে সাদা-সাদা কাশফুলের জঙ্গল হয়ে থাকে। ক'দিন পরে আবার বাদামি হয়ে মরে যায়।

স্কুলের ভিতরের পরিবেশটা অবশ্য আশুদের মোটেও অত ভাল বলে মনে হয় না। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ানো হয় এখানে। মোট শিক্ষক শিক্ষিকা, পরিদিদি সমেত আটজন। এঁদের মধ্যে একজন প্রায়ই অসুস্থ থাকেন বলে আসতে পারেন না। এক তারিখে আসেন খালি। হেডমাস্টারমশাই সারাদিন অফিসে নানা রকমের কাজকর্ম করেন। তাঁকে মিডডে মিলের চাল, ডালের হিসেব নিয়েও ব্যস্ত থাকতে হয়। দেবেশস্যারের ব্যাপারটা আবার অন্য রকম। তাঁকে খালি-খালি পনেরো কিলোমিটার দূরের ব্লক অফিসে যেতে হয়। ভোটার লিস্ট, জনগণনা, আরও কত কী! পুরুলিয়া সদরেও নানা কাজ থাকে স্কুলের। সেখানেও যান ওই দেবেশস্যার। বাকি দু'জন দিদিমণি আর দু'জন স্যারকে (পরিদিদি তো সবে এল) সব ক্লাসের পড়া নিতে হয়। ক্লাস টু-তে পড়ান মিলিদিদি। যেমন সুন্দর তাঁর গলা, তেমনই মিষ্টি ব্যবহার। কাউকে বকেন না পর্যন্ত। একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! তাই অন্য সব ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ক্লাস টু-র সবাইকে প্রচণ্ড হিংসা করে।

সবচেয়ে খারাপ কপাল অবশ্য আশুদের। সেখানে পড়ান কমলেশস্যার। ভয়ানক আমিষখোর চেহারা তাঁর। বড়-বড় লাল-লাল চোখ, গদার মতো হাত, তাতে আবার প্রচুর লোম। নাকেও কত চুল। ওঁর মোটা-মোটা ভুরু আর জীবন্ত একজোড়া গোঁফ। বিশাল লম্বা আর তেমনই কড়া মেজাজ। প্রচুর মারধোর করেন। করতে-করতে মেতে যান একেবারে! আশুদের সঙ্গে তিনি ক্লাস ওয়ান থেকে টু থেকে পর্যন্ত উঠেছেন। ফোরেও নিশ্চিত উঠবেন।

আজ আশু আর ভোলা আর জগু তাঁর ক্লাস থেকে একসঙ্গে ছোট বাইরে করতে বেরিয়েছিল। তারপর আর আসেই না আসেই না। "আসছি স্যার" বলে যখন তিনজন একসঙ্গে ক্লাসে ঢুকছিল আবার, কমলেশস্যার বাজের মতো গলায় হাঁক দিয়ে বললেন "দাঁড়া!"

উনি আবার আস্তে কথাই বলতে জানেন না। পাগুলো কাঁপছিল ওদের। জগু হাউমাউ করে কী সব বলতে গিয়ে কপ করে একখানা মশা-ই গিলে ফেলল। তারপর কমলেশস্যার আয়েস করে ওদের কানগুলো মলতে থাকলেন। এরটা প্যাঁচাল, ছেড়ে দিয়ে পরের জনের কানটা ধরেন, তারপর অন্য জনের কান মলেন। আবার ফিরে-ফিরে আসেন। শেষটা যেন নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল তাঁর। আরামে চোখ মুদে ফেলেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে বললেন, "যা, এবার গিয়ে বোস।"

সবে বসেছে, জয়ন্তীম্যাম এসে খবর দিলেন কয়েকটি ছেলে এই ক্লাস থেকে বেরিয়েছে আর তাঁর ক্লাসের দু'টি মেয়ে কান ধরে বাইরে নিলডাউন ছিল, তাদের গায়ে থুতু ছিটিয়ে এসেছে।

কমলেশস্যার ভয়ানক রেগে গিয়ে মুখটা প্রথমে ছুঁচলো করলেন,

তাঁর গায়ের রঙটা পালটে বেগুনি মতো হয়ে গেল। গোঁফজোড়া জীবন্ত হয়ে গিয়ে শুঁয়োপোকার মতো নিজের ওদেরকে নড়াচড়া করতে লাগল। সেই সময় জগু মশাটা পেটের ভিতর থেকে বের করতে গিয়ে ভুল করে 'কোঁয়াক' করে একটা আওয়াজ বের করে ফেলল।

"বাঁ দিক, থার্ড বেঞ্চ সবক'টা উঠে দাঁড়া," গর্জন করে উঠলেন কমলেশস্যার। হাতে বেত তুলে নিয়েছেন।

জয়ন্তীম্যামের মনটা খুব নরম। চোখদুটো ছলছল করে করুণস্বরে বললেন, "কমলেশ, মারবেন না প্লিজ়!"

কমলেশস্যারের মুখটা হাঁ হয়ে গিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল। গোঁফটা ঝুলে গিয়ে ঠোঁটগুলো কেঁপে গেল। বেত ধরা হাতটা নীচে নেমে এল। বিড়বিড় করে কী সব বলে তারপর ভাঙা গলায় বললেন, "থার্ড বেঞ্চের সবক'টা কান ধরে বাইরে নিলডাউন দে।"

জগু, ভোলা আর আঙ্গু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু ওদের সঙ্গে আঁচল আর মিঠুও বেঞ্চে বসেছিল বলে ওদেরকেও বাইরে বেরিয়ে আসতে হল। পাশ দিয়ে পেরনোর সময় কমলেশস্যার তাঁর কালো-কালো দাঁতগুলো কিসকিস করে আবার ওদের কান ধরতে গিয়েও জয়ন্তীম্যামের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেলেন। উনিও মুচকি হেসে সরে গেলেন।

পরের ক্লাসেও ওদের কান ধরে বাইরেই বসে থাকতে হল। কমলেশস্যার বারবার ওদের দিকে তাকিয়ে গরগর করতে থাকলেন। কিন্তু মারলেন না।

আঙ্গু আনমনে তাকিয়ে দেখল, সামনে দিয়ে একটা মোটা মতো কালো পিঁপড়ে পিছিয়ে তুলে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সামনের পা দুটো তুলে নাকটা চুলকে নিল। ওটার পিছনে একটা সাদা-কালো ছিট-ছিটি মোটা টিকটিকি আসছিল। সেটা কেন জানি থেমে গিয়ে কী ভেবে আবার ঘুরে গিয়ে লাফিয়ে দরজার পাশের দেওয়ালটাতে চেপে গেল। আঙ্গু হাত বাড়িয়ে ওটার লেজটা ছুঁতে গিয়েও থেমে গেল। লেজটা ছুঁয়ে দিলে খসে যায় আর নিজের থেকেই লাফাতে থাকে। সেটা দেখতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু কমলেশস্যার এখন খেপে আছেন।

একটা মশাও নিচু হয়ে হেলিকপ্টারের মতো এঁকেবেঁকে উড়ে চলে গেল। তখনই আঙ্গু দেখে, ওর ধাইয়ের উপর টপ করে গরম একফোঁটা জল পড়ল। চমকে গিয়ে চোখ আঁচলের মাথা নিচু আর চোখ দিয়ে ক্রমাগত ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে। তার পাশে মিঠুরও প্রায় একই অবস্থা। ওর নীচের ঠোঁট কাঁপছিল।

জগুরও মাথা নিচু আর গোটা শরীরটা কাঁপছিল। ও কি কাঁদছে নাকি? না, ও হাসছে। মিঠু আর আঁচলের অবস্থা দেখে নিঃশব্দে হেসে চলেছে ও। আঙ্গু আর ভোলার প্রচণ্ড হাসি এসেছিল। সেটা চাপতে গিয়ে ভোলা আবার 'ঘ্যাঁক' করে বিকট একটা শব্দ করে ফেলতেই কমলেশস্যার চমকে কুটিল চোখে ওদের লক্ষ করতে লাগলেন। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে কান ধরাতে মন দিল।

"বেল্লিক কোথাকার," স্যার গর্জন করে উঠলেন। কী ভাবলেন কী জানি। আবার একমনে ভারতের জলবায়ু আওড়াতে থাকলেন।

একটু পরে আঙ্গু ফিসফিস করে আঁচলকে বলল, "তুই খামোকা কাঁদছিস কেন?"

আঁচল আরও কাঁদতে থাকল। মুখ খুলল না। মিঠু তখন ফিসফিস করে কান্নাভরা গলাতে বলল, "তোরা কী সব করে এলি! সে জন্য আমাদেরকেও স্যার শাস্তি দিলেন। আর কোনওদিন তোদের পাশে বসব না।"

আঙ্গু খুব গম্ভীর হয়ে স্যারের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাপাগলায় বলল, "আমরাও কিছু করিনি। ওই জগুই মেয়েদুটোর গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে এসেছে।"

জগু শুনতে পেয়ে নরম গলায় বলল, "আমি কী করব! ঠিক সেসময়ে আমার মুখে একটা মশা ঢুকে গিয়েছিল। তাই বের করতে গিয়ে...ওফ! আজ সকাল থেকে আমার মুখে খালি মশা ঢুকে যাচ্ছে। এত মশা কোনওদিন দেখিনি।"

আঙ্গু বলল "যাই বলিস ভাই, আমার পরিটা চুরি না হলে এসব কিছুই হত না। কী লাকিই ছিল ওটা। দুটো কালো মতো ভূত কয়েকদিন থেকেই ওটার পিছনে লেগেছিল। ওরাই হয়তো রাত্তিরবেলা চুরি করে নিয়েছে। আসলে ভাল জিনিস তো আর ওদের সহ্য হয় না!"

জগু আর মিঠু হাঁটুতে ভর দিয়ে একটু কাছে সরে এল। আঁচলও কান্না থামিয়ে, আর থাকতে না পেরে বলল "কিসের পরি ভাই? কী ভূত?"

ভোলা একবার কমলেশস্যারের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল "সে কত কথা। তোরা তো আবার আমাদের সঙ্গে বসস না বলেছিস।"

আঁচলও স্যারের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল "রাগে বলে ফেলেছিলাম ভাই, কিছু মনে করিস না। কালকেও তোদের পাশে বসব। বলে দে ভাই!"

ভোলা তখন স্বর নামিয়ে বলে চলল, "বিশেষ একটা কাজের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। জঙ্গল দিয়ে ফিরছিলাম সেদিন। গভীর রাত। খালি আমি আর আঙ্গু। চারদিকে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না। মাথার উপর বাঁকা চাঁদ। একটা পেঁচা ডেকে উঠল হঠাৎ। আমরা, বিশেষ করে আঙ্গু, প্রচণ্ড চমকে উঠল। খোলা আকাশে মেঘ ডেকে উঠল কড়কড়। আঙ্গুকে বললাম, 'কিচ্ছু চিন্তা করিস না। আমি যখন আছি তখন ঠিক সামলে নেব।'

"সামনে কিছু দেখা যায় না। বড় বেল গাছটায় সাদামতো কী যেন একটা নড়ে উঠল। তারপর স্পষ্ট দেখলাম মস্ত হাত বাড়িয়ে ওইটা পাশের গাছটাতে চলে গেল। তক্ষুনি সামনের মাটিতে সোনালি রঙের কিছু একটা ঝকমক করে উঠল। আঙ্গুকে কনুই দিয়ে একটু ঠেলা মারতে ও দেখি ওটা তুলে পকেটে পুরেছে। কিছুই বলল না যদিও। ভেবে দেখলাম দেখি, ও নিজের মুখে কিছু বলে কিনা।

"তারপর একদিন আবার আঙ্গু পিছু নিয়েছি। স্কুলে ছুটি ছিল। দেখলাম নিশি লাগার মতো ও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘোর দুপুর তখন। বড় বাঁধটার কাছে গিয়ে লুকোলাম বট গাছটার আড়ালে। জল থেকে হঠাৎ দুটো মেয়ে উঠে এল। তবুও তাদের গা একেবারে শুকনো। মাথার চুলের রঙ শ্যাওলার মতো সবুজ। পায়ের তলা একেবারে মাছের মতো। আঁশ চকচক করছিল।"

শুনতে-শুনতে আঙ্গুর গায়েও কাঁটা দিয়ে উঠছিল। নেহাত টিফিনের ঘণ্টা পড়ে গেল তাই রক্ষে! টিফিনের পর অবশ্য স্কুলে আর নতুন কিছু ঘটল না। কমলেশস্যার আগুনচোখে তাকাচ্ছিলেন কেবল।

ছুটি হতে-হতে দিনের আলো মরে এল। আনমনা হয়ে ঘরের রাস্তা ধরেছিল আঙ্গু। মনে-মনে ভাবছিল, দিনটা আসলে গেল কেমন! নিলডাউন দিতে হয়েছে, কিন্তু সেরকম মার খেতে হয়নি ওকে।

স্কুল বিল্ডিংয়ের বাউন্ডারিটা পার করে ফাঁকা রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটল আঙ্গু। ডওড়া একলা রাস্তা। পলাশ আর সেগুন গাছের শুকনো, বড়-বড় পাতা পড়ে আছে রাস্তাজুড়ে। অন্ধকার ছেয়ে আছে গ্রামের আকাশে। বড় মনখারাপ করে দেয় এই গ্রামের প্রতিটি কোণ। সামনের অশ্বত্থ গাছটার একটা ডাল কেটে পলিথিন দিয়ে ঘিরে বাঁশের খুঁটির নতুন চায়ের দোকান করেছেন সুমনকাকু। সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছোটকু। আর সঙ্গে লম্বা, রোগা, শুকনো মতো দুটো লোক। সেদিন সন্ধেতে যাদের দেখা গিয়েছিল। লোকদুটোর ছায়া পড়ছিল না দোকানের দেওয়ালে।

॥ ৮ ॥

ছোটকু বলেছিল, "সে সময় কি বাঁদরটা ঘরেই থাকবে? মুশকিল হয়ে যাবে!"

মা বললেন, "সবাই মিলে আমার ছেলেটার পিছনে লেগো না তো! কী এমন করেছে ও? ছেলেবেলায় একটুআধটু দুষ্টুমি সবাই করে।

আর আমিও থাকব তো। কিছু চিন্তা নেই।"

বাবা বললেন, "গোলু খুব একটা ভুল বলেনি যদিও।"

গোলু হল ছোটকুর ডাকনাম।

মা তখন রেগে গিয়ে বললেন, "মোটেও ও অত খারাপ নয়। ছেলেবেলায় ও যা করেছে-করেছে। এখন ও অনেক বড় আর শান্ত হয়ে গিয়েছে।"

এত যে কথা হচ্ছে তার কারণ হল, আজ নাকি কারা সব ছোটকুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কী সব কথাবার্তা বলার আছে। আর অনেকদিন আগে, তা প্রায় এক বছর হতে চলল, কারা সব এসেছিল। তারা প্লেটের সব শিঙাড়া, মিষ্টিগুলো খায়নি। নষ্ট হবে বলে আঞ্জু সেগুলো তুলে ফেলে খেয়ে ফেলেছিল। তাতে নাকি বাবা আর মায়ের লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল। কিছু যদি ভাবে তারা। অথচ ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ওরা বরং খুব খুশি হয়ে আঞ্জুর গাল টিপে দিয়েছিল।

যাক গে যাক, নেই নিক গুকে। আঞ্জু খোড়াই কেয়ার করে। নেহাত ভোলা গিয়েছে ওর মামাবাড়ি, না হলে ও বাইরেই খেলতে চলে যেত। এদের ঘরে থাকতে বয়েই গিয়েছে ওর। একমাত্র মা-ই যা একটু ভাল। তাঁর জন্য মন কেমন করে, তাই। ছাদে চলে গেল আঞ্জু। সিঁড়ির ঘর থেকে ওর ছেঁড়া মাদুরটা বের করল। অর্জুনের মতো তির-ধনুক আর ছেঁড়া পাঁজি আছে। ওসব নিয়ে খেলতে বসল।

ঠিক বেলা এগারোটার সময় গাড়ির হর্ন শুনে ছাদ থেকে ঝুঁকে দেখল, ওদের ঘরের সামনে একটা সাদা রঙের গাড়ি এসে থেমেছে। পিছন-পিছন নাক মুছতে-মুছতে নিকি আর ওর ভাই কিছু দূর দৌড়ে এসে থেমে গেল। গ্রামে গাড়ি এলেই ওরা খামোকা পিছন-পিছন দৌড়োয়। তারপর গাড়ি থেকে নামলেন একজন ভদ্রলোক। খুব বুড়োও নন, আবার ছোকরাও নন। তাঁর সঙ্গে নামলেন একজন ভদ্রমহিলা। লাল শাড়ি আর টিপ পরা। সম্ভবত প্রথমের ভদ্রলোকের বউ হবেন। দারুণ দেখতে। অনেকটা পরিদিদির মতো। তারপর ছোটকুর বয়সি একজন লোক। জিন্স আর কালো টি শার্ট পরা। পায়ে চকচকে কালো শু। সে আবার হাত ধরে নামাল খুব বুড়ো কিন্তু দারুণ দেখতে ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন ভদ্রলোককে। তাঁর সব চুল সাদা।

আঞ্জুর যদিও খুবই নীচে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। এঁরা ছোটকুকে কী বলতে এসেছে জানা দরকার। গ্যাংয়ের লোক হতে পারে। বা সাদা পোশাকের পুলিশ। তা ছাড়া এঁদের হাতে কী সব প্যাকেটফ্যাকেট আছে। খাবার জিনিসও হতে পারে। কিন্তু তবুও জেদ করে ও নীচে গেল না। যদি ডাকে তবেই যাবে।

প্রতি রবিবার ওদের ঘরে পেঁপে আর আলু দিয়ে পাঁঠার মাংসের ঝোল হয়। আজও হবে। তবে আজ বাবা অনেকটা বেশি করে মাংস এনেছেন। এঁরা সম্ভবত খেয়েই যাবেন। তা ছাড়া বড় মতো একটা কাতলা মাছ এসেছে আর গুচ্ছের শাকপাতা। নীচ থেকে সেই মাংসের গন্ধটা নাকে আসতে আঞ্জুর প্রাণ আনচান করে উঠেছিল। কিন্তু কাতলা মাছটা যখন তেলে ছাড়া হল, তখন গন্ধে ও আর কিছুতেই থাকতে পারছিল না। সেই কখন একবাটি পান্তা খেয়েছে। এতক্ষণে হজম হয়ে প্যান্টের কোমরের কাছটা ঢিলে হয়ে গিয়েছে একেবারে। পেটটাও গুড়গুড় করছিল আর মুখে খালি-খালি জল চলে আসছিল। নিজেকে আঞ্জু বলছিল, অর্জুন কি শুধুই এত বড় বীর! কত প্রলোভন জয় করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু একই সঙ্গে মনের অন্য কোণটা বলছিল যখন তিনি প্র্যাকটিস করতেন, সে সময় কি কেউ গরমমশলা দিয়ে মাংস রান্না করছিল? আর বড়-বড় কাতলা মাছের পেটি ভাজছিল? তা হলে কী হত তা বলা মুশকিল!

একটা বড় আর লম্বা কাঠের টুকরোকে ব্যাটের মতো ধরে পাথরের টুকরোকে উপরে ছুড়ে বারবার মারবার চেষ্টা করছিল আঞ্জু। কিন্তু একটাও লাগছিল না। নীচ থেকে যা গন্ধ ছেড়েছে, বড্ড অসুবিধে হচ্ছে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর গলার আওয়াজ শুনে থেমে গেল আঞ্জু। সেই বুড়োমতো ভদ্রলোক আর ছোটকু উপরে এসেছেন দেখা যাচ্ছে। দাদুটার সাদা চুলগুলো হাওয়াতে ফরফর করে উড়ছে। কী সুন্দর যে লাগছে! ছোটকু আবার আজ ফরসা জামাকাপড় পরে খুব সেজেছে দেখা যাচ্ছে। এত সকালে স্নানও সেরে ফেলেছে।

দাদুটি ছাদে উঠে এসে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে তারপর আঞ্জুর দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসলেন। বললেন "এসো দাদুভাই, তোমার কথা কত যে শুনেছি!"

আঞ্জু একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল। তবে হতে পারে নীচে খাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত পায়ে-পায়ে এগিয়েই গেল। ছোটকু আবার পিছন থেকে ইশারা করে বারবার বুড়ো ভদ্রলোকের পায়ের দিকে দেখাচ্ছে। দেখাবার কী আছে? খালি পায়েই তো এসেছেন!

উনি আঞ্জুর মাথায় হাত রেখে আঙ্গ হেসে বললেন, "আমি হলাম পরির দাদু।"

তাই উনি এত সুন্দর! মনে-মনে ভাবল আঞ্জু।

ভদ্রলোক বললেন, "পরি ঠিকই বলে, তুমি তো ভারী মিষ্টি ছেলে।" তারপর বললেন "জান তো তোমার ঠাকুরদা আর আমি ছেলেবেলায় একই স্কুলে পড়তাম। অবশ্য আমি ওর থেকে তিন ক্লাস নীচে। তুমি নাকি পরির মিউজিক্যাল বক্সটা খুঁজে দিয়েছ? তোমার মা দিয়েছেন ওর হাতে। কোথায় রাস্তাতে ফেলে এসেছিল, পরিই বলছিল। আসলে পরি আর আমি তো ঠিক দাদু-নাতনি না, আমরা হলাম বেস্ট ফ্রেন্ড। এবার অবশ্য তুমি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে যাবে!"

আঞ্জু একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। কী বলবে ভেবেই পাচ্ছিল না। এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ঘিনে-ঘিনে ভাবটাও টের পাচ্ছিল না। দাদু কিন্তু বলেই চললেন, "ওটা পরিকে কে দিয়েছিল জান?"

তারপর মুচকি হেসে ছোটকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার ছোটকু! ওর সঙ্গে আমরা পরির বিয়ে দেব ঠিক করেছি। ও হবে তোমার নতুন কাকি!"

ছোটকু লজ্জা-লজ্জা মুখে মুখ নিচু করে ছিল। আর আঞ্জু এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, যখন নীচ থেকে সেই শুকনো, লম্বা, কালো মতো লোক দুটো উপরে উঠে এসে বলল, "ছোটবাবু, বড়বাবু বললেন বাগানের কোন দিকটা সাফাই হবে সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করে নিতে," তখন ও আর নতুন করে অবাক হল না।

প্রশ্ন

আমার কুইজ

দীপসুন্দর দিন্দা

১. সার্কাসে অনেক সময় এক চাকাওয়ালা সাইকেল দেখা যায়। এই এক চাকাওয়ালা সাইকেলগুলোকে কী বলে?

২. প্রথম আধুনিক অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৬ সালে গ্রিসের আথেন্সে। এই প্রতিযোগিতায় ৩১১ জন পুরুষ খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জান কি কতজন মহিলা খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন?

৩. 'শার্লক হোমস' চরিত্রের স্রষ্টা বিখ্যাত সাহিত্যিক আর্থার কোনান ডয়েল মাঝে-মাঝে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তিনি একটিই মাত্র উইকেট নিয়েছিলেন এবং

এটি ছিল একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটারের উইকেট। কে ছিলেন সেই ক্রিকেটার?

৪. ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া কোন ভারতীয় রাজনীতিবিদের আসল নাম 'এডভিগে আন্তোনিয়া অ্যালবিনা মাইনো'?

৫. প্রতি গ্রীষ্মে পুরীতে জগন্নাথদেবের ভোগের মেনুতে নিয়ম করে ফিরে আসে 'পাখাল ভাত'। এই মেনুই অন্য নাম নিয়ে বাংলার গ্রামগঞ্জে খাওয়া হয়। আমরা কী নামে চিনি একে?

৬. কোন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর কাছ থেকে সেবা পেয়ে তাঁকে দু'টি বর দিতে রাজি হয়েছিলেন?

৭. 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' কে বলেছিলেন?

৮. কমিক্সের কোন চরিত্রের পোষা বাজপাখির নাম ফ্রাকা?

৯. বক্সিংই সেই প্রথম খেলা, যার চলমান ছবি তোলা হয়। এই ছবিটি কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানী তুলেছিলেন?

১০. 'নুয়েভা' নামের রেস্তরাঁটির মালিক কোন জনপ্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটার?

১১. প্রথম 'সেরা অ্যানিমেশন ছবি' হিসেবে কোন ছবি অস্কার পুরস্কার পেয়েছিল, যার কাহিনিকার ছিলেন উইলিয়াম স্টেগ এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল একটি রাক্ষস, সেই রাক্ষসের বন্ধু ছিল একটি গাধা।

১২. অলিম্পিক্সের ইতিহাসে জেরেমি বুজাকোয়েস্কি ভারতের পক্ষে কোন দিক থেকে প্রথম ছিলেন?

১৩. নেপালের আপা শেরপা, ফুরবা তাশি শেরপা এবং কামি রিটা শেরপা সর্বাধিক ২১ বার কোন রেকর্ডের অধিকারী?

১৪. কলকাতার প্রথম বাঙালি শেরিফ ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্র। কলকাতার প্রথম মহিলা শেরিফ ছিলেন কোন প্রখ্যাত গায়িকা?

১৫. এক ইংরেজ সাহেবকে হত্যা করার ব্যর্থ পরিকল্পনার পর কোন বাঙালি বিপ্লবী সমস্তিপুর রেল স্টেশনের কাছে ট্রেনে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক পুলিশ দারোগার সন্দেহে ধরা পড়ে যান এবং নিজের মাথায় পিস্তল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেন?

১৬. সুকুমার রায় সৃষ্ট চরিত্র ট্যাঁশগরু একদিন কী খেয়ে প্রায় তিন মাস

আধমরা হয়ে শুয়ে ছিল?

১৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের জন্য স্যালাইনের অভাব দেখা গেলে একটি জিনিসের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল, কারণ তার মধ্যে পটাসশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে, যা হৃদপিণ্ডের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। সেই জিনিসটি কী?

১৮. ১৮ শতকে সাইবেরিয়াতে কোন গাছের পাতা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হত?

১৯. ইথিওপিয়া, তাঞ্জানিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং উগান্ডা— এগুলো কোন আফ্রিকান দেশের পাঁচটি বর্ডার?

২০. চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দর। বেহুলার পিতার নাম কী?

২১. মুম্বইয়ের একটি রেস্তরাঁয় কোন বলিউড অভিনেতার নামে 'সঞ্জুবাবা চিকেন' পরিবেশন করা হয়?

২২. বর্তমানে সেলফি তোলার প্রচলন সর্বত্র। প্রথম কোন ব্যক্তি এই সেলফি তুলেছিলেন?

২৩. রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একমাত্র বাংলা পত্রিকা যা ১৮৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে চালু করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। পত্রিকাটির নাম কী?

২৪. রঞ্জি ট্রোফি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ৬৩৭টি উইকেট পেয়েছিলেন এই ক্রিকেটার। কিন্তু দেশের হয়ে খেলার সৌভাগ্য হয়নি। এই হতভাগ্য ক্রিকেটারটির নাম কী?

২৫. ৯৬৪ সালের শেষ দিকে স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক ডগলাস অ্যাঞ্জেলবার্ট সর্বপ্রথম কোন জিনিসটি আবিষ্কার করেন, যা প্রথমে তৈরি হয়েছিল কাঠের চারকোণা ফ্রেমের মধ্যে?

২৬. ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসকে সাহায্য করার জন্য ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সংস্থাটির নাম কী?

২৭. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইউরোপিয়রা গ্রীষ্মে ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস হয়ে এর নাম দিয়েছিল 'রেড ডগ'। এটিকে আবার অনেকে 'ফায়ারি পিম্পল' বলত। এটি কী?

২৮. ত্রিনিদাদ, সান আন্তেনিও, সান্তিয়াগো, কম্পেশান এবং ভিক্টোরিয়া নামক জাহাজে চড়ে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন?

২৯. সর্বকালের সেরা কোন রক অ্যান্ড রোল শিল্পীর জামাই ছিলেন মাইকেল জ্যাকসন?

৩০. সূর্যবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র অজ। অজের পুত্র কে?

৩১. সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট ফেলুদার আসল নাম প্রদোষচন্দ্র মিত্র। ফেলুদার ঠিকানা কোথায়? বাংলাদেশের কোন গ্রামে ফেলুদাদের আদি বাড়ি ছিল?

৩২. বেলজিয়ামের ইপ্রেসের ক্লথ হলের অনুকরণে কলকাতায় কোন ইমারতটি তৈরি হয়েছিল ১৮৬২ সালে?

৩৩. সুন্দরবনে একটা প্রকাণ্ড শাল গাছে হিড়িম্ব নামে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস থাকত। তাকে হত্যা করে ভীম তার বোন হিড়িম্বাকে বিয়ে করেছিল। তাদের একমাত্র পুত্রের নাম ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচের একটি পুত্রের কথা মহাভারতে রয়েছে। অর্থাৎ যিনি কিনা ভীমের নাতি। তার নাম কী?

৩৪. প্রাচীন এই গ্রিক গণিতবিদদের জীবন সম্পর্কে বেশি জানা যায়

না। যুক্তির মৌলিক কিছু বিষয় এবং প্রাথমিক পর্যায়ের জ্যামিতির উপর 'এলিমেন্টস' নামে একটি বই লিখেছিলেন তিনি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রভাবিত করেছে এই বই। ইনি কে?

৩৫. কোন বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন রিনা প্রীতীশ নন্দী, যা প্রথমে প্রকাশিত হত 'ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্‌স' সংস্থা থেকে?

৩৬. 'খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গি এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কীসে।' 'বর্গি' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

৩৭. 'সোনার কেল্লা' ছবিতে ট্রেনে তোপসের হাতে টিনটিনের কোন বইটি দেখা গিয়েছিল?

৩৮. আমলকী বা ধাত্রীতে কোন অ্যাসিড থাকে?

৩৯. মোনালিসার ভুরুতে কোন রং ব্যবহার করা হয়েছে?

৪০. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউজের উপর যে ঘড়িটি আছে, তার নাম কী?

৪১. এই দেবীর বাহন হল একটি বিড়াল। ইনি মা রূপে পূজিত হন এবং

বিভিন্ন রূপে এঁর কোলে বা হাতে শিশুকে দেখা যায়। কে ইনি?

৪২. কোন ফল থেকে অতি সামান্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হয়, তাই তেজস্ক্রিয়তার একটি এককের নাম ওই ফল থেকে করা হয়েছে?

৪৩. কোন ফলকে প্রাচীন স্পেনে 'Pomi d'oro' বা সোনালি আপেল বলা হত?

৪৪. ১৯২০ সালে কঙ্গোর 'কিনশাসা' নামক জায়গাতে প্রথম কোন রোগের সন্ধান পাওয়া যায়?

৪৫. তাইল্যান্ডে 'হা হা হা' মানে কোন সংখ্যাকে বোঝানো হয়?

৪৬. 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'-তে যে মূর্তিটি দেখতে পাই, সেটি আসলে কোন রোমান দেবীর মূর্তি?

৪৭. ১৫৫৭ সালে রবার্ট রেকর্ড কোন গাণিতিক চিহ্ন আবিষ্কার করেন?

৪৮. 'হাইড্রক্সিঅ্যাপাটাইট' নামক খনিজটি কোন বিশেষ কারণের জন্য আমাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ?

৪৯. আমাদের কাছে ১৩ সংখ্যাটি অশুভ কিন্তু জাপানিদের কাছে কোন সংখ্যাটি অশুভ?

৫০. শ্রীলঙ্কায় কোন বিখ্যাত কার্টুন সিরিজটি 'চণ্ডী' নামে খ্যাত?

উত্তর

১. ইউনিসাইকেল।
২. এই গেমসে একজনও মহিলা খেলোয়াড় অংশ নেননি।
৩. ডবলিউ জি গ্রেস।
৪. সোনিয়া গাঁধী।
৫. পান্তা ভাত।
৬. শম্বরাসুর।
৭. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।
৮. অরণ্যদেব বা ফ্যান্টম।
৯. টমাস আলভা এডিসন।
১০. বিরাট কোহলি।
১১. শ্রেক।
১২. উইন্টার অলিম্পিক গেমসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি অংশ নেন।
১৩. এঁরা ২১ বার করে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছেন।
১৪. সুচিত্রা মিত্র।
১৫. প্রফুল্ল চাকী।
১৬. ন্যাকড়ার ফালি।
১৭. ডাবের জল।
১৮. চা পাতা।
১৯. কেনিয়া।
২০. চাঁদের বন্ধু সায়বেনে।
২১. সঞ্জয় দত্ত।
২২. ১৮৩৯ সালে রবার্ট কর্নেলিয়াস নামে ফিলাডেলফিয়ার ৩০ বছরের এক যুবক।
২৩. উদ্বোধন।
২৪. রাজিন্দর গোয়েল।
২৫. প্রথম কম্পিউটার মাউজ়।
২৬. বানর সেনা।
২৭. ঘামাচি।
২৮. ফারদিনান্দ ম্যাজেলান।
২৯. এলভিস প্রিসলে।
৩০. দশরথ।
৩১. ২১ রজনী সেন রোড, কলকাতা। সোনা দিঘি।
৩২. কলকাতা হাইকোর্ট।
৩৩. বর্বরিক।
৩৪. ইউক্লিড।
৩৫. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার লিখিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'।
৩৬. মরাঠা দস্যু।
৩৭. ল্যান্ড অফ ব্ল্যাক গোল্ড।
৩৮. অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।
৩৯. মোনালিসার ভুরু নেই।
৪০. বিগ বেন।
৪১. ষষ্ঠী।
৪২. কলা।
৪৩. টম্যাটো।
৪৪. এইচ আই ভি।
৪৫. ৫৫৫।
৪৬. লিবার্টাস।
৪৭. সমান চিহ্ন।
৪৮. এটি দাঁতের এনামেলের প্রধান উপাদান।
৪৯. চার।
৫০. ছোটা ভীম।

হ্যাংলাথেরিয়াম

নবনীতা দত্ত

বজবুড়োর মা চিলচিৎকার করে উঠলেন বুঁচকির মাকে দেখে, "ওই দ্যাখো, তোমার মেয়ে আমার রোদে দেওয়া আচারের শিশি থেকে সব আচার খেয়ে নিলে গো! সেদিন যখন বললাম তখন তো গা করলে না, এবার বিচার করো।" কোনও রকমে মহিলাকে থামিয়ে নতুন এক শিশি আচারের সামগ্রী তাঁকে কিনে দেওয়ার ভরসা দিয়ে ছাদ থেকে দুদ্দাড় করে নেমে এলেন বুঁচকির মা। কিন্তু মেয়ের সেদিকে হুঁশই নেই। সে মনের সুখে তখনও মুখের মধ্যে শেষ হয়ে আসা তেঁতুলের বিচি নিয়ে জিভ দিয়ে খেলা করছে।

এই শুরু হয়েছে এক নতুন উৎপাত। এমনিতেই ছেলেবেলা থেকেই খেতে ভালবাসে বুঁচকি। আর সেই খাবারগুলোই ওর প্রিয়, যেগুলো খেলে মা রেগে যান। বুঁচকির মুখ খুললেই চকোলেট, তেঁতুল, গুজিয়া, বাতাসা, পানের বোঁটারা সারাদিন উঁকিঝুঁকি মারে। আর এখন এই খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটাকে বুঁচকি পচাকাকার পরামর্শে রীতিমতো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। বুঁচকির পচাকাকাকে মনে আছে তো? যে প্রিন্স উইলিয়ামের ছেলের মুখেভাতে যেতে পারেনি বলে একটা সোনার মুকুট কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিয়েছিল, যার কাছে সচিন ব্যাটিং টিপস নেন, মারাদোনা কোচিং নেন, এ হল সেই পচাকাকা। পচাকাকা বলে খাওয়াদাওয়ার কোনও শেষ নেই। বিয়েবাড়ি বা নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে খেতে বসলে পচাকাকার আর উঠতেই ইচ্ছে করে না। সকলে যেখানে শেষপাতে মিষ্টি খায়, সেখানে পচাকাকা মিষ্টি খাওয়ার পরেও মাংস, ফিশফ্রাই নিয়ে আসতে বলে। পচাকাকা বলে, "কিছুতেই যে মন ভরে না, মনে হয় যেন মিষ্টির পরে নোনতা, নোনতার পরে মিষ্টি, তারপর আবার নোনতা, তারপর আবার মিষ্টি খেয়েই যাই।"

এহেন গুরুর তালিম পেলে শিষ্যর যে কী রকম উন্নতি হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভরপেট খেয়ে পড়তে বসলেও বুঁচকি খাবারের স্বপ্ন দ্যাখে। ভূগোল বই খুলে হয়তো সে সবেই পৃথিবীর আহিকগতি, বার্ষিক গতি পড়তে বসেছে, কিন্তু কিছু পড়ে ওঠার আগেই পৃথিবী থমকে যায়। তার জায়গায় বুঁচকির মাথার চারপাশে প্রদক্ষিণ শুরু করে দেয় কুসুমরঙা সূর্য। কেন জানি না, সূর্যকে দেখলেই ওর খালি ডিমের কুসুমের কথা মনে পড়ে যায়। পিকনিকে বা ঘুরতে গেলে সক্কাল-সক্কাল সিদ্ধ ডিমের কুসুমে নুন মাখিয়ে খাওয়ার কথা ভাবলেই ভূগোল পুরো গোল্লায় চলে যায়। ভূগোল বই গুটিয়ে তখন অঙ্ক নিয়ে বসে। কিন্তু অঙ্ক করতে বসে তিন লিখতে গেলেই তার প্যাঁচ আর শেষ হয় না। খাতাভর্তি জিলিপি এঁকে হাপুসনয়নে চেয়ে থাকে সে। রোববার সকালের আগে তো আর এই জিলিপি জুটবে না, রোববার করেই তো বাবা বাজার থেকে ফেরার পথে রামুকাকার দোকান থেকে রসে টইটম্বুর জিলিপিগুলো নিয়ে আসেন। জিলিপির প্যাঁচে অঙ্কগুলোও ঠিক জুতসই জায়গা করতে পারে না বুঁচকির খাতায়। বইপত্র গুটিয়ে সে আম্মার কাছে গিয়ে বসে গল্প শুনতে। আম্মার কাছে রামায়ণের গল্প শুনতে বসে সীতা থেকে সোজা সীতাভোগে চলে যেতে দু'মিনিট সময় লাগে না ওর। এই ভাবা পর্যন্ত ব্যাপারটা থেমে থাকলে না হয় হত। কিন্তু ওই যে বললাম ব্যাপারটাকে বুঁচকি পুরো শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে কেউ এলেই তাদের প্লেটটা দূর থেকে জুলজুলু চোখে মেপে নেয়। তারপর অতিথি-অভ্যাগতদের হাত ঘুরে প্লেট ফিরে এলেই সেই প্লেটের সঙ্গে ফিরে আসা শোনপাপড়ি, গোলাপজামগুলো টপাটপ মুখে পুরে দেয় সে। বাড়িতে কেউ চা খেয়ে কাপ নামিয়ে রাখামাত্র চোঁ চোঁ চুমুক সেই কাপে। ফ্ল্যাটের ছাদে কারও আচার আর পুরোপুরি শুকিয়ে তার ঘরে ফিরতে পারে না, বুঁচকি আর তার খুদে বাহিনী দুপুরে সতর্ক ও অতর্কিত আক্রমণ করে সেই আচারের উপর। বুঁচকিকে নজরে-নজরে রাখতে নাজেহাল তার মা। তবুও কোনও লাভ হচ্ছে না। বুঁচকি আবার ওর বন্ধুদের অর্থাৎ মিঠি, বাপটু, চিকুদের সঙ্গে নতুন ফন্দি এঁটেছে। রোববার-রোববার ওদের ফ্ল্যাটের কারও না-কারও বাড়িতে মাংস রান্না হবেই হবে। ওরা বন্ধুরা মিলে ঠিক করেছে আগে থেকে জানতে হবে কাদের বাড়ি মাংস হচ্ছে। তা হলে সেই রোববার তাদের বাড়িতে গিয়েই খেলানাবাটির বাক্স খুলতে হবে। দুপুরবেলা পর্যন্ত তো খেলা গড়াবেই, আর দুপুর হলেই বাটি করে হাজির হবে গরম-গরম মাংসের ঝোল আর মাংসের আলু। প্ল্যানমাফিক ওদের দলের পেটপুজো ভালই চলছিল। শুধু সমস্যা হয় তখন, যখন কোনও রোববার একসঙ্গে দুটো বাড়িতে মাংস রান্না হয়। তখন ওরা ঠিক করে উঠতে পারে না, কোন কাকিমার মাংসটা বেশি ভাল হবে। সে সমস্যার সমাধান অবশ্য পচাকাকা গন্ধ শুঁকে করে দেয়। তবে সব মাংস ফেল মেরে যায় যখন ওদের পাশের বাড়ির উনুনে মাংসের ঝড়াই চাপে। মাসখানেক হল ওদের পাশের বাড়িটা বিয়েবাড়ি হিসেবে ভাড়া দেওয়া শুরু করেছে। আর বিয়ের দিনগুলোতে ছাদ থেকে খুদে-খুদে চার-পাঁচটা মাথা উঁকি দিয়ে হাপুসনয়নে তাকিয়ে থাকে ওই বাড়ির পিছন দিকের উনুনে বসা বিশাল কড়াইগুলোর দিকে। সকাল থেকে মাংসে মশলা মাখিয়ে কড়াইতে ছেড়ে কষে-কষে রান্না হয়। ফিশফ্রাইগুলো মশলা মেখে লেপটে পড়ে থাকে। বিকেলে ঠিক ওদের খেলার সময়ই ফিশফ্রাইগুলো কড়াইয়ের তেলে স্নান করে কড়মড়ে হয়ে ওঠে। বাপটুর খুব রাগ ওদের উপর, "পাড়ার মধ্যে কেন বিয়েবাড়ি ভাড়া দেয় বল তো? পুলিশ ডেকে এসব বন্ধ করে দেওয়া উচিত।" মিঠি আবার ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ ভেঙিয়ে বলে, "উঁ! পাশাপাশি বাড়িতে বিয়ে হলে একটু নেমন্তন্ন করতে পারে না বাপু!" বুঁচকি ঢোক গেলে, "না হয় না-ই ডাকল, একটা বাটিতে করে তো ক'টা ফিশফ্রাই পাঠিয়ে দিতে পারে। আমাদের বাড়িতে ভাল কিছু হলে মা তোদের বাড়িতে পাঠান না বল?" কিন্তু সে গুড়ে বালি। উপর থেকে মহাযজ্ঞ দেখেই ওদের ফিরে আসতে হয়। তবে আপাতত বুঁচকির সব ভাল লাগা বন্ধ। ক'দিন ধরে উলটোপালটা খেয়ে পেটের ভিতরের দুষ্ট দৈত্যগুলো খুব রেগে গিয়ে পেটে কামড়ে দিয়েছে ওকে। তাই ডাক্তারকাকুর কথামতো মা এখন বুঁচকির সব খাবার বন্ধ করে দিয়েছেন। আপাতত শুধু খাবারের ছবি আর স্বপ্ন দেখেই কাজ চালাতে হচ্ছে। কারণ, খাবারের পাতে জুটছে কেবল করলা সিদ্ধ আর মাছের ঝোল, ভাত। আর এই ক'দিনই যেন আশপাশের সব বাড়িতে ভাল রান্না হচ্ছে। লুচি ভাজার গন্ধ, কষা মাংসের গন্ধ, ডিম ভাজার গন্ধ দিয়ে এই করলাসিদ্ধ আর ট্যালট্যালে ঝোল-ভাতই খেতে হচ্ছে বুঁচকিকে। তার সঙ্গে সকাল-সন্ধে জুটছে বিস্বাদ কিছু তেতো ওষুধ। মা অবশ্য বলেছেন, তেতো ওষুধ সব আজকেই শেষ। কিন্তু বাইরে

বা ভাল খাবার খাওয়া এখনও বন্ধ। আর এর মধ্যেই আবার বাপটুর জন্মদিন পড়েছে। এবার বাপটুর সাত বছরের জন্মদিন, ওদের সব বন্ধুদের যেতে বলেছে। কিন্তু কালকের মধ্যে কি ওর পেটের দৈত্যগুলো সব মরবে? না হলে মা যে যেতে দেবেন না বাপটুদের বাড়িতে। আগের বছর মিঠির জন্মদিনে কত কী খেয়েছিল ওরা, কেক, চকোলেট, ঠান্ডা শরবত, তারপর ফুলকো-ফুলকো লুচি আর ইয়াব্বড় আলু দেওয়া মাংসের ঝোল। ভোদাই আবার এত আলু খেয়ে ফেলেছিল যে মাংস খেতে পারেনি, কাল যে কী হবে!

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতেই বারান্দা থেকে মিঠি বুঁচকিকে ডাকল, "আই বুঁচকি, সন্ধেবেলা বাপটুদের বাড়ি কখন যাবি?" বুঁচকি সময়টা ভেবে বলার আগেই মা পিছন থেকে বারান্দায় জামাকাপড় মেলতে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুঁচকি আজকে যাবে না। ওর পেটে দৈত্য ঢুকেছে। ডাক্তারকাকু নেমন্তন্ন খেতে বারণ করেছেন তো।

মিঠি তাও নাছোড়, "নেমন্তন্ন খেতে বারণ করেছে তো কী হয়েছে, নেমন্তন্ন বাড়ি যেতে তো বারণ করেনি।"

মনে-মনে সে ভাবছে সন্ধেবেলা একসঙ্গে খেলাটা তো অন্তত হবে। ওদিকে বুঁচকির একে রাগ হচ্ছে মায়ের উপর তাকে যেতে দেবে না বলে আর মিঠির কথা শুনে তো রাগ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। নেমন্তন্ন না খেলে কেউ নেমন্তন্ন বাড়ি যায়! তা হলে আর সে নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে কী করবে? সকলের লুচি-মাংস খাওয়া দেখবে? কোথায় মিঠি তার মাকে রাজি করবে তাকে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার জন্য, তা না, খালি উলটো কথা। মিঠি কি ওর বন্ধু না শত্রু! বুঁচকির মা ঘরে চলে গেলে পরে মিঠি ওর বাহারি জামা এনে দেখাল যেটা ও সন্ধেবেলা পরে যাবে। কিন্তু সেসব দিকে বুঁচকির মন নেই। তার এখন চিন্তা সন্ধেবেলা বাপটুদের বাড়ি কী করে পৌঁছনো যায় সেই নিয়ে। মিঠি ঘরে চলে গেলে সে এসে পড়তে বসল। আজকে ছুটির দিন, তাই বাবার কাছে অঙ্ক কষতে বসবে। ছুটির দিনগুলো সে বাবার কাছেই পড়তে বসে। দু'-একটা সরল কষতে না-কষতেই মাংস কষার গন্ধ এসে লাগল নাকে, আর সব সরল নিমেষে জটিল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই বাপটুদের বাড়িতে এসব রান্না হচ্ছে আজকে সন্ধেবেলার জন্য। বাবার কাছে আদুরে গলায় তার আবদার শুরু হল, "বাবা, আজ বাপটুর জন্মদিন, আমি যাব তো?"

বাবাও নির্বিকার, "যাবে তো! নিশ্চয়ই যাবে। বন্ধুর জন্মদিনে বন্ধু যাবে না, তা কখনও হয়!"

"কিন্তু মা যে বলেছে আমি আজ বাপটুদের বাড়িতে কিছু খেতে পারব না।"

"হ্যাঁ, সেটাও ঠিক। আজ ওদের বাড়িতে তোমার খাওয়া হবে না। আমার সঙ্গে আজ বাপটুদের বাড়ি গিয়ে ওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে উপহার দিয়ে আবার আমার হাত ধরে চলে আসবে।"

বুঁচকির চোখ ফেটে জল চলে আসছে। যে বাবা তার সব কথায় সায় দেন, বুঁচকির সব কথা শোনেন, সেই বাবাও কেন আজ মায়ের দলে চলে গেলেন বুঝে উঠতে পারছে না সে। দুপুরবেলা আবার সেই করলাসিদ্ধ আর কাঁচকলা দেওয়া মাছের ঝোল খেতে হয়েছে তাকে। সন্ধে হতে না-হতেই সারা বাড়িতে হইচই পড়ে গিয়েছে টের পাচ্ছে সে। আর আজকেই যেন সবাই ওদের ঘরের সামনে দিয়ে বারেবারে যাতায়াত করছে। মিঠি, চিকু, পাপড়িদি, পাপাইদারা সব সুন্দর-সুন্দর জামাকাপড় পরে ওদেরই ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে দুদ্দাড় করে নেমে যাচ্ছে বাপটুদের ফ্ল্যাটে। বন্ধ কোলাপসিব্‌ল গেটের ওপাশ থেকে জ্বলজ্বলে চোখে তাই দেখছে বুঁচকি। মিঠি আবার সন্ধেবেলা ওদের বাড়িতে এসে ওর সাজগোজ দেখিয়ে গেল। সকালবেলা দেখানো জামাটার সঙ্গে কেমন ম্যাচিং হেয়ারব্যান্ড আর জুতো পরেছে, বাপটুর জন্য কেমন উপহার কিনেছে সব দেখাল।

আর এসব দেখার সঙ্গে-সঙ্গে ফিশফ্রাই আর কষা মাংসের গন্ধে ঘর-বাড়ি ম-ম করছে টের পেল বুঁচকি। সে যেন এবার কেঁদেই ফেলবে। কোনও রকমে ওর চোখের জল আটকে একটা ভাল জামা পরে নিল সে। বাপটুর জন্য কেনা গিফ্‌ট বগলদাবা করে বাবার হাত ধরে সে এসে দাঁড়াল বাপটুদের ফ্ল্যাটের দরজায়। বুঁচকি ঠিক করেই এসেছে যে, সে কারও খাবারের প্লেটের দিকে তাকাবে না। তাতে তার আরও কষ্ট হবে। সোজা গিয়ে বাপটুকে গিফ্‌ট দিয়েই চলে আসবে। কিন্তু তা কি আর হয়? বাপটুদের ঘরে ঢুকতেই সকলের আগে টেবিলে সাজানো প্লেটগুলোতে চোখ চলে গেল। একী! এখানে তো ঘুগনি, কেক, মিষ্টি, প্যাটিস। বেশির ভাগই তো দোকানের খাবার। তা হলে সকাল থেকে যে এত কষা মাংস আর ফিশফ্রাইয়ের গন্ধ পেল, সেগুলো গেল কোথায়!

ইতিমধ্যে বাপটুর মা বেরিয়ে এলেন ভিতর থেকে, "আসুন, আসুন, বাপটুকে আশীর্বাদ করে যান। আর আজকের দিনে একটু মিষ্টিমুখ তো করতেই হবে।"

বুঁচকির বাবা তড়িঘড়ি বারণ করলেন, "না, না, ওসব অন্য একদিন হবে। আজ একেবারে পারব না বউদি।"

"ওমা! সেকী! তা কখনও হয় নাকি? আজ শুভদিনে এসেছেন, একটু কিছু মুখে দেবেন না?"

"আজকে ছেড়ে দিন। আজ আমার এক বন্ধুর বোনের বিয়ে। আমাদের এই পাশের বিয়েবাড়িটাই ভাড়া নিয়েছে ওরা। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ওখানে তো যেতেই হবে। বুঁচকির বন্ধুর আজকে জন্মদিন, ওকে একবার শুভেচ্ছা জানাবে না? তাই ওকে নিয়ে এলাম। আমরা এখুনি চলে যাব।"

এই! আজকে সে বিয়েবাড়ি যাবে। বুঁচকির চোখ চকচক করে উঠল আনন্দে। বাপটুকে 'হ্যাপি বার্থডে' বলে গিফ্‌ট দিয়েই ছুটে চলে এল সে বাবার পাশে, "চলো বাবা, আমার হয়ে গিয়েছে।"

সেদিন সন্ধেবেলা মা-বাবার সঙ্গে বিয়েবাড়ি গিয়ে বুঁচকি সকাল থেকে পাওয়া মাংস আর ফিশফ্রাইয়ের গন্ধগুলো ভাল করে মিলিয়ে নিচ্ছিল জিভের স্বাদে। তবে পাচাকাঁচার মতো মিষ্টির পর মাংস, মাংসের পরে মিষ্টি ব্যাপারটা অবশ্য বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। শিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করতে গেলে আরও অধ্যবসায় প্রয়োজন আছে বইকী!

ছবি: দেবাশিস দেব

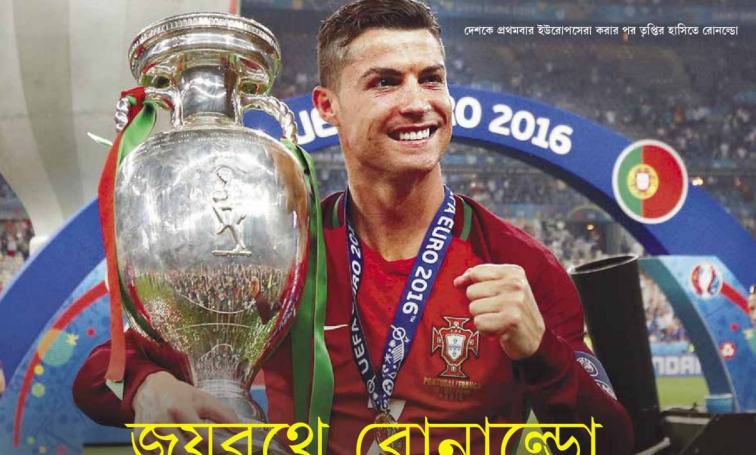

দেশকে প্রথমবার ইউরোপসেরা করার পর তৃপ্তির হাসিতে রোনাল্ডো

জয়রথে রোনাল্ডো

ক্লাব কিংবা দেশ, গত এক বছরে একের পর-এক ট্রোফি জিতে চলেছেন পর্তুগালের গোল মেশিন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

জয়দীপ চক্রবর্তী

সেটা ২০০৩ সালের ৬ অগস্ট। পর্তুগালের রাজধানী শহর লিসবনে পুরনো এক স্টেডিয়াম সংস্কারের পর নতুন করে উদ্বোধন হবে সেদিন। উদ্বোধনী ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে সেদেশের সেরা এক ফুটবল ক্লাব স্পোর্টিং ক্লব দ্য পর্তুগাল। স্টেডিয়ামটির নাম এস্তাদিউ হোসে আভালদ। যা স্পোর্টিংয়ের নিজস্ব স্টেডিয়াম। প্রি-সিজ়িন ম্যাচ প্র্যাকটিসে আমেরিকায় পরপর তিনটি ম্যাচ জিতে এসেছে ম্যান ইউ। কিন্তু সেদিন স্পোর্টিংয়ের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল ম্যান ইউ। ম্যাচে সবুজ-সাদা ডোরাকাটা ১৮ বছরের একটি ছেলে ২৮ নম্বর জার্সি পরে খেলেছিল। গোটা স্টেডিয়াম ম্যাচ শেষে তার নাম ধরে চিৎকার করছে। ম্যান ইউয়ের খেলোয়াড়ও তাঁকে নিয়ে কথা বলছেন। অথচ ম্যাচে তিনি কিন্তু কোনও গোল করেননি। কেবল দু'টি জোরদার শটে বিপক্ষের বিশ্বজয়ী গোলকিপার বার্থেজ়কে কাঁপিয়ে দিয়েছেন। ম্যান ইউয়ের কিংবদন্তি কোচ স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন আর দেরি করেনি। স্পোর্টিংয়ের ১৮ বছরের সেই 'গরম প্রতিভা'কে দেড় কোটি পাউন্ডে সই করালেন নিজের ক্লাবে। শুরু হল ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো দোস স্যান্তোস অ্যাভাইরোর জয়যাত্রা।

উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের ম্যাদাইরা দ্বীপ পর্তুগালের অংশ। সেই দ্বীপের সান্ত অ্যান্তোনিও শহরে ১৯৮৫ সালে পাঁচ ফেব্রুয়ারি রোনাল্ডোর জন্ম। চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বাবা দিনিস অ্যাভাইরো স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি আর স্থানীয় ক্লাব আন্দোরিনায় মালির কাজ করতেন। তিনি আবার তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের ভক্ত। তার নামেই ছেলের নাম রাখেন রোনাল্ডো। মা মারিয়া রান্নার কাজ করতেন। খুবই কষ্টের সংসার ছিল তাঁদের।

এই শহরে মাত্র চার বছর বয়সে ফুটবলের সঙ্গে পরিচয় হল খুদে রোনাল্ডোর। বাবা মাঠে যেতেন কাজে। সঙ্গে-সঙ্গে খুদে রোনাল্ডোও যেত। বড়দের দেখে-দেখে পায়ে বল নিয়ে কাটানোর চেষ্টা করত। সারাক্ষণ বল পায়ে নিয়ে দাপাদাপি চলত। লেখাপড়ায় কোনওদিনই মন তেমন ছিল না। কেবল ফুটবল আর ফুটবল! স্নান, খাওয়া, ঘুম ভুলে কেবল খেলা। সুযোগ পেলেই বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে, জানলা দিয়ে লাফ মারতেন। তারপর সোজা মাঠ। তখন থেকে ফুটবলই খুদে

রোনাল্ডোর ধ্যান-জ্ঞান।
বয়স যত বাড়তে থাকল, ফুটবলের প্রতি টানও বেড়ে গেল রোনাল্ডোর। আট বছর বয়সে বল পায়ে তাঁর জারিজুরি

তরুণ রোনাল্ডোর প্রতিভা চিনতে ভুল করেননি ফার্গুসন

দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন বড়রাও। এই সময় আদোরিনার জুনিয়র দলে খেলতে শুরু করল রোনাল্ডো। দু'বছর সেখানে কাটানোর পর যোগ দিল 'ন্যাসোনাল' দলে। স্থানীয় লিগে চ্যাম্পিয়ন করলেন ন্যাসোনালকে। ততদিনে ছোট্ট রোনাল্ডোর প্রতিভা একটু-একটু করে প্রচার পাচ্ছে। তখন আদোরিনা ক্লাবে রোনাল্ডোর বাবার পরিচিত ফুটবলার ফারনাও সোজের পরামর্শে দেশের রাজধানী শহর লিসবনে চলে গেল রোনাল্ডো। সেখানে স্পোর্টিং ক্লব দ্য পর্তুগালে ট্রায়াল দিল সে। কিন্তু সেই শহর ভাল না লাগায় আবার ম্যাদাইরায় ফিরে এল রোনাল্ডো। এবারও অভাবের সংসারে রোজগার তো করতে হবে। কিন্তু করবেটা কী? লেখাপড়া করেনি, ফুটবল ছাড়া আর তো কিছু পারে না সেই কিশোর। তাই মন শক্ত করে পরের বছর আবার গেল লিসবনে। এবারে স্পোর্টিংয়ের আকাদেমিতে ট্রেনিংয়ের সুযোগ পেল সে। সেটা ১৯৯৭ সাল। মাত্র ১২ বছর বয়স তখন রোনাল্ডোর। ২০০৩ পর্যন্ত এই ক্লাবে ছিলেন রোনাল্ডো। ক্লাবকে পর্তুগালের জাতীয় লিগে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। এখান থেকেই ম্যান ইউয়ে খেলার জন্য ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে এসে কোচ স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসেনের নির্দেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ২৮ ছেড়ে সাত নম্বর জার্সি পরা শুরু করেন রোনাল্ডো। ১৫ বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ে ক্লব দ্য পর্তুগালে খেলার সময়ই রোনাল্ডোর হার্টে একটা রোগ ধরা পড়ে। যার নাম 'রেসিং হার্ট'। এই রোগে হার্টবিট খুব বেড়ে যায়। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে এতে অসুবিধে থাকে। ফলে রোনাল্ডোর ফুটবলজীবনই তখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যায়। তবে মায়ের সম্মতিতে, হার্টের অপারেশনের পর আবার সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরে আসে রোনাল্ডো। খেলোয়াড় জীবনে এক বিশ্বকাপ ছাড়া সব ট্রোফিই তাঁর দখলে। ক্লাব হোক কিংবা জাতীয় দল তাঁর সাফল্যে কোনও খাদ নেই। বিশ্ব সেরা ফুটবলারের তকমা জুটেছে চারবার, ব্যালঁ দি ওর চারবার। দেশকে প্রথমবার ইউরোপসেরা করেছেন গত বছর। দেশের হয়ে, ক্লাব রিয়ালের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ডও তাঁর নামে। সব মিলিয়ে ৩২ বছরের রোনাল্ডোর দলগত এবং ব্যক্তিগত সাফল্য উন্নাসিক পর্বতশৃঙ্গকেও লজ্জায় ফেলে দেবে। ছেলেবেলায় আদোরিনায় খেলার সময় রোনাল্ডোকে 'ছিঁচকাঁদুনে', 'অ্যারেলিনা' (মৌমাছি) বলে খ্যাপাত সতীর্থরা। এগুলো বলার কারণ ছিল। বল পায়ে পড়লে মৌমাছির মতো ভোঁ ভোঁ করে বিপক্ষকে কাটাতে-কাটাতে এগিয়ে যেত খুদে রোনাল্ডো। কিন্তু পা থেকে বল কেড়ে নিলে, গোল করতে না পারলে কিংবা ম্যাচের মাঝে যদি তাকে বসিয়ে দেওয়া হত, তখন চোখে জল চলে আসত। এসব অবশ্য এখনও পিছু ছাড়েনি। তাই তারকা হয়েও হতাশা, দুঃখে চোখের জল লুকোতে পারেন না আবেগপ্রবণ রোনাল্ডো। বল নিয়ে এখনও দুরন্ত দৌড়ে বিপক্ষকে কাটিয়ে বেরিয়ে যান, তেমনই মাঠের মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঠিক যেমন, গত ইউরো কাপের ফাইনাল। ম্যাচে ২৪ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় রোনাল্ডোকে। চোখের জল মুছতে-মুছতে মাঠ ছাড়েন তিনি। ২০০৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও এমনটা হয়েছিল। ৩৪ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। সেই ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল পর্তুগাল। দুটো ম্যাচে একই প্রতিদ্বন্দ্বী, ফ্রান্স। এবার কি তবে ফাইনালেও হার দেখতে হবে? কিছু করতে না পারার যন্ত্রণায়, আশঙ্কায়, হতাশায়, সেদিনও চোখের জল বাঁধ মানেনি। সাইডলাইনের ধারে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ তিনি দলকে উদ্বুদ্ধ করে যান। অতিরিক্ত সময়ের একমাত্র গোলে সেই ফাইনাল জিতে নেয় পর্তুগাল। ইতিহাস বদলে গেল সেদিন। বস্তুত ২০০৩ সাল থেকে রোনাল্ড জাতীয় দলে খেলছেন। তারপর এত বছরে মাত্র এই দু'টি ম্যাচেই তাঁকে খেলার মাঝে মাঠ ছাড়তে হয়েছে।

জার্ণালিজমে কি রিয়ালেই খেলবেন না অন্য কোথাও?

২০১৮ পর্যন্ত রোনাল্ডোর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে রিয়ালের। শোনা যাচ্ছে, তিনি দল ছাড়তেও পারেন। তবে যেখানেই তিনি খেলুন, সি আর সেভেন নামের আগুনে বিপক্ষ দলগুলো যে আরও কয়েক বছর ঝলসে যাবে তা নিশ্চিত।

হার্দিক পাণ্ড্য

হৃদয়ে হার্দিক

ভারতীয় দলের এই ক্রিকেটারের উত্থান হার মানায় রূপকথার গল্পকেও।

স্বর্ণাভ দেব

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বাবার হাত ধরে নামজাদা ক্রিকেটারের আকাদেমিতে যাওয়া এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরেও সেই আকাদেমিতেই সুযোগ... এমন কথা বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু এমনই ঘটেছিল হার্দিক পাণ্ড্যর সঙ্গে। বাবা হিমাংশু দুই ছেলে হার্দিক ও ক্রুনালকে নিয়ে গিয়েছিলেন কিরণ মোরের আকাদেমিতে। আকাদেমির নিয়ম ছিল, ১২ বছরের কমবয়সিদের ভর্তি নেওয়া হবে না। কিন্তু হিমাংশুর নাছোড় মনোভাবে কিরণ মোরে রাজি হয়েছিলেন হার্দিককে একবার নেটে প্র্যাকটিসের সুযোগ দিতে। কিছুক্ষণের নেট সেশনের পরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নিয়মের গেরোয় কী ভুলই না করতে চলেছিলেন। একরত্তি দামাল ছেলের দুরন্ত ক্রিকেট প্রতিভাকে চিনে নিতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। সেদিনই আকাদেমির ভর্তির নিয়ম পালটে ফেলেছিলেন কিরণ। কিন্তু ব্যয়বহুল আকাদেমিতে স্বল্প মাইনের চাকুরে হিমাংশু ছেলেকে ভর্তি করবেন কী করে? সেখানেও এক ব্যতিক্রম! হার্দিকের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতেই যেন প্রথম তিন বছর বিনামূল্যে কোচিং করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিরণ। শুধু যে ক্রিকেট

ভাই দি এন বৌদি হাতে সচিন ও দাদা ক্রুনালের সঙ্গে

খেলার জন্য হার্দিকের উপর সবার নজর পড়েছে তা ঠিক নয়। তার পাশাপাশি রয়েছে তাঁর নাটকীয় হাবভাব। দুমদাম মন্তব্য করার ঝোঁক। অনেকেরই হয়তো মনে পড়ে যাচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির ফাইনালে রবীন্দ্র জাডেজার ভুলে রান আউট হয়ে ফেরার দৃশ্যটা। তারপরে সোশাল মিডিয়ায় হার্দিকের টুইটটাও ভোলার নয়। স্বভাবতই এমন কাজের জন্য কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি তাঁকে। কিন্তু প্রতিভার জোরে ঢেকে যেত সেসব খুঁত। এ যেন বাবার ক্রিকেটপ্রেমকে ছেলের শ্রদ্ধার্ঘ্য। শুধু ছেলের কেরিয়ারের কথা ভেবেই কাজকর্ম শিকেয় তুলে সুরাত থেকে বরোদায় চলে এসেছিলেন হিমাংশু। পরিবারে টাকাপয়সার অভাব থাকলেও দু' ছেলের ক্রিকেট প্রতিভাতেই সমস্ত কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন তিনি। বিশেষত, ক্রিকেটে মন দিতে গিয়ে হার্দিক যখন নবম শ্রেণির পর লেখাপড়া ছাড়লেন, তখনও বাবা-মা আস্থা হারাননি ছেলের উপর। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, জীবনের সব ব্যাপারে তো কেউ সেরা হতে পারে না। হার্দিক লেখাপড়ায় ভাল না হলেও ক্রিকেটটা ঠিকমতো খেলতে পারলে জীবনে অনেকটাই এগোতে পারবে। কিছুদিন পরে পরিবারের একমাত্র রোজগেরে হিমাংশু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকল যে, সারাদিনে একবেলা খাবার জোটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতেও দমানো যায়নি হার্দিককে। হাজার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সফল হয়েছেন ২৪ বছরের এই অলরাউন্ডার। প্রথাগত ব্যাটসম্যান বা দুর্ধর্ষ বোলার কখনওই ছিলেন না হার্দিক। কিন্তু আধুনিক সময়ে সীমিত ওভারের ফরম্যাটে হার্দিক দুরন্ত। যিনি স্লগ ওভারে দ্রুত রান তুলতে পারেন। হার্দিকের মারগুলো দৃষ্টিনন্দন না হলেও তিনি যেভাবে বল হাঁকান বাউন্ডারির বাইরে, তাতে কখনও-কখনও বিভ্রম জাগে বইকী! অন্য দিকে বোলিংয়েও নিজের অবদান রাখতে সক্ষম হার্দিক। জাতীয় দলে শুরুর দিকে (টি২০) বোলিংয়ে তেমন একটা সাফল্য না থাকলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির মাঝে ভারতীয় দলের সতীর্থদের সঙ্গে

বোলিং দক্ষতাকে আরও পরিমার্জিত করেছেন তিনি। বলের গতি বাড়িয়ে প্রতি ঘণ্টায় ১৪০ কিমি-র উপরে নিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে নিখুঁত লাইন লেংথে বলও করতে শুরু করেছেন তিনি। যার ফল মিলেছে রাতারাতি। এর সঙ্গে হার্দিকের ফিল্ডিং-দক্ষতা যোগ করলে যে কোনও দলেই তিনি হয়ে উঠতে পারেন সম্পদ। ফাস্ট বোলার অলরাউন্ডার বরাবরই দুর্লভ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে। কপিল দেবের পর ইরফান পাঠান চেষ্টা করলেও তেমন সফল হননি। সেই ঘাটতিই যেন পূরণ হল হার্দিকের সুবাদে। তবে তাঁর পেস বোলিং শুরুর কাহিনিও বেশ ইন্টারেস্টিং। শুরুর দিকে লেগ স্পিন করতেন হার্দিক। হঠাৎ একদিন আকাদেমির ম্যাচে একজন ফাস্ট বোলার কম পড়ছিল। সেই ম্যাচে কোচের নির্দেশে ফাস্ট বোলিং করেছিলেন হার্দিক। সাত উইকেট নিয়ে চমকেও দিয়েছিলেন সকলকে। তারপর থেকেই স্পিন ছেড়ে নিয়মিত ফাস্ট বোলিং শুরু করেন হার্দিক। তবে হার্দিককে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে পৌঁছে দিয়েছিল ঘরোয়া ক্রিকেটের একটি ম্যাচ। মুম্বইয়েরই বিরুদ্ধে ৫৭ বলে ৮২ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। সেই ম্যাচে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং জন রাইট (তখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ)। পরে রিকি পন্টিংও হার্দিকের ধুন্ধুমার ব্যাটিংয়ে এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ৫০ জনের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছিলেন এই স্পেশ্যাল ট্যালেন্টকে। বছরদুয়েক আগেও মাত্র ৪০০ টাকাতেও যে বরোদার প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলে বেড়িয়েছেন, কোটিপতি লিগে তাঁর অন্তর্ভুক্তিকে রূপকথা ছাড়া আর কীভাবে বর্ণনা করা যায়! আই পি এল ডেবিউয়ের দু'বছর আগেও নিজের কোনও ব্যাট ছিল না হার্দিকের। টিমমেটদের থেকে ধার করতেন। সেই আফশোস মেটাতেই হয়তো এখন তাঁর কিট ব্যাগে রয়েছে আটটি ব্যাট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি২০-তে ডেবিউয়ের পরে ভারতীয় দলে নিয়মিত হার্দিক। এমনকী প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরার শিরোপাও পেয়েছেন। এ-ও তো ভারতীয় ক্রিকেটে দুর্লভ। আশা করা যায়, হার্দিকের খেলায় সমৃদ্ধ হবে ভারতীয় ক্রিকেট। একই সঙ্গে দারিদ্রের মোকাবিলা করে হার্দিকের উত্থানকাহিনিও প্রেরণা হয়ে উঠবে উঠতি ক্রিকেটারদের কাছে।

মাঠে অপ্রতিরোধ্য সর্দার

স্টিক হাতে সর্দারি

ভারতীয় হকির মুখ বলতে এঁকেই বোঝায়। দুর্দান্ত খেলোয়াড়, অসাধারণ অধিনায়ক সর্দার সিংহ রন্ধ্রে-রন্ধ্রে একজন যোদ্ধা।

ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়

সর্দার কাকে বলে? নেতা, অধিনায়ক, তাই না? যাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে বাকিরা, অনুসরণ করে। হকির মাঠে আছেন এমনই এক সর্দার। ক'জনেরই বা বাবা-মা'-র দেওয়া নাম 'সফল' হয়? হকির মাঠে এই সর্দারের ক্ষেত্রে কিন্তু নাম আর কাজ একেবারে হুবহু মিলে গিয়েছে। বলা হচ্ছে সর্দার সিংহর কথা। একটি কথা শুরুতেই বলে দেওয়া যেতে পারে, ধনরাজ পিল্লাইয়ের পর ভারতীয় হকিতে এত বড় আইকন আর আসেনি। নিঃসন্দেহে এখনও ভারতীয় হকির মুখ তিনিই। আর তার প্রধান কারণ কিন্তু হকিস্টিক হাতে তাঁর পারদর্শিতা নয়। বরং টার্ফে নেতা হয়ে ওঠার গুণই।

হরিয়ানার রানিয়ায় সর্দারের জন্ম যখন, বছরতিরিশ আগে সেসময়ই শেষবার অলিম্পিক্স মেডেল জেতে ভারতীয় হকি দল। সেই অনুপ্রেরণাতেই খেলা শুরু সর্দারের। ভারত আর মেডেল পায়নি। কিন্তু সর্দারের ভিতরের আগুনটা তৈরি করে দিয়েছিল। একদিন ভারতকে হকিতে নেতৃত্ব দিতে হবে অলিম্পিক্সে আর-একটা অলিম্পিক্স মেডেল জয় করতেই হবে। ২০০৬ সালে ভারতীয় দলে ডাক পান সর্দার। গতিসম্পন্ন মিডফিল্ডার, খেলতে পছন্দ করেন সেন্টার হাফে। স্টিকের কন্ট্রোলও দারুণ। এই পোজিশনে খেলায় একটা স্বাভাবিক নেতৃত্ববোধ কাজ করে। সেন্টার হাফের ভূমিকা, মাঠের চার দিকে খেলাটা ছড়িয়ে দেওয়া। আক্রমণে বল বাড়ানো, দরকার মতো উঠে গোল করা, আবার নেমে এসে রক্ষণের প্রথম দেওয়াল গড়ে তোলা। নেতৃত্বসূচক পোজিশনে খেলার জন্য

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে

সর্দারের চরিত্রও ছিল মানানসই। সহজাত অধিনায়ক যাকে বলে, একেবারে তাই ছিলেন তিনি। আর এর ফলে, ২২ বছর বয়সে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরেন সর্দার। এত অল্প বয়সে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়কত্ব করেননি কেউই। অধিনায়কত্ব যেন সর্দারের খেলার ধার বাড়িয়ে দিয়েছিল আরও। সেসময়ে হকিতে ভারতের অবস্থা রীতিমতো টিমটিমে। হারতে থাকা দলের প্রধান স্তম্ভ, মনোবলের প্রধান উৎস হিসেবে জ্বলে ওঠেন সর্দার। ২০১০-'১১, পরপর দু'বছর আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের বাছাইয়ে অল স্টার দলে নাম তোলেন তিনি। একটি বেলজিয়াম ক্লাবের হয়ে খেলেন, পরের বছর খেলেন একটি ডাচ ক্লাবের হয়ে। হকিতে কিন্তু এই দু'টি দেশ রীতিমতো হেভিওয়েট। সম্ভবত এসব দেশে খেলার জন্যই সর্দারের খেলাতেও একটি পেশাদারিত্বর ছোঁয়া আসে। এর পরই তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় হকি দল জিততে শুরু করে একের পর-এক টুর্নামেন্ট। দু'টি কমনওয়েলথ গেমসে রুপো, এশিয়ান গেমসে সোনা জেতে। বেশ কিছু টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন সর্দার। ২০১২-য় পান অর্জুন পুরস্কার। ২০১৩ সালে হকি ইন্ডিয়া লিগ শুরু হয়। এত অর্থ, এত জাঁকজমক, এত বিদেশি খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ আগে দেখেনি ভারতের হকি জনতা। অনেকের মতে, ভারতের সাম্প্রতিক ভাল ফর্ম এই লিগের কারণেই। হকি ইন্ডিয়া লিগের প্রথম এডিশনে মার্কি প্লেয়ার হিসেবে সর্দারকে কেনে 'দিল্লি ওয়েভরাইডার্স'। দাম ওঠে ৪২.৪৯ লক্ষ টাকা। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন সর্দার। এই মুহূর্তে 'পঞ্জাব ওয়ারিয়র্স'-এর অধিনায়ক তিনি।

কিন্তু এত গল্প থাকলেও, আসল স্বপ্নটা কিন্তু এখনও অপূর্ণই। লন্ডন অলিম্পিক্সে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন ভরত ছেত্রী। কিন্তু ২০১৬-র রিও অলিম্পিক্সে ভারতের অধিনায়ক হচ্ছেন সর্দার, এমনটাই ঠিক ছিল। সর্দারের ফর্ম একটু ঢিলের দিকে যাচ্ছিল, ফিটনেসের সমস্যাও ছিল। তবু তাঁর হাত ধরেই যোগ্যতা অর্জন পর্বে দারুণ খেলেছিল ভারত। লন্ডনে গিয়ে নিজের কন্ডিশনিংয়ের উপর কাজ করছিলেন সর্দার। একটা অদ্ভুত উৎসাহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন হকি দলটায়। বহুবছর পর সবাই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, অলিম্পিক্স মেডেলটা এবার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎই টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে নেমে এল দুঃস্বপ্ন। অধিনায়কত্ব চলে গেল সর্দার সিংহের। সে জায়গায় অধিনায়ক হলেন গোলকিপার সৃজেশ। সর্দারকে দল থেকে বাদ দেওয়ার কথাও হচ্ছিল। কিন্তু কোচ অল্টমান ছিলেন নারাজ। মিডিও হিসেবে না হলে, স্ট্রাইকার হিসেবেই সর্দার সিংহকে খেলাবেন বলে দরবার করেছিলেন তিনি (ভারতীয় জার্সি গায়ে ২৭৪টি ম্যাচ খেলে ফেলা সর্দারের গোলের সংখ্যা ১৬)। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মিডফিল্ডার হিসেবেই রিও যান সর্দার। এক গুরুতর অভিযোগ এবং তা নিয়ে বিতর্কই সর্দারের অধিনায়কত্ব নিয়ে নিয়েছিল, এমনটাই মনে করা হয়। কোচ অল্টমান অবশ্য বলেছিলেন, নেতৃত্বর চাপ কম থাকলে সর্দার অনেক ভাল খেলবেন। কিন্তু ভিতর থেকে ভেঙে গিয়েছিলেন সর্দার সিংহ। মজা করতে ভালবাসেন এমনিতে। র‍্যান্ডেড পোশাক, দামি গাড়ির শখ আছে। ফ্রি থাকলেই রেঞ্জ রোভার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেই সর্দার হঠাৎ খেলা ছাড়ার কথা, ধর্মের কথা বলতে শুরু করেন। ২০১৫-য় পদ্মশ্রী পাওয়া মানুষটার সব সম্মান তো তখন ধুলোয়! সর্দার সিংহর মনের অবস্থা প্রভাব ফেলেছিল দলেও। কোয়ার্টার ফাইনালের বেশি এগোয়নি ভারত।

কিন্তু সর্দাররা হেরে যায় না। এখনও অধিনায়ক হতে পারেননি সর্দার। বিতর্ক, মামলা চলছে এখনও। কিন্তু অলিম্পিক্সের পর থেকে আবার নতুন করে আগুন হয়ে উঠেছেন তিনি। রিও-র মাসদুয়েক পরই এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফিতে টুর্নামেন্টের সেরা নির্বাচিত হন সর্দার সিংহ। তাঁর হাত ধরে সেমিফাইনালে শক্তিশালী কোরিয়া এবং ফাইনালে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে জয়ী হয় ভারত। ৩০ পেরনো সর্দার এখন চূড়ান্ত ফিট। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড হকি লিগে অসাধারণ খেলে গোল করিয়েছেন, করেছেনও। বড় দুই তারকা না থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত টুর্নামেন্টে ভারত ভালই খেলেছে, সৌজন্যে ওই মানুষটি। লিগের মাঝেই ব্রিটিশ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন সর্দার। তাতে কী? স্বপ্নটা যে দারুণ যত্নে আবার ঘষা শুরু করেছেন তিনি। অলিম্পিক্সে দেশের অধিনায়কত্ব, একটা অলিম্পিক্স মেডেল...

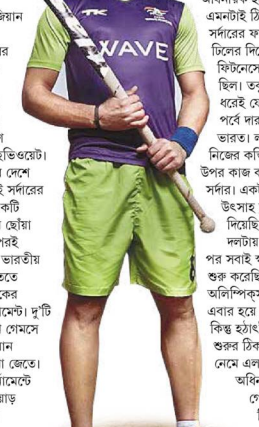

'দিল্লি ওয়েভরাইডার্স'-এর জার্সিতে

রিও অলিম্পিকসে রৌপ্যপদক হাতে নিয়ে সিন্ধু

শাবাশ সিন্ধু

সাইনা নেওয়াল, সানিয়া মির্জার পর ফের আন্তর্জাতিক খ্যাতির আলোয় হায়দরাবাদের এক মেয়ে। ভারতের নতুন ব্যাডমিন্টন তারকা।

সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বছর, রিও অলিম্পিক্‌সে পি ভি সিন্ধু ব্যাডমিন্টন ফাইনালে হেরে গেলেন স্পেনের ক্যারোলিনা মারিনের কাছে। মারিন সে-সময়ে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। ক্রিকেটের জন্য বরাদ্দ সকল উন্মাদনা সেদিন ব্যাডমিন্টনে চালিত করেছিল ভারতবাসী। কিন্তু না, মারিনের আগ্রাসী খেলার সামনে জোর লড়াই চালিয়েও শেষ পর্যন্ত জিততে পারলেন না সিন্ধু। এখানে একটু থেমে দ্বিতীয়বার ভাবা যাক। সিন্ধু কোথায় হেরে গেলেন? যা হল, তা সোজা অর্থে 'হার' নয়। তা ভারতীয় ক্রীড়া তথা ব্যাডমিন্টন ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল পর্ব। পি ভি সিন্ধু হারেননি। তিনি রৌপ্য পদক জিতেছেন। সোনা আসেনি, রুপো এসেছে। প্রথম ভারতীয় এবং কনিষ্ঠতম মহিলা হিসেবে সিন্ধুই তা এনেছেন। তিনি আমাদের নতুন অহংকার। বয়স বেশি নয় হায়দরাবাদের এই মেয়েটির, জন্ম ১৯৯৫ সালে। লন্ডন অলিম্পিক্‌সে (২০১২) ব্রোঞ্জ জিততে দেখেছিলেন সাইনা নেওয়ালকে। তখন থেকেই সিন্ধুরও লক্ষ্য হয়ে যায় অলিম্পিক্‌স, ঐতিহাসিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া, দেশের

হয়ে পদক জেতা। আট বছর বয়স থেকেই ব্যাডমিন্টন খেলছেন সিন্ধু। বাবা পি ভি রামানা ও মা পি বিজয়া ভলিবল খেলোয়াড়। রামানা অর্জুন পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু মেয়ে বেছে নিলেন ব্যাডমিন্টন। তাঁর গুরু, অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হওয়া পুল্লেলা গোপীচন্দ।

প্রথম দিকে সেকেন্দ্রাবাদে ভারতীয় রেলওয়ের ইনস্টিটিউট অফ সিগনাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস-এর ব্যাডমিন্টন কোর্টে মেহবুব আলির কাছে খেলার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছেন সিন্ধু। তারপর, গোপীচন্দ ব্যাডমিন্টন আকাদেমিতে। কোচ গোপীচন্দ তখন থেকেই লক্ষ করেন, তাঁর এই ছাত্রীর ভিতর হার-না-মানা মনোভাব। গোপীচন্দের কোচিংয়ে পরপর বেশ কয়েকটি খেতাব জিততে থাকেন সিন্ধু। ৫১তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস-এ অনূর্ধ্ব-চোদ্দো বিভাগে স্বর্ণপদকও পান তিনি। উত্তরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল সিন্ধুর। দেশের পরিধি থেকে বেরিয়ে ক্রমে আন্তর্জাতিক পরিসরে পা রাখেন তিনি। সেখানেও পেতে থাকেন খেতাব, জিততে থাকেন পদক। নজরে আসেন বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন-বোদ্ধা ও সমালোচকদের। আর তাঁরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হন, এই মেয়েটি অসম্ভব প্রতিভাময়!

২০১৩ সালে মালয়েশীয় ওপেন জেতেন সিন্ধু, তাঁর প্রথম গ্রাঁ প্রি স্বর্ণপদক। সে-বছরই আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা জিতে নেন তিনি। ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে উইমেনস সিঙ্গলসে প্রথম ভারতীয় পদকজয়ী (ব্রোঞ্জ) হন পি ভি সিন্ধু। বছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত ম্যাকাও ওপেন গ্রাঁ প্রি গোল্ড টুর্নামেন্টও জিতলেন সিন্ধু। তাঁর বাবা যে-পুরস্কার পেয়েছিলেন, ভারত সরকারের কাছ থেকে সেই পুরস্কারই এবার পেলেন মেয়ে। অর্জুন পুরস্কার। ২০১৪ সালে ফের ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতেন সিন্ধু। ধীরে-ধীরে পেশাদার ব্যাডমিন্টনের কায়দা-কানুন শিখে নিচ্ছিলেন সিন্ধু। যেমন, তিনি স্বভাবে লাজুক। কোর্টে চেঁচাতে পারেন না, আগ্রাসন দেখাতে পারেন না। কিন্তু

কোচ গোপীচন্দের সঙ্গে

ব্যাডমিন্টন একটি মাইন্ড গেমও বটে। এখানে খেলার দক্ষতার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরী ভাষাও জরুরি। গোপীচন্দের তত্ত্বাবধানে সিন্ধু নিজের প্রতিভার ষোলোআনা বের করে আনতে শেখেন। পরিবর্তন আসে তাঁর খেলার শৈলীতে। ভীষণ রকম পরিশ্রম করতে পারেন সিন্ধু। যদিও লাজুক প্রকৃতির হলেও সবসময় যে নিজেকে স্থিতধী রাখতে পারেন, এমনটা নয়। তাঁর কাছ থেকেই জানা যায়, "পরাজয়, বিরুদ্ধ-সমালোচনা আমি সহজে গ্রহণ করতে পারি না। মনে আছে, বাবাকে একবার বলেছিলাম, লোকে আমার সম্পর্কে বাজেভাবে কথা বলছে, আমি নিতে পারছি না, ভেঙে পড়ছি।" বাবা একটিই কথা বলেছিলেন, "তোমার র‍্যাকেটই তোমার উত্তর হোক।"

তাই-ই হয়েছে। র‍্যাকেটই কথা বলেছে তাঁর। তবে সাফল্যের নেপথ্যে শুধু কোচ বা নিজের পরিশ্রমকেই চূড়ান্ত বলে মানতে চান না ২২ বছরের সিন্ধু। সর্বাগ্রে রেখেছেন তাঁর বাবা ও মা-কে। মা স্বেচ্ছাবসর নিয়ে নিয়েছিলেন মেয়ের জন্যই। বাবা সর্বক্ষণ থেকেছেন মেয়ের পাশে, নিজের কাজকর্মের কথা চিন্তা না করে। তাঁরা দু'জনেই চেষ্টা করেছেন খেলার প্রতি যাতে অবিচল থাকতে পারেন সিন্ধু, তাঁর খেলার পথে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে। মেয়ের বিন্দু থেকে 'সিন্ধু' হওয়ার পিছনে তাই এই খেলোয়াড়-অভিভাবকদের অবদান অনস্বীকার্য।

রিও অলিম্পিক্সে রুপো জেতার পর থেকেই ভারতে অন্যতম চর্চিত ক্রীড়াব্যক্তিত্ব পি ভি সিন্ধু। একাধিক ব্র্যান্ড এনডর্সমেন্ট। লাইমলাইট। ২০১৫-তেই পেয়েছিলেন পদ্মশ্রী। ২০১৬-তে পেলেন রাজীব গাঁধী খেলরত্ন পুরস্কার। বলিউডে নির্মীয়মাণ তাঁর বায়োপিকও। এখন নিজেকে কীভাবে দেখেন সিন্ধু? বেশ নির্লিপ্তির সুরেই তিনি বলেন, "ব্যাঙ্ক সিন্ধু আমি নিজেই। রেগুলার লাইফ লিড করলেও প্রচুর পরিশ্রম করেছি। অলিম্পিক্স সবে শুরু। এখনও অনেকটা পথ যাওয়ার বাকি।

আমরা জানি, সিন্ধুর স্বপ্ন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জয়, অলিম্পিক্সে স্বর্ণপদক এবং অল ইংল্যান্ড খেতাব। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার তাঁকে একটি অনন্য সম্মান দিয়েছিল রিও-তে রুপোজয়ের পর, সরকারি চাকরি, গ্রেড ওয়ান অফিসার। ডেপুটি কালেক্টরের পোস্ট। সিন্ধু সাগ্রহে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, "ব্যাডমিন্টনে আমি হয়তো আরও সাত থেকে দশ বছর থাকব। তার পর আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই, ফুলটাইম কাজ। সে-কারণেই সরকারি চাকরির প্রস্তাব আমি না গ্রহণ করে থাকতে পারিনি।"

অনেকেই হয়তো ভেবেছিলেন সিন্ধু বলবেন, তিনি তাঁর গুরু গোপীচন্দের মতো কোচ হবেন। কিন্তু সিন্ধু জানিয়ে দিয়েছেন, না, তিনি কোচ হতে চান না। আপাতত ব্যাডমিন্টন কোর্টেই দেখা যাবে পুসারলা বেঙ্কটা সিন্ধুকে। সেখানে পরাজয় থাকবেই, আশাভঙ্গও হবে। তবুও, এসবের মধ্যেই তাঁর কাছ থেকে আশা আরও রেকর্ড-ভাঙা রেকর্ড, জয়, পদক, খেতাবের।

সাফল্যের হাসিতে ঝুলন গোস্বামী

ঝড়ের নাম ঝুলন

বাংলা তথা ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন আইকন এখন ঝুলন গোস্বামী।

চন্দন রুদ্র

লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী ছিলেন না মোটেই। বরং ছেলেবেলায় খেলাধুলোর প্রতি ঝোঁকই ছিল বেশি। বিশেষ করে ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রিয় খেলা। সেদিন বই খাতার বদলে ব্যাটবল নিয়ে মেতে থাকা নদিয়ার চাকদহের প্রত্যন্ত গাঁয়ের মেয়েটিই আজকের সফল বোলার ঝুলন গোস্বামী। এ মুহূর্তে মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক তিনি। তাঁর বোলিং ঝড়ে ভেঙে গিয়েছে দশ বছর আগের পুরনো নজির। নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে বিশ্বক্রিকেটে ধোনি, কোহলিদের মতো ঝুলনও এখন তারকা।

লর্ডসে জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দুরন্ত সাফল্য নিয়ে ইংল্যান্ড সফর শেষ করে দেশে ফেরার পর কলকাতা বিমানবন্দরে ফুল, মালায় রাজকীয়ভাবে তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল আমজনতা। অনেক বছর